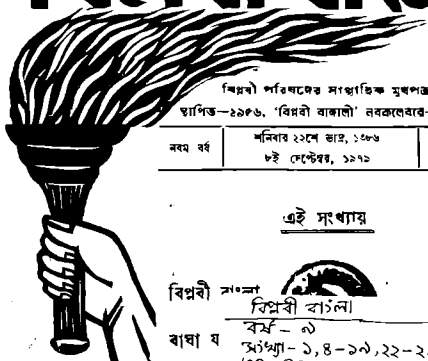


বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণত্র
স্থাপিত—১৯৪৬, 'বিপ্লবী বাংলা' নবকালেবার—১৯৭১

নবম বর্ষ	শনিবার ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	১ম সংখ্যা
----------	--	-----------

এই সংখ্যায়

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী বাংলা

বর্ষ - ৯

বাধা য

সংখ্যা - ১, ৪-১৯, ২২-২৬, ২৮,
৩০-৪০, ৪২, ৪৪-৪৬, ৪৮

রক্ততী

১৩৮৬-৮৭

সংসদী

(১৭৭৭-৪০)

। প্রকাশিত কলকাতায় ।।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। কীর্তি ৮৩ ।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ঘোষিত সময়

। ডঃ আশা দাস ।।

রাষ্ট্রপুত্র সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক বলিরী মোহন দাস ।।

বালেশ্বর দিবস স্মরণে

বিপ্লবী পরিষদের

প্রজ্ঞাভাষী ।

বিপ্লবী বাংলা

‘বিপ্লবী বাংলা’র আরো একটি বছর পূর্ণ হল। বিগত আট বছরের দীর্ঘ যুদ্ধের পথ অতিক্রমাস্তে নবম বৎসরে পদার্পণ করলো এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি। সাংবাদিকতার মহান ঐতিহ্য থেকে আমরা ভারতবর্ষের আপামর জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ—সত্যতা ও নিষ্ঠাকতার আদর্শে। তাই ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলতে বিধা করিনি কোন দিন—সস্তা প্রলোভন ও উচ্চাশার কাছে নতি স্বীকার করিনি। পার্শ্ববর্গের নিকটে এর ক্ষুদ্র অমর্য। যেমন ঈকুঠ প্রশংসা পেয়েছি তীব্র সমালোচনাও করেছেন অনেকে—এই সমালোচনা আমাদের কবচচুণনের নোঙর। বলা করেছে বাজারী পত্রপত্রিকায় রূপান্তরিত হওয়ার সন্থ সর্বনাশ থেকে। বিপ্লবী বাংলার জয়লগ্নে বর্ষে আনুষ্ঠানিক দল্লাদ জানাই আমাদের অস্বাদিত পার্শ্ববর্গকে—আর দল্লাদ জানাই তাঁদের, বিভিন্ন সময়ে ধারা লেখা দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন। প্রণাম জানাই অগণ্য প্রোতঃস্বরণীয় শহীদদের উদ্দেশ্যে—তাঁদের অলঙ্কার ‘বিপ্লবী বাংলা’কে প্রতিনিয়ত বলা করে চলেছে।

২ই সেপ্টেম্বর বিপ্লববর্ষি বাঘা বড়ীনের অমর স্মৃতিপূত বালেশ্বর দিবস—জাগ ও দেশ-সেবার মহান আদর্শে যে দিনটি জাতির স্মৃতি থেকে কোনদিনই মুছে যাওয়ার নয়। আর এক ২ই সেপ্টেম্বরে জন্ম নিয়েছিল ‘বিপ্লবী বাংলা’—ভারতবর্ষের দ্রুত ও জীবিত অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন ও স্বপ্নের মানসপুত্র। যে নৈতিকতার আদর্শে তারা একদিন জীবন পণ করেছিলেন, ‘ঈসির মঞ্চে গেয়ে গিয়েছিলেন জীবনের জয়গান’—তাঁদের সাধনা ও স্বপ্ন রূপায়িত হবে ‘বিপ্লবী বাংলা’র—এটিই এই পত্রিকা প্রকাশের প্রধানতম লক্ষ্য। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আক্রমণ আমাদের করায়ব হয়নি—এখনো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে—অবতীর্ণ হতে হবে আরো বহুবিধ সংগ্রামে। বর্তমান দেশ ও জীবনকে সেই নবস্তর সংগ্রামের পথে উত্তীর্ণ করাই ‘বিপ্লবী বাংলা’র আদর্শ ও জীবনবেদ। আমরা যেন সেই লক্ষ্যে অবিচলিত থাকি এই প্রার্থনা জানাই।

বাঘা যতীন স্মরণে

(বন্দনা)

শ্রীগৌরমোহন বসু ।

হে বাঘা বিজ্ঞানী বীর

বালেশ্বরের জঙ্গলে—

ভূমি ভাটলে গচ্ছিয়া ;

অস্ত্রের আশা নিষা.

মহাকালের মঙ্গলে ।

দূম তাক্সা আগরণে

বিষোষিলে বজ্রধনি,

শিক্কা দিলে দানবের ;

বীর বিক্রমে পশুরে,

ভীত-অব্রাহান্ত হানি ।

আগ্নেয় অস্ত্রের বাতে,

জাগাইলে চিত-রব ;—

অস্ত-আশা অবসানে ;

উজ্জল করিলে প্রাণে

ভাবতের যে গৌরব ।

মৃত্যুঞ্জয়ী হে যতীন

সত্য অস্ত্রের বেদনে,

জঙ্গলের অমঙ্গল ;

পশু দহিল অনল,

তব ষাণ্ডব দাহনে ।

জাতির দাবারি মূৰ্খা—

বিক্রমী—বাঘা যতীন,

অগ্নি নাম জয় নিল.

ইতিহাসে মুক্ত হ'ল,

মুক্তি ধারা চিরধন ॥

রক্ততীর্থ যাত্রী

রক্ততীর্থ বালেশ্বরে চলিয়াছি শহীদ তর্পণ করিতে। বীরবোদ্ধা বাঙ্গালী শহীদদের কৃকর রক্তে যে হুমি আমাদের নিকট পবিত্র হইয়া রহিয়াছে সেই রক্ততীর্থের ধূলিকণায় সেদিনের সেই প্রবাহিত পবিত্র স্নাত্ত রক্তধারার দুই একটি বিন্দু আজও তাহার বর্ণ গৌরব অক্ষয় রাখিয়া। সজীবিত রহিয়াছে কিনা কে জানে!—কিন্তু চলিয়াছি সেই রক্তের আকর্ষণে। দুনিবার তাহার আকর্ষণ, হৃষ্পষ্ট হুনিমিত্ত তাহার আহ্বান!

আজিকার তরুণ বাঙ্গালী, আজিকার স্বাধীন স্বয়ংশাসিত বাঙ্গালী, তোমরা সে আহ্বান স্তব্ধে পাও কিনা জানি না,—তোমরা সে আকর্ষণ অনুভব কর কিনা জানি না! কিন্তু আমরা বাহারা জীবন প্রভাতে সেই রক্তের আহ্বানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম তাহাদের নিকট সে আহ্বান একটা মৃত্যুহীন অনুজ্ঞা হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল, সে আকর্ষণ জীবনের গতি ও প্রগতির নির্দেশ দান করিতেছে আজও।

১৯১৪ সাল। সেদিনের বাঙ্গালী, সেদিনের ভারতবাসী দেশকে দেশমাতৃকা বলিয়া জানিত, দেশকে দেশজননী বলিয়া পূজা করিত। শৃঙ্খলিত দেশমাতৃকাকে মুক্ত করিবার জন্য মায়ের সম্মান বাহারা তাহারা সেদিন আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করিয়াছিল, মাতৃ অঙ্গকে শৃঙ্খলের বেদনামুক্ত করিবার জন্য অকাতরে আত্মাহুতি দিয়া গৌরব বোধ করিয়াছে। ১৯১৪ সালে বালেশ্বর তাহারই একটি ইতিহাস কৃক করিয়া তীর্থে পরিণত হইয়া আছে। সেই তীর্থ তাই ভারত সম্মানের মাতৃতীর্থ।

তোমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, দেশ আজ তোমাদের নিকট কয়েক লক্ষ বর্গ মাইল হৃষ্পতি, তোমরা সেই সম্পত্তির নিষ্কিন্ত্র সর্বাধিকারী। ইহা করিলে তাহাকে ভোগ করিতে পার, ইচ্ছা করিলে তাহাকে দান করিতে পার, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেও পার। তোমাদের হিংসা করি না : কিন্তু আমরা বাহারা দেশকে একদিন জননী বলিয়া জানিয়াছিলাম তাহারা তাহাকে দান, বিক্রয় বা ভোগের সামগ্রী বলিয়া ভাবিতেও পারি না—লজ্জার সন্ধোচে ভয়ে নিজের অস্তিত্বকে হারাইয়া ফেলি। বালেশ্বরের রক্ততীর্থ তাই আজও আমাদের মাতৃতীর্থের অতিজ্ঞান।

ঐয্যা গৌরবে গৌরবান্বিত মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের গর্বিত নাগরিক তোমরা। দামোদর বীর,

অবজ্ঞা করি না, কিন্তু তুলিতে পারি না সম্পদ একদিন আমাদের ছিল, তাহার আকর্ষণে—পূরু আততায়ী ব্যয়ব্যয় বনন মাতৃ অঙ্গে আঘাত হানিয়াছে, শুধু সম্পদ দিয়া সে আঘাত নিবারণ করিতে পারি নাই, কুকের রক্ত চালিয়া সে আঘাত রোধ করিতে হইয়াছে, অথবা রক্ত দিতে পারি নাই বলিয়া মাতৃঅঙ্গে বহুনের বেদনা অসহায়ের মত সঙ্গ করিতে হইয়াছে। তাই বালেশ্বরের রক্ততীর্থে আজও আমাদের সুক্তি-তীর্থের প্রতীক, তাহাকে তুলিতে পারি না।

তোমরা প্রগতিবাদি বহুবংশল জাতি বলিয়া সারা পৃথিবীতে আজ পরিচিত হইয়াছ,—থল তোমরা। জননীকে বশিত করিয়া এক মাতৃগর্ভজাত ভ্রাতার মিত্রতা ক্রয় করিয়াছ, প্রতিবেশী চীন তোমাদের সীমান্ত বেষল করিলে তোমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মিত্রতার অভিযান কখন করিয়া ভোরণ সম্ভিত কর, তোমাদের সুবিশীর্ণ সম্পত্তির কিছু অংশ নিবিবাসে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রতিবেশীর সহিত মৈত্রী সম্পর্ক প্রগাঢ় করিবার বশ দেখিতে পার। তোমাদের বশ সার্থক হউক! মাতৃ অঙ্গ বিলাইয়া দিয়া বহুকে লইয়: যদি স্নেহে থাকিতে পার, শান্তিতে বাস করিতে পার, যদি সসন্মানের গৌরবে ধরাপুটে বিচরণ করিতে পার, তবে আমরা স্ক্রুদ্ধ হইব না।—কিন্তু ভাই, তোমাদের আজিকার এই বহুর বিনিময়ের সওগান দ্বব। পণ্য যে সম্পত্তি তাহাকে জীবন প্রভাতে একদিন আমরা শ্মশানিতা, অবমানিতা, অঙ্গসজলা মাতৃরূপে ল্যভ করিয়াছিলাম।

তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিতে, তাহাকে অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে, তাহার নয়নের অঙ্ক মুজাইতে একদিন তোমাদেরই পূর্বগামীগণ বনন বহুর অবেষণে, মিত্রের সন্ধানে পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে নিঃসঙ্গল পর্যটক করিয়া কিরিয়াছেন তখন তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে পথকুকুরের বিড়ম্বনা। সে আলা, সে বিড়ম্বনা কল্পনা করিতেও তোমাদের বলি না। কিন্তু আমরা তুলিতে পারি না। তাই চলিয়াছি সেই রক্ততীর্থে যেখায় প্রথমতম এক বহুর গোপন সওগাদ গ্রহণ করিতে গিয়া সেদিন হৃদ্বিনের বন্ধ অবেষণে রত তোমাদেরই পূর্বগামী একমল বাঙ্গালী তরুণ কুকের রক্ত চালিয়া নির্বাসন প্রান্তরের বালুকশাকে রঞ্জিত করিয়া গেল। আজ তোমার হৃদ্বিনের বন্ধ মিলিয়াছে জানি না সে কেমন! কিন্তু তোমাদের জীবনে সার্থকতা গান করিতে, তোমাদের জীবনকে গৌরব মণ্ডিত করিতে বন্ধ খুঁজিয়া বাহা পায নাই, আশন রক্তের বেবায় তোমাদের আজিকার ব্যাত্রাপণের বাহা নিশান নির্দেশ করিয়া গিয়াছে, যদি ইচ্ছা হয় মুহূর্তের জন্য তাহাদের স্মরণ করিও, হৃদ্বিনে না হউক হৃদ্বিনে ছায়ায় মত পার্শ্ব থাকিয়া, বিবেকের মত কুকের মধ্যে বসিয়া, শক্তির মত বাহতে আশ্রয় করিয়া তোমাদের তাহা সঙ্গান করিবে, তোমাদের সঙ্গী হইবে। স্মরণ করিও আজ শত-শত শহীদেব সঙ্গে তাহাদের—

বুড়ীবালামের জীয়ে—

কুকের রক্তে সেদিন বাহা রাঙালে বরিত্তীয়ে।

রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

[“A Nation In Making” গ্রন্থ থেকে অংশবিশিষ্ট]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

(বহির্শাল সম্মেলনের পরে)

(পূর্ব প্রকাশিতের পরে)

বিশেষী ব্রত সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার
প্রয়োজন আছে। বিশেষী আন্দোলনের এই
ব্রতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিশেষী ব্রত
গ্রন্থের ভাবনাটা আমার কাছে থেকেই আসে।
আমিই এই ব্রতের স্রষ্টা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের
কলরা স্টেশনের কাছে একটি গ্রামে এক বিশেষী
সভায় বক্তৃতা করার সময় এই ধারণাটা আমার মনে
আসে। সভাটি হজিলা একটি হিন্দু মন্দিরের
সামনের প্রাঙ্গণে। আমার বক্তৃতা করার সময়
সেবতার মৃতিটি ছিল ঠিক আমার মুখোমুখি।
স্থানটির পরিবেশ ছিল ধর্মীয় ভাবে মণ্ডিত। বিশেষী
সভাবনাটা একটা ধর্মীয় আলোড়নের উদ্দীপনা
জাগিয়ে তুলেছিল। এটা আমাদের ধর্মের অঙ্গীকৃত
হয়ে পড়ল। কোন পূজা-পার্বণে বিশেষী জিনিষ
যেখানে পুরোহিতেরা পৌরোহিত্য করতে অস্বীকার
করতে লাগলেন। বিশেষী বস্ত্র, বিশেষী বাজ,
বিশেষী চিনি ও লবণ একরকম ধর্মীয় নিষ্ঠা নিয়েই
পরিভাষ্য করা হল। আমাদের ধর্মীয় ভাবটা এত
কর্মব্যাপক যে প্রকৃত ধর্মের ক্ষেত্রেও ছাপিয়ে গিয়ে
আমাদের জীবনের সমস্ত কর্ম-কাণ্ডকে তা রঞ্জিত করে
দেয় ও তার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে। এই
ভাবে বিশেষী সংস্কার আমাদের ধর্মীয় সংস্কারের
রূপ লাভ করে। মন্দির এবং সেবমূর্তির প্রতি

আমার মনটা ঐ স্থানের মহাশ্রেষ্ঠ ভবপূর হয়ে
যাওয়ায় দুহর্তের মধ্যে একটা আচমকা আবেশ
এসে আমার মনটাকে অধিকার করে বদল এবং আমি
সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে দাঁড়িয়ে উঠে তাদের উপাস্ত
সেবতার সম্মুখে এক মহান সত্ত্ব গ্রহণ করতে
আবেদন করে ফেললাম। সঙ্কল্পের বাঁধাটি আমি
সকলকে তুললাম। সমবেত সকলে দাঁড়িয়ে আমার
কথা শুনে শুনে তা আত্মিক করল। কথামূলক
বাংলায়। বক্তৃতাও বাংলাভাষায় করা হয়েছিল।
ইংরেজীতে তার নিয়মিতরূপে অনুবাদ করা যেতে
পারে।

“সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে আমাদের সাক্ষীরূপে
থাকার আহ্বান জানিয়ে এবং আমাদের বংশধরগণের
সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা এই মহান সত্ত্ব গ্রহণ করছি
যে বস্তুর সম্মুখে আমরা বিশ্বে প্রস্তুত প্রত্যাশি
ব্যবহার করব এবং বিশেষী প্রত্যাশি ব্যবহার করা
থেকে বিরত থাকব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।”

এই সঙ্কল্পের কথা আমি পূর্বে কখনও ভাবিনি।
স্থানটির পারিপার্শ্বিকতার প্রেরণায় এক আকস্মিক
ভাবাবেগের বশে এ রকমটা হয়েছে। এর ফল যা
হয়েছে তা বর্ণনা করে বৃথান যায় না; অসুখান
করেই তা ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় যখন
দেখা গেল যে আত্মমানিক প্রায় ১০ হাজার থেকে

আবোহা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো এবং সম্বন্ধে সেই সম্বন্ধ বাক্যের কথাগুলি আবৃত্তি করল। কিছুদিনের জন্য আমাদের সমালোচকরা কিছুই বললেন না। কিন্তু শোমই যখন এই সম্বন্ধ বাক্য জনগণের চিত্তে ক্রমশ গভীর রেখাপাত করেছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তখনই তারা গর্জন করে আমাদের অভিসম্পাত করা শুরু করে দিল। আমরা তা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু কোন আশ্রয় দিইনি। আমরা আমাদের সহজ ভাবে পথেই এগিয়ে চলেছি।

পরের দিন বরিশালে একটি সাহিত্য সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। ডাঃ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা থেকে সে সম্মেলনে যোগদান করার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু সে সম্মেলনের অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হল এবং তিনি মিঃ কৃষ্ণেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে কলকাতায় চলে গেলেন। তার পরের দিন বরিশাল শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে রহমতপুর গ্রামে এক খদ্দেমী ও দেশ-বিভাগ বিরোধী সভায় বক্তৃতা করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করা হল। আমাদের আতিথ্য দান করেছিলেন ঐ স্থানের জমিদার চক্রবর্তী পরিবার। এরা বেশ বনোন্নি পরিবার। পরিবারটি খদ্দেমী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে দিবেছিলেন। আমাদের বেশ একটি বাব-সাধ্য প্রোভোকেস দেওয়া হল। খদ্দেমী অনুষ্ঠানের ফলে ঐ স্থানের পল্লীগোমেও বর্ণ-বৈষম্যের বাঁহাৰ কথা সকলে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি বিলম্বিত কেন্দ্র বাঙ্গালী হলেও আমরা সকলে একত্রে বসে আমাদের প্রোভোকেসের আহ্বার গ্রহণ করি।

প্রোভোকেসের পরেই সভার অনুষ্ঠান হল। সভার কাজ শেষ হলে পুলিশ এসে উপস্থিত হল। তারা এল রেগুলেশন ল্যাঠিতে বোকাই কয়েকটি ঠিক পাড়ীতে করে। কিন্তু তাদের আসতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব

হয়ে গেছে। ততক্ষণে মেলা ভেঙ্গে গিয়েছে। সুতরাং কাউকে গ্রেপ্তার করা চলল না, দস্তা সম্পর্কে কোন রিপোর্ট দেওয়ার মতও কিছু মিলল না। ইতিমধ্যে বরিশাল শহরে পুলিশের গতিবিধি সম্পর্কে চাকল্যকর গুত্তব ছড়িয়ে পড়ল এবং এরকম সংবাদও রটে গেল যে পুলিশ রহমতপুরে আমাদের গ্রেপ্তার করতে গিয়েছে। আমার আত্মীয় মিঃ বিহারীলাল রায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন; তিনি রহমতপুরে ছুটে এলেন প্রকৃত বাপারটাকী তা জানতে এবং প্রয়োজন হলে আমাদের সাহায্য করতে। আমাদের সঙ্গে তার দেখা হল আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তার পৈত্রিক বাসভূমি লাহুতিয়ার পথে। তিনি আমাদের অন্ধত দেখে ও হৃদয় শরীরে দেখতে পেয়ে খুশি হলেন। তিনি আমাদের তার পৈত্রিক ঘর বাড়ী, উজ্জানদি এবং তার পিতা ও ভ্রাতার সমাধি ক্ষেত্র দেখালেন। এরপরে আমরা এই ভাবে আনন্দ করতে করতে বরিশালে ফিরে এলাম যে আমরা মিঃ ইমার্সন ও তার পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে এদিনের কাজগুলি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

এইভাবে আমার ঘটনাবলি জীবনের উত্তেজনা-পূর্ণ অধ্যায়গুলির একটি অধ্যায় শেষ হল। এই অধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন ইথারোপ্যাস্ট মহিলা আমাকে বলেছিলেন : “কর্তৃপক্ষ বরিশালে আপনাকে কীদে আটকবার জন্য প্রস্তুত হইবেছিলেন। আপনি সে কীদে ধরা পড়েননি; পরন্তু তাড়াই আপনাকে কীদে আটকা পড়েছেন। আপনাকে নৈতিক জয় হয়েছে।” মহিলা ছিলেন একজন নিরপেক্ষ দর্শক। সেট সময়কার উত্তেজনাপূর্ণ মনোবৃত্তি থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণমুক্ত ভাই অবস্থা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে গেরেছিলেন।

একদিন বিজ্ঞান করে আমরা কলকাতা রওনা

হলাম। আমাদের ফিরে আসার সমর্থকার ঘটনা-গুলিও কখনও তুলবার নয়। আমাদের হাজার বা টেন যখনই কোন ঠেখানে থেমেছে তখনই এতোক ঠেখানেই জনতার ভিড় জমেছে আমাকে ও আমার পদধূলি নেওয়ার জন্য। আমার প্রভাবতনের এই ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমার নিজা বা বিগ্রাম মোটেনি এবং প্রত্যয়ে যখন আমরা সর্বশেষ ঠেখান নিয়ালসা এসে পৌঁছলাম তখন দেখতে পেলাম যে এক বিশাল জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য সেখানে সমবেত হয়েছে। এটি সাকুলার সোসাইটির চেলেরা তাদের মাননীয় সভাপতি বাবু কৃষ্ণকুমার ব্রিহ সহ আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে আসিয়াছিলেন।

আমাদের কলকাতা ছাড়ার দিগে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সেই ভোরের বেলায়, যখন কলকাতার লোকের ঘুমও ভাগেনি হাজার হাজার লোক জড় হল আমাদের দেখার জন্য ও আমাদের মুখের কথা শোনার জন্য। মাথার জীবনে সব সময়েই এমন মুহূর্ত আসে মুহূর্তটিতে বৈচিত্র্য থাকে সার্থক বলে মনে হয়। আমার কাছে ছিল এটি সেই বকমের একটা মুহূর্ত। এর আগে আমাকে ২৪ ঘণ্টা ধরে বায়ে বায়ে বক্তৃতা করতে হয়েছে। ফলে আমার গলায় আঙুয়া ক্যাস্কেসে হবে গিয়েছিল। কিন্তু সে সময়ের উৎসাহের টানে আমার বক্তৃতা করতে উঠলাম এবং প্রোত্যয়ের উৎসাহিত করে স্বদেশী সঙ্ঘে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে ও অনড় প্রত্যয়ের সহিত দেশ বিভাগ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে উঠলাম মনে এই নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে যে দেশ বিভাগ বদ অথবা এর সংশোধন হবেই।

সেই সমাবেশে অসংখ্য বক্তাদের মধ্যে লিয়াকৎ হোসেনও ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাখান পক্ষ। তিনি অসংখ্য গণিতের কথা

বাবর পেয়ে মাদারিন উপবাস করে কাটিয়েছেন। একজন অসাধারণ ব্যক্তির সম্পদ লোক এই লিয়াকৎ হোসেন। রাজস্রোহের অভিযোগে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। পুলিশ সব সময়েই তার পিছু লেগে থাকত, তার সমস্ত দেশসেবামূলক কাজকর্ম প্রায় সময়েই সরকারী আদেশে নিবৃত্তি থাকত তার সঙ্গে সকলে সমস্ত বিষয়ে একমত না হতে পারেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্যের সত্যতা তিনি একজন নিষ্ঠাক অনড় এবং অনমনীয় পুরুষ। আমার মনে হয় সরকারী মহল তাকে একজন ভয়ঙ্কর ধনোদ্যম ব্যক্তি বলে মনে করে, কিন্তু উদ্দেশ্যের অকপটতা, স্বদেশের স্বার্থের প্রতি অনন্তমনা অমুরাগ এবং সেই স্বার্থের সেবা নিষ্ঠাকভাবে বীরত্ব প্রদর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে তার জুড়ি নেই বললেও চলে। তিনি বাঙ্গালী নন বিহারী। তিনি আমাদের ভাষাও বলেন না। কিন্তু বাংলাকে তিনি নিজের দেশ করেই নিয়েছেন এবং বাঙ্গালীরা তার ভালবাসার পাত্র। কোন কোন বিষয়ে তার মত ও পথ সম্পর্কে আমি সব সময়ে একমত হতে পারি নি। কিন্তু 'স্বদেশী' ব্যাপারে তিনি যে একজন বীর পুরুষ সে বিষয়ে আমার দৃষ্টিতে তার জন্য সব সময়েই একটা কোমল অমুহূর্তের স্থান রয়েছে।

আমার স্মৃতি চরণের এই অংশটি ছেড়ে যাওয়ার আগে আমাকে মি. এ. রহুল সম্পর্কে দু-একটা কথা অবশ্যই বলতে হবে। মি. রহুল ছিলেন বরিশাল সঞ্চালনের প্রেসিডেন্ট। হায়! মৃত্যু তাকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়েই করাল আসে টেনে নিয়ে গিয়েছে; এবং মৃত্যু ঘটেছে তার পারিবারিক জীবনের এক সব চেয়ে বড় অশুভান তার একমাত্র কন্যার বিবাহের পূর্বকালে, ইষ্টাং ক্রমবস্ত্রের ক্রিয়া বহু

সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরক্ষা অভিপ্রেত

শ্রী বঃ শ্রীধর খন্নোপাধ্যায়

সংসদীয় গণতন্ত্রের এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে ভারত রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কর্তব্য রাষ্ট্রপতি নীলম সন্তীষ রেড্ডী এবং তিনিই চরণ সিংকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ চালিয়ে যেতে যে অমুজ্জ্বল করেছেন, তা সংবিধান সম্মত কিনা সেই প্রশ্নই প্রধান বিচার্য বিষয়। রাষ্ট্রপতি লোকসভার নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা পলসমষ্টির প্রধানকেই সাধারণতঃ মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। তাঁর মনে এ বিষয়ে যদি কোনরূপ সন্দেহ থাকে তবেই লোকসভার আস্থা ভোটের ক্ষমতা ব্যবহৃত করার প্রশ্ন তিনি তুলতে পারেন নচেৎ নয়; কিন্তু চরণ সিং ও মোরারজী দেশাই দুজনেই রাষ্ট্রপতির দ্বারা আদিষ্ট হয়ে এখন তাঁদের সমর্থক লোকসভা সদস্যগণের নামের তালিকা পাঠান তখন রাষ্ট্রপতি উভয়ের প্রেরিত নামের তালিকা ভালভাবে পরীক্ষা করে যাবেন যে মোরারজী ভাইয়ের সমর্থক সংখ্যার চেয়ে চরণ সিংয়ের সমর্থক সংখ্যা বেশী অথচ উভয়ের কারোরই সমর্থকের সংখ্যা নিরক্ষর সংখ্যা গরিষ্ঠ নয়। পাঁচশত আটত্রিশজন সদস্যের লোকসভার চরণ সিং বা মোরারজী দেশাই উভয়ের মধ্যে কেউই সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হন নি, তথাপি রাষ্ট্রপতি চরণসিংকে সরকার গঠনের অমুজ্জ্বল দিলেন নর্থ হইল যে চরণ সিংকে আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই লোকসভার আস্থা ভোটের মাধ্যমে তাঁর সংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে

হবে। এই নর্থ মতই গত ২০শে আগষ্ট চরণ সিং লোকসভায় আস্থাভোটের সম্মুখীন হবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে ঐ দিনে লোকসভার অধিবেশন ডাকার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু লোকসভার অধিবেশন ঐ দিন আবহুত হবার পূর্বেই রাষ্ট্রপতির হাতে চরণ সিং তার পদত্যাগপত্র দাখিল করেন অর্থাৎ চরণ মন্ত্রীসভার ইতি এখানেই সংঘটিত হয়। এই পদত্যাগী প্রধান মন্ত্রী চরণ সিং রাষ্ট্রপতির কাছে বা লোকসভায় কোথাও তাঁর গরিষ্ঠের সমর্থন প্রমাণ করতে পারেন নি এবং সে কারণেই তাঁর কোন সুপারিশ রাষ্ট্রপতি মাফ করতে বাধ্য হনই উপযুক্ত তা বর্জনীয় এবং সংবিধান সেই সাক্ষ্যই দেয়। এতদসঙ্গেও রাষ্ট্রপতি কি করে তাঁকে প্রধান মন্ত্রী বহাল রাখেন সংবিধানের নিষ্পন্ন লঙ্ঘন করে সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার এবং সেই কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিকদল রাষ্ট্রপতির এই কার্যের সমালোচনায় আজ মুখর হতে বাধ্য হয়েছে। চরণ সিং আস্থা ভোট গ্রহণের পূর্বে যে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন সে মন্ত্রীসভাও সংখ্যাগরিষ্ঠের মন্ত্রীসভা এবং তাই সে মন্ত্রীসভার অস্তিত্বই সংবিধান বিরোধী। রাষ্ট্রপতি যে মন্ত্রীসভা ও তাঁর প্রধান চরণ সিংকে যে এখনও কালি চালাতে দিচ্ছেন তা বেআইনী ও সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বাধীনতার পর এই সর্বপ্রথম সংখ্যা লিষ্টের সরকার কেন্দ্রে কাণ্ড পরিচালনা করছেন এক তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসাবে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে

এবং মধ্যবর্তী নির্বাচন পরিচালনা পর্যন্ত। কিন্তু এদের পরিচালনার যে মধ্যবর্তী নির্বাচন অগ্রস্তিত্ব হবে ভিসেসের মাদের মধ্যেই, সেই নির্বাচন যে জায়া-চরণ, নিরপেক্ষ ও স্বাধীনপূর্ণ এবং অব্যাহতাবে অগ্রস্তিত্ব হবে তার গ্যারাণ্টি কোথায়—এ প্রশ্ন যদি চরণ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি জোলেন, তবে কি তা অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক হবে? রাষ্ট্রপতি এখনও চরণ মন্ত্রী সভাকে সংখ্যালঘু ও পক্ষপাতদুষ্ট হলেও হতে পারে এই বিবেচনায় ও সম্যক বিচারে বরখাস্ত করে দিতে পারেন এবং কোন নিরপেক্ষ জ্ঞানী গুণীজনকে প্রধানমন্ত্রী সরকার গড়ার ও কাজ চালাবার ভার দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতিকে এখনই এমন ভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তাঁর ঐ প্রস্তাব আসন, মধ্যবর্তী আসন, ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের উচ্চাঙ্গ থাকে। মধ্যবর্তী নির্বাচন ছাড়া আশ্বাসাম গয়ারাম মার্কা লোকসভা সভ্যদের সঠিক পথে চালাবার আর কোন পথই খোলা ছিল না এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে মধ্যবর্তী নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া ছাড়া এসেদের জনগণের রক্ষা ব্যবস্থা করার ও শত্রু মন্ত্রিসভা চালাবার আর কোন পথই উন্মুক্ত ছিল না। কাজেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের আদেশ সমরোপযোগী, জায়া সঙ্গত ও সংবিধান মোতাবেক হয়েছে বলেই রাষ্ট্রপতি জনগণের বক্তৃতাধারা, কিন্তু চরণ সিংকে না দাবিয়ে দিলে দামনের নির্বাচন যে প্রশংসা হবে না তা কে বলতে পারে? চরণের হস্তম্যান রাজনারায়ণ বিনি বর্তমানে মন্ত্রী (এস) দলের সভাপতি ও অর্থনৈতিক মন্ত্রী হওয়া ও বেশ বসিকজন, তিনি যে নির্বাচনের মুখে মুখে নানান কন্দি কিকির খাটিয়ে নির্বাচনকে প্রশংসা পরিণত করবেন না কে তার গ্যারাণ্টি দেবে চরণ সিং না চাবন? কাজেই নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচেষ্টা চরণ সিংয়ের নিজে থেকেই সরে বাওয়া এবং

মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেওয়া জনগণের পক্ষে মঙ্গলজনক, অস্তিত্ব এই নির্বাচনের পরে তাকে তার এই কাজের ক্ষমতা সমালোচনের সম্মুখীন হতে হবেই আর রাষ্ট্রপতির উচ্চাঙ্গের অবস্থা কলর আয়োজিত হবে এই জগতেই। রাষ্ট্রপতিকে যে ভাবায় আক্রমণ করছে জনগণ, বিশেষ করে দলপতি চন্দ্রশেখর ও সংসদীয় দলনেতা বাবু জগজীবন রাম তা নীতি বিগহিত ও অশালীন এবং রাষ্ট্রপতির এই অমর্যাদা যে সমগ্রদেশের অমর্যাদা, বিশেষ করে বিদেশীদের চোখে তা কি চন্দ্রশেখরজী ও বাবুজী একবারও ভেবে দেখছেন না? রাষ্ট্রপতির উচ্চাঙ্গকে এই জঘন্য ভিতরকারের দ্বান কোরে তোলা যে ভবিষ্যতে কত বড় ক্ষতিকর ও ক্ষতির পক্ষে লক্ষ্যজনক হবে তা কি তারা চিন্তা করেন না?

সংবাদে প্রকাশ, প্রকাশ্য রাজপথে সর্বজন সমক্ষে বাবু জগজীবন রাম না কি ভাষণ দিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডী, তাকে প্রধান মন্ত্রী হবার সুযোগ দেন নি পূর্বের আক্রোশ বশে কারণ ১৯২৮ সালে যখন সর্ব প্রথমে কংগ্রেস নির্বাচিত হয় তার ঠিক পরেই তিনি রেড্ডির বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে ছিলেন, ফলে রেড্ডি সেবারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হেরে যান। বাবুজী একজন প্রাজ্ঞ ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হয়ে কি ভাবে রাষ্ট্রপতির মর্যাদার আসনে এমন হীন পন্থায় কাশ হোঁড়েন তাঁ সাধারণ বুদ্ধির অঙ্গমা এবং তার মত ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে এতটা নিচে নামতে পারেন তা স্বাভাবিক অসীত। বাবুজীর বিকৃতবাসী কোন দুইলোক যদি তার মত একই কারদার নির্দয় রাজপথে সভাকরে বলে যে বাবুজী মন্ত্রী থাকাকালে স্বীয় আয়করের হিসাব দাখিল করেন নি বহু বহু হবে ও আয়কর বিভাগের চাপে পড়ে মারা যাবেন তিনি একদিনের জন্য

বলে যে রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকায় নিজ
 রিটার্ন যথাসময়ে দিতে পারেন নি এবং ফলে তার
 পক্ষে যথাসময়ে খীয় আরবর জমা দেওয়া সম্ভব
 হয়নি তুলেব জন্ত, আরবর ঋণিক সেবার জন্ত নয়—
 তবে কি বাবুজীর মত নামী লোকের মর্যাদার আঘাত
 লাগবে না, যদিও দুইসেতকের ঐ কথাই মধ্যে সত্য
 নিহিত আছে বলে উপনিষদে সংবাদ পত্রের ববরে
 তা প্রকাশ পায়।

রাষ্ট্রপতির কাছে মোরারজীভাই সংখ্যা গহিষ্ঠের
 তালিকা দিতে পারেন নি বলেই অনাস্থা প্রস্তাবের
 প্রস্তাবকে অর্থাৎ চাবনকে মন্থিসিতা গর্হনের আক্রমণ
 দিয়ে ছিলেন। চাবন অপারগ হওয়ার পরে সেনাটি
 ও চরণ সিংকে একই সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন।
 কিন্তু তখনও বাবুজীর দলনেতা (সংসদীয়) মোরারজী
 ভাই চরণের থেকে কম সংখ্যকের সমর্থন পান। এ
 কথা কি বাবুজী জেনেন না—না জেনেন্তেই স্তম্ভ
 ক্রোধের বশে রাষ্ট্রপতিকে অথবা অশালীনভাবে
 আক্রমণ করার জন্তই তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত বিবো-
 দগার করছেন যা কোন মতেই শোভন ও সঙ্গত নয়।
 চন্দ্রশেখর নিজ দল সামলাতে না পেরে এখন সব
 সেবট রাষ্ট্রপতির ব্যাঙে চাপাতে চাইছেন। রাষ্ট্র-
 পতির ইমপিচমেন্ট করার জন্ত তিনি কমিটি তৈরী
 করে ফেলেছেন। এখন দেখাবাক তারাও চরণ সিং
 মূল্যিমায়ে, রাজনারায়ণ, জরজ কারনানডেজ, বিজু-
 পট্টনায়ক, বহুগুণা এবং জনতাদলের অস্ত্রান্তের মত
 হঠাৎ সুযোগ বুঝে দলছুট হয়ে চরণের ঐচরণেয়
 হবে না পড়ে। রাষ্ট্রপতি কি জনতাদল ভেঙ্গেছেন
 না ভাঙ্গার উৎসাহ দিয়েছেন যে তাঁর ওপর এই
 হীন আক্রমণ—কেন এই নোংরামি? সংসদীয়
 গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির মর্যাদার আসন অতি উচ্চ,
 উপস্থিতি তাঁকে এভাবে হেয় করার জন্ত এই নিম্নবীর

প্রচেষ্টা কেন? রাজনারায়ণ জনতা (এস) দলপতি
 যা বুঝী তাই অতীতে করেছে এবং ভবিষ্যতেও হয়ত
 যা করতে পারে, কিন্তু চন্দ্রশেখরের কি রাজনারায়ণী
 চিন্তা শোভাপায়? বর্তমান অবস্থায় ভারতে
 সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে রাষ্ট্রপতির
 ইমপিচমেন্ট করলে কোন ঠবিধাই হবে না আর
 তাছাড়া সময় সংক্ষেপ করার নির্বাচন নভেম্বরের
 শেষেই; তাই এখন সূচী ও পক্ষপাতশূন্য নিরপেক্ষ
 নির্বাচন অত্যাচারের জন্ত চন্দ্রশেখর ও অস্ত্রান্ত সকল
 দলের দলপতিকে রাষ্ট্রপতির সামনে হাজির হকে
 তাকে বধ্যতে হবে যে নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ
 নির্বাচনের ব্যাংকট চরণ সিংকে হটিয়ে, সেট স্থানে
 দেশবরো। যে কোনও রাজনীতি বজিত চরম
 নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে বসাতে হবে এবং তাতে রাষ্ট্র-
 পতির উচ্চাসনের মর্যাদাও রক্ষিত হবে এবং সংসদীয়
 গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য পূরণ হবে। চন্দ্রশেখর যদি এই
 পথে চলতে রাজি থাকেন তবে মনে হয় ঐমজী
 গান্ধীর সমর্থন ও সহযোগিতা তিনি নিশ্চিৎ পারেন
 জনতা (এস), স্বর্ণ সিংয়ের কংগ্রেস, মূল্যিমায়ে,
 কারনানডেজ মার্গ দমাজতস্থী দল ও বিজু-বহুগুণা
 গোপীর লোকেরা ছাড়া অস্ত্র সব রাজনৈতিক দলই
 চরণ সিং সরকারের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থা নিতে
 রাজি হবে। আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনকে যদি কেউ
 প্রহরনে পরিণত করতে না চায় এবং সংসদীয় গণ-
 তন্ত্রের ওপর সঠিক আস্থাশীল হয়, তবে সকলে মিলে
 একযোগে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রধানদের সঙ্গে
 নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করতে হবে, বেশী
 রহস্তর ব্যাংক অর্থাৎ মধ্যবর্তী নির্বাচনকে বিস্তৃত পন্থায়
 পরিচালিত করতে হবে এবং পক্ষ একটাই তার, আর
 সে পক্ষ কোন রাজনৈতিক দলের হাতে তদাবধায়ক
 সরকার না রেখে নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে এ

সরকারকে তুলে দিতে হবে অবিসম্মে। এ বাপারে
একটা কথা নাকি খুবই প্রচারিত হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি
কোন হরিজনকে প্রধানমন্ত্রী হতে দিতে চান না
এক সেই ক্ষুদ্র বাবুজীর সংযোগ-বিত্ততা থাকে সাথেও
তাকে প্রধান মন্ত্রী করা হয়নি। এটাই হীন চক্রান্তকারী
চিন্তার প্রচারে অনেক হরিজন এম, পি, নংক সক্রিয়-
ভাবে অংশ নিতে দেখা গেছে। ভারতের সংহতি
অংগের এই অপচেষ্টা যারা চালিয়েছেন বা এখনও
চালাতে উৎসাহী তাদের সংসদীয় গণপঞ্চের দ্বারা

ও সুবিধা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে জনগণকেই
সংযতভাবে দায়িত্ব নিতে হবে, অত্যাচার ভারতের
সংসদীয় গণপঞ্চের চরম ক্ষতি সাধন করা হবে; যা
কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। জনগণের দায়িত্ব
নিতে হবে, অত্যাচার ভারতের সংসদীয় গণপঞ্চের
চরম ক্ষতি সাধন করা হবে; যা কোন ক্রমেই
বাঞ্ছনীয় নয়। জনগণের দায়িত্ব এখন সম্মতি
কারণ নিশ্চয় আসন্ন।

রাষ্ট্রীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রসূ

আমলা হুত কুমারী

আমুবেলিয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ এক আন্তর হুত
খাতি-কুন-১ গ্রীষ্মকালীন চক্রবর্তী
কিন্তু কুন-১ গ্রীষ্মকালীন চক্রবর্তী

ঘোষণা

বিদ্যাবী বাংলার আগামী সংখ্যা ২২শে সেপ্টেম্বর শারদীয়া সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইবে।

সেক্ষত : এই সেপ্টেম্বরের সংখ্যা প্রকাশিত হইবে না।



চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ঘোষিত সময়

॥ ডঃ আশা দাস ॥

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার রাত্রে Indian Republican Army র চট্টগ্রাম শাখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের সুচিহ্নিত কর্মসূচীর একটির সঙ্গে অস্ত্রটির সংযোগ কেবল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠই নয়, প্রতিটি কর্মসূচী একসূত্রেই বিদ্রুত। সুতরাং ঘড়ির কাঁটার কাঁটার এক নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত পরিকল্পনা কার্যে রূপায়ণ প্রয়োজন। কার্যের সামগ্রিকতম ব্যতিক্রম চরম বাধ্যতা ও ভীষণ বিপদ ভেঁকে আনবে—এই বিষয়ে বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক বিপ্লবী সূর্য্য সেন এবং তাঁর অঙ্গণামীরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বিদ্রোহ ঘোষণার পূর্বাংগে বিপ্লবী ত্রিপুরা সেন প্রত্যেক গ্রুপের অধিনায়কদের মধ্যে ২:১৫ টি করে ঘড়ি বিতরণ করেছেন। বিতরণের পূর্বে ঘড়িগুলি পরীক্ষা করে সময় ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, ১ম, অনন্ত সিং, এখন প্রশ্ন সর্বাধিনায়ক বিদ্রোহের পরিকল্পনা ঘোষণা করে কোন সময়ে তা কার্যকরী রূপদানের সিদ্ধান্ত করেন এবং কার্যাত: সেই Zero Hour এ বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে কিনা, যদি না হয়ে থাকে, ঠিক কোন সময়ে এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, এই সম্পর্কে পরবর্তীকালে রচিত বিদ্রোহী নায়কদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিতে এবং এই বিদ্রোহ সম্পর্কে অসম্ভাব্য ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থে এতদূর সময় নিম্নরূপ :—

সূত্র :—	সর্বাধিনায়ক কর্তৃক ঘোষিত সময় :—	বাস্তবে বিদ্রোহ কখন ঘটে :—
চারুকিাশ পত্র—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার		
সূচন, পৃ: ১০৭	৯ টা ৪৫ মি:	৯ টা ৪৫ মি:
অধিকা চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম বিপ্লবের		
বহিঃ লিখা, পৃ: ৪৬	৯ টা ১৫ মি:	১০ টা ১৫ মি:
লোকনাথ বসু, চট্টগ্রাম বিপ্লবের		
বহিঃলিখা, পৃ: ২২	১০ টা	১০ টা
পশেন ঘোষ, বিপ্লবী সূর্য্য সেন		
বক্তৃতামালা, পৃ: ৭৫	১০.৩০ মি:	১০-৩০ মি:
অনন্ত সিং, অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম, পৃ: ০৫০	সন্ধ্যা ৮ টা	১০ টা

সেবা থাকে এঁরা প্রায় সকলেই Zero Hour সম্পর্কে ভিন্ন সময় নির্দেশ করেছেন। এদের চারুকিাশ পত্র বাতীত আর সকলেই চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বিশিষ্ট নায়ক এবং অংশগ্রহণকারী। চারুকিাশ

নিজে বিজ্ঞোহের অংশগ্রহণকারী না হলেও এই বিজ্ঞোহের সঙ্গে গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং বিশৃঙ্খলিত ক্ষতিত কয়েক জন ব্যক্তি তাঁকে এই ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করেছেন। সুতরাং এঁদের প্রত্যেকের প্রদত্ত Zero Hour এর গুরুত্ব রয়েছে।

চট্টগ্রাম দত্তের গ্রন্থে Zero Hour পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তিনি লিখেছেন ‘৯৪৫ মি: শক্তির ইংরাজের রাজ্যকালে সুরক্ষিত দুইটি অস্ত্রাগার ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ একসঙ্গে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের তুর্কি আঘাতের ক্ষণ বাহিয়া ইতিহাসের পাতায় ধসে পড়বে।’ (প্রাগুক্ত, পৃ ৮) ৯-৪৫ মি: সর্বাধিনায়কের পূর্ণ স্থিতিগত সময় এবং ঠিক সেই সময়েই আক্রমণ কার্য আরম্ভ হয়েছে। অভিযানের পূর্বাঙ্কে এমন কোন অনিবার্য কারণ দেখা দেয়নি যার জন্য Zero Hour ২ ঘণ্টা বা ১ ঘণ্টা পরিবর্তন করা প্রয়োজন হতে পারে। তিনি লিখেছেন রেলপথ আক্রমণকারী বিপ্লবী দল ১৭ই এপ্রিল রওনা হয়েছেন। (প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭) বিপ্লবী লোকনাথ বল লিখেছেন ‘১৮ই এপ্রিলের দু’ দিনদিন আগে আমাদের কয়েকজন সান্ধী রেলওয়ে লাইন কেটে দেবার জন্য সহর পরিভ্রমণ করে যান। ১৮ই এপ্রিল রাত ১০টার সময় তারা ধুম এবং লাঙ্গল কোটের মাকামাকি রেলওয়ে লাইন কেটে দেন। (চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহিঃশিখা ‘অধীনতার প্রথম আলো,’ পৃ ২৬) এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী গণেশ বোষ লিখেছেন—‘সেদিন (১৮ই এপ্রিল) বিকাল বেলাতেই রওনা হয়ে গিয়ে রাত্রি ১০-০০টার সময় ৬০ মাইল এবং ৭০ মাইল দূরে দুইটি স্থানে রেলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং রেল লাইনের পার্শ্বের টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়।’ (বিপ্লবী সূর্য সেন পৃ ৭৬) লালমোহন সেন রেলওয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী দলের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তিতে আছে—১৭ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭-৮টার কংগ্রেস অফিস থেকে তিনি এবং অজান্তরা যাত্রা করেছেন—

On Thursday evening we were starting from the Congress office for the Pahartali station... On coming to the Pahartali station we purchased tickets for Dhoom and got into one compartment and the other party took tickets for Nangalkote and got into a different compartment. Then we got down at the Dhoom station at 1 or 1-30 A.m.

১৮ই এপ্রিলের দু’ দিনদিন আগে ৬ জন বিপ্লবীর রেল লাইন বা টেলিগ্রাফের তার কাটার ব্যপারটিরসহ অস্ত্র জাহাজগায় বাস করা নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার পক্ষে সম্মতিন নয়। এক্ষেত্রে বিপ্লবী গণেশ বোষের তথ্যই অবিক নিরর্থকবোধ্য। লালমোহন সেনের স্বীকারোক্তি ও তাঁর তথ্যকেই অধিকতর নির্ভরযোগ্য করেছে।

টেলিফোন ভবন অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী। চট্টগ্রাম বিজ্ঞোহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সূর্য সেন ও নির্বল সেনের পরই তাঁর স্থান। সুতরাং তাঁর প্রদত্ত তথ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তিনি লিখেছেন—‘মহাশয় অজান্তরা সন্ধ্যা ১০-০০ টার মধ্যে ...

মিনিটের সময় হইবার কথা ছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ একই সময়ে হওয়ার কথা ছিল। (চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহুশিখা, চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিবরণ প্রবন্ধ, পৃ ৪৬) Zero Hour পরিবর্তনের কারণও তিনি উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ‘বিভিন্ন দলের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করিতে চলিয়া গেলেন, এমন কি লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের দল Auxiliary Force Army-র সীমানার মধ্যে ঢুকিয়াও পড়িয়াছিলেন। এমন সময় খবর আসিল....সময় এক ঘণ্টা পিছাইয়া দেওয়া হউক।’ (এ) দেখা যাচ্ছে তাঁর মতেও Zero Hour ২-১৫ থাকলেও বাস্তবে কাজ আরম্ভ হয়েছে আটো পবে।

বিপ্লবী মনসু সিং Zero Hour পরিবর্তিত সময় এবং সময় পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে লিখেছেন—‘পুলিশ লাইন আক্রমণকারী দলের সঙ্গে বাণ্যার জঙ্গ যে গাড়ীর বাধস্থা করা ছিল তা যখন লত ছোঁয়ার পরেও শেষ মূহুর্তে পাওয়া গেল না, তখন সমস্তাটি বাস্তবে ঠাড়াল এইরূপ—যে কোন উপায়ে হোক না কেন আমাদের একযান। গাড়ী কিছুক্ষণের মধ্যেই যোগাড় করতে হবে। কিন্তু এই আধ ঘণ্টার মধ্যে একটি টান্ডি ভাড়া করে এনে চালককে বেঁধে রেখে গাড়িটি নিয়ে আমাদের সকলের ঠিক জিরো আওয়ারে (Zero Hour) আক্রমণের জঙ্গ পুলিশ লাইনে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অতৃত ছুটি ঘণ্টা সময় চাই—অর্থাৎ রাত আটটার সময় হুসপং আক্রমণ শুরু না করে আমাদের তা করতে হবে রাত দশটার।’ (যুব বিদ্রোহ, ১ম, পৃ ৪৪) প্রধানতঃ গাড়ী না পাওয়ার জঙ্গ Zero Hour পরিবর্তন করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। গোপন ও আকস্মিক আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হয়ে বাণ্যার পর আরো দু’ ঘণ্টা অপেক্ষা করা যে কত ভয়াবহ ও বিপজ্জনক জাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাঁর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় পরিবর্তিত সময় বিভিন্ন গ্রুপকে জানিয়ে দেওয়া, বন্যাসনয়ে প্রচারপত্র বিলি বন্ধ রাখা ইত্যাদি কাজও খুব তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন।

বিপ্লবী গণেশ ঘোষ লিখেছেন—“এ দিন (১৮ই এপ্রিল) সন্ধ্যাবেলা রাত্রি ১০-৩০টার সময় ৬ জনের একটি ক্ষুদ্র দল পরিপূর্ণভাবে সামরিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে সেই ছোট পাহাড়টির উপর উঠে গিয়ে পুলিশ অস্ত্রাগারে প্রহরারত সৈন্যদের অকস্মাত আক্রমণ করে অস্ত্রাগার দখল করে নেয়।” (বিপ্লবী স্মৃতিসন, ২৭৪) তাঁর মতে ঠিক এ সময়ে অর্থাৎ ১০-৩০টার বিপ্লবীরা টেলিফোন ভবন ও টেলিগ্রাম অফিস এবং পাহাড়তলীর কৌজী অস্ত্রাগার দখল করেন। ঠিক এ নির্দিষ্ট সময়েই ৬০ মাইল ৭০ মাইল দূরের দুইটি স্থানের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে সারা ভারতের সঙ্গে চট্টগ্রামের সংযোগ সূত্র ছিল হয়।

টেলিফোন ভবন অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নেতৃত্বানীত ব্যক্তিদের মধ্যে স্মৃতিসন ও নির্মলসেনের পরই তাঁর স্থান। স্মৃত্যায় তাঁর প্রদত্ত তথ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তিনি লিখেছেন—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার সূত্র ২৮ই এপ্রিল রাত্রি ২-১৫ মিনিটের

সময় হইবার কথা ছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ একই সময়ে হওয়ার কথা ছিল। (চট্টগ্রাম বিদ্রোহের খবরশিখা, চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিবরণ ব্যবসা প্রবন্ধ, পৃ ৪৬) Zero Hour পরিবর্তনের কারণও তিনি উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—“বিভিন্ন দলের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করিতে চলিয়া গেলেন, এমন কি লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের দল Auxiliary Force Arm-র সীমানার মধ্যে ঢুকিয়াও পড়িয়াছিলেন। এমন সময় খবর আসিল....সময় এক ঘণ্টা পিছাইয়া দেওয়া হউক। (ঐ) দেখা যাচ্ছে তাঁর মতেও Zero Hour ২-১৫ থাকলেও বাস্তবে কাজ আরম্ভ হয়েছে আরো পরে।

বিদ্রোহী অনন্ত সিং Zero Hour, পরিবর্তিত সময় এবং সময় পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে লিখেছেন—“পুলিশ লাইন আক্রমণকারী দলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য যে গাড়ীর ব্যবস্থা করা ছিল তা বশন নত চেষ্টার পরেও শেষ মুহূর্তে পাওয়া গেল না, তখন সমস্তটি বাস্তবে ঝড়াল এইরূপ—গাড়ী কিছুক্ষণের মধ্যেই বোমাঝড় করতে হবে। কিন্তু এই আশা ঘন্টার মধ্যে একটি ট্যাঙ্কি ভাঙা করে এনে চালককে বেঁধে রেখে গাড়িটি নিয়ে আমাদের সকলের ঠিক জিহাওয়া (Zero Hour) আক্রমণের জন্য পুলিশ লাইনে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অসুস্থ দুই ঘণ্টা সময় চাই—অর্থাৎ রাত আটটার সময় যুগপৎ আক্রমণ শুরু না করে আমাদের তা করতে হবে রাত দশটার।” (যুব বিদ্রোহ, ১ম, পৃ ৪৪। প্রধানত গাড়ী না পাওয়ার জন্য Zero Hour পরিবর্তন করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। গোপন ও আকস্মিক আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আরো দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করা যে কত ভয়াবহ ও বিপজ্জনক তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাঁর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় পরিবর্তিত সময় বিভিন্ন গ্রুপকে জানিয়ে দেওয়া, যথাসময়ে প্রচারপত্র বিলি বন্ধ রাখা ইত্যাদি কাজও খুব তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

বিদ্রোহী গণেশ ঘোষ লিখেছেন—“এ দিন (১৮ই এপ্রিল) সন্ধ্যাবেলা রাত্রি ১০-৩০ টার সময় ৬ জনের একটি ক্ষুদ্র দল পরিপূর্ণ ভাবে সামরিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে সেই ছোট পাহাড়টির উপর উঠে গিয়ে পুলিশ অস্ত্রাগারে প্রেরারাত সেপাইদের অকস্মাৎ আক্রমণ করে অস্ত্রাগার দখল করে নেয়।” (বিদ্রোহী সূর্যসেন, পৃ ৭৫) তাঁর মতে ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ১০-৩০টার বিদ্রোহী টেলিকোন ভবন ও টেলিগ্রাম অফিস এবং পাহাড়তলীর কোঁকো অস্ত্রাগার দখল করেন। ঠিক এই নির্দিষ্ট সময়েই ৬০ মাইলদূরের দুইটি স্থানের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে সারা ভারতের সঙ্গে চট্টগ্রামের সংযোগ সূত্র ছিন্ন হয়।

বিদ্রোহী অনন্ত সিং এবং গণেশ ঘোষ চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। স্মৃত্যং বিদ্রোহের সময় সম্পর্কে এঁদের দু'জনের লিখিত বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এঁদের যৌথ নেতৃত্বেই পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রান্ত ও ধ্বংসীকৃত হয়েছে। অনন্ত সিং তাঁর গ্রন্থে গাড়ীর বিভ্রাটের এবং তা সমাধানের প্রদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন যার অনিবার্য পরিলভি Zero Hour ২ ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হয়েছে বলে তিনি

দাবী করেছেন। তাঁর গ্রন্থ হতে আরো জানা যায় পাড়ী বিভাগের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় বিদ্রোহী গণেশ ঘোষও অবগত আছেন। কিন্তু Zero Hour পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত তাঁর গ্রন্থে নেই। হয় ত গ্রন্থের ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য তিনি এই প্রসঙ্গ বাত দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই দুই-জন বিদ্রোহী নায়কের রচনায় চরিত্রের বিশ্রাহের ঘোষিত সময়ও (Zero Hour) তাত্ত্বিক রয়েছে। বিদ্রোহী অনন্ত সিং বলেছেন পুলিশ অস্ত্রাগার অক্রান্ত হয়েছে রাতি ১০ ঘটিকায়। গণেশ ঘোষ বলেছেন— পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রান্ত হয়েছে রাতি ১০-১০ ঘটিকায়। একই গ্রন্থের দু'জন নায়কের প্রদত্ত বিবরণে এই বিশ মিনিটের তাত্ত্বিক অবহেলার বস্তু নয়।

মধ্যনিয়মক কর্তৃক বিদ্রোহের পূর্বাঙ্কে ঘোষিত সময় পরিবর্তনের প্রসঙ্গ বিদ্রোহী লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ এবং চাকবিকাশ দত্ত উল্লেখ না করলেও Zero Hour-এর পরিবর্তন হয়েছে। এঁরা হয়ত বাস্তবে যে সময়ে কুটিল শক্তিকল্প সমূহ আক্রমণ ও দখল হয়েছে সেটাই উল্লেখ করেছেন এবং Zero Hour পরিবর্তনের কারণটাকে অামল দিতে চাননি। কিন্তু পরবর্তী ভাবতের দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ ঠিক কোন সময়ে ঘটে এবং নির্ধারিত সময় সংঘটিত হয়েছিল কিনা—এই ছুটি তথ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী তথ্যের মধ্য থেকে সত্যোদ্ঘাটন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সন্দেহের এই গর্ভমিলের কারণ কি বিঘরণ? কিন্তু ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের সেই Zero Hour—সেই নির্ধারিত সময় এঁদের জীবনের মাহেশ্রেক্ষণ! যার জন্য দু'বৎসরের এত প্রস্তুতি, এত উত্তোষ আয়োজন, এত ভাগ ও দ্বঃস্বরণ, যে সময়ের একটাই বাধাবানে বা ব্যতিক্রমে চরম ব্যর্থতা ও ভয়াবহ দুর্ঘটনা অবশ্যজ্ঞাবী সেই বিশেষ সময়টি কি তাঁরা বিমুগ্ধ হতে পারেন?

AFI আর্মারী আক্রমণের অধিনায়ক লোকনাথ বল। তাঁর প্রসঙ্গ তথ্যের উপরও সাধারণের নির্ভরতা রয়েছে। আক্রমণের দিন ও সময় সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—“আক্রমণের দিন ঠিক হল ইংরেজী ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, রাত দশটা। (প্রাকৃত, পৃ—২১) তাঁর পরায়তন প্রবন্ধে Zero Hour পরিবর্তন করার বিবরণ অমুল্লিখিত। এই প্রবন্ধে আরো লিখেছেন—রাতি ১০—১০ মিঃ রেলওয়ে অস্ত্রাগার, পুলিশ, অস্ত্রাগার, টেলিফোন ভবন আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জাজমেণ্টে উল্লিখিত কয়েকটি সাক্ষ্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সার্জেন্ট মেজর ফেরেল—এর পাচকের সাক্ষ্য হল যখন Sergeant Major Farrell...had returned to his bungalow just after 10 P.M. from the institute where...suddenly a shot was heard outside.” (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case No 1, p 32) সার্জেন্ট ব্রেক বার্ণের বাংলা AFI আর্মারীর সন্নিকটে। তাঁর সাক্ষ্যও এই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। জাজমেণ্টে বলা হয়েছে—Sergeant Blackburn...was returning home that night about 10—15 p.m. from the Pahartali Institute in a taxi... On arrival at the gate of the armoury compound Sergeant Blackburn noticed with surprise that several electric torch lights were being flashed along the wooden roof of the AFI building

Verandah. (এ, p 32) সার্জেন্ট বার্শে ১০—১৫-এ সাইকেল করে চট্টগ্রামে ফিরে আসছিল। তাহার সাক্ষা হতে জাজমেন্টে লিখিত হয়েছে—When near the gate across the Pahartali road he heard five or six reports in quick succession from the direction of the AFI armoury and immediately afterwards two more shots. (এ, p 33)

পুলিশ আর্মারী আক্রমণকারী গ্রুপের ক্ষমতা যে ট্যাকসি ভাড়া করে আনয়ন করা হয় তার ড্রাইভার আবদুল রাসীদের জবানবন্দী সরকারী জাজমেন্টে পাওয়া যায়। বলা হয়েছে—How this car came to be in the police lines we learn from Abdul Rashid (P. W. 16).... On the evening of the 18th April he and his assistant Sultan Ahmed were waiting in the car in the taxi-stand near The Laldighi when about 8-30 or 9 P.M. লালদীঘির ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে গনেশ ঘোষের বাড়ী পৌঁছতে ১ ঘন্টা এমন কি আধ ঘন্টা সময় লাগিবার কথা নয়। অনন্ত সিং লিখেছেন :তারা বিদ্রবী হিমাংশুকে গাড়ী ভাড়া করে আনতে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর লক্ষ্য ৯—৩০ মি পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। তিনি লিখেছেন—“আমরা সাড়ে ৯টার পর আর এক মিনিটও অপেক্ষা করব না....আমরা সাড়ে ৯টার পায়ে ঠেটেটে বগলা হব স্থির করলাম। (যুব বিদ্রোহ, ১ম, পৃ ৬৮) সেই সময়ে ৯—৩০ মি হিমাংশু গাড়ী নিয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি আরো লিখেছেন—“ড্রাইভারকে 'Psychologically বশ করে বেঁধে রেখে বগলা হওয়া পর্যন্ত ছমিনিটের বেশী সময় লাগেনি।” তাঁর মতে খড়ির কাটাঘর কাটাঘর রাত ১০টার পুলিশ আর্মারী আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু খড়ির কাটাঘর কাটাঘর যে পুলিশ আর্মারী আক্রমণ হয় নাই, হয়েছে আরো পরে Judgement-এ তাহার বহু সাক্ষা আহবিত হয়েছে। পুলিশ আর্মারীর হাবিলদার ডবানীলাল বলেছেন—About 10—20 or 10—30 p.m. he was awakened by the report or guns and pistols and stretched out his hand to seize his musket but discovered it was not there. Strangers had come on the Verandah and inside the guard room and the sentry was not visible (এ, পৃ ২৪) জনৈক জা ব্রিক্কাটা রিপোর্ট করেছেন—He was sitting in his shop....when about 10—৩০ p.m. he heard the sound of a motor car passing by towards the police lines. (এ, পৃ ২৪). ব্রজলাল নাথীয় একজন সোকানদার সাক্ষা দিয়েছেন—a motor car approaching the magazine about 10-30 p.m. and heard the sentry call “Halt”. (এ, p ২৪) ‘বিজ্ঞান সাক্ষ-ইনসপেক্টর সঞ্জীব নাগ রাত্রির ঘুম ভেঙে উনতে পেয়েছেন—“about 10-30 p.m. by the reports of guns and revolvers and shouts of Bandematram from the direction of the armoury. (এ পৃ 28) মহাস্বরাম দাস পুলিশ লাইনের দরিকটে অপেক্ষারত বিদ্রবী সৈনিকসমূহ ছিলেন, তাঁর স্বীকারোক্তি—about 10-30 or 10-45 p.m. there was a shout of Bande Matarm. those persons moved and I too followed them

(এ p 81) পুলিশ আর্মারীতে যোগেশ্বর ঘোষ নামক একজন কনষ্টেবলকে বিপ্লবী সৈনিকেরা হাতকড়া লাগিয়ে মাগাজিন কক্ষের মধ্যে বন্দী করে রাখেন। এই কনষ্টেবলটি রাত্রির ডিউটি শেষ করে নিজের ব্যারাকে ফিরছিল। সে তার বিবরণ যা দিয়েছে মজ সাহেব তা উপস্থিত করেছেন - In the busti, Azim met constable Jogendra Ghose who handed him a pair of handcuffs saying, he was returning to barracks about 10-30 p. m. (এ p 30-31) কনষ্টেবল যোগেশ্বর ঘোষ রাত্রে নিশ্চিষ্ট সময়ে নিজের ডিউটি শেষে ব্যারাকে ফিরছিলেন, সুতরাং তার প্রাপ্ত সময় নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক, যদি ১০-৩০ সময় বিপ্লবীরা তাকে বন্দী করে থাকেন তবে এই সময়েই পুলিশ আর্মারী বিপ্লবীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

টেলিফোন ভবন আক্রমণের ক্ষেত্রে ভিন্ন সময় উল্লেখিত হয়েছে। টেলিফোন অপারেটর আহমদুল্লাহ তার রাত্রিকালীন অফিস কর্তব্যে যোগদান করেছেন রাত্রি ৮ ঘটিকায়। ইয়াং রাত্রি ৯-৪৫ মি ছয় সাত জন ব্যক্তি দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন—Suddenlly at about 9-45 p. m. (standard time) some six or seven men stole up from behind him seized by the arms...(এ p 26) টেলিফোন ভবন দখল করে বিপ্লবী অফিস চক্রবর্তী ঘরন ফিরছেন তখন টেলিগ্রাফ ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট জনলার আড়ালে পড়িয়ে আন্দাজে রাইফেল থেকে একটি গুলি করেন। জাজমেন্টে উল্লেখিত হয়েছে—‘Ma Scott, the Deputy Superintendent of Telegraphs was in his quarter that night when about 10 p. m. Mr Horn, the Telegraph Master who also lived in the building, come running to him...and asked for a rifle. (এ, পৃ 26) জাজমেন্ট টাইবুনালের প্রেসিডেন্ট কখন টেলিফোন ভবনের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে তার সাক্ষী হাজির করেছেন টেলিফোন ভবনের অগ্নিতাপ-দহ একটি সেওয়াল ঘড়ি দ্বারা কাটা চিরতরে স্তব্ধ হয়ে আছে ৯-৫০ মিনিটের কক্ষে। The fire blackned dial of the clock which hung on the wall behind the switch board, with its hands arrested at 9-50 p. m. (standard time) offers its own silent testimony as to the time at which the outrage was committed (এ, p 27) টেলিফোন ভবনের ঘড়ি স্তব্ধ হয়েছে ৯-৫০ মি-এ এবং টেলিফোন ভবন থেকে ফিরবার পথে গুলি বিনিময় হয়েছে ১০টায়। সুতরাং টেলিফোন ভবন ধ্বংস কার্য সম্পন্ন করতে ১০ মি থেকে ১৫ মি সময় ব্যয়িত হওয়া স্বাভাবিক। অনন্ত সিং বদিও বলেছেন এই পরিকল্পনা ৫ মিনিটের প্রোগ্রাম। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয় বলেই অনুমান করা যায়। ৯-৫০ মি-এ স্তব্ধ ঘড়ি দ্বারা প্রমাণিত হয় ৯-৫৫ মি-এ টেলিফোন ভবন আক্রান্ত হয়েছে এবং ১০টায় বিপ্লবী দল টেলিফোন ভবন থেকে নিরস্ত হয়েছেন। A E I আর্মারী রাত দশটায় এবং পুলিশ আর্মারী রাত ১০-৩০টায় বিপ্লবীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

প্রশ্ন হল সর্বাধিনায়ক কর্তৃক ঘোষিত Zero Hour কি ছিল? বিপ্লবী অধিকা চক্রবর্তী বলেছেন ২-১৫ মি এবং অনন্ত সিং বলেছেন ৮ ঘটিকা হল বিদ্রোহের পূর্বাঙ্কে ঘোষিত সময়। সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা দুটি কারণে পরিভ্রাঙ্ক। (১) সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা গোপন আক্রমণের পক্ষে অগ্রকূল পরিবেশ নয়। সন্ধ্যাগ, কর্ম চক্সল সহরের উপকণ্ঠ বিপ্লবী সৈনিকদের চলাফেরা গোপন কাজকর্মের সহায়ক না হওয়াই স্বাভাবিক। খুঁটিনাটি প্রতিটি ব্যাপারে সূক্ষ্মদর্শী সর্বাধিনায়ক সমস্ত পরিবেশ পরিস্থিতি নিশ্চয় বিচার বিবেচনা করে Zero Hour স্থির করেছিলেন। (২) অল্প কোন আর্থারী অভিযানকারী ৮ ঘটিকা Zero Hour ছিল এই তথ্য পরিবেশন করেননি। সুতরাং সর্বাধিনায়ক কর্তৃক বিদ্রোহের পূর্বাঙ্কে ঘোষিত Zero Hour ২টা অথবা ২-১৫ মি হওয়া স্বাভাবিক।

জঙ্গলাহের মামলার রায়ে লিখেছেন—In M II we have a list of watches of various makes with notes against each of the number of minutes. They were fast or slow on Wednesday 7-35 p. m., Thursday 6-15 p. m. and Friday 8 a. m. The prosecution suggest that the object of this miraculous composition was to ensure that the raids should be simultaneous (ঐ, p 123) এই M II মার্ক। ম্লিপ হতে প্রমাণিত হয় কত সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি ঘড়ি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সতর্কতা গ্রহণের কারণ অবশ্যই যাতে Zero Hour-এ বিদ্রোহ ঘোষণা করা যায় এবং যুগপৎ প্রতিটি আক্রমণ কেন্দ্রে কাজ শুরু করা যায়। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল Zero Hour পরিবর্তিত হয়েছে এবং আক্রমণের সময় এক ঘন্টা পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিপ্লবী অধিকা চক্রবর্তী লিখেছেন পরিবর্তিত সময়ের পূর্বেই নির্মল সেন ও লোকনাথ বল আর্থারী সীমানায় প্রবেশ করেছেন। কেবল এঁরাই না হন অধিকা চক্রবর্তী নিজেও ২-৪৫ মি-এ টেলিফোন ভবনে প্রবেশ করেছেন। সুতরাং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান না থাকলেও সার্বিক পরিকল্পনা যুগপৎ অমুষ্ঠিত হয়নি। সম্ভবতঃ এই কারণেই বিপ্লবী নায়কগণের প্রদত্ত সময়ে পরস্পর বিরোধী তথ্য পাওয়া গেছে।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

৩

সত্যাত্মক জ্ঞান—

ভাষাতত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস

॥ কীর্ত্তিমান ১১ ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাল্পনিক কেরারী জীবনে বাঙালী নম ছিল সন্তান। মন মোহন বাবুই মা ও বোনকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। তারা এসে বিদ্যাবীরের আড়া পটলডাঙ্গা মেসে উঠলেন, গিরীজা দেবীও মঙ্গলাকে নিয়ে প্রথম বিদ্যাবীর সংসার পাতা হল নূর মহম্মদ লেনে। এরপরে যিহাউর বাড়ী ভাড়া করা হল পাথুরিয়াঘাটা। ঘুরে ঘুরে গিরীজা দেবী ও মঙ্গলা থাকতেন। দল বারোদিন পরে পরে তাদের বাসা বদল হত। বিদ্যাবীর তরুণরা গিরীজা দেবীকে কেউ ডাকতেন মা কেউ ডাকতেন মাসীমা। ক্রমে গিরীজা দেবীও একজন নিষ্ঠাবতী বিদ্যাবীর কন্যা হয়ে দাঁড়ালেন। বিদ্যাবীরের কাছে সাংঘ্য করার জন্য নানাবিধে অনেক সময়ই তাঁকে বাইরে যেতে হত। কন্যাদের রোগ লক্ষ্যে তিনি অসুস্থ ভাবে সেবার করতেন। এমনকি ছুই একজন যক্ষ্মা রোগীর পরিচর্যাভারও তিনি নায়েবে গ্রহণ করেছিলেন।

এইভাবে আড়াই বছর কাল বিদ্যাবীর কলকাতায় কাটালেন কিন্তু পুলিশের অভ্যাসের ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল। ১৯১৭ সালের মধ্যভাগে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে তাদের পক্ষে আর কলকাতায় থাকা চলে না। তাছাড়া কলকাতায় থাকার প্রয়োজনও আর বিশেষ নাই। রাসবিহারীর উদ্যোগে সমস্ত অভ্যাসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সে প্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাও আর নেই। বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেদিক থেকে সাহায্য পাবার পাশাও আর নেই। বিদ্যাবীর দেখলেন আসামপ্রদেশ তখন অনেকটা শান্ত।

পুলিশবিহারী সংগঠন তখন সেখানে কিছু আশ্রয় পড়ে উঠেছে। সেখানে তারা আছেন তাদের উপর পুলিশী উৎপাত নেই। তাই বিদ্যাবীর স্থির করলেন সেখানে কয়েকটা বাড়ী ভাড়া করে কিছুকাল কাটাবেন। আসামে গিয়ে বিদ্যাবীর চারটি বাসা বা আশ্রয়-কেন্দ্র ভাড়া করলেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে এক এক দল ছয় নামে বাস করতে লাগলেন। বিভিন্ন পরামর্শের জন্য এবং অসুস্থ প্রদেশের সংযোগ করার জন্য কারও কারও কলকাতায় থাকার প্রয়োজন হল। তাই তারা অবশ্য কলকাতাই থেকে গেলেন। কিন্তু তারাও প্রয়োজনমত গৌহাটি গিয়ে নেতা মলিনী খোবের পরামর্শ নিয়ে আসতেন। গিরীজা দেবী এবং মঙ্গলাকেও গৌহাটিতে এনে রাখা হল। বিদ্যাবীর আশ্রয়কেন্দ্রগুলিকে গৃহস্থ বাড়ীর রূপ দেওয়ার জন্যই তারা কলকাতার মত আসামেও বিভিন্ন বাসার অদল বদল করে থাকতেন। কৃষ্ণ সাহা এবং সত্যীশ পাকড়াশী গৌহাটি থেকে কলকাতায় এসে তাদের নিয়ে যান।

বিদ্যাবীরের এই ব্যবস্থা কলপ্রস্থ হল। কিছুদিন পর্যন্ত পুলিশের সম্মেহ প্রত্যক্ষভাবে তাদের উপর থেকে কিছুটা সরে গেল। কলকাতায় যারা ছিলেন তারাও সংঘাত বন্দী নয় বলে পুলিশের উৎপাত থেকে কিছুটা বেঁচে গেলেন। হয়তো আরও কিছু দিন এইভাবে নিরাপদেই কাটত। কিন্তু কলকাতায় হঠাৎ একদিন পুলিশ এক বস্তীতে কোকেন বাবসায়ী সন্ধান করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কৃষ্ণ সাহার সন্ধান পায় এবং সেখানে তাকে গ্রেপ্তার করে। (চলবে)

জনগণই আমাদের শক্তির উৎস

বামফ্রন্ট সরকার ৩৬ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক মূল্যগুলির সভা, সমিতি, সংগঠন ও আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার কিরিয়ে দিয়েছেন।

গ্রাম শহরের প্রমজীবী মানুষ ঠাকুরের গণতান্ত্রিক ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন। ক্ষেত্র-মজুররা বিধিসম্মত নিম্নতম মজুরী আদায় করছেন। বর্গাদাররা অপারেশন বর্গায় পাচ্ছেন বর্গার স্বয়ং। নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার। গ্রামীণ জনজীবনে আজ এসেছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের জোয়ার।

শ্রমিকশ্রেণী অর্থ-নৈতিক দাবিলাওয়ার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হচ্ছেন জয়যুক্ত। ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে এসেছে নতুন জোয়ার।

বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার নৈরাজ্যের অবসান ও শ্রুত সংস্কৃতির বিকাশে দৃঢ় সংকল্প।

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির পথ কৃশ্রমাজীর্ণ নয়। বেকার সমস্যা, বিজ্ঞাত সমস্যা ও নানাপ্রকার সমস্যার মুহূর্ত সমাধানে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী অনেকগুলি ব্যবস্থাই নিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার।

গ্রাম-শহরের কারেমী স্বার্থ ও জনগণের শত্রুর গণ-আন্দোলনের আঘাতে আতঙ্কিত। তাই তার মুখপাত্ররা আতর্জন্যে মূক হয়েছেন, ধুয়ো ফুলছেন আইন ও শৃঙ্খলায়।

বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সমস্ত সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন পশ্চিমবাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে চান। এই সরকার একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন জনগণই শক্তির উৎস।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষ সংখ্যা—১৩৮৬

SEVEN SINS

Politics	Without	Principle,
Wealth	Without	Work,
Pleasure	Without	Conscience,
Knowledge	Without	Character,
Commerce	Without	Morality,
Science	Without	Humanity,
Worship	Without	Sacrifice.

—GANDHIJEE

মাতৃপূজা

রামায়ণের যুগে, রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে তৎকালীন সমাজের মানুষেরা ভীষণ ভাবে অত্যাচারিত, নিগৃহীত এবং নিপীড়িত হচ্ছিলেন। প্রবল প্রতাপাধিত এই রাক্ষস রাজের বিরুদ্ধে রুষে দাঁড়াবার মত সাহস ও সংগঠন তৈরী করতে পারছিলেন না নিপীড়িতেরা। রাবণ ছিলেন সকল অস্ত্র শক্তির প্রতীকৃতি। কোন প্রকার অস্ত্রায় কাজ করতে তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ অনুভব করতেন না। অস্ত্রায় কাজ আপন ভাবে আপনিই বাড়িয়া চলে। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীরাম চন্দ্রের ধর্মপত্নী জনক নন্দিনী সীতা দেবীকে ছলনা করে তাঁকে অপহরণ করলেন। তাঁকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টার ফলে ঘটল রাম রাবণ যুদ্ধ। রামায়ণে বর্ণিত আছে শক্তি সত্ত্বের রূপ শ্রীরামচন্দ্র অকালে দেবী দুর্গার পূজা সম্পন্ন করেন। এ দেশের মানুষের বিশ্বাস এই পূজার ফলেই শ্রীরামচন্দ্র নব বলে বলীয়ান হয়ে রাক্ষসকে হত্যা করে সীতা দেবীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন। সেই থেকে মহামুখ্যমাম সহকারে দেবী দুর্গার পূজা সম্পন্ন হয়ে আসছে। একথা অবশ্য জোর করে বলা যায় না যে বর্তমান পূজারীরা দেবী দুর্গার মাধ্যমে কোন বিশেষ শক্তি লাভ করেছেন। বিন্দুজনেরা বলবেন যে পূজার মধ্যে নেই কোন আনুষ্ঠানিকতা, নেই নিজেদের নৈতিক, শারীরিক শক্তিশালত করার যথাযোগ্য প্রগতি ও সাধনা। ফলে এখনকার পূজা হবে দাড়িয়েছে পূজার ব্যভিচার। এই উপলক্ষে পূজার উদ্ভোক্তাদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ণাঙ্গ মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু ৮পূজা তবু হচ্ছে এবং হবে বলেই মনে হয়। এবারকার ৮দুর্গা পূজার মাধ্যমে দেশের শুভশক্তির জাগরণ ও অশুভশক্তির বিলোপ ঘটাবার প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভূত হচ্ছে। আদর্শহীন, দুর্নীতিপরাধ, স্বার্থাধেবী একদল মানুষ দেশের ভাগ্য নিয়ে যেভাবে ছিনিমিনি বেলেছে তাদের অবদমন করতে না পারলে দেশের সমূহ সর্বনাশ অনশ্বর্তব্য। ইতিহাসে দেখা যায় অশুভ শক্তি কিছুকাল তার প্রভাব বিস্তার করে যা কিছু সত্য, যা কিছু হুম্মর এবং যা কিছু শিবম বা মঙ্গলময়, তাকে গ্রাস করে রাখতে পারে। এটাও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে সূর্য্য গ্রহণ কাল স্থায়ী মাত্র। সূর্য্য কক্ষিক গ্রহণের পর আবার দগৌরবে আনুপ্রকাশ করে আলোক বিকীর্ণ করে। তাই দেশের মধ্যে আজো যে সব দেশ প্রেমিক, আদর্শনিষ্ঠ, জন কল্যাণপ্রতী মানুষ বেঁচে আছেন

তাদের শক্তি সঞ্চয় করে দেশ মাতৃকাকে রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হবে। আমাদের ৩৬৭গাঁ পূজার মাধ্যমে আমাদের নব বলে কলীযান হয়ে উঠতে হবে। খ্রীষ্টান্নির নিকট প্রার্থনা জানাতে হবে যে তিনি যেমন এককালে মথৈকেটভ, মহিষাসুর, দুঃস্নেত্র, চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতির দ্বারা অসুর বধ করে পৃথিবীতে দ্বায় ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তেমনিভাবে এই সব অসুরদের উত্তরমূর্তী, মুনাকামিকারী কালোবাজারী, অসং ও নীতিহীন রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের নিধন করেন এবং দেশের মানুষকে সংসাহসী, আশর্ষবানী ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ সেবার কাজে আত্মনিবেদন করবার মানসিকতা প্রদান করেন। অবশ্য সেবার পূজারীসেবায় করণীয় হবে, সব হীনতা, সব দীনতা সব মলিনতা ও প্রাণের ভিতরকার সব আবর্জনাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সং ও মহৎ উদ্দেশ্য লাভের পথে যারা চলতে চান ভগবান শুধু তাদেরই সহায় হন একথা ভুলে গেলে চলবে না। ইতিহাসের শিক্ষাই এই যে আকাশ থেকে বিঘাতার করুণাধারা এমনিতেই করে পড়ে না। সে ক্ষত তপস্যা ও সাধনা করতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন হয় চরিত্র বল, আদর্শনিষ্ঠা ও প্রাকলভ দেশ প্রেম। এই সত্যই প্রমাণিত করে গিয়েছেন বিপ্লবীরা ও আমাদের মহান নেতারা, তাদের জীবন ও কার্যকলাপের মাধ্যমে। চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না, এই হল শামী বিবেকানন্দের বাণী।

এবারকার ৩৬৭গাঁপূজা তাই আমাদের নিকট বৈশিষ্টপূর্ণ। আমাদের প্রার্থনা করতে হবে—

শরণাগত নীনার্ত-পরিগ্রাণ পরায়ণে।

সর্বসম্পত্তি হরে দেবী, নারায়ণি নমোন্ততে ॥

অন্তরের সমস্ত ব্যাকুলতা নিয়ে যাচঞা করতে হবে

প্রণতানাং প্রদীপঃ স্ব দেবী বিশ্বাক্ষিহারিণি।

শ্রৈলোক্যবাসী নামীভো লোকানাং বরদা ভব ॥

কিন্তু একথা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে নিজেরা যদি না পবিত্র হয়ে, শুদ্ধ হয়ে, আন্তরিকতা নিয়ে দেবীর আরাধনা করি, তবে সব আয়োজন ব্যর্থতার পর্যাবসিত হতে বাধ্য।

বন্দে মাতরম।

দেবতার দাবি

বিশেষ আপদে ও সঙ্কটকালে মানুষ সাধারণতঃ দেবতার শরণাপন্ন হয়, সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। স্ববস্ত্রিত, নৈবেদ্য, উপচার ও নানা উপঢৌকনে দেবতার মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণে যত্নবান হয়। দেবতার। কিন্তু বারবার এই নির্দেশই দান করেছেন যে আত্মবিলম্বন বা আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে জিজ্ঞাসার আশীর্বাদ লাভ সম্ভব নয়। ঐশ্বর্যশালী পরাক্রান্ত ব্যক্তির উৎকোচের প্রার্থনা বা পণ্ডিত ব্যক্তির চাটুকারিতাপূর্ণ প্রার্থনার প্রবণতা দিয়ে যে দেবদুঃখ লাভ সুলভ হয়ে ওঠে না, দেবমাহাত্ম্যের অত্যন্ত কীর্তির সন্ধান ও বাহন একাবিক ভারতীর পূরণ তার বহু দৃষ্টান্ত সন্ধান হয়ে আছে। চাই আত্মত্যাগ, আত্মসমর্পণ, আত্মহত্যা।

মহাবল মহাপরাক্রান্ত মহিষাসুর ধ্বংসের স্বর্গরাজ্য জয় করে, বহুকালব্যাপী আর্যমণ্ডল ও বিহীনভোগী দেবতাদের স্বর্গরাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিল। এই মহাসঙ্কট থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করবার জন্য দেবগণ যে আত্মোৎসর্গের সাধনা করেন তা থেকেই দেবী দুর্গার আবির্ভাব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রাদি সকল দেবতা নিজ নিজ ভেদে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দিয়ে ভবেই দেবী দুর্গাকে লাভ করতে পেরেছিলেন। দেবগণের এই আত্মবিলম্বনে তৃপ্ত হয়ে দেবী মহিষাসুরকে বধ করে তাঁদের স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সত্যযুগে রাজা শুরব্রহ্মসাগর। পৃথিবীর অধিকার হারিয়ে অকলা থেকে অরণ্যমধ্যে বিচরণকালে একদা মেধস মুনির সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই মুনির উপদেশ অনুসারে রাজা শুরব্রহ্ম দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে মুকঠিন কৃচ্ছ সাধনা ও তপশ্চর্যা দ্বারা দেবীর পূজা অর্চনা করে তাঁর অনুরোধে হস্তরাজ্য গুনকভাবে সক্ষম হন। মেধস মুনি রাজা শুরব্রহ্মের নিকট যে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন করেন তাকেই বলা হবে যে ঐশ্বর্য।

যেভাবে ব্রহ্মসাগরপতি রাবণ প্রতি বদন্ত হুত্রে দেবী দুর্গার আবাহন করতেন। এই পূজা রাজকীয় ঐশ্বর্য আভ্যুদয়ের পূজা হলেও ব্রহ্মসাগর রাবণের দেবী আরাধনার শুচি-শুদ্ধতা, নিয়ম-নৈকট্যতা দেবাঙ্গুণ্য ও ভক্তিঅন্যর অভাব কিছু ছিল না। স্ববস্ত্রিত্রি মণ্ডে অসম্পূর্ণতা থাকতো না,— আত্মবিকৃত্যর অভাব থাকতো না। ভবু রাজ্যহারা, পত্নী-বিবাহ কাতর বনবাসী ঐশ্বর্যমন্ডল যখন অকালে অসময়ে অকস্মাৎ দেবী দুর্গাকে আবাহন করলেন পরমতন্ত্র রাবণের বিরুদ্ধে দেবীর আনুকূল্য ও আশীর্বাদ লাভের জন্য, দেবী সে আত্মানে সাড়া না দিয়ে পারেননি। কেন পারেননি তার কারণ ছিল। স্ববস্ত্রিত্রি ও আত্মবিকৃত্যর অভাব না থাকলেও ঐশ্বর্যমন্ডলের পূজার আভ্যুদয়ের উপচারের অসম্পূর্ণতা ছিল। বনবাসী

হামচন্দ্র বহু কষ্টে ও বহু শ্রমে দেবী-পূজার উপচার সমস্তই সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন নি একটি নীলোৎপল। পথম আগ্রহে মানস করেছিলেন, একটি কীটমুক্ত নীলপত্র দিয়ে দেবীর অঙ্কনী উদ্ঘাপন করবেন। বহু অবেদ্যশেও এটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবার খ্যাতি যার ছিল সেই পবন নন্দন হস্তমান পর্য্যন্ত কীটমুক্ত একটি নীলোৎপল সেদিন সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এক মহাপরীক্ষার মুহূর্ত্ত! এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। রামচন্দ্র ধন্য উত্তোলন করলেন,—কীটমুক্ত নয় এমন নীলোৎপল তুল্য তাঁর চক্ষুতরকার উৎপাটন করে দেবী পদে অঙ্কনী দিয়ে এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন বলে। দেবী অয়ং বাধা দিলেন,—তুই হবে ত্রৈরামচন্দ্রকে অতীষ্ট লাভের বরদান করলেন। পুরাণে সঙ্গত দেবমাহাত্ম্য এই আত্মোৎসর্গের দাবী ও ধাত্রা অমূল্যগ করেই কীৰ্ত্তিত হয়েছে। বধির যে সে শোনে নাই, অজ্ঞান যে সে বোকে নাই।

কলিযুগে এই বাংলায় ধর্ম বহির্মন একদিন এক মহাসমুদ্রের প্রভাবে, কমলাকান্তের অহিংসে সেবা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেবীদর্শন পেয়েছিলেন মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। সেদিন তিনি সে আবির্ভাবকে ধরে রাখতে পারেন নি। হারিয়ে কেলে সেকি অশ্রুস্রব আকৃতি! "দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না"—সেই অনন্ত কালসমূহ এই প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসমূহ জলরাশি ব্যাপিল, জল কম্রোলে বিশ্বসংসার পুরিল। তখন যুক্তকরে সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠমা হিন্দুয়ী বন্ধুহ্মি। উঠমা! এবার হুসন্তান হইব সংপথে চলিব তোমার মুখ সন্নিবি। উঠ মা এবার আপনা ভুলিব, দ্রাক্ষসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম আলস্য ইন্দ্রিয়ান্ধিত ত্যাগ করিব, উঠ মা একা যোদন করিতেছি, কাদিতে কাদিতে চক্ষু সেল মা। উঠ, উঠ—উঠ—"

তারপর একদিন কালার যুগ খেমে গেল,—এলো 'বনে মাতরম্'—এর দিন। "লক্ষ পরাগে শব্দ। না জানে, না রাখে কাহারও খণ।" কলিতে আত্মোৎসর্গের সে এক অবিস্মরণীয় যুগ, মাতৃপূজার মহোৎসব বক্তৃতা আত্মনিবেদিত। তার প্রতিক্রিয়া সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতের আকাশে বাতাসে,—শৌছেছিল নদী প্রান্তর ও অরণ্য পর্বত সমূহ বিস্তীর্ণ ভারত হৃদির রক্তে, রক্তে। দেবতার নির্দেশের মতই প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সে আহ্বান বাণী একদিন এক ছরস্র আত্মোৎসর্গের সাজা লাগিয়েছিল অন্ধ ওদশনের অদিবাসী অধ্যুষিত অরণ্য পর্বত সমাকর্ষ এক অর্ধশরিত্ত লোকালয়ের একটি হুগ্রাচীন দেবমন্দিরের এক অজ্ঞাত অপরিচিত পূজারী মানস লোকেও।

পূজারী দীন দরিদ্রের সন্তান। পরিবারের আত্মীয় একজন সম্মল সরকারী কর্মচারীর আশ্রয়ে থেকে বিজ্ঞানরে পড়াশুনা করছিলেন সেখানে যে সব আলোচনা কানে আসতো, যে সব ঘটনা দৃষ্টি পথে আসতো তা থেকে কৈশোর বরসেই এ ধারণা তার মনে বহুমূল হয়েছিল যে মানুষের চরম দারিদ্র্য, চরম অসহায়তা ছড়িয়ে আছে তার চারদিকে, অথচ সম্পূর্ণ ও শিক্ষিত বান্ধা তারা উদাসীন, আত্ম-শুবাধেয়ী; আর দেশের রাজা বা সরকার উৎপীড়নকীল। একদিন মনে হল কেনই বা এই বিজ্ঞানচর্চা পাঠাভ্যাস যদিও এই অসহায় মানুষদের পাশে দিয়ে দাঁড়াতে পারি? পড়াশুনা করে আমিওতো

এই সব হৃদয়হীন আত্মহুঁত্বাধেয়ীদেরই দলে গিয়ে ভর্তি হব। কাজ নেই তাতে—সেখি কোথায় আছে মানুষের বেদনাতন্ত্র। ক্রন্দন, কোন পথে মুহুর্তে পারি তাদের অস্ত্রের খাড়া। বাড়ী ছেড়ে বেগিয়ে পড়লেন দুর্ভাগ্যাধেয়ী এই তরুণ।

গঞ্জাম বিশাখাপত্তনম ও গোদাবরী অঞ্চলের কয়েকটি জেলা নিয়ে সেকালে গঠিত হয়েছিল একটি আঞ্চলিক প্রশাসন সরকারী পরিচাৰায় তাকে বলা হোত এজেন্সী ডিভিশন। বিচার আচার গ্রন্থ অস্ত্রার মানুষের বন মান প্রাণ যা কিছু সমস্তই নির্বিচার ভাবে নির্ভরশীল ছিল একজন যেতার কবিশনার এবং তার অধীনস্থ কর্মচারী ও পাইক, পেরাদা বরকন্দাজদের উপর। এখানকারই একটি পল্লী মন্দিরে এসে পূজারীভাবে আশ্রয় নিলেন সেই তরুণ,—নাম তার সীতারাম রাজু।

সকল অসহায়ের আশা ভরসা পূরণের একমাত্র অধিকারী এই দেব বিগ্রহ, মরলোকে তাঁর প্রতিনিধি এই তরুণ পূজারী বড়ই হৃদয়বান বড়ই সহিষ্ণু ও সহানুভূতিশীল, সকলেই যেন বড় আপনজন। অতি অল্পদিনের মধ্যে সবাই তাকে ভালবেসে ফেললো, বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে ইনি সকল প্রসঙ্গের জবাব জানেন এবং সকল সমস্যার সমাধান জানেন। এ আর এক ধরনের কঠিন জীবন, অসহায় অস্তিত্ব। রাতদিন মানুষকে জেনে শুনে মিথ্যা আশ্বাস দিতে হয় দেবতার নামে। যে সমস্যার সমাধান নেই, দেবতার নামে অসার ব্যাক্যবিগ্রাসে তারই সহজ সমাধান রচনা করতে হয়। দুঃস্বপ্নাঙ্গাঃ যোগীর শরীরে হুঁচার কৌটা জল ছিটিয়ে দিয়ে, ফুল বেল পাতার নির্মালা তার মাথায় ছুঁইয়ে বসতে হয়,—“সেবে যাবে, দেখিস সামনের বছর এমন দিনে তোব এ রোগ আর থাকবে না।”—চিন্তা হয়, লোকটা যদি না এর মধ্যে মরে যায় তবে আগামী বৎসর তাকে কি বলা যাবে। দেবতাও অবিধানের পাত্র হয়ে উঠবেন যে।

চার পাঁচ দিন অনাহারের পর একটি লোক ছোট একটি মোরগ বা ছাগশিশু নিয়ে বেরিয়েছিল বিক্রয় করে হুঁচার আনা পয়সা যা পাবে তাই দিয়ে পরিবারস্থ লোকের একটা দিনের অন্তস্তঃ খাবার সংগ্রহ হবে বলে। পথে সরকারী এক বরকন্দাজ তাকে চোর অপবাদ দিয়ে সে ছাগশিশুটিকে কেড়ে নিয়েছে। দেবতার আদালতে তার কি বিচার নেই? পূজারির বলতেই হয় ও মরবে, মরবে, দেখিস গর মরণ ঘনিষ্ঠেছে।” কিন্তু সে অত্যাচারী তো সত্যই মরে না।

পাঁচল লোক কাজে বেরবে জীবিকার অধেংগে। বধর এলো, বাগার বাটতে হবে। কে এক সরকারী কর্মচারী আসবেন, বড় সাহেব। বশ বাসো মাইল ছুবে রেল ষ্টেশন। সবাইকে খেতে হবে সাহেবের মোটামুট হয়ে আনতে। রাতে গর। ফিরে এসে নালিশ জানালে পূজারির বলতেই হয়, এ অর্থের রাজব টিকবেনাবে, দেখিস আমি বলে দিলাম। এমন অধম দেবতার কবনও সস্তা করেন না ইত্যাদি দিনের পর দিন চলছিল এই দুর্বল পীড়ন আর এই তোক।

দয়বী হৃদয় এই তরুণ পূজারীর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো,—এ সে কি করছে? যে যেন দেবতার আদেশ শুনতে পেল,—“দেবতা কি সকল মানুষের মূখ শাস্তি অধিকার মাথায় করে কেবী করতে

বেকবের পাগল! সেবতা মানুষের 'যোগক্ষেম' বা কর্মসাধনার ফলবহন করেন। গুনের যোগক্ষেম কোথায়? কর্মসাধনা কোথায়? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, হুমুসহীনতার বিরুদ্ধে ওরা রুখে দাঁড়াচ্ছে কোথায়? সতাই তো! পূজারির টনক নড়ল; মন্দির ছেড়ে অরণ্যের পথ ধরলো মানুষের মনে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মত্ত ছড়িয়ে দিতে। ত্রন্দন নয়, প্রতিরোধ; কুল নয়—অস্ত্র। আর নাগিশ নয়, এবার অভিযান। পূজারি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সঙ্গী সমর্থক সংগ্রহ করতে লাগলেন। মনে হল সবাই যেন প্রস্তুত, যেন এই আহ্বানের জগুই অপেক্ষা করছিল। মানুষের মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে পড়ল। লোকে শোনে আর বলে,—‘সীতারাম ঠাকুর, মন্দিরের পূজারি ঘুরে ঘুরে সকলের মা বাপ, সেকি কখনও মূল পরামর্শ দিতে পারে। রাজু সারা দাম্পিত্য পায়ে চাবে ফেললেন। সরকারী লোক তাঁকে ধোঁকে। ধরা পড়ে বললেন, বেশ যাচ্ছি আমি এদেশ ছেড়ে।’ সঙ্গীদের বলে গেলেন তৈরী থাকতে। নিজে চললেন নেপালের পথে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায়।

শক্তি পরীক্ষার দিন বনিয়ে এলো। ছোট বাটো, আঘাত প্রতিঘাত থেকে সংঘর্ষ চরমে এসে পৌঁছিল ১৯২৪ সালে। আসাম রাইফেলের পুরো একটি বাহিনী রাজুর বিদ্রোহী দলকে ঘিরে ফেললো। ‘কিলেক্টরী’ অফিসের এক অরণ্য উপত্যকার। পরাক্রম অবস্রাণবি ভ্রমের বিদ্রোহীরা পিছু হটলো না,

—“কার আগে প্রাণ কে করিবে দান

তারই লাগি কাড়াকাড়ি।”

সারা রাত্রি ব্যাপি সংঘর্ষের পর বিদ্রোহীরা সরকারী বাহ ডেন করে রেখিয়ে এলো। উভয় পক্ষের হতাহত পিছনে পড়ে থাকলো প্রচুর। সরকারী কতৃপক্ষ অভিসন্ধিমূলক ভাবে রটিয়ে দিল যে বিদ্রোহী দলপতি সীতারাম রাজু সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। কিন্তু খোঁজার সৈন্য মোতায়েন রাখলো রাজুকে খুঁজে বের করতে।

সেদিন ৬ই মে, ১৯২৪ সাল। সীতারাম রাজু সেই নিভৃত অরণ্যে এসে অতি প্রত্যুবে নদীতে স্নান করে প্রভাতী পূজা অর্চনা সেয়ে তাঁরে উঠেছেই সরকারী খোঁজার সৈন্যরা তাকে ধরে ফেললো। রেপ্তার নয়, বিচার আচারের অমুষ্ঠান নাই,—নদী তাঁরে একটি বৃক্ষের সঙ্গে বেঁধে তাকে গুলি করে হত্যা করা হল। সীতারাম কানপেতে শুবিছিলেন দেবী পূজার শম্বকটা ধ্বনির মত স্ববাস্তবের আওরাজ,—তাঁর একান্ত সুস্থ ও অহুগামী ছই বীর বিদ্রোহী, গাম মানুষ ভোরে, আর গাম গৌতম ভোরে এদিয়ে চলেছে তার বিদ্রোহী বাহিনী নিয়ে,—শেষ জন্ম পরাক্রম নির্ধারিত হয় নি তখনও। প্রাতঃসূর্য্যের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে তখন নব জীবনের সিন্ধুপন্থগামী সীতারাম রাজুর প্রশান্ত পরিতৃপ্ত মুখের উপরে সেবতার আশীর্বাদের মত—শেষ জন্মের আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে দেশের মানুষের কাছে সীতারাম রাজু যেবত লাভ করে অমর হয়ে আছেন আজও। তাঁর যোগক্ষেম তাঁকে অমরত্ব দান করেছে।

‘বিপ্লব’—কি রমণীয় রসধন রোমাঞ্চকর কথা। এটী—‘বিপ্লব’! উচ্চারণ মাত্রই চক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে এক মহাপরিবর্তনের চিত্র, এবং সেই মহাপরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে বাইরে থেকে; অর্থাৎ বাইরের সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগ্রাম প্রকৃতি থেকে। এক্ষেপে ‘বিপ্লবের’ সঙ্গে অস্বাভাবিক ভাবে বিজড়িত হয়ে রয়েছে হিংসা ঘেব, হানাহানি কাটাকাটি, রক্তপাত প্রাণনাশ, প্রতিশোধ বড়ঘর, নিন্দাবাদ পালিগালাজ প্রকৃতি অতীব কলঙ্কজনক দৃশ্যময়, বীভৎস ঘটনা। সেই দিক থেকে সেবতে গেলে, একথা নিশ্চয় দৃশ্যের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, ‘বিপ্লব’ জাতির জীবনে বড়ই স্তম্ভজনক হোক না কেন, এর উদ্ভব অস্বাভাবিক দিক থেকে বহু সমস্যারও সৃষ্টি করেছে, যার সমাধান করতে পুনরায় বহু প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে পড়ে।

‘বিপ্লব’

সেইসত্ত্বে ভারতবর্ষের দাবিত বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই পূণ্য ভূমি, এই বঙ্গদেশ, এই অনন্ত পীঠস্থান আগন্তুকাল অনন্তমুখী, অর্থাৎ আত্মীয় বিশ্বাসী। সাধারণতঃ বলা হয় যে, জীব দেহ ও মনের সমষ্টি। দেহ জড়বস্তু, মন অজড়, এবং অজড় মন সাধারণতঃই পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষ এনে ফেলেছে একত্রে আরেকটী অভিনব, দুতন, তৃতীয় ভাব, অর্থাৎ আত্ম। একমাত্র আত্মাই প্রকৃত পক্ষে অজড়, এমন কি, মনও জড়পদার্থ। দেহ ও মনের মধ্যে প্রভেদ সেসত্ত্বে স্বরূপগত নয়, পরিমাপগতই কেবল। অর্থাৎ দেহ তুল জড় পদার্থ, মন সূক্ষ্ম জড় পদার্থ বলা হয়েছে, তারও ত দ্বারসত্ত্বে কারণ আছে যা পান্ডিত্য ধর্মেও স্বীকৃত। অর্থাৎ দেহ এবং মন বনিটতম বস্তুনে আবদ্ধ, এবং দেহের মাধ্যমেই মন কার্য করতে সমর্থ। মনের দুটি প্রধান কার্য, বাইরের জ্ঞান আহরণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে; অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, এবং তারপরে হস্তপদ প্রভৃতি পক্ষ কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই জ্ঞানানুসারে স্বব্যবধি কর্মে দেহকে প্রবৃত্ত করা। এই উভয় দিক থেকেই মন পরিপূর্ণ ভাবেই দেহাশ্রয়ী, এবং দেহের যত্ন বিহীন হলে, মনও বিকল হয়ে যায় সেই পরিমাণে। যেমন—চক্ষুর রোগ হলে, আমরা আলো রং প্রকৃতি দেখতে পাইনা, মস্তিষ্কের কোনো কেন্দ্রে বিনষ্ট হয়ে গেলে, সেই দিক থেকে মনের জ্ঞানেরও অভাব ঘটে। এক্ষেপে দেহের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, দেহের সম্পূর্ণ অধীন মনও যে দেহের দ্বারা জড় স্বভাব এই সিদ্ধান্ত নিত্যমতই অব্যবহিক নয়, স্থানান্তিত।

ড. রমা চৌধুরী

সে ক্ষণ, ভারতীয় মন্ত জীবকে যদি সম্পূর্ণ ৰূপেই জড়বস্তু বলে এহণ করতে বাধা থাকে, তাহলে তার মধ্যে আরেকটি জিনিষকে স্বীকার করে নিতে হয় সেটি হল তার অমর অজড় আত্মা। একমাত্র আত্মাই প্রকৃত পক্ষে অজড় এবং সেজন্য একমাত্র আত্মাই প্রকৃতপক্ষে এপ্তলে বিবেচ্য, সেই মন নয়।

অতএব, জীবের দিক যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই আসবে এই আত্মা থেকে, কেবল এই আত্মা থেকে এমন কি যথঃ পরমেশ্বর থেকেও নয়, কেবল আত্মা থেকে। এই জড়ই ভারতদর্শনদায় ত্রিময় ভাগবতীভাষ্যে এই তথ্যটি কি সুন্দর ভাবেই না সুগোচরবে বলা হয়েছে—

“উচ্ছ্বাসস্থানং নাস্তানমবসাদস্থং ।

আত্মৈব আস্থানো বহুবাষ্টম্ভব

ত্ৰিপুৰাস্থানঃ ।

বহুৱাত্মস্থানস্তত্র যেনাষ্টম্ভবাস্থনা দ্বিতঃ ।

অনাস্থানস্ত শত্ৰুণে বৰ্ত্ততাষ্টম্ভব শত্ৰুৰং ।

(গীতা ৬।৫-৬)

“নিজেই নিজের উচ্চাচর কর

করেনা আত্মার অবসর ।

আত্মাই আত্মার বহুশ্রেষ্ঠ

আত্মাই আত্মার শত্রু ভীষণ ।

আত্মাভারা বিজিত আত্মা

আত্মার বহু পরম ।

আত্মাভারা অবিজিত আত্মা

আত্মার শত্রু চরম ।

(গীতা ৬।৫-৬)

সেজন্য অস্তবিগ্ৰহ আসবে এই আত্মার মধ্য থেকেই। সেই বিগ্ৰহের লক্ষ্য হবে বহুজীবের জীবন মুক্ত জীবের জীবনে পরিবর্তিত পরিবর্তিত পরিপূরিত করা—তিনটি দিক থেকে, জ্ঞানের দিক থেকে, অহঙ্কৃত্যের দিক থেকে, প্রেমের দিক থেকে—যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Thinking, Feeling, Willing।

প্রথমতঃ জ্ঞানের দিক থেকে, বহু সাংসারিক জীব বর্তমানে হয়ে রয়েছে অজ্ঞান ভিম্বাচ্ছন্ন; এবং এরূপ অজ্ঞানবশতঃ নিজের অজর-অমর-অভয়-অশোক আত্মাকে জড় দেখমানের সঙ্গে একীভূত করে অশেষ পার্থিব দ্বঃখ ক্রেশ ভোগী হয়ে পড়ছেন। আত্মার অল্পশালোকে এ অজ্ঞান দূরীভূত হলে, জীব তৎক্ষণাৎ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবেন যে তিনি জীব নয়, শিব; জীবাশ্ম নয়, পরমাশ্মা; মানব নয়; ব্রহ্ম। তখন তিনি ‘সর্বং বখিগং ব্রহ্ম’ (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩।১৪।১) ‘ব্রহ্মোহং সর্বম্’ (বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ২।৫।১)—‘অয়মাশ্মা ব্রহ্ম’ (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৪।৬) ‘অহং ব্রহ্মাস্মি (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।১০)—বিষ

ত্রকাওই ত্রক' 'ত্রকই বিশ্বত্রকাও' 'এই আরাই ত্রক' 'আমিই ত্রক'—প্রমুখ বর্মণীয় রসবন যোমানন্দর মন্ত্রাহুসায়ের নিকটকে অপর সমগ্র জীবকে সমগ্র বিশ্বত্রকাওকে স্বয়ং ত্রকরূপে উপলব্ধি করে পরম জ্ঞান লাভে ধস্তাধিত হন।

দ্বিতীয়ত: অমুচুতির দিক থেকে বহু সাংসারিক জীব আদর্শহীন - ত্রক বা কোনো উচ্চতর ত্রদে তাঁর বিশ্বাস নেই, ত্রকা নেই, ভক্তি নেই। এতলে আত্মার জ্ঞানের অকণালোকে বহুজীব যখন ত্রককে জানেন, সত্যকে জানেন, তখন স্বভাবত:ই সেই ত্রক সেই সত্যের প্রতি তাঁর মনে উদয় হয় গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির। অর্থাৎ তখন তিনি সকল জীবকে সমগ্র বিশ্বকে ত্রককে প্রাণ মন দিয়ে ভালবাসেন।

তৃতীয়ত: প্রবৃত্তির দিক থেকে বহু সাংসারিক জীব নিজের অজ্ঞান প্রবৃত্তি বাসনা কামনার দাস হবে; কেবল সকাম স্বার্থপর কর্মে রত হন এবং তারই ফলে জন্ম জন্মান্তর ভাগী হয়ে অশেষ দু:খ দুর্গতি গ্রস্ত হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রেও আত্মার অকণালোকে সকলকে ত্রকরূপে ভেদে ত্রকরূপেই তাঁদের সেবা করা, পূজা করা এই শু হয় তাঁর পরিবর্তিত জীবনের প্রের্ত সাধনা।

একুপ বিশ্বত্রকাওকে ত্রকরূপে জান, ত্রকরূপে ভালবাসা ত্রকরূপে সেবাকরা—এই হয় বহু সাংসারিক যুগের মহাজীবন ত্রত।

এই হল অন্তর্বিশ্বের লক্ষণ—আত্মজয়। আমাদের নিজস্বের মধ্যেই যে ভীষণ বড়বিপ্লু রয়েছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাংসর্ঘ—তাঁদেরই ত সর্ব প্রথম পরাজিত করতে হবে—নতুবা বাইরের শত্রুদের পরাজিত করে আর আমাদের লাভ কি, লাভ কি বাইরের বিপ্লব বিপ্লোহ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যদি না এইভাবে আন্তর বিপ্লব বিপ্লোহ সংগ্রামে আমরা। জয়ী হতে পারি দেহের উপর আত্মার, অজ্ঞানের উপর জ্ঞানের, অভক্তির উপর ভক্তির, অন্যচারের উপর সগাচারের বিজয় পতাকা উত্তীর্ণমান করতে পারি।

এই ভাবে যদি আমরা অগ্রসর না। হই তাহলে প্রকৃত জয়, প্রকৃত প্রগতি প্রকৃত শান্তি লাভ আমাদের কি করে হবে, অন্তর থেকে নিজস্বের যোগ্য করে নিতে না। পারলে বাইরের দিক থেকে সাফল্য লাভ আমাদের কি করে হবে, আত্মজয় না হলে বিশ্বজয় আমাদের কি করে হবে? বর্তমান জগতের দিকে তাকিয়ে দেখলে এ কথাটা সত্যতা তা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। বাইরের দিক থেকে আগ্ন আমরা কত শক্তিশালী বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশাল শৃঙ্খলামরা অনায়াসে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি, চলেযাচ্ছি দূরের গ্রহে উপগ্রহে বা কিছুদিন পূর্বেও আমাদের স্বাধীন ছিল। আমাদেরই আণবিক বোমার নানবিক বিক্রমে আজ সমগ্র জগৎ প্রকম্পিত। কিন্তু তাকে জগতের সুখ শান্তিপূর্ণতা প্রোগতি কতটুকু সাধিত হয়েছে, বৃদ্ধিবিগ্রহ কতটুকু কমেছে 'One world' বা একটি অবশু পৃথিবী সকল দেশ সকল জাতি, সকল জনকে নিয়ে একটি অবশু অচ্ছেদ্য পৃথিবী কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? যে ভিত্তিরে সেই ভিত্তিরেই ত আজও আমরা থেকে গিয়েছি, অন্তরের দিক থেকে ত আজও আমরা পূর্বের দ্বার, এমন কি পূর্ণাপেক্ষা বিস্তৃত, ভিত্ত শৃঙ্খ, শীর্ণ, শীর্ণ, ক্লিষ্ট, শিষ্ট হয়ে আছি: তাহলে বাইরের তথাকথিত প্রগতির অর্থ কি?

বিদ্রোহীশ্রেষ্ঠগণ এই কথাইত বারংবার আমাদের বলেছেন—“Be and make”—‘হও এবং কর’ বিদ্রোহী শিরোমণি যুগাচার্য বামী বিবেকানন্দের এই মহাময় সকল বিদ্রোহের সকল পরিবর্তনের সকল প্রগতির মূল ভিত্তি। মানুষ না থাকিলে সমাজ কাকে নিয়ে উন্নত, আত্মশক্তি না থাকিলে বিপ্লবশক্তি আসবে কোথা থেকে, স্বভাব পরিবর্তিত না হলে জগৎ পরিবর্তিত হবে কিরূপে ?

বর্তমান যুগ বিদ্রোহের যুগ, জন জাগরণের যুগ, গণতন্ত্রের যুগ—যে কল্যাণমণ্ডিত যুগে যে নারী, শূত্র, গণ যে দীন দরিদ্র অশিক্ষিত সাধারণ জনেরা এতদিন মুষ্টিমেয় ভাষাকষিত উচ্চ জীবনী কণ্ঠক দলিত মথিত অবহেলিত অত্যাচারিত হয়েছিলেন, তাঁরা মস্তক উন্নত করে বস্ক ফীত করে দণ্ডায়মান হয়েছেন নিজস্বের শাস্ত, স্ত্রাঘ্য অধিকার লাভের জন্য। অত্যন্ত আশার কথা অত্যন্ত আনন্দের কথা এটি হুনিচ্চিত। বহুযুগ ধরে সজিত সমাজের কলঙ্ক মোচনের, হুতন জাতি ধর্ম বর্ণহীন সার্বজনীন সমাজ গঠনের মহাযাত্রার পূর্ণ মধ্যাঙ্গা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আজ আছে পরিবর্তনের পরিপূর্ণতার প্রগতির এবং এই সকলের উপায় স্বরূপ বিদ্রোহের। কিন্তু সেই বিদ্রোহ বহুশক্তি ধ্বংস হবে না, হবে শক্তিপূর্ণ উপায়ে অসত্য থেকে সত্যে অন্ধকার থেকে আলোকে মৃত্যু থেকে উত্তরণ। কিন্তু সবার মূলে সেই একই কথা ‘Be and make’ আগে নিজে পূর্ণ হও পরে অন্যকে পূর্ণ কর, আগে নিজে মানুষ হও পরে অন্যদের মানুষ কর। আগে নিজে বিদ্রোহী হও পরে অন্যদের বিদ্রোহী কর। নিজে যদি শূত্র হয়ে থাক তাহলে অন্যদের পূর্ণ করবে কি দিয়ে ? এই হল ভারতবর্ষের মতে প্রকৃত প্রকৃষ্ট বিদ্রোহের মর্মার্থ বাণী। এই বাণী যেন আজ বিদ্রোহ যুগের মহাবাণী হতে পারে এই প্রার্থনা।

With best compliments from :

THE PEERLESS GENERAL FINANCE & INVESTMENT CO. LIMITED.

ESTD, 1932

Registered Office : “PEERLESS BHAVAN”

3, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-700 069

More than 100% of the Company's Liability to its certificate-holders
are kept Invested in Government Securities & in Fixed Deposits
with Nationalised Banks,

লাল পান্ডা

মহাশ্বেতা দেবী

১৮৫৭-৫৮ সালে ভারতে যে অভ্যুত্থান ঘটে তা সিপাহীদের বিদ্রোহ দিয়ে শুরু হলেও ক্রমে তা কুমিহীন চাষী, সামন্ত ভূপতি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন জায়গায় এই অভ্যুত্থান স্বীকৃত ব্যাপক হয়। ডাঃ শশীকৃষ্ণ চৌধুরী “Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-59” বইটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। বহু জায়গায় ইংরেজের নীল ও রেশম কুঠি এবং অস্ত্রাস্ত্র ব্যবসার কেন্দ্র আক্রান্ত হয় ও সাধারণ মানুষ সাধামত অস্ত্র সংগ্রহ করে দৃঢ়ে অংশ গ্রহণ করেন।

তবে মধ্য ভারতে এই বিদ্রোহ সমাজের প্রায় সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭-৫৮ সালের বহু ঘটনাই এখন দলীল হয়ে দণ্ডের সংরক্ষিত আছে। গোয়েলাল ভেওদ্বারীর হিন্দীতে লেখা ‘বুন্দেল খণ্ড কা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ নামক মূল্যবান বইয়ে মধ্য ভারত বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সেই সময়কার ঘটনাবলী নিয়ে লেখা শ্রীমদ্রজ দিশের ‘বুন্দেলা কা শুর কহানী’ (হিন্দী): কবি ভূপংলালের ‘বীরাঙ্গনা রায়সো’ (বুন্দেল খণ্ডী); এবং কল্যাণ সিং বৃদ্ধার ‘লক্ষ্মীবাঈ কী রায়সো’ (হিন্দী) এইসব স্থানীয় অভ্যুত্থান বিষয়ে অনেক আলোক পাত্ত করে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে সে সময় ভারতে সৈন্য সর্বাধিক ছিলেন কোলিন ক্যাম্পবেল। বক্তৃত, মূলত কাঁসার রাণীর নেতৃত্বে বুন্দেল খণ্ড এবং তাঁর

ভারতে এমন ভাবে সামরিক বিদ্রোহ ঘটছিল যে ক্যানিং এই মধ্য ভারতের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

ক্যানিং ও ক্যাম্পবেল পরিকল্পিত মালোয়া ও মধ্যভারত অভিযান বাহিনী গঠন করতে গিয়ে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সমগ্র সেনা-বাহিনীকেও অপর্যাপ্ত মনে হয়। তখন বিলম্ব থেকে সামরিক কর্মচারী ও কোজ আনবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মেজর জেনারেল হিউরোজকে বাইরে থেকেই আনা হয়েছিল। হিউরোজ সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ফিল্ড কোর্সের দুই ত্রিগ্রহে সৈন্য নিয়ে মধ্য ভারতে রওনা হন। তিনি সাগরের পথে কাঁসার রওনা হন। পথে রায়াগড়ের জর্জের দুর্গ ছিল। বীণা নদীর তীরে, পারাডেব ওপরে এই পার্শ্বের জর্জের পথ জঙ্গলে ঢাকা। জর্জের উত্তরে জঙ্গল, পায়ের কাছে কুড়ি ভিট চণ্ডা পরিখা। রায়াগড়ের কেন্দ্রায় ১৮৫৮ সালের জানুয়ারীতে সেদিন যাত্রা অপেক্ষা করছিল তাদের মধ্যে কমজনই সিপাহী। স্থানীয় কুমিজীবী মানুষ এই যুদ্ধকে সাহায্য কববার লগ্নে চার, পাঁচ, ছয় মাইল দূরে দূরে নোরিওনলি কুচি প্রকৃতি গ্রামে প্রতিরোধ ঘাঁটি গড়ে তোলে। যে পদ্ধতিতে এইসব অকলে যুদ্ধ হয়, তাকে আজকাল হয়ত গেরিলা পদ্ধতি বলা হবে। ইংরেজদের আসবার সম্ভাব্য পথগুলিতে প্রতিটি লশা ক্ষেত্র থেকে লশা কেটে নিয়ে, জলাশয়গুলি বিচ্যুত করে, পথে পথে গাড় ও পার্শ্ব ভূগীকৃত করে রাখা হত।

এইভাবে প্রস্তুত থাকবার সময়ে গ্রামবাসীর। পারাডেবের গায়ে গায়ে আগুন আলিয়ে চারদিকে আগুনের সম্মুখে ছড়িয়ে দিত। কখনো বা তুলোটে কাগজে লাল আলতা দিয়ে একটি উল্লত হাত এঁকে সেটি দূতের হাতে পাঠানো হত। তা ছাড়া বিদ্রোহীরা সকলেই অস্ত্রাস্ত্র পতাকার সঙ্গে লাল পতাকা ব্যবহার

করত। সামরিক রিপোর্ট এই তথ্যটি আমাদের কোঁকুহল উত্তেজিত করে। রায়গড়ে হিউরোজের নিশ্চিত সৈন্যবাহিনী ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। বিশেষতঃ অগ্নিযন্ত্র। এদিকে ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা ছিল না। অস্ত্রশস্ত্র বলতে তরোয়াল, বর্শা, তীর ধনুক ও কয়েকটি গাদাবন্দুক ছিল। তবু তিন দিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ চলে। এই অঞ্চলের নেতা ছিলেন মহম্মদ ফজিল খাঁ। তিনি কৃপালের বেগমের আত্মীয়। কৃপালের বেগম হিউরোজকে অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ফজিল খাঁ ছিলেন সুপুরুষ প্রৌঢ়। তাঁর কপালে একটি লাল জরুল চিহ্ন ছিল।

ফজিল খাঁ তিন দিন ধরে কোলা বন্ধ করলেন। তারপর তাঁর নির্দেশে বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে বারোসিয়ার দূত চলে যায়। বারোসিয়া গ্রামটি জঙ্গলে ঘেরা। সেখানে ভারতীয়রা জমায়েত হতে থাকে।

তৃতীয়দিনেই বোকা গেল কোলা আর রাখা যাবে না। কিবেরগাম স্থানীয় ভূখামী, বুনেলা চেহারা ছিপছিপে, ভালো শিকারী বলে তার নাম ছিল। তিনি ফজিল খাঁকে বললেন, 'আপনি নদী পেরিয়ে গুহাতে চলে যান।'

'কেন? আমি বাথ না ভালুক?'

কিবেরগাম বললেন, 'গুহাতে কিছু সৈন্য আছে। বন্দুকও আছে বারুদও আছে।

'কোলায় কি হবে?'

'সেবা থাক!'

কিবেরগাম, নবাব কামদার খাঁ ও ওয়ালিদাদ খাঁ কোলা, তাঁদের ভাষায় রাখতে লাগলেন। এদিকে মহম্মদ ফজিল খাঁ ওরা থেকে দূর করতে লাগলেন। রায়গড়ের কোলায় প্রচুর খাদ্যশস্ত্র, কামান তৈরি

করবার ছাঁচ, খোড়া, গরু ও উট সব কিছুই মজুত। এমন কোলা কি বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেওয়া যায়?

ইংরেজ সৈন্য যখন কোলায় যুদ্ধ করতে আসে, ভারতীয়েরা পেছন থেকে তাদের আক্রমণ করে ও জঙ্গলে চলে যায়। জঙ্গলের ভেতরে ছোট ছোট খাঁটিতে গ্রামবাসীরা মেয়ে ও শিশুদের এনে রেখেছে। সেখানে গিয়ে ভারতীয়েরা লুণ্ঠন।

আবার অতর্কিতে আক্রমণ করে সরে পড়ে তারা। এইভাবে প্রায় ন দিন যুদ্ধ করে তবে ইংরেজরা রায়গড়ে কোলা দখল করল।

যখন দখল করল, তখন দেখা গেল সেখানে বাপপুরের রাজা ঠাকুর মর্দন সিংহের লেখা চিঠিপত্র আছে। তাতে এই প্রতিজ্ঞাখণ্ড খাঁটি গড়ে তুলবার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। লেখা আছে, সবচেয়ে আগে আশপাশের গ্রামবাসীদের বুকিয়ে হক, ভয় দেখিয়ে হক, দলে আনবে। তাদের মেয়ে, শিশু ও বৃদ্ধদের জঙ্গলে, নিরাপদ জায়গায় রাখবে। গরু, ছাগল জঙ্গলে ছেড়ে দেবে। এক নয়, ছোট ছোট অনেকগুলি খাঁটি গড়ে তুলবে ও সেখানে খাদ্যশস্ত্র মজুত করবে। অস্ত্রশস্ত্র বা পাবে তাই জড়ো করবে। কামানদের শিখিরে নিলে গাদাবন্দুক তৈরি করা এমন কঠিন কাজ নয়। দূরে কাজ অত্যন্ত বিধাসী লোক ছাড়া কারকে দেবে না। দূত বরা পড়লে যদি সব বলে দেয়, তা থেকে বড় ক্ষতি হতে পারে না।

এই ত চিঠির মর্ম। আর কি দেখা গেল? দুর্দে মাত্র ন খানেক লোক আছে। এই কয়জন লোক এমন সুসজ্জিত ত্রুটি ব্রিগেডকে বাধা দিচ্ছিল সেসে ইংরেজরা বিন্মিত হলেন। তা ছাড়া, একটি উন্নত লাল পতাকা খাঁকা কিশাল পতাকা পাওয়া

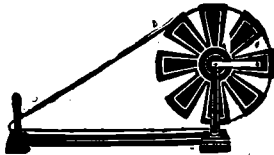
গেল। মহম্মদ ফজিল খাঁকে চিন্তা কুপালের বেগমের দেওয়া বাহিনীর সৈন্তের। তাদেরি একজন মহম্মদ ফজিল খাঁকে চিনিবে দিল।

২৮শে জানুয়ারী রামগড় কেন্দ্রের সামনে মহম্মদ খাঁ, নবাব কামলার খাঁ, কিয়েগরাম ও ওয়ালিদকে ফাঁসী দেওয়া হয়। ওয়ালিদ খাঁ আর কিয়েগরাম খুব গর্ব করে বললেন তাঁরা মহম্মদ ফজিল খাঁকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। মহম্মদ ফজিল খাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “তুমি কি মনে কর, তোমারা এইভাবে ইংরেজদের পরাজিত করতে পারবে?”

“নিশ্চয়। তুমি কি দেখলে না, আমাদের মধ্যে যারা সৈন্ত নয় তারাও লজতে পারে? ফজিল খাঁ সগর্বে জবাব দেন। হিউরোজ কেঁপে গিয়েছিলেন। তিনি একশো সাতশেজন ভারতীয়কে ফাঁসী দিলেন, দুশো থেকে তিনশো ভারতীয়কে হত্যা করলেন। সেদিন রাত থেকেই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আগুন জ্বলতে লাগল। রাত না পোহাতে বোড়া ছুটিয়ে

দুত এসে হিউরোজকে খবর দিল বাবোদিয়া, মাসিনপুর ও খুইয়ে ভারতীয়রা সমস্ত হয়ে অপেক্ষা করেছে। কারাগার ও নারিয়াওয়ালীতে দাঁটি গড়ে উঠেছে। জঙ্গলের আদিবাসীরা পাখর, তীরধনুক ও বর্শা নিয়ে অপেক্ষা করছে। বিলায়েতী ও আফগানরা এগিয়ে এসেছে। তারা বলেছে “যতক্ষণ গুলি থাকবে ততক্ষণ বন্দুক চালাব। যতক্ষণ তরোয়াল চালাতে পারি, চালাব। তারপর, আর কিছু না পারি, মরতে ত পারব?” হিউরোজ তৎক্ষণাৎ আত্মা সৈন্ত চেয়ে পাটালেন।

এইভাবেই সেদিন মধ্যভারতের সমস্ত সামাজিক স্তরে, প্রতিটি জঙ্গলে, গুহায়, পাথরের দুর্গে, উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, বৃদ্ধ হয়। ১৮৫৭-৫৮ সালে ভারতের আর কোথাও তিক এইভাবে সর্বাঙ্গিক বিদ্রোহ হয় নি। এইসব প্রতিরোধ যুদ্ধের পদ্ধতি ও প্রকৃতি আজও আমাদের কৌতূহল ও আস্থা জাগায়।



মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

ভারতীয় উৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলিতে সর্বত্র সাধম ও শৃঙ্খলা বক্ষা করুন।
আপনার আনন্দের আভিষেক যেন অস্ত্রের অশ্রুবিধার কারণ না হয়।

উৎসবের সময় অর্থ ও বিচ্ছিন্নতার অপচয় বন্ধ করুন। চাঁদা আদায়ের নামে যাত্রা জনগণের ওপর জুলুম করেন, পথচারী ও যানবাহন সমস্যার কথা না ভেবে যাত্রা পথের ওপর উৎসব আয়োজন করেন, মাইক্রোকোনের অভ্যুত্থানে যাত্রা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেন তাঁদের সযত্নে আচরণে উদ্দীপিত করা সত্ত্বাব্ধি সম্পন্ন মানুষের কাজ। উৎসবের উদ্দেশ্য কোন মানুষকে বিব্রত করা নয়, সকলের মধ্যে প্রীতির বিনিময় করা।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি অবস্থান। কোনো এক সাধারণ উৎসব তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করার সুযোগ এনে দেয়। কোনো অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

স্বসম্প্রদায় তথা রাজ্যের সকল মানুষের কাছে আমার আবেদন, ভারতীয় উৎসব পালনের সময় সাধম ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখুন। অস্ত্রের অশ্রুবিধা না করে উৎসব উদ্‌যাপন করুন।

এতদিন নড়বড় করছিল, শেষটার ভেঙ্গে পড়ল।
 জন্মের সময় কতো আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, কতো
 বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন বিধাতাপুত্র। সব
 চাপা পড়ে গেল ভাঙ্গা ইট কাঠের নীচে। বেরিয়ে
 পড়ল ভেতর থেকে ক্যানসার। ভাস্কর্য্য কৃতিত্ব
 সবটুকু মোরারজীর নব, তিনি তা দাবিও করেন
 নি। বলেছেন, —কি বলেছেন সে কথাই পরে
 আসবে। কি করেছেন এই সওয়া দু বছর আগে
 আগে তারই মোটামুটি হিসেব নেওয়া বাবে।

ক্যানসার

। ঐসতীহৃদয় সেন ।

ভ্রব্যমূল্য বাড়তে বাড়তে চলেছে : গত দু মাসে
 বেড়েছে কুড়ি শতাংশ। বেড়েই চলেছে আঁধার
 রাতে ভরাবহ বানের জলের মত। আইন শৃঙ্খলা
 লোপ পেয়েছে, কাগজ খুলাসেই চোখে পড়ে শুধু
 চুরি ডাকাতি খুন জখমের খবর। আলো নেই
 হাওয়া নেই জল নেই ; নেই বলতে কিছুই নেই।
 শিল্প ভ্রমিক কাজ করে না। রেল ভ্রমিক বলছেন,
 বোনাস না পেলে কাজ করেন না। ব্যাঙ্কের ব্যবসা
 আজ এখানে কাল ওখানে Clearing বন্ধ করে
 টাকা পরসার লেনদেন প্রায় বন্ধ করে এনেছেন।
 সরকার একটার পর একটা Ordinance জারি
 করে চলছিলেন, আর কোনটাকেই কার্যকর করে

উঠতে পারছিলেন না। অর্থাৎ শাসন কার্য্য চুলোয়
 দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে ছিলেন। শেষটার বেই
 অনাস্থা প্রস্তাব উঠল তখন ‘বইল তোমার সমস্যা’
 বলে গেক্সা নিয়ে নেমে পড়লেন পথে।

মোরারজী অবশ্য নিজের ব্যর্থতা অস্বীকার
 করেন নি। বলেছেন ব্যর্থতা তাঁদের সকলেরই,
 দুষ্ট করে বলেছেন যে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে
 ‘জনতা’ দল গঠিত হয়েছিল সেই মূল্যবোধকে সকলে
 মিলে উপেক্ষা করাতোই দল হিসাবে ‘জনতা’ ব্যর্থ
 হয়ে গেল। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধই ছিল জনতার
 শরিকদের মধ্যে বন্ধনের মঙ্গল সূত্র। কিন্তু কারোই
 আন্তরিক অন্তঃসত্তা ছিল না সেই মূল্যবোধের উপর
 ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেউ দমন করতে পারেন নি।
 সকলেই চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি রেখে-ঢেকে বলেছেন ; আমরা দিনের পর
 দিন চোখের উপরে প্রত্যক্ষ করছি। সেন্সিটিভ রাজ-
 নীতির ভরাবহ ভূতের নৃত্য, শেষটার তাড়বরতো
 পরিণত হয়েছে। শিশুরমত লোভী আর পশুর মত
 নিলজ্ঞ, একসল বখীদ্বান নেতা ক্ষমতা হস্তগত করার
 ক্ষমতা যে কি পরিমাণ পাগল হয়ে উঠতে পারেন, এই
 ৩২ বছরে একবারও এমন করে চোখে পড়ে নি।
 ভেবেছি এরা সবাই পেশাদার রাজনীতিক, দেশকে
 এরা ভালবাসে না। একটা ইলেকশন এসেই হয়।
 ঝড়ে বাশে এদের নির্মূল করে ফেলবে। সেবে
 ঠাণ্ডা গাধার ভেবেছি, কিন্তু পরিবর্তে কাকে নিয়ে
 বসাবো ? দেশকে ভালবাসে এমন মানুষ কি আছে ?
 আছে কি কারো মধ্যে ত্যাগ সত্যতা ও ডিসিপ্লিন ?
 যখন সেনি স্ত্রীপ্রিয় কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিও
 একটা হুজু মহীত্বের জন্য লালসায়িত, তখন কাকে
 বিশ্বাস করা যায় ? ওপর তলাতেই যখন এই অরক্ষা
 তখন নীচের ওলার রাম শ্রামে বছর মধ্যে কোষায়
 মানুষ খুঁজে বেড়াব ?

প্রাক স্বাধীনতা যুগে তো দেশে এমন অবস্থা ছিল না। ভাগ ছিল, সতন্ত্র ছিল ডিস্ট্রিক্ট ছিল। মানুষ ছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনানীদের কথা ধরছি না; বলছি সাধারণ মানুষের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জন জীবনে আমর। শৃঙ্খলা মেনে চলতাম, না মেনে উপায় ছিল না। জীবন মুকুট। মোটেই সহজ ছিল না পরাধীন যুগ। পরীক্ষায় পাশ করলেই চাকরী পাওয়া যেত না। উচ্চ বর্ণের হিন্দুর পক্ষে তো নয়ই কটাই বা চাকরী খালি হত সে যুগে? তার মধ্যে যেমন তেমন একটা সংগ্রহ করতে পারলেই সেটা হত দটটারি জেতার মত স্বেচ্ছাচার্য। এবং সেটা রক্ষা ছিল সম্ভব। সর্বদা ভর, কখন উপরওয়াল বলে বসবেন “যাও বেয়ে যাও” তখন চাকরী ত বাবেই দ্বিতীয় একটা সংগ্রহ করাও অসম্ভব। সেটা যে কত বড় অজায় তা অমূল্য করতাম। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। একমাত্র অন্যের উপর দোষ চাপান হাড়া।

মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগ—এই তিনটি কঠোর অধিপরাধীকার পরে অবশেষে আমরা সুবিধা পেলাম। অনেক শোড় ঘেঁরে এসেছি তো, তাই অনেক ভেবে চিন্তে, নতুন সংবিধান রচনার কাজে হাত দিলাম। অতীতের ঐতিহাসিক দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করে, ভারী welfare state এর যন্ত্র সামনে রেখে। বিশ্বের জাতিপুঞ্জের সংবিধান খুঁজে খুঁজে ভাল ভাল বাগানগুলি চরন করলাম। মানুষকে মানুষে ভেদ উঠিয়ে দেওয়া হল; কিন্তু ধনী ও গরিবের সুযোগের পার্থক্য রদ করা হল না। প্রকৃতির জল হাওয়ায় মত, বায়ু, বরষ ও বাসস্থানের উপর সকলের সমান অধিকার স্বীকার করা হল; অথচ সেই অধিকার অর্জনের জন্য কি করতে হবে সেটা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করা হল না। মালিকের মজির

উপরে জনতার জীবিকা হাতে নির্ভর না করে, সেজন্য কোটি কোটি চাকরী সৃষ্টির অস্বীকার হইল; কিন্তু তার মূলধন যে কোথা থেকে সংগৃহীত হবে সে বিষয়ে কিছুই বলা হল না। বরং সেটা যাতে সহজে গঠিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হল unproductive কাজে ব্যয় বাড়িয়ে দিয়ে। যারা দুর্বল যারা পেছনে পড়ে আছে, তাদের সামনে আসবার সুযোগ দেওয়ার জন্য অগ্রগামীদের লাগাম টেনে রাখবার ব্যবস্থা করা হল। রোপণ করা হল পরিশ্রম বিমুক্ততার প্রথম বীজ।

কর্মযজ্ঞ শুরু হল, সে এক দক্ষ যন্ত্রের মত আয়োজন। দারিদ্র্যের শাস্ত উঠানো স্থাপিত হল কামাখশালা, ইম্পাতের কারখানা। পাহাড় পর্যন্ত সাক করে মাটির তলা থেকে বার করা হল বনিক। গ্রামের সর্ব আল জেঙ্গে তৈয়ারী হল রাজপথ। বান জেতের ওপর দিয়ে ছুটলো বিজলীর ডাব। বস্তা ঘোলের অস্ত্র বাঁধা হল জলদেবতাকে, সৃষ্টি করা হল জলশক্তির উৎস। নব জীবনের উল্লাসে তখন আর ভর সইছে না। চারদিকে নানা কাজ; অট্টালিকা উঠছে, কাঠেরী বসছে, ছুটছে দৈত্যের মতো ডিকেল চালিত ট্রাক। বহু বেকারের জন্য চাকরী সৃষ্টি হতে লাগল। তার অচাই এলো গ্রামের মানুষদের ভোগে, ঘাসের শাবি বিক্রিত করে চলতে লাগল আমাদের নিগের রথ।

ট্রেড ইউনিয়ন গড়লাম, শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করলাম। চাকরীর নিয়ন্ত্রণের সব রকম ব্যবস্থা করা হল; শ্রমিকের যে একটা কর্তব্য আছে ফার্মের উপরে না হলেও জাতির উপরে তারও যে উৎপাদন বাড়ানোর দায়িত্ব, না বাড়ালে যে আর পাঁচটা বেকারের কর্ম সংস্থানের পুঁজি সংগৃহীত হবে না, (বাকী অংশ ০৪ পাতায়)

শহীদ যোগেন্দ্র চক্রবর্তী

॥ স্বাধীনমোহন সেন ॥

১৯১০ সালে জামালপুর হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করিয়া জ্বাতি মাসে ময়মনসিং কলেজে ভর্তী হইলাম। সেই সময় কার্যোপলক্ষে যোগেনদার সঙ্গে পরিচয় হইল। পরিচয় করাইয়া দিলেন অমূল্য শীলন সমিতির নেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোহন সেন পরবর্তী কালে তিনি রামচন্দ্র মিলনে যোগ দিয়া নরেন মহারাজ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'এর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বৈশ্ববিক কার্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর।' নরেনদার আদেশ অনুযায়ী চলিয়া জীবনে লাভবান হইয়াছি।

যোগেনদার বাড়ী ছিল ময়মনসিং জেলার নেত্র-কোণা মহকুমার একটি গ্রামে। তিনি ছিলেন চরুচ সাহসী, কর্মকুশল, কার্যপারায়ণ এবং দরদী বিপ্লবী। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই বহু বৈশ্ববিক কার্যে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার সম্পর্কে আসিয়া গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে নরেনদা শ্রীযুক্ত রমেশ আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া রূপুসংল। ময়মনসিং কলেজে উপস্থিত হইয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আমাকে বাড়ী ঘর ও পড়াশুনা ছাড়িয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই সোনারঙ জাতীয় বিজ্ঞালয়ে উপস্থিত হইতে বলিলেন। তিনি যোগেনদাকে নির্দেশ দিলেন যে আমি তাহার আদেশ পালন করিব সমস্ত কানাইলান আমি তখন আমার দাখা সুধান্তে হৃৎসেনের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতাম। আমি কাহাকে

কিছু না বলিয়া যোগেনদা ও রমেশবাবুর সঙ্গে সোনারঙ চলিয়া গেলাম।

সোনারঙে তখন অমূল্যশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেখানে বিপ্লবীরা নিজেরাই পাক করিতেন, বাসন মাজিতেন, গো-পালন করিতেন এবং গরুর জন্ত ঘাস প্রকৃতি কাটিতেন। তাহা ছাড়া স্কুলে জাহা দিগকেও পড়াইতেন। মূলীগঞ্জ হইতে মাসে মাসে পুলিশ আসিয়া অন্তর্কোটে বিজ্ঞালয় বেধাও করিয়া শানতলাস করিত। হুইবার পুলিশ ইচ্ছাকৃত মামলা লাল সেনকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া কিরিয়া গেল। আমরা দুই বায়েই তাহাকে ডিক্রি নৌকায় গ্রামের বাহিরে লইয়া বাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বিজ্ঞালয়ের চতুর্দিক কলাকীর্তি থাকায় পুলিশ সুবিধা করিতে পারিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ আমাদের প্রধান কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য বহু পরিশ্রম হইল। তখন ঢাকা বড়োয় মামলা চলিতেছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়, পুলিশ বাবু ও অজ্ঞাত আসামীদের পক্ষে মামলা চালাইতে ছিলেন। মামলা চালাইবার জন্য এবং অজ্ঞাত বৈশ্ববিক কাজ করের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কাজেই অর্থ সংগ্রহের জন্য আমাদের মাসে মাসে ডাকাতি করিতে হইত। ডাকাতি করার আয়োজন প্রধানত সোনারঙ কেন্দ্র হইতেই করা হইত।

সোনাল গ্রামে সশস্ত্র পুলিশের একটা ক্যাম্প ছিল। গোয়েন্দা পুলিশ কুলের আশে পাশে বহুল দফাদারের সাহায্যে কিছু লোককে হাত কবিল। তাহারা প্রায়ই নানা চুহুর আমাদের সঙ্গে বগড়া বাধাইবার চেষ্টা করিতেন। একদিন প্রাতে দূলে আসিয়া নরেন্দ্রার সঙ্গে আলাপ করিতেছি এমন সময় অমূল্য সেনগুপ্ত আসিয়া আমাকে জানাইল যে একটা মুসলমান ছেলে আমাদের পুকুরের ঘাটে একটা গুরুশ্রান করাইবার জন্ত অনিয়মিত। অমূল্য সেনগুপ্ত পরবর্তী কালে আনন্দ বাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে জানাইলেন যে সমিতির পুকুরের ঘাটে গরু স্থান করাতে নিষেধ করার সে অকথা ভাবার গালাগালি করিতেছে এবং তরু প্রদর্শন করিতেছে। তাহার নিকট সমস্ত উনিয়া আমি সেখানে চলিয়া গেলাম। কিন্তু আমি ঘাটে ঘাইবার পথে সে আমাকেও গালাগালি করিতে লাগিল আমি উত্তেজিত হইয়া মুসলমান বালকটির পিঠে একটি বাঁশ দিয়া আঘাত করিলাম। সে মাটিতে পড়িয়া গেল এবং জোরে চিংকার করিতে লাগিল। তাহার বাড়ীর লোক আসিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া গেল। এই ঘটনার পর নরেন্দ্রা আমাকে পূবই গালাগালি করিলেন। কারণ সেই দিনই অর্থ সংগ্রহের জন্ত লোক ও অস্ত্র-শস্ত্র মজুত করার কথা ছিল। এই ঘটনার ফলে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। আমি নরেন্দ্রার নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলাম। বলিলাম যে অপমানিত বোধ করার আমার মেজাজ ঠিক ছিলনা।

বহুল দফাদার এই সংবাদ পাইয়া ২০০ / ২৫০ লোক লইয়া বিজালঘের দিকে ছুটিয়া আসিল। একটা লোক আমূল্য দিয়া আমাকে দেখাইয়া দিল। নরেন্দ্রা আমাকে সরিয়া পড়িতে বলিলেন। লোক

গুল ক্রমশ আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া যোগেনন্দা এবং দিগ্বী মুকুটি আশ্রয়স্থান করিয়া বহুল রাইফেল বাহির করিলেন। রাইফেল দেখিয়া বহুল এবং তাহার দলবল ভয় পাইল এবং পলাইয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যাম্প হইতে সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া পড়িল। কিন্তু পুলিশ আগার আগেই স্বল্পশস্ত্র সহ বিলম্বীরা সরিয়া পড়িলেন। যোগেনন্দা এবং আরও কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। বিজালঘের একটি পানের ব্যবস্থা ছিল। বরোজের উপর একটি পিস্তল বাগ এবং কিছু বিক্ষিপ্ত চিঠিপত্র পাওয়া গেল পুলিশ ডাক ঘূর্তির মামলা দায়ের করিয়া যোগেনন্দা এবং অস্ত্রাস্ত্র কয়েকজনকে চালান দিল। তাহাদের মামলার বিভিন্নরূপ লগু হইল। যোগেনন্দা আট মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ঢাকা জজ কোর্টে আপীল করা হলে যোগেনন্দা আপীলে মুক্ত হলেন। কয়েক মাস পরে সমিতির পক্ষ থেকে বিলম্বীরা বহুল দফাদারকে হত্যা করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই কেম্বেলবা, যোগেনন্দা এবং আমি অল্প একটি মামলার জামালপুরে এক বঙ্গীয় সন্ত্রাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম। জামালপুর মাঝে জেলে আমাদিগকে বামি টানিতে হইল। জেলের জমাদার পরসে আদায় করিবার জন্য দুর্ব্যবহার করিত আমরা সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিবার জন্য বহুপরিকর ছিলাম সুতরাং সুবিধা করিতে না পারিয়া জমাদার রাগিত্তে আমার বাবার নিকট গিয়া বলিল যে আমাকে কিছু টাকা দিলে সে জেলে আমাদিগকে তাহাকে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিবে। তাহার কাকিবাছী বুঝিতে পারিয়া ধমকাইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। কয়েক দিন পরেই আমাদের জামালপুর জেল হইতে ময়মনসিং জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। ময়মনসিং

কলে আমাকে খানি টানিতে হইত। যোগেননা ও মেশবাবুকে চেকিতে খান ভাঙিতে হইত। সেই ময় ময়মনসিং জেলে শ্রীমুখ্যে মোহন ঘোষ, ইউপেন্দ্র দাশ এবং জীতেন্দ্র লাহিড়ী এক ডাকাতি মাল্য সাত বৎসর ৪০ ভোগ করিতেছিলেন।

যোগেননা কোন প্রকার অস্ত্রার সম্বন্ধ করিতে পারিতেন না জেলের বড়নশালার মেট করেদীদের পর খুবই অভ্যাস করিত। একদিন সন্ধ্যায় আমরা খাইতে বসিয়াছি, যোগেননার পাশেই কজন করেদী মেটকে কিছু ভাল মিটে বলিল। টে ক্রু হইয়া করেদীকে চপেটাঘাত করিল। যোগেননা মেটের ব্যবহারে আপত্তি করায় মেট তাহাকেও গালি মিটে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গেই যোগেননা উদ্ভিয়া মেটের গলা টিপিয়া ধরিলেন। হলার এবং করেকজন ওয়ার্ডার আসিয়া যোগেননাকে ধরিয়া ফেলিলেন যোগেননা জেলারকে হাটয়া সব কথা বলায় জেলার মেটকে খুব ফকাইলেন। জেলার ছিলেন পাক্ষাণী। পণ্ডিত ধোয়া সিং। কারাকোবো সদস্য জেলার খুব মই দেখিয়াছি। ১৯১৭ সনের প্রথমভাগে বংকলী ইয়া বখন হাজারীবাগ জেলে যাই পণ্ডিতজী তখন হাজারীবাগ সেট্টাল জেলের জেলার ছিলেন।

কয়েক মাস পরে একদিন রাতে লাহোর বড়হাট মলার উনিশজন দণ্ডিত আসামী ভেল হইতে শায়েন করে। এরমধ্যে কয়েকজন পরদিন প্রাতেই নলের কাছে ধরা পড়ে। জেলের প্রাচীর ভিঙাইয়া চপে পাথরের উপর পড়ায় তাহাদের পায়ে খুব চোট পেে একজন তাহারা বেসীন্দ্র বাইতে পায়ে নাই। নবার জেলের ভিতরে আসার পরে এ্যাডিশনাল লায়র কীষণ হায়েচোপ্তরী চাকুরীতে উন্নতিলাভ করার আশায় তাহাদিগকে প্রহার করে। ইহাতে

জেলার বাগাধিত হইয়া তাহাকে খুব ধমকাইলেন। তিনি বলিলেন, “এ দাবির আমার উপর, তোমার উপর নয়। এদের জন্ত আমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমি কেন ইহাদের উপর অনর্থক একরূপ অভ্যাস করিতেছি?” করেকমাস পরেই জেলারের শাস্তি হইল। তাহাকে হাজারীবাগ সেট্টাল জেল হইতে কোন ডিষ্ট্রিক্ট জেলে বদলি করা হইল। বাওদার দিন তিনি মুরেনবাবু ও আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। জানিয়া আজ তিনি বাঁচিয়া আছেন কিনা। মেটের সঙ্গে কগড়ার করেকদিন পরেই যোগেননাকে প্রেসিডেন্সী জেলে এবং রমেশবাবু ও আমাকে রাজসাহী জেলে বদলী করা হইল। ছাড়াছাড়ির সময় মনে আসোয়াসি অন্তর্ভবত কহিলাম।

রাজসাহী জেলে রমেশবাবুকে ও আমাকে অফিসে ডাকাইয়া সুপারিনটেনডেন্ট কর্নেল উড সাহেব বলিলেন, “তোমরা ভালভাবে চলিও আমি তোমাদের উপর ভাল ব্যবহার করিব। এই ভাল ব্যবহারের প্রথম নমুনা-- আমাকে দিলেন খানি টানার কাজে এবং রমেশবাবুকে দিলেন চাকীর কাজে। জেল কোঠের নিয়মানুসারে প্রতি করেদীকে সৈনিক দলদের সরিষার তেল বাহির করিতে হয়। কিন্তু রাজসাহী জেলে সকালে দলদের ও বিকালে দলদের সরিষা খানি টানিতে হইত। আমার শরীর তখন খুবই মজবুত ছিল কিন্তু আমাকেও প্রথম করেকদিন হিমমিৎ খাইতে হইয়াছিল। পরে আর একবার কষ্টসাধ্য মনে হইতন। রাতিতে থাকিতাম জাল ডিষ্ট্রিক্টে। রমেশবাবুকে যে চাকী দিয়াছিল তাহা চালাইতে রমেশবাবুর খুবই অনুরোধ হইতে লাগিল। বড়কমাসার (সেটা বদলাইয়া) সেওয়ার রমেশবাবুর কষ্টের কতকটা লাঘব হইল। রমেশবাবু রাতিতে

থাকিছেন সেলে। কয়েকমাস পরে আমরা ছই-
জনেই মুক্তিলাভ করিলাম।

দোমারঙ মামলার যোগেনদার শক্তি আসলে
বহাল রহিল। জেলের বাহিরে আসিয়া শুনিলাম
যে তিনি হ্রেসিডেন্সে জেলে কামারশাণার আছেন।
মুক্তিলাভের পর নরেন্দার সঙ্গে দেখা করায় তিনি
আমাকে কলকাতার কোন কলেজে ভর্তি হইতে
বলিলেন। ১৯১২ সালের জুলাই মাসে আমি
কলিকাতায় আসিয়া রিপন কলেজে ভর্তি হইলাম।
কলকাতায় আমি বড়িশির বাসায় থাকি। পড়াশুনা
করিলাম। ১৯১৩ সনের মার্চ মাসে একদিন বিকালে
কলেজ দ্বোয়ারে বেড়াইতেছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম
আলোয়ান পরিহিত একটি লোক তাড়াতাড়ি আমার
দিকে আসিতেছে। কাছে আসিবারাত্র আমি
যোগেনদাকে চিনিতে পারিলাম। তিনি হাসিমুখে
আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার এই পোষাক
কেন এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন জেলার
নিয়মানুযায়ী এক বৎসরের বেশী মেয়াদী বেশী
কয়েদীর কাপড়চাপড় জেল কর্তৃপক্ষ বিক্রয় করিয়া
দেন। তাহার শীত কাপড় ও ছই টুকরা কাপড়
খাল্যদের পর দিয়াছে। ছই টুকরা কাপড়ে লক্ষ্য
নিধারণ করা যায় না বলিয়া তিনি কোমরে আলো-
য়ান জড়াইয়া এই আশায় কলেজ দ্বোয়ারে
আসিয়াছেন যে এইখানে পরিচিত লোকের সহানু-
বিল্যে পাবে। আমি তাহাকে একমুহূর্তে আপ্যায়
সারকুলার রোডে আমাদের বাসায় লইয়া গিয়া
খাওয়ার ব্যবস্থা করিলাম এবং নূতন কাপড় ও জামা
কিনিয়া দিলাম। তিনদিন তিনি আমাদের বাসায়
ছিলেন। তিনি কবে বাড়ী বাইবেন তাহা জানিতে
চাহিলাম। তিনি বলিলেন বাবা ও বড়দাদার সঙ্গে
অনেকদিন দেখা হয় না, তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা

হয়। কিন্তু কোন কাজ না করিয়া বাড়ীতে যাইব
না। এরপরে এক বছর মেসে গিয়া তিনি কয়েক
দিন কলিকাতায় ছিলেন। এই সময় আমাদের
বিপ্লবী বঙ্গগন্ধবাহারা কলিকাতায় ছিলেন সকলের
সঙ্গে দেখা হইল। কয়েক দিন পরে নরেন্দার
নির্দেশে তিনি ঢাকার গেলেন।

অরুণাচল আশ্রমের হান্সমায় মিষ্টির গর্ডন আই
সি এম সংহত ছিলেন। ঐহটে অরুণাচলে আশ্রম
বাসীদের সঙ্গে সেখানকার সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট ও
অস্ত্রাগ্রহের সংঘর্ষ হয়। আশ্রমের সাব সেক্সাঙ্গীদের
উপরও অসামান্যিক অত্যাচার চলে। সমিতি হইতে
স্থির করা হইল যে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ
লইতে হইবে। যোগেনদার উপর এই কার্যের ভার
অপিত হইল। অদূত সরকার ঢাকায়ই ছিলেন।
ভাবাপ্রসন্ন বল কলিকাতা হইতে ঢাকার গেলেন।
তাহারা তিনজন বোমা ও তিনটি রিভলবার
লইয়া ঢাকা ও ঐমঙ্গল পৌছিলেন ঐমঙ্গল
ইহাতে মৌলবীজার চোদ্দ মাইল ইটিয়া
গেলেন এবং নিকটবর্তী সন্তের সাতী গ্রামে অগ্নিশীলন
সমিতির এক সভার বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন।
তাহারা সন্ধ্যার পর রাত্তারাট ও গর্ডন সাহেবের
বাড়ী দেখিয়া থাকিলেন। ঐবন্ধ লালমোহন সে
সময় বন্দোবস্ত করিলেন।

পরদিন রাতিতে শহরের এক প্রান্তে গর্ডন
বাড়ীতে তিনজন ও পাতিয়া বসিল। যোগেনদা
সকলের আগে রিভলবার ও বোমা লইয়া বসিলেন।
তাহার পশ্চাতে রিভলবার হাতে অদূত সরকার এবং
তাহার পিছনে ভাবাপ্রসন্ন বল। তাহার হাতেও
একটি রিভলবার ছিল। হঠাৎ আকস্মিকভাবে বোমাটি
বির্পীর্ণ হওয়ায় যোগেনদা ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ
করিলেন বিপ্লবী বীর যোগেন চন্দ্রবর্তী শত্রু নিধনের

পূর্বেই আত্মহত্যা দিলেন। কি করিয়া হয়ৎ বোমাটি
কির্দী হইল তাহা অন্ততাব্য ভাৱাপ্রসন্ন বল এখনও
বলিতে পারেন না। এই দুর্ঘটনায় অন্ততাব্য এবং
ভাৱাপ্রসন্নবাবু বোমার টুকরায় আহত হইলেন।
তাহারা তাড়াহাড়ি ঘটনায় হইতে ছই ফালং নূবে
একটা কাপড়টের কত্রে গেলেন। শ্রীহৃষ্টের মাঠায়
সমিতির সভা প্রদূর গুণ্ড দিতলবার ছইটি তাড়াহাড়ি
সরহিয়া ফেলিলেন। লালমোহন বাবু অন্তত সৰকার
ও ভাৱাপ্রসন্ন বলকে পদূর গুণ্ডের সাহায্যে অতিকষ্টে
ছই ফালং নূবে কালাপদ দাসগুণ্ডের বাড়ীতে লইয়া
গেলেন। সেখানে কার্ণীপদ বাবুর বাবা তাহাদিগকে
ঐষপত্র দিলেন তাহারা অসহ্য যত্নসহ ছটপট করিতে
ছিলেন।

লালমোহনবাবু স্থির করিলেন যে অন্ততাব্য এবং
ভাৱাপ্রসন্নবাবুকে নৌকায় করিয়া ঢাকা লইয়া
বাইবেন। কার্ণীপদবাবু নৌকা ভাড়া করিয়া দিলেন।
কিন্নবীরা রাগি এগারটার সময় বামুনদীতে নৌকায়

চড়িলেন। রাগি সেড়টার সময় নৌকা যাত্র ও
কুশিয়ারী নদীর সন্ন্যস্থলে পৌঁছিল সেখানে আর
একখানি নৌকাভাড়া করিয়া সকালবেলা তাহারা
শেরপুর রোডে পৌঁছিলেন সেখানে লালমোহনবাবু
সমিতির সভা মির্জাপুরের মহেশ্র শর্মাকে ঐজিয়া
যাতির করিলেন। মহেশ্রবাবু একখানা নৌকা
ভাড়া করিয়া দিলেন এবং নগদ কুড়িটাকা দিলেন।
কয়েক দিন পরে কিন্নবীরা ঢাকায় পৌঁছিলেন।
লালমোহনবাবু নৌকা হইতে শ্রীহৃষ্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের বাসায় গিয়া প্রভুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে সাক্ষৎ
করিলেন। প্রভুলবাবু চান্দ্রির এসিক কুচিকিংসক
মহিনীমোহন দাসকে নৌকায় লইয়া গেলেন।
মহিনীবাবু আহতদের চিকিৎসার ভার নিলেন তাহারা
চিকিৎসায় অন্ততাব্য এবং ভাৱাপ্রসন্নবাবু অংশিনেত
মধ্যেই আত্মগো লাভ করিলেন।

আমার পতনশ্রদ্ধভাজন শহীদ হোমেশ্রপ্রদায়
চরণে প্রণাম।

রাষ্ট্রীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রসাদ

আমেরা হাত কুমারী

আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরি

মূল্য ৩.৫০ এক সাতলস ফল

খাদ্যেই

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী

কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা

করুণার মনোভাব কেন ?

ধীরেন ভৌমিক

মুদ্রার মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে

করুণার দৃষ্টিতে দেখা হয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। ইন্দিরাগান্ধী সরকার ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য মাসিক ১০০ টাকা পেনসান মঞ্জুর করেছিলেন, তার মূল্য এখন ৪০ টাকা। ১৯৭১ সালে সরকারী বেসরকারী অফিসে ২০০ টাকা মাহিনা পেতেন, তারা এখন কমপক্ষে ৫০০ টাকা পান, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসান বৃদ্ধির কথা বলা হলে বলা হয় সরকারী ভাণ্ডারে অর্থ নেই। মন্ত্রীদের এম. পি. ভের. এম. এল. এ পের ভাতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকারী বায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন অর্থের সঙ্কট দেখা দেয় না। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেলায়ই এই স্থপনতা। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন—যারা এম পি, এম এল এ হয়েছেন তাঁরাও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা চিন্তা করার সময় পান না। দলের কথা ও নিজের কথা চিন্তা করার পর তাদের আর সময়ই থাকে না। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লবীও মজিন্দারী নয়—দিল্লীতে চাপ সৃষ্টি করার একাধিক প্রয়াসও নেই। আন্দোলনবাসীরা একাধিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে ৫০০ টাকা পেনসান আদায় করেছেন এটা খুবই আনন্দের কথা—সকলের জন্য একই রকম ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন ছিল। এম পি বা পিচ বংসর পাল'মেট সঙ্গ থাকার পর মাসে ৫০০ টাকা পাবেন—বিরাট বিদ্রোহী ধনকুবের টাটা বিড়লা

একবার পাঁচ বছরের জন্য এম. পি. হলে তিনিও এই সুযোগ পাবেন। কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আয়ের বিধি নিষেধ। ১৯৭২ সালে পাঁচ হাজার টাকা বাৎসরিক আয় হলে—এখন সেই অঙ্ক ২৫ হাজার টাকা হলে পূর্বের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে। কম জন স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই বা আয় আড়ে প্রায় সকলেরই ত বয়স ২০/৭০ এর উপর। শতকরা ২ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সামান্য আয় থাকতে পারে; তাও সামান্য এবং ২ ১ বংসর পর সেই আয়ও হয়ত তাদের থাকবে না—তবু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কেন বৈসাদৃশ্যমূলক আচরণ। অজ্ঞাত রাজ্যে রাজ্য সরকার থেকে পেনসান ১০০ থেকে ১৫০ টাকা দেওয়া হয়, মেডিকেল সাহায্য দেওয়া হয়, পড়াশুনার ও চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গে সে সবের বালাই নেই। মুদ্রাহীনা ক্রমে কমছে—মুদ্রাকীর্ণ মূল্যবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিকে কাবু করে ফেলেছে।

১৯৫০ সালে যখন স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হয়, তখন বলা হয়েছিল যে ভারত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হবে সব নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষার বিচারের ব্যবস্থা করা। তারপর আবার নির্দেশক নীতিতে বলা হয় যে রাষ্ট্র এমনভাবে নীতি নির্ধারণ করবে যাতে প্রত্যেক নাগরিক সন্তুষ্টি জীবন যাত্রার জন্য বা প্রয়োজন তা পায়। যাতে দেশের সম্পদ এমনভাবে

কতিংক হয় যে তা থেকে সর্বসাধারণের উপকার হয় বাতে জনগণের স্বার্থ বাহুত করে দেশের সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদান কোনো সোষ্টি বা বিশেষ শ্রেণীর হাতে গিয়ে না পড়ে। দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা পৃথকভাবে চিন্তা করতে হত না।

পাঁচটি পরিকল্পনা সাত্ব হওয়া সাত্বও দারিত্র কমলি :

আমাদের পরিকল্পনার সব কবটিতেই দারিত্র্য ঘোচনের কথা বলা হলেও কাছাকাছি: ধনীরাই অধিকতর ধনী হয়েছে। বার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধতায় করেছে তারা স্বাধীনতার যুগে অধিক ক্ষয়ণ উঠিয়েছে। আমাদের জনসংখ্যা ৫৬ কোটি থেকে ৬৪ কোটি হয়েছে, প্রতি বছরে ১ কোটির অধিক জন সংখ্যা বাড়ে। খাল শমা, মিলের কাপড়, তাঁতের কাপড়, চিনি, ইত্যাদি ভোগ্য পণ্যেরও উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু সমবর্তন হয় নি। কারো অতিরিক্ত খেয়ে ফিরাই পায না, কারো ভাগ্যে ঝেঁচ থাকার মত খাবারই ছুটছে না। কারো বিরাট প্রাঙ্গণ ফাঁকা পড়ে আছে, আর বহু ভাগ্যহীণ মানুষ ফুটপাথে বস-বাস করে—অনেকে একটি মাত্র ঘরে গ্যাসাসি করে বাস করে, তার মধ্যে বারান, তার মধ্যেই ছেলে খেয়েদের পড়াশুনা। তবু সহরাকলে বেশন ঘুঘর এককর দিয়ে কিছু লোকের উপকার করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামের ৫০ কোটি মানুষ চরমভাবে বিপন্ন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি অভিচার

গ্রামাঞ্চলেও স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় ভোগ্য হা: চাল, ডাল, জেল, চা, কেরোসিন, কাপড় ইত্যাদি

সহরার সহজপ্রাপ্য করে বন্টনের কথা হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রিয় শাসনের চরম অস্থিরতায় ক্ষত সব কিছুই পরিকল্পনার স্তরেই পর্যাবসিত হয়ে আছে। দারিত্র জনসাধারণের এই স্বল্পমূল্যে পণ্য কেনারও সামর্থ নেই, অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীকও নেই। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী আছে তাদের শুধু ২০০ টাকা আয়, এই স্বল্প আয়ের দ্বারা তারা অর্থাহারাে, অনশনে রয়েছে। মোরারজী দেশাই তাদের এট স্বল্প আয়ও বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। মহীন্দর অগ্রান্ত সম্প্রদায় বাধা দেওয়ার সম্ভব হয় নি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণার করার ক্ষত পুলিশ তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে হামলা, এখন তাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত তদন্তের নাম করে পুলিশী অভিযান চলছে এই হল তাদের প্রান্ত স্বল্পস্থায়ী কেন্দ্রিয় সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গ। ৭ বছর আগে বাদের পেনসান মঞ্জুর করা হয়েছে—৭ বছর পর আবার তদন্ত কেন অনেক পরীক্ষা নির্ভীকায় পেনসান মঞ্জুর করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশে পেনসান মঞ্জুর করা হয়—আর এখন পুলিশের সুপারিশে, আমলাদের নির্দেশে পেনসান বন্ধ হচ্ছে। সহ-বন্দীদের সার্টিফিকেটকে প্রমাণ্য পুলিশ হিসাবে মানা হচ্ছে না, এম, এল, এ, এম, পি, সহ-বন্দী কোথায় পাবে। অধিকাংশই ত পরলোকে, সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি এত বিরূপ কেন। নতুন কেসগুলি চালু করার কোন চেষ্টাই নেই। কাইলবন্দী হয়ে আছে সকল আবসন। মহীন্দা বাস্তব গণ্য রক্ষক, আমলাবা তাদের পাওয়াই দেখ না। বন্দীরা আমলাদের কাছে করছোড়ে কুর্পিশ জানায়।

এই আমলারাই ইংরেজকে চালিয়েছে—এখন নতুন নতুন শাসকবর্গকে চালিয়েছে।

সাধারণ মানুষ উপজিত

স্বাধীনতার ৩১ বৎসর পরেও এই অভিশপ্ত দেশে সাধারণ মানুষের পড়াশুনার সুযোগ নেই, রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, কোনও রকমে বসবাস করার ব্যবস্থা নেই। অপর দিকে ভাগ্যান্বিত লোকেরের জন্য বহুতল প্রাসাদ, স্ক্রিঙ্গ, টেলিভিশন, গাড়ীর সংখ্যা বাড়ছে। যে সব দল সমাজতন্ত্রের কথা বলেন—তাদেরও প্রভাব বৃদ্ধি হয় নি। নেতাজী যখন ১৯৪৯ সালে বামপন্থী একেবার কথা বলেছিলেন—তখন সমাজতন্ত্রীরা ও কমিউনিস্টরা মহাবোগিতা করলে নেতাজীকে দেশ ত্যাগ করতে হত না, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ত্যাগ হত না, স্বাধীনতা সংগ্রামীর জাতীয় জীবনে মর্যাদার অধিকারী হতেন। বুদ্ধ, অক্ষয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য তিনি মহাজাতি সদন নির্মাণ করেছিলেন—এখন সেখানে তাদের প্রবেশ করাই মুশকিল। অবশ্য মহাজাতি সদনে পাঠাগার, সভার জন্য হল, তদানীন্তন একাধক কংগ্রেস ভবন, গবেষণাগার স্থাপন এসবও তার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল।

প্রায়াক্তন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম

এই ঋণ্ডিত স্বাধীনভাষা পরিভ্রাণীমার নীচে যাবা রয়েছে, তাদের প্রজাগ বাড়ছে, বেকারী বাড়ছে, মানুষের হতাশা বাড়ছে, সাধারণ মানুষ কোন আশার আলো দেখছে না। ভ্রমিয়ারী প্রখার অধ-মান ঘটেছে কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা নতুন জমি দারী সৃষ্টি করেছেন। একবার যাত্রা দলের নেতৃত্ব তারা সীমিত সমস্ত সংখ্যা রেখে দলের নেতৃত্বপথে বহাল থাকছেন। কেন্দ্রিয় শাসনে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় দেশে নৈরাজ্য দেখা দিলে, আক-লিকতা, সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। দেশের একা সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে, এই অংশ্যার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সার্বিক একা ও সংগ্রাম প্রয়োজন। আমাদের দেশের পরিচালকরাও ইংরেজের মতই সংগ্রামের ভাষা বুঝে—আবেদন নিবেদনে কোন কাজই হবে না।

— — —

ভারতবর্ষের প্রধান সার্বিকতা কী—এই কথাটা স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিছে, প্রভেদের মধ্যে একা স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখী করিয়া নেওয়া এবং বহুত্ব মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মানহয়, সে গুলিকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিত্তিকার নিগূঢ় যোগকে আবিকার করা।

এক বৃন্তে তিনটি বিষ ফুল

—ক্রমেন্দ্রনাথ গঙ্গা

চোরাচালান ঘূষ-দলভাণ্ডাণ যেন এক বৃন্তে তিনটি ফুল। এই ফুলের সৌরভ এমন বিবাস্ত্র যার প্রজ্ঞাবে মত্ত দেশ আজ বিপন্ন, জনসাধারণ পিষ্ট। এই বৈপন্ন অবস্থা হতে মুক্তি পাবার কোন দিশারী পাণ্ডিত্যে দেখা যায় না। এই ভিন আপদের সহ-বস্থানে ভারত যেন নিজের ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে স্বদেশের পর্যায়ে নেমে পড়েছে। এই পঙ্কিল বস্থা হতে মেরুদণ্ড সোজা ও স্টু করে ভারত কি উঠতে পারবে। পূর্ব গৌরব কির পাবে?

চোরা চালানের বিষময় ফল সপ্তকে আমাদের সরকার সচেতন, বন্দ করার প্রচেষ্টারও অভাব নাট। ই চোরা-চালান ও চোরা-কারবার বন্ধ করার জন্য দুটি সরকারী দপ্তর আছে (১) সেন্ট্রাল একসাইজ ও ল্যাণ্ড কাষ্টমস্, (২) বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, (৩) ইণ্ডো নিবেদান বর্ডার ফোর্স, (৪) রাজ্য সরকারের আঞ্চলিক দপ্তর, (৫) কলিকাতা পুলিশের সিকিউরিটি ন্টোল ও (৬) স্থানীয় পুলিশ। এই দুইটি দপ্তরের স্ত শত শত কোটি টাকা ব্যয় হয়। ইহা সযেও নরা কারবারই আমাদের অর্থনীতি দখল করে াছে। এই বাজার দেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে াছে।

কোচিন ও বোম্বাইর আন্তর্জাতিক চোরা চালান কটা স্তনিস্থিত ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় তটা না হলেও যতটা হয়েছে তাতেই আমাদের ঐ নৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। জাহাজের স্তনীতি- ত কর্মচারীদের সঙ্গে চোরা-কারবারীদের ব্যবস্থা

অল্পব্যয়ী জাহাজ নোঙ্গর করা অবস্থায় ডিক্রি বোকা করে জাহাজ হতে মালপত্র বের করে আনা হয়। কলিকাতার আর এক প্রকার চোরা কারবার হয়— কলিকাতা। বন্দর দিয়ে স্থলপথে নেপালের মালপত্র যায়। নেপাল প্রচুর বিদেশী মাল আমদানী করে। এই মাল পশ্চিমবঙ্গে কেনে দিয়ে যায়। লক্ষ্যম এয়ার- পোর্টে আগলি-এর যুক্ত পরিচরনা আছে। এরোপ্লেন বড় বড় মাল আনা সম্ভব নয়, হোট হোট পামা মাল আনে, বিশেষ করে সোনা। লক্ষ্যম বিদেশগামী যাত্রীদের তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একদল যাত্রী নিয়মিতভাবে হংকং বা বেংকক যাত্রাস্থত করছেন। এরা ওদের দিবস্ত কাষ্টমস্ অফিসাররা। ডউটীতে থাকেন তার উপর নির্ভর করে কবে যাবেন বা ফিরবেন। ওরা যাবার সময় গাঁজা আফিম নিয়ে যায়, বিদেশে ওগুলোর লোক লদর।

এই চোরা কারবারের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় ত্রিপুরায় উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি, কলিকাতা, নিউমার্কেট ও শিলিগুড়ি এলাকায়। ত্রিপুরার বাজারে ভারতীয় কাপড় জামা প্রায় উঠে গিয়েছে। স্থান নিয়েছে বাংলাদেশ থেকে আগল করা বিদেশী কাপড়-চোপড়। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত আগলার লোকদের জমিদারী। কলিকাতার রাস্তাঘাটে চীন ফাউন্টেন শেন প্রকারে বিক্রি হয়েছে। এই সমস্ত দেখে মনে সেনট্রাল একসাইজ এণ্ড ল্যাণ্ড কাষ্টমের কাছে কৈকিরুণ চাওয়ার প্রয়োজন মনে করে না সরকার। শিলিগুড়ির শোকানে প্রকারে হটানের মদ বিক্রি

হচ্ছে। ইহাতে লক্ষ লক্ষ টাকার আবগারী
কর নষ্ট হচ্ছে। আবগারী দপ্তর কিছুই
করছেন না।

শ্রাগলি-এর সঙ্গে আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে
সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ নেওয়ার প্রবণতা। ঘুষ
নেওয়ার মুঠু ব্যবস্থা থাকার জন্তই চোরাকারবার
এমন ব্যাপকতা পেয়েছে। একথা আজ গোপন
নেই যে গরিব পথে অর্পলাভের লালসা সরকারী
প্রায় প্রতিটি বিভাগ সংক্রমিত। ঘুষের সাহায্যে
অসাধা সাধন হয়। ঘুষ না দিয়ে চারসত্তর কাজও
হয় না। নিম্ন ও মধ্যবর্তী স্তরের কর্মীদের মধ্যে
গরিব পথে অর্পলাভের ইচ্ছা যুগিয়ে থাকে মূল্যবস্তির
ফলে অতাবের ভাড়াবা কিছু যারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত
এবং উচ্চ আয়শীল, বাসের উপর দেশের শাসন
শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব যারা জাতিকৈর সঠিক ও সফল
নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে নির্বাচিত তাদের মধ্যে
জননীতি পরায়ণতা দেখে জনসাধারণ নির্বাক ও
বিন্দাস্ত। বর্তমানে দিল্লীর রাজনৈতিক আবহাওয়া
এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মনে হয় দেশপ্রীতি
একবারে উবে গিয়েছে। যেনতেন প্রকারে গদি
লাভই হলেনতাদের একমাত্র কাম। ইহার পিছনে
নাকি টাকার খেলাও চলছে। এই টাকার
যোগান দের কারা? কোন নীতি ও আদর্শের প্রতি
সামান্যতম শ্রদ্ধারও মনে ভাব নেই। ইহার পরি-
ণাম ভয়াবহ। কাজেই চোরাকারবার ঘুষ, দলভাগ
এট অসুখ ঐশত হতে দেশকে রক্ষা করার উপায়
কি? স্বাধীনতা লাভের অবাবহিত পর থেকেই যদি
শাসকদল জননীতির বিরুদ্ধে কর্মের ব্যাপক স্থায়ী ও
বিরামহীন সংগ্রাম চাঙ্গিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন
করতেন তাহলে জননীতির এত ব্যাপক প্রচার ঘটতে
পারত না। বক্তৃতার, প্রস্তাবের অনেক আদর্শের বাণী

শুন। গিয়েছে। জননীতির বিরুদ্ধে কর্মের ব্যবস্থা
পরিকল্পনাও করা হয়েছে, কিন্তু কারো কিছু
হয় নাই, ফলে দিন দিন দেশ অবক্ষয়ের দিকে মো
চলেছে। আশার কথা এই জননীতিগত সমাধে
মধ্যেও ১৩ বৎসরের হেলে চন্দন ও শব্দ লালহতে
মত কর্মচারী দেখা যায়। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র না
শিক্ষায়তনের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ২৮ নং টালিগ
রোড, কলিকাতা ১৬ নিবাসী চন্দন কুমার
মজলদার ৩১ ৭-৭২ ইং ইষ্ট বেঙ্গল মার্চে খেলা দেখে
এসে গোটের মুখেই একটি প্যাকেট কুড়িয়ে পায়
প্যাকেট খুলে দেখে সাতশ টাকা। এট টাকা
প্রতি সামান্যতম লোভও স্বরণ করে টাকাটা দিয়ে
দেখ মার্চে কর্মচারত পুলিশ অফিসার ডি, সি, টি, সি
কমলেশ রায়েব হাতে। জিরাড চন্দনের পিট চাপলে
বলেন সাবাস ভাই সাবাস। শব্দ লালহতে ছিলো
কলিকাতা কাটমসের এনিস্টেটে কালেকটর। তা
কাছে সোনা শ্রাগলি-এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল
তাকে কোন প্রলোভনে কাবু করতে না পেয়ে
জয়পুরে গত ৬ই জুলাই সন্ধ্যার বাড়ী কিরার সম
গুলি করে খুন করা হয়। শ্রাগলারদের প্রভাবে
এই খবরের কিনারা এখনও হয় নাই। এই রকম
কর্ণণ গ্রামে গড়ে, সহরে দেখা যায় মাঝে মাঝে
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, অনেক অপপ্রকাশিতই থেবে
যায়। এই সমস্ত নং পট্টা ও সং ও আদর্শবাদ
মামুষগুলিকে সমাজের শাসনে তুলে ধরবে কে?
কে তাদের সংগঠিত করবে? কেন্দ্রের সরকার গঠনের
ভাষাভাষে রাজনৈতিক নেতারা যে করণ্য চরিত্রের
পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাদের প্রতি আস্থা করার
কোন যুক্তি পাওয়া যায় না।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আলোর সন্ধান পাওয়া
যায়। আমরা আশেপাশে ঘাসের দেখছি ওয়া

করের ধারক, কিন্তু যেখানে বিন্দুখলার শেষ
ানে অপেক্ষা করছে শূন্য। এ সুদিনের জন্য
শুধা করতে হবে।

বিদেশী শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার
কোন কোন দেশের মানুষকে ইমানিকালেও
প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে, কত রক্ত দিতে
হে আমরা দেখেছি। আমরাও আমাদের মাতৃ-
র মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কয়েকবারই
প্রেমের পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু স্বাধীনতা
র আত্মা শুধু রণক্ষেত্রেই আসে না। দেশের
সামর্থ্য ও সমৃদ্ধি বাড়ানোর প্রয়াসে যে যেখানে
করছি তার সবটুকু বহু অর্পে স্বাধীনতা রক্ষার
সেই কাজ আমরা যে যেখানে কতখানি
। আন্তরিকতা, সোশালবোধের সঙ্গে করব, সেই
মানেই আমরা যথার্থভাবে স্বাধীন ভারতের
রিক হয়ে উঠব। রাজনৈতিক বল ও নেতাদের ও
চলকালীন প্রতিষ্ঠতির প্রতি নির্ভা থাক।
দর। নেতারা গণতন্ত্রের বুলি মুখেই বলেন,
তপক্ষে দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি পড় নব। সি, পি,
বৈরাচার বিরোধী গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক
। প্রচার করলেও কার্যত: গণতন্ত্রের নামে চল-
তে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যার দাপটে বিচার-
পর্যন্ত অস্তিত্বই হয়ে .৮.৮.৯ ইং শনিবার

সরকারের কাছে ক্ষাতিবিচারের দাবী জানিয়ে মহা-
করণে মুখামস্তী জ্যোতি বসুকে এক স্মারক লিপিতে
অন্তরোধ জানায়েছে। বিচার ব্যবস্থার রাজনীতির
অনুপ্রবেশ বন্ধ করুন, জেলা জজ পথে সরাসরি আর
নিষেধ করবেন না। কাজেই সর্বত্র একটু অবস্থা
হতে পারত না। কেন্দ্রেও এটি গোঁজামিল সরকার
গঠিত হতে পারত না। তবুও আশা করব এটি
রাজনৈতিক নমনে শুধু হলানলই নয়, অদৃষ্টের সঙ্কটও
যেন আমরা পাই। আমাদের স্বরণ করিয়ে দিবেন
আমরা কোন পথে চলছি। আমাদের মনে করিয়ে
দিবে আমাদের স্বাধীনতা। লাভের ৩২ বংসর কেটে
গেলেও সামান্য এগিয়েছি, আরও অনেক কর্মকাণ্ড
পপ এগুতে হবে। তার জন্য চাই দেশপ্রেমের নতুন
লশব, নতুন উদ্দীপনা, নতুন সঙ্কল গ্রহণের সাহস।
এতদিন আমরা কি করেছি সেই বিলোপ নয় হিসাব
করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি করতে চাই,
সেই বিষয়ে চেতনা ও সচ অংশবিন্যাস। আন্তর্জাতিক
রাজনীতির অবিলম্বে আরও আমরা যেন আতঙ্ক
না হয়ে পড়ি। সেই জন্য আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য
ও দেশের স্বাধীনতা। লাভে ও রক্ষার্থে শত্রুত্ব
লহীদের মর্মান্বী স্বরণ করতে হবে, তুলে ধরতে হবে,
ইহাই আমাদের এগুবার পাথরও মুক্তির পথ।

— — —

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

রাষ্ট্রপুরু হুরেজ্জ নাথের স্মৃতি কথা

['A Nation In Making' গল্প থেকে অঙ্কিত]

অমরনাথক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাসগুপ্ত

(বহিঃশাল সম্মেলনের পরে)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এমন সময় জীবনাধসান ঘটল যখন দেশের মহান
প্রয়োজন সাধনের উপযোগী এক সম্ভাবনাময় জীবন
তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। তার মৃত্যু তার বহুগণ
ও গুণগ্রাহীদের হৃদয়ে এক অপরিদীপ্য লোক বহন
করে আনল, আর দেশের পক্ষে তা হল নিরাকরণ
ক্ষতিকর। মি: হুজ্জ ছিলেন একজন বাঙালী
মুসলমান, পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার লোক। তিনি
ছিলেন অল্পকোডের গ্রাডুয়েট এবং কলকাতা হাই-
কোর্টের একজন ব্যারিষ্টার। বঙ্গভঙ্গ চূড়ান্তরূপে
ও স্বাধীনভাবে কার্যকরী হওয়ার পরে যে কজন
মুসলমান তার বিরোধিতা করেছেন মি: হুজ্জ ছিলেন
তাদের মধ্যে একজন। রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-
মুসলমান একো তার বিশ্বাস ছিল অটুট। দেশ
বিভাগকে তিনি একটা জাতীয় বিপর্যয় বলেই মনে
করতেন। কারণ এর এলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে
বিক্রোধের সৃষ্টি হবে; বাংলা ভাষাভাষী জনগণের
সংহতির মধ্যে তা বাংগার সৃষ্টি করবে এবং তাদের
রাজনৈতিক প্রভাবকে ক্ষয় করবে। এক সময়
তার এই অভিমতের জন্য তিনি তার সম-ধর্মীদের
মধ্যে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি
তা কাটিয়ে উঠেন এবং এই দেশে সম্ভাব্য লাভ
করেছেন যে তিনি যে মতবাদে বিশ্বাস করেন এবং
যে মতবাদ তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার করে

আসছেন তারই জয় হয়েছে। এর পরে তিনি তার
বিরূপে সম্ভাব্যদের একজন নেতাক্রমে স্বীকৃতি লাভ
করেন। শারীরিক সামর্থ্যের দিক থেকে মি: হুজ্জ
একজন অক্লিশালী লোক ছিলেন না। তার উপরে
বাংলাদেশে অমুদ্রিত সংচেয়ে ঘটনাবলি কন্-
ফারেন্সকে কেন্দ্র করে তাকে যে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ
পোহাতে হয়েছে তাতেও তার স্বাস্থ্যের উপরে
আঘাত লাগে। কিন্তু সে সমস্তই তিনি স্বীকার
করে নেন। তার স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা যা তাকে
তার দেশ-সেবার কাজে একটা বৈশিষ্ট্য দান
করেছে—তাই তাকে এ সমস্ত সহ্য করার ক্ষমতা
দিয়েছিল।

বহিঃশাল কনফারেন্স সম্পর্কে সরকার যে সমস্ত
কাণ্ড করেছে তা যে কেবলমাত্র এই বাংলায়ই
শিক্ত সমাজের মধ্যে ঘোবের ভাব সৃষ্টি করে,
তা নয়; অজ্ঞাত প্রদেশেও তা পরিব্যপ্ত হয়।
মজাজের এসুপানেডে এক বহু লোক সমাকীর্ণ ও
বেশ প্রভাব বিস্তারকারী জনসভা হয়। ১০
হাজারেরও বেশী লোক উদ্ভূত আকাশের তলে সেই
সভায় সমবেত হয়। এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাওয়া
গিয়েছে তাতে জানা যায়; 'সভার নির্দিষ্ট সময়ের
বহু-পূর্ব থেকেই স্রোতের মত দলে দলে লোক
বন্দেমা'ভরম্' ধনি সহকারে সভাস্থলে সমবেত হতে

থাকে।' কৃশাসক্তরা জাতির অগ্রগতিতে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সাধন করে দেয়। তারা যুগান্ত সিংহকে উত্তেজিত করে তার ক্ষমতা থেকে তাকে জাগ্রত করে। তারা জনমতের অভিযান্ত্রিক সত্ত্বকে করে তোলে ও জাতীয় ঐক্যবোধকে পরিশোধন করে। স্থপরিচিত জন-নেতাগণ সভার কাজে অংশ গ্রহণ করেন। বরিশালের কর্তৃপক্ষের জুলুমবাজির প্রতিবাদ করে সভার এক প্রস্তাব আনা হয়। প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন অনারেবল নবাব সৈয়দ মাসুম বাহাদুর আর সমর্থন করেন ডাঃ নায়াব। প্রস্তাবটিতে বরিশাল কর্তৃপক্ষের জুলুমবাজিকে এই ভাবে ব্যাখ্যাত করা হয় যে ইহা 'ব্রিটিশ প্রজাপক্ষের স্বাধিকার নিরাকরণভাবে ভঙ্গ করেছে এবং সরকারের নিয়ম তাত্ত্বিক দাঙ্গা নীতিকে ধ্বংস করেছে।' সভার পক্ষ থেকে ভারত সচিবের নিকট এক কেবলগ্রাম পাঠান হয়। কেবলগ্রামে 'একজন জনপ্রিয় নেতার প্রেরণা এবং কয়েক হাজার লোকের এক ব্যক্তি সম্মেলনকে জবরদস্তি করে পুলিশ লাগিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার প্রতি ভাৎসনিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য ব্রিটেনের স্বাধীনতা নীতির প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করতে এবং এই অজ্ঞার কাজের জন্য দাবী সরকারী কর্তব্যবাদের প্রতি শান্তি বিধানের জন্য সহায়ত্বপূর্ণ নির্দেশ দিতে প্রার্থনা জানান হয়।

কিন্তু কড়ের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। সেখানে প্রচণ্ড ঘূর্ণী কড়ের বেগে তা প্রকাশ পেল। প্রায় যোঝাই কলকাতা বোম্বারে সভা হতে থাকে। মক্খলও শিঙনে পড়ে বইল না। সেখানেও কলকাতার অঙ্গসংগে সভার অনুষ্ঠান চলতে থাকে। একতপক্ষে বরিশালের পুলিশ যে সব কাণ্ড করেছে

তার কাহিনী শাবানলের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং জন-চিত্তকে অস্থিত করে ফেলে। যে সব লোক গণ-আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তারাও স্বদেশী সত্ত্ব গ্রহণ করলেন এবং সৈন্যনির্ভর জীবনে তা পালন করতে লেগে গেলেন। নিয়ালয় নিকৃতে যারা সারাঞ্চ পুঁথির মধ্যে ভুবে থাকেন, যারা সন্তোষী মত উদাসীন জীবনবাগানে অভ্যস্ত তারাও তাদের নিকৃৎ গৃহ কোণ থেকে যেখানে এসে আগ্রহ সহকারে 'স্বদেশী'তে লেগে গেলেন এবং দেশ বিভাগ বিরোধী বিক্ষোভে নেমে পড়লেন। এক বিশাল জন সভার অনুষ্ঠান হল রায় পঞ্চপতি নাথ বস্তুর বাড়ীতে। এত বড় জন-সভা ১৬ই অক্টোবরের পরে আর হয়নি। এই সভা হরেচিল উদ্বুদ্ধ আকাশ-হলে এক শূণ্যস্থ প্রাঙ্গণে। সভা প্রাঙ্গণটি লোকে এমন সাদাসিঁড়িভাবে ভরে গিয়েছিল যাতে শ্বাসকণ্ড ইচ্ছার মত অবস্থা দেখা দেয়। রায় নরেন্দ্রনাথ সেনকে সভাপতির আসনে বরণ করা হল। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার তৎকালীন নেতা-দের মধ্যে সবচেয়ে নরমপন্থী। তিনিও বরিশালের ঘটনাকে বিবৃত করে বললেন যে 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে এর নজির মেলা কঠিন।' তিনি বললেন 'সংবাদপত্র ও সভামঞ্চ হচ্ছে জনগণের অদম্যোত্তর বাষ্প নির্গমনের কেন্দ্র।' তিনি আরও বললেন 'যখনই সেট সংবাদপত্র ও সভা মঞ্চকে দমন করতে চাও তা হতেই তখনই অরাজকতা দেখা দিয়েছে।' তার এই কথাগুলি ভবিষ্যৎ বাণীর মত পরবর্তী ঘটনাবলীতে তা প্রমাণ করেছে।

অচিরেই বাংলাদেশে অরাজকতাবাদী বা বিপ্লব-বাদী আন্দোলন দেখা দিল। অরাজকতাবাদ ও বিপ্লববাদ—কথা দুটিকে ঘেন কিছুটা ঢিলাভাবে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই

অরাজকতাবাদ বা বিপ্লববাদ দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত ব্যাপক অসন্তোষের পরিণতি রূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সরকার যে নীতির অনুসরণ করে আসছে তাইই ফলে সেই অসন্তোষ আরও গভীর হয়ে দেখা দেয়। সরকারের সেই নীতির সবচেয়ে প্রকট দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিনা প্রয়োচনায় ডেলিগেটের উপরে মারপিট এবং কনফারেন্স ভেঙ্গে দেওয়া। বঙ্গভঙ্গ যে কেবলমাত্র একটা শাসনতাত্ত্বিক ব্যবস্থাকল্পে দেখা দেয় তা নয়। এটা হচ্ছে দাওয়াল ক্রিটিক শাসনের ঐতিহ্যের সহিত অপরিচিত একটা নতুন নীতির নিদর্শন। এই নীতির অনুসরণ করে মনমূলক কার্য চলতে থাকে। ‘কমেন্সী’ কমি ও প্রচারকদের নামা বকম মামলায় মোপর্ন করা হতে লাগল, তাদের উপর নামা প্রকার নিষায়ে চলতে থাকে; প্রকৃত স্থানে জনসভা নিষিদ্ধ করা হল; নিরুপাট, শাস্তিপূর্ণ, গন-বহুল অফলগুলিতে মিলিটারী পুলিশ মোতায়েন করা হল। তারা শাস্তিপূর্ণ নাগরিকদের উপর মারপিট চালাতে থাকে। বরিশাল জিলার বার্গারি পাড়ায় গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করা হল তাদের অত্যাচারে স্থানীয় অনেক লোক গভীর উবেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্ত্র চলে যেতে মনস্থ করেন; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কমেন্সী সার্কেলার প্রকাশ করার জন্য রাজহোশের মামলা রুজু করা চলতে থাকে। বরিশাল জিলার সর্বজন-মস্ত নেতা বাবু অমিনীসুয়ার দলের বিরুদ্ধেও এই বকম একটা মামলা রুজু করা হয়।

এই অত্যাচার উৎপীড়ন চরম হয়ে দেখা দিল যখন ডেলিগেটের উপর অক্রমণ চালিয়ে বরিশাল কনফারেন্স ভেঙ্গে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গেই অরাজকতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

এবল উবেজ্জতার জনচিত্তের আবেগ ফেটে পড়ল। সব দেশেই ঘূর্ণিত হল সবচেয়ে বেশী অস্থিতিশীল। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ঘটনাক্রী তাদের নিয়ম-তান্ত্রিক পথে চলার বিশ্বাসকে নাজা দিয়ে শিকল করে দিল এবং তাদের হতাশার মুখে ঠেলে দিল। একটি ঘটনার ভিত্তর দিয়ে আমি নিজে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার ভিত্তিতে বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত কখন হয় তার সময় নির্দেশ করতে পারি। একথা বলতে আমার কোন ঘিবা নেই যে বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা এবং তার পরে সরকার যে নীতির অনুসরণ করে চলেছে, তাই হচ্ছে আমাদের প্রদেশে এই আন্দোলনের মূল কারণ। তবে অর্থনৈতিক অবস্থাও নিঃসন্দেহে এই কারণকে শক্তিশালী করেছে। বরিশাল কনফারেন্স ভেঙ্গে দেওয়া ও তার সঙ্গে সঙ্গে যে উচ্ছ্বলতা ও অত্যাচারের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হল, তাই এই বিপ্লবী আন্দোলনকে জাগিয়ে তুলেছে, এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। কারকটি ঘটনায় আমার সে বিশ্বাস জন্মেছে। সে ঘটনার কথা এখন এখানে উল্লেখ করছি।

বরিশালের ঘটনার পরে একদিন সন্ধ্যার সময় আমার বারাকপুরের বাড়ীতে ছুটি যুবক আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তারা গোপনে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমি ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বলে উঠলো যে এটা একটা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন ব্যাপার; তাই তারা দখল বন্ধ করে কথা বলতে চায়। দরজা বন্ধ করে আমরা তিন জনে ঘরে বসলাম। যুবকদের মধ্যে একজনকে দেখে যখন হল যেন সে ডাক্তারী পড়ার ছাত্র। সেই আলোচনা শুরু করল। সে বলল, “আমরা আপনার কাছে এসেছি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার উপদেশ নিতে। আমরা স্থায়

চ্যামফিড কুলারকে গুলি করে হত্যা করার একটা
 যান করেছি। এই উদ্দেশ্যে আমরা আজ
 যাত্রা...বন্দনা হয়ে বাড়ি। আপনি এবিষয়ে কি
 বলেন?” আমি এরকম কথা-বার্তার জন্য প্রস্তুত
 ছিলাম না। তা ছাড়া প্রস্তাবটিও এমন একটা
 দ্ব্যর্থবোধক প্রস্তাব যে প্রথমে আমি একটু ধতমত
 হয়ে গেলাম। আমি বললাম, “তোমরা কুলারকে
 গুলি করতে চাও কেন? সে কি করেছে?”
 একটি স্পষ্টতই গভীর আবেগের সহিত উত্তর করল
 ‘বার্ণারিপাড়ার মোতাম্মের তার গুণী সৈস্তরা
 আমাদের কয়েকটি মেয়েদের উপর অত্যাচার
 চালাচ্ছে। আমরা তাঁর উপর প্রতিশোধ
 নেতে চাই।” আমি বললাম, “তাহলে তোমরা
 স্কটল্যান্ড দ্বারা পড়বে এবং তোমাদের ফাঁসি হবে।”
 তারা তখন বলল ‘তাকে হত্যা করার একটা
 যোগ আমরা নিতে চাই। আমাদের মেয়েদের
 যান বন্ধার জন্য প্রয়োজন হলে আমরা সে জাহাজের
 ক্ষয় প্রস্তুত।” এ সময়ে আমি যে বিরূপ একটা
 দৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেলাম তা যে কেউ কল্পনা করতে
 পারেন। আমার এই সঙ্কটজনক অবস্থার চেয়ে বড়
 ছোট আর কিছুই হতে পারেনা। আমার সামনে
 সে দুটি যুবক—তাদের দেশের মেয়েদের উপর
 অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে পূর্ণ সম্মত। হাটন
 । এর কোন প্রতিবিধান করবে, সে বিশ্বাস এরা
 দিতে কৈলোছে। এদেরই আবার সেই কাজ থেকে
 মাঝেকই প্রতিনিরুত্তর করতে হবে। আমার
 গায়েই এই সময় একটা জোর গুলব আমার
 নো এসেছিল। সে গুলবটির বেশ ভিত্তি আছে
 লই আমি বিশ্বাস করেছিলাম। গুলবটি হল এট
 ‘স্টার ব্যামফিড কুলার পদত্যাগ করেছেন। আমি
 কবের বললাম, “তোমরা জান যে স্টার ব্যামফিড

কুলার পদত্যাগ করেছেন? একজন যুব ব্যক্তিকে
 গুলি করার কি লাভ? অপরপক্ষে তোমাদের এই
 প্রয়াস জনস্বার্থের পক্ষে আশু বিপর জেত আনবে।
 আমরা সকলেই চাই, তিনি যেন আর লেপ্টেজাট
 গভর্নর না থাকেন। যদি তোমাদের এই কাজে
 তোমরা ব্যর্থ হও—আর তোমরা নিশ্চিতভাবে বলতেও
 পারছ না যে তোমরা সফল হবে—তা হলে এটা
 নিশ্চিত যে তিনি তার পদত্যাগ পর প্রত্যাহার করে
 নেবেন এবং তার কাজে তিনি বহাল থাকবেন।
 তোমরা কি তোমাদের দেশের প্রতি এই অহিতকর
 কাজটি করতে চাও?”

এই কথার তারা দ্বন্দ্ব হল। যুবকদের তৎক্ষণাৎ
 তাদের সে চিন্তা ও প্রস্তাব পরিত্যাগ করতে বাজি
 হল। তাদের এই সম্মতিকে আমি আরও
 পাকাপোক্ত করে দিলাম। আমি বললাম, আমি
 ব্রাহ্মণ, আমার পা তুয়ে তাদের প্রতিজ্ঞা করে বলতে
 হবে যে তারা সে চিন্তা ও প্রস্তাব পরিত্যাগ করেছে।
 সঙ্গে সঙ্গে তারা তা করল। আমি যেন হাস কৈলে
 বাঁচলাম। এর পরে আবার আর এক সমস্যা দেখা
 দিল। তারা বলল যে যে ভাষাচার কুলারকে গুলি
 করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে সেখানকার সব
 বন্দোবস্ত বাতিল করার জন্য তাদের তত্বনি সেট
 রাইয়ের বৈধনই সেখানে হেতে হবে। কিন্তু তাদের
 সঙ্গে টাকা নেই, তারা আমার কাছে টাকা ধার
 চাইল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তা দিলাম। তাদের
 কোন পরিচয় আমার জানা ছিল না, অল্প পয়সা
 আমি জানি না তারা কে? কারণ আমি কোন
 সময়েই তাদের নাম জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু আমি
 এটা বৃত্তে পেরেছি যে তাদের বিশ্বাস করা যায়,
 এবং সে বিশ্বাস যে ঠিক, তাও প্রমাণিত হয়েছে।
 তারা ডাকবোলে আমার টাকা ফেরৎ দিয়েছে।

কি ধরনের চিন্তাধারা তখন গড়ে উঠছিল, বাংলার কিছু সংখ্যক যুবকের মনে, হয় ত বা তাদের অজ্ঞাত-সারেই, এক গভীরতর অসুস্থতির অন্তঃপ্রেরিত কি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, এই ঘটনার তা বোঝা গেল। অরাজকতাবাদের প্রতি কারণ কোন সহস্র-সুস্থি থাকতে পারে না। খুন খুনই তা তাকে যে নাম দিয়েই মোলঃহেম করার চেষ্টা করা হোক না কেন বা তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কারণ দেখিয়ে মার্জন। করতে চাওয়া হোক না কেন। কিন্তু প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাজের ফলে যে অবিস্বাস, যে নৈরাশ্র ও অসহায়তা বোধের অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা যেন কোন অগামী দিনের ঐতিহাসিকের দৃষ্টি না এড়ায়। কোন ব্রিটিশ ঐতিহাসিকই লক্ষ্য রাখা না করে এর উল্লেখ করতে পারবেন না।

এই ঘটনাগুলির কথা আমি এখানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম: তার অল্প কয়েক দিন পরেই মেদিনীপুরের নিকট নরসিমপুরে লেক্টেন্যান্ট গভর্নর স্যার এন.ডু. ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। বঙ্গ ভঙ্গের বিধি-ব্যবস্থা যারা প্রশরণ করেছিলেন স্যার এন.ডু. ফ্রেজার ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। যতদূর স্মরণে আসে আমাদের শাসন-কর্তাদের মধ্যে সব চেয়ে অগ্রিয়তাজন ব্যক্তিরই মধ্যে তিনি একজন হয়ে পড়েছিলেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশে কোন চাকরী নিয়ে আসেন নি। তার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল মধ্য প্রদেশকে নিয়েই সীমাবদ্ধ। লেক্টেন্যান্ট গভর্নর হয়ে আসার আগে তিনি ছিলেন পুলিশ কমিশনের প্রেসিডেন্ট এবং তার সুপারিসগুলি কটোর সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল। এমন কোন পূর্ব সংস্কার বা ধারণা নিয়ে তিনি বাংলায় আসেন নি বা তার পক্ষে যেতে পারে। এই প্রদেশে তার শাসন তার বিরুদ্ধে এক

প্রচণ্ড কঠিকের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। জনসাধারণের মধ্যে এই রকম একটা বিশ্বাস গড়ে উঠলো যে তিনি বাংলাকে বিভক্ত করার নিশ্চেষ্ট নিয়েই এখানে এসেছেন। ফলে স্বভাবতই তাকে অগ্রিয় হতে হয়েছিল, কারণ জনসংখ্যার কাছে ব্রিটিশ শাসনের সব চেয়ে অগ্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে অস্বস্তিকর এই ব্যবস্থাকে চালু করার জন্য হাতিয়াররূপে নিযুক্ত হয়ে তাকেই কাজ করতে হয়েছিল।

এই সময় মেদিনীপুরে জিলা কন্সটারেল অস্থ-স্থিত ছিল। ফ্রেজারের ট্রেন যেমনই অকোম্ব হয় সেই একই সময়ে প্রায় একই দিনে মেদিনীপুরের এই কন্সটারেলসেও পণ্ড করে দেওয়ার চেষ্টা চলে। যারা এনাকিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বলে একটা প্রবল সন্দেহ ছিল তাদেরই কয়েকজন এই কন্সটারেলসেও পণ্ড করার চেষ্টা করেন। কন্সটারেলসে সভা-পতিয় করছিলেন মেদিনীপুরের মেট সমরকার সর্জন পরিচিত নেতা মি: কে, বি, দত্ত। তিনি যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন বাবু বাবু তাকে বাবা দেওয়া চলতে থাকে। আমাকে অতিথিরূপে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এই রকম এক অব্যাবহিক দৃষ্ট দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সহায়তায় এবং মি: দত্ত ও আমার নিজের চেষ্টার ফলে আমরা পরিশেষে সভার শান্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলাম এবং সভার কাজ পুনরায় আরম্ভ করলাম। কিন্তু বা ঘটনা গেল তা আমার কাছে একটা কিছু অস্বনিহিত ব্যাপারের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হুল এবং এক মাস পরে আরও বড় আকারে নরট কংগ্রেসে বা ঘটনাকে এটা ছিল তাইই পূর্ণাঙ্গ। বিশৃঙ্খলার সবচেয়ে লক্ষণগুলিকে যেন বজাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হল, এবং তা করলেন কর্তৃপক্ষীয় লোকেরা। নিজেরাই এক নতুন

গড়ে তোলা বৃহৎ প্রদর্শন। লোকের মনে বৈধ উপায়ের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হইবে বেশ; উৎসাহী যুবকদের মন হতাশায় মোড় বেঁটে লাগল, অথচ তারা দেশের সেবা করতে প্রস্তুত উৎসুক। এই অবস্থায় তারা যুবকদের নির্দেশ, উপদেশ অগ্রাহ্য করে হিংসা ও বে-আইনী কান্ডের ভয়ঙ্কর পথে পরিচালিত হল।

এই বকম একটা ভড়ি: প্রবাহ স্পৃশের মত পরিহ্রিতির মধ্যে ১৯০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে হুগাটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল নাগপুরে। কিন্তু নাগপুরে তখন একটা উচ্চমূল্যের ডামাডোল চলছিল। সেই অবস্থায় মধ্যে বোম্বের কংগ্রেস নেতাজন নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করলেন না। তাই হুগাটে স্থানান্তরিত করা হল। কিন্তু রেপের মূল অতি গভীরে। গোগের জীবন সংক্রামিত হয়েছে পূর্ববঙ্গ সরকারের বেদানামায়ক কার্যকলাপের ফলে। আমি কিছু বলবার জন্ত দাঁড়ান মাইই সভার আসর থেকে প্রতিবাদের লক্ষণ প্রকাশ পেল। স্থার রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি পদে বরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করার কাজটি ছিল পূর্ববর্তী কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে আমারই কর্তব্য। এর আগেও আমি কয়েকবার সাধারণভাবে কংগ্রেসের সম্মতি ও অনুমোদন নিয়ে এই বকম কাজ করেছি। এবারে আর তা হল না। মেরিনোপুর সম্মেলনের গওগোল ধামানোর ব্যাপারে আমার কিছুটা হাত ছিল। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে বিরোধীরা আমার কাজে বাধা দানে উচ্চসী হলেন। আমার বক্তব্য ধান কালে বারে বারে আমাকে বাধা দেওয়া হতে থাকে যাতে আমি আমার বক্তব্য পেশ করতে না পারি। এ অভিজ্ঞতা আমার কাছে বড়ই

অবাধ্যবিক বলে মনে হল। কারণ বক্তারূপে আমি কংগ্রেস মঞ্চে ঝড়ালেই তা সাধারণত: একটা চাপা নিম্নকতার ইঙ্গিত বহন করত। প্রথমেই হত হর্ষ ধ্বনি; সেই হর্ষ ধ্বনি শেষে গেলেই আস্ত নীরবতা।

কংগ্রেসের মধ্যে একটা শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিল যারা চেয়েছিলেন মি: তিলককে সভাপতি করতে। স্থার রাসবিহারী ঘোষকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তারা বরণাত করবেন না। তাতে যদি কংগ্রেস ভেঙ্গে যায় তাও ভাল, কিন্তু স্থার রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হতে পারবেন না—এই ছিল ঐ গোষ্ঠীর মনোভাব। কল কংগ্রেস ভেঙ্গে গেল। নেতানের প্রতি চেয়ার, জুতো, চটি সব ছুঁড়ে মারা চলতে লাগল; মকের লপর সব হুড়ুড় করে এসে উঠে পড়ল। আমি মকের উপরই রইলাম। কয়েকজন বন্ধু আমার চারদিকে ঘিরে রইলেন আমাকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্ত। স্থার ফিরোজ শা মেটা ও আরও কয়েকজন সহ আমাকে পিছনের দিকে একটা তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হল। পুলিশ এসে সভামণ্ডপ খালি করে দিল। এই ভাবে কংগ্রেসের ইতিহাসের একটি শরণীয় অধ্যায় শেষ হল। এর পরেই স্তব্ধ হয় আর এক নতুন অধ্যায়।

বাংলার প্রতিনিধিগণ আমার প্রতি এই অসম্মানজনক আচরণ করার মনে খুব আঘাত পেলেন এবং অগমানিত বোধ করলেন। এক ঘটনার মধ্যেই তারা এক সভা ভেঙে আমার প্রতি তাদের অস্থা জ্ঞাপন করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের প্রতিগণও চূপ করে রইলেন না। তারাও একটি সভায় মিলিত হলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা-আলোচনা করে একটি মঠনতন্ত্র প্রণয়ন (বাকী অংশ ৩৫ পাতায়)

ক্যানসার

(১৬ পাতার পরের অংশ)

সেটাও উল্লেখ করা হল। কিন্তু সে যদি কর্তব্যে অবহেলা করে, যদি উৎপাদন না বাড়িয়ে কমায় যদি দেশকে বিপদগ্রস্ত করে, যদি মূলধন সংগঠনে বাধার সৃষ্টি করে, তবে কি শাস্তি দেওয়া হবে সেবিষয়ে কিছুই বলা হল না।

এই টোড ইউনিয়ন আইনটা খুবই ভাল, কিন্তু ভাল ছিল সেই অসীত হুগের মানুষদের পক্ষে; চিরদিন তাদের চাকরীর বোঝে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে চাকরী হারাবার বিচারিকা মাথায় নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। তাদের পক্ষে এটা ছিল উপযোগী; সে জেনারেশনের মানুষ তো এখন নেই। এসেছে নতুন জেনারেশন। সে যুগের অবস্থার সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই এ যুগের মানুষদের। কথার প্রতিবন্ধিতার তিক্ত-মধুর স্বাদ এরা পায় নি। এরা শুধু শিখেছে 'আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ' কারো গোলাম নই। নিজের চিন্তা বা কাজের উপরে সংযম ও নিয়ন্ত্রণ যে গোলাম নয়, নিজের আত্মবিকাশের ক্ষতিই এটা প্রয়োজন, সেটা এদের মাথার প্রবেশ করে না। ডিসিগ্লিন হাড়া কোন কাজই যে স্ফূর্তিরূপে সম্পন্ন করা যায় না, সে কথা বেন এরা শোনেই নি।

যে কোন জীবিকার কথাই ধরুন। ব্যবসায়ী আইনজীবী বা চিকিৎসক, স্বাধীন ব্যবসায়ের বাসের প্রকৃতি ও প্রায় দুনিয়ার মানুষের ইচ্ছার কারণ, গভীর অভিনিবেশ বাড়িয়েকে তাদের কেউ কি সফলতার শিখরে আরোহণ করতে পেরেছেন? তা যদি পারতেন তবে তো সকলেই বড় উকিল বা নাম-কাজা ডাক্তার হয়ে বাড়ী হাকতেন। অত সব বড় বড় মানুষদের কথায় কাজ কি, আমাদের মত ছোট

মানুষদের কথাই ধরুন না। 'বিপ্লবী বাংলা' এই যে ছাত্র লিখি সে ক্ষত কি সোজা পরিশ্রম করতে হয়? সাদা কাগজের challenge বড় কঠিন challenge কালির আঁচড় দিয়ে ভরে ফেলা চাউখানি কথা নয়। বিষয় বস্তু বাছাই করা ইন্টিগেলি develop করা এবং উপযুক্ত শব্দটি খুঁজে বের করে বসিয়ে দেওয়া যথাস্থানে, বিশ্বাস করেন এতে প্রচুর পরিশ্রম। তবু তো জিল যেতে হয় মাঝে মাঝে আপনাদের কাছ থেকে।

বাকির ক্ষেত্রে ডিসিগ্লিন অপরিহার্য সমষ্টির ক্ষেত্রে অতোটা নয়। দলের দু একজন মানুষ অলস বা কঁকিবাড়ি হলেও সমষ্টির কাজ চলে যায়। ছুগের পুত্রে দু এক ফোঁটা জল ধরা পড়ে না। কিন্তু তাই বলে আপনি কমী, আপনারও ভেবে দেখা স্বরকার, মাসের পর মাস যে মাইনে নিচ্ছেন, সে কি শুধু হাজিরা বইতে সেই দেবার জন্ত? পরিবর্তে আপনার কি কিছু করণীয় নেই? আপনার আত্মগম্যনে কি সেই কথাই বলে?—অনেকেই সেটা বোঝেন, এবং মোটামুটি কাজ করে থাকেন। না যদি করতেন, তবে তো administration এর চাকা খেঁদে যেত।

আবার এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই, যে চাকরী ব্যারাই করেন, তাঁদের অনেকেই ফাঁকিবাঁজ; কোন কর্তব্য আছে বলে মনে করেন না। সকালে কাগজ খুললে, বে নৈরাত্তের পরিচয় পাই রাজনীতির খেলোয়াড়দের মধ্যে আফিসি কাছারীতে বাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়লে, অবিকল সেই বস্তুটিই দেখতে পাই সেখানে। বিশ্ববিজ্ঞানযে তো বাওয়ার দরকার হয় না, তবে শুনেছি সেখানেও ঐ একই শাল। মাসে একদিনও পড়াশুনা হয় কিনা সম্ভেদ। ছেলেরাও তো পড়াশুনা করতে আসে না, আসে

পার্টি করতে আর পাশ করতে। তারপর তারা যখন চাকরীর জগতে প্রবেশ করেন, তখন নুটে জটেন 'wild at strike' করেন গুণাগুণে। কার্ভের delivery date ভেঙে দিয়ে 'পাওয়ার' দেখান। আর তাদের পেছনে হাল ধরে থাকেন পেশাদার 'লোবার সীডার', বাসের খসিতে শুধু পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। অতো টাকা দেবার শক্তি আছে কিনা কার্ভের হিসেব করেন না। একটি চালু কার্ভ বন্ধ হয়ে গেলে, কতো মূলধন যে Block হবে পড়বে, কতো অমিক যে পথে পথে ঘুরবেন, কতো বাড়ীতে যে উছন ধরবেন না, বেশ যে কতো পেছনে পড়ে যাবে, সে সব কথা ভেবে দেখেন না। কলকাতার চারদিকে এতো Sick industry যে খাবি যাচ্ছে, তার সবকটির তুর্দশার কার্ভই এই রকম অববিবেচনা। পাইয়ে দিতে গিয়ে, শেষ করে দেওয়া।

বিদ্যায় নেই কারখানায় কাজ হয় না, তবু বেতন দিতে হয় অমিককে। যে পণ্য উৎপন্ন হল না, তার জন্য পারিশ্রমিক দিতে হল। শেষে খরচ বজায় কসল নষ্ট হল, তবু কৃষককে টাকা দিতে হল। রিলিকেই হোক, ডোলেই হোক হোক ব্যতির ন্য হিসাবে। যে কসল উৎপন্ন হল না, তার প্রতিটি দানা নগদ দামে কিনতে হল কি না। মূলধন বা করিয়েছিলাম নতুন কারখানা খুলবার ক্ষমতা দিলাম এইভাবে ক্ষয় করে। পরিকল্পনা করেছিলাম মূলধন সৃষ্টি করব, পাঁচটা নতুন কারখানা স্থাপিত করব, পকাশ হাজার বেকারের অর্থ সংস্থান করব। তা হল না। মানলাম কয়েক হাজার মানুষ খেয়ে বাঁচল, কিন্তু যে পকাশ হাজার বেকারের মুখের সামনে জীবনের খোলা দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তাদের কথাও ভাবতে হবে। তখন ভয়াবহ অন্ধকার হুড়ুস

পঞ্চশিই হয়ে উঠতে লাগল তাদের বাঁচবার প্রসঙ্গ পথ। বাধীন পথ। বাধীন ভারতে নব নব বাধীন ব্যবসার পথ এইভাবেই আমরা খুলতে সাহায্য করেছি।

ক্যানসারের সর্বগ্রাসী কৃৎস্না রাহুর মত সমগ্র দেশটাকে গ্রাস করে ফেলছে। ভারতই কলে উপর জলার এক লক্ষাধীন লালসার প্রকাশ, আর নীচের জলার আর এক বাধাবন্ধীন নৈবাত্তোর বস্তা।

(৩০ পাতার পরের অংশ)

করলেন। এই গঠনভঙ্গের প্রথম দিকটিই পরবর্তী কালে কংগ্রেসের মূলনীতি রূপে পরিচিত হয়। এই দফায় কলা হল যে সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে শ্রায়তশাসন লাভ করাই হচ্ছে কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে খাটি নিয়মতান্ত্রিক বৈধ উপায়ে। কংগ্রেসের সমস্তপন গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেককেই এই মূল নীতিতে সই করতে হবে। যারা কংগ্রেস ছেড়ে গেলেন ঐকদিন ধরে তার। এই মূলনীতিতে সই করতে চাইলেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯১৬ সালে নানা সুবিবেচনার ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এই দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর কর্মীরা লক্ষ্যে কংগ্রেসে পুনরায় একাধক হল। এই কংগ্রেসেই হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে একটা এককোটি ভাব গড়ে ওঠে এবং হিন্দু মুসলমানের এক বৃত্ত বন্ধকারেলে একটি নিয়মতান্ত্রিক শাসন সংস্কারের খসড়া প্রণয়ন করে তা গ্রহণ করা হয়। আমি সেই বন্ধকারেলে সভাপতিত্ব করেছিলাম।

(চলবে)

আমাদের সংবিধান,

রাজনীতি এবং রাষ্ট্রপতির অবদান

॥ অনিল চট্টোপাধ্যায় ॥

আমরা সকলেই জানি আমাদের সংবিধান সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রচিত ও গঠিত। আমরা এও জানি এটি ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতিই অবলম্বন কারণ আমাদের সংবিধান রচয়িতাদের যান ধারণা, রুচি এবং কৃষ্টি ব্রিটিশের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। কিন্তু ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্র-আধুনিক ক্ষণতে সংচেয়ে সুপ্রাচীন এবং বন্দিত হলেও যুক্তি পদ্ধতিটি সেকেন্দ, অঐচ্ছানিক এবং গৌলানিলে ভর্তি। একটা তুদান্ত বন্যহীন ক্ষমতা কিতাবে ঐতিহাসিক অনিব্যর্থাতায় ধীরে ধীরে সমগ্রত্বের পথে গণতন্ত্রের মধ্যে নিজেস্বক রুপান্তরিত করল তার স্বকৃতি দিয়েছে ডলটেয়ার, কালমার্কস এবং লেনিন। কিন্তু তাদের সংস্কারযুক্ত আদর্শবাদের চোখে ব্রিটিশ পদ্ধতি পরিপূর্ণতার অঙ্গন লাগাতে পারেনি।

আমাদের সংবিধান জনগণকে ভোট দেবার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু এই সমগ্র অধিকারকে জনপ্রতিনিধিদের অঙ্গীকার করে নেবার স্বীকৃতি দেবনি। এই অঐচ্ছানিক পদ্ধতি ইংরেজের কায় থেকেই নেবা—ফলে যে প্রকাণ্ড অংশ জনপ্রতিনিধি পেলনা, যারা জাতীয় জীবনে কোন গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার হলনা—গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনে তাদের দায়দায়িত্বের সীমারেখাও রইলনা। আমাদের জনপ্রতিনিধিদের একমাত্র পথ যে কোন প্রকারে

লোককে ভুলিয়ে, ধান্না দিয়ে তাদের স্ব-প্রাধিকার বিস্তারের উপায় উদ্ভাবন করা এতে নীতির বালাই নেই—আদর্শের বালাই নিজ নিজ স্বার্থের মধ্যেই প্রস্ফুটিত। ভ্রষ্টাচার, মিথ্যাচার, নীতিহীনতা আমাদের রাজনীতিবিনদের একমাত্র হাতিয়ার। কালোবাজারী অধ্যুষিত অর্থনৈতিক গঠন এবং শোষণের এরা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। অথচ এই অবক্ষয়ের অস্তিত্ব লোপ পেতে পারে যদি স্বাভাবিক ও ইতালীয় ধরনে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র গঠিত হয়। যদি রাজনৈতিক দলগুলি ব্যক্তিগত প্রার্থীর মাধ্যমে না গিয়ে রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং পাঁচনা ভোটের আনুপাতিক হারে দলগুলি প্রতিনিধি প্রেরণের সুবিধে পায়। এতে সরাসরি নির্বাচনের লটারীর মত অপ্রভোত পেয়ে ক্ষমতা লাভ করার সুযোগ থাকেনা। এবং সুবিধাবাদ, দলত্যাগ, জুলুমবাজী, এবং ব্যক্তি প্রাধান্যের বাসনা কমে যাবে এবং যার ফলে দেশ সেবা একটা লাভজনক ব্যবসারে পরিণত হয়না। কিন্তু এত হল যা হওয়া উচিত ছিল অথচ সংবিধানে নেই তা লিখে মজামত জ্ঞাপন যায়।

বর্তমানে আমাদের রাজনৈতিক নীতিহীনতা এন্ধিনে দিল্লীর রাজনীতিকের প্রাস করেছে—মেঘান থেকে সেই ‘বর্নন পণ্ডিতের গুরুমাত্রা চেলার’ হস্তকার শোনা যায়—যার দাবী হল ‘ব্যাক্যায় করিতে

পারি উলট-পালট' এবং সেটা হল আমাদের সংবিধানের কয়েকটি সূত্রের ব্যাখ্যা—আমলে সংসদীয় গণতন্ত্র শুধু সামান্য কয়েকটি সূত্রের ওপর নির্ভর—এতে মোস্তাফিজ বিহারের কোরামতী দেখাবার সুযোগ সামান্য—সবটাই সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য। প্রধান সূত্র হল—রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষমতার আধার রাষ্ট্রপতি। মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতির নামে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হয় এবং মন্ত্রীমণ্ডলী লোক-নিয়ন্ত্রণাধীন। রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং অগ্ৰা মন্ত্রীরা প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশ অনুসারে নিযুক্ত হন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। এবিষয়ে রাষ্ট্রপতির কি নিজের কোন ক্ষমতা আছে? বিলতে রাজকীয় এই ক্ষমতার ব্যবহার সাধারণতঃ বিদায়ী প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শেই হয়ে থাকে এবং এটা একটি সাধারণ রুটিন হিসেবেই গণ্য হয়। কিন্তু বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী যদি এ বিষয়ে নৈব্যক্তিক না হন! বিলতে পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রীর থাকার বিরোধী দলপতিকেই আমন্ত্রণ জানান হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সনেই বিলতে একটি বিরোধ দলীয় সম্মেলন হয়েছিল। ঘটনাটা হ'ল, ১৯৭৪ সনে মি: হীথ ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। পার্লামেন্টে তার বিরোধিতা ছিল সামান্য। তিনি পার্লামেন্ট জেগে সিলেন কিন্তু নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলনা। উপরনৈতিক দল কিছুটা শক্তি নিয়ে নির্বাচিত হ'ল। মি: হীথ পদত্যাগ না করে উপরনৈতিক দলের নেতা মি: থর্পের সাথে চিঠির আদান প্রদান করলেন। চতুর্থ দিনে লেবার পার্টির নেতা গার্ডে উঠলেন এবং রাষ্ট্রকে ধমক দিলেন এ বাদ্যগ্রামী বন্ধ করার জেষ্ঠে। সাথে সাথে মি: হীথ

পদত্যাগ করলেন এবং রাষ্ট্র উইলসনকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানলেন।

আমাদের দেশে জহরলাল নেহেরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীনই মাত্রা হান। জহরলালের মৃত্যুর পরে লালবাহাদুর শাস্ত্রী কংগ্রেস সংসদীয় দলের নির্বাচনে দলপতি হন। এবং শাস্ত্রীর মৃত্যুর পরে ইন্দিরা গান্ধী দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমেই দলপতি হন। কিন্তু কার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যুর পরে নতুন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করেন—তা ঠিক জানিনে। আমলে এটা একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার—বা হুজুর। উচিত তাই হয়েছে। স্তব্ধে, আমাদের দেশ নাকি সময়ের দেশকবি পেয়েছেন এখানে বিভিন্ন জাতি একসঙ্গে মীন হয়েছে। তার ওপর আরে আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-ভাণ্ডারের মত আমাদের শিরা উপশিরাই প্রবাহিত। আমাদের দেশ রাজ্যকে শিবিরেছে হুজুর, রাজহুজুর সিংহাসন ত্যাগ করে স্বল্প বেল ধারণ করবে—তাই পশ্চিমের জাগতিক আদর্শ আমাদের কাছে কুহুতিকুহু। আমরা আমাদের স্বকীয় কর্মের স্বকীয় মহিমায় নিজেরাই উদ্ভাবিত। তাই আমি, অনুপ্রাণ এবং অপকল্প শব্দ প্রয়োগে হি টি হুটের ব্যাখ্যা আমরা অদূর স্মরণভাবে প্রাক্কল করে দেখতে পারি এবং দেখাই।

এই অতুল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে এবং তেনে ভ্যাকেনে হুজুরা: র জানে আমরা কখনও কোন কতৃৎপদ থেকে অবসর নেবার কথা কল্পনাও করিনে। ভাবতে পারেন—পশ্চিমের কোন প্রধান মন্ত্রী অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়ে পদত্যাগ করে রাষ্ট্রপতির কাছে পুনরায় নতুন সরকার গঠন করার দাবী জানাতে পারেন এবং সে দাবী না মানার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পক্ষপাতীত্বের অভিযোগ আনেন!

রাষ্ট্রপতি পড়লেন মহাবিপদে—বহুলোক, কোঠ এবং তার ওপর মহাশূন্য, রাষ্ট্রপতি ওই প্রসঙ্গে নির্বাচিত হয়েছেন। মিউ মিউ করে তাই একটা জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলেন, অর্থাৎ দলের বাইরে থেকে ২১ জন লোক নিয়ে সরকার গঠন করলে অনাস্থা প্রত্যাহারের কলহ কেটে যায়। কিন্তু অস্ত্রের কথা শুনবার ক্ষমতা কেউ প্রধান মহা হননা। তিনি রুষ্ট হলেন। নিরুপায় হয়েই রাষ্ট্রপতি বিরোধী দলপন্থিকে ডাকলেন। তিনি কয়েকদিন আলাপ আলোচনার পর রাষ্ট্রপন্থিকে বিদায়ী সরকারের ১নং উপ প্রধান মন্ত্রীকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানাতে বলেন। বিদায়ী সরকারের প্রধানতম দুজনের নেতৃত্বের লড়াইটাই বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ—এদের অতৃপ্তই জনতা পার্টির জয়লয় থেকে আড়াই বছরের একমাত্র ইতিহাস। অল্প একগুয়েমি এবং প্রধান মন্ত্রীদের উৎকট শালসা যদি ব্যক্তির পরিচায়ক হয় তাহলে এরা দুজনেই তুলম্বা ভাবে ব্যক্তিবান।

রাষ্ট্রপতির কাছে বিরোধী দলপন্থির সুপারিশ বিদায়ী প্রধান মন্ত্রীকে আবার চকল করে তুলে। তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে আবার চুটলেন এবং নতুন সরকার গঠনের দাবী পেশ করলেন। রাষ্ট্রপতি পুনরায় বিরক্ত, তাই প্রধানতম দুজনের কাছেই তাদের সাক্ষরনামের নাম চেয়ে পাঠালেন, জানতে লোকসভায় কে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী করতে পারে। অল্পদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা (ইন্দিরা গান্ধী সমেত) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে সাক্ষাৎ আলোচনা করতে লাগলেন। বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী ইতিমধ্যে একটি অবিবাক্ত কাণ্ড করে বসলেন। ব্যক্তিগত সততার বিনিময়ে প্রায় প্রত্যেকক্ষেত্রে পরিচিত তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে এমন একটি তালিকা পেশ করলেন

যার বাধ্যতাব্য বিচারে টেকেন। এক্ষত তিনি শেষকালে মার্জনা করে রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘোষণা করেন। এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয় এবং এ বোকাটাও বা কদিনের ক্ষমতা তিনি জানাননি।

চরণ সিংকে প্রধান মন্ত্রীতে নিয়োগ করার যে সব দল উপদল অনুমোদন করেছেন ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস তাদের অঙ্গতম। এ দলের নিঃসর্ত অনুমোদনের চিঠিও রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল করতে হয়েছে। ও ভদ্রমহিলাকে রাষ্ট্রপতি বেশ ভালভাবেই জানেন। ১২৬৯ সনে রাষ্ট্রপতি পনের সঙ্গী বৈজ্ঞানিক মনোনিয়ম পরে প্রস্তাব করে উনিই দাখিল করেছিলেন। কিন্তু তারপরে কংগ্রেস কর্ম কর্তাদের সাথে বিরোধের ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচক মণ্ডলীকে বিবেকের আলোনে সাদা নিয়ে ভোট দিতে বলেছিলেন এবং এর ক্ষমতা বৈজ্ঞানিক কয়েক বছরের ক্ষমতা রাজনৈতিক অন্ধকারে যেতে হয়েছিল। কারণ ইন্দিরা গান্ধীর ভয় ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে বৈজ্ঞানিক তার সিগিফিকেন্ট বহুদলের সাহায্যে এগিয়ে এসে প্রধান মন্ত্রীদের পদ থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে অপসারিত করতে চেষ্টা করবে। সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবে সঙ্গী বৈজ্ঞানিক সম্মুখই ইন্দিরা গান্ধী এবং চরণ সিংয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের নম্বর। তাই চরণ সিংকে প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ করার সাথে সাথেই তিনি তাকে অবিলম্বে লোকসভায় আন্বা ভোট নিতে বলেন। এ উপদেশ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং সততার ক্ষমতাই প্রয়োজন। চরণ সিং স্বাধীন লোকসভা ডাকলেন এবং আন্বা ভোটের নোটিশ পাঠালেন। রাজনীতির জল আবার পাকিল হল এবং অবিলম্বে ইন্দিরা কংগ্রেস চরণ সিং মণ্ডলীর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে

নিস। নতুন মন্ত্রীমণ্ডলীও কাল বিলম্ব না করে লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের সুপারিশ করল এবং সাথে সাথেই মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করে। সাংবিধানিক সংকট আবার মাথা তুলল।

জনতা পার্টির নব নির্বাচিত নেতা জগজীবন রাম এবং প্রেসিডেন্ট চন্দ্রশেখর হৈ হৈ করে উঠলেন। রাষ্ট্রপতির কাছে মন্ত্রীমণ্ডলীর সুপারিশ অগ্রাহ্য করার দাবী এবং জনতা পার্টিকে নতুন সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানাতে আন্দোলন আরম্ভ করে দিলেন। সময় বুঝে ইন্দিরা গান্ধীও গওগোলে ইচ্ছন বোম্বায়েতে শুল্ক করলেন। এখানে বলে রাখি রাষ্ট্রপতি নির্ধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির প্রতি এক ভাষণে কেন্দ্রীয় স্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সম্পর্কে এক করুণ চিত্র এঁকে রাজনীতিক, মুদ্রা ও কল্যাণ-মুক্ত করার আবেদন জানান—এ আবেদনটি হৃদয়ঙ্গর মনে হয় কোন মন্ত্রীর পরামর্শে করা হ'লনি এবং সাংবিধান বিরোধী বলে কেউ আপত্তিও করে নি। কারণ মনে হয় আমাদের রাজনীতিকরা বাণী বিতরণের মত কোনও পুঁটিনাটি বিষয়ে অধিকারের প্রশ্ন তোলা অর্থাহীন বলে মনে করে। বাণী বিতরণের মধ্যে কোন ক্ষমতার ব্যবহার আছে তা তারা ভাবেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রীমণ্ডলী এবং তাদের মনোমনি হচ্ছেন প্রধান মন্ত্রী। সংসদ ডাকা, বন্ধ করা এবং বাতিল করা মন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া হতে পারে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউস অব কমন্সকে ভেঙে দেবার রাজকীয় ক্ষমতার প্রয়োগ কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীই করে থাকেন। প্রধানতঃ দুটো কারণে তিনি এ ক্ষমতা ব্যবহার করেন প্রথমতঃ কোন সময়ে হাউসের নির্বাচন করলে সংচেয়ে বেশী শ্রুফল পাবেন এটা

তিনি ঠিক করেন। দ্বিতীয়তঃ দলে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করার জন্য, যেহেতু সদস্যদের বাগে আনার জন্যও এ ক্ষমতা তার দরকার। এর বাইরেও অনেক সময় নির্বাচনকে এগিয়ে আনার প্রয়োজন হয় যখন প্রশ্ন ওঠে যে নীতি এবং প্রোগ্রামের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচিত হয়েছে তার বিশেষ পরিবর্তনের জন্য জনগণের বাধ্য নেয়া আবশ্যিক। যেমন ১৯৩১ সনে অর্থনৈতিক মন্দার মোকাবেলা করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে তার সুপ্রাচীন ক্রিটেড নীতির পরিবর্তন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। যামক্রে ম্যাকডোনাল্ড প্রমিকদলের বাইরে গিয়ে ভারতীয়-সরকার গঠন করে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন পার্লামেন্ট এবং সরকার গঠন করেছিলেন। তাতে প্রমিক-দলের সর্বাংশ ছুড়েছিল নিশ্চয়ই কিন্তু কেউ-ই নির্বাচনের মৌলিক বৈজ্ঞানিক নিয়ম গলাবাক্স করেনি। মাইনস্টিট সরকার সংসদ ভেঙে দিতে পারেনা বলে যে মতবাদ সুবিধে মত প্রচারিত হয় তাদের জিজ্ঞেস করি সংসদীয় আইনের কোন বীতিতে কে তাকে বাধা দিতে সক্ষম? গণতন্ত্রে তো আসল মালিক জনগণই। তাই আসল মালিককেই যদি রাব দেবার জন্য বলা হয়—তাকে বাধা দেবার মত শুদ্ধ আসলি গণতান্ত্রিকতা শুধু আমাদের দেশের হুচন্দরদের দ্বারা ই সম্ভব। জয়প্রকাশের 'স্বাধীনতা বিপ্লব' এবং 'প্রতিনিধি ফিরিয়ে আনার' দাবীর মধ্যে যে দলের আশ্রয়প্রাপ্ত হয়েছিল সেই আদর্শের পরিণতি কি মারাত্মক ভাবেই হু'খজনক। এ শুধু দুইটি আমাদের লং পার্লামেন্টের কথাই মনে করিয়ে দেয়—কি আশা ও উদ্বীপন নিয়েই না তা এসেছিল এবং কী স্মারকার তনকই না তার পরিণতি।

মাইনরিটি সরকারের আইন খতিভা অস্তিত্ব সন্দেহে যদি ধাক্কা রাখতে হয়—তাহলে আমাদের শরণ করতে হবে জার্মানীর সেই ভাইমার সংবিধানকে। ১৯৩০-র অর্থনৈতিক মন্দা থেকেই সোভ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের আধিপত্য নষ্ট হয়ে যায়। দক্ষিণ প্রতিক্রিয়া ক্রমে ক্রমে মাথা উঁচু করে। ১৯৫০-৫২ ডঃ ব্রুনিং একটি ছোট ক্রিস্টিয়ান দলের নেতা। তিনি চ্যান্সেলর হলেন। দুটো বিধানমণ্ডল পক্ষের মধ্য থেকে ডঃ ব্রুনিং স্বীকার করে সরকার চালাত তার ইতিবৃত্ত এখানে বলায় নয়। এর পরে সেইসার, ফন প্যাপেন এবং নগণ্য দলের নেতা হয়ে পর পর চ্যান্সেলর হন। প্রেসিডেন্ট হিটলারের নির্বাচন ছাড়াও দুবছরের মধ্যে (১৯৩২-৩৩) জার্মানীতে তিন তিনবার সাধারণ নির্বাচন ঘটে—এবং তাতে গণতান্ত্রিকতা নষ্ট হয়েছে বলে শুনি।

নির্বাচনের প্রতি অনীহা আমাদের দেশে সুবিধাভোগীদের একটি চিরন্তন মানসিক প্রতিক্রিয়া। এবং এর ফল এরা নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতেও পেরেছে। হন না। এরা জানে যে একটি অবাধ, মুক্ত নির্বাচন জনগণকে রাজনৈতিক সচেতনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এই সচেতনতা সুবিধাভোগীদের স্বার্থের অন্তরায়।

এখানে আমাদের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে ২/১টা কথা বলা প্রয়োজন। নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি যা করেছেন তা ছাড়া অল্প কিছু করার তার উপায় বা পথ ছিল না। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জনতা পার্টি। রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাধী সকলেই জনতা পার্টির ভেতর—যারা পূর্বে সংগঠিত কংগ্রেসী ছিলেন। চরণ সরকারের একমাত্র চাবন রাষ্ট্রপতি করেছিলেন তার সহমর্মী ছিলেন কিন্তু, ১৯৬৯ সনে নির্বাচনে হেরে যাবার মধ্যে সাথেই চাবন সোভ্যাল পার্টিতে ফেরেছিলেন তাই দেখা যাচ্ছে জনতা পার্টির ক্ষোভ তার বিরুদ্ধে বজ্রাধীন। একটু ক্ষেত্রে দেখলেই বোঝা যায় এ ক্ষোভ কত অর্থহীন। সাংবিধানিক স্বাধীনতাটি বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্রপতির পক্ষে জনতা দলকে রক্ষা করা সম্ভব হ'ত না। শুধু ১৯৬৯-এ তার বিরুদ্ধে যে সন্দেহের কথা শুনা গিয়েছিল সেটাই সুপ্রমাণিত হ'ত।

স্বাধীন ভারতে অল্পদিন লোকসভার স্পীকার পদে থাকলেও নিরপেক্ষ স্পীকার হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব শপথের প্রতি যে সততা ও নিষ্ঠা দেখান তাও পৌরবের। সেরস্তু তিনি সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য।





INSIST ON

DAS LOCK

For

SECURITY & SAFETY

Sole Distributor :

SARKAR & CO.

2, Ganesh Chandra Avenue (6th Floor) Calcutta-700 013

Phone : 23-0909

চেষ্টা :

সময় :

১ম চাণ্ডীজি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
বুক হাউসের মধ্যে)

সকাল ৯টা হইতে ৭টা পর্যন্ত

শ্রীহরিহর জ্যোতিঃশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি, (কলি :) এ, সি, এ.ই. আই (লন্ডন)

১. সহপ্রকার জ্যোতিষী কার্যে প্রকৃত কৃশলী ও অদ্বৈত-বিচার-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া যাহা জ্যোতিষীতে
কে-সীবিচার করিবার সময় ও অযোগ্য দিলেই আপনি তাঁর বিচার শক্তির প্রমাণ পাবেন।

বাড়ীর ঠিকানা :

সময় :

চান্দিক বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সকাল ৭টা হইতে ১১-১০ প্রতিদিন

যাহী সপ্তাহে বিদ্রবী বাংলা প্রকাশিত হইবে না, পরের সংখ্যা ২৭শে অক্টোবর প্রকাশিত হইবে।

বিশ্ববী পশুকম্বালা

অম্বলীপন সন্মিতির বিবরণ প্রকাশ - প্রবেশচক্র পালের - ১০

বিশ্ববী মহানায়ক বাসবিহারী - প্রবোধ মধুসূদন - ১০



কীর্ত্তন কুমার দত্তের

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ১। বাঙ্গালার অম্বলীপন - ১০ | ২। দ্বিতীয়তে ভারতীয় বিদগ্ন প্রচেষ্টা - ১০০ |
| ৩। অম্বলীপন সন্মিতির বিবরণ - ১০০ | ৪। দৌলতী সংগ্রাম কাহিনী - ১০০ |
| ৫। কাকোয়ী পর্বতবৃত্ত - ১২৫ | ৬। কলকাতা বাঙ্গাল সংগ্রাম কাহিনী - ৪০ |
| ৭। বাসবিহারী ও অম্বলীপন সন্মিতি - ১০ | ৮। স্বাধীনতার পর্বত না ও মেরে - ৪০ |
| ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ - ১০ | ১০। বিশ্ববী বিবেকানন্দ - ৪০ |
| ১১। মহানায়ক ও দ্বিতীয়তে - ৪০ | ১২। ভারতের মহানায়ক ও চন্দ্রিকা বিবেকিতা - ১৫ |
| ১৩। দেশ দ্বারের ভোগেনি (১) - ১০০ | ১৪। দেশ দ্বারের ভোগেনি (২) - ২০০ |
| ১৫। পর্বত চক্রপেথের আকাশ - ৪০ | ১৬। ১৯৫৫ এপ্রিল জাতীয় পর্বত - ১০০ |
| ১৭। হাতিয়া জঙ্গল প্রচেষ্টা - ১৫ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অম্বলীপন সন্মিতি - ৫০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকা ইতিহাস - ৪০ | ২০। লাইট দ্বারা - ১৫০ |

প্রাপ্তিস্থান :- ১৫৫ বঙ্গত বাস টিউ কলিকাতা - ৭০০০০

টেলিগ্রাফ :- ১/১/১/A স্ববিশ্ব চ্যাটার্জী টিউ কলিকাতা - ৭০

— সম্পাদক মণ্ডলী —

ঐক্যবদ্ধ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) ঐক্যবদ্ধ প্রকাশ, ঐক্য চ্যাটার্জী

সম্পাদক - ঐক্য চ্যাটার্জী

বিশ্ববী বিশেষ প্রতিনিধি - ঐক্যবদ্ধ প্রকাশ, ঐক্য চ্যাটার্জী

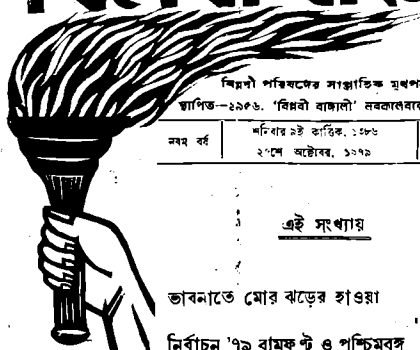
প্রকাশক ও মুদ্রক :- ঐক্যবদ্ধ প্রকাশ, ঐক্য চ্যাটার্জী

বিশ্ববী বাঙ্গাল বাঙ্গাল - ১৫৫ বঙ্গত বাস টিউ, কলিকাতা - ৭০০০০

মুদ্রণ :- ঐক্য চ্যাটার্জী, ১১১ নং দেশের দেশ টিউ, কলিকাতা - ৭০০০০

৩৪ নং ১০৭৩

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ
 স্থাপিত—১৯৫৬. 'বিপ্লবী বাংলা' সমকালে—১৯৭১

নবম বর্ষ

শনিবার ৯ই কান্তিক, ১৩৮৬
 ২শে অক্টোবর, ১৯৭১

৪-৫ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

ভাবনাতে মোর ঝড়ের হাওয়া

। সম্পাদকীয় ।

নির্বাচন '৭৯ বামফ্রন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ

। মল্লিকের ।

বিপ্লবী

নির্বাচনী কৌশল সংহতির পরিপন্থী

। বিপ্লবীর সম্পাদনাধীন ।

বিজ্ঞানের নব দিগন্ত

। কালীদাস সরকার ।

Let us bowdown our-
 selves in reverence to
 that great Indian
 revolutionary patriot
 and say 'Jai Hind'.

—Rash Behari Basu

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—CALCUTTA			
Bose Smt. Bithi-Rani w/o Late Asim Kiron Bose	C/o Saral Banerjee, Rajani Kanta Das Road, P. O. Haltu, Cal-78	100	13. 2. 79
Chakraborty Jatindramohan do Smt. Ranjita	124. Nabin Palli, Cal-56 5/60 Netajinagar, Cal-40	200 100	1. 4. 79 15. 2. 78
w/o Late Sarit Chakraborty (alias Suridh, alias Kutti)			
Chatterjee Kumud Ranjan	Narayantala, Baguihati, Cal-59	200	1. 6. 77
Datta Smt. Gitarani w/o Late Ramesh Datta	4/20 Jahurabazar Lane, Kasba, Calcutta-42	100	3. 6. 79
Gupta Smt. Anima w/o Late Pannalal Gupta	Pashcim Putiary Behala	200	18. 1. 79
Kar Pratuleswar	22 Aswini Dutta Road Khalpar Tarun Pally Cal-28	150	1.. 10 76
Paul Smt. Mahamaya w/o Late Ambica Paul	8/1 Taramonighat Road Pashchim Putiary, Cal-41	360	13. 11 78
Reha Smt. Reukana w/o Late Digendra Reha	10/2 Monmatha Mukherjee Ro v Calcutta-9	100	12. 4. 79
Sen Ajit Kumar	5/2 Sebak Baidya Street Cal-29	200	1. 4. 79
Dist—24 PARGANAS			
Chakraborty Smt. Surabala w/o Late Kusum Behari C akraborty	P. O. Sodepur	150	31. 5. 79
Chakraborty Smt. Swarnalata w/o Late Sudcir	Nitya Dharm, Chauditok P. O. Sodepur	100	4. 11, 78
Ghosal Bimal Krishna	Indrapur colony, P.O. Natapalli Barasat	200	1. 4. 77
Roychowdhury Smt. Duli Raki w/o Late Bamnades	Vill. Raipur P.O. Dakshin- chitra	100	24. 3. 76

(Contd. on 3rd cover)

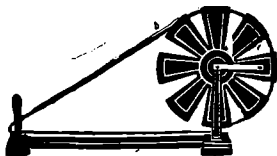
ভাবনাতে মোর ব্যড়ের হাওয়া

ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তি নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ক্ষমতালোভী ও রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্বপরতাও তত বেড়ে চলেছে। নানা কৌশলে জল খোলা করে, সেই খোলা জলে তাঁরা ক্ষমতাজুলাতে চাইছেন। অসত্য, মিথ্যা ও সুবিধাবাদের এমন নকারজনক পরিস্থিতির প্রকাশ বোধহয় এই নির্বাচনের পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। তাহলে ব্যাপার এই যে প্রায় সমস্ত দলই একটা জঘন্ত কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করছেন। ক্রায়নীতি, উচ্চাঙ্গ, দেশপ্রেমের চিহ্নও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দুই একটা আসন লাভের আশায় বিভিন্নমুখী দলগুলি নিজেদের মধ্যে আঁতাত গড়ে তুলতে সচেষ্ট। এমন অস্থিরমতি এবং সুবিধাবাদের এমন নর প্রকাশ দেখে দেশবাসী নিশ্চয়ই কৌতূহলবোধ করছেন এবং হীতমত বিকশিতও হচ্ছেন। একটা কথা আছে Politics is the last resort of a scoundrel, অর্থাৎ রাজনীতি লম্বতানের শেষ আশ্রয়। ভারতবর্ষের মানুষ এই দৃষ্ট দেখায় অভ্যস্ত নন। ঐক্যবন্ধন, রাসবিহারী বন্স, গান্ধীজী ও নেতাজীরা মত জননেতারা এসেছেন রাজনীতির মধ্যে একটা ভিন্ন পুর নৃষ্টি করেছিলেন দেশের ও দেশের সেবাকার্যের মাধ্যমে। জনসেবাই ছিল তাদের জীবনদর্শন। তাই তাঁরা যিমুখী নীতি কখনও গ্রহণ করেন নি। মহৎ আদর্শ, মানবায় মূল্যবোধ, সত্যতা, চরিত্রবল, দেশপ্রেম তাঁদের জীবনে সর্বপ্রধান স্থান লাভ করেছিল। দেশবাসীকে সেই পথে চলতে তাঁরা উৎসাহ করেছিলেন। 'মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করে, সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য জীবন আহুতি দেবার মন্ত্রে নীক্ষিত করেছিলেন। ফলে, দেশের মধ্যে নৈতিকতার একটা স্ফূর্তি পল্লব বেশ দৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। চালানির দ্বারা কোন মহৎ কাজ করতে চাননি। 'আপনি আটের ধর্ম জীবনের শেখার' এই নীতিকেই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন এবং সমগ্র দেশবাসীকেও এই মন্ত্রে নীক্ষিত করে গিয়েছেন, হাসি মুখে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থজালনা বিসর্জন দিয়েও সানন্দে জীবনের কৃষ্টি নিয়ে ও সমস্ত প্রকার দুঃখ কষ্ট বরণ করে। তাদের মুখের কথায় ও কাজের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। এর ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতবর্ষের রাজনীতি একটা নৈতিক ভিত্তি ও আদর্শনিষ্ঠার পরিবেশের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরা যে সব মহান আদর্শের কথা প্রচার করে গিয়েছেন, সেগুলি শুধু ভারতবর্ষের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। সমগ্র মানবজাতির অঙ্গ করণীয় ও অঙ্গসরণীয় ছিল। তাই তাঁরা কালের কপোলতলে চিরভাস্বর হয়ে আছেন ও থাকবেন।

স্বাধীনজাতক যুগে দুর্ভাগ্যক্রমে যে সব “নেপোল দল দই মারাহে”, তারা দেশকে কোথায় নামিয়ে এনেছে অর্থাৎনের মধ্যে, তা দেখে বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। ব্যক্তিগত লোভ, দলগত ক্ষমতা সুযোগ সুবিধালাভ, ক্ষমতামনমত্ততা চরিতার্থ করার জন্য যে কোন হীন অপকর্ম করতে এদের বিবেকের কোন দাখল অস্তিত্ব করেনা। এদের দৃষ্টিটা অতি নৈকট্যের ক্ষতি সীমাবদ্ধ। দূরদৃষ্টির এমনই অভাব যে এই অজ্ঞান কালের কলশ্রুতি কি ভয়ঙ্কর হতে পারে দেশের পক্ষে প্রতি নিশ্চিতভাবে তাদের দল ও দলীয় লোকদের পক্ষে, তা বুঝতে পারতে না। এক চকু হরিণের মত শুধু স্বার্থসিদ্ধি লাভের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চলেছে। যা কিছু মহৎ, যা কিছু কল্যাণকর বা কিছু মানুষ আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করে আসছে সভ্যতার যুগের শুরু থেকে, তার সব কিছুকেই অবশ্যই করে দিলে গোটা মানবজাতির কি হীন দুর্দশা হবে, তাও কি এরা একবার ভেবে দেখেছেনা? ভবিষ্যৎকাল এদের কার্যকলাপ দেখে কি বুঝা যায় নেবে, ইতিহাসের পাতায় এদের আঁতাকুড়ে ভিন্ন অন্তর কোথায়ও স্থান হবে না। এই ব্যক্তিটুকু কি হারিয়ে ফেলেছে? দেশের মানুষের সর্গস্বর্গ উন্নতি সাধনে করার আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে নিজেদের স্বার্থেই তাদের মধ্যে আদর্শহীনতা, দলাদলি, হানাহানি, চরিত্রহীনতা, দুর্নীতি পরাভবতা, ক্ষুণ্ণতার মত সব আদর্শ ক্ষুণ্ণিতকি উন্নতি দিয়ে, প্রভাব দিয়ে, তাদের এক কথায় অমানুষ করে তুলেছে। এই ভাবেই নরনাশের ভয়ংকর, এমন কি নিশ্চিত সত্তাবনাকে বহুল করে তুললে দেশ এবং দেশের মানুষ কেউ বাচবে না। আর যদি দেশ না বাঁচে, তবে রাজনীতিবিদরা কি বেঁচে থাকবে? চল প্রাচ্যবনের দিনে এদের জন্য আলাদা করে কি কেউ গাঁচার ব্যবস্থা করবে। যেমন নোবাকে গাঁচাবার জন্য নৌকা পড়ান হয়েছিল বলে বর্ণিত আছে?

এবারকার নির্বাচনে জাত-পাত, সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদমূলক মনোবৃত্তিকে উন্নতি দিয়ে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে নির্বাচনে জয়লাভ করার আশায়। একদল বলছেন মুসলমান প্রতিনিধি ভিন্ন মুসলমানদের গতি নাই। আবার অন্যদল ভাবছেন হরিজন প্রতিনিধি ভিন্ন তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আসল সমস্যার দিকে কোন দৃষ্টি বা জোর দেওয়া হচ্ছেনা। অগণিত গরীব মানুষ বাস করে এসেছে। গরীবের ত আলাদা কোন জাত নেই। সব সমাজ, সমুদ্রপারের মধ্যে তাদের সমস্যা একই রকমের। তাদের প্রয়োজন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্যব্রহ্ম, বাসস্থান, পরিধান প্রভৃতির মত মৌলিক সমস্যার সমাধান। এটাই ত একমাত্র উদ্বেগ হওয়া উচিত সব দল বা গোষ্ঠীর। এ কাজ যে না করতে পারবে, তাদের ত জাহান্নামের পাখে চলে যেতে বাধ্য করাই উচিত। রাজনৈতিক দলগুলি যদি ভাবে ‘কাল কি হবে আজ কেন ০। ভাবে বাস ওই। তার আগে সই এখান থেকে চলেই যদি বাই,’ তবে আলাদা কথা। অবশ্য রাজনৈতিক দল বা তাদের নেতারা নিশ্চয়ই কলহাসী। কিন্তু আমাদের দেশ আগেও ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে, এটা ঐক্য সত্য। কিন্তু দল, নেতা ও দেশবাসী—সকলেই একটু বিশেষ কর্তব্য আছে নিজেদের এবং উত্তর স্বরীদের জন্য। নেতারা যদি সে কর্তব্য না করতে চান (তারা চান না বলেই তাদের কার্যকলাপ প্রমাণ করছে) তবে দেশের মানুষকেই সেই কাজ করতে এগিয়ে আসতে হবে শুভ সময় নিয়ে, শ্রমহান আদর্শ নিয়ে, চরিত্রবল

ও দেশপ্রেম নিয়ে। দেশের মানুষ যে হতাশা ও ব্যর্থতা নিয়ে আজ ধুঁকছে, তা থেকে আজ তাদের নিষ্কৃতি দিতে হবে, তাদের ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, মানবীয় মূল্যবোধের আগুন জ্বেলে। রাস্তার অন্ধকারে তারা চায় পথের আলো। দেশে ব্যবস্থা করতে হবে দেশবাসীর : যেমন করেছিলেন আমাদের পূর্বপূরী বরেন্দ্রা নেতৃবৃন্দ এবং অগণিত বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। দেশের মানুষের ভাবনাতে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিতে তারা যাতে জেগে উঠে নিজেরাই নিজেকে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। যারা কোন ঠেগনে কন্নত : নথক করে জেঁকের মত লেগে থেকে মানুষের বক্তৃতা শোষণ করে, নিজেকে বোধশক্তি, বিচারশক্তি, চিন্তা বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে দেশের অপমার্য রাজনীতি ব্যবসায়ীদের চিত্তকে নির্দমন দিতে পারে সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। এই নির্বাচনের মুখে অনেক ভেতকারী মনোমুগ্ধ : জনবহুল দেশের মানুষের নিকট সমর্থন চাইতে আসবে দেশপ্রেমের হস্তবোধ পরে। আজ তাই সময় ও সুযোগ এসেছে যদিও সীমিতভাবে, যখন দৃষ্টিকভাবে প্রতিনিধি ও দল নিবাচিত করতে হবে। একাজ হয়ত একবারেই করা সম্ভব হবে না। তবুও দেশের মধ্যে এমন হাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, এমন মানসিকতার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে দেশে ভূমিমাল হবে অচল। তখনই সং, দল, চরিত্রবান, দেশপ্রেমের মানুষের পক্ষে মাংসমী দিনে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করার পথ প্রশস্ত হবে। এ কাজে বাধ হল নিজেকে স্বপ্নাংশে নিজেরাই ছেকে আনবেন এবং তার জন্ত প্রাণশক্তি করতে হবে শীঘ্রই মতে, একা হুলে চলবে না। নিজেকে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা কখন এবং ভোটপ্রার্থীদের হৃদয়ে কেন যে ধারা নিয়ে মাত দেশের মানুষকে বিপথে চালিত করা যাবে না। ধারাবাহিকীর দিন চলে গিয়েছে।



বিপ্লবী

নিজের মুক্তির জন্য তিনি ভাগ্যবশত অবলম্বন করিয়াছেন সেই সন্ধ্যাসীকে আমি চিনি না। আমি চিনি সেই আত্মভোলা বিপ্লবীকে যে অস্ত্রায় অবিচার দেখিলেই জ্বলিয়া ওঠে। অবিচার ও অস্ত্রায় যে করে সে প্রভুত শক্তিশালী হইলেও তাহাকে লাঠিপেটা করিতে, অন্যায়কারী বিপুল সম্মানের অধিকারী হইলেও তাহার মূখে খুঁহ দিতে যে ভয় পায় না আনন্দ পায়, সেই বিপ্লবীকে আমি জানি বুঝি ও চিনি।

কিনাসবাসন ভাগ্যী মুক্তিকাম্য বোণীকে আমি চিনি না। স্বর্ষি অরবিন্দকে আমি চিনি না। চলতি সমাজে যারা অল্পহীন, শিকাহীন, সাহসভরসাহীন জীবন যাপন করিতেছে তাহাদের সাম্রিধে যারা দয়ালু নহে, উচ্চ আত্মীয়তা অনুভব করে, তাদের দুর্দশা দেখিয়া যারা অনুকম্পা নয়—ক্রোধ অনুভব করে ঐক্য সমাজে গুলট পালট নটাইবার ক্ষমতা লণ্ডড় হস্তে আগাইয়া আসিতে যারা বিধা সম্বোধন অনুভব করে না, আনন্দ অনুভব করে,—তাদের আমি চিনি। তারা বিপ্লবী।

যারা প্রতিবেশীকে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া চোখ বুজিয়া সরিয়া থাকে তাদের আত্মীয়তাতে আমি আনন্দ অনুভব করিনা। আবার বলি, প্রতিবেশীদের দুর্দশায় যারা ক্রোধ অনুভব করে, ডাঙাহাতে তাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে যারা আনন্দ পায়, তাদের আমি চিনি। তারা বিপ্লবী।

অগণিত সাধারণের অসংকোচ জীবনের জন্য যারা সন্ধ্যাসীর জীবনরীতি অবলম্বন করিয়া আনন্দ পায়, কোনো প্রতিকূলতাকে যারা ভয় করে না তারাই তো বিপ্লবী। এদের দেখিয়াছি; আমি এদের জানি ও চিনি। এদের সাম্রিধে, সাহচর্যে আমি আনন্দ পাই, কল ভরসা পাই।

আনন্দময়ের সন্ধ্যাসীদের আহ্বান আমি শুনিয়াছি। ককির মজুমদারের কাহিনী আমাকে অভিহৃত করে। শিবকানন্দের বিপ্লবজ্ঞান আমাকে অনুপ্রাণিত করে। স্ববীন্দ্রগাথা আমাকে বহু দৃষ্টি দেয়।

সাংঘাতীভুক্ত সাধ্য করার আনন্দে বালক কুসুমামের সেই দুর্বল হাতের প্রথম আঘাত হানার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা আমারই বিষয়ে আন্তর্ভুক্ত করে।

ছানিয়ার হিসাবের খাতায় যাহা একান্ত অর্থহীন, যতীন দাসের সেই ভিলে ভিলে তুলনামূলক মূল্যবোধ চিনাইয়া দেয় তাকে যার আখ্যা বিপ্লবী।

‘প্রবীণ বিপ্লবী’

২৭/২/৭৮ লক্ষ্য

২৭/২/৭৮ এর প্রতিক্রিয়া

নির্বাচন '৭৯, বামফ্রন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ

॥ মল্ল ঘোষ ॥

কেবলে সি, পি, আই, মন্ত্রীসভার পতন ঘটবে
সি, পি, এম, আরো একবার তাদের তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক
হুঁসুড়িভাঙা, আধিপত্যকামিন্ডার পরিচয় রাখল।
- সি, পি, এম, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
ই, এম, এস, নাথুত্রিপাধ খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি বাম ও গণতান্ত্রিক জোট
সৃষ্টির 'সোনার হরিণ' দেখিয়ে সি, পি, আই-এর
মজবুত খাটি কেবল মন্ত্রীসভার পতন ঘটালেন
যার ফলশ্রুতিতে সংগোপন মুসলীম লীগ দল আরও
কতকগুলি দলের সমর্থন কয়। মন্ত্রীসভা গঠন
করলেন। কিন্তু সি, পি, আই-এর কাণ্ডিগত
(অস্বস্ত, বর্তমানে) শুধাকবিত বাম গণতান্ত্রিক
জোট বাস্তবে ঘটেই রয়ে গেল স্বয়ং কেবলের
সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালোবল এই স্বকম একটা
জোট বাঁধার সম্ভাবনাকে আরও ছুরে সরিয়ে দিল
কলা বাহু। কারণ জোট বা বন্ধুত্ব সমান সমানেই
হতে পারে—সরল ও চুপ্চল, অসুগ্রহকারী ও
অসুগ্রহীতের মধ্যে কোনদিনই জোট হওয়া সম্ভব নয়।
যার প্রমাণ, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ
ও অন্তান্ত রাজ্যে নির্বাচনী সমঝোতা ও আসন্ন
জাতিগোষ্ঠী ব্যাপারে উপরোক্ত দুই দলের মধ্যে
বাহাদুরী পরকথাকবি।

কেবলের ঘটনায় একথাও প্রমাণ হয়ে গেল,
সর্বভারতীয় একটি দল হিসাবে একদিন ভারতের
কমিউনিস্ট পার্টি'র মধ্যাণ্ডা ও আত্মনির্ভরতার সমানে

সম্মানিত ছিল, রাজনৈতিকভাবে তারা কতটা
সেউলিয়া হয়ে পড়েছে অথবা এই দলের লোলচর্চ
সুষ্ঠিমত নেতৃত্ব পার্টি'কে সর্বসাধারণের কোন্ ক্রিয়ার
নির্দেশ করেছেন। এমনকি কোনদিন যদি এই বৃহৎ
রাজনৈতিক দলটি এরই অঙ্গজ সি, পি, এম
দলের সঙ্গে নিঃসর্তভাবে মিলে যায়, তাহলেও
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নান্দ্রবেরা হরতো ততটা
আশ্চর্য হবেন না। তবে এ পলিগাম নির্ভর করবে
বিত্তীয়োক্ত দলটির ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারের
ওপর। যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তথা কেন্দ্রীয়
লোকসভায় সি, পি, এম একটি অস্বস্তম প্রধান শক্তি
হিসাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যদি
ভারতের প্রতিটি রাজ্যে এই দলের সম্পন্ন অস্তিত্ব
গড়ে উঠতে পারে এবং যদি কল্যাণবশতই হোক
অথবা নিজেদের রাজনৈতিক সত্যতা ও সম্ভাবনায়
নীতিকে জাহিরের উদ্দেশ্যেই হোক এই দল স্ফুটন
সম্মানজনক সর্ভে সি, পি, আইকে সঙ্গে নিতে
রাজী হয়—তবে বাম গণতান্ত্রিক জোট অথবা অস্ত
বে কোন সুবিধাজনক কাপালানের আড়ালে নিজেদেরকে
এই দলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে সি, পি, আই নেতৃ-
বর্গের কালবিলয় হবেনা কলেই ধরে নেওয়া যায়।
আসলে, পরমাছা বৃত্তি বে পার্টি'র মধ্য বাসা নেয়,
ভাষের বাস্তব কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু থাকেনা, বেন
ভেন প্রকারেণ একটা শক্ত কাঠামোকে আশ্রয় করে
সেই প্যারাসাইট পার্টি' নিজেদের অস্তিত্ব বজায়

রাখতে চায়।

এবং সি, পি, এম দলও জানে সি, পি, আই-এর এই দুর্বলতা। তারাও চায়, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন, ও কৃষক সংগঠনে এখনও মোটামুটিভাবে শক্তিশালী এই দলটি তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকুক (আর এর জগ্জে খুব একটা ত্যাগ স্বীকারের যখন প্রয়োজন নেই, শুধু মাঝে মাঝে বাম গণতান্ত্রিক জোন্টের প্রোগ্রাম দিয়েই যখন চলবে)। ইতিমধ্যে রাজ্জো রাজ্জো নিজেদের দলকে অত্যন্ত তাজাতাড়ি ছড়িয়ে দিতে হবে। ছড়িয়ে দিতে হবে সমাজের প্রতিটি স্তরে সবচেয়ে নিচের মহল পর্যন্ত। ক্রমত দখল করে নিতে হবে অফিস, কাচারী, কল-কারখানা, কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, পুলিশ, প্রশাসন, এমন কি বিড়ি ত্রমিক বা ঠিকে-কিমেতও সংগঠনগুলিকে। শ্রেণী সংগ্রামের নামে শিল্পে দীর্ঘস্থায়ী অশান্তি সৃষ্টি করে রাখতে হবে, বিরোধ বাধিয়ে রাখতে হবে গ্রামের ভূমিহীন কৃষক ও জমির মালিকের মধ্যে। নিতাপ্রয়োজনীয় ত্রাবাদি উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—বিদ্যুত, জল, খাদ্যশস্য, জালানী, কাগজ, গুদ্রু—নিম্নতম অশান্তি সৃষ্টি করে বাজারে কৃত্রিম অভাব বজায় রাখতে হবে যাতে নির্বিকারভাবে পূর্ববর্তী সরকারের ভণ্ডার লোভ চাপিয়ে আগামী নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখা যায়। যাতে মানুষের ক্রোধ ও অসন্তোষকে মূলধন করে সম্ভাব্য রাজনীমাত করা যায়। মাঝে মাঝে শুধু ‘জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লব’, ‘শৈবতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক শক্তি বিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক জোট’, ‘বামফ্রন্ট-বিরোধী’, ‘শ্রেণী বিচ্ছিন্ন সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম প্রতিক্রিয়ানীল চক্রান্ত, অনিবার্ধ’ প্রকৃতি প্রোগ্রাম আউড়িয়ে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত ও সি পি আই প্রমুখ রাজনৈতিক দলকে অশান্তিত করে রাখলেই চলবে।

সি পি এম দলের এই ‘পলিটিক্যাল পলিসি’, ক্ষমতা দখলের জন্য উগ্র লালসা, আধিপত্যকামিতা ও সুপারিকল্পিত রাজনৈতিক অভিসন্ধি কোন চরম পর্ষায়ে গিয়ে পৌছতে পারে, তার প্রমাণ অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পেয়েছে ‘৬৭’-৬৯ ও তৎপরবর্তী সময়ের ঘটনা পরস্পরায়। আইন ও প্রশাসনকে বৃহদুর্ভেদে দেখিয়ে সেদিন পশ্চিমবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছিল মুক্তাকল-খুন ও রাজনৈতিক সংঘাতের বক্তৃতা-তর্পণ, করেছিল স্বাধীন ভারতের একটি বহিষ্কৃত জনপদ সংস্কৃতি ও রুষ্টির পীড়িত পশ্চিমবঙ্গ। জাতীয় রাজনৈতিক শিকার হয়ে অকারণে হাতিয়ে গিয়েছিল অসংখ্য মানুষ, অনেক তাজা সবুজ প্রাণ। সেদিনের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের অতিবিপ্লবী নেতারা সেই সন্ত্রাসকেই তাঁদের জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম ধাপ বলে মনে করেছিলেন কিনা জানিনা—কিন্তু এর পরিণামে সম্ভবতঃ ক্ষতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশী তাঁদেরই—তাঁদের দলেরই। পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলিকে মানুষ ছুঁড়ে কেলে দেয় এবং ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে নব কংগ্রেস দল ভারতের সর্বত্র বিপুল ভোটে জয়লাভ করে—যাকে রাজনৈতিক পরিভাষায় ‘হুইপ’ করা বলে। মূলতঃ যুবশক্তি-ভিত্তিক সেই নব কংগ্রেস দল সেদিনের মানুষের কাছে সি, পি, এম ও বামদলগুলির দৃষ্টে সেই ভয়াবহ সন্ত্রাস থেকে উদ্ধারের বার্তা বয়ে আনে ও মানুষকে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু পরবর্তীকালে, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে সঠিক নেতৃত্বের অভাবে, সুস্পষ্ট কর্মপটীক অভিব্যক্তিহীনতার, গোষ্ঠীগত ঘন ও অর্থকলহে এই যুবশক্তির উপরেও মানুষ ক্রমশঃ বিশ্বাস হারাতে থাকে—যার সুযোগে আবার বামদলগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এছাড়া ৭৫ সালের আরোপিত জঙ্গরী

অবস্থা বাপরবতী প্রায় দুবছর কাল স্থায়ী হয়—সেই সময়কালে প্রশাসন কর্তৃক গ্রহীত বিভিন্ন কড়াকড়ি, সংবাদপত্রের দেলর, সাংবাদিক ও বিরোধী দলগুলির একাধিক নেতাকে মিসা প্রয়োগে গ্রেপ্তার, প্রকৃতি ঘটনা বাম ও অস্ত্রস্ত বিরোধী দলগুলির সামনে প্রচার ও সহানুভূতিলাভের এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়—যার সম্ভাবহারে জন্ম নেয় নতুন ‘জনতা দল’—যেটামুটিভাবে কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত দলগুলির সম্মিলনে (সি. পি. আই প্রকৃতি দু-একটি দল ছাড়া), ৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে ক্ষমতার আসে জনতা দল আর তিনমাস পরে বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

সেই ক্ষমতার আসার সময় থেকে পরবর্তী পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে আজ প্রায় আড়াই বছরে বামফ্রন্ট, মূলতঃ সি. পি. এম দল তাদের অভিজ্ঞ লক্ষ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তারা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে—বিপুল সাফল্য লাভ করেছে আসাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে। ত্রিপুরায় তাদের জয়যাত্রা অব্যাহত, অব্যাহত পাল্লান ও অফ্রাফ্র প্রদেশেও। সি. পি. আই প্রভাবিত কেবল মন্ত্রীসভার পতন ঘটতেও তারা সক্ষম হয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের মাধ্যমে সি. পি. এম. কেন্দ্রে একটি অস্ত্রস্তম শক্তিশালী দল হিসাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর—যে কোন কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হলে যাতে তাদের সমর্থন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে—সেই সুযোগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রাজনৈতিক অস্থিরতাবোধ ও সুযোগ সুবিধালাভের নতুন দিগন্ত যাতে খুলে যায় তাঁদের সামনে। এ আকাংক্ষা সি. পি. এম

নেতৃবর্গের, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির নেতাদের বহুদিনের। কেন্দ্রস্তরে একটি বাম মন্ত্রীসভার নেতৃত্বে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা যে-কোন পন্থা অবলম্বনে পিছুপাও হবেন না।

এবং তাইই ভোড়োঝাড় শুরু হয়েছে সাথ। পশ্চিম-বাংলা জুড়ে—সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। পাড়ার পাড়ায়, গ্রামে-গঞ্জে, কলার-কলারে প্রচার-ভিহানে শুরু হয়েছে পুরোদমে। দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হচ্ছে—‘বামফ্রন্ট সরকারকে ভোট দেবেন কেন’ তার ফিরিস্তি। আমরা বেকার ভাতা দিয়েছি, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি, আমরা অসেচ এলাকায় অত একর জমির খাজনা মকুব করেছি, আমরা অসুখ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছি, আমরা সরকারী কর্মচারীদের ক্রমাগতঃ সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে চলেছি ইত্যাদি। কিন্তু লেখা হচ্ছে না—কেন বিদ্রোহ সমগ্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে, কেন হাজার হাজার ঘেটে খাওয়া মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ছে, কেন জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগতঃ বেড়েই চলেছে, কেন প্রশাসন বলে কিছু থাকছে না—পুন, শরীকি সংঘর্ষ ও অস্বাস্থ্য অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগতঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেন মানুষ সুবিচার পাচ্ছে না—গাঁয়ে গাঁয়ে পঞ্চায়েত প্রধান ও ভেলঃ পরিবাদের সদস্তেরা ‘হাতে মাথা কাটছে’ কেন শিক্ষা, শিল্প, উৎপাদন—প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য ও স্থিতিহীনতার সৃষ্টি হচ্ছে। কেন ন’মুদ্র একটি বামপন্থী সরকারের শাসনাধীনে থেকেও তার দ্রাব্য অধিকার ও পাওনা থেকে প্রকারান্তরে বঞ্চিতই হচ্ছে। এসব ‘কেন’র উত্তর লেখা হচ্ছে না—কারণ এর কোন উত্তর নেই। শুধু প্রশ্নই আছে; অত্যাচারিত, আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত মানুষের উত্তরহীন প্রশ্নগুলি প্রচার আর ক্ষমতার স্তম্ভট প্রাকারে মাথা

খুঁড়ে মরছে। মরিচবাঁপির উচ্ছাসের ঐক্যশব্দে নৃশংসভাবে দণ্ডকারণে কেবল পাঠানো হল কেন? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে এক কমরেড বন্ধু বলেছিলেন—‘ভায়া আইন অমান্য করেছিল বলে, ভায়া আমাদের হুকুম মানেনি বলে।’ আমি জানিনি, মানুষের কষ্ট আর চোখের জলের উপরে যে আইন—ভার সভাই প্রয়োজন আছে কিনা, বামপন্থী রাজনীতিতে তার ব্যাখ্যা কিভাবে করা হয়। কিন্তু একথা মনে হয়, সেই সব ছিন্নমূল লোকজন্মের সঙ্গে আমরা একটু ভালো ব্যবহার করতে পারি।—অন্ততঃ এদের পুষ্টি করে এককালে রাজনৈতিক কার্যে তোলার কথাটা মনে রাখি।

মরিচবাঁপির মানুষ অথবা বারাসতের হাকিম সরকার হয়তো মার্কসীয় চিন্তাবাদার প্রতীক বলে বিবেচিত হবেন—ভীষের গুণের সম্ভোধানবাস অন্তঃকরণেই প্রবাহিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে আমি আসল লোকসভা নির্বাচনের প্রাকালে পশ্চিমবঙ্গের ‘জনপ্রিয়’ বাস্কেট নেভরুনকে একটাই অনুরোধ করতে চাই, আপনারা দয়া করে আর রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতাকে প্রেরণ করেন না। মহা-কলিকাতার একটি ক্ষুদ্রতম বাস্তব বাড়ির দেওয়ালে ইন্দিরা কংগ্রেস দল একটি হাত এঁকে তাঁদের দলীয় প্রার্থীকে চোটে দিতে বলেছেন। তার উপসংহারে সি. পি. এম-এর জবাবীতে লেখা হয়েছে—‘ওই দেখছেন কালো হাত, জুড়ে আছে অনেক রক্তের ছাপ।’ গাওড়া ষ্টেশনের বাসষ্ট্যান্ডেও এইরকম সতর্ক-বাণী চোখে পড়েছে। এ ভিনিবটা এবারের নির্বাচনে প্রচারে নতুন আমলানী। এর জবাবে যদি পূর্ণোক্ত পলিট ‘কান্ডে হাতুড়ী তথা’ চিত্রিত দেওয়াল লিখনের নীচে লিখতে শুরু করে—‘এ দেখছেন লাল কান্ডে,

জুড়ে আছে অনেক রক্তের দাগ’। তাহলে হয়তো আপনারাও কাড়াকড়ি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। শুরু হয়ে বাবে রক্তাক্ত বদলা নেওয়ার খেলা। গ্রাম-গল্প থেকে এ ধরনের সত্যসের ধরনের আলোক আসতে শুরু হয়েছে।

এ ঘটনা কারোরই কান্ডিত হওয়া উচিত নয়। একঘাটা মনে রাখা প্রয়োজন, হিসো আনে প্রতিহিংসা এবং তা থেকেই জন্ম নেয় অতিহিংসা Super Violence—যার হাত থেকে কোন দল, কোন মানুষই রেহাই পাবেন না। ইতিহাস এ সত্যের বার বার প্রমাণ দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্প্রতি বলেছেন,—‘আমরা বিগিং-এ বিশ্বাসী নই আমরা বিগিং হতে দেব না।’ দক্ষ প্রশাসক হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর মুনাম আছে, আমরা আশা করি, তাঁর প্রতিশ্রুতি আগামী লোকসভা নির্বাচনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে। আর সেই সঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের অবাধ নির্বাচনী প্রচারের সুযোগ পাবে। সুযোগ পাবে দেওয়াল লেখার, পোষ্টার মারার, জনসভা করার, মানুষের ঘরে ঘরে ঘাওড়ার। একমাত্র তাহলেই মুঠু ও সং নির্বাচন সম্ভব হবে, সম্ভব হবে সাধারণ মানুষের রাগ জানার। আর গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষের বাকবোধ না করে তাকে বেশী করে প্রচারের সুযোগদানই মানুষের কাছে তাদের বক্তব্যের দোষত্রুটি দেখিয়ে দেওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ এ রাজ্যের মানুষ যখন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন। তাই রাজ্য জুড়ে তথা সমগ্র দেশে সং ও নির্বাপক প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সার্থক করে তোলা হোক,—জনসাধারণের এই কামনা। সার্থক করে তোলা হোক গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি—পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই কামনা করে।

নির্বাচনী কৌশল সংহতির পরিপন্থী

শ্রীবংশীধর স্বামীপাধ্যায়

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বখী-মহারথীরা কোমর বেঁধে নেমেছেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কৌশলে জরী হবার অত্যাশ্রয় বাসনার। জরী হওয়াই যেন একমাত্র লক্ষ্য। যে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে, তবে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের অধিকার নিলবে, তাদের সম্বন্ধে কিন্তু এ বা সকলেই উদাসীন। জয়লাভকে সুনিশ্চিত কোরতে এঁরা দেশের সংহিতা-কেও বিনাশ কোরতে উদ্যত, তাই জাতপাতের ক্ষুভ্রত্ব দিতে পর্যাস্ত এঁরা লক্ষ্যবোধ করেন না। কেউ কেউ আশা মসলমান ভোটারদের মনোবৃত্তন করার উদ্দেশ্যে দিল্লীর জামা মসজিদের শাহী উমান সৈয়দ আবদুল্লাহ ব্যাতির পদক্ষেপম করভেও ইতস্তত করছেন না।

ধর্মনিরপেক্ষ দেশে নির্বাচনে জয়লাভ কোরতে হলে ধর্মপন্থীদের ভোতাড় কোরতে হয়, তাদের অজ্ঞায় আশার রাখতে হয় বৃহত্তর জনসংখ্যার ক্ষতি সাধন কোবেও আর হুকুমও তামিল কোরতে হয় মস্ত্রীয় পেলে, নচেৎ পণের বাবে এদের বিরোধীতা অনিবার্য ও ফলে পরাজয় এবং মস্ত্রীয় ধ্বংস। এই প্রকার বিশেষ বিশেষ ধর্মের মানুষদের ভোটার-খাদ্য আর কতদিন এই নজার জনক অংলু ও ব্যবস্থা চলতে থাকবে ভারতে? এর কি কোন বিকল্প নেই না নেতারা এটাকেই সুবিধাজনক মনে করেন বলে এই ব্যবস্থাই-তিরকাল ধরে চলতে দেওয়া হবে? কোন কোন সাধারণ মস্ত্রয় এই সব দেখে শুনে পথে ঘাটে মন্তব্য করে—এইরূপ নির্বাচন নিরপেক্ষও

অবধ হতে পারে না বরং একে ধর্মপন্থীদের বাগ্য প্রভাবিত নির্বাচন বা প্রহসনের নামান্তর বলেই তারা মনে করে।

১৯৭৭ সালে বখারী সাহেব জনতার দিকে পুরা-পুত্রি কৃৎকে পড়েছিলেন, এবারে তিনি লোকসভার না বহুগুণ্য না অপর কোন দলের বা জোটবদ্ধ দল-সমষ্টিব দিকে পুনরায় কৃৎকে পড়বেন তা কে জানে। এই ঘটনাট প্রমাণ করে যে একজন ব্যক্তি বিশেষের অনুগ্রহে বা বিরোধে নির্বাচনের ফল-ফল নির্ভর করে বহুলাংশে। অনুগ্রহপন্থাবে ইবিজন ভোটাররা তাদের মনোমত হরিজন নেতারা নির্দেশে ভোট দেয় এবং সেই ইবিজন নেতা বা নেতারা যখন যে দলের হয়ে ভোট ভিক্ষা নামে সেই দলট হরিজনদের প্রায় অধিকাংশ ভোটটি পায়। এবারে আবার নতুন কীকাত্তা দেখা যাচ্ছে কারণ জাতি, বান্দব, অত্যাচারী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষেরা ওদের নিজ সম্প্রদায়ের প্রার্থীকেই ভোট দিবার জন্য প্রচার কার্য চালাতে আরম্ভ করেছে। আদীবাঙ্গীরা বহু পূর্ব হতেই আদমচরতন এবং তাই তারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই চলে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতের বালাইনেই অন্ততঃ ভোটপক্ষে, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান ভোটারে ব্যাপারে বিভিন্ন হয়ে পড়ে দেখা গেছে। ভোটে মুসলমান প্রার্থীকে গেলে মুসলমান ভোটার তাকেই ভোট দেয় স্বভাবত কারণ ওঁদের স্বভাবত প্রীতি বড়ই প্রবর, যদিও হিন্দু হিন্দু প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে নিজ দলের মনোনীত প্রার্থী-

কেই ভোট দেয়—সে হিন্দুই হোক বা মুসলমানই বা
অন্ত যে কোনও ধর্মবলয়ীই হোকনা কেন।

ইতিমধ্যে যতগুলি নির্বাচন অঘটিত হয়েছে
তার বাস্তব অভিজ্ঞতাই উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।
একটা মূলত কৌশল দেখা যাচ্ছে এবারের প্রাক
নির্বাচনকালে এবং তা হচ্ছে যারা নিজেরা বৈরতন্ত্রী
তার অপরদিকে বৈরতন্ত্রী আখ্যায় হুঁত্বিত করে
জনগণকে ধোকা দিতে চায়। জনগণ কি এতই
অবুধ বা রাজনৈতিক চেতনাহীন? মনে হয়
বর্তমান ভারতের সব রাজনৈতিক দলের আত্মসর্ব-
নীতি ও সীমাহীন স্বার্থপরতার বহিঃপ্রকাশ জনগণ
জেনেও বুঝে ফেলেছে—কেন্দ্রীয় সরকারের আক-
স্মিক পন্থার সাথে সাথে, কারণ ব্যক্তিগত উচ্চা-
কাখা পূরণের অসং উদ্দেশ্য নিয়েই কেন্দ্রের সুস্থিত
সরকারকে সরান হয়েছে কতগুলি মিথ্যা কথা
বলে যার কোন প্রয়োজন ছিল না। চরণ সিং যে
বিধাসভাতন্ত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অকালে
পতন ঘটালেন তা কি কোনদিন জনগণ ভুলে যাবেনা
চরণকে বাহবা দেবে বলে তিনি খারণা করেন।

রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাঝেই চরণের বিরো-
ধীতার সক্রিয় ভাবে এই নির্বাচনে তাঁর দলও
ছোটকে পরাস্ত করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টাই
চালাবে। জাতীয় কংগ্রেস চরণ সিং সরকারের
শরিক হয়ে যে কি ভুল ও নীতিহীনতার পথে পা
বাড়িয়েছে তা এই নির্বাচনেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।
জাতীয় কংগ্রেস আজ ভুলের পরে ভুল কোরে
চলেছে। ফলে তার অতীত সৌরভ রান হতে তুচ্ছ
করেছে—এ কি কম বৈদগ্ধ্য ও দুঃখের ব্যাপার।

তবুও জাতীয় কংগ্রেসের চেতনা হলোনা, নেতৃবৃন্দের
নেতৃত্বের ভুলে জাতীয় কংগ্রেস তার বৈদগ্ধ্য ও রাজ-
নৈতিক অস্থির পর্যায় হারাবে বলে গুরুতর আশংকা

হয়। সি পি এম মূলত একটি বৈরতন্ত্রীদল। সেই
সি পি এম এর দ্বারা যদি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস
নেতাদের লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার
প্রস্তাব হতে হয় ও তাদের অধুমতি নিয়ে তবে
তাদের নির্ধারিত আসনের জন্য নির্বাচনে ঝড়োভয়ে
তো থিক! শতাব্দিক বর্তমান জাতীয় কংগ্রেস নেতৃব-
কে। যারা সি পি এম এর সঙ্গে নির্বাচনী জোট
বঁধে বা আঁতাত করে। কংগ্রেস আজ পথের ধলায়
গড়াগড়ি খাচ্ছে কাদের ভুলে ও কাদের পাশে,
তাদের ভারতীয় জনগণ কোন দিন ক্ষমা কোরবে।
না।

সেই মহান কংগ্রেস কাঙারীবিহীন-হাল ভাঙ্গা-
পাল ছেঁড়া এক নোকা বিশেষের অবস্থার নীত
হয়েছে। কি গভীর দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এ
যে তা বর্ণনা করা দুস্বাধ্য।

ভাঁড় রাজনারায়ণ আর ক্ষমতালোভী চরণ সিং-
দের কথায় আজ কংগ্রেস উঠে বসে, এর চেয়ে
আর কি দুঃবস্থা হবে? কংগ্রেসীদের কি তবুও
শৈতন্ত্যদগ্ধ হবে না? রাজনারায়ণ রাজঘাটে গান্ধী-
জির সমাধিক্ষেত্রে যে নীতি বিগর্হিত পথে যেজ্ঞার
শাব্লিকে গিরিত করল তার ক্ষমা নেই। এই হট-
কারা আধাপাগল যে দলের কর্তব্যজ্ঞি, সেগুলি কি
জনগণের সমর্থন পাবে বলে মনে হয়? রাজ-
নারায়ণের মঞ্চ সাধারণ মানুষের অভিমত ঘোটেই
ভাল নয়। তারা তাকে কৌতুকাভিনেতা মনে করে
আর তাই তার কথায় হাসে, কিন্তু চলিত হয় না।
অনতা (এস) বা পূর্ণ ঔদ্ধিহিত লোকদল মানুষের
সহানুভূতি ঐতিমধ্যেই হারিয়েছে আর বোম্বারী
সাহেবের বরজাঘ লোকদল বড়ই হত্যা নিক না কেন,
কোন মুসলমান নিমকহারামদের ভোট ভ দেবেই না,
উপেঁতা তারা লোকদলের বিরোধীতাই কোরবে বলে

শুনা বাজে। জগজীবন রাম হরিজনদের যে ভাবে সংঘবদ্ধ করে জনতা দলের উপর তাদের আস্থা আনার চেষ্টা কোরছেন তাতে হরিজনরা মোটেই খুসী হতে পারছেন না, কারণ হরিজনদের আর্থিক নেতারা ইন্দিরাগান্ধীকেই বেশী বিশ্বাস করেন। ফলে কেউ কেউ জগজীবন বাবুকে ইন্দিরা কংগ্রেসে ফিরে যেতে পরামর্শ দিচ্ছেন। বাবুজী এখন দোটারায় পড়ে ঠিক ঠিক কোরতে পারছেন না যে তাঁর নিজের আবেদন গোছাতে হলে তাঁকে কোন পক্ষে এখন চলতে হবে ? - ইন্দিরার পক্ষে না জনতার পক্ষে ? বাবুজী তাঁই মনস্তির করার জন্য কিছু দিন চূপচাপ থাকার কথা গভীর ভাবে চিন্তা কোরছেন। দেখা যাক তিনি শেষ অবধি কি করেন।

তিনি এখন দোটারায় দোতুলামান। সকলেই যে ভাবে গড়িছড়া ডিঙে ইন্দিরার পেছনে গিয়ে লাইন লাগাতে বাস্তব তাতে মনে হয় শ্রীমতী গান্ধীর স্মৃতি আসন্নপ্রায়। তাঁর দুর্দিনে যাত্রা সব তাঁকে ডেড়ে গিয়েছিল, তারা ভুলস মাঠ কোরে তাঁর কোলে ফিরে আসছে দেখে বাবুজী বাবুড়ে গেছেন ! ইন্দিরার দিকে সবাই যদি এভাবে কুঁড়ে পড়ে তবে তাঁর জয় সুনিশ্চিত ভাবে অনেক রাজনৈতিক নেতারা বেশ কাঁপরে পড়ে দারুণ হুঁচকায় য়। তারা ঠিক করতে পারছেন না কি পথায় ও কি কি মিথ্যা প্রচারে ইন্দিরার বর্তমান ভাবমূর্ত্তিকে অসুস্থ: কিছুটা স্থান করে দেওয়া যায়। তাঁদের দলের বং জোটের স্বার্থে। হুনিশ ভারতে ডি. এম কে ইন্দিরার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাঁর প্রতিকর্ষীদল এ, ডি. এম.-কে কে ওয়ার হারাবার জন্য। কেবলেও ইন্দিরার শক্তি আপের কুলনায় কিছুটা বহিত হলে শুনা যাচ্ছে।

মহার্যাষ্ট্রে ইন্দিরার জয়লাভের আশা নাকি তুঙ্গে হলে জনকেই হস্ত বারু করছেন। পশ্চিম বাংলায়

এভাবে ইন্দিরা যে অনেক বেশী আসন পাবে, সে বিষয়ে সবাই একমত, তাই সি. পি. এম. এখানে ইন্দিরা বিরোধী প্রচারে নেমে পড়েছে। জনতা দলেরও বিরোধী সি, পি, এম, কিন্তু জনতার চেয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের ক্ষমতা এত বেশী যে বামজোট ইন্দিরা বিরোধী পথসভা, মেয়াল লিখন ইত্যাদিকে বেশী জরুরী মনে করে সেই কাজে ব্যাপিয়ে পড়েছে। সি, পি, এম, ইন্দিরার বিরুদ্ধে একটাটা মাত্র সোবারোপ করছে এবং তা হচ্ছে যে শ্রীমতী গান্ধী স্বৈরতন্ত্রী।

অশুদ্ধতার ব্যাপার যারা নিজেরা নীতিগতভাবে স্বৈরতন্ত্রে স্থির বিশ্বাসী ও হাতে কন্মত। শেলে কেন্দ্রে চরম স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করে এদেশে নির্বাচনকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে বদ্ধপরিকর। তাহাই মাঝার ইন্দিরাকে স্বৈরতন্ত্রী বলে প্রচার চালিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে ও ক্ষমতা লাভের পথকে স্তম্ভ করতে সন্ম। বাস্তব। তারা কি ভাবে ও বিশ্বাস করে এদেশের জনগণ তাঁ সব ডেড়ে। কথায় ও উদ্বেগজনক স্বার্থক মিথ্যা প্রচারে বিপথগামী হয়ে ? বাস্তবে দেখা যায় অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। কারণ ভারতের বৃহত্তর জনসংখ্যা সি. পি. এম, বামজোট, ওখাক্ষিত বাম গণতান্ত্রিক ঘোটা ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের ভগ্নর আস্থা হারিয়েছে বহু পূর্বে। কারণ এদের অতীত ইতিহাস বলক কালিমায়া ভরা ও জাতীয়তা বিরোধী সব সময়েই। ভারতে জাতীয়তা-বাদী রাজনৈতিক শক্তি-বলর ঘুরে ফিরে কেন্দ্রীয় সরকার দখল করবেই কারণ এদেশের শক্তকণা আশী ভাগ লোকেই নীতিগত ভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি বিরোধী।

ভারতে যে সকল মানুষ রাজনীতি সচেতন তারা কেউই বিগত ১৯৪২ সালের “ভারত হাজো”

আন্দোলনের কথা আজও ভোলে নি আর সেই সময়ে বিশেষী রাজশক্তি ইংরাজের গোলামী ও দেশের মানুষের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি। অর্থাৎ আজিকার সি, পি, আই: ও সি, পি, এম—দুই দলই। এই বিশ্বাসঘাতকের দল সে সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কুইনলি বলতেও লক্ষ্যবোধ করেনি। এরাও এই ভোটের আসরে নেমেছে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা করার কল্পিত সন্ধিতে আর তাই জোট বেঁধেছে হালি বিশ্বাস ঘাতক জনতা (এস) দলের সঙ্গে যারা অধুনা লোকদল বলে খ্যাত।

পূরাতন ও মৃত্তন বিশ্বাস ঘাতকরা জোট বেঁধেই আর এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় কংগ্রেস, যার ইতিহাস ত্যাগ ও তিতিকার অলস্ত দৃষ্টান্তে সমৃদ্ধ, সেই কংগ্রেস কি ইন্দিরা বিধের বিবে অরহর হয়ে এই বিশ্বাসঘাতকত্বের সঙ্গে জোট বাঁধতে এলো মুন্সেফা ওয়াবর তুরাশায়? জাতীয় কংগ্রেসকে এটাই হীন পলা অবলম্বন কোরতে দেখে দেশবাসী মর্মাহত।

জাতীয় কংগ্রেসের শক্তি তথাকথিত নেতারা নয়, অগণিত দেশবাসী আর তাই তারা বিচলিত ও বিকৃত আজিকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ওপর। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে—কোন কংগ্রেস সাদা আর কোন কংগ্রেস বুটা—ইন্দিরা কংগ্রেস সাদা না জাতীয় কংগ্রেস সাদা?

বড়ই দুরূহ প্রশ্ন এটি। মনে হয় নির্বচন অস্ত্রে এ প্রশ্নের সহস্ররূপে দেবে নির্বাচিত কংগ্রেস (ই) বা কংগ্রেস সদস্যরাই তাদের সংখ্যাভয়ের মাধ্যমে, তখন আর কোন ধোঁকা বা সন্দেহ থাকবে না জনসাধারণ কাছে। জনতাল যারা মুখ্যতঃ জনসব ও আর, এস, এস প্রভাবিত তারাও মুসলমান ভোটারদের

হাত করার ভালে আছেন, চন্দ্রশেখর ও দলের অস্ত্রান্ত কর্মকর্তার কৌশলী প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে। তাই চন্দ্রশেখরও বুখারীর দরদায় জামা মসজীদে হত্যা দিতে শুরু করেছেন কেবল মুসলমান ভোটারদের ভোট পাবার আশায়। বুখারী সাহেব খুবই ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ, তিনি খেয়ে চেয়ে দেখছেন কে বেশী মূল্য দেবে তাঁকে। এই মূল্য আর অস্ত্র কিছুই নয়, কেবল মুসলমান ভাইরা ভ্যাকুয়েটে ঘেঁষেহুঁ সংখ্যাগুরু সেহেহুঁ তাদের আরো কিছু বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও যোগ্যতা না থাকলেও বড় বড় চাকরী অথবা সরকারী বড় বড় পদে তাদের বসাতেই হবে এবং এ ব্যাপারে যারা রাজি হবে অর্থাৎ যে রাজনৈতিকদল বা জোট বুখারীর দরদায় কোন ধর উৎসাহ রাজি হবে, তিনি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বা তাঁদের প্রার্থীকেই সমর্থন করেবেন জাতভাইদের স্বার্থে। বুখারী বা এই সব প্রকৃতির মানুষেরা ভারতে বাস করেও ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের কথা মোটেই চিন্তা করেন না। এঁরা নিজ নিজ জাতভাইদের স্বার্থ নিয়েই মগ্ন এবং সে স্বার্থ রক্ষা কোরতে গিয়ে এঁরা যে দেশে বাস করেন সেই দেশের প্রকৃত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতেও সন্ম প্রস্তুত।

স্বাধীন ভারতে এই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা মানুষ বা সম্প্রদায় বিশেষ কে আর কতকাল আমরা তোবামোদ কোরে চলবো ভোট পাবার আশায়? এই সর্বনাশা অবস্থা ও ব্যবস্থাকে আমরা যতশীঘ্র পরিহার করতে পারি তত শীঘ্রই দেশের ও দেশের মঙ্গল। সাম্প্রদায়িকতার প্রপ্রয় কি ভোট লোভী নেতারা ই দিচ্ছেন না? এদেশে কেউ যদি নিজেই হিন্দু বলে পরিচয় দেয় তবে তা ব্যাধি লাগে কারও

(বাকী অংশ ১৪ পাতায়)

বিজ্ঞানের নব দিগন্ত

॥ কালীদাস সরকার ॥

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চার্লস ডারউইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Origin of species by means of Natural Selections' প্রকাশ করে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, সৃষ্টির মূলে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু নেই। উদ্ভিদ, জীব, স্থাবর ও জঙ্গম কিছু পৃথিবীতে বর্তমান সবই প্রাকৃতিক রূপে আপন: আপনি জন্ম গ্রহণ করেছে। struggle for existence এবং Survival of the fittest হল জীবজগতের মৌল ধর্ম - Rule of Life. ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে ডারউইন প্রকাশ করলেন 'Descent of Man' গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি দেখালেন, মহাশয় মানবের উন্নত উদ্ভবপুরুষ। ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বিবর্তনবাদ বিশ্বের চিন্তাক্ষেত্রে গুরুতর বিপ্লব ঘটাল এবং নিরীশ্বরবাদী জড় দর্শনকে করল অধিকতর শক্তিসমৃদ্ধ। ডারউইনের মতবাদ শুধু জীব-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রইল না, তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রেও।

জড়বাদ প্রকৃতির প্রত্যক্ষভূত স্বরূপের বাইরে কোন কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ঈশ্বর পাণ-পূণ্য কর্মফল ক্ষমাস্তব প্রকৃতি জড়বাদীরা গঠিতে অর্থহীন, অসম্ভবাস মাত্র। নিরন্তর জীবন সংগ্রাম একমাত্র এই নিষ্ঠুর সংগ্রামে একমাত্র শক্তিমানের বেঁচে থাকার অধিকার—জীবধর্ম বলে স্বীকৃত হওয়ায়, বন্য দানবী প্রকৃতি ধর্মির অত্যাচারন মূল্যবোধ হারাল। মানবতাবোধের পরিবর্তে হান্সি নিদর্শনতা ও স্বার্থসর্বধতা হল নব সমাজচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু।

এবং শ্রেণী সংগ্রাম ভিত্তিক, সমাজ দর্শন এই জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিকতা এবং জাতীয়তাবাদ বিরোধিতা হল মার্কসের ইহুদী মানসিকতা জ্ঞাত অমুসিদ্ধান্ত।

জড়বাদের সহায়ক হল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান অকৃতপূর্ণ সাক্ষ্য। বিজ্ঞান সমাজ-সংস্কৃতিকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে জোগাল গতিময় প্রাণশক্তি। মানুষ ভাবল যে, বিজ্ঞান সাধন। পৃথিবী থেকে দুখ, দারিদ্র এবং অনাহারকে দূর্নিবৃত্ত করতে সক্ষম হবে। ধর্ম পন্থেক হাজার বছরের সাধনায় যা করতে সক্ষম হয় নি, বিজ্ঞান তা করবে। সে এনে দেবে অসাম্য ও তুর্দম; পরিকীর্তি বিবে এক স্তম্ভর, অমানবময়, লংকাহীন জীবন প্রবাহ। বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিছু তেমন তেমন কিছু করতে পারে নি। মানুষের লোভকে করেছে পরন্তর, সমাজ-সমস্যাকে জটিলতর।

বৈবয়িক উন্নতির কল সৃষ্টিময় ভাগ্যান্বয়ন করায় হওয়ায়, অসাম্যকে করছে তীব্রতর, ভাগ সম্প্রদা ক্ষীণতর এবং জীবন অধিকতর সংগ্রাম সংকুল। নৈতিক মূল্যমানকে বিদায় দেওয়ায়, ব্যক্তি স্বার্থ সমাজ জীবনকে করেছে কলুষিত, ভাস্কর এনেছে পরিবার ও দাম্পত্য সম্পর্কে। দেহের রোগ স্থান নিয়েছে মনে। মনের ভাবকে সহজভাবে প্রকাশ করার অক্ষমতা সর্বত্র সৃষ্টি করেছে এক সর্বনাশ চাপা অশান্তি। অস্ত্রের কাছে কেউই ধরা পড়তে চায় না, কি করে নিজের অভিপ্রায় কত-

শুধু চলেছে তারই কষ্টকর চেষ্টা। 'সিনেম' ও টেলিভিশন মাধ্যমের চিত্রগতিক বহির্মুখী করেছে, স্থল চিত্রার স্থান নিবেড়ে কঁচনা বিলাস। পরাক্রম, বার্তা এবং নিঃস্বচ্ছলনা মাধ্যমের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছে। জীবন হয়েছে অন্তঃসার শূন্য রঙিন কুণ্ডলীর মত।

এখানেই কিন্তু তার শেষ নয়। কল কারকার-বানার বিব বাপ্স বাতাসকে এবং নষ্ট ও সমুদ্রে পরিত্যক্ত রাসায়নিক অবশেষ জলকে দ্রবিত করে চলেছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু এই হারে ত্বরিত হতে থাকলে এমন দিন খুব দূরে নয় যখন পৃথিবী মৃত্যুবাসের অযোগ্য হবে। সেই দূরবর্তী আশঙ্কার চেয়েও গভীরতর সংকট সৃষ্টি করেছে আর্থবিক বোমার সাক্ষ্য মৃত্যুর।

ভাট জড় বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ধারার চিন্তা শুরু করেছেন। এই চিন্তার জনক আর্থবিক বিজ্ঞান।

এলবার্ট আইনস্টাইনকে বর্তমান বিজ্ঞান যুগের গুরু বলা হয়। আইনস্টাইন তাঁর 'সায়েন্স অ্যান্ড রিলিজিয়ান' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমার নিকট মাধু ধর্মবিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠ মানব বলে মনে হয়। কারণ এই ব্যক্তি ধর্মবাসনামুক্ত, এবং তাঁর সকল চিন্তা ও কর্ম তিনি ব্যক্তি জীবনের চাপের পাণ্ডুর উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। মানব সমাজে উচ্চতর জীবন ও মহতর লক্ষ্য স্থাপনের প্রয়োজনে প্রাচীন ধর্মের স্থান অপরিহার্য। যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত পৃষ্ঠি দিয়ে দেখেন, তার কাছে বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের বিরোধ লক্ষ্য হওয়া অসম্ভব।'

প্রখ্যাত কৈজ্ঞানিক স্যার জেমস জীবন তাঁর 'নিউ ব্যাকগ্রাউন্ড অব সায়েন্স' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জড় বিজ্ঞানী বস্তু ও তাপ বিকিরণকে কেন্দ্র করে গবেষণা করতে করতে দেখছে যে, সে প্রকৃতির রহস্য উদ্ভা-

(১২ পাতার পরের অংশ)

হিন্দুতা যে সংখ্যাগুরু, কিন্তু এসেছে কৃষাত-মুসলীম লীগ আজও আছে এবং তার। ব্যক্তি-নীতিতেও বেশ সক্রিয়, তবুও তারা সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন বলে সচরাচর কেউ অভিযোগ তোলেন না কেন? কি এর আসল কারণ? আসল কারণ ভোটের বাজারে এদের অনেক দাম। মোল্লাদের, মৌলভী সাহেবদেরও বিশিষ্ট খ্যাতিমান মুসলমান নেতাদের কাছে প্রিয় হতে পারলেই ভোটের বাজারে লক্ষ লক্ষ ভোট অনায়াসেই পাওয়া যায় আজও। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়, হরিজন, আনিবারী ও অজ্ঞাত অগ্রদূত জাতির ভোট পাওয়া যায় কাকে কাকে যেভাবে তাদের কঠোর বাস্তবতার সুপারিশে সেভাবে বর্ধ হিন্দু বা শিক্ত সম্প্রদায়ের ভোট এঁ একই কারণেই পাওয়া যায় না কেন? বর্ধ হিন্দু ও শিক্ত সম্প্রদায়ের মতবুদ্ধন বেশ বিচার বিবেচনা করেই ভোট দেয়, সব দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বহর যাচাই করে তবে তার আর আগে নয়। এবার এই বর্ধ হিন্দুতা, যারা প্রকৃত গণতন্ত্রী তারা যদি তাদের গণতান্ত্রিক স্বার্থ রক্ষার প্রতী হয় এবং সেই স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তবে কি তা কোন অসম্ভব হবে?

অবস্থাটা কি ঠাড়াবে? প্রত্যেকটি জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় যদি গোটা দেশের স্বার্থ না দেখে নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনে জড়া হয়, হবে দেশের সংহতি বিনষ্ট হতে বাধ্য। দেশের অমললগুলো কোন সম্প্রদায়ের মকল হতে পারে না। এট সত্য স্বরসম না করলে সকলেরই সমুদ্র সর্বনাশ হবে। প্রত্যেককেই জাতীয় ভাবধারার অংশীদার হতে হবে এবং কর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখে, দেশের সবার আঙ্গনিয়োগ করতে হবে সকলকেই। সমগ্র দেশের কল্যাণ সাধনে যে দল প্রতিশ্রুতি বদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য, নির্বাচনে তাকেই সমর্থন করতে হবে।

টেনে অসমর্থ। বীজগণিত পাঠের প্রথম দিন শিশুর
 A- নিকট x. y. z. যেমন অর্থহীন লাগে, কোটন
 ইলেকট্রন ও প্রোটনের প্রকৃতিও তেমনি পদার্থ-
 বিজ্ঞানীর নিকট আজ ধারণার অতীত বলে মনে
 হচ্ছে। আমরা বড়কোর এই x. y. z. এর গতি
 আবিষ্কার করে নিজেদের কাছে ব্যবহার করতে
 পারি, কিন্তু তারা কি বস্তু তা জানতে পারি নে।
 ফলে আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতি এমন এক স্থানে
 এসে থাড়িয়েছে আইনস্টাইন যাকে বলেছেন—এক
 অজানা থেকে আর এক অজানা উদ্ভব।

আধুনিক মানুষ সত্যিকারের জ্ঞানী ও নিরাপদ
 হতে পারে সে যদি মহাকাব্য গ্যোটের কথাটা মেনে
 চলে—যা চিন্তার অধিগম্য তাই নিয়ে মানুষ সবুট
 থাকুক, আর যা অচিন্তা তাঁর উদ্দেশ্যে সে ভক্তির ভরে
 নৌযাক তার মাথা।”

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী জর্জ
 রডারফোর্ড তার ‘ক্যান দি ম্যান বি মডিকায়ড?’ গ্রন্থে
 লিখেছেন, ‘বস্তুত: আমরা কিছুই আবিষ্কার করিনে,
 প্রকৃতির সম্পূর্ণ অপর্যবেক্ষণ করি মাত্র। চৌম্বকত্বের
 দ্বারা যা সৃষ্টি করি তা বহাৎজাতের দ্বারা সূক্ষ্ম ও
 সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের সাক্ষ্যের পিছনে থাকে
 বুদ্ধির অসম্য একটি স্বপ্ন অংশ। কিছু, যা বিচিত্র
 প্রাকৃতিক নিয়মের সংগে আকস্মিক ভাবে মিলে
 যায়। মানুষ তার এই সামান্য সাক্ষ্য থেকে
 ভাবতে শুরু করে যে, সেই বিশ্ব জগতের প্রভু।
 মানুষ অসম্য ইচ্ছাশক্তি বলে প্রকৃতিকে ভয় করতে
 চায় কিন্তু জীবনের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে যে,
 মানুষের সে অভিলাষ পূরণ হবার নয়। আমরা
 বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের পৌরব জ্ঞানের সঙ্গে যখন
 আমাদের দীর্ঘমত শক্তির কথা ভাবি দীনতার ওজন
 আমাদের নতবস্তুক হতে হয়।

সিমলাহিত ইতিহাস ইনস্টিটিউট অব অ্যাড-
 ভানসড্, টাডিক্স এর গবেষণা পত্রিকার বৈজ্ঞানিক
 জি পি চ্যাটজি মান অ্যাণ্ড অ্যাটম’ প্রবন্ধে বলে-
 ছেন—‘এতকাল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কার্যকারণ ও
 ধারাবাহিকতার অনড় সূত্রের দ্বারা নির্ণীত হয়ে
 এসেছে। পরমাণু গবেষণা এই সত্য উদ্ঘাটন
 করল যে প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি বুদ্ধির অসম্য।
 তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি প্রকৃতির চরিত্রকে
 সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ, তারা যে সত্য
 প্রকাশ করে তা হল প্রকৃতির সহিত মানুষের সংঘাত
 জনিত প্রতিক্রিয়া, ঐশ্বর্য ও ঐশ্বর্যের সমীক্ষাজাত
 অসুস্থিস্থা। পরমাণু এই নতুন ধারণার ঐশ্বর্য,
 বৈজ্ঞানিক সত্য নিরূপণের ক্ষেত্রে নব দিগন্তের
 উন্মোচক।

আণবিক জগৎ অতি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য ও কুহেলিকা-
 ময়। সেখানে আমরা আইনস্টাইনের অপেক্ষিক
 তত্ত্ব এবং দিরাক ও হাইসেনবার্গের সংঘাতত্ব অসু-
 সরণ করে পরমাণু বিভাজনে প্রবৃত্ত কিন্তু উক্ত
 তত্ত্বগুলির একটি সূত্র ও গাণিতিক নিয়ম অসুযায়ী
 সেখানে কাজ করে না। মানুষের আবিষ্কৃত কোন
 বৈজ্ঞানিক সত্যই পরমাণুর প্রকৃতি নিদ্বাণে সক্ষম
 নয়। জড় বিজ্ঞানের ইতিহাস সর্ব প্রথম রহস্য
 নির্ভিড় পরমাণু এক অজ্ঞেয় শক্তির অস্তিত্বের সম্ভাবন
 জানাল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক শক্তি বিভাগের
 অধ্যক্ষ বৈজ্ঞানিক টমাস - ই - মুরে “হাইড্রোজেন
 বোমা থেকে বিশ্বকে বাচাতে হলে জড় বিজ্ঞানের
 সহিত যবের সংযুক্তি আবশ্যক” এই থিসিসে
 লিখেছেন—‘জড় বিজ্ঞানের অগ্রগতি তার ভিত্তি
 ভূমিকে নাকড়িয়ে গিয়েছে। এই চিন্তাধর্মের আমি
 বহু নিরীক্ষণযোগ্য বিজ্ঞানীর মধ্যে লক্ষ্য করেছি।

বিশ্বশক্তির পিছনে সৈবী অভিজ্ঞাষের পুরাতন ধারণাকে এখন আর সৃষ্টিগত থেকে গোঁড়ামির সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া চলছে না। বিজ্ঞানীরা তাঁদের নব উপলব্ধির কথা স্বীকার করেন। আমার মনে হয় জড়বাদীদের মধ্যে ধর্মের বিশ্বস্তকর পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন প্রত্যাসন্ন এবং অচিরে ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের মিলন হবে।

এ সম্পর্কে বাদেব সাধনতন্ত্রে ধর্মকে আফিমের নেশা বলা হয়, এমন তারা কি বলেন?

ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, 'বাস্তবিক বয়স যত্ন থেকে উজ্জ্বল নির্মাণ পর্যন্ত সকল উদ্ভাবনই সামাজিক প্রয়োজন ভিত্তিক। তারা কোন নৈতিক অবলম্বন জোগায়নি। মানব কল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল্যায়ণ নিহিত। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি মূল লক্ষ্যে পৌঁছাবার সোপান মাত্র। লক্ষ্য আরো উচ্চতর। অস্ত্রাধীকে চিরন্তন, আকস্মিককে অত্যাশঙ্ক, অগ্নিস্বাধীকে অবিদ্যুর বলে গ্রহণ করার বিকৃত বুদ্ধিকে মুশিক্ষার বারান্ট শুধু দমন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে চিন্তাবিদদের ভূমিকা সর্বাধিক। চিরন্তন সত্যের দিকেই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য স্থানিষ্ট।'

সমাজবাদ চিন্তায় ধর্মকে স্থান দিলে স্বীকার করতে হয় ঈশ্বরবাদ, এবং সেট সঙ্গে ধর্মীয় পরি-

শীলন তরুণ। সমাজতন্ত্রের মূলে ঈড়ায় তখন চিন্তা, বাক্য ও ধর্মে ঈশ্বর নির্ভর আনুভূতির সাধনা ঈশ্বর নির্ভরতা জাগায় মানব প্রীতি ও জ্ঞানের প্রেরণা। এলবার্ট আইনস্টাইন তাই বলে ছিলেন; ধর্মবিহীন বিজ্ঞান পশু।'

আশ্চর্যের বিষয় যে জড় বিজ্ঞানীদের নব উপলব্ধি পাঁচ হাজার বছর পূর্বের উপনিষদের ঋষির সত্য দর্শনের সহিত কেমন মুলতর ভাবে মিলে যায়।

‘একোহবর্গো বহুধা শক্তিযোগাদ
বর্ণনেকানি নীতিতর্ষে’ মধাতি।

বীচিতিচাত্ত্রে বিশ্বমাত্রে সঃ প্রঃ
মনো বৃকঃ শুভ্যঃ সঃ মনুজুঃ।'

— শ্বেতাশ্বতর ৪।১

(যিনি এক ও অরূপ, শক্তির নিগূঢ় প্রয়োজনে বহু রূপে অভিব্যক্ত। যিনি সৃষ্টির আদি থেকে বিলয় পর্যন্ত সকল প্রকাশে বিরাজমান। তিনি আমাদের স্তম্ভবুদ্ধি ভিন্ন।)

সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের মূলীভূত জুজের্ড রহস্যময় শক্তিকেই কি আমরা বিশ্বজননী ভূগর্গরূপে আবাহন করি না? সে আবাহন কি ব্যক্তি পূজা কিংবা ঋগ্না পূজার চেয়ে শ্রেয়ঃ নয়? মার্কসবাদীরা কি বলেন?

— — —

যাবজীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনাস্ত
অব্যর্থ ফলপ্রসাদ

আমেরলা হুত কুমারী

আমুর্বেনিয় মতে ১০০০

মূল্য ৩.০০ অকস্মিক হুত

ব্যক্তিগত

প্রিঅবনীমোহন চক্রবর্তী

ফিলিপস কুমারী - কলকাতা - কলকাতা - কলকাতা - কলকাতা

(Contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs,	Date
Dist—NADIA			
Biswas Smt. Nilima	Kanaaripara, P. O. Santipur w/o Late Amal Biswas	100	29. 10. 78
Dist—BURDWAN			
Sarkar Smt. Lakshmi Bela w/o Late Rajendramohan	Vill Kesbia P.O. Katwa Burdwan Dt. P.O. Kbagra Murshidabad dt.	150	12. 6. 79
Chakraborty Smt. Usharani w/o Late Monmohan	8/12 Einstein Avenuc. Durgapur.5	100	28. 11. 78
Dist—HOOGHLY			
Singha Smt. Kamala Bela w/o Late Satya Sadhan Singha	Vill Natilpur P.S. Khanekul	100	10. 5. 79
Datta Smt. Latika w/o Late Kripanath	47 Ramsiraghat Street P. O. Bhadrakali	150 150	15. 6. 79 15. 6. 79
Dist—BANKURA			
Goswami Smt. Bimala Bela w/o Late Janaki Ballav	Vill Bhairebpur P. O. Amarkana	100	2. 3. 79
Dist—BIRBHUM			
Datta Smt. Kalidasi w/o Late Satya Das Datt	Vill Ahmodpur P.O. Sainthia	100	16. 3. 79
Dist—MIDNAPUR			
Bera Rajani Kanta Chatterjee Abani Bhusan	P.O. & Vill Pratapdighi P.O. & Vill Garbeta	200	15. 8. 72
Dist—JALPAIGURI			
Dasgupta Smt. Santibal w/o Jogendra Dasgupta	Vill Pabitrpara P.O. Jalpaiguri	250	22. 1. 79
Dist—WEST DINAJPUR			
Bose Harendra Mohan (alias Sankea Bose)	Ukilpara. P.O. Raigong	200	17. 12. 73
Goswami Smt. Santilata w/o Brojo Sudar Goswami	P.O. Bettalajerk Bera Raghunathpur	100	5. 6. 79
Ghosh Smt. Surabala w/o Late Amulya Ghosh	Khadimpara Mastarpara P.O. Balurghat	200	16. 4. 79

विश्वको अष्टकमाला

अन्योन्यं नमिच्छिन् विप्रश्च धर्मान्—अथैकैकं वाच्यम्—०

विद्युत् प्रकाशानुसङ्ग राशि-विद्युत्—प्रकाश-सम्बन्ध

শ্রীরাম কুমার দত্তের



- | | |
|---|---|
| ১। বাংলায় অগ্নিব্রহ্ম—১৫০ | ২। বর্তমানতে ভারতের বিদ্যুৎ প্রচেষ্টা—১০০ |
| ৩। অমূল্যমূল্য সমিতির পি. মি. বি. বি.—২০০ | ৪। বৌদ্ধী সংগ্রহ কাহিনী—১০০ |
| ৫। একোন্মী পদ্যসংগ্রহ—১৫৫ | ৬। ফলতা বাজার সংগ্রহ কাহিনী—৫০ |
| ৭। হাদিসবিহীন ও অমূল্যমূল্য সমিতি—১০ | ৮। বাবিন্দার পদ্যসংগ্রহ বা ও. মেরে—১০ |
| ৯। বিদ্যাকানন ও সমাজবাহ—৫০ | ১০। বিদ্যাকানন—৫০ |
| ১১। মহাভারত ও হৃত্যভাষ্য—১০ | ১২। শান্তকর্ম মনোভাষণ ও ভবিষ্যি নিবেদিতা—১৫ |
| ১৩। শেখ বাবের ভোগেনি (১)—১০০ | ১৪। শেখ বাবের ভোগেনি (২)—২০০ |
| ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আকাস—৫০ | ১৬। ১০১ প্রশ্ন জাতীয় শহীদ বিদ্যুৎ—১০০ |
| ১৭। হাতিম হত্য প্রচেষ্টা—১৫ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অমূল্যমূল্য সমিতি—৫০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পত্রিকা ইতিহাস—৫০ | ২০। লাট হত্য প্রচেষ্টা—১৫০ |

व्याख्यान :- १५१ वसुधैव कुटुम्बकम् कनिका-१००००१

टैक्स नं०—१/१/१/A बरिम छाटेबी गेट कनिकाडा-१२

— ५५ —

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗୁଣାଧ୍ୟାୟ (ମୁଖ୍ୟାତି) / ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହ, ଅନୁମୋଦିତ

जन्मावक-विनाशिक मन्त्रा वाच्योक्तौ

ଦିଆଯିବ ବିଶେଷ ଗ୍ରତିବିଧି—ପ୍ରକାଶନ ଯୋଗେ । ବେଢ଼ାଲା—ଶ୍ରୀକବିରାମ ନାଥ ।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীযুক্ত নন্দ লেনকড় । প্রচার বচনি—শ্রীযুক্ত সোম ।

ସିନିଗି ବାସନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ :—୫ମ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ଛାଡ଼ି, କଲିକାତା-୧୦୦୦୧

ପଞ୍ଜୀକ :—କ୍ରିଷିକା ବାବୀଜିନି, ୧୧୭ ଯେ କେବଳ ଯେଉଁ ଟି, କଲିକାତା—୧୦୦୦୦

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবমাসব্যব—১৯৭৪

নবম বর্ষ	শনিবার ১৬ই কান্তিক, ১৩৮৬ ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৯	৬ সংখ্যা
----------	---	----------

এই সংখ্যায়

অথ নির্বাচনী কথা

। সম্পাদকীয় ।

জয়প্রকাশজীর মহাপ্রাণ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক বসিনী মোহন বাপডত্ত ।

ভারতে স্থিতিশীল সরকার সর্বাগ্রগণ্য

। ঐক্যবীর অধ্যাপাধ্যায় ॥

একটি বিস্মৃত স্মৃতি চারণ

॥ ঐতিহ্যবাহু হুমায়ুন কুর্তাণাধ্যায় ॥

“মহৎ প্রচেষ্টাকে মহৎ দৃষ্টি
দিয়ে দেখলেই মহাবের
আসন লাভ করা যায়।”

—বাঘীজী ।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীনের সভা

বিপ্লবীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সার কথা ছিল সমগ্র ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারতকে খণ্ডিত করে বৈদেশিক শাসকদের হাত থেকে ভারতবাসীরা হাতে রাজনৈতিক শাসন অধিকার আসে। আমরা স্বাধীন হই। এই স্বাধীনতা লাভের ৩২ বৎসর পর আজ ভারতের রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও সংসদীয় গণতন্ত্রে যে শঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিয়া সমস্ত অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের এক বৃহৎ সমাবেশ আহ্বান করিয়া কোন কর্তব্য নির্ধারণের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা বিবেচনা করার জন্য সীমিত সংখ্যক বিপ্লবী বন্ধুদের আগামী ১১ই নভেম্বর রবিবার বিকাল ৪টায় ৬নং মিশন রোডে 'কিশোর ভবনে' এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হইয়াছে। আপনি বহু সময়ে উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিলে বাঞ্ছিত হইবে। ইতি—

নিবেদক—

ঔপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

"বিনোদ দত্ত

"ভবেন্দ্র নন্দী

"কালি কিশোর দে

"জ্যোতীশ মজুমদার

ঔপূর্ণ চট্টোপাধ্যায়

"পরেণ চট্টোপাধ্যায়

"নরনারায়ণ দাশগুপ্ত

"ভক্ত কুমার ঘোষ

"অখিল চন্দ্র নন্দী

ঔদীনেশ বটক

"প্রবোধ রায়

"শান্তি গাঙ্গুলী

"সুবোধ চন্দ্র রায়

২৪।১০।৭২

১১৭, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি-১৪

ফোন: ২৬-৪২২৬

পরলোকে বিপ্লবী মনতোষ চক্রবর্তী

আমাদের বিপ্লবী বন্ধু মনতোষ চক্রবর্তী গত ২০শে অক্টোবর, ১৯৭২ তারিখ কলিকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। ছাত্রাবস্থাভেদে তিনি অল্পসীলন সমিতিতে যোগ দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার তাঁকে কয়েক বৎসর কারাবাস করতে হয়। আমরা এই একনিষ্ঠ বিপ্লবীর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

জয়প্রকাশজীর মহাপ্রয়াণ

কালের গতি নিয়মানুসারে, অবশেষে জয়প্রকাশজীর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল অনেকদিন। নিশ্চয়ই জয়প্রকাশজীর অদম্য মনোবল, জীবন সূড়ার লড়াইয়ে তাঁকে সহজে পরাস্ত হতে দেখনি।

জয়প্রকাশজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট নায়ক। বৌধনের প্রারম্ভেই পার্শ্ব সুব্রহ্মচন্দ্রের লেড ত্যাগ করে, তিনি দেশমাতৃকার সেবার আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একান্ত একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর অবশ্য প্রাণ্য দীর্ঘকালবাস, নানা প্রকার নিপড়ন ভোগ ও দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে তাঁর নিশ্চিষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ব্যক্তিগত ক্রমতালাভ ও পদাকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিলনা কোনদিনই, যদিও সেগুলি তাঁর পক্ষে খুবই সহজলভ্য ছিল।

জয়প্রকাশজীর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও চিন্তাধারা বারবার নতুন রূপ ধারণ করেছে। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর কর্মক্ষেত্রে বহুগুণের সঙ্গে কখনও কখনও মতান্তর ঘটেছে। তবে তাঁর আন্তরিকতা, বমতে নিষ্ঠা এবং তাঁর নিজ ভাবধারা প্রসূত নীতিকে রূপায়ণ করার নিরলস প্রচেষ্টা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর পাণ্ডিত্য, তত্ত্বতাবোধ, জনস্বদ তাঁকে শেষের মতো জনপ্রিয় করেছিল।

১৯৪২ সালে তাঁর আন্দোলনের ভূমিকা বিশেষ ভাবে গৌরবময়। আজীবন গান্ধীবাদী হলেও, প্রয়োজনের মুহূর্তে দশদ্র বিপ্লব আন্দোলনও সংঘটিত করতে বিধা করেন নি।

সাম্প্রতিককালে তিনি যে আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন, তাঁর বিচার ভবিষ্যৎ কালই করবে। সে সম্বন্ধে আজ চুলচেরা বিচার করার সময় নয়।

আমরা এই বিশিষ্ট নেতার পরলোকগমনে অত্যন্ত ব্যথিত এক তাঁর উদ্বেগে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সমবেদনা জানাই ও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

অথ নির্বাচনী কথা

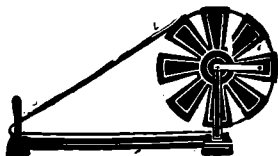
নির্বাচনের দিন যতই বনিবে আসছে, বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, আকস্মিক দলের স্বরূপ ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ব্যাঙ এর চাতার মত নতুন দল গজিয়ে উঠছে। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে দলের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনবধীকার্য। কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তার মৌল উদ্দেশ্য হল দেশের সেবা ও দেশের দলের মঙ্গলসাধন করা। এই সত্যটা সবাই যেমাসুম ভুলে গিয়ে, দল, গোষ্ঠীর প্রাধান্য স্থাপন করাকেই সর্বতোভাবে প্রাধান্য দিচ্ছে। এই মৌলনীতি থেকে তারা কতদূর বোঝেন পূর্বের সত্ত্বা যাকে, তার প্রমাণ মিলবে তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়েই। নীতি এবং উদ্দেশ্যের কোন বালাই নেই। আছে ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষমতালিপ্সা ও ব্যক্তিগত অর্থিক সমৃদ্ধতা সমাধানের জন্য হীন প্রচেষ্টা। এবং এই মানসিকতা ও মতলব হাসিল করার জন্য যুঝাযুঝি স্ববিধাবাদের আশ্রয় নিতে অনেক দলই কোন বিবেকের সংশয় অনুভব করেছে না। মুখে সাম্প্রদায়িকতা, আকস্মিকতার নিন্দা করলেও, ক্ষমতা লাভের মতলব নিয়ে সাম্প্রদায়িক ও আকস্মিক দলের সঙ্গে অদৃষ্ট রকমের আভাত গড়ে তুলতে কোন প্রকার যিধা অনুভব করছেন না। কাল যে শত্রু ছিল, আজ সে বন্ধু হচ্ছে। কাল যার নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল, সুবিধামুদায়ী আজ তার গুণগান করছে। কাল যাকে সমর্থন করবে না বলে জিগির তুলেছিল আজ স্বার্থের প্রয়োজনে তার সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করে জোট বাধতে কসুর করেছে না। এর মধ্যে মৌল নীতি, উদ্দেশ্য, মানবীর মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের কোন অস্তিত্ব বা গুরুত্ব দিচ্ছে না। সুবিধাবাদকে এরা একটা রাজনৈতিক মতবাদে পরিণত করেছে। যে যেখানে ক্ষমতার আসন দখল করেছিল, সেখানে কি প্রশাসন, কি জনগণের সমৃদ্ধতা সমাধান, কি দেশের কল্যাণ সাধনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেও নির্লজ্জ, বিবেকহীন, আদর্শহীন দলগুলি আবার জনগণকে বোকা দিচ্ছে, ক্ষমতা পুনর্দখল করার জন্য। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে, প্রার্থী নির্বাচনের কাজ যতই ঘরানিত হবে, এদের স্বরূপ ততই আরো প্রকট হয়ে উঠবে। কিন্তু দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে, এদের এই হীন চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতেই হবে এবং সে কাজ করতে হবে আগামী দিনের নির্বাচনের মাধ্যমে। এ কাজে কুটি হলে, দেশের মানুষ নিজেরাই নিজেদের সর্বমাল্য ডেকে আনবেন এবং সেজন্য সম্পূর্ণভাবে তারা নিজেরাই দায়ী থাকবেন।

একবার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর দিয়ে গত কয়েক বৎসরে যে

সব ঘটনা ঘটেছে, তার বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। গত দুই, আড়াই বৎসরে দেশটা বনভঙ্গ স্বরূপে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। “অন্ধকারের অন্ধরেতে অন্ধমানস” বরষে প্রতিনিবৃত্ত। কোথায় আলো, কোথায় আলো বলে দেশের মানুষ পরিগ্রাহি ডাক ছাড়ছে। বিশেষ দৃষ্টাংগা পশ্চিম বাংলার উপর, আক্ষরিক অর্থেও নৃচোভেস্ত অন্ধকারের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। যার কলপ্রতি কত ভীষণ এবং সুদূর প্রসারী হবে, তা অসুমান করলেও, অন্তরাশ্বা উদ্বেগে ও ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠছে। পূর্বতন সরকারের পতন ঘটবার পর, একমাত্র উদ্বেস্ত ও কাজ হয়েছে, জিৎসাসা প্ররতি চরিতার্থ করা। কমতাসীন দলগুলি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার গ্রানি নিয়ে একটা হাস্যরোহকারী অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে কমতাসীন দলগুলির এ কলঙ্ক দূরপনের। এমন মাত্রাজ্ঞানহীন এবং শোচনীয় অপদার্থতার নম্বির ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অসুমান করে খুঁজে পাওয়া বাবে কিনা সন্দেহ। এদের মসীলিপ অধ্যায়গুলো সমীক্ষা করলে এটা খুব সহজে এবং স্বচ্ছ ভাবে প্রমাণিত হবে যে সুবিধাবাদের মোকায় সবাই বোলাজলে কয়লা ভুলভেই বাস্ত ছিল এবং এখনও আছে। দেশ ও দেশের মানুষের কথা এরা বেমানাম ভুলে গিয়ে এই ভারতভূমিতে সর্বক্ষণী মৈত্রোর মত দাপাদাপি করছে। এবং স্বাভাবিক নিয়মে এই সব মৈত্রোর সর্বগ্রাসী ক্ষা পরিপূর্ণ ভাবে মেটেনি বলে। আবারও এলো মোলো করে দিয়ে লুটেপুটে খাবার জস্ত কোমর বাঁধছে। পরিগ্রাণায় সাবুদাম, বিনাশায় চ ছুড়তাম, ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন আমাদের শাস্ত্রকাররা ভয়সা দিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও তারা বলেছেন যে তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার জস্ত যুগ প্রাপ্তিও চাই। মানুষেরও কর্তব্য আছে। তাদের সংপ্রবৃতি, দেশহিতৈষণা ও সমুজ্জল আদর্শ ও মানবতাবোধকেও জাগ্রত করে ফুলতে হবে। অন্ধার অবিচারের সঙ্গে কোন আপোষ না করে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে চরিত্রবল নিয়ে, আদর্শ নিষ্ঠা নিয়ে, বহু জনহিতকারী ব্রত নিয়ে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা আরো করব। কিন্তু সর্বপ্রথম যে কর্তব্য হবে সেটা হবে, বার্থ, অযোগ্য, নীতিহীন, দেশপ্রেমহীন কোন দল বা মানুষকে সমর্থন জানান হবে না। যারা রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহণ করে, সমাজে সুবিধাবাদ, ভ্রনীতি ও মুনাকা সংগ্রহের কাজে বাপ্ত ছিল, তাদের অক্ষুৎ হিসাবে গণ্য করতে হবে। দেশে হুন্দির পরিস্থিতিক বার। বিনষ্ট কয়েক, তাদের কোন ক্ষমা নেই।

একটা কথা এখন বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। স্বেচাধিকার লাভ করার সকলতা এই জনবায় সহজে ঘটেনি। এক্সত বহু শ্রম, বর্ম, অক্ষম ও বক্ত দান করতে হয়েছে। বার্তা একালে আত্মনিবোধ করে এই অধিকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাপ্তিষ্ঠিত করেছেন, তাবা একটা বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনেরও প্রবক্তা ছিলেন। হেলাফেলা করে, কিছু অর্থ উপার্জন ও মুষ্টিমেয় মানুষের সুবোধ সুবিধা আদায়ের জস্ত এ কাজ করেননি। তাদের মহান উদ্বেস্ত ছিল, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন করা। সামান্য কয়েকজন মানুষ যাতে ক্ষমতা দলল করে সংখ্যা-

গরিষ্ঠের ক্রায়া অধিকার প্রতিষ্ঠা না করতে পারে, এই ভোটাধিকার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই। নিজেদের পছন্দমত সরকার গঠন করে, নিজেদের সৌভাগ্য বচনা করতে পারে, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার আদায় করার এটাই অবিচল লক্ষ্য ছিল। কিংবা অর্থাৎ যদি ভোটাধিকার প্রাপ্ত মানুষেরা তাদের প্রাপ্ত অধিকার সঠিক ভাবে প্রয়োগ না করেন ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের জন্য তবে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থকে তারা বিপন্ন করবেন নিশ্চিত ভাবেই। তারা ভোটাধিকার পাওয়ার অযোগ্য বলেই নিজেদের প্রমাণিত করবেন। তার ফলস্বরূপ হবে পৃথিবীর প্ৰবাসীরা ও সংগ্রামকে ব্যর্থ করা এবং উত্তরশ্রমীদের ভবিষ্যৎকে বিনষ্ট করা। এই প্রত্যাবাসের জন্য বর্তমান ভোটারদের কোন ক্ষমতা থাকবে না এবং ইতিহাসে তারা মনুষ্য নামের অযোগ্য বলে চিহ্নিত হবেন। সুতরাং সময় ও সুযোগ যখন এসেছে, তখন যোগ্য ও নিষ্ঠাবানদের নির্বাচিত করাই হবে একমাত্র কাজ। দেশে দ্বিভাষী সরকার করা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, দেশে গণতন্ত্রকে কায়েম করতে পারেন, দেশ ও সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারেন, দেশের মানুষের মনে উচ্ছানন্দ, মাননীয় দলবোদের ও দেশপ্রেমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহাই, কেবলমাত্র তাহাই সমর্থন পাবার যোগ্য এই মানসিকতাকে সদা সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে।



রাষ্ট্রপুরু মুরেজু নাথের স্মৃতি কথা

[“A Nation In Making” গ্রন্থ থেকে অধ্যায়]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

পরোক্ষ প্রভিয়োধ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতঃপর এই জাতীয়তাবাদী দলটির সমস্ত উপদলীয় গোষ্ঠিগুলি এক হয়ে হুগল এবং শিক্ষিত মুসলমানগণও কংগ্রেসের মতো এসে আসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাঁড়ালেন। একাবদ্ধ হয়ে সাক্ষ্যের সহিত কাজ করার সম্ভাবনা আর কখনও এরূপ আশা বাজত হয়ে উঠেনি। কিন্তু পুরান দিনের বিভেদও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কর্ম প্রণালির প্রতি আকর্ষণ মানুষের মেজাজ ও প্রকৃতির মধ্যে বহুদূর থাকে, আর তার উপরে থাকে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ। সেগুলি তো আর এক দিনে দূর করা যায় না। তাই সেগুলো কিছুদিনের মধ্যে আবার কংগ্রেসের কাজের মধ্যে প্রকাশ পেল। ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের সমস্ত মিসেস বেনাভু কংগ্রেসে যোগদান করেন। মিসেস বেনাভু ছিলেন এ যাবৎ কাল বিবোসক্ষিক্যাল সোসাইটি ও হিন্দু শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তার বায়িতা তার বলিষ্ঠ ব্যক্তির, অস্বাস্থ্য পরিত্রাণ করার সামর্থ্য ও সংগঠন ক্ষমতা অগ্রদূতের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই জাতীয় দলের বিভিন্ন গোষ্ঠিকে একত্র করার কাজে তার বিশেষ হাত ছিল। তিনি জর্জিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন; ভারতের বিভিন্ন স্থানের নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের কারো কারো সঙ্গে চিঠি পত্রের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠভাবে সাংযোগ রক্ষা করেন।

১৯১৫ সালে যোগেতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বঙ্গল তখন তিনি একটি হোমরুল লিগ গঠনের এক প্রস্তাব বিবেচনার জন্য একটি সভা আহ্বান করেন। এই সংগঠনের কাজ হবে হোমরুল বা স্বাভাবিক শাসনের প্রশ্ন নিয়ে প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া। এই সম্মেলনের বিভিন্ন সভায় আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম। সে সময় একটা সংগঠন হলে তা কংগ্রেসের উপর চাপ বসবে ও শাকে ঢেকে ফেলবে এবং ইয়ত বা শাকে ছুসলও করে ফেলবে। ফলে সে সময় আর হোমরুল লিগ গঠন হল না। কিন্তু মিসেস বেনাভু তার সে ধারণাকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নি এবং পরবর্তী কালে সেই লিগ গড়ে তোলা হয়।

সেই পুরান দিনের ঘটনাগুলির স্মৃতিকে পুনরাবৃত্তি করে তোলায় কোন ইচ্ছা আমার নেই। আর এখন তা প্রায় সকলে ভুলেই গিয়েছেন। তাহলেও একথাটা আমাকে বলতেই হচ্ছে যে কংগ্রেসের মধ্যে পুনর্মিলন সাধিত হওয়ার পরে এই লিগই সর্বপ্রথম কংগ্রেস শিবিরে বিভেদ ডেকে আনে। আমি এই লিগে যোগদান করিনি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতিদের মধ্যেও খুব বেশী কেউ এই লিগে যোগদান করেনি। কলে আমি কিছুটা অপ্রিয় হয়ে পড়লাম। কিন্তু অপ্রিয় ভাঞ্জন হওয়াটা রাজনৈতিক জীবনে একটা স্থায়ী ব্যাপার নয়। দেশের স্বার্থ কি হলে সবচেয়ে ভালভাবে

রক্ষিত হতে পারে সে বিষয়ে আমার যে ধারণা তা রক্ষা করার জন্য আমার সহকর্মী বন্ধুদের সহিত এক বোঙ্গে সে রূপ অগ্রিম হস্তান্তর কৃতি নিতে চর করিনি। কিন্তু হার? সে সব বন্ধু আচ্ছ আর বেঁচে নেই। কংগ্রেসকে গড়ে তুলতে আমি সাহায্য করেছি, কংগ্রেস ছিল আমার জীবন কর্মেরই একটা অঙ্গীভূত ব্যাপার, আমার পূর্ব, আমার একটা অধিকার। সুতরাং আমার শব্দে এমন কোন কাজ করা সম্ভব হবে না বা, আমার মতে, কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষয় করতে পারে অথবা দেশবাসীর কাছে কংগ্রেস যে মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে তা অবনতি করতে পারে।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তরীণে আবদ্ধ হস্তায় পরে আমার উপরে হোমরুল লীগে যোগদান করার জন্য প্রবল চাপ দেওয়া হয়। এরূপ প্রবল ও দৃঢ় চাপ আর কখনও দেখা হয়নি। এই সময় আমি ছিলাম ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এক জন সদস্য পদ প্রার্থী। একজন ভোটার এবং তিনি আমার একজন বন্ধু—আমাকে লিখে জানানলেন যে আমি যদি হোমরুল লীগে যোগদান না করি তা হলে তিনি আমাকে ভোট দিবেন না। আমি এরূপ প্রস্তাব বা শাসনিকে কোন আমল দেইনি।

হোমরুল লীগের সেক্রেটারী আমকে পর লিখলেন যে আমি যদি লীগে যোগদান করি তা হলে আমাকে সর্বসম্মতিক্রমে লীগের কলকাতা শাখার সভাপতি নির্বাচন করা হবে এবং আমার ইম্পেরিয়াল নির্বাচনে বিরোধিতা করা হবে না।

আমি আমার রাজনৈতিক কর্ম-জীবনে কখনও ভ্রষ্টুটিতে ভীত হইনি বা ক্ষমতার প্রলোভনেও প্রলুপ্ত হইনি। এমনকি যখন কোন বিষয়ে কোন-রূপ বাতির করার সুযোগ আমার বন্ধু বা সহকর্মীদের

হাতে ছিল তখনও আমি এই একই নীতির অমুসরণ করেই কাজ করেছি। ভীতি প্রদর্শনে বা প্রলোভনে গড়ে আমার উদ্দেশ্য থেকে বা আমার বিবেকের নির্দেশ মত কাজ করার মনোভাব থেকে বিচ্যুত হইনি।

মিসেস বেনাভুকে আমি পূর্বেই জ্ঞাত করি, তার জনসেবা-মূলক কাজেরও আমি উচ্চ প্রশংসা করি। কিন্তু হোমরুল লীগে যোগদান করার ব্যাপারে আমার যে আপত্তি তা তার অন্তরীণের ফলে কোনক্রমেই লঘু হবে যায়নি। তবে তাকে অন্তরীণ করার হৃৎকেন্দ্রক ঘটনার বিরুদ্ধে যে সাধারণ প্রতিবাদ হয় তাতে আমি সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাঙ্গীকরণে যোগ দিয়েছি। আমি এই স্বকম দুইটি প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেছি। তার একটি হয়েছিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলের বাড়ীতে, আর একটি হয়েছিল কলকাতার টাউন হলে এবং যে কোন হোমরুল লীগের সদস্যের মতই তাঁর ভাষায় সেই অন্তরীণ আদেশের নিন্দা করেছি। ১৯১৭ সালের কংগ্রেসে মিসেস বেনাভুকে সভাপতি পদে নির্বাচন করার জন্য যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার মূলে ছিল তার প্রতি এই অন্তরীণ আদেশ। যে কথা আমি পূর্বেই বলেছি, লক্ষ্যে কংগ্রেসে এই জাতীয় সংগঠনের মধ্যে যে একা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ভাবনের প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায় হোমরুল লীগ গঠনে, আর বিতর্ক লক্ষণ দেখা দিল মিসেস বেনাভুকে কংগ্রেসের সভাপতি করার আন্দোলনে। অতুলনার নিষ্ঠার সঙ্গে যিনি মাতৃহৃদয় সেবা করে বাজিলেন এরূপ একজন প্রতিভাশালিনী মহিলাকে অন্তরীণ করার সাধা বেশ উত্তেজনার জলে উঠলো। লোকের মনে এই ধাক্কা ছিল যে স্বাধীন শাসনের জন্য তিনি যে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে বাজিলেন

তাকে অঙ্গীশ করে গভর্ণমেন্ট সেই আন্দোলনকে শিবে মারতে চাইছেন। আবার প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃগণ সব শিবালের এক বাঁর মত এক অক্লান্ত পারিবারিক হুব সাদৃশ্যে আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে ক্রান্ত না করলেও উপেক্ষা করে যে সব উক্তি করে চলছিলেন তাতে দেশের লোকের মনোভাব আরও দৃঢ় হল এবং তা আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুলল।

এ কথা বলা অস্বাভাবিক হবে না যে গভর্ণমেন্টই এমন একটা উদ্বেজনার সৃষ্টি করে দিলেন যার ফলে মিসেস বোম্বার্ড কংগ্রেসের সভাপতির পদ লাভ করলেন। আমলাতন্ত্রের কাক্ষের দ্বারা প্রায় সময়ই এই রকম চলে আসছে। তারা এক নিম্নর বাতাবরণের মধ্যে থাকেন। জনমতের শক্তি ও প্রসার কতখানি তা তারা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারেন না ফলে ঘটনাচক্রে তার কাছে হার মানতে হয়। আমলাতন্ত্র যদি আগে থেকে বুঝতে পারতো যে মিসেস বোম্বার্ডকে অন্তরীণ করলে তার ফলে কি রকম আন্দোলন দেখা দিতে পারে, তা হলে হয়ত তারা তাকে অন্তরীণ করতেন না। এ কথা ঠিক যে মন্ত্রী গভর্ণমেন্টের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে একজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন। কিন্তু তিনি সারাটা জীবনই একজন আমলার মতই কাটিয়েছেন। তাকে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নিয়োগ করার লর্ড মর্লির শাসন সংস্কারের যে অভিপ্রায় ছিল তার একটি শর্ত পূরণে তা বাধা দেবে। লর্ড মর্লির ইচ্ছা ছিল গভর্ণমেন্টের উচ্চতম পরামর্শদাতা পরিষদগুলিকে জনমতের সঙ্গে সম্পর্কিত করে রাখা। সে যাই হোক, এ রকম একটা ভুল তারা করে বসেছেন। বাস্তবিকই গভর্ণমেন্টের পক্ষে এটা একটা প্রচণ্ড ভুল হয়েছে।

এই ভুলের জের বেশ কিছুদিন ধরে চলে। তবে মি. মন্টেগু ভারত সচিব হওয়ার পরে ইতিবাচক এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। মিসেস বোম্বার্ডকে মুক্তি দেওয়া হল। এই মুক্তিবান ভারতের জনমত যে ভাগ্যবশত হকে তাই আর একবার প্রকাশ করল। এই জনমত জাগৃতির বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলায় এক অক্লান্ত উপায়ে আরও প্রদর্শিত হয়েছে।

মিসেস বোম্বার্ডের অন্তরালের ফলে পরোক্ষ প্রতিরোধের প্রসঙ্গ সামনে এসে দেখা মিল। এই পরোক্ষ প্রতিরোধের ধারণাটি কার তা বলা কঠিন। হয়ত মি. গান্ধীই এর উদ্ভাবক। বাই হোক, পণ্ডিত মন মোহন মালব্য কলকাতায় এলেন এক বক্তৃদের এক ছরোয়া বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। আমি তখন কলকাতায় ছিলাম না; হাওয়া পরিবর্তনও কিশোরীর জন্ত রূচিত ছিল। আমি বুঝতে পারলাম যে আমার বাংলার বক্তৃদের মনোভাব এই সুবৃহৎ রাজনৈতিক অত্র হিসাবে পরোক্ষ প্রতিরোধের বিরোধী ছিলেন। অগ্রসর পড়েই বোম্বার্ডে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। প্রবীণ প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে আমিই সে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম। পরোক্ষ প্রতিরোধের পক্ষে তখন বেশ একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিল। তবে আমাদের বাঙালী বক্তৃদের মধ্যে সকলে না হলেও অন্ততঃ অধিকাংশই এই পরোক্ষ প্রতিরোধের বিরোধী ছিলেন। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা বাস্তবিকই একটা কঠিন ব্যাপার। একটি নিষ্ঠুর সভায় বসে আমরা আমাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করলাম। আমি যখনই কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তখনই আমি কেবলমাত্র কৌশল অবলম্বন

করাই কার্যকর বলে মনে করছি। আমি প্রস্তাব আলোচনা স্থগিত রাখার প্রস্তাব করে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির বিবেচনার উপর তা ছেড়ে দিতে বলি। এইভাবে কিছুটা সময় পাওয়া বাবে; তৎকালীন উদ্বেজনাও দূর হবে; স্থগিত বিচার ও সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। এই পন্থা অমুসরণ করাই বিজ্ঞ-জনোচিত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

যে প্রস্তাবটির খসড়া আমরা প্রেরণ করলাম তা উত্থাপন করার ভার দেওয়া হল মি: (বর্তমানে স্যার) প্রভাস চন্দ্র মিত্রের উপর। প্রথম দিনে যখন প্রেরিত বিবেচনার জন্ত ওঠে তখন সকলেরই মনোভাব ছিল বেশ উদ্বেজনা পূর্ণ। প্রেরিত নিয়ে বিতর্কের সম্পূর্ণ সুযোগ আমি মিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে দীর্ঘ আলোচনা হওয়ায় সভা স্থগিত রাখতে হল। পরের দিন যখন আমরা আবার মিলিত হলাম ও আলোচনা শুরু করলাম, তখন দেখা গেল যে পূর্বদিনের উত্থাপন অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছে। ঐটাই আমি আশা করেছিলাম। বক্তার পর বক্তা উঠে বক্তৃতা করলেন। পরে মি: ভিলক উঠে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে কালেন যে প্রেরিত নিয়ে বিবেচনার জন্ত একটি কমিটি গঠন করা হোক। এইবার স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র তার প্রস্তাবটি তোলবার সুযোগ পেলে খেলেন। তিনি উঠে বললেন যে প্রস্তাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এটি বিবেচনা করে রিপোর্ট পেশ করার জন্ত প্রাদেশিক কমিটির নিকট পাঠান হোক। রিপোর্ট পেশ করার জন্ত একটি সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। অকটোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই তা দিতে হবে বলে সাব্যস্ত হল। প্রস্তাবটি কার্যতঃ এক বকম সর্বসম্মতি ক্রমেই গৃহীত হল এবং ঘটনা

দৃষ্টেই বা বোঝা যায়, একটি কঠিন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল। সভায় সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যেই একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল বলে মনে হল। তা হল এই যে কত ভাড়াবাড়ি গভর্নমেন্ট স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তাদের ঘোষণা বাণী প্রকাশ করবেন এবং সে ঘোষণা যদি আগামী অক্টোবর মাসে যখন লিখিত ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা বসবে তার পূর্বেই প্রচার করা হয়, তা হলে পরোক্ষ প্রতিরোধের ভাবনার মূলে যে উদ্বেজনা ও ক্রোধ রয়েছে তার প্রশমন ঘটবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশ আইন সম্মতই হোক, আইন-আইনীই হোক, তা অস্বীকার করে শেষ পর্যন্ত অমান্য করার আন্দোলন করতে গেলে তাকে ঘিরে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দেয় বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের কঠোর অগ্নি পরীক্ষার পুড়ে আমরা বাঙ্গালীরা তা ভালভাবেই জেনেছি। বরিশাল কন্ফারেন্সের ঘটনাগুলির কথা তখনও আমাদের মনে ভাঙা ছিল। দেখানে আমরা পরোক্ষ প্রতিরোধ নীতি অমুসরণ করেছিলাম। ফলে সেখানে বা অসিছে তা হল এই সিরাজ গঞ্জ ও বার্ণারিগাড়ায় এবং অস্ত্রাশ্রয় স্থানে সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি অত্যাচার অপমান করা হয়েছে, শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাও অসম্ভব হতে স্বদেশী কর্মীদের উপর নির্যাতন চালান হয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি যে যদি খুব বেশী সংখ্যক লোকের আন্তরিক অঙ্গীকৃতি পেছনে না থাকে, যদি বহু সংখ্যক লোক নির্যাতন ভোগ করতে প্রস্তুত না থাকে তাহলে পরোক্ষ প্রতিরোধ সামলানো সম্ভব হতে পারে না। আমরা এমন কোন নিশ্চয়তা দেখতে পাইনি যে এ বকম কোন অবস্থার দৃষ্টি তখন দেশে হয়েছিল। কাজেই আমরা পরোক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত রাখার

সিদ্ধান্তে পুঁসীই হয়েছি। এতে আমরা বিশ্বস্তি নিয়ে ভাববার ও বিবেচনা করার সুযোগ পাব; এবং এও আশা করেছিলাম যে পরিস্থিতি এমন ভাবে গড়ে উঠতেও পারে যাতে পরোক্ষ প্রতিরোধ অনাবশ্যক ও অব্যক্তি বলে মনে হবে।

ইতিমধ্যে বাংলার এই সমস্যাটি একটি কঠিন আকার ধারণ করল। কতকগুলি ঘটনা ঘটল যার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে কথাটি এগন বর্ণনা করছি। মিসেস বেনাটের অমৃতবীরের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বাড়ীতে যে সভা হয়েছিল তার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি করে এবং এটা ছিল একটা প্রাথমিক আলোচনা সম্মেলন। মকঃবলের প্রতিনিধিগণকে তাতে যোগদানের ক্ষমতা আমন্ত্রণ জানান হয়নি। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে পরে টাউন হলে আর একটি সভা করা হবে এবং শেরিফ হবেন সে সভার আহ্বায়ক। মকঃবলের প্রতিনিধিগণকে সে সভায়

আলোচনার অংশ গ্রহণের ক্ষমতা বলা হবে। তদনুযায়ী সভা ডাকার ক্ষমতা এক অমুরোধ পত্রে সেই করে শেরিফের কাছে দেওয়া হল। সভার তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল এবং স্থায়ী রাসবিহারী বোম্ব সভাপতির কার্য পরিচালনা করবেন, তাও স্থির হল।

ইহাং শোনা গেল যে সরকার এই সভা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সভা ডাকার অমুরোধ পত্রে যার। সেই করেছিলেন, অনরাকে মিঃ কামিং তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ক্ষমতা থেকে পাঠালেন, গভর্নমেন্টের আদেশ তাদের জানিয়ে দেওয়া হল। এই নিষিদ্ধকরণের ক্ষমতা কার্যগুলির মধ্যে একটি হল এই যে এক প্রাদেশিক সরকারের কোন আদেশের দমালাচনা অপর কোন প্রদেশের লোকদের দ্বারা করতে দেওয়া যায় না। একজন নতুন আন্তঃ প্রাদেশিক আচরণ তত্ত্বের কথা ইতিপূর্বে আর আর কখনও শোনা যায়নি। এতে সকলেরই হাসি পেল। (চলবে)

স্বাস্থ্যের পেটের ব্যথা, অম্ল, অসীর্ণ ও পেটের বেদনার
অব্যর্থ ফলপ্রসূ

আমেলা হুত কুমারী

আয়ুর্বেদীয় ঘাত ১২০০ মূল্য ৩.৫০ এক প্রদর্শন করুন
খ্যতিমান গ্রীষ্মবতীমোহন চক্রবর্তী
কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা

একটি বিস্মৃত স্মৃতি চারণ

ঐতিহাসিক স্মৃতি মুখোপাধ্যায়

১৯২২ সালে-এর জুলাই মাস-এর শেষ দিক। আমি তখন ঢাকা হল-এর ইষ্ট ব্যারাকের পাঁচ নং কামরিতে বাসিন্দা, এবং ঐ জুলাই পর্য্যন্তই হইতে বলায়ান এম্. এল্.সি হুজুর। আমার পূর্ণকালিক পরিচালক বীরেন চন্দ্র রাই-এর দ্বিতীয় জন্মদিনের কথা। তিনি ঐ হল-এর নর্থ ব্যারাকের দশ নম্বর ঘরের প্রবেশ চন্দ্র দাস-এর কক্ষস্থ। উভয়েই আমার শেষ বয়স এম্. এল্.সি হুজুর।

অকস্মৎ এই ক্ষণে যে বীরেন বাবু ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ হইতে বি.এল্.সি পাশ করে কলিকাতা স্কটিশ কলেজে আসিয়াছেন। ব্রিটিশ কলেজে আমি তাঁর অর্থ দিলাম। ঐ সময় হইতে তিনি আর কোন বোগ্যবোগ্য রাখেন না। প্রথম সাক্ষাতেই সত্যী সত্যের সাক্ষ্য দিই যে আমারই হলের লোক আমিই হইলাম। সে বাহা হউক ঐ দিন সত্যায় রমনার বাড়ি তাঁর নিকট হইতে ১৯২৮-২৯ এর জুলাই-এর পঞ্চম ঘটনা হলো আমলা-উল্লেখ।

১৯২৮ সাল-এর ডিসেম্বর-এর গার্লস অধিবেশনে প্রধান বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে "কংগ্রেস" বটনে মতানৈক্য ঘেঁষা বেগুলাতে ১৯২৭ সাল-এর যেদিনোপূর্ব জেলে সুবীত "এক" পাঠি পড়ন প্রত্যয় বাহ্যত হয়। সুদৃঢ় পক্ষে জাঃ বাহুগোপাল মুখার্জি, মনোহর চন্দ্র আর অশ্বত্থামান পক্ষে মহারাজ টেলোকা, চক্রবর্তী, বসিঃসেন প্রমুখ ঠিক করেছিলেন যে এরাও বাকিদের সঙ্গে একত্রে কাজ করিবেন।

এই কংগ্রেস অধিবেশনে অশ্বত্থামান সমিতির বাহ্যিক ও অন্তর্য্য প্রবেশের সুখ কলীয়া উপস্থিত ছিলেন। প্রবীণ বিপ্লবী নেতাদের ঠাল বাহানাতে তিনি বিরক্ত হয়ে "সাহাবা কিছু কখনো না, জাহায়াই মুক্ত নেতৃত্ব পক্ষে নিয়ম কখন" এই পক্ষের বিরুদ্ধে পার্শ্বাঙ্গীকরণ কোন এক ঠাঁয়ে (যেদ লাইসেন্স থাকে) সত্য পাকড়ানী বহাশরক অশ্বত্থামান

অগ্রগামী (advance) অংশ-এর নেতৃত্ব গ্রহণ ও উপস্থিত ব্যবস্থা গ্রহণে অহুতাগ জনন। ইহাতে প্রমুখ তত্ত্বাচাৰ্য্য, বতীম দাস, বিমল রাই (সঃ কলিকাতা), সত্যীচন্দ্র দাস, চন্দ্র চন্দ্র দাস, পৌরুষ বোম, বীরেন রাই, প্রমুখ সুবীর চক্রবর্তী, অশ্বত্থামান চ্যাটার্জী, তৎপঃ শিঃ মনোরম ও প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন।

এই প্রসঙ্গে বীরেন বাবু আরো জানালেন যে ১৯২০-২৮ সাল এ বাল্যকালী বাক্য কলীম সূত্র সেন, সত্যীচন্দ্র দাস, বতীম দাস, বিমল সেন, প্রমুখ সুবীর প্রধান বিপ্লবী নেতাদের ১৯১৯-২০ শেষ কাছাকাছি পৰ্য্যায়ালোচনাত্তর আগাম ঠিক স্থির করে বেবেছিলেন যে জাহায়া (সাহাবা) যদি সহিজে বিপ্লব তত্ত্বাচাৰ্য্য করিতে গড়িমসি করেন—তবে নিজেই প্রমুখ কক্ষে বিপ্লবী দলো তথা বিপ্লবী ভারতকে "বিকল্প নেতৃত্ব" (alternate leadership) প্রতিষ্ঠার ভার গ্রহণের উত্তোষ নিবে। কলীয়া এই যে প্রধান বিপ্লবীরা তখন কংগ্রেস কার্য্যে আত্মনিয়োগিত করেছিলেন। সেই সময় কথা স্মরণ করে সত্য পাকড়ানী বহাশর স্বীয় দলের উৎসাহী কলীয়ার পার্শ্বাঙ্গীকরণিত বীরেনের অহুতাগ রূপায়নে রাজী হন। মনোরমের অহুতাগ তাই যে বহাশর জিজ্ঞাসী নেতাদের ভাষে "সুদৃঢ় বাকিদের পাখা (প্রজ্ঞানানন্দ গ্রুপ) : চট্টগ্রাম বাকিদের দল : ঢাকার বিজি হল-এর দারক ও কলীয়া অতি বিলম্বে বিজ্ঞানাত্তর সত্যায় আত্মকরণের অত আত্মায়ন হয়" (অধিবেশনের কথা—সত্যপাধ্যায়) তিনি এখন বিজি বিপ্লবী দলের কক্ষ মুক্ত তখন কলী ও দায়কদের এতদাল গ্রুপ-এ (advance group) টেনে আনেন। প্রধানবীর যেহেতু নাম বিজি বিপ্লবী গ্রুপ (revolving group)।

বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপের অগ্রসারী দাঁড়ক ও কনৌ বা
বাঁহা এই সময় সশস্ত্র বিদ্রোহ করে উৎসব করেছিলেন—
তার ত মধ্যে

আয়োজিত সমিতির—

সজোহ মিত্র, বিনিমি গাঙ্গুলী প্রমুখ; চট্টগ্রাম
মাস্টারবার দল—এর

গবেশ ঘোষ, অমল সিংহ, লোকনাথ দল, অমিতা
চক্রবর্তী, নগেন সেন (জুগুসেন) প্রমুখ ;

উত্তর প্রদেশের—

জীভেন দাঙ্গাল, চক্রপেথের আছার, প্রমুখ,
বাহারী পুখ পুখ দল—এর

গকানন চক্রবর্তী, অমলেন্দু দাসগুপ্ত; কনৌ বজ্রবাহার,
কানৌদহ ওর দার, প্রমুখ চাটাজী (টেনা), প্রমুখ
বন্দোপাধ্যায়, বিহার দত্ত, তারানার চাটাজি, হরিলাস
জট্টাচার্য প্রমুখ

বি-জি হ—

বেজর সত্যজগৎ, সুপতি দার, মির দার, বীর্ভেন
পোখার, বজ্রবাহার দার, নিরুজ সেন, প্রমুখ; বাহরী দার।

পাঞ্জাব—এর

তরং সিংহ, দ্বাশগুজ, সুবোধ প্রমুখ ;

বহিলাল দুগাঙ্গুর (প্রজ্ঞানিন্দ) —এর

রাধান দাস, নলীনি দাস, কনৌ দাসগুপ্ত ;
কাজিরকর চাটাজি, সুবীর আইচ ; মতীনকর গুপ্ত,
অরুণ দার, সুহুল সেন, অমিন চাটাজি. নরনরকর
দাসগুপ্ত প্রমুখ

কংগ্রেস অধিবেশনের পর সতীশ দাসগুপ্তাণী বিভিন্ন
ক্ষেত্র—বিশিলাল, ঢাকা, যমুন সিংহ, গাংনা, বংগুধ,
বহরবপুর, হকিম কলিকাতা, কহিবপুর প্রভৃতি স্থানে দান
ও অগ্রসারীদেব নিকট “আইবিশদাঘোর অতুখান
বাটানোর” পরিকল্পনা পেশ করেন (অবশ্য অতি সূক্ষ্মপাণে
দনা বাহর) তখন স্বভাবত উৎসাহী তরুন বিদ্রোহী কনৌরা
জীকে দূরধরন আদান ও বিপুল সাড়া পান। কেননা এই
সময় বেলা ওলোর দরবারের সঙ্গে কোন না কোন সময়ে
তিনি হুক ছিলেন। এই সময় তার তাকে পীর দল

অগ্রসারীদেব দারা সাড়া দিয়েছিলেন—

বিশিলাল :—

নিরনজন সেন, হরিদার সেন, বীর্ভেন চক্র দার,
পাঞ্জাল দাসগুপ্ত, কনৌ চাটাজি, সুবোধ দত্ত, সজোহ
সুহার চক্রবর্তী, বৈদেল চক্রবর্তী (সুটি) অসাংগ
দাসগুপ্ত, বিহার দানাজি প্রমুখ ;

যমুনসিংহ :

দৌরভ ঘোষ, অসাংগ দার, বরনী বিলাস, প্রমুখ
বিশিলাল, প্রমুখ তট্টাচার্য, দারানর বিশিলাল প্রমুখ ;

ঢাকা :

সতীশ দার দার ; নরেন ওর, সুশীল দারদার
(লুলা), অরুণ চক্র দার, কলদ চক্রবর্তী, সুবোধ দার
চক্রবর্তী, সজোহ দাসগুপ্তী. অরুণা দাস প্রমুখ ;

হা কলিকাতা :

বির দার, মতীন দাস, সুশীল দানাজি প্রমুখ

কহিবপুর :

মতীশ ঘোষন কর (পাল)। হরিলাস
রাধানচন্দ্র দাস, সজোহ সুহারী, (পুখ দাস হল এর কনৌ,
অগ্রসারীদেব সুহিত কাজ করিত) প্রমুখ।

গাংনা :

অনুল দাজি

সুবিলা :

প্রভাত সুহার চক্রবর্তী, বাহরী দাস সুবোধ
সুধোদাচার্য প্রমুখ।

এরকি আবার নিরনজন সেন ও প্রমুখ তট্টাচার্য
১৯২৮ সালে—এ দাক্ষিণী হইতে হুক হয়ে প্রথম কেউ
আলাদা ফ্রন্ট করার পরিকল্পনা করেছিলেন দুগাঙ্গুর ও
অগ্রসারীদেব কিছু কনৌ নিয়ে। এই ফ্রন্ট হাজির
হোটেলের প্রভু জনর তট্টাচার্য দরদারের উপস্থিতিতে
নিরনজন সেন—এর উত্তোষে গকানন চক্রবর্তী, মতীন
দাস, মির দার, সজোহ মিত্র, এক বৈঠকে প্রথম বিদ্রোহী
মেজদেব অতীত কার্যাবলী স্মরণাত্তর বিকল্প নেতৃত্বের
কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রমুখ বাহু তখন আইন
দানের দ্বারা ছিলেন উহা দপারনে নিরনজন সেন তখন

যেহুদা বাজারের..... কামরা তাত্তা নিয়ে
বিতলবার সংগ্রহ ও গোমা প্রকৃতি তৈরীর কাজে ব্যাপ্ত
আছেন।

দক্ষিণ কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত সমিতিতে বিনয় কান্ত ও
ও যতীন দাস প্রমুখের সাক্ষর উত্তর ভারতের শচীন
সাক্তাণ ও যোগেশ চট্টাচার্য্য যোগ দিল। বাংলার বাহিরে
শচীন সাংগল-এর মধ্য-এর নাম ছিল "বিল্লবান তিথ্যাক্তান
পাটি" উত্তর সহিত চট্টগ্রামের যুথাসেন-এর ও
লনকান-এর স্তম্ভসং-এর মধ্যের সমিতি-এ আছে।

১৯২২ সাল-এর ফেব্রুয়ারীতে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক
সংসদনের সময় এক একবার বৈঠকে অধিকা চক্রবর্তী,
নিরঞ্জন সেন, বটম দাস, শচীন পাকড়াশী প্রমুখ টিক
কংগ্রেস- উন্নতি জেলা সহঃ : বরিশাল, মহম্মদসিংহ ও
ও চট্টগ্রাম-এ বাইতিন খাঁতর পুত্ৰান উন্নতি
এবং আও কলিকাতা ও ঢাকা সহরজয় ঐ সময় নিকট
কতকগুলো ভাষণের আখ্যাত হনাত হয়ে। এটি সকল
কাৰ্য্যাদি মূল্য-একই দিনে নিকট সময় হয়ে।

উপরোক্ত সংগঠন-এর কিছু পর বরিশাল জেলা
কনকরণের সময় নিরঞ্জন সেন-এর বাড়ীতে (ভাষার
দিতা বরিশাল সহরে আশ্রয়ে পেশকার ছিলেন)
যুথাসেন, শচীন পাকড়াশী, বীণেশ চন্দ্র রায়, মোক্ষ
জুনাঃ চক্রবর্তী, শৈলেশ চক্রবর্তী প্রমুখের উপস্থিতিতে
রংপুরের কল্যাণ চাকারার অর্থাৎ বরিশাল সহরে জাণী
অনুষ্ঠান কি রূপে সংঘটিত করা যার তাই নিয়ে আলোচনা
হয়েছে ও চুক্তিগ্রহণ হয়েছ। যুথাসেন মহাপুর উক্ত
সংগঠনে সভাপতিত্ব করতঃ এসেছিলেন।

এইভাবে আমি আবার বঙ্গীয় কার্য্যালয় লব জানতে
পারলাম। এইরূপে বঙ্গ-এর সহিত পুনরায়, সংযোগ
সাধিত হইল।

শচীন পাকড়াশী মহাপুর ১৯২৮ সাল-এ বাকবন্দী
হইতে মুক্ত হয়ে ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত
হয়েছিলেন। কিছুদিনের অন্ত ১৯২৯ সালের প্রথম ভাগে
তিনি বরিশাল কংগ্রেস কমিটির পরিচালক নিযুক্ত হবেন।
বরিশাল দাকা কালীন তিনি চক বাজারের দুকুল সেন-এর

বাড়ীতে ছিলেন। ঐ সময় তাহার বৈয়াক কার্যকলাপ
প্রধান নেতাদের অনুপুত না হওয়াতে তিনি ঐ সংগঠন
লোপ করেন এবং পুণঃপুত্রি বৈয়াক কার্যে নিয়োজিত
হয়েন। এই কাজ পরিচালনার সুবিধার্থ বিটকোর্ড
মেজিসল হলে শচীন চক্রবর্তী সহায়তায়
ঐ স্থলে মেসের নিকটে এক তাহরা হয়ে চলে আসেন।
এই কামরা হইতে তিনি বীর বলাই দা, অজ্ঞাত বিভিন্ন
বিল্লবী গুলের অগণ্যায়ী কল্যাণ লায়ক কল্যাণের মধ্যে
মেজামেশা ও যোগাযোগ রাখিতেন। ও তাহারের বোমা
তৈরী প্রক্রিয়া ও শিক্ষা বিধাছিলেন। সঙ্গে নিজের
গুলের বিশিষ্ট কল্যাণের ও বোমা তৈরীর প্রক্রিয়া শিক্ষা
হিতেন। এই সময় তাহার নির্দেশকমে শচীন দাস তার
ঐসংঘে বীরেন সোকারকে বোমা তৈরী করুলা বা
প্রণালী দেন। বীরেন দায়কে এইমত বসানে অব্যাহি
দেওয়া হয়। বীরেন দায়, হুগতি দায়, বিহুনত সেন,
বল্লভ দায়, মেনাপাল দাস প্রমু (Sailes) শৈলেশ চক্র
বর্তী-এর (পরে স্বঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
প্রাপ্ত অধ্যাপক-বর্তমান বিশেষ্ট এগ্রেট হঃ কলিকাতা)
নেতৃত্বে ঢাকা বৈয়াক্তির কোন এক বাড়ীতে বোমা তৈরীর
ব্যবস্থা করেন। বোমার গোল ত্রয়েত্র চক্র দাস সহযোগ
করিতেন। কীতিলক্ষ্মা নিবাসী ননী গোহার কারখানায়
বোল তৈরী হত। লক্ষ্মী বাজারের ব্যারিটার পি, কে
বল্লভ পুত্র অজ্ঞাত স্থায় বহুর মারকম বোল যোগান
হাইতো। বীর বলাই ত্রয়েত্র চক্র দাস, সন্তোষ
গাংকলী, বীণেশ দায়, অশীল সহকার (ঈশলা) প্রভৃতি
তিনি বোমা তৈরী ট্রেইন দিয়ে রেখেছিলেন। এই বোমা
তৈরীর প্রণালী পাকড়াশী মহাপুর নিরঞ্জন সেন, পরে
বীরেন দায় চট্টগ্রাম যাত্রারবার বঙ্গ-এর নিকট সংগ্রহ
করেছিলেন।

রংপুর অধিবেশনের পর ঢাকায় এসে বলাই করতঃ
সুবিধার অন্ত ত্রয়েত্র চক্র দাস কে নাগায়নগক হইতে
ঢাকা হলে আনেন। ত্রয়েত্র বাবু নাগায়নগক হইতে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈয়াক রেল দ্বারা হিন্দেও আসিতেন।
ঢাকা গেলের নর্থ ব্যারাকের দশ নবর কামরায় ব্যারিটিক

যাও। মকবুত করার জন্য বীরেন চন্দ্র দাশ কে কলিকাতা
দৌতে ঢাকা আনেন—স্বপ্নের হাবুডু কক লম্বী করেন।
অস্ট্রি আবার বি-ডাউ ডিক্রিক-ডিল। এই তাহরা গেল
হলেও পরিচানা ছিল। মেঘের আদ্যিগের পরজন্মে এক
ভুলিকেট চাবির বন্দোবস্ত ছিল। হাতে, দে-হাতে যাদের
সদর বরসা অন্তর্যধনা করিতে পারিত না তার একই
বন্দোবস্ত। কলিকাতা কেন্দ্রে দৌতে প্রবেশকারী 'চবি
গম্ভীর' ব্যাপটিট বিনয়ের নিম্নিল একই প্রবর্ত
আগিবে এই গম্ভীর হুঁও বন্দোবস্তদি করিয়া লড়াই
পাকড়ানী হাঙ্গর কলিকাতা মূল কেন্দ্রে চলে আসেন
—হুগুরের সুদীর্ঘ স্তোত্র কপালে বলা বাহুল্য।

[illegible]

আর ঢাকা হল-এর এন-বি টেন এর ব্রজেন চন্দ্র
হাল-এর যা ছিল পূর্বা বাগদার অহনৌলন বিঃদ্রাষ্টা
মোদীর বিলন কেন্দ্র যা শীর্ষ কেন্দ্র। কলিকাতা হইতে
সতীন পাকড়ানো বা প্রভুল চন্দ্র চট্টাচার্য মহাপ্রবর
কলীর ব্যর্থোপলক্ষে ঢাকা আসিলে এই ঢাকা হল-এর
এন-বি টেন নহ জননন যেকিলে যেনে চক্রপথ চক্রবর্তী
বেলে উঠিতেন। শুভন বিচিত্র জেলার বিশেষত সতীন
নাথ বাব, দৌরভ ঘোষ, ব্রজেন চন্দ্র হাল, নবেন গুহ,
মহোদ-চক্রবর্তী, অনিল সেনগুপ্ত, সুশীল সর্গাং,
১৮৮৫ চন্দ্র, সতীন কব (পাল), বিজয় বানার্জি,
নৃপেন নাথ চক্রবর্তী, চক্রপথ চক্রবর্তী, জগদেব হাল
(হরমসিংহ) এম্ব অন্নাভ্য জাগো চান্দ কণা ও
বৃন্দেনভোষে মহিষ মোগাকার হইত। উদ্ভেদ-গাভনৈতিক
কলা বাহাল।

[illegible]

দশম ভাগ্যে বৈদ্য ভোগে চলেতেছিল।
আমি বহন ভাগ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভক্তি হয়ে ভাগ্য হল
ইহি কাহিত কথায় থাকিতাম—চন্দ্র হেঁদিতাম বিস্তার
হলের কুটীর হুতের কবীরে হল উভয়নে। কখন
কামি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইষ্টনয়ন একতর বল নিতে মোর
পোষ্টার অভিধান চলিত। বাক্যের আবার এ, বি,
এম্-এ, বি, সি, এম্-এ পাশকরে সমিতি দশমের
আগমন ও চলিত। সবদ পোষ্টাক হুইটী দশল
অভিধান গোপনে চলে—পুলিশী দশী এভিধে।

অত্যাশীষের কাঁধে কল্যাপ বিনোদিত : বিহিত মল্লের
জ্যোতিষ কোবাবলার, তেজোবল ঘোষ প্রমুখদের
সেখিভায় ইউ. টি. সি নিয়ে ব্যস্ত থাকিতেন। অথোকা
দুই মলেই ইউটিসি-ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর্স-এর
নামকরণ টেনার ছিল ! এমন সেক্ষেত্রেই অসহ্য এই
ট্রেনিং বি-ডি মল্ল-এর উঠার কালে অনেক সহায়ক
হয়েছে।

ঢাকা চলছে এসে দেখলাম আমাদের কন্যাদের
 ঘনো বেশ একটা ঢালা উল্লেকনা। জামিনা তা
 আশ্রয় কারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিনা! অন্যায়। কামকন্দা
 ও জোর কসমে চলিতে লাগিল।

বিনা যোগে ২২ খাতা এতে উল্লেখ, উন্নয়ন, আয়োজন এক খাতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল ১৯১০ সাল-এর ১৮ই ডিসেম্বর। এই সময় আবার নেতারা লাহোর কংগ্রেসে ডেলিগেট হয়ে যাওয়ার ভোগভোগে

কতিয়েছিল—উৎকর্ষ উত্তর গণতন্ত্রের সমর্থনী বিপ্লবীরাও
সহিত মোলোকাং ও ভবিষ্যৎ কাল প্রণালীর পরা
নিকশন-নিষ্কাশ। ঐ দিন প্রাতে গোপন বৃত্তে খবর
পেয়ে যেহুয়া বাজার ডেরা হইতে সতীশ পাকড়ানী,
নিরঞ্জন সেন, রমেন বিশ্বাস, তথাৎ লক্ষণেশ্বর (),
পরে ওমানকার সাবের দিষ্ট প্রাপ্তিতে পাহালাল
লক্ষণেশ্বর, জগদীশ চট্টাচারি, হুসুল সেন, সতীশ কবিশ্বর,
তরেন পাণ্ডা, ব্রজেন দাশ, নিশানথ দাশ চৌধুরী,
তথাৎ চক্রবর্তী, বেহালী বিশ্বাস, নিখিল দাস, সুবীর
আইচ প্রমুখ বহুশি জন দ্বিতীয় গ্রেপ্তারিত হয়ে
যায়। আর সঙ্গে যে ওমানকার ডেরা হইতে বোঝা,
দিল্লী হা, বোঝার খেল, ও প্রচুর রসায়ন প্রযুক্তি
পুশিৎ বস্তুসমূহ করে। ইহা হইল তখনকার দিনের
বিখ্যাত যেহুয়াবাজার বোঝা প্রত্যুতি বস্তুসমূহ
এই অপ্রত্যাশিত গ্রেপ্তারের ফলে বাংলায় বিভিন্ন বিপ্লবী
মল গড়ে 'বিকল্প নেতৃত্ব' (Alternate leadership)
প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা করেছিল তারা। অতঃপরই বিল্ট হয়ে
যায়। বিভিন্ন সংস্থার অগ্রসারী মল-এর নেতারা অতঃপর
সতর্ক হয়ে যান এবং একতরু চলিতে থাকিতে সচেষ্ট
হয়—[তাহা পরবর্তী ঐ মকল মলের কার্যকলাপ
প্রকাশিত।]

সতীশ পাকড়ানী যেহুয়া বাজার ডেরাতে থাকিতেন
না। তিনি লম্বত মলের একতরু প্রণালীর নেতাদের
সহিত বোঝাবোঝি থাকিতেন বহিরা অতঃপর থাকিতেন।
নিরঞ্জন সেন ও অজ্ঞাতরা ঐ ডেরাতে থাকিতেন-ও বোঝা
প্রত্যুত করিতেন। নিরঞ্জন সেন, প্রভুল চট্টাচার্য,
প্রত্যুতি একই বোঝাডেরা ছিলেন। তাঁর নিকট খবর
ছিল যে ওমা তত্ত্ববিদী একটা কিছু করিয়া তেলিতে
পারে। তাই তিনি নিরঞ্জন সেনকে বিশেষতঃ "হঠাৎ
কিছু না করিয়া-মকল বিপ্লবী মল-এর-অপুখ ও বহির্দাল-
সহকের একতরু অবিশেষণের সুবীত প্রত্যাব নিয়ে ঐ
যেহুয়া বাজার—কলাবাগান ঘাটীতে আসি যাহে যান ও
যাহদায় জটাইয়া পড়েন। পরবর্তী কালে সুমিয়ার
প্রত্যাব চক্রবর্তীকে প্রত্যোক্তে সত্যদ্বারা ঐ কথা
বলেছিলেন।

সতীশ পাকড়ানী মহানগরে আত্মনিক গ্রেপ্তারে
অসুখীমের অগ্রসারী তখন কতীরা কিং কতরু
বিস্তৃত হয়ে পড়েন। "চট্টার বেডি"-বনৌর ঐতিহ্য
অসুখণ করে—তার পরের লাতিন নেতারা মলের
সুখলা ও বহির্দায়িতত্তা বজায় রেখে অগ্রসারী কতরু
বাতবায়িত করণ উত্থাসী হইলেন।

এখানে তাঁর অগ্রসারীরা কেমনেইল বেহেতু অগ্রসারী
ঐ মলইই একতরু—হিন্দুস্থান মোতাঝিই বৈশিষ্ট্য কেন
এলোনিরেশন—লাহোরের সাত্তার ১৩২৮
১৭ই ডিঃ); বিল্টা এলোনিরেশনে বোঝা নিকশন
(১৯২৮—৮ই এপ্রিল), তাহে আবার ঐ প্রযোণে ঐ
মলইই আরেক আশে যেহুয়া বাজার বোঝা প্রত্যুতি
মলই (১৯২৯—৮ই ডিঃ) তপারিত করেতে-ততে
-করে ১৯২৯-২৯ এম নায় বাপক য় পাকড়ানী
হইতে পারে। ইতিমধ্যে বাংলায় মোতোঝা বিল্টা ঐ
মলই তখনই হয়ে উঠেছিল-গ্রেপ্তারী নিবিল্ট পতীতেই
আবিল্ট ছিল।

অতঃপর প্রভুল চট্টাচার্য ১৯৩০ সালের আত্মসারী
প্রথমতঃ সতীশ দাশ-এর পর নিয়ে সুমিয়ার ও চট্টাচার্য
যান। সুমিয়ার প্রত্যাব বাবুও সঙ্গে প্রভুল বাবুও
খোলাখুল আলোচনা হয়। প্রত্যাব বাবু ঐ সময়
সতীশ দাশ-এর কাছ থেকে পত্র প্রাপ্তে জানতে পারেন
যে প্রভুলবাবুকে চট্টাচার্য পাঠান হইতেছে। তখনই
তাঁহার সহিত বাট্টারবার মলের বোঝাবোঝি ছিল ও
পুখবর্তন-কেন মতী দিলোবে ও-নিরঞ্জন সেনের আশ্রয়
হইতে। সুমিয়ার আশ্রয় সেজে তিনি চট্টাচার্য যান
ও বাট্টারবার মল-এর সহিত বোঝা করেন ও নির্ভাবিত
কতরু মতী নিয়ে কিং এসে মলীর নেতাদের আশ্রয়।

যহনন-সিৎ মেলা : ঘনৌ নিশান, প্রমুখ বিশ্বাস
প্রমুখ শৌরত বোঝা, প্রমুখ
বোঝা হা

পাখনা মেলা বা : অতুল কুশল দায়িত্ব

উত্তর মল

বহির্দাল মেলা : সত্যেন্দ্র সুহাও চক্রবর্তী,
শৈলেন চক্রবর্তী, দায়িত্ব কত
(চলবে)

ভারতে স্থিতিশীল সরকার সর্বপ্রাথমিক

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যবর্তী নির্বাচন আসন্ন। ভারতের জনগণ কেন্দ্রে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনের প্রত্যাশায় আগ্রহী, কারণ তারা জানে যে সুদূর কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতিত বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিতে স্থিতিশীল অবস্থার পরম্পরের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রেখে সর্বভারতীয় চিন্তায় একাত্ম হয়ে চলতে পারবেনা। এর ফলে জনগণই দাপ্তরিক জরুরি ভূমিকায় আর বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকারে পরিণত হবে ধীরে ধীরে, যা কোন সময়েই সম্ভব হবে না দেশের পক্ষে। নির্বাচনকর্মগুলি এবারের অনেক ভেবে চিন্তে হবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন কোরবে, কারো ছেঁদে কথায় বা ভাণ্ডায় ফুল পথে চলবে না বলেই মনে হয়।

ভারতীয় জনগণ স্বভাবতই উপর মনোভাবাপন্ন, তাই সহজেই তারা রাজনৈতিক নেতাদের কণায় বিশ্বাস করে এবং এভাবে তাই কোরে আসছিল, কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক শক্তিগুলি পূর্ণবিস্তারের পথে যে পন্থার অগ্রসরমান তা আশ্চর্যবহীন স্বার্থ-ক্ষতা ও সুবিধাবাদের রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়, আর জনগণ সেই চারুদ্যো ও স্বার্থসর্ব্বথ ব্যক্তিগত আর আত্মাশীলনয়। তারা আশন-পর চিনে কেলোছে। এক রাজনৈতিক দল অপর রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে যে সব মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রসঙ্গিত উক্তি কোরছে তা অদৃশ্য কোনও তারা ভোট আদায়ের জন্য ঐক্য অসম্ভবত্ব কোরছে কেবল মাত্র দলত্বার্থে, জনত্বার্থে নয়। চরম বৈরাচারীসল সি. পি. আই (এম) ও সি. পি. আই ইন্দিরা কংগ্রেসকে বৈরতন্ত্রী

আখ্যায় অথবা কৃত্রিম কোরে ভোটের ব্যক্তাবে ব্যক্তিমাং করতে চায়। এ বৈরাচারীর দল দুটির পূর্ব ইতিহাস ও বর্তমান কার্যাবস্থা কি জনগণ জানে না? না ওদের বাগাড়ম্বরে জনগণ আবার ফুল কোরবে বলে ওরা আশা করে? কেবলমাত্র দুট কমিউনিস্টিক কেন্দ্র মুকোশলে জাতীয়তাবাদদলগুলি একতাবদ্ধ হয়ে ক্ষমতায় কোরছে মুসলীম লীগকে মন্ত্রীয়ে বসিয়ে তা কি ওরা এখনও উপলব্ধি কোরতে পারে নি? ওরা চরণ সিংয়ের লেহুড় হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে উদ্ভূখী পৃষ্ঠিতে থাকিয়ে আছে, যদি ছিটকেটা কিছু পায়।

ওদের এ আশা-তুরাশা ছাড়া কিছু নয় এবং নির্বাচনান্তে তা হতাশার পর্যায়সিত হবেই। সিংহ ভাগের চিন্তায় ওরা সদামনগুল তব ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলি ওদের ওদ্ব্যাজন মত কাজে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত দূরে ছুঁড়ে কেল দেবে কারণ ওরা যে জনতাবাদের পক্ষপটে আশ্রয় নিয়ে হঠাৎ ক্ষমতায় বসার সুযোগ শেল, সেই জনতাবাদের বিশ্বাসের দিনে সি পি এম চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল জনতার সঙ্গে। এরপরে চরণ সিং কি এ সি পি এম কে বিশ্বাস করবে? মনে হয় করবে না। তবে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে যে চরণ সিং নিজেও তো বিশ্বাসঘাতক, সে কোরে উত্তর এই যে, বিশ্বাসঘাতক সেক্ষেত্রে উত্তর এই যে, বিশ্বাসঘাতক যে নিজে সে অপর বিশ্বাসঘাতককে মোটেই বিশ্বাস করে না, আর এটাই অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা এবং তা সঠিক।

প্রতিশ্রুতি জনতা সরকারকে যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পূরণের জন্য ভেঙ্গেছে এবং ভেঙ্গে যারা মন্ত্রীকে আসীন করেছে কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের তাগিদে, তারা কিন্তু জনগণের চোখে হের প্রতিপন্ন হয়েছে। ভোটের সময় এরা জনসমর্থন তো পাচ্ছেই না, উল্টে জনগণ এদের বিরুদ্ধেই ভোট দেবে বলে শুনা যায়। শ্রীমতী গান্ধীও চেয়েছিলেন জনতা সরকারের পতন কারণ তাঁর চিন্তায় ছিল জনতা সরকার অকেন্দ্র ও জনগণের কল্যাণ সাধনে অক্ষম, অতএব নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন করে জনগণের স্বায় নেওয়া হোক।

তার সে ইচ্ছাই অবশেষে ফলবতী হয়। তাঁর সে ইচ্ছাই অবশেষে ফলবতী হয়। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি ছিল বাস্তবমূল্য ও প্রথম, আর তাই তিনি আজ নির্বাচনের সম্মুখীন হয়ে জনগণের কাছে আবেদন রেখেছেন প্রতিশ্রুতি সরকার গড়ার সহায়ক হতে জনস্বার্থ।

তার সে আবেদনে সারা ভারতে এক অতৃপ্ত সাড়া জেগেছে ও বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর সমর্থকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে যে বোধ হয় তিনিই পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবেন আগামী নির্বাচনে জয় লাভ করে। যারা কংগ্রেস (ইন্দিরা) দলের সমর্থক তারা উৎসুক হয়ে উঠছেন দিনের পর দিন আর দুই কমিউনিষ্ট দল আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে প্রচার শুরু করে দিয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ভীষণভাবে, অথচ উক্ত প্রচার সবক'ও যে ইন্দিরা জয়যাত্রার পথে শূন্যে শূন্যে এসিবে চলছেন তা দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় ছত্র ছত্রে পরিস্ফুটান। সি, পি, এম তাই মহা প্রমাদ গুনছেন আর বাঁচার ভাবসি

দক্ষিণ ভারতে জনতার সঙ্গে গাঁট হড়া বাঁধতে সচেষ্ট। এখন জনতাদল আর সম্মুখগামীকতা পুটে দল নষ্ট সি, পি, এম দলের কাছে বা'পলিট ব্যারোর কাছে, বরং তারাই এখন পরিব্রাজা। সি, পি, :এম বা অথ কোন কমিউনিষ্ট দলের যে কোনও দলের অভাব কখনই হয় না তা জনগণ বেশ দেখতে পাচ্ছে আর এরা দল স্বার্থে যে কত নিচে নামতে পারে তা আরো একবার এইভাবে প্রমাণিত হতো পরিণত হ'ল। এই সব স্বার্থবালী নীতি জ্ঞানহীন দলের অস্তিত্ব যে কি কোরে জনগণ আজো বরদাস্ত করে সেটাই পরমাস্থি। এরা এক মুখে যে কত কথা ইনিরে বিনিয়ে কত ভাবে ও কত বিচিত্র ভঙ্গিতে বলে তা শুনে সাধারণ মানুষের গা জ্বালা করে ওঠে। এরাও ভোটের বাজারে আসার সবগম করার হান্নার কত অভিনব কাণ্ডসই না দেখাচ্ছে। এদের ভবিষ্যৎ যে ঘোর অন্ধকার তা কি এরা জানেন? পশ্চিমবঙ্গের অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম কোরে এরা যত নাচন কৌশল করুক না কেন, এরা যে ঘোর ভিমিরে তা বোধহয় বুঝে ফেলছে, আর তাই এখন নাতিয়াস ওঠা বন্ধ করার তাগিদে ইনিরার ভয়ে পাণ্ডু বগনে স্রিয়মান অবস্থায় অনবরত 'বৈরভদ্রী' 'বৈরভদ্রী' এই দুটি কথা বারে বারে উচ্চারণ কোরে আকাশ বাতাস কাটিয়ে চিংকার জুড়ে দিয়েছে, তবুও ওদের দিকে কেউ ফিরে চাইছে না, বরং সবাই ইনিরার নিশ্চিত জয়ী নৌকার ওঠার চেষ্টায় সুবাই ওঠে পড়ে লেগে গেছে। ইনিরার জয়ের আশা যতই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল হ'লে ক্রীতচরণের লেজুড়না ততই আতঙ্কিত ভীত ও সন্ত্রস্ত হচ্ছে, কারণ তারা জানে যে কংগ্রেস (ই) যদি শাসন ক্ষমতার পুনরায় বসে, তবে ঐ সব মিথ্যাতারী, ঠগ, ও স্বার্থপরী রাজনীতিকরা আর হালে পানি পাবে না কখনও। (চলবে)

বিশ্ববী পশ্চকম্বালা

অহুশীলন সন্থিত্তির বিলম্ব—৩০০

বিলম্বী মহানারিক রাগবিহাটী—৩০০

কীরোরদ কুমার দত্তের

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ১। বাংলাে অংক—১৫০ | ২। বাংলাে অংক—১৫০ |
| ৩। অহুশীলন সন্থিত্তির বি, যিত্তির—২০০ | ৪। পৌরসী সংগ্রাম কাহিনী—১০০ |
| ৫। কাকোরী পৌরসন্থ—১২৫ | ৬। কলতা বাহার সংগ্রাম কাহিনী—৫০ |
| ৭। রাগবিহাটী ও অহুশীলন সন্থিত্তি—৫০ | ৮। বাহীনতার পৌরসন্থ ও যেরে—৫০ |
| ৯। বিবেকানন্দ ও সমগ্রদান—৫০ | ১০। বিশ্ববী বিবেকানন্দ—৫০ |
| ১১। মহারাম ও হুতাশত্র—৫০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিত্তা—১৫ |
| ১৩। দেশ ঘাণের ভোলেনি (১)—১০০ | ১৪। দেশ ঘাণের ভোলেনি (২)—২০০ |
| ১৫। পৌরসন্থের জাগরণ—৫০ | ১৬। ২০ট এপ্রিল জাতীয় পৌরসন্থ বিলম্ব—১০০ |
| ১৭। হাতিজ হুতাশত্র—১৫ | ১৮। ভারতের বাহীনতা সংগ্রাম ও অহুশীলন সন্থিত্তি—৫০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৫০ | ২০। লাট হুতাশত্র—১৫০ |

প্রাপ্তিমান :—৫০০ বরত রাগ টিট কলিকাতা-১০০০০১

টেলগ্রাফ—১/১/১/A বন্ধি চাটাকী টিট কলিকাতা-১০

— দ্ব্যর্থক মণ্ডলী —

ঐকগরীল চট্টোপাধ্যায় (সত্যপতি) ঐকগরীল নকী, ঐকগরীল চাটাকী

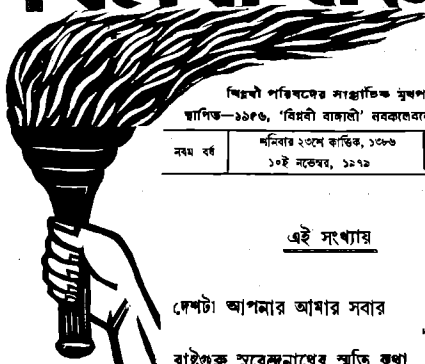
দ্ব্যর্থক—ঐকগরীল নগর রাগচৌহুরী

বিলম্বী বিলম্ব প্রতিনিধি—ঐকগরীল যোগ । বোকা—ঐকগরীল পাল ।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—ঐকগরীল সেনগুপ্ত । প্রচারক—ঐকগরীল লোহ ।

বিলম্বী বাংলা কার্যালয় :—৫০০ বরত রাগ টিট, কলিকাতা-১০০০০১

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকালেবাব—১৯৭৯

নবম বর্ষ	শনিবার ২৩শে কান্তিক, ১৩৮৬ ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৯	৭ সংখ্যা
----------	--	----------

এই সংখ্যায়



দেশটা আগনার আশার সবার

। সম্পাদকীয় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মলিনী মোহন হাঙ্গুত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। কিশোর কল ।

ভারতে স্থিতিশীল সরকার সর্বাঙ্গগণ্য

। ঐক্যবীথর অধ্যাপনাথ্যার ।

একটি বিশ্বস্ত স্মৃতি চারণ

। ঐক্যবীথর হুম্বর মুখোপাধ্যায় ।

অসমাপিকা উপসংহার

। ককিহুত্রে দাব ।

হে যোব দুর্ভাগ্য দেশ

বাহের করেছ অপমান,

অপমানে হতে হবে,

ভাদের সবার সমান ।

—রবীন্দ্রনাথ

দেশটা আপনায়—আমার সফার—

আগামী মহাবর্তী নির্বাচনের যখন সময় সব রাজনীতিবিদ দল ও গোষ্ঠী সময় ও সুখ যখন ভারতের সর্বাত্মক উন্নতিসাধন করার যোগ্যতার দাবীদার প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠী, যেন এই ভারতের, বিশিষ্ট উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে চরম বিপর্যয়ের অশ্রুনি স্রবস্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে কেউ মুখ খুলছেন না। এবং প্রতিবেদক ও প্রতিকার মূলত কোন চেষ্টা করছেন বলে খবর মিলছেনা। বলা বাহুল্য আমরা আসাম মনিপুর। মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডের কথাই বিশেষ ভাবে বলছি। আসাম প্রদেশে এই দেশের সহৈতি বিনাশকারী আন্দোলন এই প্রথম নয়। আসামে ‘বাঙাল—ফো’ আন্দোলন ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। কিন্তু মনিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড প্রকৃতি স্থানে দেশের অন্তিমকারী আন্দোলন এইবার বিশেষ ভাবে নয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একথা সত্য যে এই সব স্থানের অধিবাসীরা স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম হতে চাননি। এমন কি চীন পাকিস্তানের মত ভারতবিক্ষেপী রাষ্ট্রগুলির সাহায্য ও সহায়তায় হাসিল করতে চেষ্টার রুট করেননি। এই কৃষাত প্রচেষ্টার নায়ক ফিজো আজ দেশভ্রামী হতে বাধ্য হয়েছেন। অল্প একজন নায়ক লালাডেল। এখন আদালতে অভিযুক্ত ও পুলিশের নজর বন্দী অবস্থায় আছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে স্বমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই এরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতের অংশ হিসাবে ভারতের এক নিশান, এক প্রধান ও এক বিধান মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ছদ্মস্তকারীরা অবদামিত হতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এই সব স্থানে ছদ্মস্তকারীদের অশান্তির আশ্রম সম্পূর্ণভাবে নিজে বান্ধনি বলেই আজ মনে হচ্ছে। এই আশ্রম কখন ভূষের আশ্রমের মত বিকি বিকি কখনও বা দাউ দাউ করে অলে ওঠে। প্রশাসনিক গাফিলতী বা দুর্বলতা দেখলেই এরা মাথা চাড়া দেয়। এই সত্যটাই এবারকার ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে।

কেন এই নকারজনক ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি বারবার ঘটছে তার কারণগুলি এখনই বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নেওয়া সরকার। অল্পখায় গোটা দেশের সহৈতিই শুধু বিপন্ন হবেন। দেশটা বণ্ড বণ্ড হয়ে মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। এমন কি দেশের স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে। ঘটনাবলির গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে কয়েকটি এর মধ্যে মানসিক। কয়েকটি দেশের শত্রুদের দ্বারা সৃষ্টি সৃষ্টি। জালিত এবং পালিত। ঘটনাবলীর প্যাটার্ন অনেকটা একই। সমস্ত বাসীদের প্রতি পাহাড়ীদের অবিশ্বাস এর মধ্যে একটি প্রধান কারণ। এদের হারণা, যারা পার্বত্য অঞ্চলগুলির আদি বাসিন্দা নয়, তারা কখনই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। একা এরা পাহাড়ীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের বিলোপ ঘটাবে। দক্ষ করে নেবে তাদের ক্রিয়সম্পত্তিও সুযোগ সুবিধা। ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে সকলেরই সুযোগ সুবিধা সব ক্ষেত্রেই সমান। যারা অনগ্রসর তাদের ক্ষত্র বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থাও আছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা স্বীকৃত এবং সংবিধানগত।

স্বাধীনতার মুখে বহির্বিদেশের ধরে এই ব্যবস্থাদুয়ারী রাষ্ট্র প্রধানগণ কাজকর্ম করেছেন। তবুও গণগোল ঘটেছে কেন? উপরোক্ত প্রদেশগুলিতে বসবাসকারী খামি, জয়ন্তিয়া প্রকৃতি খণ্ড-জাতির মানুষগুলির অধিকাংশই খৃষ্টান। তারা গোটা ভারতকে নিজেদের বংশে বলে মনে করতে কুণ্ঠাবোধ করে। অনেকের ধারণা বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচার এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার জন্ত অনেকাংশে দায়ী!

এদের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। তবুও এই আবদার কেন? এই রাজ্যগুলি দীর্ঘমুহূর্তী স্থানে অবাঞ্ছিত হরণ্যার জন্ত, ভারতবিশেষী দেশগুলি এদের উদ্ধার দিয়ে, গণগোল সৃষ্টি করে, ভারতকে উদ্বিগ্ন ও বিপর্যাস্ত করতে চায়। এ সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আগেও ছিল, এখনও আছে। আসামে ও তার সংলগ্ন অধিবাসীদের একটা মানসিক বিকার ঘটেছে বলে মনে হয়। প্রত্যেক প্রদেশবাসী মানুষের যে কোন প্রদেশে বসবাস করার, কৃতি রোজগার করার অধিকার ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত অধিকার। সৃষ্টিমের কয়েকটি লোক যদি এই সংবিধান-প্রদত্ত-অধিকারের অবমাননা করে, তবে তাদের কোন ক্ষমা বাততে পারেনা। এখানে যদি ভারত সরকার শৈথিল্য এবং দুর্বলতা প্রদর্শন করেন, তবে এই রোগ সংক্রামক ভাবে অস্ত্র হুজি়য়ে পড়তে বাধ্য যদি হয়। বাঘ, বাঙ্গালীরা সংখ্যালঘু বলে আসামীরা বাসি। জয়ন্তিয়ারা তাদের উপর ও ভিন্ন প্রদেশের অবস্থানকারীদের খুনজবম, সম্পত্তি লুণ্ঠ করেন। তবে ভারতের অস্ত্রাস্ত্র প্রদেশে বসবাসকারী আসামীরা, বাসি, জয়ন্তিয়ারদের কি অবস্থা হবে, তা একমাত্র বদ্ধ উন্নাদ ভিন্ন সকলেই বুঝতে পারেন। সেই অনভিপ্রেত, অসমর্থনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কারো মঙ্গল হতে পারেনা, একথা সামান্যতম বিচারশক্তির অধিকারীরাও সহজে বুঝবেন। সূত্রং এই বিচ্ছিন্নতা—ব্রহ্মণ মানসিকতাকে চিরদিনের জন্ত নির্মূল করতে হবে। দুষ্কৃতকারীদের কালো হাত ভেঙ্গে দিতে হবে। বিদেশী চক্রান্তকারীদের অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। ভারতের সব প্রান্তের অধিবাসীদের মঙ্গলে এই সত্য চুকিয়ে দিতে হবে সে দেশটা আপনার আমার সবার। যার যা খুসী করার কোন অধিকার নেই এবং সর্বোপরি এমন দেশত্যাগীমূলক কাজ করলে কারো নিকৃতি নেই। এটা শুধু ধবংসের কামজের মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে করা যাবেনা। এটা কর্তব্য হবে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে।

আমরা আশা করব কোন দলই শুধুমাত্র ভোটের আশায় এই আঙুন নিয়ে খেলা করবেন না। করলে এই আঙুনেই তাদের অঙ্গে পুড়ে থাক হয়ে যেতে হবে। এটাই অতীত ইতিহাসের শিক্ষা।

প্রদত্ত আর একটা কথা বলা প্রয়োজন আমামী নির্বাচনের পরিস্থিতিতে। যারা জাত পাত সাম্প্রদায়িকতা ও আকস্মিকতাকে উদ্ধার দিয়ে, প্রকৃত দিবে, ব্যক্তিগত ও দলগত মুনাফা তুলতে চাচ্ছেন, তাদের দূরে হাটতে দিতে হবে। এই সব দৃষ্টি ভঙ্গীর বহিঃপ্রকাশ উত্তর—পূর্বাঞ্চলের মূলে কাজ করেছে এবং দুষ্কৃতকারীদের দুঃসাহস বাড়িয়ে দিচ্ছে। যে দল ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্রকে মৌল নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে, যে দল কেন্দ্রে একটা স্থিতিশীল শক্ত সমর্থ সরকার গঠন করতে পারবে, সমর্থন সেই দলেরই প্রাপ্য।

একটি বিস্মৃত স্মৃতি চারণ

ঐতিহ্যে নু স্মরণ সুবোপাধায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খুলনা জেলা : মালি ৩০ অসিল লেনগুণ,
স্বাধীন মুখাতি, অসিল
সরকার, নির্দেশ দাস, প্রথম
চৌধুরী, কালীশাল বহু
নামাধার চৌধুরাধায়
নিশাধায় দায় চৌধুরী, মুনাল
বায় চৌধুরী (খোলাধার),
প্রথম ।

বসন্তা : মুখাতি চাটাজি, স্বাধীন
চাটাজি

নিপুণা জেলা : প্রথম চক্রবর্তী

কলিকাতা কেন্দ্র : প্রথম চৌধুরী, বিনয় দাস
(স্বঃ কলি), স্বাধীন চক্র
বাস । প্রথম

এইভাবে সংগঠন প্রথমের পরে টাকা প্রথম
সংগঠন, বোমা প্রস্তুতি, বিস্ফোরণ প্রস্তুতি
প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য কলিকাতা তথ্যচিত্রে প্রকাশিত
করা হয়। কলিকাতার মধ্যে ও আবার ওকট
উৎসাহের বসন্তা হয়ে গেল এইভাবে নিজেরা একটা
কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন ।

অসিলের পর স্বাধীন চক্র দায় স্বঃ কলিকাতাতে বিনয়
দায় লংঘনে বিবিসিউস, বেলিগার, চীনা পাকড়া প্রস্তুতি
দান হইতে সংগ্রহ করেন । প্রথম বাবুই মন্ত্র সংগ্রহের
প্রধান আশ্রয় । তাহারাও নির্দেশ এই সংগ্রহ কার্যে
অগ্রসর হইত । ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সত্যান
দায় কলিকাতা নির্দেশিত হয়ে প্রভাত চক্রবর্তী স্থান
হইতে কলিকাতা আসেন অসিলের সন্ধানে । প্রথম
বাবু ও প্রভাত বাবু উভয়ে এই সংগ্রহ কার্যে কলিকাতা

ছিলেন । তাই তাদের চৌধুর ও স্বঃ কলিকাতার অসিল
খানারির সন্ধানের বেশ ভাল প্রথম প্রথম লিপ্ত হইত ।
এই লিপ্ত হইতে প্রভাতী স্বাধীন চক্র দায় বসন্তা
বিশাল চাটাজি কেন্দ্রে পাঠানেন ।

বোমার পর চাটাজি সন্ধান পাওনী, প্রথম চক্র
বাস, স্বাধীন দায়, স্বাধীন সরকার (মুনাল) । প্রথম
চক্রবর্তী প্রথম বাবুই ছিলেন । বোমা দান হইতে
সন্ধাননি নিঃসৃত হইতো । বিশাল চক্রবর্তী প্রথম
বসন্তাধার হইতে ও প্রথম কলিকাতা চক্রবর্তী প্রথম
কলিকাতা প্রথম বাবুই ছিলেন । বোমা দান হইতে
সন্ধাননি নিঃসৃত হইতো । বিশাল চক্রবর্তী প্রথম
বসন্তাধার হইতে ও প্রথম কলিকাতা চক্রবর্তী প্রথম
কলিকাতা প্রথম বাবুই ছিলেন ।

সন্ধান পাওনী ও আবার চাটাজি বিশ্ববিদ্যালয়ের
কলিকাতার হইতে বোমা প্রস্তুতি, সংগ্রহ, প্রস্তুতি
সংগ্রহ করিতো । এতদ্বারা স্বাধীন আবার ও কলিকাতা
হইতে এতদ্বারা সংগ্রহ করিতো ।

নামাধারস্মৃতি-শীতলকা মিনালী মনি বহু তাহার
সোহায় কার্যবান হইতে বোমার খোল (Shell) তৈরী
কবে বোমাধার হিতো ।

পূর্ববর্তী উল্লিখিত হয়েছে যে সত্যান পাকড়া
বসন্তা তৈরী বসন্তা দিয়ে নিঃসৃত হইতেন ও প্রথম
নির্দেশিত প্রমাণী আশ্রয় দিয়েছিলেন তাই এই প্রমাণ
তৈরী করিতে বিশেষ বেশ পাইতে হয় নাই । এইভাবে
প্রথম প্রস্তুতি বোমা তৈরী হয়েছিল ।

এভাবে কলিকাতাতে ও আবার স্বঃ কলিকাতার
বিনয় দায়-কলিকাতা দায় কলিকাতার ও প্রমাণাব
হইতে স্বাধীন সত্যান প্রস্তুতি বোমা তৈরী কলিকাতা



থাকেন। কালীঘাটেই কোন এক তথ্যবাহার ঘাটিকা খোল যোগান দিতো। ফিল্ম এগেদমুখীতে যে যোদ্ধা নিকশিত হয়েছিল তাহা সতীন রায় এখানেই নিখান করেছিলেন।

অর্ধেক অরুণ মাল খানাতার, গোটে অকিস স্টুট হর। তাহাতে কক চক্রবর্তী, ব্রজেন দাস, নরেশ শুভ, সতীন রায় অংশ গ্রহণ করে না স্থানীয় সরকার নির্দেশক ছিলেন।

ইহার কিছুদিন পর ঢাকা-ভালতলা গোটে অকিস স্টুট হর ইহাতে ব্রজেন দাস, ককচক্রবর্তী, পূর্ণেশ্বর বোম্ব, স্থানীয় সরকার প্রমুখ অংশ গ্রহণ করে।

এতদ্বারা সতীন সত্যায় সিক্সের ভিতর হইতে জানা ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে দিতো। ভাষাভিহ বিক বেনী নকর দেওরা সতীন সত্যায় বিকল্প ছিল বলে এখানেও তখন বেনী নকর দেওরা হয় নাই। সতীন সত্যায়ের দ্বায়েই অর্ধেক অরুণ তখনও অস্বস্তিত হয় নাই। বসন্তে টাকার বহুতর হয়েচে কতীরা হুগিয়েছে।

এদিকে আবার প্রভুল চট্টাচার্য্য মহাপ্রাণ ঢাকার প্রায়ই এসে সতীন চেলসেবর বসন্তর কালী বাকীর মাঠে হুটিং (Shooting) চালনা দিচ্চা। এইভাবে তিনি প্রথমবারে বসন্ত দাস, কক চক্রবর্তী, সতীন রায়, স্থানীয় সরকার প্রমুখকে চালনা দিচ্চা দিয়েছিলেন। উহার আবার পণ্যচক্রের অন্যান্যদের ঐ বিধে দিচ্চা দিতেন। ঢাকাতে প্রভুল বাবু আবাহুদ্রা ইতিহাসিক স্থলের একটি বাকীকে ব্যাপক ট্রেনিং দিয়ে পদ্ধতি করেছিলেন। অস্বস্তি ভাবে বহির্ভাগ ও বহুমনসিহে সময়ে গিয়ে তিনি সৌরভ বোম্ব, সুরেশ চক্রবর্তী, রাবিকা কক, স্থানীয় সত্য, সৈন্যে চক্রবর্তী (হুটী), স্থানীয় রায় অবিল সেবগুণ, অবিল বোম্ব, বিপ্লব চক্রবর্তী পূর্ণেশ্বর বসন্ত, নলে সেন, তখনো বানাজি, হীরাবোহন চট্টাচার্য্য, হরিহরন নাথ প্রমুখ। বিপ্লব ব্যানার্জি সতীন কক (পাল) প্রভৃতিতেও ট্রেনিং দিয়েছিলেন পরবর্তীতে ট্রেনিং দিবার জন্য এ বিধে তিনি যেন

একই বেলারোহা হন নিয়ে চলিতেন।

এইভাবে সকল বিকটেই অতি সন্তপনে ও সন্দেহাশয়ে মনস্ত কাণ চলিতে থাকিতো।

১৯৩০ সালের কাহিন্যরীর প্রথম ভাগে মহাপ্রাণ চট্টাচার্য্য চক্রবর্তী সতীন প্রভাত চক্রবর্তী স্থানীয়তে যেকা হয়। মহাপ্রাণ তখন রেজুনের পথে চট্টগ্রাম হাইতেছিলেন। মহাপ্রাণের কাছে প্রভাত বাবু রিকোন্সিট প্রেশের কাব্যের পরিকল্পনা শেন করেন এবং নিজেদের কাব্যবলীও জানান। কথা প্রসঙ্গে প্রভাত বাবু অপরদের কাছে অর্থ সংগ্রহে লাব্যতা করার কথা বলেন। কেননা মহাপ্রাণের সহিত বকিন-পূর্ণ-এশিয়ার অনেক দেশের অর্থ সত্যায় কাহীনের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ছিলেন এ বিধের অস্বস্তীন বলের বিশেষ অভিজ্ঞলোক। এই সময় মহাপ্রাণ বলেন "বসন্তে আবার কোন কাহীনা নাই। এখনো হাইতেই নীতাই-সেখান থেকে কিরে এসে বসন্ত তোমাদের সাগোয় করা সত্যায়র হইবে কিনা"।

১৯২৮ সালের ভিসেবর মাসে সতীন পাকড়ানীর প্রেষারের কলে অস্বস্তীন অগ্রগামী কহীনের বসন্ত যে মানসিত হতাশা উদ্ধৃত হয় তাহা হয় কহিবার জন্য ঢাকা হল এন-বি টেন বসন্ত ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী প্রথম ভাগে ব্রজেন বাবুর ঘরে এক অস্বস্তী সভা বসে। সৌরভ বোম্ব, সতীন রায়, নরেশ শুভ, ককচক্রবর্তী প্রমুখ স্থির করেন যে এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে ঢাকা-মহানগরীর ব্রাহ্মণি গ্রামে বহুবাহরী পরগনা হুং সত্যায়ন অস্বস্তিত হউক। ঐ সত্যায়নের সত্যায়িত করার জন্য বহুবাহরীকে তা: বিশিষ্ট বিহারী দেনকে মনোনীত করা হয়।

উদ্ভূত হুং সত্যায়নের অধিবেশনের আড়ালে পুর্নিশে চোখে বুলা দিয়ে পূর্জ বাহলার বিপ্লবীরাও তাঁদের সত্যায়িত-ছাত্র-হুং প্রতিমিহি বা উদ্ভিগীত কলে বিভিন্ন খেলা হতে এসে একত্রিত হয়ে তবিততে কণ্ঠস্বা দিহী করত। এত কহীনের মনে বহুসংখ্য ভিত্তিত উৎসাহ উদ্ভীপনার সত্যায়ন হইবে। (চলবে)

রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

[“A Nation In Making” গ্রন্থ থেকে অংশাবলি]

অনুবাদক—অধ্যাপক নগিনীমোহন দাসগুপ্ত

পরোক্ষ প্রতিরোধ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সকলেই বুঝতে পারলেন যে এটা ঠিক আসল কারণ নয়। আসল কারণটি এই অহিঁসার শেহনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু তার অন্তঃসার-শুদ্ধতা একেবারেই স্বচ্ছ। এই অহিঁসার শেহনে সরকারী ব্যাখ্যা সংবাদপত্রগুলির নিকট পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তাতে সরকার পক্ষের মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটল না, ঘটল জনসাধারণের মধ্যে অদত্তোত্তের বৃদ্ধি। আমরা তখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যোগদানের দ্রুত বোধগেতে ছিলাম। আমরা কিরে এলেই যাতে একটি আলোচনা বৈঠক ডাকা হয় সেজন্য একটি তারবার্তা পাঠালাম এবং যত তাড়াতাড়ি পেরেছি আমরা কিরে এলাম।

আমার কিরে আসার পরদিনই সেই বৈঠক কল। বহু লোক সে সভায় উপস্থিত হল। কিন্তু হায়! একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সে সভায় উপস্থিত থাকতে পারলেন না। আর কোনদিনই তাকে আমাদের কোন জনসভায় দেখা যাবে না। ইনি হলেন মিঃ রতুল। মাত্র দুদিন আগে তিনি তার একমাত্র কস্তার বিষের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করার কাজে ব্যস্ত থাকার মধ্যে হঠাৎ জলবায়ের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় এ জগৎ ছেড়ে চলে যান। তাই আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে এক ব্যক্তিগত বিরোধ-বেদনার কাল ছাড়া নিজে কনফারেন্সে সমবেত হলেন। সম্মেলনে চেয়ারম্যানের কাজ

আমি করি। সভায় উদ্বেজন্য ছিল খুবই প্রবল এবং বিষয়টি নিয়ে যতই আলোচনা চলে ততই উদ্বেজন্য আরও বেড়ে যায়। বিনিতি যখন বক্তৃতা করতে গেলেন তিনিই ভয়ানক শপথ করেন যে তিনি সরকারের এই আমন্ত্রণকে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হলে সে জন্য জেলে যেতেও প্রস্তুত আছেন। এটা এখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে সরকার যে সভা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন তা যদি অসুস্থিত হত তা হলে সভার উত্তোক্তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠতো।

অনেক উদ্বেজন্যপূর্ণ কথাবার্তা ও অবশেষে এই সিদ্ধান্ত হল যে আমাদের মধ্য থেকে ৬ জন সভা ছেড়ে নিভৃত বসে একটা কর্মপদ্ধতি স্থির করলেন। যে কর্মপদ্ধতি কোন গুলোর আপত্তি না করে কনফারেন্স গ্রহণ করবে। কনফারেন্সে উপস্থিত বয়ো-রক্ষণের উপর এই সম্মানজনক কাজের দায়িত্ব অর্পিত হল। এরা হলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ বাবু মতিলাল ঘোষ, মিঃ ঘোমকেশ চক্রবর্তী, মিঃ সি. আর. দাস, কল্ললুল হক এবং আমি নিজে। আমরা একটা পানের ঝরে গিয়ে আলোচনায় বসলাম। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আলোচনা করে সম্মতক্রমে এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে আমরা ঢাকায় গিয়ে গভর্ণর লর্ড রোপার্ডের সঙ্গে এক ডেপুটিশনে মিলিত হয়ে সাক্ষাৎ করে প্রকৃত অস্থায়ী কথা তার

গোচরীকৃত করবে। এবং সভা নিষিদ্ধ করার আদেশটি বাতিল করার জন্য অনুরোধ করব। গভর্ণর সাহেব তখন ঢাকায় ছিলেন। আমাদের এই চিন্তা মনে এল যে গভর্ণমেন্টকে এই রকম এক অসহনীর পরিস্থিতি সৃষ্টির কাজ থেকে প্রতি-নিবৃত্ত হওয়ার একটা সুযোগ আমরা সেবা; এবং তাতে যদি আমরা সকল হই কেবলমাত্র তখনই আমাদের পরোক্ষ প্রতিরোধের পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হবে।

এই সিদ্ধান্ত করে আমরা সেই নিষিদ্ধ কক থেকে বেরিয়ে কনক্যাংসে হলে ফিরে এলাম। মি: ব্যামকেন্স চক্রবর্তীর উপর আমাদের সিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করে বন্ধিয়ে দেওয়ার ভার দেওয়া হল। একজন প্রবীণ এবং স্বাস্থ্য আইনজ্ঞের মতই তিনি কৌশলে এবং সুনিপুনভাবে এ কাজটি সমাধা করলেন। কিন্তু সভার আসর যখন উত্তপ্ত থাকে তখন সাধারণত: সব সময়ই যে রকম ঘটে, এখানেও তাই ঘটল। কোন নরম পন্থা গ্রহণের পরামর্শ তাঁর মনে রাখাপাত করতে পারল না। প্রস্নের পর প্রস্ন করে আমাদের একেবারে অস্থির করে ফেলা হল। আমাদের এই সিদ্ধান্ত অধিকাংশেরই মন:পূত্ব হল না। তারা সকলেই চান জনসভা করতে এবং পুলিশের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ বাধাতে। সভা করতে গেলেই সে সংঘর্ষ দেখা দেবে। তবে পুলিশের সঙ্গে বাস্তবিকই কোন সংঘর্ষের পরীক্ষায় বড়জন উত্তীর্ণ হতেন, তা বলা আমার সাধের অন্তীত। বরিশাল সম্মেলনের সময়কার কোন কোন ঘটনার কথা আমার মনে আছে। স্বাভাবিক সাহসিকতা-পূর্ণ বক্তৃতা করেছিলেন ও ভাবভঙ্গীতে প্রতিরোধের ভাব প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেককে দেখেছি পুলিশ যখন শোভাযাত্রা আক্রমণ

করে ভেঙ্গে দিল তখন যতদূর সম্ভব দ্রুত পালায়ে গেলেন। অবশ্য সময়ের এখন পরিবর্তন ঘটেছে। তখন একথা বলা যায় যে কারাকান্ড হওয়ার মোহ ও সন্তোষ বাহবা পাওয়ার পাগলামী একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহেছে।

বৈঠক ভেঙ্গে গেল। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল না। তবে এ রকম একটা মত প্রকাশ পেয়েছিল যে বৈঠকের আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অনুমতি ঘাড়াই আমরা একটা ডেপুটেশনে যাব। সঙ্গে সঙ্গেই আমি গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মি: পোলের সঙ্গে সংযোগ করলাম এবং ডেপুটেশনের জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট করা হল। স্থির হল যে সে সময় ঢাকার যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভা বসবে তা যেদিন শেষ হয়ে যাবে তার অব্যবহিত পরের দিনই আমাদের ডেপুটেশন গ্রহণ করা হবে। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অনেক ভারতীয় সদস্যই ডেপুটেশনে যোগদান করতে চাইলেন। কিন্তু ডেপুটেশনে যাওয়া যাবেন তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ঐ সংখ্যা ছিল ৬ জনে সীমাবদ্ধ। আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্ত ভালই হয়েছিল। কারণ আমাদের গভর্ণরের সঙ্গে কিছু গোপন কথাও হয়েছিল যা কোন বড় বক্তৃতার ডেপুটেশন গেলে বাধ্যপ্রাণ হত। ইতিমধ্যে দেশে টাউন হলের সভা নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদ স্বরূপ নানারকম উৎসাহিত আন্দোলন মতামত ছড়িয়ে পড়ল। এর মধ্যে একটি প্রস্তাব হল এই যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ভারতীয় সদস্যগণকে কাউন্সিলের সভা বর্জন করতে হবে। যে টীমারে চড়ে বৈঠক ভাগ সদস্য ঢাকায় যাচ্ছিলেন সেই টীমারের মধ্যেই এই প্রস্তাবটি নিয়ে খুব গুরুত্বের সহিত আলোচনা হয়। একটা নিষ্পত্তি যখন হতে চলেছে এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনার

জন্ম একটা ডেপুটেশনও যখন হুঁত হতে চলেছে ঠিক তার পূর্বক্ষেণে এ রকম একটা প্রস্তাবের মত অবিবেচনা প্রস্তুত প্রস্তাব আর কিছুই হতে পারে না। গভর্নমেন্টের নিবৃত্তিতার ফলে যখন জন-সাধারণের মধ্যে তীব্র উদ্বেজনার সৃষ্টি হয় তখনই কিতাবে চরমপন্থী মতবাদ প্রচলিত হয়। এমন কি প্রকল হয়ে ওঠে তা দেখাবার জন্যই এই ঘটনার উল্লেখ করলাম।

লর্ড রোশাস্‌সে ঢাকায় গভর্নমেন্ট হাউসে সৌজন্য দ্বারা দায়িত্বের সহিত আমাদের ডেপুটেশন গ্রহণ করলেন। ডেপুটেশনের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মি: স্যোমকেপ চক্রবর্তী, মি: সি. আর. দাশ, মি: কল্লুল হক ডা: নীলরতন সরকার বাবু শুরেন্দ্রনাথ রায় এবং আমি নিজে। মর্মে প্রথমেই লর্ড রোশাস্‌সে জিজ্ঞাস করলেন আমাদের মধ্যে কে মুৎসাদ্দ হতে কথা বলবেন। মি: চক্রবর্তী আমার আমার নাম বললেন। পরবর্তীকালে মিসেস বেনাটকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত করার বিষয় নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের মধ্যে যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে শুধরো পর্যাপ্ত সে মনোভাব স্থান পায়নি।

আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত সরকারী কাগজপত্র নিয়ে প্রেরণ হইবেই লর্ড রোশাস্‌সে এসেছিলেন। তিনিই আলোচনার সূত্রপাত করলেন। আলোচনার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এটা স্পষ্ট বোকা গেল যে আন্ত: প্রাদেশিক ব্যাপার বলে যে কথা উঠেছিল, এক প্রদেশের লোকের অন্ত: প্রদেশের শাসনকর্তার কাজ-কর্মে সমালোচনা করা অব্যাহীন বলি যা বলা হয়েছিল তা সবই ভুলো কথা। প্রতিবাদ সভা নিষিদ্ধ করার কাণ্ডটা যে কী, তা অকণ্টেই প্রকাশ করা হল। যুক্তির

বিচারে তা মেনে নেওয়ার মত বিষয় নয়। তবে তা স্বর্ষে পরিমাণে সভা বলে প্রতীয়মান হয়। যে কারণে সভা নিষিদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা হল এই যে হোমকল লীগের একটি সভায় (গভর্নর সাহেব আমাকে সম্মোহন করে বললেন—‘আপনি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না’) এমন ভাষায় বক্তৃতা করা হয়েছে যা গভর্নমেন্টের নিকট অত্যন্ত আশঙ্কিতকর বলে মনে হয়েছে, এবং এই কারণেই আশঙ্কা করা হয়েছে যে টাউন হলের সভায়ও সেই রকম ভাষা প্রয়োগ করেই বক্তৃতা করা হবে, বিশেষত: বক্তারা প্রায় সেট একট লোক; আর সেই বক্তৃতা করা হবে আরও অধিক সংখ্যক তরুণ প্রজাতির কাছে। এর ফল পূর্বেই ব্যাখ্যাত হবে। লর্ড রোশাস্‌সে বেশ মর্ষপূর্ণভাবে বললেন, ‘অস্বাভ্য প্রদেশে যে রকম করা হয়েছে আমি তো জাহেদের উপরে সে রকম কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করিনি যে তারা কোন জন সভায় উপস্থিত থাকতে পারবে না।’

লর্ড রোশাস্‌সে সি. আই. ডি অফিসারদের রিপোর্ট থেকে আশে বিশেষ পাঠ করে আমাদের শোনাতে আরম্ভ করলেন। এই সি. আই. ডি অফিসারগণ হোমকল লীগের উদ্বেষিত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার বিবরণ সঠিকভাবেই রিপোর্ট করা হয়েছে কি না তা বলা সম্ভব নয় কিন্তু যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তা যদি মোটামুটিভাবেও কিছু পরিমাণে সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় যে যে ভাষায় বক্তৃতা করা হয়েছে তা অত্যন্ত অদম্য হয়েছে। কর্তৃপক্ষ নিজেরাই থাকে প্রায়ই তাদের আয়োজিত জন সভায় বক্তৃতা করার জন্য। ডেকে আসেন, এ রকম একজন বক্তা সম্পূর্ণ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তিনি উপস্থিত মুখবদের

বে-আইনী ঘোষিত অস্বীকৃত সমিতির কর্ম-কৌশল অনুসরণ করে বল প্রয়োগের নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দেন। রিপোর্টে আরও বলা হয় যে সেই বক্তা বলেছেন যে ইংরেজরা এসেছে মুষ্টিমেয়, অপর পক্ষ এসেছে সন্তানরা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ। তথাপি এই মুষ্টিমেয় বিশ্বেশীরা তাদের প্রভু হয়ে আছেন। আর একজন বক্তা এই হোমরুল সভায় বক্তৃতা করতে হবে, কারণ তিনি সি. আই. ডি অফিসারদের অনুবাদ করা রিপোর্টে বিশ্বাস করেন না। বক্তার এই মন্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মনে হল এবং আমার সে মনোভাব আমি প্রকাশ করলাম বিশেষতঃ এই কারণে যে এই বক্তাকেই ইতিপূর্বে একবার এই বলে আপত্তি জানাতে হয়েছিল যে সি. আই. ডি তার বক্তৃতার ভুল রিপোর্ট পেশ করেছেন। আমার এই কথাই উত্তরে গভর্ণর বাহাদুর বললেন যে আমার এই রকম মন্তব্য সি. আই. ডি-র সভ্যতার উপর কটাক্ষপাত করা হয়েছে। সি. আই. ডি সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট স্বভাবতই খুব উদ্বিগ্ন বোধ করেন; কারণ বিপ্লবী দল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রায়ই সি. আই. ডি কর্মচারীদেরই বেছে নিয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম যে স্তার রাসবিহারী ঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন—এটাই তো একটা নিশ্চিত আশ্বাস যে সভার কাজ যুক্তিযুক্তভাবে ও অল্পে পথেই পরিচালিত হবে। লর্ড রোবান্সন বলেছিলেন যে তারা সে খবর জানতেন না। আমি বললাম যে তা সহজেই জানা যেত। গভর্ণর বাহাদুর সারা সমগ্রটা বেশ অকপট ও বিবেচনামূলক ছিলেন এবং তিনি বললেন যে আমরা যদি তাকে নিশ্চয়তা দান করি যে সভায় বক্তৃতায় কোন উত্তেজনাপূর্ণ প্রশ্ন প্রশ্ন করা হবে না এবং সভার

কাজ যথাযথভাবে পরিচালিত হবে, তা হলে তিনি নিয়েছাড়া প্রত্যাহার করে নেবেন। উত্তরে আমরা বললাম যে আমরা সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা দান করতে পারছি না, তবে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করব যাতে গভর্ণর বাহাদুরের ইচ্ছা পূরণ হয়। আমরা আরও বললাম যে সব জন সভারই উত্তেজনার মধ্যে এরকম একটা বোঝাপড়ার ভাব সব সময়ই থাকে যে সভার কাজ সঙ্গত ও যুক্তিযুক্তভাবে পরিচালিত হবে। এই সমস্ত আলোচনার ফলে মোট কথা দাঁড়াল এই যে নিশ্চয়তা দান করেছি। তার ভিত্তিতে নিবেছাড়া প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

এইভাবে আমরা একটা সাক্ষ্যের আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। আমার কিন্তু মনের মধ্যে একটা খটকা ছিল, কি জানি, আমাদের কি ভাবে অভর্থনা করা হবে। আমাদের এই বাংলাদেশ কোন বিষয়ে কোন সাক্ষ্য যদি মনোহাতিতভাবেও অর্জন করা যায়, তা হলেও তা সব সময় নিরংকুশ সমর্থন লাভ করে না। বঙ্গ-ভঙ্গ আইন যখন সংশোধন করা হল এবং যখন সকলেই মনে করেছিলেন যে জন-সমর্থনের ঐক্যতানের মধ্যে প্রতিবাদের মূহ একবারে ডুবে যাবে, তখনও সেখা গেল যে একদল লোক আছেন যারা বিহারকে বাংলা থেকে আলাদা করে নেওয়ার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া আরও বেশী সংখ্যক লোকের কাছে রাজধানীকে স্থানান্তরিত করার কাজটা একটা আশাত বলে মনে হয়েছে। সুতরাং আমি যে কোন প্রকার মন্তব্য ও সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম : বিশেষতঃ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেই যে ভাবে আলোচনা বৈঠক ভেঙ্গে যায় সে ঘটনার কথা মনে রেখেও আমার প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল।

ডেপুটেশনে আমাদের প্রতিনিধির করার
যোগাভা বা অধিকার ছিল কিনা, তাই নিয়ে
এক প্রতিবাদ উঠলো; এবং প্রতিবাদের মধ্যে
এমন একজন লোক ছিলেন যিনি আমাদের সমস্ত
আলাপ-আলোচনার একজন অগ্রবর্তী ভূমিকা
নিরেছিলেন এবং যিনি নিজেকে ডেপুটেশনের
একজন মধ্যস্থতায় মনোনীত হতে কোন আপত্তি
করেন নি। তিনিই খুব বেশী করে জোড় দিয়ে
আমাদের প্রতিনিধির করার অধিকার সম্পর্কে
প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু একমতে
সাক্ষ্যের মত আর কিছুই সকল নয়। সাক্ষ্যই
হল সাক্ষ্যের একমাত্র নজির। সভার উপর
জেরে নিবেদাঙ্গা যে তুলে নেওয়া হয়েছে
তাইতো একটা ল্যাভের কথা দ্বার মূল্যকে কোন
প্রশ্ন করা চলে না। কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারের
পার্শ্ব সমস্তা নিয়ে জনসাধারণ ভত মাথা ঘামায়
না, আর যদি বা ঘামায়, তাহলে তাও সাময়িক
ভাবে। সাময়িকভাবে হয়ত বা তা তাদের
স্বাধীনকে একটু খানি হ্রাস হ্রাস দিতে পারে অথবা
কোন কলহ রটনা তাদের স্বাভাবিক ভাল লাগার
প্ররতিকে তুণি দিতে পারে। কিন্তু সেই মুগী
রোগের ভাবটা অল্প দিনের মধ্যেই কেটে যায়
এবং যুক্তি ও সাধারণ বিচার বিবেচনাই শেষ
পর্বত জনগনের স্বাভাবিক অংগ। রূপে জোড়ার
হয়ে উঠে। একটা প্রস্তাব এল যে আমরা আর
একটা বৈঠকে মিলিত হই এবং ডেপুটেশনে কি
ঘটেছে কি ঘটছে, তা সকলকে জানিয়ে দেবো।
আমি এ প্রস্তাবে আপত্তি জানালাম। কারণ
আমার মনে আশঙ্কা ছিল যে আগের বৈঠকে যে
রকম ভীত বাধ্যতাবাদ ও বগড়া খাটি হয়েছে
এখানেও আবার তারই পুনরাবর্তি ঘটবে। আমি

টউন হলে এক সভা ডাকার প্রস্তাব করলাম।
কারণ আমি মনে করলাম যে এ রকম ক্ষিতি
যদি হয় তাহলে তার দাকার তার প্রচার এবং
তার প্রতিনিধির মূলক পরিস্থিতি ব্যক্তিগত
উদ্বেগনাকে অনেক খানি কমিয়ে দেবে, হয়ত বা
পর্যাপত্তির তুল ধারণাকেও হ্রাস করবে।
আমার এই সিদ্ধান্ত যে ঠিক হয়েছিল তা
প্রমাণিত হয়েছে।

টউন হলে একটি জন-সভা হল। এটা হল
সেই পুরানো সভা বা নিঃস্ব কয়া হয়েছিল।
সহকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই
সভা খুব চমকপ্রদ ভাবে সাক্ষ্য লাভ করে।
এই সভা আমাদের জন-সভা করার অগ্রগণ্য
অধিকারকে সাব্যস্ত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত বৈধ
পন্থা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করা না হয়
ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সে অধিকার কেউ বধন
করতে পারে না। তার বাস বিহারী যোব সভায়
উপস্থিত ছিলেন না। তাই আমাকেই সভাপতিত্ব
করতে বলা হল। আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ
করলাম। সভায় একমাত্র আমিই বক্তা ছিলাম।
আর কেউ বক্তৃতা করেন নি। সভার সকলেরই
এই রকম মনোভাব ছিল যেন আর কেউ বক্তৃতা
না করেন। খুদী মনে সকলেই তা মেনে নিলেন।
আমি ও এই স্বযোগ গ্রহণ করে ডেপুটেশনের
প্রকৃতি ব্যাখ্যা করলাম ব্যাখ্যা করলাম। আর
আমিইতো দিলাম সেই ডেপুটেশনের নেতা।
আমার মনে হয়, এই প্রসঙ্গে আমি সেই টাউন
হল বক্তৃতায় বা বলেছিলাম তা মোটামুটি ভাবে
সকলেই সমর্থন করেছিলেন। আমি আমার সেই
বক্তৃতায় কথা গুলি এখানে উদ্ধৃত করার লোভ
সামান্যে পারছি না।

সভা নিবিদ্ধ করার সংবাদটি কখন আমাদের কাছে পৌঁছল, তখন বাবু মতিলাল ঘোষ এবং আমি বোম্বেরে ছিলাম। আমরা ভাড়া ভাড়ি কলকাতায় চলে এলাম। আমরা একটি আলোচনা বৈঠকে বসলাম এবং ঢাকার লর্ড রেনাল্ডসকে বাহাদুরের কাছে এক ডেপুটীনে গেলাম। আমরা যে ডেপুটীনে গিয়েছি তা কোন সংঘ বা জন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব নিয়ে বাইনি। গিয়েছিলাম ব্যক্তিগত ভাবে কয়েক জনের প্রতিনিধিত্ব করার বোগাতা আছে, এই বিবেচনায় : কারণ, এই ব্যক্তিরাই মাদ্রাসার সেবার সংগ্রামে অনেক দ্রুত সময়ে 'সেই সংগ্রামের তাপ ও কামেলা সঙ্গ করেছেন। আমাদের এ দাবী নিহিত রয়েছে আমাদের জন-সেবা মূলক কাজের স্বাভিত্র মধ্যে ; আমাদের এ দাবী রয়েছে আমাদের উদ্দেশ্যের পবিত্রতার মধ্যে : সর্বোপরি আমাদের এ দাবী রয়েছে দেশ বাসিন্দাদের আমাদের প্রতি যে আস্থা আছে সে সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যাহার মধ্যে। ছোটলাট বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের সময় আমরা তাকে কোন রকম প্রতিশ্রুতি দেইনি ; কোন রকম প্রতিশ্রুতি চাওয়াও হয়নি। আমরা কেবলমাত্র, এই বলেছি যে আমরা সাধারণত সেবাবো বাতে সভার কাজ দায়িত্ব বোধের সঙ্গে পরিচালিত হব। একে যদি প্রতিশ্রুতি করতে চান, বলুন। কিন্তু এ রকম প্রতিশ্রুতির ভাব আমাদের সমস্ত জনসভার ক্ষেত্রেই থাকে। এটা আইনেরই নির্দেশ। এর মধ্যে কোন ব্যর্থক বাকা বা বাচ্চাতুরা ছিল না ; মূল নীতির সঙ্গে কোন রকম আপোষ

করা হয়নি ; আমাদের কোন অধিকারকেও ছেড়ে দেওয়া হয়নি। আমরা সেখানে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা মত মর্যাদা ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেছি ; আমাদের গড়ে তোলা ক্ষমতাও অধিকারের প্রতি নজর রেখেই কাজ করেছি। লর্ড রেনাল্ডস সে বাহাদুরও তার দিক থেকে আমাদের মনোভাবের প্রতি মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি আমাদের ভ্রমভাবে এমনকি সম্ভবতার সহিত গ্রহণ করেন এবং একজন রাষ্ট্রনীতি বিদের মতই সম্ভট করার মনোভাব নিয়েই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। সভার উপর থেকে নিবেদাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে ; এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের সরকারী কাজের সমালোচনা করতে পারবে না— এই নীতিও পরিত্যক্ত হয়েছে। ঢাকায় আমরা যা করেছি তার মোট ফল হল এই। এ লজ্জা আমরা লজ্জিত নই ; আমরা যা করেছি তা ঠিকিই করেছি, দৃঢ় ভাবেই তা বলছি।”

এই ভাবে আমাদের গণ-আন্দোলনের মধ্যে যে একটা সংকট মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তা এড়ান গেল। সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে আমি সৈকান্ত ভীত নই। তবে যে কাজের জন্য সে সংঘর্ষ, তা যেন বৃত্তিভূত হয়, যেন তার পেছনে জনমতের দৃঢ় শক্তি লগ্নাশ্রম থাকে, যেন তা এমন কোন দমন-মূলক সরকারী কাজের দিকে ঝেঁলে না নেয় যা আমরা সম্মত করতে পারব না এবং যার ফলে আমাদের বিকাশশীল স্বদেশ সেবার প্রযুক্তি বাধা পেতে পারে। অগ্নাঙ্কতাবাদী আন্দোলনের ফলে এই বালায় যে দমননীতির প্রয়োগ করা হয়েছে তা আমাদের (বাকী অংশ ১২ পাতায়)

ভারতে স্থিতিশীল সরকার দৰ্শনাগ্ৰগণ্য

শ্রীমন্তীর বন্দোপাধ্যায়

(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর)



সাধারণ্যে ধারণা প্রায় বহুদূর হয়ে যাওয়ায় যে ইন্দিরা কংগ্রেসই ভারত শাসনের অধিকার অর্জন করেছে। এবারের নির্বাচনে ও স্থিতি-স্থিতিশীল সরকার গঠন কোরবে জনগণের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে, আর ভারতের অগ্রগতি স্বাভাবিক হবে পুনরায় কোন ব্যক্তি বা দল বার্থে নয়, সম্পূর্ণ জনবার্থে, আর তাই কামা আজ দেশবাসীর কাছে। পশ্চিম-বঙ্গে শ্রমজীবী শক্তি বৃদ্ধি যে হারে ক্রম-বর্ধমান তা লক্ষ্য করলে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে অচিরে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা আসনগুলি তাঁর দলই দখলে রাখবে। আর অল্প রাজ্যের সংবাদ যা তা তাঁরই অধিকূলে বলে প্রতীয়মান হয়। সে কারণ রাজনৈতিক দূর দৃষ্টি সম্পন্ন প্রাক্তন বিপ্লবীদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর সহায় ও সমর্থক হতে চাইছেন কেন্দ্রে স্থিতি ও স্থিতিশীল সরকার গড়ার আশায় যাতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কর্ম-কাণ্ডগুলি অচিরেই শুরু হয় ও তাঁর ফলে দেশ সর্ব বিষয়ে সমৃদ্ধ হতে পারে অনতিবিলম্বে।

জনতার নেতা জগজীবনরাম ইন্দিরার সিকে বিপুল জনসমর্থন ক্রম-বর্ধমান লক্ষ্য করে, বেশ কীপরে পড়ে এক নতুন রাজনৈতিক কর্মমূল্য প্রকাশ করে; তাতে জনগণকে বিভ্রান্ত করার কাজে অগ্রসর হবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে সুপরিকল্পিত উপায়ে এগিয়ে যাবার পথে সাংবাদিকদের প্রেরণে উত্তর

বেকাশার পড়েছেন। তিনি চান যে ইন্দিরা বাবে সব কংগ্রেস যদি এক হয়ে যায় তবে তিনি খুবই সম্ভব হন, কিন্তু তিনি জনতা দল ছাড়াতে রাজি নন। তাঁর ঐ চক্রান্তে কেউই সামিল হতে ইচ্ছুক নয় মায় বহুগুণাঙ্গী পর্যায় : কারণ তাঁর ঐ সম্ভাবিত যে মৌখিক এবং তা যে কোন মতেই আন্তরিক নয় তা কংগ্রেসীরা বুঝে ফেলেছে। জগজীবনবাবুর বর্তমানে কংগ্রেসকে উপদেশ দেবার কোন অধিকারই নেই; কারণ যেদিন থেকে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে, সি, এফ, ডিকে জনতা দলের সঙ্গে একীভূত করেছেন, সেদিন থেকে কংগ্রেসের ভাল-মন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উঠে গেছে। তাঁর এখন এই কৃত্রিম কংগ্রেস প্রীতি লোকচক্ষে মন্দেহজনক ও উদ্বেগজনক বলে প্রতীয়মান হবে। কোন কংগ্রেস সংগঠনই তাঁকে অতীতের সেই আভা ও বিশ্বাস অর্পণ করতে এখন আর পারবে না বা চাইবে না, তিনি। সে রাস্তা নিজেই বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর ঐ সব রাজনৈতিক কৌশল কার্যকালে বিফল হচ্ছে বাবে বাবে। তিনি চাইছেন ইন্দিরার শক্তিকে বর্ধক করতে, তা সে যে উপায়েই হোক। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা বার্থ হচ্ছে এই জন্য যে কংগ্রেসে স্বাকাকালীন তাঁর যে জনগণের ওপর প্রভাব ও প্রতিপত্তি পূর্বে ছিল, আজ আর তা নেই। জনতার যোগদানের পর তাঁর সে পূর্বের জনপ্রিয়তা অনেকাংশে বর্ধ হয়ে

গেছে, তা কি তিনি নিজেও জানেন না ?

আজ ভারতের জাগ্রতাকাশে দুই প্রতিদ্বন্দী রাজনৈতিক শক্তির অত্যন্ত অসম, একটি বাবুজীর নেতৃত্বাধীন জনতা দলের আর অপরটি শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস (ই) দলের, তবে এঁদের দুই শক্তি গোষ্ঠির মধ্যে কে যে শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করবে তা বলা এখন অসম্ভব কারণ জনগণই সে রায় দেবে সামনের নির্বাচনে। চরণ সিংয়ের জনতা (এম) দল অথবা লোকসল ও বিভিন্ন বাম ও ডান পন্থীদের মার্কা কোন দিক থেকেই শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেস (ই) দলের বা বাবুজীর জনতা দলের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা এখনও অর্জন করতে পারেনি এবং শেষ অবধি পারবেক না কারণ সাধারণ মানুষের দরবারে জনতাদলের ও কংগ্রেস (ই) দলের কথাই আলোচিত হচ্ছে। এই দুই দলের মধ্যে কে যে সাংখ্যিকের জোরে ক্ষমতায়

(১০ পাতার পরের অংশ)

জন-জীবনের বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কারণ দমনের কাজ এমন অধিক মাত্রায় চলেছে যা আমাদের সহ্য করার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। জন-সাধারণের উপর সর্ব-ব্যাপক পুলিশী তাণ্ডব, দীর্ঘকালের জন্য অনেক তরুণ কর্মীকে কারাবদ্ধ করে রাখা, সমিতিগুলিকে বে-আইনী করে দেওয়া—সব কিছু মিলে আমাদের নব জাগ্রত জন-জীবনের উপর এক বিপর্যয়ের স্রষ্টি করেছে। বাবু সে, আমি হয়ত যে সময়ের কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি, তার চেয়ে একটু বেশী দূর এসিয়ে এসে পড়েছি এবং পঁচিছুটা বিস্তারিতভাবে প্রেক্ষাপটবিশিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করে ফেলেছি।

(চলবে)

অধিষ্ঠিত হবে তা এই মুহুর্তে বলা কঠিন। কারণ উভয় পাশেই জনবল, বুদ্ধিবল ও সংগঠনী শক্তি বেশ প্রবল। তবে কংগ্রেস (ই) দল যেভাবে অস্ত্র সব দলকে পিছনে কেলৈ ক্ষুণ্ণ গতিতে অগ্রসরমান, তাতে জয়মালা বোধহয় শ্রীমতী গান্ধীরই প্রাপ্য হবে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের জোরে, আর সেই অবস্থাই এখন ঘোষিত হওয়ার পথে হলে রাজনৈতিক ভাষা-কারণ্য নানাভাবে নিত্যদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করে চলেছেন। এর মূল্য কম নয়, কারণ এঁরাই জনমত গ্রহণ করেন। এটা অবধারিত সভ্য যে শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে এলে সুস্থিত ও স্থায়ী সরকার তিনি গড়ে তুলতে পারবেন। অবশ্য যদি তাঁর দলের একক সাখা গরিষ্ঠতা থাকে লোক-সভায়, নচেৎ কখনই নয়। আর যদি দুই বা ততোধিক দলের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় কেন্দ্রে, তবে সে সরকার সুস্থিত ও স্থায়ী কিছুতেই হতে পারবে না, এ কথা জোর গলায় বলা হায়। তাই জনগণকে যে কোন একটা দিক বেছে নিতে হবে। দুই মোকাদ্দ পা দিয়ে কেহই পথ চলতে পারে না। জনগণকে স্থির ধীর হয়ে বিচার বিবেচনা কোরে দেখতে হবে কে হলে ভাল হব—ইন্দিরা গান্ধী না জগজীবনরাম অর্থাৎ কংগ্রেস (ই) দল না জনতা দল। কাকে তারা সর্ব বিধে যোগ্য ও রাজ্য পরিচালনে সর্বাধিক কর্মক্ষম ও উন্নয়ন প্রবাসী হলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে—সেটাই হবে প্রকৃত মাপ কাঠি। ভারতীয় জনগণের কাছে শ্রীমতী গান্ধীর খুব সম্ভব অধিকতর প্রত্যাশা প্রদানমূল্য হবে বিবেচিত হবেন। কারণ তাঁর যোগ্যতা, কর্ম দক্ষতা ও কুট কৌশল এবং উন্নয়নের স্বার্থ সাধ প্রচেষ্টা সর্বজন মনে ইতিপূর্বেই তাঁর ভাবমূর্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যে সব সাংবাদিক সাহিত্যিক

তার পতনের পরে তার সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি মন্তব্য প্রকাশ করে জনমনে তার ভাবমূর্ত্তিকে ধীরে ধীরে রান ও বিকৃতপ্রায় কোরে এনেছিলেন, তাঁরাও বর্তমানে তার প্রশংসিত গতিতে শুরু করে দিয়েছেন বেশ গটা করে। সংবাদপত্রের দ্বারা দ্বারা তার মন গান, তার শক্তির পুনঃস্থাপন ও তার বর্তমান ভাবমূর্ত্তির উজ্জ্বলতা বেশ প্রকাশমান দেখা যায়। কারণ মনে মনে তাঁরা এক বড়ম বুকেই নিয়েছেন যে শ্রীমতী গান্ধী এখানে প্রধানমন্ত্রীর আসনে সমাসীন হবেনই এবং তাঁই এই স্তুতিবাদ পূর্বকালে তাঁরা শুরু করে দিয়েছেন বলে খুশমান হয়। আবার এও হতে পারে যে তাঁদের রাজনৈতিক জ্ঞান অনেকের চেয়ে বেশী এবং তাঁই জনমত শ্রীমতী গান্ধীর অধিকুল গঠন মানসে তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেছেন দেশের বৃহত্তর কল্যাণের চিন্তায় সে কারণেই হয়ত বা তাঁরাও স্তুতি ও স্বাধীন সরকার কামনা করেন।

তাঁদের চিন্তায় এটাই হয়ত বা উদ্ভিত হয়েছ যে ইন্দিরা কংগ্রেস ছাড়া অতী কোন দলের একক এমন শক্তি নেই যে তারা ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধার হতে পারে, আর ছোড়াভালির সরকার যে আবেশে স্বাধীন হবে না তা সকলেই জানে এবং সেই বিশেষ

কারণে ভারতের একমাত্র শক্তিশালী এক দলীয় সরকার গড়ার কল্পনা ইন্দিরারই আছে, তাঁই তাঁকেই যৌথভাবে সব ভোটের যদি ভোট দেয় তবে নিঃসন্দেহে তিনি আবার এক দলীয় ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তুলতে পারেন আর সেই স্তুতি লক্ষণই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আজ ধীরে ধীরে দেখা দিতে শুরু করেছে। চারিদিকে সম্রাট দেশের জীর্ণাশ্রিত ও উন্নতির পথেই ইন্দিরাকে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী ও তাঁর প্রধানমন্ত্রীর আসনে তাঁর নিকেই অধীষ্ঠা প্রকাশ করতেন আপন আপন মঙ্গল কামনায় ও দেশের সম্প্রদায় উন্নতির আশায়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে এক দলীয় শাসন ছাড়া কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার অদৃশ্য এবং সে কারণে স্বাধীনতা যদি সম্রাট স্তুতি ও স্বাধীন একদলীয় শাসনব্যবস্থা চায় কেন্দ্রীয় সরকারে, তবে শ্রীমতীর কংগ্রেস (ই) দলকে লোক সভায় সংসাদিক আসনে বসার সুযোগ কোরে দিতে হবে তাঁদের ভোটের মাধ্যমে, নচেৎ ভারত আজ যে ভিমিরে আছে সেই ভিমিরেই থাকবে বেশ কিছুকাল এ এক অবধারিত দৃষ্টান্ত, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

স্বাধীন পেটের মাছু, অম্ম, সঙ্গী ও পেটের বেদনা
অর্থ ফলপ্রসূ

আমলা হুত কুমারী

অম্মবেদন্য মতে তৈরী

মূল্য ৩, ৫০ এক একক

ব্যক্তিগত

শ্রীমতীমোহন চক্রবর্তী

১৯৫০

ভায়াত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ স্বীকৃত পত্র ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দল নেতা নলিনী বোস শুধু ক্ষেত্রের বিপ্লবী নন, তিনি ফেল পলাতকও। দলের নেতা হিসাবে বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে তাহাকে সংযোগ রক্ষা করতে হত। ১৯১৬ সালে বিনাসক রাত কাপ'লের উপর নাগপুর সংগঠনের ভার দিয়ে কিছু দিনের জন্য তাকে সেখানে রাখা হয়। নলিনীবাবু নাগপুরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলাহাবাদ যান। এলাহাবাদ সংগঠনের চিঠিপত্র যেত রঘুবীর শর্মার নামে। রঘুবীর এলাহাবাদ কোর্টে হাবিলদার ছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তার নামে চিঠিপত্র পুলিশ সংগ্রহ করবে না এই ছিল বিপ্লবীদের ধারণা। নলিনীবাবুও এই নামেই চিঠি দিয়ে নাগপুর থেকে রওনা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে দলের লিবার্টি ইন্সতার গোপনে বিলি করতে গিয়ে রঘুবীর ইজরায়েল যান। তার নামে চিঠি বেড়েই পুলিশ তা খুলে দেখে। একেবারে শিকার ছুটে গেল। এলাহাবাদ ঠেকনে গাড়ি থেকে নামতেই নলিনীবাবু গ্রেপ্তার হলেন।

নলিনীবাবুকে গ্রেপ্তার করার পরেই এলাহাবাদে তার উপর এক দফা অভিযান চললো। দ্বিতীয় দফা অভিযান হল কলকাতা কিড্ ট্রাটে নিয়ে এসে। তাহাকে কোর্টে উপস্থিত করা হল না। আবার তাকে নিয়ে বাওরা হল এলাহাবাদে। সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল শরীর থেকে প্রহারের চিহ্ন দূর করা। কয়েকদিন পরে তাকে বাংলাদেশে

নিরে আসা হল। প্রথমে তাকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অপরাধে সেখানে তার বিচার হয়। কিন্তু সরকার পক্ষ প্রমাণ করতে পারল না যে নলিনীবাবুর উপর অন্তরীণ-এর আদেশ জারি করা হয়েছিল। ফলে তিনি বেকসুর মুক্তি পান। কিন্তু আদালত ভবন ত্যাগ করা মাত্র তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে কলকাতা দালাও হাউসে এনে তার কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে রাখা হল। এখানে বিপ্লবীদের ভোরে এক ঘন্টা এবং বিকেলে একঘন্টা পাখচারি করতে দেওয়া হত। গ্রেপ্তারের সময়ে নলিনীবাবুর পরিচানে ছিল হাফ-প্যাট এবং পায়ে ছিল বুট জুতা। এই পোষাকেই তিনি সমগ্র ভারতে ঘুরে বেড়াবেন। পুলিশের সন্দেহ এড়াবার জন্য তিনি একশ পোষাকে থাকলে দালাদ হাউসেও গ্রেপ্তারের পরে তিনি এই পোষাকে ছিলেন। একদিন বিকালে অপর এক বন্দী প্রবোধ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে নলিনীবাবু এই পোষাকে সোজা গেটে চলে এলেন। কোন প্রতিবাদ সূচ্য না করে প্রহরীকে বললেন, দরজা খোল প্রহরী মনে করল ইনি কোন পুলিশ অফিসার হবেন। সে ভৎসনা দরজা খুলে দিল। এই ভবনে অল্প এক অংশে এই সময় পুলিশ ট্রেনিং কলেজ ছিল। প্রবোধবাবুর পরনে ছিল খুঁটি সাট। প্রহরী তাকে হস্তে Watcher guard মনে করে থাকবে। তাই দরজা খোলার আদেশ

পেয়ে সে ভাড়াভাড়ি সেলাম দিয়ে বাইরে যাবার দরজা খুলে দিল, এবং নলিনীবাবু ও প্রবোধবাবু বিলম্ব না করে সরাসরি বাহিরে চলে এলেন।

১৯১৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর নলিনীবাবু এবং প্রবোধবাবু দালাল্যা থেকে পলায়ন করেন, নলিনী-কলকাতার এক আত্মীয়ের গৃহে গিয়ে প্যাণ্ট বদল করে ধুতি পরে নেন। এবং এর পরে নৌকা করে ঠাকিন্দাড়া থেকে চন্দনগর চলে যান। ১৯১২ সাল থেকেই চন্দনগর সংগঠন অংশীদারদের সঙ্গে এক সংগঠন রূপে চলছিল। রাসবিহারী বসু ছিলেন উত্তর সংগঠনের নেতা। কয়েকদিন চন্দনগরে থেকে নলিনী বাবু গোঁহাটি বণ্ডনা হয়ে যান। সঙ্গে যান প্রবোধ বিদ্যাস, জীতেশ লাহিড়ী এবং প্রভাস লাহিড়ী। বিপ্লবীদের সাবধানতা অবলম্বন করে মোকামাঘাট এবং কাটিহার হয়ে গোঁহাটি যান। কেরার বিপ্লবীদের আশ্রয় কেন্দ্র সমূহ গোঁহাটিতে সরানোর ব্যবস্থা এই সময়ে চলছিল, বিপ্লবীরা চন্দনগর যেতে মানকুছু ঠেশনে এসে ট্রেন ধরেন। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও এক গোয়েন্দা পুঙ্খ বিপ্লবীদের পিছু নেয়। আসামের আমি নগাঁও ঠেশনে এই গোয়েন্দা বিপ্লবীদের কামরাঙ্ক খুঁঠ। কিন্তু নলিনী বাবুর প্রত্যাগমন মতিষের জন্ত বিপ্লবীরা সন্দেহ এড়াতে সক্ষম হন। এবং গোয়েন্দা

অফিসার তাদের অগ্রগমন ত্যাগ করে। গোয়েন্দা অফিসার ট্রেনে ইন্টার ক্লাসে উঠেই বিপ্লবীদের সাথে জিজ্ঞাস করেন, তারা কি করেন এবং কোথায় যাচ্ছেন। নলিনী বাবু নেহাত গোবেচারা হয়ে উত্তর দিলেন— “আমি খান চালের ব্যবসা করি এবং এরা দুজন আমার ছোট ভাই”। গোয়েন্দা অফিসার সঙ্কটঃ পরীক্ষা করে দেখবার জন্য খান চালের দর নিরে নানারূপ আলাপ আলোচনা আরম্ভ করলেন। নলিনী বাবু যথার্থ প্রদত্ত উত্তর দিয়ে পরীক্ষা সংকট উত্তীর্ণ হলেন, গোয়েন্দা বিপ্লবীদের গৈরো লোক মনে করেই পরের ঠেশনে ট্রেন ত্যাগ করলেন। প্রভাস বাবু তখন নলিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে ঠিক ঠিক দর বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল। তিনি বলেন আমি প্রতিদিন খবরের কাগজের বাজার দর দেখি এ জন্যই আমাকে কেবু বনতে হয়নি। আমরা সংসারী না হলেও বিপ্লবীদের পক্ষে সব রকম জ্ঞান থাকা দরকার। শুধু নলিনী বাবুই নয়, সে যুগের বিপ্লবী নেতারা এইভাবে সব কিছুর জন্যই নিজেদের প্রস্তুত করে রাখতেন। সব রকম জ্ঞানই তাঁদের প্রয়োজন মনে করতেন, কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রকৃত পক্ষে বিপ্লবীরা ছিলেন সংসারানভিন্ন আত্মতালো।

(চলবে)

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

৩

সত্যাত্মক প্ৰধান—

অসম্মাপিকা উপসংহার

॥ ঐক্যের চক্রে বার ॥

সতে সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভাণ্ডায়েষী ইংরাজ বণিক ধল ভারতবর্ষ আসিয়া সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিল। ঘটনাচক্রে সে সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে হইয়াছিল বিশালকার্য্য বৃষ্টি সাম্রাজ্য। ইতিহাসে ইহা এক অভিনব সাম্রাজ্য।

ভারতবর্ষে শুধু সামন্ত প্রথা প্রবল। আদিম সামন্ত প্রথা নানা ঘটনার মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইয়াছিল। পাঠান মুঘল লাসকরণও ইহার রূপান্তর ঘটাইয়াছিলেন, কিন্তু গুপগত কোন পরিবর্তন আনেন নাই।

পরাকৃত ভূমিজাগণ বনে আগ্রহ লইয়াছিল; বনে আগ্রহ লইয়াও তাহারা মহাজন, শ্রেষ্ঠী ও রাজ আক্রমণ ও অভ্যাসের হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই, যেমন রেহাই পার নাই হলধর সাম্রাজ্য।

ইংরাজ শোবনে সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল শাসন, শোষিত শোষণ ও শাসনে ভারতবর্ষীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সর্বাংশ দাখল হইয়াছিল, আভাবিক পাশে তাহার অর্থনৈতিক বিকাশ রুদ্ধ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইলেও অসন্তোষের বহিঃ বিদ্রোহের আকারে অনিয়া উঠিতে ছিল।

ইংরাজের বেডনবুর্ক ভারতীয় সিপাহীগণের মধ্যেও অসন্তোষের এ আগুণ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষের সামন্ত প্রথার নারকশয় এই

বর্ষ হইতে ইংরাজ কোম্পানীর কড়কের বিলোপসাধন করিয়া আপনাদের প্রকৃত পুনঃ স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইংরাজ বিরোধী অস্ত্রাশ্রয় শক্তিরও তাহারা এতদূরদেস্তে সহায়তা লাভের চেষ্টা হইতে বিরত হন নাই।

আকশান, তুর্কী, পাঠান ও মুঘল আক্রমণকারীরা হইয়া হইয়া বাহির হইতে আসিয়াছিল এবং কালক্রমে তাহারা হিন্দুস্তানেরই অধিবাসী হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের পূর্ব হইতে এদেশে যাহারা বাস করিতেছিল তাহাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে আগত ইহাদের ধর্ম লইয়া, জীবন যাত্রা প্রণালী লইয়া বিরোধ হইয়াছিল, মারামারি হানাহানিও হইয়াছিল, কিন্তু মানুষ বলিয়া, এক দেশবাসী বলিয়া পারস্পরিক বন্ধ মিলন ক্ষেত্রেরও সম্ভাবনা পাওয়া গিয়াছিল। বিরাট ভারতবর্ষের অন্ততম ধর্মও সংস্কৃতিরূপে ইসলাম আপন স্থান করিয়া লইতে ছিল।

ভারতবর্ষের বহন আসল প্রকৃত ইংরাজ কোম্পানী মুঘল তখন দিল্লীতে নামে মাত্র বাদশহ।

হিন্দু সামন্ত নারকশয় দিল্লীর নামে যাত্র সম্বন্ধে কে ভারত সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলে, হিন্দু ও মুসলমান সামন্ত নারক ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ কোম্পানীকে উৎখাতের নির্ধম সংগ্রামে প্ররম্ব হইলেন। তাহারা বার্থ হইলেন।

(চলবে)

বিশ্ববী পস্তকমালা

13 NOV 1979

অন্তর্জালন সমিতির বিম্ব প্রকাশ-ব্রহ্মপুত্র বার্ষিক-০'০০

বিশ্ববী মহামারক রাসবিহারী-স্বপ্নে মহুবাধের-০'০০

কীর্ত্তন কুমার দত্তের

- ১। বাংলায় অস্ত্র-১'৫০
- ২। দ্বিতীয়তে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা-১'০০
- ৩। অস্ত্রজালন সমিতির পি. মি.সি.সি.-২'০০
- ৪। দৌলতী সংগ্রাম কাহিনী-১'০০
- ৫। কাকোয়ী পুষ্কর-১'২৫
- ৬। কলতা বাহার সংগ্রাম কাহিনী-১'৪০
- ৭। রাসবিহারী ও অস্ত্রজালন সমিতি-১'০০
- ৮। স্বাধীনতার পথের মা ও মেয়ে-১'৪০
- ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ-১'৫০
- ১০। বিশ্ববী বিবেকানন্দ-১'৫০
- ১১। মহাশক্তি ও হত্যাবৃত্ত-১'৪০
- ১২। ভারতের নবজাগরণ ও তপিনী নিবেদিতা-১'৫০
- ১৩। দেশ বাসের ভোগেনি (১)-১'০০
- ১৪। দেশ বাসের ভোগেনি (২)-২'০০
- ১৫। পথের প্রবেশের আকাশ-১'৫০
- ১৬। ১০ই এপ্রিল আত্মীয় পথের বিবল-১'০০
- ১৭। হাতিজা হত্যা প্রচেষ্টা-১'৫০
- ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অস্ত্রজালন সমিতি-১'০০
- ১৯। ভারতের আত্মীয় পথের ইতিহাস-১'৫০
- ২০। লাল হত্যা প্রচেষ্টা-১'৫০

প্রাপ্তিস্থান :- ১৫০ বঙ্গবাস ট্রাষ্ট কলিকাতা-৭০০০০১

সেলসক্রী-১/১/১/A বহিঃ চ্যাটার্জী ট্রাষ্ট কলিকাতা

— সম্পাদক মহোদয় —

শ্রীমদীন চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীমদীন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক-শ্রীমতি শরণ রায়চৌধুরী

বিশ্ববী বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-শ্রীমদীন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও প্রবন্ধ :- শ্রীমদীন চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববী বাংলা কার্যালয় :- ১৫০ বঙ্গবাস ট্রাষ্ট, কলিকাতা-৭০০০০১

বঙ্গবাস :- শ্রীমদীন চট্টোপাধ্যায়, ১৫০ বঙ্গবাস ট্রাষ্ট, কলিকাতা-৭০০০০১



বিশ্বী বাংলা

শিল্পী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিশ্বী বাংলা' নবকালেবার—১৯৭৪

নবম বর্ষ

শনিবার ৩০শে কান্তিক, ১৩৮৬

১৭ই নভেম্বর, ১৯৭২

৮ সংখ্যা

এই সংখ্যায়



ঐচরণ সিং-এর দস্তোক্তি

। সম্পাদকীয় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মিলি বোমর লালগুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। কিরোম দত্ত ।।

ভোটার তালিকার কারচুপি বিপদ হেনেছে

। ঈশ্বরীন্দ্র লক্ষ্যোপাধ্যায় ।।

একটি বিশ্বৃত স্মৃতি চারণ

। ঈশ্বরীন্দ্র লক্ষ্যোপাধ্যায় ।।

অসমাপিকা উপসংহার

। কবিরাজ দাস ।।

নির্বাচন সমীক্ষা

। কালীন্দ্র লালগুপ্ত ।।

শির, মসজিদ ও গীর্জা
- ভগবানের এই তিন
চক্রে আমি পৃথক ভাবে
ধিনি ।

—মহাত্মা গান্ধী

শ্রীচরণ সিং-এর দস্তোক্তি

যখন প্রকাশ জাহেজ রাষ্ট্রপতির অধীনে বড় তলাকী দরবারের প্রবাসস্থী শ্রীচরণ সিং গত ১৫ ফেব্রুয়ারি আহমেদ নগরে এক সাংবাদিক সন্মেলনে উক্তি করেছেন যে তিনি অবস্থার সময় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে সব অজ্ঞার কাজ করেছেন তার জন্য ইংরেজ অফিসের জেলে পাঠান উচিত। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত একটা উক্তিও করা হয়ে পড়ল। সেটা হল, যার একটি কান কাটা থাকে, সে লজ্জার জনশব্দের বাইরের পথে যায়, আর দুটি কান কাটা থাকে যার সে প্রেমের কথা শিরে বাঁধাঘাত করতে কোন লজ্জা অনুভব করে না। শ্রীচরণ সিং যখন জনতা দরবার থেকে প্রথম বিসর্জিত হন, তখন প্রকাশ তখন একটি নীরবতার তান করেছিলেন। কিন্তু যখন ফলফোলস প্রেরণ করে নিজের সুখান্ধী হবার আশার উজ্জ্বলতার চরিত্রার্থ করেছিলেন এক প্রেমাত্মীর আসন লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তখন তার সব লজ্জা সরন বিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনি ভয়ভাঙ্গা লজ্জা জাহেজ কতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁর বহুবান্ধী শ্রীমতীজাহেজকে সাহায্যে। এর ফলে কোন আত্মনিষ্ঠা, নীতি ও দেশপ্রেমের নামসম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু এমনই তাঁর বোধাত্মা, যে কয়েক সাতুরের অবস্থায় সব ছিল তার 'বল তেল'। তাঁর কথটার সত্যমতের বাস্তবতা ভেঙে পড়ল। তিনি সোভিয়েতের আত্মত্যাগে প্রেমের সঙ্গীত হতে না গেলে পৃষ্ঠপোষক করলেন কলকাতা দাবা কোয়ার্টার। তাঁর ভাষা ছিল যে পক্ষের দাবা দিয়ে তিনি কলকাতার দাবা কোয়ার্টার। সেই পক্ষেরদাবার পক্ষে তিনি এখন কিছু লক্ষীর সোভিয়েতের সমালোচনা করছেন। তাঁর এমন লক্ষ্য হলেন শ্রীমতী গান্ধী। বহুশ্রীমতী বাক্যকালীন তিনি অগ্রসরজাহেজ বিকল্প করেই শ্রীমতী গান্ধীকে জেলে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তার দৃষ্টিগোচরে সে আইনের দিকে তার পথও জনতা দরবার ও অনেকগুলি দাবা দাবার করেছেন শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে। বর্তমান আইন অবলম্বকে করা দেখিব। তবু শ্রীমতী গান্ধীর জাহেজের জন্য ছিলেন অবশেষে বঠন করে নিজেকে ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সব দাবার বাক্য প্রকাশ করতঃ কিং করেন নি। দেশের আইন অবলম্বনে উপর প্রত্যেক কোন কলকাতা করা হয়েছে কিনা সে কথা দেশের আইনজীবীরা করে পড়েন। কলকাতা জাহেজ পথে বহুশ্রীমতী পক্ষপ্রতিভা নিজে নিজে দাবা ও বড় পোষক করেন। আশাবী নির্ভর্যের ফলস্বরূপে জন প্রকাশ কিংহু।

কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই লোকের মনে জাগবে ঐচরণ সিং-এর সাম্প্রতিক উক্তি থেকে। যখন কয়েকটি আদালতে উদ্ভিদাঙ্গীর বিরুদ্ধে মামলার শুনানী চলছে, বিভিন্ন আদালতে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনছেন এবং তারপর সন্তু কিছু খুঁটিয়ে দেখে তাদের রায় প্রদান করবেন, তখন দেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাকে জেল দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করাটা কি আইন বিরুদ্ধ ও অশাসনীয় নয়? এর দ্বারা আদালতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা এবং আদালতকে অবমাননা করা হয়েছে বলে যদি কেউ মনে করেন, তবে কি খুব ভুল হবে?

ঐচরণ সিং-এর এই ধারণার অল্প বিধে প্রণোদিত উক্তি, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর উচ্চাসনের অমর্যাদা ঘটিয়েছে। আমরা তার বিশেষত্ব হয়ে যত্না উক্তি করার কারণটা সহজেই অনুমান করতে পারি। নির্বাচনের দিন হতই এগিয়ে আসছে, তার পারের তলের মাটি ততই সরে যাচ্ছে। এটা অনুমান করেই কি তিনি ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছেন?

প্রসঙ্গত, চরণ সিংজীর অস্বাভাবিক কয়েকটি উক্তিও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তার দ্বন্দ্ব আয়োজিত সভা থেকে লোক বিরক্ত হয়ে চলে যেতে থাকলে। তিনি বললেন যে তার সভায় কোন গণগোল করলে, কোন পক্ষকে তিনি সভা করতে দেবেন না। গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ সভায় অল্প বিস্তার গোলামাল হয়। তার দ্বন্দ্ব কাউকে কোন সভা করতে দেবেন না বলে হুমকি দেওয়ার সমর্থন আছে তত্ত্ব সমাজে? আর যে লোক অপ্রত্যাশিত দৌত্যগাম্যতা করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। যার পিছনে জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশের কোন সমর্থন নেই। তার পক্ষে এমন অস্বাভাবিক হুমকিকে যদি কেউ পাগলের প্রলাপ বলে মনে করে তবে তার সিদ্ধান্তকে কি অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়? দ্বিতীয় আক্রমণ হচ্ছে ববরের কাগজের উপর। তারা নাকি ইমতী গান্ধীর পক্ষে মারাত্মক ভাবে প্রচার চালাচ্ছেন। অবশ্য এ কথা অর্থ যদি হয় যে ববরের কাগজ তার সমর্থনে কিছু বলাছেন বা তার প্রশাসনের দোষত্রুটি দেখিয়ে দিচ্ছে, তবে সে কথা বোকা সহজ। এক নায়কত্বের প্রবানের মত সবাইকে হুমকি দিতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ঐচরণ সিং-এর চরণই ভেঙ্গে পড়বে। আমরা তার হতাশা ও মনোবেদনার দ্বন্দ্ব সহানুভূতি জানাতে পারি, কিন্তু সমর্থন করার কোন যুক্তি খুঁজে পাইনা। তবে একটা কথা তাকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে দেশের কলুষিত আবহাওয়ায় তিনি যেন তার কথা ও কাজের দ্বারা আরো কলুষিত না করে তোলেন। নির্বাচনের ফলাফলের দ্বন্দ্ব তার অপেক্ষা করাই কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। তিনি যদি মনে করে থাকেন যে ক্ষমতার জোরে এবং এলোমেলো কথাবার্তা বলে, তার বিরুদ্ধবাদী সব দলকেই হারিয়ে দিয়ে নিজের দ্বন্দ্ব প্রধানমন্ত্রীর আসনটাকে শূন্য করতে পারবেন, তবে সেটা মূর্খের স্বর্গে বাস করার সামিলই হবে। দেশবাসীর লিখন পড়তে চেষ্টা করুন। মানসিক স্বৈর্য হারিয়ে ফেললে বিশেষে হানে পাঠাবার যদি দাবী ওঠে, তবে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, সেটাও ভেবে দেখা উচিত।

একটি বিস্মৃত স্মৃতি চারণ

ঐতিহাসিক স্মরণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই অধিবেশন সাক্ষ্য দ্বিতীয় কথার তার সত্যতা
নাথ হায়-এর নেতৃত্বে বানৌর স্থানেকা গোপাল গুপ্ত,
বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র নাথ হায় ও কবিরাজ
হায় চক্রবর্তীর উপর দাপ্তর হয়। উপাঃ উপাঃ
সকল পাণ্ডুলী, বহি মৌলিক, স্মরণ স্মরণ বার,
সত্যি বার স্মরণ চুক্তি ও উল্লেখ।

১৯৩০ সালের ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে বঙ্গোপসাগর
বন্দী হইতে চট্টগ্রাম দিগে আসেন। এই সময়ে
অবস্থান কালীন অষ্টাঙ্গীয়া গোপালগোপাল জন্ম স্থান,
স্মরণ যোগ প্রবৃত্তির সন্ধিত দেখা হয়। কথ্য প্রসঙ্গে
তিনি ভাষ্যের ভবিষ্যৎ কল্পনার আভাস পান। সে
যাত্রা হইতে পূর্ব ব্যবস্থাসমূহে বহুদূর ১লা এপ্রিল
চট্টগ্রাম হইতে বঙ্গোপসাগর জাহাজে আসেন। এই
সময়কালে বঙ্গোপসাগর সন্ধিত উপস্থিত স্থানেকা সন্ধিত
এক একান্ত বৈঠকে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা
হয়। এই সময় তিনি নানা কথার পর উল্লেখের ১৯ই
এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে করেন। কেননা ঐ
সময় তিনি রাজসাহী জাহাজের কংগ্রেসের সভাপতি
আজ্ঞাধিক প্রভৃতি করণে ব্যত থাকেন।

এই অধিবেশন ব্রাহ্মণিক তাঃ কীন্তে বার
মৌলিকের প্রথম প্রাথমিক অধিবেশন হয়। বিখ্যাত
কংগ্রেস নেতা ব্যক্তিগণ কে, সি, স্মরণ ও তাঃ বারজন
চক্রবর্তী গুপ্ত গোপালগোপাল ইত্যাদি স্মরণ ও
স্মরণগণে স্মরণনা স্মরণ হইল।

এই স্থান স্মরণকালে বাক্য আসার পথে বিভিন্ন
অংশের বৃদ্ধি নেতারা ব্রাহ্মণ বাবু ডাক্তার হন
অন্য-বি টেন অং এলেক্সেন-ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞানগণকে।

সেই সময় বঙ্গোপসাগর স্মরণের উক্ত কবিরাজ বাক্য
স্মরণ ঐ স্মরণ কর্মী ও ব্রাহ্মণের কবিরাজের ব্রাহ্মণিক
হটে। উক্তকালে ব্রাহ্মণ বাবু প্রোগ্রামের পর এই
'ব্রাহ্মণ' উল্লেখের প্রবৃত্তি স্মরণ হয়।

ইং ১৯৩০ সালের দ্বিতীয় সপ্তাহে চট্টগ্রাম হইতে
স্মরণ যোগ ও অষ্টাঙ্গীয়া কবিরাজগণের প্রবৃত্তি
চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণ বাক্যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি
সম্পূর্ণ। স্মরণ বাবু হইতে চট্টগ্রাম আসেন। স্মরণ
স্মরণ যোগ ও অষ্টাঙ্গীয়া-এর উপস্থিত ব্রাহ্মণ বাবু
এর সন্ধিত আসেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ
ও প্রবৃত্তি চট্টগ্রাম ১ সপ্তাহ অপেক্ষা করণ অষ্টাঙ্গীয়া
আসেন। তাহার উক্তে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ প্রকাশ করেন যে
এককভাবে ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ নামান্তর একটি স্মরণে এলি
নিয়ে ব্রাহ্মণ টিক হয় নাই। একই সময়ে বিভিন্ন প্রভৃতি
সময়ে একই ভাবে আশ্রিত হান স্মরণের হইলে সেই
ভাবেই আশ্রিত করা উচিত ছিল।

চট্টগ্রামে ব্রাহ্মণ বাবু হইতে অষ্টাঙ্গীয়া, স্মরণ যোগ,
অষ্টাঙ্গীয়া চক্রবর্তী প্রবৃত্তি অষ্টাঙ্গীয়া অষ্টাঙ্গীয়া
হল থেকে অষ্টাঙ্গীয়া বাবু ব্যবস্থার কবিরাজ।
উল্লেখের ভা ছিল যে ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ
সময়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণের মধ্যে যে উল্লেখীয় ব্রাহ্মণ
তাহা উপস্থিত ব্রাহ্মণে পাবে। তাহা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ও প্রবৃত্তি চট্টগ্রামকে আশ্রিত ব্রাহ্মণ
যে 'সময় হইলে কিছুদিন অপেক্ষা করা হইবে।'
অষ্টাঙ্গীয়া অষ্টাঙ্গীয়া ব্রাহ্মণের প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ
নাই—তাই ঐ উক্ত।

আলোচনাতে উল্লেখ ১৯৩০-৩১-৩২ এপ্রিল
চট্টগ্রাম আসেন। প্রবৃত্তি বাবু ব্রাহ্মণ কবিরাজ

দিয়ে প্রভুত্ব করতেন। বীরেশবারু মহম্মদশাহ্ সবে সৌরভ ঘোষ ও হুগো চারকে চট্টগ্রামের বন্দ বীরে ১৮ই এপ্রিল ঢাকা হল-এ ব্রজেন দাসের ঘরে উঠেন।

কথা ছিল বীরেশবারু ঢাকা কদীবেশ গঙ্গের কথা বলে নিকোবের কর্ণার কর্ণগয়া অর্থাৎ সন্তাধ্য অস্ত্রাধানের কথা বলে—করিমপুরের বিঘর ঘানানী ও নতীয় কর পালের ও বরিশালের বনোজ চক্রবর্তী ও শৈলেন চক্রবর্তীকে আলোচনার বিঘর জানিয়ে ও কর্ণগয়া বিঘে কলিকাতার মূল দলের সহিত মিলিত হবেন।

ঐ ১৮ই এপ্রিল রাত প্রায় সাড়ে দশটার ব্রজেনবারু ও বীরেশবারু বন ঢাকা হল-এর মাঠে বন নিকোবের কর্ণগয়া ব্রজেন আলোচনার রত ভ্রমেন, তখন তাঁরা এক গম্বুজ তখন যে চট্টগ্রামে বাংলা আনতে হয়ে সেতে। কিছু ঐ শেখ রাতে অর্থাৎ ১৯ এপ্রিল ভোর রাতে পুলিশ বন ঢাকা হল খোঁজ করল তখন বীরেশবারু ঝাঁচ করতে পারলেন যে চট্টগ্রামে একটা কিছু হয়েছে অর্থাৎ ঘটাবল্য তাগের পরিকল্পনামুখ্যতা ইতোবেই আঘাত হেনেছে। ব্রজেনবারুকে কিছু কথা বলে বীরেশবারু গা ঢাকা বেন ও বাকী রাতটুকু কাটানোর ক্ষুদ্র ঐ হল-এর নর্থ ব্যাংকের ৩০২২ কামরায় ভূতরূপ বহু কক্ষে ঢল আসেন। বরাট এক ছাত্র ভিত্তিক ছিল। ভূতরূপ তখন এম, এ স্তানের ছাত্র।

ঐ প্রভাতেই যোকা গেল সন্তাধ্য অস্ত্রাধানী হল-এর মূখ-মুখ্য অর্থাৎ নীতিতে এতপাশে গ্রেপে বায় বায় তার তার হীতি অস্ত্রবল করে ১৯ই এপ্রিল ১৯৩০-নের প্রথম রাতে চট্টগ্রাম সহরে পূর্বদেন-এর নল মুরোশিয়ান লাব আক্রমণ। অস্ত্রাধানী পল ও প্রচুর অস্ত্র পর সংগ্রহিত করে ঐ কাদীনতা কোলা করে আতীর পতাকা তুমেতে ও আতো সন্তাধ্য চালাচ্ছে। পরে জানা গিয়েছে তাবের নাকি উচ্চির্মক ঐ তাবে আঘাত না হানিলে পোশন বহর যে পুলিশ ঝাঁচ করতে পেরেছিল যে ‘পাণ্ডিতিক’ কিছু একটা হতে পারে বিঘর সবাইকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা রেখেছিল ও কর্ণগয়াটি ঘাঁড় হয়ে সেতো।

প্রথম বহুরা লখায়। তার চারখান পর চট্টগ্রাম।

বাস। আর বায় খোঁখায়। বাংলার গোবন্দা বিভাগ তো প্রথম ঘটনার পর হইতেই সজাগ ছিল।

অমনি ১৯শে এপ্রিল-এর প্রভাত হইতে না হইতেই ভরা বাংলার বিপ্লবী মলভলোকে তেবে বিঘর ক্ষুদ্র উঠে পড়ে লাগল। বিপ্লবব্যাপ্তিকাকার—তার চট্টগ্রাম অস্ত্রাধানী বহরের সন্তাধ্য বারের সম্পর্ক ছিল না সরকার তাবেরক হেইই বেরনি। কনকারণে, যেসে, ও বাতীতে হানা দিয়ে সন্তাধ্য বিপ্লবীঘের গ্রেপ্তার হুক করল।

রাজসাহীতে ঐ দিন মহারাজ বৈরলোক চক্রবর্তী নেক্ষেবে এক কনকরেন্দ্র হওয়ার কথা ছিল। তাঁহাকে প্রভুতন্ত্র পাংকলি, বিশিনতন্ত্র পাংকলি, বংকিম মুখাশি লহর রাজসাহীতে এসেছিল তাঁবের সবাইকে ঐ প্রভাতে ছেলে পুরলো। অর্থাৎ চট্টগ্রাম ঘটনার সহিত বাবের সম্পর্ক ছিল না—তাঁরাও রেহাই গারনি।

সন্তাধ্যনাথ রায়, প্রভাতকুমার চক্রবর্তী, গোপাল গুপ্ত প্রমুখ ঐ লহর রাজসাহী অস্ত্রবননে প্রতিমিহি হয়ে গিরেভুগেন। গ্রেপ্তারের কারণ তাঁহারা কলিকাতা হইতে লহর আসত এ, বি, এস-এর সাধায্য সম্পাদক বীরেননাথ বাণগুপ্তের কাছ থেকে জানিতে পারেন যে চট্টগ্রাম ঘটনার ক্ষুদ্র এই সকল ধর পাকড়াপি। পুলিশী বৃষ্টি প্রভাতে রাজসাহী সহরে আত্মগোপনে থাকে। নিকোবের মধ্যে পরামর্শাদি করে সন্তাধ্য রায় ঢাকা আর প্রভাতবারু কলিকাতা হওনা হন। হর্তাগা যে সন্তাধ্য রায় সিংকপি (জামালপুর—মহম্মদশাহ্) বেল টেকেন বরা পড়েন। প্রভাতবারু কলিকাতার ফিরে যেদিন আসেন সেই সন্তাধ্য প্রভাতনাথ পার্ক-এর নিকট খুত হয়ে প্রেসিডেন্সী গেসে নীত হন। গোপালবারু মহাসিঙা ফিরে যান।

সেই দিনের গ্রেপ্তারের উত্তাপ ঢাকা হল-এও প্রলে পৌছে। প্রভেগুপ্তের বাসই প্রথম যিনি ঐদিন হল হতে প্রভাতে খুত হন। অস্ত্রাধ্য বাগা গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা ছেলে ঐদিন নীত হন—স্বশীল সরকার, (পুণ্য), নরেন্দ্রের ভর, মূলু বহুদার, পায়লচন্দ্র চট্টাচার্য।

এর কিছুদিন পর ঢাকা-বদল সববোদী (attached)

হাজি সফাযুদ্দার গাংগুলি (লেখকের নতীর্থ) দ্রুত হন তাঁর গোত্রিয়া বাড়ী হতে। ইনি পরে দেউলী মেলে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাব্যবহারে আত্মত্যাগ করেন। তার সুদৃষ্টিতে জাই পুলিশ গাংগুলি বন্ধ তিন দ্রুত হন—তৎকালীন পুর বন্দী নিবাসে বান।

ঢাকা হলে ওই প্রান্তে পরগণানগর্যাবী আর কাউকে না পেয়ে ব্রজেনকান্ত্রিমে পুলিশ হল চলে গেলে পর বীরেশ তার তার সোপান হন হইতে বাহির হয়ে ঢাকা নবাবগী গ্রামেই অমরেন্দ্রনাথ তার-এর বাড়ী বান। সেখান হইতে কিছুদিন পর বহিরাগল বান। অংশী শাস্ত্র হলে বহিরাগল হইতে মুদ্রাক্ষর (প্রজ্ঞানানন্দ) বিহোদী ১৮-এর মধ্যমান দানপত্রের সহিত কলিকাতা একত্রে তৎকালীন হন। দুর্ভাগ্য যে পথে দানপত্র পুলিশের হাতে পড়া পড়েন। বীরেশবাবু পুলিশী দৃষ্টি এড়াইয়া মূল্য হতে কলিকাতা আসেন ও বহুদিনান্তের সুখান্ত তার-এর সহিত মিলিত হন। ইচ্ছান্তবাবু তখন মংলদিক হতে এসে পঃ কলিকাতার অজিত বানাজীরা বাগার ছিলেন অত্র লাঞ্ছিতের জন্ত।

উল্লেখ্য পঃ কলিকাতার বিহার তার ইতিমধ্যে প্রথম জোকেই দ্রুত চলেছিলেন।

অজিতবাবুর জিহা হইতে বীরেশবাবু উত্তর কলিকাতার জীব দানপত্রের বাসার বান। তার ২/৩ দিন থেকে বিশ্ণু গোত্রের অজিত ঘোষের প্রবর্তে ওই মেলে বেশ অত্রকদিন ছিলেন। অজিত ঘোষ কলিকাতার পোর্ট কাবলদারের জোরদায়ক বি, বি, ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বি, বি, ঘোষ মধ্যপন্থে অংশীদার সন্নিহিত একজন তৎকালীন লোক ছিলেন পরে তদ্বিহা।

তখন হইতে বীরেশ তার আশ্রয় করেই ফুলের দিকক তৎকালীন মুদ্রাক্ষর বাড়ীতে বান। সেখান হইতে দিন ৫-১০ পর বলাই কাং পরিচালনা অংশীদার বিহার জোড়-সাকো মিত্রবর্তী দেউলী প্রভেদিত মিত্র এক বাগা জাড়া করেন। তার মুদ্রাক্ষর (প্রজ্ঞানানন্দ) প্রণেয় অনিল চট্টাঙ্গী তাঁর সহিত বাড়িত। [এই অনিলবাবু পরে বাগবন্দী হয়ে বেশ হতে বহু হয়ে পতিতবল সরকারের বিধান সভায় কনিষ্ঠ ছিলেন।]

এই সময় তিনি বিভিন্ন দলের সহিত বোম্বা বোম্ব করেন উল্লেখ্য মনোরঞ্জন জন্ত—মুদ্রাক্ষর আদি দলের বিশিষ্ট লোক ও প্রজ্ঞানানন্দ দলের মেতা। এই সময় তিনি বলেন যে তারার লগ্নত বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে চাহেন এবং এই কাং তারার দলের মুদ্রাক্ষরদের সাহায্য বা গেলে তিনি কাংবাহের নিয়ে অগ্রসর হইবেন। (পরবর্তী ভাগেই তাঁর ভোদারের টোপট-এর উল্লেখ ও বীরেশ মধ্যপন্থে, ওই লগ্নাক্ষর বাগার তাঁর কাং-কল্যাণের একাংশ।

মনোরঞ্জন বাবু আরও বলিয়াছিলেন বরাই বহন পতিতে হইবে তখন কিছু করা ভাল। এ নিয়ে নাকি তৎকালীন অংশীদারের বোম্বারদারতা রহিসেন-এর সহিত কথাবার্তা বলেছেন—তিনিও নাকি এই মত সোচন করেন এবং তারারা সকলে একত্র হয়ে লগ্নত বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবেন। মনোরঞ্জন বাবু এই সময় বীরেশ বাবুকে রহিসেন-এর সহিত বোম্ব করিতে বলেন। সেই অগ্রবর্তী রহিসেন-এর সহিত বোম্ব করা মিথিষ্ট তারিখও বিবেচিলেন। অনিন্দ্যবাক্যের পত্রিকার স্বত্বীন দানপত্র দায়ক এই লগ্নাক্ষর বাবু। বহু বোম্ব করা আর হয়ে উঠে নাই। লগ্নাক্ষর করিবার আগের দিন (জুলাই ১২০০) লগ্ন। অংশ ৫ টিগ্রাম বটমার চার দান পর) অজিত বানাজির সহিত কালীঘাটের এক অংশীদার লগ্নাক্ষর কয়েকটি বোম্বার খোল তৈরী করামান ও একটি বহিঃলগ্নাক্ষর বোম্বাক্ষর বাগদা করে ওলমানেতে ফিরে এসে বোম্বাইট ওয়ে লেজল হাউসের লগ্নাক্ষর সহিত অংশীদার বহু পড়ে বান। প্রথমে প্রেসিডেন্সী—পরে বঙ্গলা মেলে প্রেরিত হন।

এদিকে কলকাতা চক্রবর্তী (ঢাকা লগ্নাক্ষর তারার) ১২০০-এর হইবে ঢাকা লগ্নাক্ষর দ্রুত হন। প্রথমে ঢাকা মেলে। পরে বঙ্গলা দুর্গে প্রেরিত হন। তারার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুঃগল্ল দাখ চক্রবর্তী তখন ঢাকা লগ্নাক্ষর হল এ থেকে বিবিধভাবে অব্যবন করিতেন।

এদুদ চক্র বটমার লগ্নাক্ষর আবার ১২০০-এর আশ্রিত বান কলিকাতাতে প্রেরিত বহন করেন ও প্রেসিডেন্সী লগ্নাক্ষর আবার প্রেরিত হন।

ভারত বিশ্বব্যাখ্যাত ইতিহাস

॥ স্বীকৃত দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এইভাবে তিনজনে গোহাটি টেনে পৌঁছলেন। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? সবাই নবাবগত গোহাটিতে। পুঁথি স্থির ছিল টেনে নেয়া লম্বাটের একখানা বই হাতে যে ব্যক্তি দাড়িয়ে থাকবেন (কোন কথা না বলে তাকে অন্তরঃ কহেই বিপ্লবীরা) আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছতে পারবেন। অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্তরঃ করে তিন জনে আটগাও হাউসে গিয়ে উঠলেন। অচেনাশনের নেতারা আশ্রয়গোপন করতে পুলিশের কাছ থেকে কেবলমাত্র বাঁচবার জন্ত নয়, তাঁরা ফেরার হস্তে পুলিশকে কানি দিয়ে অধিকতর চতুরতার সঙ্গে বৈপ্লবিক কাজকর্ম করার উদ্দেশ্যে। তাই গোহাটিতে নলিনী বাবুর পরামর্শের পরেই সেখানকার কর্মচাকলা বেড়ে গেল। প্রতিদিনই আসামের বিভিন্ন স্থান থেকে বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা থেকে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু বিপ্লবী নানা পরামর্শের জন্ত গোহাটিতে আসতেন। কারণ সমিতির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই বিভিন্ন বড়বড় মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তখন কারাগারে। ফলে নলিনী বাবুই শেষ পর্যন্ত দলের সর্বোচ্চ নেতার আসন গ্রহণ করলেন। গোহাটিতে এক একদিন ফেরার বিপ্লবীর সংখ্যা বারো চোদ্দ জন হত। একমাত্র গলনেতা নলিনী বাবুই সব আশ্রয় কেন্দ্রে যাবার অধিকার ছিল। এ ছাড়া অতি কম বিপ্লবীই সব কটা বাড়ী চিনতেন। উত্তরবঙ্গে কাজ করার সময়ে নলিনী বাবুর নাম ছিল “রাজেন বাবু।” গোহাটিতে তাঁর নাম ছিল

কর্তা বা বন্ধু। এই বন্ধু নামের একটা ইতিহাস আছে। একদিন ফেরারী বাসায় বিপ্লবীরা সবাই যেতে বসেছে তাঁরা সংখ্যায় সে দিন ছিলেন ৮/৯ জন। ফেরারী বিপ্লবীদের ভাগ্যে সাধারণতঃ মাহু হুঁত না। কিন্তু সেদিন মাহু এসেছে। তাই সেদিন ভোজ। কিন্তু ভোজই হোক আর বাই হোক ফেরারী আশ্রয় কেন্দ্রে সবার এক সঙ্গে খাবার জো নাট। একজন না একজনকে পাহারা দিতে হবে অন্য নিবে স্তব্ধতা সেই একজন বামে সবাই যেতে বসেছেন আনন্দ করে। সবারই হাতের কাছে রয়েছে গুলিভরা পিস্তল। নবাবগত ফেরারী বিপ্লবী যদি বায় সম্ভবতঃ বহুদিন পরে মাহুর দাদ পেয়ে এদিক ও দিক না চেয়ে একখানির পর একখানি মাহু খেতে চলেছেন। এমন সময় নলিনী বাবু হঠাৎ তাঁর হাত চেপে ধরলেন। একটু উঠেবসে বললেন, “বন্ধু, খামো এবারে, আর ফেরামতি দেখাতে হবে না, আমরাও একটু মাহু খেতে চাই।” নলিনী বাবুর কথা বলার চম্ ও হাসি দেখে সবাই হেসে উঠলেন। সেদিন থেকে নলিনী বাবু এবং মণি বাবু পরস্পরকে বন্ধু বলে ডাকতে লাগলেন। ক্রমে সবার কাছে নলিনী বাবুর নাম হল ‘বন্ধু’।

এই সময়ে গোহাটিতে বিপ্লবীদের জীবন সম্পর্কে প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী লিখেছেন, “বিপ্লবী হলেও আমরা মানুষ,” সংসার ত্যাগী রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হলেও আমরা দলের নৃতন করে একটি সংসার পেতে

নিয়ন্ত্রিত। সেই সমসার মধ্যেই আমাদের জীবনের হাসি কান্না জড়িয়ে পড়েছিল। বাপ, মা, ভাই, বোন থেকে দূরে দূরে গিয়েও বাপ, মা, ভাই বানের সেই ভাগবাসা দলের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম বহন কাটতে গিয়ে নতুন একটা বহন গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু দেশের বার্থে প্রয়োজন হলে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও গুলি করতে পারতাম।"

এই ফেরারী জীবনে বিপ্লবীরা ছিলেন অন্ধকারের জীব। নিত্যন্ত প্রয়োজন না হলে তারা আলোতে যাব হতেন না। গোহাটিতে চারটি ফেরারী আশ্রয় কেন্দ্রে কোনটিতেই ওলেন। ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। এখান রাতিশেষে একজন করে গিয়ে ত্রুপপত্র নদীতে স্নান করে আসতেন। নয় তো স্নানের জন্য রাস্তার কল থেকে নিজেদেরই বয়ে এনে বাড়ীতে স্নান করতে হত। কিন্তু ফেরার বিপ্লবীর পক্ষে তাও সহজ ছিল না। তা ছাড়া রাস্তার কলে ভীড় এত বেশী হত যে প্রায়ই সেখানে মারামারি হত। একদিন কল আনতে গিয়ে নলিনী বাবু কলমী আগে ধরেছেন কলে অপর এক জলাধী বাঁশ দিয়ে তাঁকে প্রচণ্ড এক আঘাত করে বসল। নলিনী বাবু তখন সমস্তই ছিলেন। তবুও অবস্থা গতিক মার ঘেঁষে মার হুমকি করে ফিরে আসতে হলো। কলের অশুবিধার জন্য প্রতিদিন সকলের স্নান হোত না। বিপ্লবীরা লটারী করে একজনের পর একজন স্নান সেরে নিতেন। আজ যিনি স্নান করেছেন কাল তাঁর স্নান নির্বিঘ্ন—এই ছিল নিয়ম। তবুও বিপ্লবী বহুটা খুব মানস উপভোগ করেই গোহাটিতে ছিলেন।

গোহাটিতে বিপ্লবীরা ছিলেন শহরের এক প্রান্তে। তারপরেই জঙ্গলকাণ্ড জনমানবহীন পাহাড়। বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে সেই জঙ্গলে টারগেট প্রাক্টিস করতে যেতেন। একদিন দেখা গেল কাভুজের কাশ বিভাগবাদের চাকরির আদায়ের জন্য ট্রেনে।

বিপ্লবীরা প্রমাদ পালেন। এ অস্ত্র দিয়ে তো আশ বক্ষ করা চলেবে না। বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে আসামের মধ্যে নতুন কাভুজ সাগ্রে করাও উপায় নেই। বৃষ্টি সেল ডাম্প সেগে কাভুজগুলি ভিজে গেছে। তাই উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডে গুলিকে একটু থেকে নেবার ব্যবস্থা হল। একদিন এইভাবে বহন কাভুজ ভাঙা হচ্ছিল তখন আশ্রনের তেজে একটা কাভুজ হঠাৎ কেটে গেল। ফাটা কাভুজ এসে নলিনী বাবুর পায়ে বিদ্ধ হল। কাভুজ ভাঙাছিলে প্রবোধ দামপুত্র। নলিনী বাবু মিউফোর্ড মেডিকেল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। নিজেই অপারেশন করে গুলি বার করে ফেললেন। বাজার থেকে ওষুধ এনে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

বিপ্লবী আশ্রয় কেন্দ্রে ফেরার বিপ্লবীদের আসা যাওয়া চলছে। তাদের অসুস্থর করে গোয়েন্দাদের আনাগোনাও বাড়ছে। বিপ্লবীদের এ বৃত্তে অস্থিবিধা হল না, তাই তারা স্থির করলেন এবারে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। এক বাসার অনেক দিন থাকার কলে পুলিশ নিশ্চয়ই এ বাড়িগুলি চিনে গেছে। সুতরাং বাড়ী পরিবর্তন করে নতুন আশ্রয় কেন্দ্রে গড়ে তুলতে হবে। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে জিভেল লাহিড়ী এক প্রবোধ বিধামকে নাহারকাটিয়া রেল ষ্টেশনের ষ্টেশন মাস্টার বামিনী দত্তের বাসায় রাখা হল। স্থির হল ত্রুপ আর সবার জন্য নৌকা এনে মোটর ইঞ্জিন লাগিয়ে ত্রুপপত্র নদীতে রাখা হবে। ক্যান্সি বাজার বাসার সতীশ পাকড়াশীকে এক নিষ্ঠুর পালকে নৌকা কিনবার জন্য ধুড়ীতে পাঠানো হল। কিন্তু কোন সাবধানতাই কোন ফল হল না। কলকাতায় কল সাহায্য প্রেরণের সব জলট পালট হয়ে গেল। বহু ডাকতি ও বহু হত্যাকাণ্ডের নায়ক কল সাহা প্রেরণের পরে নির্ধাতিয়া সহ্য করতে না পেরে খীকারোক্তি করে বসল।

অসমাপিকা উপসংহার

॥ শ্রীক্ষিপ্ত চন্দ্র বার ॥

(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতবর্ষ গোলামুজি ইংরাজ রাজ্যের শাসনে আসিয়া পেল। মহারানী ভিক্টোরিয়া হইলেন ভারতবর্ষী সাম্রাজ্ঞী।

একটা উপনিবেশে মুক্তির সম্বন্ধে এ জাতীয় বিদ্রোহ ও ইতিহাসে অভিনব ব্যাপার।

সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরাজের শাসন চলিল, শাসনের জন্ত চলিল নুতন আইন।

ইংল্যান্ডের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে এ দেশেও নুতন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল।

উদ্ভব হইল নুতন শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর। ইংরাজের আদালতে, ইংরাজ সরকারের চাকরিতে, ইংরাজ বণিকের অফিসে চাকরী লইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিকে এই শ্রেণী হইল ইংরাজ ও ইংরাজ রাজ্যের বার্তাবাহক।

ইংরাজ বণিক কালক্রমে এসেলে নুতন যুগের বণিক হইয়াও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাণিজ্যে ও উৎপাদনে অনেক নব নব বীজিত পদ্ধতির প্রবর্তন হয় ইংরাজ বণিক ও বণিকের প্রসাদে।

ইংরাজ বণিক ও বণিকের অনুকরণে দেশীয় সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদকামী ভারতীয় অর্থ ক্ষেত্রে নুতন মধ্য শ্রেণীরও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। নব্য শিক্ষিত মধ্য শ্রেণী এবং অর্থ ক্ষেত্রে ভারতীয় মধ্যশ্রেণী একই বুদ্ধিতে ছই ফল। পরম্পরের সহযোগী, পরিস্পৃহক।

নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ ইংরাজী সাহিত্য, ইংল্যান্ডে ও ইউরোপের ইতিহাস পড়িয়া

জাতীয়তার সম্বন্ধে পাইয়াছিল। ইংরাজের ভারতবর্ষ ছিল তাহাদের স্বদেশ। এই স্বদেশের জন্য তাহাদের মনে জাগিয়াছিল জাতীয়তার স্বপ্ন।

পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে আফগান মীমান্দ, উত্তরে হিমালয় ও চীন মীমান্দ, দক্ষিণে সিংহল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে এডেন বন্দরও ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভারতবর্ষ। বৃটিশের সময় ভারতবর্ষের নেপাল, ভূটান ও সিকিমের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, দুর্বল চীন রাষ্ট্রকে মধ্যবর্তী রাষ্ট্র ভিক্টোরিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হইয়াছিল। জারের রুশ মধ্য এশিয়া পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ভারতবর্ষের দিকে জারের লোলুপ দৃষ্টি ছিল, ফলে আফগানিস্তানকেও কার্যতঃ মধ্যবর্তী রাষ্ট্রের পরিণত করা হইয়াছিল, এক রুশ ভল্লক ও অল্প দিকে বৃটিশ সিংহের আশংকার পারস্পরের সাহেবও নিতীক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না।

এই ভারতবর্ষে জাতীয়তার স্বপ্ন দেখিয়াছিল নব্য শিক্ষিত ভারতীয় শ্রেণী।

মুঘল সম্রাটকে সম্মুখে রাখিয়া ভারতবর্ষীয় সামন্ত ভারতবর্ষে আধিপত্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বার বারের স্বহইয়াছিলেন। ইংরাজ কূটনীতি বিষয়ক সে সময় হিন্দু মুসলমান নায়কগণের মিলিত শক্তি লাপট মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া মিলনের মধ্য সিপাহী বিদ্রোহের সময়েই হিন্দু মুসলিম বিভেদের বীজ বপন করিয়াছিলেন। মিলনের শক্তি দিন দিন বাড়িয়া উঠিলেও বিচ্ছেদের শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়

নাই। ইংরেজের ছড়ান বীজ ফাটলে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

ইসলামের জয়যাত্রা ইউরোপে প্রতিহত হইয়াছিল, ইউরোপ হইতে কৃষ্টিয়ানীটি ইসলামকে অগ্রসরণ করিয়া ইসলাম অধুবিিত আরব ভূগো উপনীত হইয়াছিল। পরাজিত ইসলামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে আত্ম সংস্কারের আন্দোলন। মক্কা প্রজাগণত :এক ভারতীয় মুসলমান সে প্রভাব ভারতবর্ষেও বহিয়া আনিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় সাধারণ মুসলমানের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়া রূপ গ্রহণ করে মুসলমান ক্রমক বিদ্রোহের; ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়াছিল অতীত দিনের ভারতবর্ষের মুসলমান মুখল সম্রাটের সৌরব কাহিনী।

এ বিদ্রোহ দমনে ইংরেজের আত্মসা নাধা প্রবাসের প্রয়োজন হয় নাই।

শিক্ষিত ভারতবাসী স্বল্প দেখিয়াছিল ইংলণ্ডের হইবেন ভারতেশ্বর, দেশীয় রাজারা হইবেন ভারত-বর্ষের হাউস অব লর্ডস, এবং নব্য শিক্ষিতগণ গঠন করিবেন বিলাতের অধিকরণে হাউস অব কমন্স।

নব্য শিক্ষিত মনে যে ভারতীয়ের উঁকি কুঁকি মারিত্তেছিল, মুরেরপ্রনাথ সাহা ভারতবর্ষে ঘুরিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। ইংরাজ হিউম হইলেন ইহার রূপকার ভারতবর্ষের প্রজেক অফলের প্রতিনিধি স্থানীয় সহায়তায়।

কর্ম গ্রহণ করিল ভারতবর্ষীয় জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের প্রাক্কালে এবং আদিপর্বে শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল।

৫) ইংরাজ শিক্ষিত বিদ্রোহের প্রথম বীজ ফুটিয়া উঠিল আলিগড়ের উচ্চ ক্তরের শিক্ষিতগণের পক্ষে প্রথম বাহাদুরিকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল তাহার সিপাহী অভ্যুত্থানের নায়কগণের পথ বহিল, শুভ সমিতি গঠন করিল।

হত্যা, অভ্যুত্থান—প্রবাস, বৈদেশিক শক্তির সাহায্য লাভের উত্তম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈনিকগণের মধ্যে অভ্যুত্থান, সংগঠনচেষ্টা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কংগ্রেসের আন্দোলনকে বিদ্রোহের রূপদানের প্রয়াসে, আত্মসা হিন্দু ফৌজ ও নৌ বিদ্রোহ - প্রথমোক্ত এই প্রয়াসের অন্তর্গত।

যদিও এই প্রয়াসের ক্ষেত্রেই বৃত্তীশ সাম্রাজ্যিক ভারতীয় সৈনিকগণের আত্মগতা বোধে সমিতি হইয়া মানে মানে ভারত ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করিল, তথাপি শক্তি লাভের দিক হইতে ভারতবর্ষে এই শক্তি পরাজিত উপযুক্ত নেতৃবৃন্দের অভাবে।

ইংরাজ স্ট্রী ভারতবর্ষকে কংগ্রেস দ্বারা, বরাজ ও এক জাতীয়তার প্রতিষ্ঠিত দিয়াছিল: বৃত্তীশ জায়-পরায়নতা ও জনমতের অসামান্য আস্থা ছিল কংগ্রেস নায়কগণের; আবেদন ও বিধি দ্রুত আন্দোলনই ছিল তাহাদের অস্ত্র। ভাল করিয়া ইংরাজী ভাষায় উচ্চ পধ্যায়ের ইংরাজ রাজনৈতিক নেতার মত বক্তৃতা করিলেই হয়ত ইংরাজ পার্লামেন্টের ইংলণ্ডের দল নেতাদের ও বিলাতী জন-সাধারণের মন গলাইয়া দেওয়া ঘাইবে এইরূপ ছিল তাহাদের বিশ্বাস। কুঃসময়ে পাশে ঝাঁড়াইলে কৃতজ্ঞ ইংরাজ তাহা ভুলে না ইংরাজ জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে এইরূপ ছিল তাহাদের ধারণা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাধারণ ভারতবর্ষীয় গণের পক্ষ হইতে শিক্ষিত ভারতবর্ষীয় গণ ইংরাজ রাজের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়গণকে ইংরাজ রাজ্যের পক্ষ হইতে ব্রাজিলের আশা দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধশেষে তাহা-বের সে আশা ভাঙিয়া যায়, বিনিময়ে ভারতবাসী দেখে ইংরাজের চণ্ডমুতি বোলত আইন, জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।

ইংরাজের সততার, প্রতিশ্রুতিতে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেও নতন করিয়া শাস্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা মনে আসে।

ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত মুসলমান এবং সাধারণ মুসলমানের মনে অপর এক এবং গুরুতর ইংরাজ বিদ্বেষের কারণ গঢ়িয়াছিল। হুজুরত মহম্মদের সোহাবমানের পর ইসলাম ধর্ম নেতা খলিফা খাত্ত হন। এ নেতৃত্ব যতদিন হুজুরত মহম্মদের মিকবতী জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ইহা নৈতিক প্রভাব ছিল উচ্চল ও শক্তিশালী, এট পশ্চিমাধার হইতে হস্তান্তরিত হইত। অবশেষে সোহাবদ্বিত তুরস্কের সুলতানের আয়ত্তে আসিয়া যায়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতান ইসলাম উন্নতির ধর্ম নেতাও হইয়া পড়েন। সুলতানীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিস্ত্রিও হাতিয়ার হইত। পড়ে পড়ি এতিহাসিক এট পশ্চিমাধার হইত।

বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্ট ধর্মের মত ইসলাম ও বিশ্বধর্ম। তবে ইহার বিশেষত্ব ছিল। তুরস্কের সুলতান খলিফা হইয়া বিশ্ব ইসলামেরও নেতৃত্ব করিতেন। ইহাতে সুলতানের সুবিধা হইত। ইউরোপের অগাধ সাম্রাজ্যিক শক্তি বিশ্ব ইসলামের বিশেষ প্রভাবের সন্ধান পাইয়া ছিলেন তুরস্কের সুলতানী হইতে, এবং সুলতান খলিফা বাপ দিয়া। তাহার বিভিন্ন সময়ে ইহার নৈতিক প্রভাব কাজে লাগাইবার চেষ্টা

করিতেন। খলিফা বাহিত ও খলিফা বর্জিত বিশ্ব ইসলামের এই উত্তর বিধি টেউ ই বাহির হইতে এ দেশে বাহিত হইয়াছিল এবং দুই টেউ-ই এসেলে সক্রিয় ছিল মুসলমান সমাজে সব সময়ের কম বা বেশী।

ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক বিশ্ব ইসলামের স্বেচ্ছা সন্ধান এখানে।

তুরস্কের সুলতান বিশ্বযুদ্ধে জার্মান পক্ষ অবলম্বন করিয়া লালিত ও স্বার্থাস্থ হইয়াছিল। সুলতান খলিফার মধ্যকার দশের জ্ঞান ভারতবর্ষীয় মুসলমান জন সাধারণের পক্ষে অনেক নেতৃত্বানীত শিক্ষিত মুসলমান মিশ্র শক্তির অস্বতন্ত্র মনঃক বৃত্তি সাম্রাজ্যের নিকট আবেদন করিত। ছিলেন। তাহার মনোমত কল লভ করিতে পারেন নাই। খলিফার অপমানে কিন্তু হইয়া তাহার ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজকে তাহা হইয়া কেলিয়া ছিলেন। বোলত আইন, জাতিয়ান ওয়ালাবাগ, ইংরাজ রাজ কতক ভারতবর্ষীয়গণকে স্বরাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভিন্ন এই জাতীয় শিক্ষিত সাধারণ মুসলমানকে ততখানি প্রভাবিত করে নাই, যতখানি করিয়াছিল মিশ্রশক্তি পক্ষ কতক তুরস্কের সুলতান খলিফার অপমান।

(চলবে)

স্বাভাবিক পেটের ব্যথা, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রসূদ

আমোলা হুত কুমারী

আমুবেলিয়া মতে তৈরী

মূল্য ৩.৫০ এক আঁচল কল

ব্যক্তিগত

শ্রীমতীমোহন চক্রবর্তী

বিলকল কুমারী • কলকাতা • কলকাতা • কলকাতা

নির্বাচন সমীক্ষা

॥ কালীপদ সরকার ॥

মধ্যাহ্নে লোকসভা নির্বাচনের ঊষিখ খোষিত হয়েছে। নির্বাচনের মাত্র দুই মাস বাকি। নির্বাচনী অভিযানও শুরু হয়ে গেছে। ভোটদাতারাও ভাবতে শুরু করেছেন কাকে ভোট দেওয়া যায়। ভোটদাতাদের মেটিমুটিভাবে দুই ভাগে ফেলা যায়, (১) যারা কোন দলের প্রতি বিশেষভাবে অঙ্গুষত অর্থাৎ committed voter এবং (২) যারা কোনো মনে বিচার করে ভোট দেন uncommitted voter। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোটদাতার সংখ্যাই বেশি এবং তাদের ভোটেই প্রার্থীর জয় পরাজয় নির্ণীত হয়। বিশ্বের জন-সংখ্যার মাত্র ৩৮ শতাংশ মানুষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নাকে বাস করে, বাকি ৬২ শতাংশ বাস করে বিভিন্ন ধরনের একনায়কত্ব শাসনে। ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম। প্রাচীন কাল থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে নিশে আছে। বর্তমানেও আর্য অ্যাংলো স্ত্রান্সন জাতি অধ্যুষিত দেশগুলি ও ভারত যু্যাত: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পাদপীঠ। পছন্দমত সরকার গঠনের অধিকার বস্তুত: তুল্য ও দীর্ঘ সংগ্রাম-অঞ্জিত। এ কথা মনে রেখে ভোটদাতাকে তার শ্রেষ্ঠ নাগরিক অধিকারকে প্রয়োগ করতে হবে।

ভারতে শিক্টিতের হার পর্যাপ্ত না হলেও, ভারতীয় জনগণ রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন এবং পরিপতবুদ্ধি। প্রচারের দ্বারা সহজ কিস্তিমাতের সুযোগ সে কারণে সীমিত। আগের নির্বাচনের উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রে একটি স্থায়ী শক্তিশালী সরকার গঠন। সুতরাং ভোট দাতাকে সর্বপ্রথমে বিচার করতে হবে যে, তিনি যে দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক সেই দল কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গড়ার দাবি রাখে কিনা এবং তারপর তাকে দেখতে হবে সেই দাবি কতটা তথ্যনির্ভর ও সম্ভাবনাময়। নির্দল প্রার্থী, আকলিক অথবা রাজ্যান্তরের দলের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া কার্যত: নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কারণ আকলিক দলের প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে পারেনা, পক্ষান্তরে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ও সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি সৃষ্টির সহায়ক হয়। সে বিচারে আকলিক, রাজ্যান্তরের এবং সাম্প্রদায়িক দলের চরিত্র নেতিবাচক এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাকল্যের অন্তরায়। পরিপত সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্কিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ছুটি দিনটির বেশি দল সেই কারণে নির্বাচনে অংশ নেয় না।

কেন্দ্রে কোন কোয়ালিশন সরকার ইঙ্গিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম নয়। পাঁচ-মিশালি সরকার কোন বলিষ্ঠ কর্মনীতি অনুসরণ করতে পারে না। জাতীয় সংহতি এবং একায়ক্যর পক্ষেও কোয়ালিশন সরকার অপটু। তাই এমন একটি সর্বভারতীয় জাতীয়দলকে ক্ষমতার পাঠানো উচিত যে বিধাহীন নীতিতে

দেশ শাসন করতে সক্ষম। রাজ্যান্তরে কোয়ালিশন সরকারের ব্যর্থতা ইতিপূর্বে প্রমাণিতও হয়েছে। ১৯৭৭ সালে গঠিত কেন্দ্রের জনতা সরকারও প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল পাঁচটি দলের একটি কোয়ালিশন। প্রতিশ্রুতিমত এই সরকার এক বছর পার হতে না হতেই অসুস্থ হয়ে পড়ল, কাজ হল তাদের ইন্সটিটিউশন, প্রধান মন্ত্রীর নীতিবচন প্রচার আর রাজনৈতিকবাদের ভাড়াটিয়া উপহার। শেষ পর্যন্ত বল ডাঙ্গল এবং অকাল-মৃত্যু ঘটল জনতা সরকারের। কাজের কাজ জনতা সরকার কিছুই করতে পারল না। দেশ কিছুই পেল না আড়াই বছরে।

নির্বাচনী লড়াইটা এবার মূল্য: গ্রিম্বী। প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির তিনটি হল জনতা, কংগ্রেস (ই) এবং লোকসল-কংগ্রেস (আরস) জোট। তিন শিবিরের প্রধান হলেন যথাক্রমে শ্রীমঙ্গলকীর্ষন রাম, শ্রীমতী শ্যাম্ভী ও শ্রীচরণ সিং। এবারকার লড়াই-এ দলের গুণাগুণ বিচারের চেয়ে দলনায়কদের যোগ্যতা বিচারের প্রতি ভোটদাতার মনোযোগ অধিকতর নিবদ্ধ। কারণ, কোন দলের ভাবমূর্ত্তিই উজ্জল নয়, বিভিন্ন দলের মন ভুলানো নির্বাচনী ইচ্ছাহারাগুলিও সেই কারণে কারো মনে দাগ ফেলে না। সকলেই জানে, এসব নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল্য অতি সামান্যই। যে দলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক না কেন তাকে ক্ষেত্র দু'পক্ষে কাজ করতে হয়। আলগা প্রতিশ্রুতি পালন কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই কে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ হবেন সেটা চিন্তাই অগ্রাধিকার পেয়েছে। অবস্থাটা মাকিন হুন্সরাষ্ট্র এবং ব্রাসেলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো কিছুটা।

লোকসল-কংগ্রেস (আরস) জোট অপেক্ষাকৃত কমজোরী, দুই দল এক হয়ে যাবে অথবা জোট ভেঙ্গে হটকরা হবে কি না বলা শক্ত! শ্রী এইচ. এন্. বরগুণার জোট থেকে সরে আসা জোটের ভিতর সমঝোতার অজ্ঞাবহ সূচিত করছে। কমিউনিষ্টদের সহিত লোকসল-কংগ্রেস (আরস)-এর ঐক্যভেদ সম্ভাবনা অস্পষ্ট। কমিউনিষ্টরা মনে করে এবার কোন সর্বভারতীয় দলই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না, সে ক্ষেত্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনই হবে বিকল্প ব্যবস্থা। কমিউনিষ্টরা নিজেদের অধ্যুষিত রাজ্য থেকে সর্বাধিক সংখ্যক সমস্ত নির্বাচিত কর লোকসভায় একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণি গড়তে পারলে, প্রত্যাশিত কোয়ালিশনে যোগ দিয়ে ক্ষমতায় বসতে সক্ষম হবে—এই ধারণা নিয়ে তারা কাজ করছে। এই ক্ষত্র তারা জনতা সম্পর্কে সম্প্রতি কিছুটা নরম ভাবে দেখাচ্ছে।

কমিউনিষ্টরা আসলে কেন্দ্রে একটি দুর্বল সরকার চায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা হল তাদের আশ-প্রসাদের সুযোগ। ভেলেন্সা, কাকবীণ, নকশাল বাড়ি প্রকৃতি স্থানে আকলিক বিশ্রোহ ঘটবে তারা দেখেছে যে, গণতান্ত্রিক ভারত নিজেদের শক্তিতে বড় বকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি সম্ভব নয়। কমিউনিষ্টরা তাদের নীতি পাল্টে, গণতন্ত্রীর ভেক নিয়ে, নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকনতা দললে তাই উৎসব। তাদের লক্ষ্য অবশ্য গণতন্ত্রকে হাতিয়ার করে গণতন্ত্রের কলসায়ন এবং দলীয় একতাকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা।

রাষ্ট্রপুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" বই থেকে সংগৃহীত]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মেদিনীপুর সম্মেলনে ও তার অল্প কিছুদিন পরে সুরাট কংগ্রেসে যে ঘটনাবলি ঘটে গিয়েছে তাতে এবং আইন না মেনে চলার মধ্যে ও হিংসাকে রাজ-নৈতিক সংগ্রামের উপায় হিসাবে অবলম্বন করায়—সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যাওয়ার মধ্যে যা বিশেষ ভাবে প্রকট হয়েছে, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকগণ আমাদের মনোমুগ্ধ ও শাস্তিপূর্ণ ভাবে জাতীয় জীবন বিকাশের পক্ষে এক বিপদ সমূহ নতুন পরিস্থিতি উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। ভারী অমঙ্গলের এটি ছিল পূর্ব লক্ষণ মাত্র। এর পূর্ণ ভাষ্যপূর্ণ যে কী তা নীচুই প্রকাশ পেল। ১৯০৮ সালের ১লা এপ্রিল প্রাতঃকালে কলকাতাবাসিগণ একটি খবর পেয়ে একেবারে হকচকিয়ে গেল। খবরটি হল এই যে বিহারের মজঃফরপুরে গত সন্ধ্যায় এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং সেই বিস্ফোরণে হুজুর হতভাগা ইংরেজোপীথ মহিলা নিহত হয়েছেন। এই মহিলাঘর হলেন মাতা ও তার বোল বছরের কন্যা। এরা হলেন মজঃফরপুরের ব্যাতিমান উকিল মিঃ প্রিন্স কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা।

অল্পের নিম্নর পরিবর্তে এই মিঃ প্রিন্স কেনেডি কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে অল্প করেকজন ইংরেজোপীথান কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি ছিলেন তাবের মধ্যে একজন এবং তিনি একবার একটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্বও করেছিলেন। বোমা হোঁড়া হয়েছিল

মজঃফরপুরের জেলা জজ মিঃ কিংসফোর্ডের উদ্দেশ্যে। এই কিংসফোর্ড সাহেব কলকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বাংলার তরুণ স্বদেশী কর্মীদের উপর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়ার খুবই অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আরও দৃঢ় হয়ে পড়েছিলেন এই ক্ষুদ্র যে তিনি একাধিক সম্মানিত ব্যক্তির উপর দৈহিক শাস্তিবিধান করেছিলেন। কারাদণ্ড পানই হয়েছে অস্ত্রায় ভাবে। তার উপরে আবার অপমান! ক্ষতের উপরে ক্ষতের হিট! এই অপমানবোধ কতিপয় তরুণ স্বদেশবাসীর হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করে। তাই তারা প্রতিশোধ গ্রহণে সন্তোষক হয়। সুদীর্ঘায় বোস ও প্রকুর চাকী নামে দু'জন তরুণ কর্মীকে বঙ্গব্রহ্মকারীদের পক্ষ থেকে তাদের আবেশ পালনের দায়িত্ব দেওয়া হল। এতে তাদের দু'জনেরই জীবন শেষ হয়ে গেছে। একজনের কান্না হল; আর একজন যখন ধরা পড়তে যাচ্ছিল তখন নিজেকেই নিজে গুলি করে আত্মহত্যা করল। এ ঘটনাটি পূর্ণতম অর্থেই একটি বিরোধাস্ত্র নাটক—ভরতর অনর্থক এবং উদ্বেগবিহীন। এর অন্তিকাল পরেই সুরারিপুত্রের বঙ্গব্রহ্ম আবিষ্কৃত হল। হল বঙ্গব্রহ্মকারীদের বিচার এবং সে বিচারে বঙ্গব্রহ্মের নেতাদের হল কঠোর শাস্তি।

আমলাভ্যুত আতঙ্কিত হয়ে পড়ল; নিজেকেই তুলে তুলে যা ঘটেছে তার ক্ষুদ্র নিজেরাই ছিল ক্ষুদ্র পড়ল। তারা বনমূলক কাজে হাত লাগাল।

একটির পর একটি করে ক্রান্ত দমনমূলক কাজ চলাতে থাকে। ভাবল যে এতে তারা পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে পারবে এবং আইন, শৃংখলা ও শান্তি স্থাপন করতে পারবে। এ ভাবে জনজীবনকে কাঁপিয়ে তুলে এবং উত্তরনের কাজকে রক্ত করে দিয়ে তারা তাদের কাজ চালাতে লেগে গেল। প্রেসের স্বাধীনতা, জনসভা করার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হল; এন্ট্রি পুরানো মরচে ধরা অস্ত্র বা সরকারী অস্ত্রাগারে দীর্ঘকাল অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল তাকে বার করে এনে তা বিশিষ্ট বশেষী কর্মীদের উপরে প্রয়োগ করা হল। এই অস্ত্রটি হল ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন। কর্মীদের নির্বাসন দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা এই অস্ত্রটি প্রয়োগ করা হল। তাদের উপর এই অস্ত্রটি প্রয়োগ করা হল তাদের মধ্যে এমন অনেক আছেন যারা হলেন বশেষী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ, দেশবাসীকে কাছে অতিশয় সম্মানভাজন ও পূজনীয়। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে একদিন প্রাতে জনগণ এই সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল যে বরিশালের নেতা ও ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধিনী কুমার দত্ত, ব্রজ সমাজের একজন অগ্রণী সদস্য এবং সর্বোচ্চ জন মাধ্যম কৃষ্ণ কুমার মিত্র, বিশিষ্ট বশেষী কর্মী সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শচীন্দ্র প্রদাস বোস এবং স্বদেশ প্রেমিক ধনাঢ্য সুবোধ মল্লিক প্রভৃতিকে ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশনে নির্বাসিত করা হয়েছে।

আমার সন্দেহ যে খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে আমাকেও নির্বাসিত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে স্যার এডওয়ার্ড বেকারের হস্তক্ষেপের কলে বাতিল করা হয়। বেকার তখন লে-এন্ট্রি পত্ৰপত্র হয়েছিলেন এবং তিনি আমাকে ভাল ভাবেই জানতেন। এই খবরের সত্য মিথ্যা কতটুকু, জানি না। তবে ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যা বেলায় আমি

যখন ডিনার খেতে বসব এমন সময় বন্ধুবর মৌলভী আবুল হোসেন ছুটে ছুটে আমার বাতাকপূরের বাড়ীতে এসে খবর দিলেন যে সি. অ্যাট. ডি. অফিসে সাংগ। আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে, আমি যেন সে জায়গা প্রস্তুত থাকি। আমি বললাম, 'বেশতো খাওয়াটা সেবে নি, আপনিও খেতে বসে যান।' তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলেন। আমরা দুজনে খাবার খেতে নিয়ে ছু ঘণ্টা ধরে পুলিশের অগমনের প্রতীক্ষায় রইলাম, কিন্তু পুলিশ আর এল না। অতঃপর আমার বন্ধু মনে কিছুটা স্বস্তির ভাব নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন। আমিও ঘুমিয়ে গেলাম।

প্রকৃত ঘটনা হল এই যে আমাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল না; দেওয়া হল আমার কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধু ও সহযোগীকে, আমাকে নির্বাসিত করার কোন পরিকল্পনা কি বাস্তবিকই ছিল? আমি জানি না। সরকারী দপ্তরখানার কাগজপত্র ঘাটলে হয়ত কোন দিন সে সম্পর্কীয় গোপন তথ্য প্রকাশ পেতে পারে, আমি যে সময়ে গভর্নমেন্টের একজন সদস্য ছিলাম তখন হয়ত এ সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে পারতাম। কিন্তু আমি সেদিক থেকে বিবর্ত থাকি। দে বাই হোক, বন্ধুবর আবুল হোসেন যে সংবাদ আমাকে দিয়েছিলেন তার সমর্থনে কিছুটা তথ্য মিলে যায়। তিনি যেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং বলেন যে আমাকে নির্বাসিত করা হবে, সেই দিনই বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশ কর্মচারী ও ইয়োয়োনীয় সৈন্য বাতাকপূরে আসে। তবে তাদের এই আশঙ্কনের তাৎপর্যকে এইভাবে বর্ণনা করা হয় যে ভাইস-রয় লর্ড মিল্টো যেস বেলা দেখতে-এসেছিলেন, তাই এই ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এটাতে জানা ব্যাপার যে ভাইসরয় প্রায়ই বাতাকপূরে যেস দেখতে আসেন, সেজন্য আর কখনও তো এরকম সৈন্য ও পুলিশ

মোড়ায়ন করা হয় নি।

অতি উদার প্রকৃতির রাষ্ট্রনীতিবিদ লর্ড মলি
‘তার ‘রিকালেকসনসে’ যা লিখেছেন তাতে দেখা
যায় যে বিচার না করে নির্ধারন দণ্ড দেওয়ার নীতির
বিরুদ্ধে তার অস্বাভাবিক বিস্ময় হইবে উঠেছিল এবং
ঘটনার চাপে পড়েই অস্বাভাবিক তাকে নতি স্বীকার
করতে হয়েছে। আরও একটা কারণে তাকে নতি
স্বীকার করতে হয়েছিল, তা হল এই যে বাংলা ঠিক
আসল কর্মস্থলে থাকেন পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের যে
জ্ঞান সে জ্ঞানের গুরুত্ব অধিক এবং সে সম্পর্কে কোন
লর্ড উপস্থাপন করা চলে না। কিন্তু ভাইসরয়ের
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কয়েক জন সদস্যের
আচরণে তিনি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি
লর্ড মিন্টোর কাছে লিখলেন, “আজ্ঞা, ভাল কথা,
এখন যখন ১৮১৮ সালের নবম চরা তরবারি খানা
আমরা কাজে লাগাচ্ছি তখন আমার ইচ্ছা আপনি সে
অগ্রখানা প্রয়োগ করে অসুখ এবং অসুস্থকে (বৃদ্ধ
অসিয়ার) নির্ধারিত করুন। কি বলেন আপনি এ
বিষয়ে। ‘আমি সোৎসাহে আপনার সে কাজের
সমর্থন করব।’ এই কথাগুলি বলা হইয়াছিল অর্ধেক
আত্মবিশ্বাসে আর অর্ধেকটা কিস্তির তরীতে।
কিন্তু এই কথাগুলির ভিতর দিয়ে নির্ধারন সম্পর্কে
লর্ড মলির মনের কলঙ্কিত অবস্থা ও বিরক্ততা
হৃদে পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে, জনসাধারণ হইতে
কোন দিনই জানতে পারবে না। এই বৃদ্ধ অসিয়ার
কে কে? কিন্তু যতদিন পর্যন্ত জনমতের দ্বারা সর-
কারী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত না হইবে ততদিন পর্যন্ত এই
বৃদ্ধ অসিয়ারের কোন অভাব হবে না, সর্বদা
সর্বকালে সরকারী কর্মচারীদের খামখেয়ালোপনার
এটাই মোক্ষ দানবাই বলে দেখা গিয়েছে।

লর্ড মলির সঙ্গতিবোধই তাকে কয়েকটি বলা
কলঙ্কের প্রস্তাব করতে প্রেরণা দিচ্ছে। কিন্তু

আমার মনে হয় তদুপকারী কাজ হয় নি। ১২০৮
সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে তিনি লর্ড মিন্টোকে
লেখেন, “মায় একটি কাজ থেকে আপনাকে বিরত
থাকতে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। সে
কাজটি হল, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে
যেন তার সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান না হয়। এ
কাজের পক্ষে আমরা যত ইচ্ছা যুক্তি দেখাতে পারি
এবং হুজুত বা তার মধ্যে তেমন কোন অবিচার নাও
থাকতে পারে। তা হলেও এ কাজের মধ্যে একটা
পশ্চিম মহাদেশীয়, অস্ট্রীয় এবং রুশীয় চোরাচাল প্রকট
হয় পড়ে।”

১২২৮ সালের ১২শে মার্চ তারিখে ইম্পেরিয়াল
জেন্ডারলেটিভ কাউন্সিলে আমি একটি উপস্থাপনা
পরিষদ গঠন করার জন্য এক প্রস্তাব এবেছিলাম।
সে সময় আমি লর্ড মলির ‘রিকালেকসনস’
থেকে উপরে লেখা কথাটি উদ্ধৃত করে ভারত সর-
কারের হোম ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় সদস্য
মহোদয়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “১৮১৮ সালের ২নং
রেগুলেশনে বান্ধের বন্দী করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে
কি লর্ড মলির পরামর্শের এট অংশটিকে কার্যকরী
রূপ দেওয়া হয়েছে?” কিন্তু তার কোনও উত্তর
দেওয়া হয় নি। স্পষ্টতঃ এ থেকে এই অসুমান করা
যায় যে অভিজ্ঞতার দ্বারা রক্ষার পক্ষে এই অস্বাভাবিক
বিধানকে অনুসরণ করা হয় নি। এই বকম গুরুত্বপূর্ণ
আরও একটি সংযোজন সর্ব লর্ড মলি দিয়েছিলেন।
১২০৮ সালে ২৭শে আগষ্ট তিনি বললেন :—

‘তিনি (একজন এ্যাংলোইন্ডিয়ান কর্মচারী)
নিশ্চয়ই আমি তাকে স্পষ্ট ভাষায় যা বলেছিলাম
তা ভুলে গিয়ে থাকেন। আমি তাকে বলেছিলাম
যে এমন কোন ব্যক্তির নির্ধারন আমি অনুমোদন
করব না যার সম্পর্কে এ বকম নিশ্চিত বিশ্বাস করার
পক্ষে কোন বাস্তব যুক্তি নেই যে তার কাজ পরিকল্পিত

ভাবে ইঙ্গাপ্রাধিক হিংস্রতাপূর্ণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে।

পূর্বেই দেখা যাচ্ছে, এবানকার ক'ব'পক্ষ লর্ড মলির নির্দেশ-পরামর্শ মত কাজ করেন নি। সে নির্দেশ যদি পালন করা হত তা হলে কুমার কুমার মিত্র, অমিনী কুমার প্রভৃ. সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি এবং শচীন্দ্র প্রসাদ বোসের মত লোককে নির্বাসিত করা হত না। কারণ, তারা দৃঢ়ভাবে নিরমত্যাত্মিক পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, এমন কোন কাজের কথা তারা যত্নেও ভাবেন নি যে কাজ পত্রিক বা পত্রিকাভাবে 'হিংসার দ্বারা বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টির ক্ষমতা পরিচয়িত। পুলিশ যখন তাদের আক্রমণ করেছিল সেই উত্তেজনারম্বুহর্তে তারা কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ভাবেন নি। পুলিশের আঘাতের প্রতিবাদে একটিও প্রত্যাবর্ত না করে তারা সেই অত্যাচার মত্ত করেছেন। এখানে আমরা সেই পুরোনো দিনের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের আদেশ কি ভাবে কোম্পানীর কর্মচারীরা লংঘন করত তারই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। কোম্পানীর আমলে কর্মচারীদের মধ্যে কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের আদেশের প্রতি এই অমনোযোগিতা কিংবা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা প্রদর্শনের ব্যাপার প্রায়ই ঘটত। কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের পক্ষ থেকে বাত্রে বাত্রেই একথা তাদের বলা হত যে তারা যেন আর তাদের ক্রমবর্ধমান অধিকারহীন অঞ্চলের সীমা না বাড়ান। কিন্তু তাদের লোভ ছিল এত বেশী যে তারা তাদের প্রভুদের ক্রিস্টে নির্দেশগুলি অমান্য করবে এবং তাদের সে অপরাধ কমা করা হয়েছে। কারণ তারা অংশীদারদের ডিভিডেন্ডে বাড়িবার ক্ষেত্রে আরও বেশী পরিমাণ অক্ষত অধিকারহীন করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করেছে।

এ রকম প্রলোভন এখন আর নেই। সম্ভবতঃ এখন আর ইণ্ডিয়া অফিস থেকে যে সমস্ত নির্দেশ আসে তা এত নিরীহভাবে লংঘন করা হয় না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, আগেকার দিনের সেই অফিসী মনোভাব এখনও আছে যা নিজেদের পক্ষে একেবারে বৈধাচার্য্য হয়ে চলতে চায়। বর্তমানের এই সংবাদ আদান প্রদানের যোগসূত্র বন্ধ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দশ হাজার মাইল দূরে থেকে সেক্রেটারী অব স্টেট যে নিয়ন্ত্রণ কাজ চালাচ্ছেন সে নিয়ন্ত্রণ একটি ঢিলে ঢালা হবেই। সমস্ত এসেছে কিংবা তা দৃষ্টি পথের মধ্যেই এসে পড়েছে যখন ভারত সচিবের ক্ষমতা ও দাবিদ ভারত সরকারের কাছেই স্থানান্তরিত করতে হবে এক সাত্তোজোর ঐক্য রক্ষার ক্ষমতা প্রয়োজনীয় শর্তের মধ্যে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন তা আনতে হবে।

কৃতি ও বিশ্বাসের দিক থেকে লর্ড মলি দমননীতি প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভারতের শাসন কার্য পরিচালনার দাবির তাকে পালন করতে হইবেই একজন মন্ত্রী হিসাবে। তাই ঘটনার অপ্রতিরোধ্য প্রবল চাপে পড়ে তাকে এই নীতির দিকে হুঁকে পড়তে হয়েছে। তবে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেই তিনি এক শিক্ষা পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন, যে বিপ্লব আন্দোলন দেশের শান্তি বিস্তৃত হওয়ার ভীতি উৎপাদন করে দেশের জনসাধারণ তাতে কোন আগ্রহ বোধ করে না। তাদের মন-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আইন শৃঙ্খলাবোধে ঝাঁপে। সুতরাং এ থেকে তাদের এই শিক্ষাগুলি করতে হয়েছে। জরতবর্ষে যা চলছে তার সব কিছুই ঠিক ভাবে চলছে না; নিশ্চয়ই এর মাঝে কিছু গলদ আছে এবং দেশের সরকারের পক্ষ ও রাজ্য কার্য পরিচালনার মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যার কলেই বিপ্লবী শক্তিকালি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

(চলবে)

ভোটের তালিকায় কারচুপি বিপদ হেনেছে

ঐক্যবদ্ধ বন্দোপাধ্যায়



এক

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ গণতন্ত্রের পূজারী, ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চিন্তায় ভাই বৈশী ভাগ রাজনৈতিকদল বিহারী। কয়েকটি ছোটখাট রাজনৈতিক দল কিন্তু মূলত ও নীতিগত ভাবে গণতন্ত্র বিরোধী, তারা বিবাস করে যে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস ব্যালট বা ভোট পত্র নয়, বন্ধুকের নলই ক্ষমতার উৎস। তাদের ধারণা মানুষের মন জয় করে অর্থাৎ জনপ্রিয়তা অর্জন কোরে ক্ষমতা দখলের চিন্তা অব্যাহত। সমস্ত অস্থানীয় পথে ক্ষমতাসম্বল যখন রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য দেশে সম্ভব হয়েছে, তখন ভারতেও তা সম্ভব হবে নাই বা কেন? এতদিন সেই চিন্তায় তারা বিভোর ছিল ও সে পথেই চলি। শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে অজ্ঞানের সঙ্গে তারাও নেমে পড়তে মন। উদ্বুদ্ধ দেখা যায়। পার্লামেন্ট তাদের কাছে ইতিপূর্বে তরবারের খোঁড়াড় বলে মনে হলেও, তখন তারা দেখেছে ও বুকেছে যে এই তরবারের খোঁড়াড়ে 'জা'ব্দ' অর্থাৎ বাদ্যবস্তুটি পরম উপাদেয়, তাই বোম্ব হয় মনে মনে ঠিক করেছে তারা যে বন্ধু কেলে দিয়ে জনগণের দ্বারা হত্যা করে এখন ভোট ভিক্ষা করলে ক্ষমতায় আসা তত্ব সহজ ও সম্ভব হবে এবং সে কারণেই নির্বাচন প্রার্থী হবার জন্য এক দিকে দিকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেখা যাক শেষ অবধি কি হয়? জনগণ এই সব সন্ত্রাস-বাদীদের এখনও ভয়ের ও সন্দেহের চোখে দেখে, কারন এদের পূর্ব ইতিহাস ও ভয়ঙ্কর কার্যকলাপ জনগণ এখনও মনে থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। যদিও জনগণের স্বাভাবিক অস্তিত্ব ক্ষীণ। ভোটের বাজারে আসার মাত্র কয়টা আশ্রয় আছে অনেক নতুন ছাত্র শ্রমিক, পেশাগত ও রাজনৈতিক নামধের বিদেশী চরের দল ছদ্মবেশে নেমেছে ও নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সিদ্ধির ও সংরক্ষণের চেষ্টায় তারা তৎপর দেখা যায়, কিন্তু বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্যকারগণ মনে করেন যে এবারের নির্বাচনে আসল লড়াই হবে জনতান্ত্রিক ও কংগ্রেস (ই) দলের মধ্যে ও এই দুই বিবাদমান দলের মধ্যে কে যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল কোরবে তা এতদূরী বলা মুক্তি সম্ভব নয় আর তা সমীচীনও নয়। সাধারণ ভোটারের ধারণা হয় জগজীবনরাম প্রধান মন্ত্রী আর না হয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধান মন্ত্রী হবেন, অপর কারোই আশা নেই। মহিলা ভোটাররা কিন্তু এখন থেকেই টামে বাসে, ট্রেনে হাটে বাজারে, অফিস-কাছারীতে, এককথায় প্রায় সর্বত্রই বেশ প্রকাশ্যে ইনিয়ার জয় হবেই বলে এখন থেকেই মত, প্রকাশ ও প্রচার শুরু করে দিয়েছে।

আর এইসব মহিলারা কোন বিশেষ রাজনৈতিকদলের সঙ্গে কোন ভাবেই যুক্ত নয় বলে অনুমান নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। শ্রীমতী গান্ধী যেহেতু মহিলা, তাই বৃদ্ধি মহিলারা তাঁর জয় লাভে সাহায্য

ও সহায়ত্ব নিয়ে সাগ্রহে সর্বত্র এগিয়ে আসছে। মহিলারা যে কি বিপুল ভাবে ইন্দিয়াকে সাহায্য নিচ্ছে তা নিজে না দেখলে বা নিজে কাণে না শুনে কেউ বিশ্বাস করতেই পারবে না। মহিলা ভোট যে ইন্দিয়ার কংগ্রেস (ই) প্রার্থীরা বেশী সংখ্যায় পাবে তা এখনই ভবিষ্যৎ বাণী করা সহজ। মুশকিল কিন্তু ভোটের তালিকায় আসল নাম বাদ যাওয়ার ও নকল নাম ভর্তি হওয়ার। পশ্চিমবঙ্গের ভোটের তালিকায় বহু এলাকার উদ্ভ্রষ্ট প্রাণেলিভিত ভাবে আসল ও স্থায়ী বাসিন্দাদের নাম কোশলে বাদ দিয়ে নকল ও ভুলে। এবং অল্প এলাকার লোকের নাম পরিকল্পনা মত ঢোকান হয়েছে। এর ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায় বোজাই সংবাদ পত্রে এই ধরনের অভিযোগ প্রকাশিত হচ্ছে। শাসকদলের স্বার্থে ভোটের তালিকা তৈরীতে যে সব লোক বর্তমান সরকার নিয়োগ করেছেন তারা কি সি পি এম দলের ক্যাডার বা সমর্থক? জনসাধারণ এদের চিনে কেলেং হার তাই পশ্চিমবঙ্গে একদম হীন পন্থায় ভোটের তালিকা তৈরীর চেষ্টা চলেছে বলে তারা দ্বিষ্ট।

এমন কি উত্তরবঙ্গে একই ধরনের ভুল ভোটের তালিকা দেখে আর এস. পি দলও অভিযোগ তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কত হাজার হাজার আসল ভোটের যে বাদ গেছে আর তার পরিবর্তে কত হাজার হাজার নকল ভোটের নাম খসড়া তালিকায় যে উঠেছে তা দেখলে স্বভাবতই মনে হবে যে সুপরিকল্পিত উপায়ে শাসকদল, বিশেষ করে সি পি আই (এম) দল যে এই ভোটের কারসাজি বা জাল ভোটের তালিকা রচনার পিছনে আছে তা সহজেই অনুমেয়। সি পি এম ছাড়া অজ্ঞানত মূল রাজনৈতিক দলই এই অভিযোগ তুলেছে ও অনুসন্ধানে তা সত্য বলে পদস্থ সরকারী অফিসাররা স্বীকার করেছে বহু ক্ষেত্রেই। যেমন সংবাদে প্রকাশ যে হাওড়ার জেলা শাসক তদন্ত করে চার জায়গায় একদম অভিযোগকে সত্য বলে মহাকরণে জানিয়েছেন। জনগণের একটা বিরাট অংশ এই ব্যাপারে মন্তব্য করছেন যে ভোটের আদৌই সি পি এম ভোটের তালিকায় খেজাকৃত কারসাজির মাধ্যমে নিজেদের কোলে ঝোলানবার বেশ সহজ ও সরল পথ বেছে নিয়েছে।

(চলেবে)

পরলোকে বিপ্লবী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী

বরিশাল জেলার বিশিষ্ট বিপ্লবী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী গত ২৪ নভেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে হাবড়ার বাড়ীতে পরলোক গমন করেন। প্রথম যৌবনেই তিনি অমূল্যসন সমিতির সংস্পর্শে আসেন এবং সক্রিয় ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ ১০ বছর তিনি কারাবরণ করেন। মনোরঞ্জন বাবু একজন আদর্শনিষ্ঠ নিবেদিত গ্রাম বিপ্লবী হিসাবে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

আমরা এই বিপ্লবী বৃদ্ধ উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই এবং তার আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জানাই।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—CALCUTTA			
Banerjee Sunil Kumar	B/D, Nakuleswar Bhattacharjee Lane, Calcutta-26	200	22. 3. 74
Sarkar Birendra Kumar	449, College Street Market Calcutta-12	200	15. 9. 77
Dist—HOWRAH			
Chakraborty Smt. Kumudni	w/o Late Sashimohan Chakraborty	200	25. 5. 79
Dist—HOOGHLY			
Ghanta Sudhir Chandra	Dakshin Narayanpur P. O. Narayanpur	200	15. 8. 72
Dist—NADIA			
Das Smt. Pushpanil w/o Late Mokeha R. Das	65, Besharpur Road Dakshinpara	100	20. 5. 79
Nath (Debi) Kumudbasini w/o Late Narendra Nath	P.O. & Vill Ashannagar	150	3. 3. 79
Dist—MIDNAPUR			
Bag Smt Padma Balu w/o Late Manik Ch. Bag	Vill Mayorkhola	100	24. 3. 79
Das Smt. Labanya-prova (Simā) w/o Late Ramendra Sekhar Das	P. O. & Vill Aadan	200	15. 4. 78
Guntait Sit Kumud Ch.	P. O. & Vill Bahurupa Vla Narayangarh	200	15. 8. 72
Pahari Gopal Chandra	P. O. Pansi, Vill Bijoyanagar	200	19. 5. 75
Sinha Smt. Prativa w/o Late Sudhir Kumar	P. O. & Vill Kumarpura	100	15. 8. 72
Dist—JALPAIGURI			
Guba Thakurta Rajot	Old Police Line, Jalpaiguri	200	1. 4. 77
Dist—DARJEELING			
Choudhury Mororanjan	Chachan Mansion Shop No 7, Cart Road, Darjeeling	200	18. 8. 72

বিশ্ববী পঞ্চকমালার

অনুলিখন সমিতির বিদ্য গ্রন্থ—অনুলিখন দ্বারা—০.০০

বিশ্ববী মহানায়ক রামবিহারী—অনুলিখন দ্বারা—০.০০

কোরোদ কুমার দত্তের

৭/30
22 NOV 1979

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ১। বাংলায় অগ্রহণ—১.৫০ | ২। বহির্ভাষায় গ্রন্থের বিদ্য গ্রন্থ—৮.০০ |
| ৩। অনুলিখন সমিতির পি. মি. মি.—১.০০ | ৪। পৌরসী সংগ্রহ কাহিনী—১.০০ |
| ৫। গোকর্ষী পৌরসী—১.২৫ | ৬। কলতা বাহার সংগ্রহ কাহিনী—৫.০০ |
| ৭। রামবিহারী ও অনুলিখন সমিতি—১.০০ | ৮। স্বাধীনতার পৌরসী ও সংগ্রহ—৫.০০ |
| ৯। ক্রিয়াকানন্দ ও সংগ্রহ—৫.০০ | ১০। বিশ্ববী ক্রিয়াকানন্দ—৫.০০ |
| ১১। মহারাষ্ট্র ও দ্বিতীয়—৫.০০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ক্রিয়াকানন্দ—১.৫০ |
| ১৩। দেশ বাহিরে ভোগেনি (১)—১.০০ | ১৪। দেশ বাহিরে ভোগেনি (২)—২.০০ |
| ১৫। পৌরসী চক্রপেখর আশ্রম—৫.০০ | ১৬। ১৯ই এপ্রিল জাতীয় পৌরসী বিদ্য—১.০০ |
| ১৭। হাতিয়া হত্যার গ্রন্থ—১.৫০ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রহ ও অনুলিখন সমিতি—৫.০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পত্রিকা ইতিহাস—৫.০০ | ২০। লাট হত্যার গ্রন্থ—১.৫০ |

আগ্রহণ—৫.০০ বার্ষিক মূল টীট কলিকাতা-১০০০০১

টেলিগ্রাফ—১/১/১/A বহিষ চাটাকী টীট কলিকাতা-১০



— সম্পাদক হত্যার —

অনুলিখন চট্টোপাধ্যায় (মজাৎ) অনুলিখন দ্বারা, বিশৃঙ্খল চাটাকী

সম্পাদক—অনুলিখন দ্বারা দ্বারা

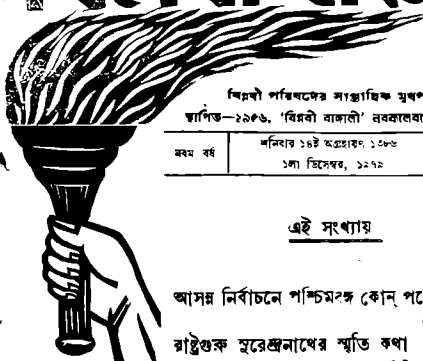
বিশ্ববী ক্রিয়াকানন্দ—অনুলিখন দ্বারা : বহিষ—অনুলিখন দ্বারা পাল :

গ্রন্থাক ও দ্বারা :—অনুলিখন দ্বারা : গ্রন্থাক ও দ্বারা—অনুলিখন দ্বারা :

বিশ্ববী বাংলা কার্যালয় :—৫.০০ বার্ষিক মূল টীট, কলিকাতা-১০০০০১

দ্বারা :—অনুলিখন দ্বারা, ১১১ নং ক্রিয়াকানন্দ টীট, কলিকাতা-১০০০০১

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
 স্থাপিত—১৯৪৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবমালেবার—১৯৭১

নবম বর্ষ	শনিবার ১৪ই অক্টোবর ১৯৬৬ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭২	২-১০ সংখ্যা
----------	---	-------------

এই সংখ্যায়

আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ কোন্ পথে

। সম্পাদকীয় ।

রাষ্ট্রশুরক সুরেক্ষনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মণিরী মোহন শশঙ্কর ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। ক্রিয়োৎসাহক ।

ভোটের তালিকায় কারুরূপি বিপ্লব হেনেছে

। ঐক্যবীথির অধ্যাপনাধ্যায় ।

ইরান আগুন নিয়ে খেলছে

। বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বি ।

অসমাপিকা উপসংহাস

নির্বাচন সমীক্ষা



। কাকিমস্ত্রা কায় ।

। কালীপদ লবকার ।

দেশের কাজ আমার ধর্মের
 অঙ্গ। ইহা আমার জীবনের
 আদর্শ। আমার কর্মনার
 ঘামি ভগবানের মূর্তি
 দেখিতে পাই।

—দেশবন্ধু

আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে ?

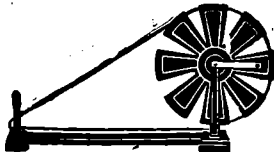
পার্লিমেটারী গণতন্ত্রের কবরটি হুনিচ্ছি নীতি আছে—তার ভিত্তিতে জনসাধারণের সংবিধান সম্মত মৌলিক অধিকার সমূহ রক্ষা ও প্রতিপালন হয়ে থাকে। এবং এই নীতি-নীতি ও প্রকার প্রকরণের ওপরই নির্ভর করে গণতন্ত্র ও সরকারের প্রতি সাধারণ মাত্রবের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

লোকসভার আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই রাজ্যে পার্লিমেটারী গণ-তন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুনভাবে বিচার বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার—যা ৭৭ এর নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেছিলেন এই রাজ্যে গণতন্ত্র রক্ষার সুমহান আদর্শকে সামনে রেখে, পরবর্তী কালপর্যায়ের তাঁদের কর্মসূচি ও অসংকত ব্যক্তি-বিশ্বাস ক্রমশঃ মাত্রবের মনে তাঁদের অস্বীকারের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। বিশেষতঃ মরিচকাপীর বাঙালী উদ্বাস্ত বিপ্রভূন, পুলিশ আন্দোলনে গুলী চালনা, শিক্ষা-ক্ষেত্রে ক্ষমতাস্বপ্নের অগণতান্ত্রিক অসম্মেয়ে ও বেকারত্বকে প্রবালোর ক্রমবর্ধি ও মর্দোপরি আসন্ন নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতে বাপক ছনোতি এই রাজ্যে গণতন্ত্রের অস্তিত্বকে ধিপর করে তুলেছে।

ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষণ বামফ্রন্ট সরকার বেকার ভাতা প্রাপ্ত যুবকদের নিয়োগ করেছেন—যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলবিশেষের কর্মীরাই এই কাজ পেয়েছেন বলে অভিযোগ এসেছে। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক ভূমি ভোটারের অস্বীকৃতি ও প্রকৃত ভোটারের নামমা ভোটারও অসংখ্য অভিযোগ প্রতিনিয়ত সংবাদপত্র-গুলিতে প্রকাশিত হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছেও এবিষয়ে হুনিচ্ছি তদন্তের দাবী জানানো হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এর জন্য দায়ী কর্মী বা কর্মীদ্বন্দ্বকে শাস্তিসূচক করা হলেও তাতে সামগ্রিক ভাবে এই ক্ষণকাল হুণীতির কোন সমাধান হয়নি—বরং অভিযোগ-গুলির সভ্যতাই অমানিত হয়েছে। এমনতাবস্থায় এই ভূমি তালিকার ভিত্তিতে কোন সং ও সৃষ্টি নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয় এবং নতুন করে ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতেও বহু সময় লাগবে মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচনের দেবী আর তিক্ততান্ত্রিক এক হাস—অতএব, সামগ্রিক

পরিষ্কৃতি বিবিচনা করে নিবাচন কমিশন যদি ভুলমাত্র ঐষ্টে বাংলা ভাষ্যগী মাগে নিবাচন না হওতেন পক্ষান্তরে ভাবতবাহের সবং যান এ সময়েই নিবাচন অসম্পন্ন হয়ে যায়—তবে তা' শাসক বামফ্রন্ট ও রাজ্যের গণতান্ত্রিক মতবাদে এত বাংলায় মানবের কাছে কহেটা ভেটি করে দেবে—তা সম্বন্ধেই অসময়ে এক ভূষা ভেটি'র শক্তিকার বিরুদ্ধে আপামর গণচমকবাসীর শিকোভ ও অসময়েই সেই আন্দোলন পরিচালিত হইবে জানবে বলে আমরা আশংকা করছি।

ঐষ্টে বাংলার মু্যামখীর প্রতি আমাদের আবেদন—আপনার লক্ষ্যবস্তুর কথা বলে, বিপ্লব জনসমর্থন নিয়ে কমলায় এসেছিলেন। মাত্ৰ অষ্ট্রাই বহুরে সেই জন আশীর্বাদ কি আপনাদের হারিয়েছেন বলে মনে করতেন এবং সেজন্যই পি. এ. পনার সরকারের যত্নভুক্তি পল-
স্থান ও উপলব্ধ কর্মের আমরা নিবাচনে জনগণের উদ্দেশ্যে এই অসং পথ গ্রহণ করেছেন।
তা যদি না হয়। তবে ভূষা ভেটির শক্তিক সম্পর্কে পাইটি অভিব্যক্তির বিস্তারিত তদন্ত
করান, সেখানের শক্তি দিন ও প্রত্যেকজনীয় সংশোধন করুন। সবকিছুকেই মিথ্যা ও চক্রান্ত
বলে উড়িয়ে দিয়ে সাময়িক ভাবে হতভোক্তা করুন। এই কিছু পরিধানে তা বহুরের সমতা ও
গণবিক্ষোভকেই ভেঙে আনুন। সে পরিধানে গণতন্ত্রকেই কোন বাস্তবেরই কামা হতে
পারেনা।



ইরান আগুন নিয়ে খেলাছে

—বিশেষ প্রতিনিধি



সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী যে একটা ঘৃণোৎসর্গের ঘোর ঘনঘটা প্রকাশ ঘটছে, তা দেখে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন চিন্তাশীল মনুষ্যেরা। প্রতিদিনই আকস্মিক হুমুসানা, প্রাণহানি, ধনসম্পত্তিহীন এমনকি কতকগুলি জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার খবর পাওয়া যাচ্ছে গণসংসারগণ অবশ্য বনছেন অশুভ গ্রহদক্ষিণেশ্বরের অশুভাশঙ্কিত এটা। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ বাণী জেনেও অস্বস্তির কোন উপশম ঘটানো সম্ভব হচ্ছেনা। জুর্গোণ মানুষকেই ভূগতেই হচ্ছে এবং সেটা প্রায় প্রতিদিনই।

এত গেল একদিককার কথা কিন্তু অচ্যুতিকে পৃথিবীর ভৌগোলিক মানচিত্রে ইরান নামক ছোট্ট একটি দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার গুরুত্ব হৃদয় প্রসারী হতে বাধ্য। যদি না এই পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটে অনতিবিলম্বে। ইরানের শাহকে কেন্দ্র করে এদেশে একটি প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি চলেছে অনেকদিন ধরেই। সেখানে একটা জঙ্গলের রাজত্বের সৃষ্টি হয়েছে বলা চলে নিঃসংশয়ে। শাহ দেশভাগ্য করার পর কিন্তু সেখানে আজ ৬ পর্যন্ত কোন স্বায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি একবার একদল ক্ষমতা দখল করছেন। অল্প একমল অল্পদিনের মধ্যে তাদের হত্যা করে গুলী দখল করছেন। ইরানের বর্তমান কালের ভাগ্য নিত্যাতা খোমেনীর আমলে সাতছাড়ার লোক প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন, এ সংবাদ পরিবেশন করছেন ঐ দেশেই দেশত্যাগী একজন তৃতীয়া প্রধান মন্ত্রী। তাঁর মনেই এই সংখ্যা আরো অনেক বেশী। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের নির্যাক খোমেনী

কি বুঝছেন না যে দেশের মানুষের কল্যাণের জন্যই তারা শাহকে বিভাঙিত করে নিজেরা ক্ষমতা দখল করেছিলেন। দেশের দেশের লোকগুলিকে যদি এই ভাবে গুলী করে হত্যা করার নীতি প্রচাৰিত থাকে, শেষ পর্যন্ত ইরানে অবশিষ্ট লোকজনের জীবনে কি ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি বনিয়ে আসবে। এস কথা ভেবে দেশের প্রয়োজন বোধ করছেন না, অথবা ভেবে দেখার বুদ্ধি তাদের এতখানেকই লোপ পেয়েছে? তাহলে এই হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বার জনক এই পার্শ্বনিক সত্যও উপলব্ধি করার মত কাণ্ডজ্ঞান ও লোপ পেয়েছে কি? একদিন এই হিংস্র নীতি যে তাদের উপরই বুনোয়া হয়ে ফিরে আসতে পারে, এই বিচার শক্তি ও বোধশক্তি পরিপূর্ণ ভাবে লোপ পেয়েছে? এই নজীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

এই প্রকার উন্মত্ততার প্রদর্শন দিলে যে কালক্রমে সীমাহীন স্পর্ধায় পরিণত হয় এবং লঘু গুরু জ্ঞান থাকেনা, এটাও স্বাভাবিক নিয়ম। ইরানের ভিতরে যতদিন এই উন্মাদনা সীমিত ছিল, এত দিন অল্প দেশ এটাকে ইরানের স্বাভাব্যত্বীন ব্যাপার বলে কোন কথা বলেনি। কিন্তু ইরানের আর্থনিক অবিস্বা-কারিতা যে পথ্যাবে উঠেছে, তাকে সংযত না করা হলে, এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে একটা দ্বিধা বুদ্ধি বিগ্রহের সৃষ্টি ঘটতে পারে। মক্কেলটো জানেন পৃথিবীতে রাজনৈতিক শক্তির বিগ্ৰাস যেভাবে বর্তমান, তাতে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের পেছনে বৃহৎ শক্তিগুলি নানাভাবে সাহায্য করবে, যদি যুদ্ধ নাগে। তবে যুদ্ধ-মক্কাটো ইরানেই হবে, এবং তার জন্য

কতির সিংহাসন ইরানের উপর পড়বে।

ইরানের বর্তমান পরিস্থিতিতে নিহক ধরোয়া যাপার বলে গণ্য করা চলেন। কয়েকটি ইরানী ছাত্র আমেরিকার দূতাবাস অবরোধ করে রেখেছে, অথবা খোমেনীর পূর্বা সমর্থন এর পেছনে আছে। কি তাদের অভিযোগ তা তারা বলে ফলছে না। প্রথমতঃ দূতাবাসের কর্মীরা প্রত্যেক দেশেই আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কতগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী। সব ভিন্ন দেশেই এই শীর্ষস্থায়ী রীতিকে মেনে চলে। কখনও দূতাবাসের কোন লোক কোন দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করলে তাকে বের করে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রয়োজনবোধে দূতাবাস বন্ধ করতেও সক্ষম হয়। কিন্তু ইরানের ছাত্ররা দূতাবাসের কর্মীদের চোখ দেখে, হাত বেঁধে লোকদের সামনে হাজির করে, তামাসা দেখবার যে জঘন্য প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে, সেটা নিন্দনীয়। তার পর বরাটে ছেলোদের মত তাদের আবদার হল ইরানের দূতপূর্ব শাহকে হত্যাকণ্ড দিয়ে ইরানে ফিরিয়ে দিতে হবে। অস্ত্রধার আমেরিকার দূতাবাসের লোকদের ছেড়ে দেওয়া হবে না। শাহ বর্তমানে মারাত্মক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে, আমেরিকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। কোন সভ্যদেশে কি এই অবস্থায় একজন মরণাপন্ন রোগীকে হিংস্র নেকড়ে মূষে ফেলে দিতে পারে। একাজ করতে কোন দেশের রাজী হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমেরিকার মত বিশেষ অস্ত্রতম প্রধান শক্তির রাষ্ট্রের পক্ষে। একাজ করলে দেশ-বিশেষে তার মাথা নীচু হবে চিরদিনের মত, এবং তাদের দেশের মধ্যে বিরোধ ও বটতে পারবে খোর আতাস কিছু কিছু ইতিমধ্যেই মিলছে। শাহকে ফেরৎ না দিলে ইরানী ছাত্র ও নেতারা যদি অবরুদ্ধ দূতাবাসের

আমেরিকাবাসীদের উপর অত্যাচার করে তার ফলে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়তে পারে। অবশ্যই একথা স্বীকার করতে হবে যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এ পর্যন্ত যথেষ্ট বৈধা ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। আগের দিনে এর থেকে অনেক দূরত্ব কারণে, পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটছে, এর প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যাবে। তবুও আমরা প্রত্যাশা করব যে আমেরিকা বিশ্বশান্তির দৃশ্য চেয়ে সরল প্রকার যুদ্ধের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব যে ইরান যদি আমেরিকার এই নীতিকে দুর্বলতার পরিচায়ক বলে মনে করে এবং আনো ইচ্ছাকৃততার পথে পা বাড়ায় তবে শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংসের সম্মুখীন হবার আশঙ্কা আছে। তৈল সম্পদের অধিকারী হয়ে হরত তারা বরাকে সমাজদান করছে, সেই তৈলকুপই তাদের কাল হতে পারে একটি অগ্নিকুলিঙ্গ নিক্ষেপের পরে। মহামান্য পোপ, ইউ, এন, ও তাদের যে অনুরোধ করেছে সেটা মেনে চলাই ভাল। বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবে যদি আগুন জ্বলে ওঠে, তাদের কাজকর্মের ফলে, তবে সে আগুন থেকে তাদেরও পতিগ্রাস নেই।

একটি প্রাচীন ঐতিহ্য আছে ইরানের। সভ্যতার প্রথম যুগের পদস্পর্শ পড়েছি। এখানে কিন্তু খোমেনীর ইরানে আজ জনগণের শাসনে পরিণত। ইরানের বর্তমানে মনোভাবের সমর্থন, নেই কোন দেশের। কোন বিষয় নিয়ে সভ্যত্বের ঘটলে, আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলাই শুভরুচি সম্ভব। কিন্তু ইরান না করছে, সেটা জঘন্য রাক মেইল। এই অকল্যাণকর পথ ত্যাগ করে, ইরানের মানুষ, বিশেষ করে ইরানী বিপ্লবীদের এখনই আবেগজনক এই মারাত্মক সড়ট মোচন করতে। অস্ত্রধার যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, সারা দুনিয়ার পক্ষেই সেটা অনাক্রম্য। আমরা প্রত্যাশা করব ইরানীরাই এই আগুন নিয়ে খেলার মনোবৃত্তিকে সংযত করবেন।

ভোটের তালিকায় কারচুপি বিপদ হেনেছে

শ্রীযুক্ত বনেন্দ্রনাথ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পশ্চিমবঙ্গে যতদূর না সঠিক ভোটের তালিকা তৈরী হয় ততদূর নির্বাচন স্থগিত রাখাই বিধেয়। জনগণের পবিত্র ভোটাধিকার বা সংবিধান সম্মত তা একদম বহুবাহুল্যক কৌশলের দ্বারা বিস্তৃত বা বন্ধিত করা: নিশ্চয়ই সংবিধান বহিঃস্থ কাজ ও তা বিপদজনক এবং অপরাধমূলক কাজ নিঃসন্দেহে। এ ব্যাপারে যারা প্রকৃত অপরাধী তাদের প্রকৃত অপরাধী তাদের খুঁজে বার কোরে সরকার কি যোগ্য শাস্তি দিতে সমর্থ হবেন? যদি তা এখন কোন কারণে সম্ভব না হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে ভুলে ভরা জালভোটের তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন বন্ধ করা হবে কি? সরকার কি গণতন্ত্রের মূল যে ভোটের তালিকা, সে ভোটের তালিকা দ্বারা সঙ্গতভাবে সংশোধন করবেন নির্বাচনের আগেই যাতে প্রকৃত ভোটের ভোট দিতে পারে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে? তা যদি কোন কারণে সঠিক করা এখন আর কোন প্রকারেই সম্ভব না হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে ভোট বন্ধ রাখতেই হবে, নচেৎ জনগণ প্রশ্ননকে কিছুতেই নির্বাচন বলে মেনে নিতে চাইবে না এবং বোরস্তর অনর্থক বাধবে এ জাল ও উদ্দেশ্য প্ররোচিত ভূয়া ভোটের তালিকার দ্বারা। জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেবার অধিকার কি কোনও রাজনৈতিক দলের আছে? নিশ্চয় তা নেই। সরকার এ ব্যাপারে দীর্ঘদর্শন করুক। আসামে বঙ্গভাষাভাষীদের কৌশলে বিধেয়ী আখ্যা দিয়ে ভোটাধিকার কাড়া চলছে আর

পশ্চিমবঙ্গে অকমিউনিষ্টদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে পরিকল্পিত উপায়ে দলীয় ক্যাডারদের ভোটের তালিকা তৈরীর প্রাথমিক কাজে লাগিয়ে।

আসাম সরকারও পশ্চিমবঙ্গ সরকার একই সংবিধান বহিঃস্থ কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও দেশের বৃহত্তম জনগণের দরবারে দোষী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধে, অথচ চরণসিংয়ের তদারকি সরকারের দ্বারা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে অভ্যস্ত। হায় সংবিধান! হায় গণতন্ত্র! যারা তোমার মূলোচ্ছেদ করছে পদে, পদে, তারা ই তোমার মৌখিক জ্বর গাটেই আপন পিঠি বাঁচাতে। সি, পি, এম হবে গণতন্ত্রী হলো? বৈরতন্ত্রে বা একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী কমিউনিষ্টরা বিজ্ঞান তপস্বী সেজে ভারতের রাষ্ট্রদ্রোহ হাত করতে চায় আর একবার তা যদি কোন রকমে হাত কোরতে পারে ওরা, তবে ভারতকে দেখিয়ে দেবে বৈরতন্ত্র কাকে বলে। ওদের বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, চেকোস্লোভাকিয়া, যোগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, কুমোয়ারিয়া প্রভৃতি কোন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র আছে? এসব রাষ্ট্রে চরম বৈরতন্ত্র বিরাজমান, তা কি ভারতীয় কমিউনিষ্টরা জানে না? ওরা সব জানে, এখন কার্যোদ্ধারের জন্য গণতন্ত্রের নামাকলী গায়ে এঁটে ওরা বক ধামিক সেজেছে। এই বক ধামিকের দল বকাসুর বেশে ভারতকে ধরবে করে তবে ছাড়বে। ওরা যে কি সাংঘাতিক ও নিষ্ঠুর তা দেশের লোক জানে আর সেই কারণেই সর্ব-

ভারতীয় ক্ষেত্রে জন্মের প্রভাব প্রতিপত্তি অত্যন্ত ক্রীণ বা নেই বললেই ঠিক বলা হয়। যারা নিজেরা নীতিগতভাবে বৈরতন্ত্রী তারা অপরকে কোন সাহসে বৈরতন্ত্রী বলে আখ্যাত করেছে হীন প্রচেষ্টা চালার।

সি. পি. এম মূলত বৈরতন্ত্রীদল এখন ওরা কিন্তু দলতন্ত্রী, আর কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় একবার বসার অধিকার কোন রকমে পেলেই ওরা যে কি নৃশংস ও মারাত্মক ধরণের বৈরতন্ত্রী তা প্রকাশ পাবেই। তবে ভারতবাসীর পক্ষে বাঁচোয়া এই যে ওরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বসার সুযোগ পাবে না কোনদিন। ভারত বৈরতন্ত্রকে অস্ত্রের সঙ্গে চুপা করে এবং সে কারণেই কোন কমিউনিষ্ট দলই ভারতে মাথা চাড়া দিতে পারবে না কোনও দিন, আর একথাও ওরাও জানে এবং তাই গণতন্ত্রের মুখোস পরে নির্বাচনকে ওরা মেনে নিয়েছে। ধীরে ধীরে সব কমিউনিষ্ট দলই ভারতে তাদের চেহারা পরিবর্তন এনেছে শুধু সাধারণকে প্রভাবিত করার তুষ্টিবুদ্ধিতে আর ক্ষমতা দখলের হীন প্রচেষ্টায়। ওরা জানে যে মুখে গণতন্ত্র আর অন্তরে বৈরতন্ত্র ভজনা করতে পারলেই আবেশের জন্মের পোয়া বার। কিন্তু ভারতীয় জনগণ ওদের মুখোস খুলে আসল চেহারা ইতিপূর্বেই দেখে ফেলেছে এইটাই ওদের চরম বিপদ। ওরা যে আসলে কিরূপ কনিবাজ ও মিথ্যাত্রয়ী তা ভোটের লিটাই বলে দেবে। ওরা জানে ভোটের আসল মার কোথার, আর তাই মোক্ষম মার মেরেছে ওরা ভোটার তালিকার কারসাজি করে। ছেনে স্তনে ঠাণ্ডা মাথায় ওরা দেশবাসীর মাথার যে প্রচণ্ড আঘাত করেছে কাল ভোটার তালিকা বা মিথ্যার ভরা তালিকা বানিয়ে ওরা নিজেরা ভালভাবেই জানে। ঐরূপ হীন চক্রান্ত ও বড়বুদ্ধি করাই কমিউনিষ্টদের কর্ম।

দেশের মানুষকে ওরা পদে পদে বোকাতে চায় যে ওরা দেশসেবক, কিন্তু আসলে যে ওরা দলসেবক ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর তা এখন বোধ হব সবাই ছেনে ও বুকে ফেলছে ওদের নীচতার, যড়যন্ত্র ও ক্ষমতালিপ্সয়। ভারতীয় কমিউনিষ্টরা বহু বছর ধরেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার মানসে কুটকৌশল ও বড়বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে দেশবাসীকে ধোঁকা দেবার হরেকরকম চেষ্টা চালিয়ে এসেছে এতাবংকাল, কিন্তু বারে বারে নিজেদের অতি-চালাকির জল্প ওরা নিজের চালে নিজেরাই মাং হয়েছে। ভারতবর্ষকে ঘিষণ্ডিত কোরতে চেয়েছিল ও শেষে করেছিল যে দুখাত মুসলীম লীগ, ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিধেবের বিদ্বৎ যোপন করে দাঙ্গা, হত্যা, নারীধর্ষণ, নারীহরণ, গৃহদাহ ও লুণ্ঠরাজ প্রভৃতি জঘন্য কাণ্ডাবলীর নায়ক যে মুসলীম লীগ, সেই মুসলিম লীগের বদ্ধ, সহায়ক, সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল তখন এই ভারতীয় কমিউনিষ্টরা যারা এখন সি. পি. এম. সি. পি. আই ও অন্যান্য ছোট ছোট বিভিন্ন নামের কমিউনিষ্ট দল সমষ্টি। সেই সময়ে মুসলীম লীগের দোসর ছিল কমিউনিষ্টরা আর ওরাই দেশ ভাঙ্গে মুসলীম লীগের মতবাদকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে দেশের মানুষের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কমিউনিষ্টদের ১৯৪২ সালের ইতিহাসও কলঙ্কিত অধ্যায় ঘোষণা করেছে ভারত ইতিহাসে, আশ্চর্য্য এবংপরও ওরা এদেশীয় মানুষের সমর্থন পায় কিভাবে? সত্যই ইহা বহুশঙ্কনক। অনেকেই বলেন যে, প্রতিটি কমিউনিষ্ট দলের সদন্ত মাসিক মাসোহারা পায়, কেউই বিনা পরিশ্রম ওদের সঙ্গে কাজ করে না, তা সে সর্বসময়ের লক্ষ্যই হোক বা আংশিক সময়ের লক্ষ্যই হোক। একথা যদি সত্য হয়, তবে বুঝতেই পারা

যায় যে কোন ক্ষমতের সংগঠনের ব্যক্তিদের নিজস্ব
মতামত ও ব্যক্তি স্বাধীন একেবারেই নেই। কমিউনিস্ট
হুই নলই এবারে একছোট হয়েছেন, তাদের আশা
কিছু কেন্দ্রীয় শক্তি নষ্টল করা, আর তাই ওরা আশা
ছিল। খেয়ে ইন্দিরার বিরুদ্ধে প্রচণ্ডে নেমেছে।
ওদের অভিযোগ ইন্দিরার বিরুদ্ধে একটাই, আর তা
হলো যে ইন্দিরা বৈরতন্ত্রী; কিন্তু সি. পি. আই
(নিকষ কুন্সীন কমিউনিস্ট পার্টি) ভো। তখন
পরমানন্দে ইন্দিরার ধ্বংস মাত্র পাঠকাও কখন কখন
বহন কোরে বেড়াচ্ছিল মনের খুসীতে ডগমগ হইবে,
যদিও তখন সি, পি, এম ইংল্যান্ডের বা বাদরের মত
লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তাদের খুসী
পিঠ বাঁচাতে।

আসামে যে বেলা চলছে ভোটার তালিকায়
যেজ্ঞাকৃত কারচুপির মাধ্যমে, সেই একই বেলা
চলছে পশ্চিমবঙ্গে, তখন শুধু কাল্পনা-কাল্পনে।
আসামে ও পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা স্বয়ং
নির্বাচন কমিশনার এস. এল. শাসনের মহাশয়কে
বা তাঁর অধীনস্থ যে কোন অফিসারকে (বাঁর
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোনরূপ স্বার্থ বা সংশ্লিষ্ট নেই)
নিজ উত্তরাধানে পুনরায় লিপিবদ্ধ করতে হবে
নির্বুলভাবে যাতে আর কোন অভিযোগ কোন
তরফ হুতই না ওঠে এবং যতরূপ তা না সম্পন্ন
করা সম্ভব হয় ততরূপ আসামে ও পশ্চিমবঙ্গে জাল
ভোটার তালিকার মাধ্যমে ভোট গ্রহণ কার্যকে
সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে তাতে যদি ওরা বা ওই
জালুঘারীর পরে ভোট গ্রহণ পর্ব চলে তাতেও
আসামের বা পশ্চিমবঙ্গের কারো আপত্তি থাকবে
না, যদি তারা সং ও নির্ভিক হন। পশ্চিমবঙ্গে
যে কারণে আসামের মত মজার বেলায় নৃত্যপাভ
তা আর কেউ না জানলেও প্রমোদ-জ্যোতিষাবু

বোধহয় জানেন, কারণ তাঁরা ভো। এখন সর্ব-
শক্তিমান। পশ্চিমবঙ্গে আগামী লোকসভা নির্বা-
চনকে অবাধ নিয়ন্ত্রণ ও হুত্ব করে তুলতে হলে
সরকারকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে প্রকৃত
সহযোগীতা করতে হবে এমনভাবে যাতে বিরোধী
পক্ষ সরকারের স্বমিচ্ছায় ওপর কোনরূপ সন্দেহ
পোষণ করতে না পারে এবং জনগণ যেন ভোটার
তালিকার কারচুপির ফলে কোন কারণেই নিজ
নিজ প্রকৃত ভোটাধিকার না হারায় কারো চক্রান্তে
সে শাসকদলই হোক বা অন্য কোন এক্সেসিই
হোক। সংবাদে প্রকাশ যে আসামের মতই প্রায়
আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপক ও বিরাট ভোটার
তালিকায় মারাত্মক ধরনের কারচুপি হয়েছে,
সরকারের গাফিলতির ফলে ও চরম বে-বানোবন্তের
কারণে। এই ইীন ও অন্তরে কাজ যে উদ্দেশ্যে
ও বাধা করেছে তারা তাবতেও পারেনি যে
নির্বাচনের পূর্বেই এই উদ্দেশ্যমূলক চক্রান্ত বহু
ক্ষেত্রে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবে ও সব কথা
কীস হয়ে যাবে ইন্দিরাকে হারাতে সি, পি, এম
কোমর বেঁধেছে তাই বলে ভোটার তালিকার পর্যাপ্ত
ইন্দিরা ভীতিতে এমন মারাত্মক গোজামিল কেওয়া
কি চলে যা লোক চক্ষে ধরা পড়ে শেষে। জনতা
কংগ্রেস, আর এস পি, কংগ্রেস (ই), এস ইউ সি
ও অন্যান্য বহু ছোট বড় নলই ভোটার তালিকার
কারচুপির অভিযোগ এনেছে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই
সত্য বলে জানা গেছে। কেবল সি পি আই
(দয়াদোষী ও গুরুত্ব অবস্থার সি পি এম-এর
দরজায় হাজির) ও সি পি এম এরূপ কোন
অভিযোগ করেনি। এর অর্থ কি এই নয় যে
ওয়াই ভোটার তালিকার কারচুপিতে সবচেয়ে বেশী
লাভবান হবে এবং তাই নীরব। আসামের উক্ত

নোংরাষির প্রতিবাদে জ্যোতিবাবু বেশ মূগুর কিত্ত
পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় যে বিয়টি ও ব্যাপক
কারচুপি করা হয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি চূপচাপ
কেন? যেখানে তার প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায়
সব ঠিক হয়ে যায় বা অচিরে ছায়াসন্নত ও সঠিক
হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে তাঁর মঙ্গল হস্ত একপ
অসাড় ও নিষ্পন্ন কেন! পশ্চিমবঙ্গের খেটে
খাওয়া মানুষের প্রাণ অধিকাংশই এই ভোটে
কারচুপি দেখে ত্রস্তিত ও বাকহারা। সর্বহারার
নেতারা এ ব্যাপারে সঠিক দায় ও দায়িত্ব পালনে
আজ অগ্রান্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে
পারছেন না কেন! কি তার আসল কারণ এদেশের
দিনমজুর, ক্ষেতমজুর, শ্রমিক কর্মচারী নিঃশব্দিত
বুদ্ধিজীবী মানুষের দল তা যদি জানতে চায় সেটা
কি তাদের অপরাধ না যারা নিজেদের ব্যক্তিগত

বা দলস্বার্থে উক্ত হীনতার ও দীনতার শিকারে
পরিণত হয়েছে তারা আসল অপরাধী? জ্যোতি-
বাবু ও প্রশাসন কি প্রকৃতপক্ষে এর সঠিক ওদন্ত
ও অভিকার করতে পারেন না? সময় অত্যন্ত
সংক্ষেপ, কাজেই যতশীঘ্র সম্ভব সঠিক ও ছায়াসন্নত
সাজা ভোটার তালিকা এখনই প্রণয়ন করার দায়-
দায়িত্ব সরকারের ও নির্বাচন কমিশনের। তাঁরা
উভয়ে এ বিষয়ে বহা শক্তি কার্য সমাপন করে
দেখবাসাক্ষে নিশ্চিত করতে পারবেন কি? যদি
না পারেন তবে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচন
কর্মসূচীকে পেছিয়ে দিতেই তবে কোনমতেই
জানুয়ারীতে তা করা সম্ভব হবে না তুলের ভিত্তিতে
একটা কর্তৃপক্ষ যেন দ্রুত রাখেন। অগ্রদূত
চরম হস্তান্তর ও নৈরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নিমজ্জিত হবে,
বা চরম লজ্জার ব্যাপার সকলের পক্ষে।

স্বাধীন দেশের বায়ু, অম্ল, অক্সিজেন ও শেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রসঙ্গ

আমেরিকা হতে স্বাধীনতা

আমেরিকায় যাতে ভেতর

মূল্য ৩.০০ এক ডলার

আমেরিকা হতে

স্বাধীনতা হতে

স্বাধীনতা হতে

নির্বাচন সমীক্ষা

॥ কলৌণ সরকার ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কমিউনিজম বিচারের প্রতিবন্ধক হল ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। কমিউনিষ্টরা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চিরায়ত আবেদনকে লম্বা করতে পারে না। জাতীয় সংস্কৃতি নির্মিত ও তাদের বৃদ্ধিতে গৌণ। অতীতে কমিউনিষ্টগণ কণ্টক পাকিস্থান দাবি সমর্থন, আশুত বিদ্রোহ ও আত্মীয় হিন্দু কোঁচের মুক্তি লক্ষ্যে বৈরিত্বের এক সাম্প্রতিক কালে রাহিমোদ-বিজ্ঞাপন-স্বীকৃতি প্রদানের মুক্তিভর প্রতীতি কাল এক ও অবিচ্ছিন্ন ভারতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদী নীতির নিষেধ। কমিউনিষ্টদের যুগে পণ্ডিতের বুদ্ধি বিকাশ ও পদার্থীয় লক্ষণ সমূহ।

অন্যদিক থেকে একই দৃষ্টান্তে রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃতি লাভ করেছে কিনা বলা কঠিন। অন্যদিক অস্বস্তি পড়িত হলগুলি নিম্নে এক হয়ে বিশেষ হয়ে নি। বিশেষ করে শ্রমজীবন দায় ও জীব দি.এক. তি গোষ্ঠীর সম্পর্কে লক্ষ্যের অবকাশ না থেকে পারে না। শ্রমজীবন প্রদানময়ী হবার উদ্দেশ্যে অন্যদিক আছেন, সে যোগে অস্বস্তি কোন ভাবে সেনে, তিনি অন্যদিক হাফতে যে বিবরণে করবেন না, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে? তখন অন্যদিক দলের অন্যদিক কি সত্যই হবে না?

একদম: বাবুজী ছিলেন শ্রমজীবন দায়ের একনিষ্ঠ সমর্থক, এবং তাঁর মতামতের নির্ভরশীল সমর্থক। জরুরী অবস্থা ঘোষণারও তিনি ছিলেন অস্বস্তি প্রদান পুষ্টপোষক। তারপর, ১৯৭৭ সালে হাওয়ার পতি বৃত্তে ৪৪% শ্রমজীবন সংগ্রহে হাওয়ার বিবরণী অন্যদিক হাওয়ার তুচ্ছ পড়লেন। বাবুজী অনেক পতীর

কালে বিচার করেন, তিনি একজন পাকা রাষ্ট্রনৈতিক। তাঁর ভোজন জাল কোষায় কত গোপন হয়ে বিস্তৃত তা যোগ্য পদ নয়।

এর পরই আসে শ্রমজীবন দায়ের গাভী ও সংগ্রহ (ই)র প্রসঙ্গ। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে যোগ্য বার, সংগ্রহ (ই) হচ্ছে এমন একদিকে সুসংগঠিত শ্রমজীবন দায়ের রাষ্ট্রনৈতিক হল। হলজীবী শ্রমজীবন দায়ের ও সংগ্রহ (ই) দায়ের ক্ষেত্রে একে অন্যদিক পরিপূরক। হল ও তার মেতার অন্যে এসে সম্পর্কে নির্দেশনা কার্যকর।

শ্রমজীবন দায়ের রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রদানময়ী দায়ের সবে যে হাওয়ার প্রদান ভোগে না। তাঁর বিবরণে একদিকে অস্বস্তি, তিনি বৈরিত্বী। হাওয়ার সেই সম্পর্কে কিছু আদোলা বরকার।

পুণ্য এক বছর হাওয়ার থাকতেও, ১৯৭৭ সালে লোকসভার নির্বাচন অস্বস্তি দায়ের করেছিলেন। জরুরী অবস্থা প্রদানে শিথিল এবং পরে প্রদানময়ী তিনি করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী জরুরী অবস্থা ঘোষণা সহ প্রদানময়ী শ্রমজীবন দায়ের প্রদানময়ী কাল ছিল যন্ত্র-পরিষদ ও লোকসভা কণ্টক পণ্ডিতিক বিবরণে অস্বস্তি। তাহলে তাঁকে বৈরিত্বী বলা বার কোন বিচারে?

অস্বস্তিক পদার্থ সাধারণত দায়ের দায়ের দায়ের নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাসূচক করে প্রদান যোগ্য উদ্ভূত সংস্কৃতি পণ্ডিতিক যোগ্যেবার কত যে জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজন হয়েছিল তাও দায়ের দায়ের বিচার করবে কে? রাষ্ট্রনৈতিক, প্রদানময়ী

এবং লোকসভা? না ইন্দিরা বিরাগী চক? সরকার
পরিবর্তনের পন্থাসম্বন্ধে গর্ব হল নির্বাচন।
১৯৭৭ সালের নির্বাচন তার দ্বীপ।

বৈরতঃসর অভিযোগ সম্পর্কে ইজরাইলের প্রাক্তন
প্রধান মন্ত্রী শিমতী গোল্ডা মেয়ার তাঁর বই 'মাই
লাইফ' একটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য
বিষয়ে তার উদ্ভৃতি প্রাসঙ্গিক।

“প্রধানমন্ত্রী ডেভিদ বেন-গুরিয়ানকে কেউ
অসংযমিত ভাবে বললে সত্য চালাবার কথা বললে
তিনি চটে যেতেন। একদিন বললে সত্যই বেন-
গুরিয়ানের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগে উপস্থাপিত হল,
তিনি হল ও ব্রি পরিষদের একজন সদস্য ও স্পষ্টতাবী
বলে পরিচিত সদস্য মিঃ শেরেখ নাকতালিকে
জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মিঃ নাকতালি, বলুন তো আমি
কি অসংযমিত পন্থায় বললে সত্য পরিচালনা করি?’
মিঃ নাকতালি একটু ভেবে নিজে প্রধান মন্ত্রীর
দিকে কিয়ে উৎসাহান্বিতভাবে বললেন, ‘না।
আপনার বিরুদ্ধে সে অভিযোগ আবার নেই। আমার
বা বলার জা হল, আপনি বললে সাধনে যে সিদ্ধান্ত
গ্রহণের প্রস্তাব রাখেন, বললে সংযমিত অস্বীকৃতি
চিহ্নে পূর্ণ পন্থাসম্বন্ধে তার অর্থহীন ভোট দেয়।”

শিমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্কে বড় জোর মিঃ
নাকতালির বক্তব্যটি প্রবৃত্ত হতে পারে। অসামান্য
ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সর্বত্র স্বীকৃত। শক্তিবানী বললে
পংক্তি ও প্রেরণার উৎস হল। যৌবন স্বেচ্ছের ব্যাঘা
অব্যাহত ও অসার। একের কাককে যেনের মায়ে
চালাবার প্রচার কোনমতে নাজ।

নির্বাচনে হরের তার পরাজয়ও আছে। পন্থাসম্বন্ধে
রাষ্ট্র ব্যবস্থার এ এক অপরিসীম ভাষাবিধান। মহাপ্রতাপ-
শালী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্লিসকেও বিজয়
বিধ হুত শেষে পরাজয় স্বরণ করতে হয়েছিল। চার্লিসের
রাষ্ট্রনীতি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কালের প্রধানতম
বেহু। নির্বাচনে মন্ত্রী কিরানী গর্ব কিন্তু মিঃ চার্লিসকে
সাম্রাজ্য কালের অভিযোগে আলাদা করে তোলেন মিঃ
পন্থাসম্বন্ধে রাষ্ট্র তারতে নির্বাচনে পরাজিত প্রধান মন্ত্রী

ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শাসনকাল বহু অসাধারণ কর্ম
সাক্ষ্যে সমৃদ্ধ, বেহুত কৌশল প্রতিযোগিতা পরাজয়
কর্মকাণ্ডের নিজস্ব হয়েছেন তার পৃষ্ঠাভিহীন যেনে না
ভাষাও। তারতবার্তার পক্ষেও এই নিশ্চয়ী কথ
সংবাদ্যবাহিনীকর।

চিকিৎসাপন্থার উপনির্বাচনে মন্ত্রী শিমতী গান্ধীকে
লোকসভার সভাপতির অধিকার থেকে বিচ্যুত করা
কি পন্থাসম্বন্ধে ছিল? চিকিৎসাপন্থার চেয়ে
নির্বাচন মন্ত্রীর প্রতিনির্বাচন মন্যৎ করার শিষ্টেই
বা কি বৃত্তি রাখা যায়?

পাছ কথিবনের একতরফা সুনামী ও টিকিরা-নিম্না
প্রচার অভিযান যে জন মানসে গাণ কাটতে পাবে
মিঃ শিমতী গান্ধীর রাজনৈতিক পুনরুদ্ধার তার প্রকৃষ্ট
প্রমাণ। সব শেষে, কঠোর ইন্দিরা সমালোচক
শ্রীচরণ মিঃ বরন প্রধানমন্ত্রীর লাভের প্রয়োজনে
শিমতী ইন্দিরার স্মরণ হলেন, তখন সবাই বুঝল যে,
শিমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি নিছক
রাজনৈতিক উদ্বেগ-প্রেরণিত ব্যাপার ছাড়া আর
কিছুই নয়।

শিমতী গান্ধীর বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা
এবং সাংগঠন শক্তিই বস্তুতঃ ইন্দিরা বিরাগীদের তীক্ষ্ণ
কারণ। তাঁর বিরুদ্ধে বৈরতঃসর ও সংসদসম্মুখ
বৈর-সাপক বহুই অভিযোগ এই তীক্ষ্ণ পরোক্ষ
অভিযুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বসন্ত বৈরাগীর মুখ দিয়ে
যেলেছিলেন, ‘হাতা হলোই রাজ্যপানে বসে, রাজ্যপানে
বসলেই হাতা হয় না।’ বিধকথির বানীটি একেবারে
স্বলীয়।

দ্বিতী গুরের সত্যই হলো ইন্দিরার জীবন কখনো
আলসা বিলাসে কাটে নি। ছোট ফোলা মাতৃবীর
এক পিতার সামিধ্য-যুক্তি ইন্দিরার চরিত্রে যে
আত্মনির্ভরতা, সাহস ও নিঃসঙ্গ পতীর দৃঢ়তা পড়ে
উঠেছিল, আজও তাঁর প্রকৃতিতে তা গহন জায়গা।

জন জীবন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে নিখুঁত
অন্তর্দৃষ্টি এবং পাণ্ডিত্য মন্ত্রীর চূড়ান্ত পক্ষে আশ্রিত
(বাকী অংশ ১২ পাতায়)

অসম্মাপিকা উপসংহার

॥ ত্রিফল চন্দ্র বার ॥

(পূৰ্ণ প্রকাশিতের পর)

অধিদ সত্যাপ্রের অভিজ্ঞতা লইয়া বোম্বদ্বাণ করমর্দা গাভী ভারতবর্ষে আসিয়া বোম্বা কোর্সে করিতেছিলেন। আফ্রিকা হাঙ্গ কালে তিনি প্রবাসী জাকতীঃপণের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বিলাতের নেতাদের দিকট তিনি তাঁহার অধিদ সংগ্রাম পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তাঁহার লোৎসাহে তাঁহার পরিকল্পনা অস্ত্রমোহন করেন। গাভীজী হিন্দু নেতাদেরও ঘন ঘূৰিণা ছিলেন।

স্বকর্তাঃ সমন দীতিঃ বিজ্ঞেঃ পণ্ডায়মান হইয়া গাভীজী সত্যাপ্রের আওত করিতে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। আলিমানতঃলাভাঙ্গ হত্যাকাণ্ড ঘটয়া যাওয়ায় আলিমান তঃলাভাঙ্গ লইয়া তাঁহাকে দ্বাভ হইতে হইয়াছিল, সত্যাপ্রের কার্যকর লইয়া অঙ্গের হইতে পায়ের নাই। বিলাকত তাঁহাকে আবার দে হুগো আমিয়া দিল।

তিলক পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের সহিত বোসলেব কীপের আপোষ হইয়াছিল ভারত শাসন পক্ষ্যের একাধে। হিন্দু ও বোসলেব নেতাদের বিলিত প্রভাব বৃত্তীঃ পরকারের সর্বণের ভারত-শাসন-সংগ্রাম আইনে স্থান পায় নাই।

কংগ্রেস অন্ততঃলর অবিবেকনে ভারত শাসন-সংগ্রাম-দ্বন্দ্বক পরকারী আইনকে পর্তাবীনে গ্রহণ করিতে লোকহস্ত পরাধণ সেন। কংগ্রেসে লোকহস্তে-ই প্রভাব বৃত্তীঃ হইয়াছিল। গাভীজীও এই প্রভাব মানিয়া লইয়াছিলেন।

বিলাকত নেতা ও হিন্দু নেতাদের অনেকের ঘন জামিয়া গাভীজী কংগ্রেসকেও সত্যাপ্রের পক্ষে সমতে আনিতে প্রাণী হইকেন। এ লকত কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অবিবেকন হইল। বহু বিলাকত-

মুসলমান প্রতিনিধি হইয়া কলিকাতা অবিবেকনে বোসদ্বাণ করিয়াছিলেন। খীঃ ব্যক্তিঃ ও তাঁহাদের সমর্থনের কোরে গাভীজীঃ সত্যাপ্রের-অতিঃস অসংখ্যা পের আকারে কলিকাতার বিশেষ অধিপেনে শাস হইয়া গেল।

নাগপুরের সাধারণ অধিপেনে আন্তর্জাতিকভাবে ইং অস্ত্রমোহিত হইলে গাভী পরিচালিত কংগ্রেস নেতৃব্রে শাখা ভারতে লক হইয়া বেন লংকঃবের সহিত অসংখ্যগিতার ত্রিধারঃ আংকঃলর এবং বিলাতী পণ্য বকন।

আবেগমকর্তী এবং বৈধ অংকঃলর-সর্বঃ কংগ্রেসকে গাভীজী সাংগঃনের কংগ্রেসে কংগ্রেসিত করিয়া পন আংকঃলরঃ শ্রেষ আনিলেন।

লোকহস্ত-তিলকের দ্বাখ্য তঃ হইয়াছিল; এলক তাঁহার সূত্রাও ঘট। ইহারে কংগ্রেসকে তিলক প্রভাব লক করিয়া খীঃ নেতৃব্রে আনয়ন তঃ গাভীজীঃ পক্ষে লং হইয়াছিল।

কংগ্রেসের ইতিহাস বাহিত মূল দৃষ্টিকঃর গুণমত পরিবর্তন না ঘটিলেও বহিঃঃ পরিবর্তন আসিয়া গেল গাভীজীঃ ও বিলাকতের প্রভাবে।

গাভীজীঃ বহিঃঃ করিয়াছিলেন বিলাকতের পক্ষ লইয়া ভারতীয় মুসলমান সমাজের পাশে হাঁতাইলে হিন্দু-মুসলীঃ সমতার সমাধান হইয়া দাঁটবে।

আপাতঃঃ এবং বহিঃঃ দৃষ্টে এ সমতার সমাধান হইয়াছিল; কিন্তু কাথঃঃ তিঃই হয় নাই।

জাতীয়তার নেতা যঃসঃ আনি জিয়া কংগ্রেস ভাগ করিয়া মুসলীঃ সাম্প্রদায়িকতার পক্ষ অংগঃন করিয়াছিলেন কংগ্রেস তৎকৃত তিলক-নীতি পরিহারের পর। অংক এক লঃহার জিয়া সাংগঃবের মধ্যে এ

পরিবর্তন আসে নাই। আসিতে সময় লাগিয়া ছিল। ১৯২৭-২৮ জাহার যথো যে পরিবর্তনের প্রসঙ্গ হইতাহি তাহার পূর্ণতাখন বটে ১৯৪৭-এ।

জিয়া প্রথম একক অবস্থা পরীক্ষণ করিলেন: মুসলমান সমাজ বিলাকতের প্রত্যয়-বৃত্ত হইল; মুসলমান বুদ্ধিবীক্ষণের যথো নানা উপদল স্বেচ্ছা ছিল। জিয়া সাহেব বীরে বীরে মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃদ্ধমান হলাহি স্তম্ভ করিলেন। পরম্পরের সহিত ব্যাধান নেতাকে এক দ্বন্দ্ব আনিগেল; অল্পসে জাহার বহু এক একে প্রত্যেকটী মুসলমান বহু তাহিরা গেল; মোসলেম লীগেও তামন খরিয়াছিল। দক্ষতার সহিত লীগের তামন রোষ করিগা মোসলেম লীগকে তিনি ভারতীয় মোসলেম সমাজের পক্ষিনালী মুখপাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তেজের আইন সভার সমতদন কলানি তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, বিলাতের সমতদনলী নেতাদের সঙ্গে তিনি গুচ্ছতার সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় মুসলীম হাজত, বনিক ও বণিকের সঙ্গে জাহার সম্পর্ক ভাল ছিল। সুবিধার্ত্ত বিধি ইসলামকে কাজে লাগাইবার পুরো তিনি পাইয়াছিলেন।

মুসলমান সমাজের মুখপাত্র হইলেও ভারতবর্ষীয় এক জাতীয়তা বাহ সমাজে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। জাতীয়তাবাদী যে দল নেতাকে তিনি ভালভাবে চিনিতেম করেবাহার জাহারের সহিত মিলিত হইয়া তিনি জাতীয় সমন্য সমাজানের দ্বন্দ্ব এবং ভারতে ব্রহ্মণ কল্পকের দৃষ্টান হইয়াছিলেন।

১৯৩৬ এর নির্বাচনের পর কংগ্রেস বহন মুসলীম লীগকে মুসলমান সমাজের একমাত্র মুখপাত্র বলিয়া মানিয়া লইতে, প্রবেশে প্রবেশে শাপন সমতার অনিষ্ঠিত হইয়া কংগ্রেস বহন মোসলেম লীগের সঙ্গে সমতা তাগাতাপি করিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন, বহনম আলি জিয়ার পরিচালনার মোসলেম লীগ তখন লীগের ভারতবর্ষীয় একজাতীয়তাবাহ দ্বন্দ্বন করিগা ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের দ্বন্দ্ব পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান

(৮ পাতার পরে আগ)

অন্তবেশ যোগ থেকে যে মানবতাবোধ আসে শ্রীমতী সত্যীকে করেছে তাই অনুপ্রাণিত বেশনেন।

শ্রীমতী ইমিগা সত্যী বহন বলেন, বর্তমানে তিনি ও তাঁর দল কংগ্রেস(ই) শুধু পারে ভারী কেন্দ্রীয় সরকার দ্বন্দ্বতে, তখন তিনি অতিভাব যেন না।

শ্রীমতী দিও বলেন, তিনি কংগ্রেস বহু অল্পসে সেই দ্বন্দ্ব তিনি পরীক্ষণে কল্পকরহী এবং শ্রীমতীক বহু মনে করেন তিনিই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরীক্ষণ উপস্থিত। দুই প্রাধান্যে আতি ভিত্তিক হাবি একাত্তি হালাত। মুহীমকাল যে উচ্চমানের জীবনযাত্রা এগা অভ্যাস তাতে দুই অতীতের অদ্ব্যবৃতি এঁদের মনে রাখার কথা নয়। দৌতম বৃত্ত, সম্রাট অলোক থেকে বিবেকানন্দ ও গান্ধীজী এবং দ্বিৎকন, উইলবারফোর্ড থেকে তলতর ও লেনিন, মানব বহুদীপন, অভিজাত সমাজ ছিলেন। সত্যীকায় বীনবন্ধুহাওয়া আগের অগোচরে তাঁরা কোন কাজে পারেন নাহুৎক মন। চোখের সামনে তো রয়েছেন কলনার প্রতীক মানব টেরেসা। কোন দেশের বা কোন আন্তের হালাহ তিনি।

এবার নির্বাচনে আতি, সম্রাট ও বহু নিয়ে যে বহুপের প্রচার শুক হয়েছিল তাতে জাতীয় সংহতির শুকতর অন্তিমায়নের সমাজনা যেকা বিরোধিল। মনে হয়েছিল, বিদগ্ধ জিগ বহরের পণ্ডাত্তিক অভিজাত ও শিকা সবই বৃত্তি বুঝা হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কলিমনারে বিচার বিবেচনা বিপদের আগন্তুক হুৎ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। নির্বাচন কলিমনার প্রতিক্রিয়া প্রাণী ও বলের শুক যে আন্তঃপরিধি যোগা করেছেন তাতে ধর্ম সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ এবং ব্যক্তিগত মুখ্য-ভিত্তিক নির্বাচনী প্রচার বিধিত হয়েছ।

লোকসভা নির্বাচনে সম্রাট, বর্ণ ও জাতিভিত্তিক হলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার-পরিধায় লক্ষ্যকর হালাহ
— — — — — (চলবে)

অসহযোগ আন্দোলন অহিংস বলে নই, সমুদ্র ঘরের মত অসুস্তের সহিত গরলও উঠিয়াছিল।

কংগ্রেসের সভাপতি অসহযোগনীতি পরিবর্তনের দাবী ক্ষুদ্র পত্রিতে প্রকাশ হইতে থাকে। এই আন্দোলনের পুরোচারণে ছিলেন সেনাবহু চিত্তবর্তন শাস ও পত্রিত-মতিলাল নেত্রক। গান্ধীজীও এই আন্দোলন স্বীকার করিয়া দ্বিহাতে উঠিয়াছিলেন। কংগ্রেস আইন সভায় প্রবেশ করিলেন। এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চাহিলে সহযোগিতা পটনের তিলকেও এই নীতির বিবেকে অগ্রসর হইলেন। মানা বাধা-বিশিষ্ট। মধ্য বিদ্যা গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অসদাধিত এই নীতি পুনর্বার লাপ হইল ভারতবর্ষ বিভাগে এবং প্রবাসী ভারতবর্ষে বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্তিতে।

বিলাকত আন্দোলনের পক্ষিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিম ধর্ম লালিয়া যায়। বিলাকতী নেত্রকের সর্বজন করিয়া বিলাকত আন্দোলনের পক্ষিত্ব তুচ্ছ করিয়া গান্ধীজী হিন্দু মুসলিম সমস্যার দ্বারা সমাধান খুঁজিয়া ছিলেন, তাহা বার্ষিক পঞ্চাবলিত হই কংগ্রেসের সম্মেলন কর্তৃপক্ষের মধ্য বিদ্যা এবং সমগ্র আলি জিন্নার প্রতী সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়া গান্ধীজীও কংগ্রেসের হস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজিয়াছিলেন।

অসহযোগ ভারতবর্ষে শাস্ত করিয়াও প্রতিপ্রাণে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে দায়িত্ব সাচেৎবে নৈকুণ্ণে একটা কমিশন প্রেরণ করিয়া ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, কমিশন সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়া, বিভিন্ন নেতা-বল্লের প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করিয়া বৃটিশ সরকারের অসহযোগ শাসন সংস্কারের একটা প্রণালী রচনা করিবেন।

কমিশনে এবং কমিশনের প্রণালীতে ভারতবর্ষের নেতাদের অধিকাংশের আগতি ছিল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের নেতাপক্ষকে আলোচনা জানান সর্বজনপ্রিয়। ভারতবর্ষের সংবিধান একটি বসন্ত রচনার ক্ষণ।

কংগ্রেস উত্তরী হইয়া সর্বজন সম্মেলনের আয়োজন

করেন। মহম্মদ আলি জিন্না মুসলমানদের পক্ষ ১৪ নম্বর এক দাবী উপস্থাপন করিয়া সম্মেলন সকল হইতে নিষেধ না।

অবশী তিলকেও পরিভ্রমণের সর্বজন সম্মেলন মুসলমান নেতাদের সঙ্গে আপোষে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গান্ধীজীও পরিভ্রমণের কংগ্রেস ব্যর্থ-কাম হইলেন।

কংগ্রেস পুনরায় অসহযোগ আইন অসহযোগ আন্দোলনের পথ ধরিলেন। বলাকটের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করিলেন। ভারতবর্ষের শাসন সংস্কার সমস্যার উদ্দেশ্যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের পোলটেবিল বৈঠকের প্রথম সভায় কংগ্রেস যোগদান করেন হিন্দু মুসলিম সমস্যার যেখানে তিনি অসিদ্ধ হইয়া প্রত্যাহার করিলেন। মহম্মদ আলি জিন্নার সাহায্য ভিক্ষা করিয়াও তিনি তাঁহাকে টেনাটতে পারেন না। বিলাকত হইয়া যথেষ্ট প্রত্যাহার করিয়াই কংগ্রেসের আন্দোলন ও ভারত সরকারের বেড়ালালে তিনি পড়িয়া গেলেন।

আন্দোলন বার্ষ হইল; কংগ্রেসের আদায়ের আদায় আইন সভায় প্রবেশের দাবী উঠিল। কয়েকটি প্রদেশে সংস্কারগতির হইয়া কংগ্রেস মহাত্ম প্রদর্শন করিলেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের যৌথিক প্রতিষ্ঠিত-ভিত্তিতে।

বিভিন্ন বিষয়ে আলিয়া গেল; বৃটিশ সরকারের ইচ্ছিতে ভারত সরকারে পক্ষপত্তির বিবেকে হুঁচ খোলা করিলেন মিহনকি পক্ষত্ব হইয়া। ভারতবর্ষের প্রতি-নিধিপনের এ ব্যাপারে কোন মহাত্ম লগ্নাৎ চেষ্টা হয় নাট উৎসাহী ভারত সরকারের পক্ষ হইতে।

প্রতিবার কংগ্রেস প্রাথমিক সভায় ত্যাগ করিয়া নূতন আকারে অসহযোগীতার পথ ধরিলেন; ব্যক্তিগত সভাপ্রদর্শন সঙ্গঠন করিয়া গান্ধীজী কংগ্রেস পক্ষ হুঁচ খোলা প্রচার কার্য চালাইলেন সমগ্র ভারতবর্ষে। অবশী প্রথম মহাপ্রদর্শন সমগ্র গান্ধীজী এবং কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের পক্ষ প্রচার কার্য চালাইয়া হুঁচাফের

সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিয়া গেলেন। ব্রীটিশ সরকারের
শব্দ হইতে দূত আগিলেন। ভারতবর্ষগণের সহিত
আগোষণ কর্তা। রাশিয়া এই ন্যা। ভারতবর্ষের
ভাগ্য বহাই হইত, ব্রীটিশ সরকারকে ভারত
ছাড়িত। ব্রীটিশে আগিলেন। কংগ্রেস অগণ
আগত প্রচার করিয়া লক্ষ্য করিয়া। ব্যাপকতন প্রসিদ্ধিতে
গণ আগোষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

গণভৌকী গ্রন্থ কাংগ্রেস নেতাবিগকে আন্দোলন সংগঠনের হযোগ না মিথ্যে ভারত সরকার ক্ষমতার সহিত বন্ধনভাবে লাগিয়া গেলেন, দেশে আন্দোলনও হইল বহুপূর্ব, হিংসা অহিংসার ভেদেবো ছিল না ; বিশ্ববী বামনবী কহী ও নেতাগণ আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে বৈব্রোহী বাধীন সংকারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রমত্ততঃ বংগের ভারতবর্ষীয় বিদ্রোহগণের প্রবেশের সিদ্ধাপুর বৃগ্ণে অশান্তিত ভারতীয় জৌর প্রথম লিপাপুরকে করেকবিনের ভক্ত বৃত্তীল শাসনমুক্ত করিয়াছিলেন ; চট্টগ্রামের বিদ্রোহগণের দৌখে ১৯৩০ এপ্রিলে চট্টগ্রাম ও করেকবিনের ভক্ত শাসনমুক্ত হইয়াছিল। এই দাবা দ্বিরাষ্ট্র বাঃলা এংং মতাগোষ্টে সমাভালা পরোহ স্থাপন করিয়াছিলেন ওংগ্রেস বৃক্ক বিদ্রোহগণ।

চীহত সৰকাৰ পাঠেৰে নথ হ'তে বাহাৰ চুল
পৰ্য্যন্ত সম্বন্ধেৰ অক্স প্ৰকৃত কটোৱাছিলে। স্বৰ্গপতি
তাহাৰা প্ৰেয়াণ কৰিলে। আৰ্থোলন ইমেনেৰ কক্স
চৰম নিৰুপ্তাৰ সহিত তাহাৰা এ আৰ্থোলন ইমেন
কৰিয়াছিলে। নিপাহী অক্সাৰান ইমেনেৰ কক্স
তৎকালীন ইংৰাজ পৰকাৰৰে নিৰুপ্ত বস প্ৰেয়াণ
কৰিয়াছিলে, ৪২ এৰ আৰ্থোলন ইমেনেৰ উচ্চত,
একক বৃত্তি বস প্ৰেয়াণ তাহাৰাই সহিত চুল-শীৰ,
আৰ্থোলন বাৰ্থ হইল। পাতীতী অক্সেদ পকে তাৰত
সৰকাৰেৰ সহিত পৰযোগিতাৰ প্ৰেয়াণ কৰিলে। বৃত্তি
সৰকাৰ পাতীতীৰ প্ৰত্যয় প্ৰেয়া কৰিলে বা।

বিশাখা পান্ডীতী জিয়া গায়েবের লাতায়া লটকা।

ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ସହଯୋଗ ସମାବେଶ କ'ଣେ ଲାଗେଇ ନାହିଁ ।

কংগ্রেস যখন বে-আইনী এবং গাছীজী ধরন কলে
রুশ প্রথম যাত্রী (তৎকালীন) প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
অগ্রগতি তত্ত্বাবধায় নিতিম সম্প্রদায় ও স্বার্থের মধ্যে
আইন সভার আশ্রয় গুলিও বটনাস্থ এক বোম্বার
যেন । সুন্দরান সম্প্রদায়কে অগ্রগতি বৈধি আশ্রয়
লেখ্যে হইয়াছিল ; সুন্দরান সমাজে হুষ্টিও কারণ
ঘটিয়াছিল । কোন পক্ষেই অসন্তোষ ঘটাইতে না
চাহিয়া কংগ্রেস নেতাদের মনোজ্ঞ হইয়াছিল না-এখন
না বহুনের তিন্ত রুশ প্রথম যাত্রী সুন্দরান
সমাজকে হুষ্টি করিবার চেষ্টাতেই কাজ চলি নাই
হিন্দু শুশ্রূষালীগণকেও সাধারণ ভাবে হিন্দু সমাজ
হইতে পৃথক করিতে চাহিয়াছিলেন আসে যেমন করা
হইয়াছিল পিছনের বোম্ব । গাছীজী পূ-এ ভেদে
হকী ভিন্দে ; রুশ সহকারে এই অগ্রগতির
বিকল্পে তিনি প্রতিবাদ করেন এবং গোয়েন্দাদের
সংশোধন বাধী করিয়া অনুশয় আন্তর করেন ।
বহুসমাজ, বাসিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আবেদন
পর্ষায় সর্বত্রই হিন্দু নেতার চোয় সর্বজনগ্রাহ্য
এক প্রকারে উপনীত হইয়া লক্ষ্য হইয়াছিল হিন্দু
নেতাদের পক্ষে । ম্যাগডোনাও গোয়েন্দার সংশোধিত
হয় । হিন্দু সমাজ হইতে অসন্তোষের অভ্যাস
দ্রুতভূত করার উদ্দেশ্যে গাছীজী কলে হইতে আরম্ভ
করেন হিন্দুর আবেদন । যথেষ্ট আলি দ্বিতীয়
হাঃহিম কংগ্রেস-সমাজ ও জাতীয়তাবাদী ছিলেন
তত্ক্ষণ তিনি রুশ তত্ত্বাবধায় প্রগে হইটি পক্ষ
কেনিয়াছিলেন ; রুশ ও ভারতবর্ষীয় কংগ্রেস ।

କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଛାଡ଼ିବା ତିନି ଦିନୁ ମହାତ୍ମା
ଜାତୀୟତା ବାବୁ ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକାନ୍ତ କରିବା ଚିନ୍ତିତ
କରିବେ ଆସନ୍ତ କଲେ, ଗୁପ୍ତ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି
ଦିନୁ ଡାକିବା ଯେବା ତିନି ଦିନୁ ମହାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କ
ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ମହାତ୍ମା ବାବୁ ଦିନୁ, ମହାତ୍ମା ଓ
ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଏକାନ୍ତ କରିବା, ଦିନୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି
ମହାତ୍ମା ଜାତୀୟତାବାଦ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମତ ଛାଡ଼ି ଦାୟିତ୍ବ

পয়ালী হইলেন। জাতীয়সঙ্গীতী মূলমন্ত্রমণ্ডকে
বিশ্ব মূলমন্ত্র বলিয়া চিহ্নিত করিয়া তিনি মোগলেশ
লীপের হিন্দু মন্ডানে বাতির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে
লাবী করিলেন বৃষ্টিগ ভাবভীত প্রের বৃষ্টিগ ও
সংগ্রেস্ট হ্রদিত ব্র, তৃতীয় পক্ষও আছে, যে তৃতীয়
পক্ষ মূলমন্ত্র নীল।

কংগ্রেস প্রাথমিক মন্ত্রীসভার বার্ষিক জালিলেন,
মোগলেশ উদ্ভাষন করিলেন মুক্তি দিলেন।

কংগ্রেস বৃষ্টিগ সরকারের বৃদ্ধোত্তরে মোগলেশী
চট্টলেন না, সক্রিয় অনবদ্যোপিতার পক্ষ লাইলেন;
মোগলেশ টকার পৃথক সুযোগ গ্রহণ করিয়া সংগ্রেসের
শক্তি বৃদ্ধি করিলেন।

মহাত্মা গান্ধী বদন বৃষ্টিগ সরকারকে ভারত
জাতিরা চলিয়া বাইতে আহ্বান কামাইলেন, মহাত্মা
বাক করিয়া কার্যে আহ্বান বলিলেন লীল এখন
সংগমে অবতীর্ণ হইবেন, যে সংগার কংগ্রেস বা
বৃষ্টিগ সরকার প্রত্যক্ষ করেন নাই।

বাসবিহারী বহুর ইতিহাস লীল বক্ষিণ পূর্ব
এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়গণকে স্বাধীনতা সংগ্রেসের
জ্ঞান সংগঠিত করিয়া ছিলেন। ভারতীয় বিশ্ববৃদ্ধের সুযোগ
গ্রহণে তিনি বহু পরিকল্পনা হইয়াছিলেন। কামাই
বৃত্ত ভারতীয় সেনাপ্রণের সংগঠন ভারত প্রধান সক্রিয়
হইয়াছিল। ইউরোপ হইতে আকাশ হিন্দু বাসি
লইয়া ভারত অভিবাসনে যে পরিকল্পনা প্রস্তাবিত
বহু করিয়াছিলেন তাহা বার্ষ হইয়া বাইলেন হুভার
চল আপানে আসেন। প্রথমে বিদ্যাবী মনোভাবকে
আজাহ হিন্দু কোল সংগঠন করিয়াছিলেন, যে উত্তরা
লীল সময় বক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংগঠন করিয়াছিলেন
ভারত নেতৃত্ব তিনি হুভারপ্রের হস্তে অর্পণ করেন
কবে বহু তাঁহাকে বাসন্ত কামাই নেতাজী বলিয়া।
হুভার চল ইতিহাস লীপের নেতা ও আজাহ হিন্দু
কোলের সর্বাধিনায়ক হইয়া তাপবিহারী বহুর
সহযোগিতায় আপানী সরকারের সহিত সন্ধিবদ্ধ হন;
তাঁহার পরিচালিত সরকার হইল আজাহ হিন্দু

সরকার। আজাহাম হইল এই সরকারের কত্থাবীন
কেন্দ্র; আপান সরে অস্ত্রাভ কথেকটি সরকারে কত্থক
এই সরকারী বীকৃতি লাভ করিলেন। নেতাজী হুভার
চলের পরিচালনায় এই সরকার বিলী অভিবাসন
করিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়ে বিদ্যাবী সরকার প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছিল সে সরকারের নায়ক নির্গাচিত হইয়াছিলেন বালা
মহেন্দ্র প্রতাপ। এ সরকার অস্ত্রাভ সরকারের বীকৃতি
ও সচিবানীতা পাণ্ডার চোটা করিয়া ছিলেন, পান নাই।
এ সরকারের আচরণে কোন ত্রুত ভিলনা, সংগার প্রচেষ্টার
পূর্ববর্তী সরকারে পরবর্তী আজাহ হিন্দু সরকারের মত
লাক্সা লাগে সময় হইতে পাইলেন নাই।

আসন্ন হিমালয় ভারতবর্ষে ভেদ্যকী হুভারপ্রের বহু
পরিচালিত আজাহ হিন্দু সরকারের কথা আশির্বাদিয়াছিল,
কিন্তু আজাহ হিন্দু কোল শৌচহীয়াছিল বসিপুরের উম্মুল
পর্বাৎ। এত এ বাসিন্দীর কথকতাও শেষ হইয়া বাক জাপ
সরকারের আশ্রয়মর্পরের সঙ্গে সঙ্গে। বৃদ্ধ শ্রেণে আজাহ
হিন্দু কোল ও নেতাজী হুভারপ্রের বহুর কাহিনী, কাহি,
বহু, মঙ্গলার নিবিলশে ভারতবর্ষীয় সুগণের মন মাক্টয়া
হুজিয়াছিল। কংগ্রেস ও মূলমন্ত্র লীপের কর্মীগণ, বেধানে
ভারতীয় কর্মানিই মঙ্গের শক্তি ছিল, সেখানে কর্মানিই
কর্মীগণ আজাহ হিন্দু কোলের বক্ষীবেগ মুক্তির লাতীতে
সমবেগ চইয়া পথে প্রাখিয়া গেলেন।

বৃষ্টিগ সরকারের বার্ষ পক্ষ দেখিরা মহাত্মা কামাই
আজাহের সরকার টোকা মারিয়াছিলেন, কার্যে আজাহ
মঙ্গের বহুজা মুলিয়াছিলেন কিন্তু মনের বহুজা বেধেন
নাই।

একদে বৃষ্টিগ সরকারের বহুজা ও পান্ডীকী খোলা
দেখিলেন।

ভারতীয় নৌ বাসিন্দীতে ভারতবর্ষীয় নৌ কর্মীকে
বহুশি হুভার আজাহ অভিবাসন ছিল, বর্ষ বিধে ছিল
এখানে প্রবল আজাহে। আজাহ হিন্দু কোলের হাওয়া
ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক মৈনিক বিভাগে আশির্বাদিয়াছিল।
কিন্তু সংগার বিদ্যাবী ওপ্ত কর্মীও ভারতীয় কোল ছিলেন



ভারতীয় নৌবাহিনীতে তাঁহারে সংখ্যা ছিল অনেকতর
বেকী।

নৌ বাহিনী বিস্তার করে, অগ্রগত—বাণিজ্য ভারতীয়
কৌশলও বাহায্য মানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারে
অসংখ্য ছিল জাহাজ নেতারা। যম সাধারণ তাঁহারে
সাধারণ্যে আগাইয়া আসে। জনসাধারণ তাঁহারে
জ্ঞান সহ্য হুতু সি প্রশংসা করিলেন; কিন্তু
জাতীয় নেতারা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা
সরকারে প্রবেশ করিয়াই নৌবাহিনীকে অস্বাভাবিকতার
মিনা করিলেন। উক্তসময় সামরিক কর্মচারীগণের নিকট
তাঁহার প্রস্তুত আত্মসমর্পণ করিতে নিষেধ ছিলেন।
জাতীয় বাহিনীগণের প্রবলতা, অক্ষমতা, নেতৃত্বের
অভাব হিবানোকে মত সকলের নিকট স্পষ্ট হইল।
বিস্তারী সেনা ছিল, জনসাধারণের সমর্থন ছিল—ছিল না
দুরদৃষ্টি-সম্পন্নবোধ্য, পক্ষিপক্ষী নেতৃত্ব। বিস্তারিত বাহ্য
গেল।

সাম্রাজ্যিক ইংরাজ অগ্রসর করিয়াছিলেন ভারতীয়
কৌশল উপর নির্ভর করিয়া আর ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা
করা চলিবে না। ভারতবর্ষীয় নেতাদের সঙ্গে আশেপাশ
করিয়া মানে মানে করে ফেরার কার্যক্রম গ্রহণ করিলেন।
কংগ্রেস-এ লীগ যেন বিভাগে ঢাকী হইলেন, ইংরাজ
যেন ভাগ পরিয়া ইংরাজের ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া 'ভল
ক্রিটানিরা, কলিও কয়েড' গাতিতে গাতিতে ইউনিয়ন অ্যাঙ্ক
উড়াইয়া গল্পে চলিয়া গেল।

রক্তপাতের ভয়ে আদি কংগ্রেস যেন বিভাগে সম্মত
হইয়াছিলেন। কিন্তু পাক-ভারতে হিন্দু, শিখ, মুসলমানের
রক্তের নদী বহিয়া বিগড়িল; ভারতবর্ষের হিন্দু, শিখ,
মুসলমান প্রমাণ করিয়াছিলেন তাঁহার পত্তনও অবন,
মহত্ব পদবাচ্য নয়।

যেন ভাগ হইল, কংগ্রেস ও লীগ ভাগ হইল, কিন্তু
সমতা বিচ্ছিন্ন না।

যেন ভাগ হইল, গাছী কিন্তু এক জাতীয়তার দাবী
হাঙ্কিলেন না; হই রাষ্ট্র হইলেও কুপালের, ইতিহাসের
ভারতবর্ষ তো দায় দায়ী। কংগ্রেস-এ লীগের কথ,

মুসলমান ও অমুসলমান হিন্দু হুতু, পাণ্ডিত্য ও ভারতের
কথ কানীও চট্টা জাতি লগ্নে উপনীত হইল। বঙ্গের
দুহিতে না দুহিতে ভারতবর্ষে যথেষ্ট দাবী হিন্দু বাছী
আততায়ীর বলিলে প্রাণ ভাগ করিলেন, পাণ্ডিত্য
রাষ্ট্রের কাংখে আকম হতবল আলি জিন্না পাকিস্তানের
অন্তঃকারি ভাগ্যপাতালে হুঁড়োঁয়ে বহে। যেন নিম্নান
ভাগ করিলেন।

আগে হিন্দু মুসলমান দাবী হইত: অস্ত্রের পাণ্ড-
হুতু হইল। পাকিস্তানে অমুসলমানের স্থান প্রায় চূর্ণ
না; তথাপি এক পাকিস্তান এক বাঙালি না, দুই হইল
আগে ভারতে অমুসলমান মদনাবী আদিত পাকিস্তান
হইতে: পাকিস্তান 'যথা' বিতরিত হওয়ার প্রাক্কালে
ভারতে মুসলমান শরণার্থী দেখিতে হইল। পাকিস্তান
বাঙালি যাত্রা চলিল, সেটিও দুই দিক হইতে বিচ্ছিন্নতার
দাবী সম্মুখীন উল্লেখ। পাকিস্তানের প্রত্যেক ব্যাঘ্র
লইয়া লীগ নেতাদের প্রথম হইতে বহুতর ঘোষণা করিতে।
বাংলায় ও কথ-মুসলমান অসামান্যের মত মহত্ব
আলি জিন্না ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটিমাত্র
পাকিস্তান রাষ্ট্র সংগঠন করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার
কীংকালেই পাকিস্তানে একাধিক জাতীয়তার তিনি
প্রত্যক্ষ করিয়া গতাছিলেন। শিব ইসলাম বোধ আছে।

তাই বলিয়া 'বহ উপ-পাশে জাতীয়তার ভেদ দাই,
ঐক্যমিত রাষ্ট্রের সঙ্গে ঐক্যমিত রাষ্ট্রের বিচার দাই—
ইহা সত্য নয়। যে রাষ্ট্র নেতারা প্রমাণ, সেখানে দ্বন্দ্ব
ও সংগ্রহিত সংবাদগুরু নিগোষণ স্থান দাই।

অবশ্যক ভারতবর্ষে নব্য শিক্ত ইংরাজী বহাজে
রীকাল্যত কথ্যাজিল, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ উভা
কাব্যত: ত্যক্ত হইয়াছে নানাপ্রকার ভগ্না-কৌশলের দ্বিত
সংঘিষ্ঠিত হইয়া ভারতবর্ষে ইহা তিষ্ঠত কিম্বাকার হইয়া
হাঙ্কিয়াতে পাটা সমস্ত বিলম্বিত না হইলে হয়।

ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ মুসলমান সমাজের কতক
স্থাপনের দাবীতে পাকিস্তান চাহিয়াছিলেন। পাকিস্তানে
অমুসলমানের নিরাপত্তা না থাকিলেও ভারতের মুসলমানের
নিরাপত্তাও সূত্র বহাজে সহিত স্বীকৃত। ভারতবর্ষের
(বাঙালি ১৮ পাতায়)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" এর থেকে অধ্যায়]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন গাঙ্গুল

বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার মনে হয় এই বিশ্বাসের বশেই তিনি এমন এক শাসন সংস্কারের কাজে হাত দেন যার ফলে ভারতীয় জননেতাগণের কাছে সে সরকার আরও গ্রহণযোগ্য হবে।

এই শাসন সংস্কার করার কাজ থেকে এসেছে তা এমন একটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল তিনি ছিলেন এর অবধারক এবং সে শাসন সংস্কার যাতে পুরোপুরি ভাবে কার্যকরী হয় সে ব্যাপারেও তিনি খুব ব্যাগ্র ছিলেন। আর লর্ড মিল্টোকেও তিনি স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেলেন যে এ কাজে যেন দেরী না হয়। লর্ড মিল্টোর নিকট এই দার্শনিক রাষ্ট্র নীতি-বিদ যে সমস্ত পত্র লিখেছেন তাতেই এ ব্যাপারে তার উৎসাহ কতখানি তা স্পষ্ট হবে বরাবর দিয়েছে। লর্ড মিল্টোর কাজকেও তারিফ করে কলা যায় যে তিনিও তার উপরওয়ালার এই নির্দেশে তৎপরতার সহিত মানলে সাদা দিবেছেন। ভাইসরায়ও ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে একজন এবং প্রাদেশিক এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সমূহে একজন করে ভারতীয় প্রতিনিধি রাখার এবং লওনে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে একজন ভারতীয় সদস্য নিয়োগ করার বিষয়টিও লর্ড মার্শার নিজস্ব চিন্তা প্রসূত। লর্ড রিপনের মত ভারত বন্ধুও এতে অসম্মতির ভাব প্রকাশ করলেন এবং রাজা এডওয়ার্ডের মত সহায়-

ত্বপ্রিয় সন্মতি ও সরকারী সমর্থনী মন্ত্রণের বহুল প্রাপ্য। এ প্রতিজ্ঞাবোধের এই বিধোদী ভাব যুক্ত একপ অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে সন্ধিহান ছিলেন কিং একজন দৃঢ়চেতা রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসাবেই ছিল লর্ড মিল্লির ব্যক্তি মতা : তা না হলে তার কোন মূল্যই নেই। এই শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং লর্ড কিচেনারকে ভারতের ভাইসরয় করার প্রস্তাবের বিরোধিতায় তিনি যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন তা তার মনোবলকে সবচেয়ে বেশী করে প্রকাশ করেছে।

মর্লি মিল্টো পরিকল্পনা নামে পরিচিত এই শাসন সংস্কারকে বাগত জানানো হয়েছিল এই কারণে যে এর মধ্যে আশা আকাংক্ষা পূরণের দিকে সামান্য একটুখানি অগ্রগতি লাভ হয়েছে। ভারতের কোন লোকই এ বকম কোন দ্রষ্টব্য ধারণা পোষণ করেনা যে এই শাসন সংস্কারে অনেক কিছুই পাওয়া দিয়েছে। এই শাসন সংস্কারের মধ্যে সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে যা মনে হয় তা হয়ত এট যে এর মধ্যে বেঙ্গলকারা সমস্পর্ক জাতীয় সমস্তা সম্পর্কে প্রস্তাব আনার অধিকার দেওয়া হয়েছে, এই ভাবে তাদের সরকারী কাজ ও নীতিকে সমালোচনা করার একটুখানি সুযোগ দেওয়া হয়েছে—বলিও সে কাজ ও নীতিকে নিরসন করার ক্ষমতা তার মধ্যে

নেই।

দাদা মহলী সংস্কারের সঙ্গেই হাউস অব লর্ডসকে বলেছিলেন যে কোন ক্রমেই তিনি সংসদীয় প্রথা প্রবর্তন করতে যাচ্ছেন না। তবে একথা তিনি যেমন বলে মনে মনে উপলব্ধি করে থাকতেন যে সমস্ত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার জ্বলন্তী বরূপ তার নিজের মহান দেশের সংসদই শুরুতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসদীয় অনুষ্ঠানের উৎস থেকেই সূচনা লাভ করেছিল।

এই শাসন সংস্কার যেভাবে রচিত হয়েছিল তাকেই আন্দোলনস্বরূপ ধরে নিয়ে ভাইসরয়ের কাছে এক প্রপোজিশন দেওয়া হল। এমনকি এ ক্ষেত্রে কলকাতা টাউন হলো একটি সভার অনুষ্ঠান করার প্রস্তাবও এগিয়েছিল। কিন্তু সে সভা হতে পারেনি আমরট ইন্সপেকশনের ফলে। আমি তৎকালীন লেকটুরার গভর্নর স্যার এডওয়ার্ড বেকারকে বললাম যে আমি এই সম্বন্ধে এই সভার বোগদান করতে পারি যে সেখানে বহু বিভাগের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব আনতে এবং তা সংশোধন করার ক্ষমতা প্রার্থনা জানাতে দিতে হবে। সরকারী মহল বাদেও উৎসাহে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল তারা তাতে রাজি হল না। সুতরাং সভা করার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হল।

নব গঠিত কাউন্সিলগুলির কাজ শুরু হল ১৯১০ সালে। কাউন্সিলগুলির প্রথম সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার সময়ই ভাইসরয় যোগদান করলেন যে ১৯১৮ সালের এনং রেগুলেশন যে সমস্ত রাজকর্মীদের আটক রাখা হয়েছে তাদের আর আটক রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ তারা কোন বৈরতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাই তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। কৃষ্ণকুমার মিত্র, অম্বিনী কুমার দত্ত প্রভৃতিকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক ভুল কাজ করা হয়েছে; এতে কোন প্রয়ো-

জনীর উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়নি; এতে কতই হয়েছে, একাজ কাউকেই ভীতি প্রসূত করতে পারেনি; বরং তা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নির্বাসন দণ্ড দেওয়ার ঘটনা এর পরে আরও অবশ্য অনেক ঘটেছে। কিন্তু সে সময়ের

(১৬ শতাব্দীর পরের অংশ)

অনেক আদিম জাতিতে, ভারতে আগও অনেক উপজাতি ও ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক নৃশীল প্রজাতির মধ্যে এখানে লোক সংস্কৃতি ও জাতিগত কীর্তনসমূহ করিচ্ছিলেন, যাকে ধরে ধরেই হঠাৎ আকাংক্ষা দিচ্ছিলেন। এর উত্তীর্ণ হতে এই দুঃখের আধিক্যের মত, শচন্দ্র, অশুভ, বিবাস ও সংস্কৃতি লইয়া অধিকাংশ চিন্তা ব্যক্তি কিংবা সংখ্যার বাহাং লুপ্ত, সাক্ষ্যে বহাং পুংক, অধিকাংশের সহিত পাণ্ডারা মিলিয়া মিলিয়া চলিবে কিনা, যুদ্ধ সাত্বা ভাষার প্রাক্কালে সেই বিবেকী ভাষাধারীরা ভারতবর্ষে তাৎপত্য করিয়া রাখিচ্ছিলেন।

কুপোল ইতিহাসের ভারতবর্ষে নৃতন ধর্মের ভাষার আশ্রয় রাখিচ্ছিলেন।

দুঃখের লক্ষণেই বিবেকী দেখা যায় না; কিন্তু ভারত মহাদেশের মতিন রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বৃষ্টি নাই, কিন্তু বৃষ্টির উত্তরাধিকারী মতিন প্রথম প্রথম সম্পন্ন। শে চীন বা হাকার তিনজাত নাই, নৃতন চীন ভারতবর্ষে পাতিদ্বান প্রথোপাধিকার লাভ করিচ্ছিল। বৃষ্টি নাই, বৃষ্টির প্রতিক্রিয়া ভারত নাই কিন্তু রূপ নৃতন আকর্ষণীয় নৃতন পাশ্চাত্য ঘটনা করিচ্ছিল।

কংগ্রেস বৃষ্টি নৃতন ভারতবর্ষে মহাদেশের ভারতবর্ষে পাতিদ্বান। বৃষ্টি-নৃতন ভারতবর্ষ নাই, কুপোল-ইতিহাসের ভারতবর্ষ আছে। কুপোল ইতিহাসের ভারতবর্ষে পাতিদ্বান বিদ্রোহন মতিন; বিবেক হঠাৎ এ নৃতন আধিক্য লুপ্ত হয় নাই। ইহার দের টানিয়া এই উপমহাদেশের লক্ষ্যাবলী মতিনেই মতিনেই মহাদেশে ঘটনা মতিন দিয়া লক্ষ্যাবলী মতিন।

নির্বাচন দণ্ড দেওয়া লোকের মনে বেঙ্গল অসহৃদিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল সে বকম আর কখনই হয়নি। ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে ইণ্ডিয়া অফিসে লর্ড মলির সঙ্গে আমার এক সাক্ষাৎকারের সময় আমি খুব জোর দিয়ে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অধিনীকুমার দত্তকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা বলেছিলেন। লর্ড মলি কেবল আমার কথাই শুনলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। তবে সেই সাক্ষাৎকারের সময়টা ছিল খুব খারাপ। কারণ এ সময়টারই স্মার উইলিয়াম কার্ভান উইলমকে হত্যা করা হয় এবং ফলে সারা ইংল্যান্ডে তখন ঐক্যনৈতিক বড়োয় সম্পর্কে সন্দেহের ভাব দেখা দেয় এবং তার বিরুদ্ধে প্রবল রোব প্রকাশ পায়। এর চেয়ে কোন শাস্ত্র সময়ে আমার কথাটা ভুললে হয়ত তা কাজে লাগত। ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে আমার সে বকম আশা ছিল না। সেই মাসের সেই ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় ঘটনার কথা আমাকে পরে আরও উল্লেখ করতে হবে। ইত্যবসরে নতুন শাসন সংস্কারে প্রাপ্ত কাউন্সিলের ঘটনা সম্পর্কে আমার একটা ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করা যাক।

১৯০৯ সালের পার্লামেন্টের স্ট্যাটিউট অনুসারে যে সমস্ত বেঙ্গলেশন প্রনয়ণ করা হল তাতে কোন পদচ্যুত সরকারী কর্মচারী কোন লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারে না। সরকারী চাকরী থেকে পদচ্যুতি এইভাবে একটা অযোগ্যতা বলে সাব্যস্ত হয়। এর পূর্ববর্তী বিবি-বিধান অর্থাৎ ১৮৯২ সালের স্ট্যাটিউট এ বকম কোন অযোগ্যতার কথা ছিল না। তবে মনে হয় এরকম একটা বিধান সেখানেও ঢুকবার চেষ্টা হয়েছিল। সাম্প্রতিক-কালে এই নতুন বেঙ্গলেশনে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে তা স্থানটিই যোক আর ইম্পেরিয়াল কাউন্সিলই হোক—কোন

সিট পাওয়ার ব্যাপারে আমি অযোগ্য হয়ে পড়লাম। তবে সরকারের প্রধান কর্মকর্তা ইচ্ছা করলে সে অযোগ্যতা দূর করতে পারেন। স্মার এডওয়ার্ড বেকার ছিলেন তখন লেক্টোরাট গভর্নর। তিনি আমাকে ভালভাবেই জানতেন। কয়েক বড়র বাবং আমরা একত্রে জনসেবামূলক কাজ করেছি এবং সেট কাজের ভিতর দিয়ে আমরা পরস্পরকে কাছে পেতে ও জ্ঞাত করতে শিখেছি। কিন্তু ও কাজ থেকে কোন প্রকার প্রস্তাব বা সুপারিশ না পেয়ে নিজে থেকেই তিনি আমার অযোগ্যতা দূর করে দিলেন এবং গভর্নমেন্টের নির্দেশ মতের একটি কপি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

এখন একটা ব্যাপারে আমি একটা অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেলাম। আমি বার বারে একথা বলে এসেছি যে ধরন্তলের কোন সংশোধন যদি এবং যে পর্যন্ত না হয় তাহলে এবং ততদিন পর্যন্ত আমি কাউন্সিলে নির্বাচনের ক্ষমতা হারাব না। নতুন শাসন সংস্কার অনুযায়ী গঠিত কাউন্সিল সম্পর্কে আমার মনোভাব কী তা বলতে গিয়ে এই বলতে চাই যে আমি বাংলার নেতাদের প্রায় সবাই একথা বলেছি, 'দেশ বিভাগ আইনের সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত কাউন্সিল থেকে দূর থাকুন।' ১৯০৯ সালে ২৪শে জুন তারিখে ওয়েস্ট মিনিষ্টার প্যালেসে হোটেলে স্মার উইলিয়াম ওয়েভার বার্ষিক প্রাতঃ ভোজ বৈঠকে বলতে গিয়ে স্মার চার্লস ডিলকে, স্মার হেনরি কটন, মি: হিউম, মি: গ্যামসে মাকডোনাল্ড এবং আরও কয়েকজনের উপস্থিতিতে আমি বলেছিলাম:

'যদি লর্ড মলি তার ডান হাতে শাসন সংস্কার ও বাঁ হাতে দেশ বিভাগের সংশোধন— এই দু'বকম লান হু হাতে ধরে বাংলার জন-সাধারণকে বলেন যে তোমরা চুটাই পাবে না, এর একটাকে বেছে নিতে হবে তাহলে আমরা

দেশবাসীগণ বিপুল সংখ্যায় অন্তঃকূটভাবেই দেশ বিভাগের সংশোধনকেই নিতে চাইবে: শাসন সংস্কারকে পরে কোন শুভ মুহূর্তে আসতে বিহতে আপত্তি করবে না।

লন্ডন মন্ডলি বারে বারে এত বেশী পদে বিরক্তিকর ক্ষেত্রের দৃশ্য দেশ বিভাগকে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা বলেও ঘোষণা কর। সবেও সেই দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতাপ করার প্রচেষ্টায় শ্রীষ্ট কার্যকার উপায় হিসাবে আমার সব সময় এটাই মনে হয়েছে যে বাংলার নেতৃবৃন্দ নতুন শাসন সংস্কারে দেওয়া কাউন্সিলের কাজের সঙ্গে সহযোগিতা করা থেকে সর্ব প্রকারে বিরত থাকবেন। আমি জানি, আমার এই আত্ম-স্বাধীনতাবলক নির্দেশ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু আমি আমার মন স্থির করে ফেলেছিলাম এবং আমার সে বিশ্বাস আমি ঘোষণাও করেছিলাম। যে ভাবেই বিচার করা যাক না কেন, আমার কাছে এই বিশ্বাস পরিত্যাগ পক্ষে কোন অহুতাই ছিল না। আমি এক ভাগ্য স্বীকারে মনস্থির করলাম যার ফলে আমার এক বিশিষ্ট কর্ম-জীবনকে পরিত্যাগ করতে হল—সেক্ষেপ কর্ম-জীবনে থেকে পূর্বে একবার কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করেছি বলে আমার দেশবাসী মনে করে থাকেন। তবে একথাও ঠিক যে এট প্রকার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাও খুব কঠিন কাজ। কারণ এই আমন্ত্রণ এসেছিল এমন একজন বড়ুর কাছ থেকে যার প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব শ্রদ্ধার ভাব আছে এবং যিনি নিজেও বহুভাবেই উপায় আবেশের দ্বারা চালিত হইতছিলেন। এই আমন্ত্রণ কেবলমাত্র একজন প্রাদেশিক গভর্ণরের কাছ থেকে এলে তা আমার উপর সামান্যতই বেখাপাত করত, কিংবা আসৌ কোন বেখাপাতই করত না। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ছিল না। আমন্ত্রণ ছিল এমন

একজন বড়ুর কাছ থেকে যিনি শাসন সংস্কার পরিকল্পনাকে সাক্ষাৎমুখিত করতে চেয়েছিলেন এও চেয়েছিলেন যে আমি যেন সে কাজে কিছু অবদান রাখি। আমার পক্ষে সম্প্রদায়িত লেন্ডন-লেটিভ কাউন্সিলে গ্রাভ এডওয়ার্ড বেকারের মত একজন সহযোগীকে লাভ করা ছিল এক ব্যক্তিগত পরিভোবের বিষয়। কারণ তিনি তার সকল কাজে যে কত উচ্চমনা পুরুষ ছিলেন, সমালোচকদের প্রতি কত উপর ভাব পোষণ করতেন এবং তার বহুদের প্রতি কত প্রীতি প্রবণ ও সদয় ছিলেন, তা আমি জানতাম।

আমার অবস্থা যে বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল তা আমি বুঝতে পারলাম। অবশেষে আমি বাংলার তৎকালীন কয়েকজন নেতাকে এক আলোচনা বৈঠকে আহ্বান করলাম এ অবস্থায় আমার কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। সেই পরামর্শ বৈঠকে তাদের জেকছিলাম তাদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গত: মি: এ বহুল, বাবু আনন্দচন্দ্র রায় এবং বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার। তাদের সর্ব-সম্মত অভিমত হল, আমার নির্বাচনে দাঁড়াবার প্রস্তাবে রাজি না হওয়াই উচিত। কারণ আমি যদি বেঙ্গল লেন্ডনলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে দাঁড়াই তাহলে পূর্ববঙ্গের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের প্রতি তাদের সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে নেতাদের প্রতি তাদের সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে এবং ফলে দেশ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলন অসং শোষণীয় আঘাত পাবে। পূর্ববঙ্গের নেতারা হুগলী প্রদেশের কাউন্সিলে নির্বাচন থেকে বিরত ছিলেন। তাই শতাব্যতাই তারা আশা করেছিলেন যে আমরাও যেন নির্বাচন থেকে বিরত থাকি। আমি তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলাম। আমার কাছে ভবন বঙ্গ (বাঁকী অংশ ২২এর পাতায়)

ভাৰত বিশ্বৰ আক্ৰমাৰ ইতিহাস

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর)

দৌরাটতে আটপাও আখর কেসে সে দাখে দাখে এসে দাখত। বাটীটি তার পরিচিত। অস্ত্র আখর কেসে গুলি সে চিনত না। কিন্তু আস্ত্র আখর কেসে আটপাও এসে জানত। আটপাও হাউসের একটা নকশা তাকে সে কলকাতা পাঠি বি অভিনে দেয়। এইভাবে সে গুলীও দড়ি খেতে কিসের দলী বাটীর দল ও কেসের দলীলন করে। কিন্তু বেশীদিন সে হেঁচে থাকতে পারেনি। আটপাওর দলীলন বিলম্বের চাতে বহু দোষের দলীলন দিলে। এতদ্বারা সাধারণ দলীলন লেখত দলীলন। অস্ত্র আখর মধ্যে হাউস কেসের দলীলন বহু হয়ে সে দাখা দাখ।

১৯১৮ সালের ১৫ আগস্টের কলকাতার বৃষ্টি পাতা
 প্রেরণার হয়। সঙ্গে লেখি যেখানে পুদিন আশাধার বাবার
 বসত বৈঠক হয়। এই আগস্টের রাতে তিনটিও পদ
 পুদিন ও বিলিটারি বিপুল বাহিনী নিয়ে আটপাও হাউস
 দিয়ে ফেলল। এই কাল আশাধার পর্বত অকল ঘড়
 নীত। তখনও তিনচার ঘণ্টা বৈঠক আছে। নীতের
 রক্তের কৃষ্ণা দাঁড়ির অন্ধকারে যেন আরও স্পষ্ট
 করেছে। লম্বা দৌলটি বহু তখনও পড়ি নিয়ন্ত্রণ
 নিয়ন্ত্রিত শুধু কোর বিপ্লবী গুরুত্বই খেপে আছে। তখন
 পালার করে পাহারা যেন নিজেদের। আটপাও হাউসের
 পিছনে প্রবীর মধ্যে তার সবই তখন আগ্রহিত। শুধু
 অধঃপ্রবাহ তখনও গুরুত্ব। তাকে পাহারা দিতে
 তাকা যেন। রাত একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত ছিল প্রভাস
 বাবুর পাহারা। এর পরে ঘনি রাখের পালার। প্রভাস
 বাবু যদি বাসক পাহারার মধ্যে লম্বা তখনও
 দাঁড়ন নীত এক যেন ঘণ্টা বেঁচে থাকে। বিপ্লবীর

দায়ে সেখানে বেশ কলকিছুই মাই। তাৎপলককক কক্কিরে
ককককক নককক কক্কিটা উকক কককক। ন'কক: ককক
ককক একককক প্রককক কক কক ককক কককক ককককক এক
ককক ককককক কক কককক। কককককক: কক এক ককক
এককক কক: ককক কককককক কক কক ককক এক
ককককক কক. ককক ককক: কক কককককক একক
কককক।

কৃষ্ণচক্রে ধোঁহের অন্ধকারে খেঁচা ভোট গাড়ে বিহীন
আদর্শ পুলিন ও সাময়িক বারিহী। যনি কালের কথা
করেই তত্ত্বের নব লালিতের উল্লেখ নলিনীবাধু। প্রবেশ
বাধু এবং প্রভাস বাধুও পিছনে পিছনে থাকিবে এলেন।
উত্তমের যথেষ্ট পিছু দাঁড়লেন তিন জন।

মিলিনী বাবু সত্যমেব জয়তায় বুলে দেখলেন পুলিশ বাঁকীটা ঘুরে যে দ্বার নিষ্টিষ্ট হ'ল অধিকার করে পাড়িয়েচে। বুঝা গেল খিনা লাগায়ে বাহিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বিলম্বীরা দুইতমিথো স্থির করে ফেললেন লম্বা সরাসর এর পুলিশের বাহু ভেঙে কয়েকজন মতুবা মৃত্যুবাণ করবেন। কতখ্যা ছিট করে মিলিনী বাবুই প্রথমে পুলিশকে লক্ষ্য করে দ্রুতলবারের জমি করলেন। নিকটবর্তী পুলিশ মহাসিঁহা যেন ক্ষুভলগাণী হল। প্রভাসবাবু এবং প্রবোধবাবুও পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে জমি চালাতে লাগলেন। পুলিশ হলেন নেতর করছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার ফোর এডেয়ার। এই লম্বা তিনিও পুলিশ বাহিনীকে হারু মিলেন "কাহান"। শুক হল হুদিক থেকে জলিবর্ধন। একহিকে বিদ্রোহের চাটটা দ্রুতলবার। অপর দিকে বেঙলভাবিক পুলিশের রাইফেল। গুলির প্রত্যস্তর

গুলি চলত লালস। পুলিশের প্রচণ্ড সক্তির বিক্ষে
বিদ্রোহীদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আজ অনেকই হতাশা
সম্পন্ন হ'ল। কয়েকটি ক্ষুদ্র এট অসম্ভবতই সম্ভব
করে তুলেছিল। অতীতের দীক্ষিত বা ব্রাহ্মণী
বিদ্রোহীদের বৃত্তান্ত। এরই মধ্যে এতটা হাইসেলের
গুলি এসে প্রত্যাহারের উল্লেখ দেয় করে গেল।
কিন্তু সেদিকে তার ফ্রাঙ্কশ নাই। তিনি রক্তস্রাব
নিরোধ গুলি করে চলেছেন। উত্তেজনার মধ্যে তিনি
কখন গুলি বিছা রেছেন তিনি টেরও পাননি। হঠাৎ
পালের প্রত্যাহার বলালে "হুজু তো হোয়ার কাপড়
জিতে গিয়েছে।" বহুই দিকে প্রত্যাহার এত
জাতিতেই ফেলেন। তলপেট থেকে চার পাঁচ আঁচল
মোটে লাল উল্লেক্ষ তেজ করছে পুলিশের বইকাদের
গুলি। এই সময় নগিনীদাস হঠাৎ গুলি বন্ধ করলেন।
অস্ত্র ত্যাগ গুলি বন্ধ করবার নির্দেশ দিলেন।
বিদ্রোহী গুলি বন্ধ করলে পুলিশও গুলি বন্ধ করল।
বিদ্রোহী যে আগেই আত্মসমর্পণ করে বসবে তার জন্য
হতাশা তারা প্রকাশ দিলেন। এবার আরও প্রচণ্ড
হবে বিদ্রোহের পুনরাক্রমের উত্তোঃ করল তারা।

গুলি বিছা হলে নগিনীদাস তার মধ্যে প্রবেশ
করলেন। তার পিছনে পিছনে অসংখ্য বিদ্রোহীও করে
চুকলেন। অসংখ্যবৃক্কে এ বীর ভেঙে আনা হল।
নগিনীদাস অসংখ্যবৃক্কে বলালে পুলিশ বাড়ী বেধেও
করে কেবলছে। একজন লড়াই করে গিয়েছে। আনন্দের
দ্বিগুণে আত্মসমর্পণ করলেন। সমস্ত লম্বা লড়াই
করে মরণ। আপনি কী করতে চান। অসংখ্য বলালে,
একজন অসম লম্বা লড়াই কী? তার চেয়ে ধরা দিলে
লড়াই হবে একটা Statement দিয়ে মরণে মরণে
চাক্ষুস হবে কেনী। কিন্তু নগিনীদাস বলালে সে হবে
না। এখন থেকে তারও আত্মসমর্পণ করা হবে না।
আনন্দের আগে লড়াই করণ গতে গুলি ছুঁতে গেলে আমি
গলাইতে হত্যা করবে। তারপরে আত্মসমর্পণ করণ এই
দায়ার দ্বিগুণ। আমাদের বেহুতলি পুলিশ পাঁচ
কিন্তু জীবন নয়। (চলবে)

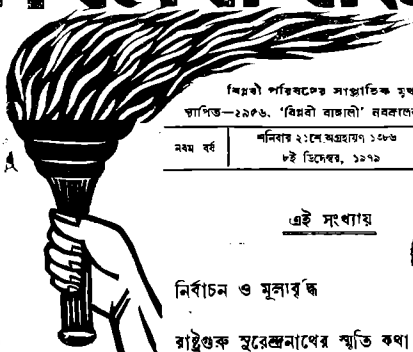
(২০ পাতার পরের অংশ)

ভাস্কর সংশোধনই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়
প্রয়োজন। এই প্রয়োজন তখনকার দিনে দেশের
কাছে অল্প সময় প্রয়োজনকে একেবারে ঢেকে
কেনেছিল।

নির্বাচনে পাড়োতে নারাজ হওয়ার পক্ষে আরও
একটা বড় রকমের যুগি ছিল। নির্বাচন পাশ করা
হয়েছিল তাতে নরমপদী দলের কয়েকজন বিশিষ্ট
নেতা অযোগ্য বলে সাব্যস্ত হল। আমার সহ-
কর্মীরাই যেখানে অযোগ্যতার নিষেধাজ্ঞার ফলে
নির্বাচন থেকে বাদ পড়ে গেছেন সেখানে আমি
কি করে কাউন্সিলে প্রবেশ করতে পারি? মজারট
পার্টির কতিপয় নেতার এক আলোচনা বৈঠকে
সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়। আমি সে সিদ্ধান্তে
রাজি হই এবং তা স্থার এডওয়ার্ড বেকারকে
জানিয়ে দিলাম। আমি তাকে জানিয়ে দিলাম
যে যদিও আমি তার কাছ থেকে এক্ষেত্রে এবং আরও
অনেকক্ষেত্রে যে সময় ব্যবহার পেয়েছি সেজন্য খুবই
কৃতজ্ঞ, তা হলেও নতুন শাসন সংস্থারের প্রাপ্ত
কাউন্সিলে আমাকে নির্বাচনের সুযোগ দেওয়ার
জন্য আমার অযোগ্যতা বুঝে করে দিয়ে যে সরকারী
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তার সুযোগ আমি
সমস্তম্বে প্রত্যাখ্যান করছি। এখানে আর একটি
কথা বলতে পারি এডওয়ার্ড বেকারের সঙ্গে আমার
যে সম্পর্ক ছিল তা কিছুমাত্রও ক্ষুদ্র হয়নি।
বৃদ্ধার বয়স হওয়ার আগেই তিনি মরণ বরণ
করেছেন। সেজন্য আমার অন্তরে গভীর বেদনা
বোধ করছি এবং তার স্মৃতির প্রতি জানাচ্ছি
আমার শ্রদ্ধা।

(চলবে)

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

চ্যাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাতালী' মসকালকাবে—১৯৭৮

নবম বর্ষ

শনিবার ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৬

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯

১১ সংখ্যা

এই সংখ্যায়



নির্বাচন ও মূল্যবুদ্ধি

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মলিনী মোহন দাসগুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। বিজয় কান্ত ।

বিপ্লববাহিনী ক্ষুধিরাগ

অবক্ষয়ের পাঠ্য শিক্ষার গলতি

। অরুণ কান্ত দাস ।

শাসন ও স্বাধীনতা

। প্রবোধ মজুমদার ।

উপরের পথে শুনি কার বাণী

ভয় নাই ভয়ে ভয় নাই

নিষেধে প্রাণ যে করিবে দান

কর নাই তার ক্ষয় নাই ।

— রবীন্দ্রনাথ

নির্বাচন ও মূল্যবৃদ্ধি

ভারতবর্ষের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন প্রস্তাৱ। ১৯৮০ সালের প্রায়ই এই নির্বাচন হওয়ার কথা। একটি বিশাল দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করছে এই নির্বাচনের উপর যার ভিত্তি হল গণতান্ত্রিক দেশের আশামের জনসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু যারা এই নির্বাচন ব্যক্তের প্রবান হোতা—অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভোটের শ্রেণী, তথা ৬০ কোটি মানুষ—আসন্ন নির্বাচনের মুখোমুখি পাড়িয়ে তাঁদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে না। বরং এই নির্বাচন সম্পর্কে এক বিতৃষ্ণ উদাসীনতা আচ্ছন্ন করে রেবেছে সাধারণ জনমানসকে। এর কারণ, বিগত নির্বাচনগুলির ও বর্তমান নির্বাচনেরও পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ভোগ্য-দ্রব্যের (consumer goods) মূল্যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমানতা।

রাজনৈতিক নির্বাচন সাধারণ মানুষের সামনে আবির্ভূত হয় আশা ও আশ্বাসের মশাল হাতে। ক্ষমতাসীন সরকারের কার্যকলাপ, ব্যর্থতা ও অপসার্যতা, (যদি কিছু থাকে) তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, নতুন সরকারকে ক্ষমতায় আনতে ভোটদিবার প্রয়োগই হল সাধারণ মানুষের অব্যর্থ অস্ব। ‘বালট বায়ে বিল্লং’ শুধু পুঁথিগত অর্থে নয়—আকস্মিকভাবেও সত্য। তাই নির্বাচনে ভোটদান মানুষের কাছে শুধু সাংবিধানিক অধিকার ভোগই নয়—তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বিচার বিশ্লেষণ ও আশা-আকাংখারও বাস্তব প্রকাশ।

কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, নির্বাচনের এই ভাবমূর্ত্তি সাধারণ মানুষের মন থেকে মুছে গিয়ে সেই স্থান দখল করছে এক বোঝা আতঙ্ক—আতঙ্ক মূল্যবৃদ্ধির, আতঙ্ক অনিশ্চয়তার, অস্থিরতার; আতঙ্ক—জনজীবনে বিপর্যয়ের। মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে—এটিটি নির্বাচন আসে সাধারণ ম্হনতী মানুষের পকেট কেটে ধনীর সম্পদ বৃদ্ধি করতে। যে বিপুল পরিমাণ অর্থ নির্বাচনের ব্যয়ভার হিসাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি দেশের ধনিক বণিক শ্রেণীর নিকট থেকে সংগ্রহ করে—তা কড়াফোক্তিতে উড়ল করা হয় নির্বাচনের পরে জিনিষপত্রের অস্বাভাবিক দাম বাড়িয়ে, সরকারী টাকার বৃদ্ধি করে—দৈনন্দিন ভোগ্যপত্রের কৃত্রিম অভাব ঘটবে ব্যাপক কালোবাজারী করে। শুধুমাত্র প্রাণধারণের তাগিদে সাধারণ মানুষদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে হয় সাধ্যাতিরিক্ত দামে—তার বক্ত, দাম আর চোখের জলের

বিনিময়ে গড়ে ওঠে নিত্যমুত্তর ধনীরা প্রাসাদ। ফলতঃ দুর্নীতি বাড়ে, বাড়ে ইনক্লেশন। এক দিকে ধনীসেব হাতে প্রচুর অর্থ ও যথেষ্ট ব্যয় মুদ্রাফীতিকে বাড়িয়ে তোলে—অপর দিকে চড়া বাজারে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাধারণ চাকুরী ও শ্রমজীবী মানুষকে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয়—সরকারী বেদরকারী ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মস্থলে। এই ভাবে একটি জাতির জীবনে নির্বাচন আত্মীকরণ হয়ে আসে না এবং জাতির জীবনে এক অস্বাভাবিকতারই সঞ্চার করে।

নির্বাচনের এই কুফলপ্রতি থেকে দেশকে, জাতিকে মুক্ত করতে দেশের প্রতিটি রাজ-নৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের বনিষ্ঠ প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন।

অর্থনীতিতে কালো টাকা (black money) বলে কোন টাকা নেই। টাকা তখনই কালো, যখন তার ব্যবহার হয় না, যখন মুষ্টিমেয়দের হাতে অপরিণীত টাকা জমে যায়। ব্যবহারহীন টাকাই কালো এবং সর্বপ্রকার দুর্নীতির উৎস। আজকের রাজনৈতিক নির্বাচনে এই কালো টাকারই ভাণ্ডার নুতন শুরু হয়েছে। কালো টাকার কালিমা মসীলিষ্ঠ করে দিচ্ছে যা কিছু শুভ বুদ্ধিকে, মানসিক মূল্যবোধকে, জনগণের প্রতি নেতৃবৃন্দের হৃদয়তম দায়িত্ব চেতনাকে। কালো মেঘের মতোই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনকে ঘনঘটাঘ ঢেকে দিয়েছে অসত্যের কালিমা। এই পরিস্থিতিতে যে নির্বাচন হতে চলেছে—যাতে অশেষ নিচ্ছেন ভারতবর্ষের ছোট-বড়ো, আকলিক, প্রাদেশিক, প্রান্তিক অসংখ্য দল ও গোষ্ঠী—তা সাধারণ মানুষের জন্য কোন আশার বাণী বহন করে আনবে? ভারতবর্ষের মানুষ আজকের এই অসংখ্য দল-উপদলকে বিশ্বাসই করতে পারছেন না। কারণ কেন্দ্রীয় স্তরে পর পর ছুটি কোয়ালিশন সরকার তাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে একাধিক দলের ক্ষমতাভিত্তিক সমঝোতার বে ক্রান্তি হয়—তা আভিধানিক অর্থেই কনক্রেটনকে বহন করে আসে—সেই কোয়ালিশন দ্বারা জাতির কোন হৃদয়তম কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। তাই নির্বাচন শেষের ৬০ কোটি মানুষের মনে আজ কোন সাদা জাগাজে না—; তারা শুধু ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্মরণ করছেন স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিকে।



বিপ্লববাহি কুদিরাম

‘কীসির মাঝে গায়ে গেল ঘাঁরা জীবনের তরুণান,

আসি অলঙ্কা লাড়ায়ান্ন তাবা—দিবে কান্, বলিদান !’

কার্জনের আমলে যে সকল সংস্কারী কর্মচারী নিষ্ঠুর অত্যাচারীরূপে কৃৎসিত অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অঙ্গুষ্ঠম ছিলেন কলিকাতার প্রধান গেসি-ডেলি মাসিকিষ্টেট কিংসফোর্ড । বঙ্গেশীয়ানার কিছুমাত্র পরিচয় পাটলে তনি অভিযুক্ত বক্তির প্রতি গুরুতম ব্যবহার করিতেন । তরুণবয়স হইলে তো কথাই নাই । তাহাদের বোঝাতে কর্তৃত্ব করা হইত । শেষ পর্যন্ত কিংসফোর্ড জন-সাধারণের কাছে এতদূর অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন যে সরকার তাঁহার নিগাপন্থার জন্য তাঁহাকে জেলাজজ রূপে মজঃকরপুরে বদলি করিতে বাধ্য হন ।

কিন্তু ইহাতেও কিংসফোর্ডের বিপদ কমে নাই । বিপ্লবীরা তাঁহার প্রাণ নেওয়ার জন্য দুটংকর ছিলেন । কিংসফোর্ডকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হইল ছইজন তরুণ বিপ্লবীর উপর । এই ছইজন হইলেন কুদিরাম বসু এবং প্রবুল চাকী । তাঁহারা মজঃকরপুরে আসিয়া কিংসফোর্ডকে হত্যার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন (এপ্রিল, ১৯০৮) । কিংসফোর্ড খুব সাবধানে চলাকিয়া করিতেন । কোট আর ক্লাব ছাড়া তিনি কোথাও বাহির হইতেন না । একদিন সুযোগ পাওয়া গেল । সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই কিংসফোর্ড ক্লাবে আসিয়াছেন—সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী । তাঁহারা মিসেস কেনেডি ও তাঁহার কন্যার সহিত তাস খেলিয়া ছইটি আলাস গাড়িতে ক্লাব হইতে বাহির হইয়া বাড়ির পথে রওনা হইলেন । প্রথমে কেনেডির গাড়ী, তাহার পিছনেই ছিল কিংসফোর্ডের গাড়ী । ছইটি গাড়ীই সেবিতে প্রায় এক রকম । প্রবুল ও কুদিরাম রাস্তার পাশে গাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিলেন । প্রথম গাড়ীখানা কাছে আসা মাত্র তাঁহারা বোমা ছুড়িলেন । গাড়ীখানা ভাঙিয়া চূরমার হইয়া গেল । মিসেস কেনেডি ও তাঁহার

মহোই মায়া গেলেন । কিংসফোর্ড ভাগ্যক্রমে অক্ষত থাকিয়া গেলেন ।

কুদিরাম ও প্রবুল প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছেন—চারিদিকে পুলিশের তোড়জোড় । মায়া শহর হোলপাড় । প্রবুল সমস্তপুরে আসিয়া ট্রেন ধরিলেন । কিন্তু পুলিশের দারোগা নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় তাঁহার গতিবিধি দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, এই দুবকই হয়তো কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের বড়যন্ত্রকারীদের একজন । দারোগার তৎপরতায় হাওড়ার পথে এক স্টেশনে প্রবুলকে গ্রেপ্তার করা হইল । কিন্তু বিপ্লবের অগ্নিময় দীক্ষিত যুবক নিজের পিপুলের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, কুদিরাম অস্ত্র পথ ধরিতা রেল-স্টেশনের কাছাকাছি বাজারে কিছু খাবার কিনিয়া লইতেছেন এমন সময় পুলিশের হাতে তিনি ধরা পড়লেন । ১৮ বছরের এই তরুণটিকে ঘন বন্দী অবস্থায় কড়া পাহারার মজঃকরপুরে লইয়া আসা হইল তখন তাঁহার চোখে প্রশান্ত মৃষ্টি, মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি । বিচারের সময়েও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরীকার । তিনি অকপটে স্বীকার করিলেন যে, অত্যাচারী কিংসফোর্ডের প্রাণনাশ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য । কুদিরাম নিজেও জানিতেন তাঁহার কীসি হইবেই । তাঁহার মুখে-চোখে এতটুকু দৃষ্টিস্তার ছাপ ছিল না এবং কখনোই দেহের ভজন বাড়িয়া গিয়াছিল । ১৯০৮ মালের ৬ই জুলাই বিচারের রায় বাহির হইল—কুদিরামের কীসির রকুম হইয়াছে । ১১ই আগষ্ট কীসির গড়ি গলায় পরিয়া কুদিরাম শহীদেব গৌরব অর্জন করিলেন ।

অবক্ষয়ের কারণ শিক্ষায় গলতি

—ব্রজেনচন্দ্র দাস

রাজনৈতিক গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন, কোন দিগন্তেই কোন আলোর নির্দর্শন দেখা যায় না। বাম, দক্ষিণ গণতন্ত্র, বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি বাক্যের বাগাড়ম্বরে নেতাদের বিগতি ভরপুর। দেশের সমস্যা সমাধানে কোন দৃষ্টিকোণ নির্দেশ নাট। দেশপ্রেম, দেশপ্রীতি একেবারে উঠে গিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি গদি পাওয়ার লোভে মাতোয়ারা, নেতাদের মহিষের লোভ ও ক্ষমতার মোহ চরমে উঠেছে। নির্বাচনের উল্লাস যত বাড়ছে নেতাদের উক্তি তত বিকারগ্রস্ত হতেছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষও অর্থসর্বধ মনোভাব নিয়ে চলছে। ব্যবসায়ীর অর্থশালস, সীমাহীন, কৃত্রিম জনটন সৃষ্টি করে, খাজদ্রব্যে ভেজাল মিশিয়ে অভিমানাকা লুটছে। সরকারকে দেয় অর্থ ঙ্কি দেওয়ার জন্য আইনজ্ঞ ও অক্সিগারদের অর্থের বিনিময়ে কিনে নিচ্ছে। কর্মচারীরা কাজ না করেই বেতনবৃদ্ধির দাবী জোরদার করার জন্য অর্থসচিব সৃষ্টি করছে। সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি যুবকবৃন্দও ভোটের তালিকা প্রস্তুতে অবহেলা ও কর্তব্যাহীনতার চূড়ান্ত দেখাচ্ছে। ভোটের তালিকা প্রণয়ণে নিযুক্ত কর্মকর্তা প্রায় সবই যুবক; এমনও কর্মজীবনে প্রবেশ করে নাই, শিক্ষান্তে জীবন সংগ্রামে মাত্র অবতীর্ণ, এদেরও দেশপ্রেম ও গণতন্ত্রের প্রতি সামান্যতম জ্ঞানও ভোটের তালিকা প্রণয়ণে দেখা যায় নাই। এই ভোটের তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন গ্রহণে পরিণত হবে। ভোটের তালিকার অসংখ্য ভুলভেদে ভোটের স্থান পেরেছে, অথচ খাতি স্থায়ী বাসিন্দা বাদ পড়েছে।

নাম, পিতার বা স্বামীর নাম বয়সের তুলটাই যেন স্বাভাবিক। সঠিক নাম, পিতার বা স্বামীর নামে বয়স যেন বাতিক্রম। ইহাই বর্তমান সমাজের চিত্র। দেশ ক্রমাগতই অবক্ষয়ের দিকে নেমে চলেছে।

এই পরিস্থিতি স্বাধীনতার পরের কয়েক বৎসরের ঘৃণীতি ও নীতিজ্ঞানহীনতার অবদান। অথচ স্বাধীনতার পর আমরা শিক্ষার, কারিগরী বিজ্ঞান, উৎসাহে, উত্তমে অনেক এগিয়েছি। কিন্তু সব যেন এলোলেলো হতে চলেছে।

পৃথিবীর অন্ধ্র মাদ্যবের মত আমরাও বাস্তবিক প্রকৃতিকে অনেকটা আঁতে এনেছি। খাব, ভিমে, টপল পানী থেকে শুরু করে গাছ, উদ্ভিদ ও অজস্র কীটের অস্তিত্ব আমাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। আমরা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হই, কলিকাতার মেয়েরা হিমালয়ের শৃঙ্গ আরোহণ করে। এই প্রদক্ষে যুগান্তর পত্রিকার সংবাদপত্রের মটর গাড়ীর গ্যারেজের এক বুড়ো মিস্ত্রির বাল্যকাল উদ্ধৃত করা হল। দেশের ঘূর্ণশার কাণ্ড সবাই যখন উত্তপ্ত তখন প্রাচীন কারিগরী কলেন “আপনারা যা বলছেন সবই সত্যি। কিন্তু কে ভাবতে পারত হিন্দুস্থানে বদেশী মটর হবে আর আমি তার মোরফত করব। হাতের এই খড়ি দেখুন ইতিহাস খড়ি, ইতিহাস হাতে পড়েছে। ইতিহাস খড়ি, ইতিহাস টর্চ, ইতিহাস সাইকেল, এমন কি ইতিহাস মটর বাইক, আর আমি ফল মিস্ত্রি সেই বাইক চড়ছি। আপনারা জনতা পাটি, সজ্জর গাড়ী, লোকদল; বাম, দক্ষিণ, গণতন্ত্র, বৈরাচার, সাম্প্র-

দায়িকতা কত কি বলেছেন কিন্তু আমি যখন অগ্নি
মিথি গাড়ীর বনেট খুলে উকিছুকি দিতে শুরু
করেছিলাম তখন কি এ দৃশ্য চাওতে পেরেছিলাম ?
বজ্রস মিল্লির এই উচ্ছ্বাস কেবলমাত্র বজ্রস মিল্লির
একটি মন্ব অসংখ্য বয়স কাটিগির এই উচ্ছ্বাসেই
কাজ চালাতেছে, তাই এখনও আমরা সবসিক দিয়েই
আগাতেছি। আমাদের অগ্রগতির দীপ নিবে না।
কিন্তু যুবকবৃন্দ যেখানেই কাজ করুক না কেন, যেতে
বামায়ে, কল-কারবানায়, অফিস-আদালতে, স্থল-
পেলেজে এই মনোভাব আছে কি ? একেবারে নেই
কমলে অভাব হবে, কিন্তু স্বাভাবিক গতি কর্তব্যচ্যুতি,
সামাজিক নীতি জ্ঞানের ও বেশপ্রীতির অভাব।
ইহার প্রধান কারণ শিক্ষার মানুষ গড়ার নীতির
অভাব। শিক্ষা নিয়ামকদের যদি প্রসন্ন করা হয়
ভারতের শিক্ষানীতির দুল উদ্দেশ্য কি তা হলে কোন
শুষ্টি উন্নত বেরিয়ে আসবে না। শিক্ষানিয়ামকরা
যত বহু উদ্দেশ্যের কথাই বর্ণন না, অগ্রে কতক-
গুলি ডিগ্রি উপাধান ছাড়া শিক্ষা কোন মহত্তর
জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেনি। শিক্ষার্থী
একমাত্র উদ্দেশ্য কোন বস্তুকে একটা ডিগ্রি উপাধান
করে জীবিকার সংস্থান করা। জীবিকার প্রয়োজন
নিশ্চয়ই আছে। শিক্ষা কি জীবন ও সংস্কৃতির
চলমান শ্রোতব্যার্থ সম্পর্ক বর্জিত হবে ? শিক্ষা ও
সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, একে অপরের পরি-
পূরক। জনজীবনের সংস্কৃতি আপন স্বভাবে
ইতিহাসের ধারায় সমাজের অন্তঃস্থল থেকে নির্বাহের
উৎসাহিত হয়, ইহাকে জড়িয়ে দিতে হবে শিক্ষা
পদ্ধতিতে। সংস্কৃতি চেতনা ও সামাজিক বিকাশের
সহযোগী হবে শিক্ষা কর্তৃপক্ষী। এর জন্য জাতীয়
সংস্কৃতি নীতি সম্পর্ক শিক্ষানিয়ামকদের স্বচ্ছ দারণা
ও সুশৃঙ্খল প্রবাস জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনে শিক্ষাপদ্ধতির কর্তৃত্ব
কারণ আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার সংবেদনের
অভাব। সংস্কৃতি কেবল কাগজ কলমের ব্যাপার
নয়, এর জন্য মানসিক শটলুই তৈরী করা দরকার।
পোষাক পরিভূষণ, ব্যবহারে, শিল্পচারে, শিক্ষক-ছাত্র
সম্পর্কে গ্রামে, গঞ্জে, সহরে পরস্পরের সঙ্গে আচার
ব্যবহারে সংস্কৃতি কৃষ্টি হতে হবে। শিক্ষাকে
কেবলমাত্র অর্থকরী বিজ্ঞান সমার্থক মনে না করে
আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে
সম্পৃক্ত সামাজিক সহযোগী করার চিন্তাধারা ও
দৃষ্টিভঙ্গি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। শিক্ষার সঙ্গে
জীবনের এক জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক
অবিচ্ছিন্ন। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনের এই
মৌলিক সম্পর্ক উপেক্ষা করা চলে না।

জাতীয় মানসে গতিরভাবে প্রোথিত বিশ্বাস ও
বীজিনাতির জাতীয় রাজনৈতিক মনোভাব ও গ্রিন্দা-
কর্মের-গতিপ্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করে। ধর্মনির-
পেক্ষ রাষ্ট্রীয় জীবন আদর্শের উপর জন জীবনের
সংস্কৃতির প্রভাব কৃতিকারক হয় না বরং রাষ্ট্র পরি-
চালনায় বর্তমান ক্ষয়শীল অবস্থায় সংস্কৃতিচেতনা
হ্রাসপীড়ের কাজ করতে পারে। ৬ই সেপ্টেম্বর
১৯৭৯ কলিকাতায় শিক্ষাসদনে শরণচন্দ্র বসু জন্ম-
বার্ষিকীতে শরণচন্দ্র বসুর প্রতি ব্রহ্ম জানায়ে বাবু
জগজীবন রাম বলেন “বর্তমান রাজনীতিতে নেতারা
বুদ্ধি ও হৃদয় বিসর্জন দিয়ে পাকা রাজনৈতিক নেতা
হয়ে বসেন কিন্তু শরণচন্দ্র রাজনীতিতে এসেও
হৃদয় বিসর্জন দেননি। কথাটা ভাববার মত।
রাজনীতিতে জনের দ্বন্দ্ব দিতে হবে, নতুন
রাজনীতি বৈষাচারী রূপ গ্রহণ করে, গণতান্ত্রিক
পদ্ধতি কোথাও হয়, নেতৃ জনতার অধিকোত্তা
হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শিক্ষা সংস্কৃতি ও জীবনের মৌলিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে শরণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন স্বদেশপ্রেম একটা স্থূল উচ্চাস নয়, মনুষ্যবিকাশের প্রধানতম উপাদান, দেশপ্রেম বজ্রিত মানুষ সমাজের কণ্টক। এই কণ্টক উপড়ে ফেলে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রতি ছালবালা ঠাঁকে নিয়ে গেছে ভারতের প্রতি ভালবাসায় এবং তা থেকে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন বিশ্বপ্রেমে ও মানবপ্রেমে। রবীন্দ্রনাথের চোখে দেশের মাটিতেই বিশ্বমণ্ডীর আঁচলপাতা। রামমোহন থেকে শুরু করে বাংলার সমীচীণ এই ভাবধারাতে বারক ও বাহক ছিলেন এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

শাধীনতার আগে বাংলায় মাত্র একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, বর্তমানে ছব্বী বিশ্ববিদ্যালয় চলছে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষাপদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই। সম্প্রতি মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ব

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি চলছে। লক্ষ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার অর্থায়ন করেছে। বিদ্যাসাগরের পূর্ণস্মৃতিবিজড়িত বিদ্যাসাগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের দায়িত্ববাহনকারীরা কি বিদ্যাসাগরের জীবন মর্ষণের প্রতি পূর্ণ মর্মানন্দ নিয়ে শিক্ষা পদ্ধতির চালু করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি করেন? যদি সক্ষম হন শিক্ষা পদ্ধতিতে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে, জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির অলো দেখা দিবে।

বিপ্লবীরা তাঁদের কণ্ঠ ভারত পেছতে পারলেন না বলে আক্ষেপ করেন। এই বিষয়ে আরও কিছু বলে জনমত গঠন করার প্রচেষ্টা ত্রুটি হতে পারেন। রাজনৈতিক আবেগে না জড়িয়ে কিশোর ও যুবকদের দেশপ্রেমিক নাগরিক হওয়ার জন্য শিক্ষাদানে বিরোধীরা নিজেদের নিযুক্ত করলে জীবনের শেষপ্রান্তে দেশপ্রেমিক কাজের একটা শ্রেষ্ঠ অবদান হবে। ইহাই বর্তমান সমাজের সর্বস্তরের অবকাঠের মোড়ক ঘুড়ি দিবে নব ভারতের পথের নিশানা দিকে।

হাবিজী মেরের বাবু, অম্বু, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রসূ

আমেলা হাত বুঝারো

আমুবেলিয় মডেল ডেপার্ট

মূল্য ৩.৫০ এক প্রতিলিপি হস্ত

ব্যক্তিগত

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী

মিলকলে কলিকতা • কলকাতা • কলকাতা • কলকাতা

শাসন ও স্বাধীনতা

এক

॥ সুবোধ মজুমদার ॥

সামাজিক জীবনযাপন করতে হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেনে চলতে হবে কতকগুলি সাধারণ সামাজিক নিয়ম কাণ্ডন। যে এসব নিয়ম মানেন না তাকে সমাজ বাধ্য করবে মানতে। এই মানেনোর কাজটাকেই বলে হয় শাসন কার্য। সমাজের হয়ে যে এই কার্যটি করে তাকে বলে হয় সরকার। যে সরকার যত কম স্বাধীনতা হরণ করে যত বেশী শাসন করতে পারে সেই হচ্ছে তত বেশী ভাল সরকার।

নির্বাচনের মুখে প্রত্যেকটি রাজনীতিক বলই বলে আমরা সবচেয়ে বেশী ভাল সরকার গঠন করব। অর্থাৎ তারা সবচেয়ে কম স্বাধীনতা হরণ করে সবচেয়ে বেশী শাসন করবে। কিন্তু শাসন মানেই যে হচ্ছে স্বাধীনতা হরণ। একটা বাড়ল অপরাটও বাড়বে। একটা কমলে অপরাট অবশ্যই কমবে। যে নাগরিককে যতটুকু শাসন করা হবে তার কাছ থেকে ততটুকুই স্বাধীনতা হরণ করা হবে। অতএব দেখতে হবে প্রয়োজনের বেশী যেন শাসন না করা হয় কোন নাগরিককেই। প্রয়োজনের কমও যেন করা না হয় তাও দেখতে হবে অবশ্যই।

যে সরকার নাগরিকদের প্রয়োজনের অধিক শাসন করে সে হচ্ছে বৈরাচারী। সে পীড়িত করে ব্যক্তিগত আইননিষ্ঠ নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে। আবার, যে সরকার নাগরিকদের প্রয়োজনের কম শাসন করে সে হচ্ছে দুর্বল। সে প্রজন্মের বৈরা-

চারী নাগরিকদের সমাজ বিরোধী জীবন যাত্রাকে। অতি শাসকও যেমন অনিষ্টকারী, অল্প শাসকও যেমন অনিষ্টকারী। নাগরিকরা তাই নির্বাচনের পূর্বে বিচার করবেন সুশাসক কে হবে।

শাসন করা হয় আইন দ্বারা। আইন যত বেশী শাসনও তত বেশী। আইন যত কম শাসনও তত কম। অতএব নাগরিকরা প্রথমেই দেখবেন আইনগুলি সব প্রয়োজনীয় কিনা। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ভারত শাসন ছিল শোষণমূলক। তাই তার আইনও ছিল শোষণাত্মক। সংখ্যাও ছিল তাদের অনেক বেশী, স্বাধীন দেশের আইনের তুলনায়। স্বভাবতই স্বাধীন ভারতে তাদের অনেকগুলিই অপ্ৰয়োজনীয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতের কোন সরকারই আজ পর্যন্ত খতিয়ে দেবেন নি কোন আইন প্রয়োজনীয় আর কোনটা নয়। কোন রাজ্য সরকারও এ কাজটির প্রয়োজন অনুভব করেননি আজ পর্যন্ত। অপর পক্ষকে গালাগালি দেবার জন্য ‘শোষণকারী’, ‘বৈরাচারী’ প্রভৃতি শব্দগুলির পরিপূর্ণ ভাষ্যপার্থ উপলব্ধি না করেই নেতারা সেগুলি ব্যবহার করেন অবাধে।

শাসন যদি একেবারেই না থাকত তাহলে স্বাধীনতা থাকত সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সামাজিক জীবন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন ব্যতীত চলতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ যদি সুনাগরিকও হয় তবু পারে না। আইনই সুনাগরিককে বলে

দেবে কী কাজ করা উচিত আর কী কাজ অমুচিত। তবে এটা ঠিক সবাই শূনাগরিক হলে মাফ। করা বা শান্তি দেবার প্রয়োজন হয় না। প্রশাসনের ব্যয়ভারও তাই অনেক কম থাকে। শাসন চলে কিন্তু নাগরিকর, যেভাবে আইন মেনে নেয় বলে সরকারকে বল প্রয়োগ করতে হয় না আর।

অতএব ভারতের যে কোন ভাল সরকারের কর্তব্য হচ্ছে দেশবাসীকে জ্ঞান ও আচরণের মাধ্যমে শূনাগরিকত্বের শিক্ষা প্রদান করা। অর্থাৎ শাসন করা হবেন জ্ঞানী ও সদাচারী। তাঁদের দেখেই দেশবাসী শিখবে যেভাবে আইন মেনে চলতে। সরকারের ১ম কর্তব্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় আইনগুলো বেবে অপ্রয়োজনীয় আইনগুলি বাতিল করে দেওয়া এবং আইনের সংখ্যা খুব কমিয়ে দেওয়া যাতে বিচারক ও বিচারপ্রার্থী উভয়েই উকীলের সাহায্য কর্তীতই বৃত্তে পাবেন কোন কাজটা আইনী আর কোনটা বেআইনী।

বে কোন সরকারের এ ছুটি প্রধান কর্তব্য আজ পর্যন্ত কোন সরকারই সম্পন্ন করেন নি আমাদের এই তথাকথিত স্বাধীন দেশে। এখন থেকে ৫৫ কংসর আগে দেশকলু চিত্তরঞ্জন দাশ এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ভারতবাসীকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বরাজনদের অধিনায়ক দেশবন্ধু ও তাঁর তরুণ সেনাপতি সুভাষচন্দ্র ভারতময় ঘুরে ঘুরে সেদিন বলেছিলেন, বিদেশী আকলাভবের জাবগার এসে দেশী আকলাভবকে বসতে দেবে না আমরা, তার নাম স্বাধীনতা নয়। সে সতর্কবাণী পরবর্তী নেতারা গ্রাহ্য করেন নি যদিও। কলে ভারতবাসীরা আজ স্বাধীন হয়েও পরাধীন, স্বদেশে থেকে ও পরবাসী সাম্রাজ্যবাদী আইনের কবলে পড়ে।

এই বিপর্যয়ের মূল কারণ হচ্ছে কৃষিকা ও কুশর্ন। পশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ার

বাসী জীবনদর্শনের প্রভাবে মানুষ হয়ে কমতাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার না করে পাবেন না নেতারা। কমতায় আসীন হয়ে আমাদের শাসন করা মনে করেন তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে শুধু পরকে শাসন করা, নিজেকে শাসন করা নয়। নিজেরা আইনের আওতা থেকে মুক্ত থাকবেন আর অপরকে যথাসম্ভব বেশী আইনের নাগপাশে শক্ত করে রাখবেন এটাই হচ্ছে তাঁদের শূনাগরিকের আদর্শ। তাঁরা নিজেরা যখন আইন লংঘন করতেন তখন কেউ অভিযোগ করতেন বা করলেও কোন ফল হত না এটা ধরেই নেওয়া উচিত। কলে সাম্রাজ্যবাদী আমলাতান্ত্রিক আইন ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তাঁরা।

এর বহু প্রমাণ দেশবাসী পেয়েছে স্বাধীনতার প্রারম্ভিকাল থেকেই। প্রথমতঃ দেখতে পাই স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার ভার পড়ল সাম্রাজ্যবাদী শিকার পুঁঠ ও ধনবাসী আদর্শে অগ্রগণিত মানুষদের ওপর। তাঁরা সম্পদ-বৈষম্য ও অসম বটনকে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে কায়েম করলেন আনৈতিক মৌলিক অধিকারগুলো প্রণয়ন করে। তাঁরা সামাজিক সুবিচারকে শাসন ক্ষেত্র থেকে নির্ধারিত করলেন নির্দেশমূলক নীতি বা 'জিরেফুজি প্রিন্সিপাল্‌স'গুলোকে বিচার বিভাগের আওতার বাইরে রেখে। সরকার যদি সংবিধানের সেই নির্দেশগুলো লংঘনও করে তাহলে কেউ কোর্টে মালিশ করতে পারবে না তার বিরুদ্ধে। ভুলপরি তাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখলেন সাম্রাজ্যবাদী আইনগুলোকে।

দ্বিতীয়তঃ দেখা গেল স্বাধীন ভারতের সরকারি অকারণে দেশের মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করে ক্রমাতে গিয়ে আইন পড়ার জন্য হাজার হাজার লোককে পাঠাতে লাগলেন সেখানে। ভারতীয় বিধিবদ্ধায় গুলির আইন পরীক্ষার পাঠ্যক্রম এবং অসংখ্য অনেক

পরীক্ষার পাঠ্যক্রম যে বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের চেয়ে বেশী উন্নত ও উপযোগী। তাহলেও তাঁরা নানা ভাবে ভারতীয় ছাত্রদের উৎসাহিত করতে লাগলেন বিলাতি ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা অর্জন করতে। তাঁদের দ্বারা সমর্থিত ও প্ররোচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় ডিগ্রীধারী সুযোগ্য প্রার্থীকে উপেক্ষা করে উচ্চপদে নিযুক্ত করতে লাগল বিলাতি ডিগ্রী বা সার্টিফিকেটধারী অযোগ্য লোককে।

তৃতীয়তঃ ভারতের অর্থনীতিকে পশ্চাৎ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির পশ্চাতে দৃঢ়বদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ডি ডি সি-র মত ঝাঁপ এবং হুগলুর ইসপাত কারখানার মতো বহু কারখানার পতন। এগুলিকে কোনমতে বজায় রাখার জন্য অনন্ত কাল ধরে জ্বারজ্বলে বিদেশী রাষ্ট্রের মুখোশ্রী হয়ে থাকতে হবে। অথচ এসবের মধ্যে যে অর্থের অপব্যয় হয় তার চেয়ে অনেক কম অর্থ ব্যয় করে সারা দেশে আরও বেশী সূষ্ঠভাবে ও ব্যাপকভাবে সেচ আর বিন্যাসের ব্যবস্থা করা যেত।

চতুর্থতঃ আমরা দেখেছি সরকারী সাহায্যে বা প্ররোচনায় কৃষিকা ও দেশদ্রোহিতার আমদানী। বেসরকারী ও মুনাগরিকতা-বিরোধী বই বিদেশ থেকে আমদানী করা হয় তা দেখে আমাদের দেশের অগ্নীভস্ম বেআইনী বইগুলিও লজ্জার ফণার কণ্ঠকিত হয়ে ওঠে। ছাত্র ছাত্রীদের বেশী স্বেচ্ছা, তৎপর ও শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী পিভামাতা মার্কেট আকুলতা ও ক্রেশের অবধি নেই। এর কারণ হচ্ছে আমাদের শোষণপন্থী সাম্যবিরোধী সরকার পিভামাতাদের বুকিয়েছেন যে বিদেশী কৃষিকায় অব্যাহতি না হলে তাঁদের ছেলেরা এদেশে ঘরোয়া পাবে না।

এখন নির্ধারনের মুখে সমগ্র জাতির হৃদয়ে বিরাট গুরুত্বের প্রশ্নটি হচ্ছে—কী করে বটানো যাবে স্বাধীনতা আর শাসনের মধ্যে একটা সুনিবিড় সমন্বয়? ভারতবর্ষকেই করতে হবে এই সমন্বয় সাধন প্রাণের দাবী এবং কর্তব্যের দাবী। শাসন ও স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ভারত নিজেকে রক্ষা করবে স্বয়ং থেকে, তারপর সমগ্র মানবজাতিতে দেখাবে আশ্রয়ন থেকে পরিত্রাণ লাভ করার পথ। এই মহান পথের বক্রণ কী?

নৈরাজ্যবাদ মানুষের সহজাত সামাজিকতার উপর নির্ভর করে বলেছিল রাষ্ট্রীয় শাসন অপ্রয়োজনীয়। জীবনের লক্ষ্য অস্বাভাবিক সংঘর্ষে বেশী সহজ হয় পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যেই। তার পথে বাধা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় শাসন। কারণ কতকগুলো ব্যক্তির ইচ্ছা বা চেয়ারাই তো। চরিতার্থ হয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে। এই মতবাদ অনুযায়ী অর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তি থাকবে পরিপূর্ণ স্বাধীন। দ্রব্য উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তি থাকবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু শাসন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আর উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা ইতিমধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞানালোকিত সমাজে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধনিকরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় দলিত মণ্ডিত করতে লাগল সামাজিক শ্রোত্রানীতি আর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে। ধনিক, শাসক আর পুরোহিতরা জনসাধারণকে বলত আদর্শবাদী জীবনদর্শন অনুসরণ করতে, আর নিজেরা অনুসরণ করত ইন্দ্রিয়বাদী সন্তোষময় জীবনদর্শন। ওখন জনসাধারণের পরিত্রাণের হুমকায় অবতীর্ণ। হলেন মানববাদী মহাবি কার্ল মার্কস।

নৈরাজ্যবাদ ও সমাজ বাদের সমন্বয়ে মার্ক্স নৃত্তি

আদর্শবাদ, ধর্মবাদ পুরোহিতবাদ সববিকৃত নিষ্ফল করে তিনি প্রচার করতে লাগলেন জড়বাদী জীবন-দর্শন। কিন্তু মার্ক্সের অড়বোধ আসলে ছিল বাস্তববাদ। আর তিনি যে আদর্শবাদের নিষ্ফল করেছিলেন তা ছিল ভগ্নেশের দ্বারা প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক আদর্শবাদ। ইউটোপীয় বুদ্ধিজীবীদের কুহকের চাপে পড়েই মার্ক্স বাস্তববাদ পরিণত হয়ে গেল ইন্দ্রিয়সর্বধে সন্তোষবাদে। কার্যতঃ মার্ক্স নিজে সরল আদর্শবাদী জীবনযাপন করে বঞ্চিত শ্রমিকদের বলহীন সন্তোষের পথে চলতে। তথাপি মার্ক্সের এই মানবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অল্প বা স্বার্থাশ্রয়ী সমর্থকরা মার্ক্সবাদকে পরিণত করল একটা সমাজবিরাগী শক্তিহীনপে। বহুকালের মত মার্ক্সিষ্টরাও প্রচার করতে লাগল অস্ত্রপূজাবাদ আর সমতাগবাদের।

সমাজকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করতে হলে, অর্থাৎ শাসন ও বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হলে, সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে একটা সামাজিক শ্রেয়োনীতির। যে শ্রেয়োনীতির ভিত্তি অতীন্দ্রিয় জগতের কাঠামোতে আবদ্ধ না থাকে সে শ্রেয়োনীতি বিশেষ ফলপ্রসূ হব না কার্যপালন করতে হলে পুলিশের প্রয়োজন হয়। সমাজের সবাইকে দিয়ে শ্রেয়োনীতি পালন করাতে হলে যত পুলিশের প্রয়োজন তত পুলিশ দ্বারা সম্ভব নয় কোন

সরকারের পক্ষে। অথচ অতীন্দ্রিয় জগত ভিত্তিক শ্রেয়োনীতি মানুষ পালন করে নিজের গরজেই, কারণ দৃষ্টি, সরলতা, সংযম, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, প্রেম পয়োগকার প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় মূল্যবোধ গুলোকে লংঘন করে অস্ত্রের শাস্তি পায় না কেউ। কিন্তু অতীন্দ্রিয় শ্রেয়োনীতি, মূল্যবোধ প্রভৃতির কোন স্থান নেই জড়বাদী জীবনদর্শনের মধ্যে। ফলে নিষ্ঠাবান সত্যপরায়ণ কর্মী বা নেতা তৈরী করা সম্ভব হয় না মার্ক্সবাদের দ্বারা।

প্রকৃত মার্ক্সবাদ ও সমাজবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে একান্ত প্রয়োজন একটি সামাবাদী জীবনদর্শনের। পৃথিবীতে একটামাত্র জীবনদর্শন আছে যা স্বীকার করে মানবের সামাজিক দায়। তা হচ্ছে বেদান্ত দর্শন। বৈদান্তিক সামাবাদকে অগ্রদীপন করেই আমরা আনতে পারি সামাজিক সত্য, আর্থিক সত্য, রাজনীতিক সত্য, সুযোগ সত্য সমভোগ সত্য ইত্যাদি। বেদান্ত দর্শন থেকেই আমরা লাভ করতে পারি অতীন্দ্রিয় শ্রেয়োনীতি। বেদান্ত নির্দিষ্ট পথেই আমরা সমন্বয় ঘটাতে পারি শাসন ও বাধীনতার মধ্যে। অন্তঃস্ব নির্বাচনের প্রাকালে ভোটপতাদের বিচার করতে হবে কোন দল ও প্রার্থী বেদান্তবাদের কত কাছাকাছি, এক ধনবাদ, পুঞ্জিবাদ, ইন্দ্রিয়বাদ, সন্তোষবাদ, জড়বাদ প্রভৃতির সংস্পর্শ থেকে কত দূরে।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

৩

সত্যটাকে পড়ান—

ভায়াত বিশ্বব আশ্চালানর ইতিহাস

॥ কীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা জগতকে জানিবে বাব বিপ্লবী প্রান ঘের
কিন্তু আশ্চর্যজনক করেন। শেষপর্যন্ত তাই হবে এরূপ
সামান্য হল।

ঘরের ভিতর সবাই বসন কথাবার্তার ব্যস্ত ফেরার
ওয়ে ঘরের মেত্রে পুলিস ও সামরিক বাহিনী কিংবে
এল। বাইরে থেকে ফেরার করেদার ইংকে বললেন,
"Open the door," নলিনীবাঈ প্রত্যুত্তরে বললেন,
'The door is open. Enter and be killed.'
কিন্তু পৈতাক কৃষ্ণান কোন অকিলাবেরই সাহসে ফুলালো
না বরজা টেপে দ্বিতরে ঢেকে।

নলিনীবাঈ আমায়ের কতখা বসন দ্বিৎ, আগে বহুকণ
পারি বহুকণ শুনি আছে লড়াই করা যাক। বিপ্লবী
নিজেরাই বহুতা হুলে ফেলেন এবং এখানেও চারাই
আগে শুনি চালাতে আন্তর করলেন। নলিনীবাঈই
সামনে এগিয়ে পেলেন এবং শুনি তিনিই করলেন।
সঙ্গে সঙ্গে পুলিস বাহিনীর রাইফেল সঙ্গ করি উঠল।
কিন্তু বিপ্লবীর কাণ্ডে চারটি মাত্র হতলবার। এখানে
এল বহুতাবধন করবার সময়। নলিনীবাঈর নিঃশেষে ঘরে
কিরে এলেন সগাই। অসহ্যাবু বললেন আমি এখানে
সগাই এর চেয়ে বড়, আমাকে প্রাণ করে সবাই আমি প্রাণ
যেব সময় আসে। পরিবর্তে করে নলিনীবাঈর নিঃশেষে
সগাই ঠাডিরে পেলেন। নলিনীবাঈ তার শিশুস্বামীটি ঘরে
আছেন অসহ্যাবু বহু লক্ষ্য করে আর এক মুহূর্ত মাত্র।
তারপরেই সব শেষ। হঠাৎ নলিনীবাঈ বললেন আমিও
তো পাচজন ওবে এখানে চারজন কেন? প্রাণেবাবু
উত্তরে জানালেন বনীত্র তার খোলা উপকিরে ভাষার
বাড়িতে গড়ে আগেরই পাগিয়ে পেলেন। তখন নলিনীবাঈ

বললেন যদি পালাবার পথ থাকে তবে আর চতুর পথ নয়।
এ অসহ্যাবু পথ নয়। পালাও সগাই। এসবার শেষ
চেষ্টা করা যাক। সঙ্গে সঙ্গেই পালাবার চেষ্টা করা হল,
চেষ্টা ফলবতীও হল। পুলিস বহিনী তের করে বহিনীবাঈ
বোম্বার্ড এলেন বাইরে। বাইরে পুলিসলল কিছুই টের
পেলনা। তারা সব বোম্বার্ড করেই দাঁড়িয়ে বসল।
এমনকি তারা বসন ভিতরে ঢুকল, গুলি পূর পানী উগাও।
বনীত্রবাঈ পানের বাড়িতে পরে সেখান থেকে ফেরাল
টকিরে বাইরে আসেন। একাকী পথ চলতে চলতে
লক্ষ্যে পহুত যান। কিন্তু কী কয়েন, কোথায় যাবেন।
লক্ষ্যে একটা মতাব বিজানা পেরে তাই টেনে মতাব লেপ
পারে জড়িয়েই শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই
নিজেরই বিপ্লবী কীহন পুলিসের সঙ্গে সংগ্রাম হুলে গিরে
পুলিসের পড়লেন লক্ষ্যে। পুলিসের হল তেতরে ঢুকে
কড়িকে দেখতে না পেরে ছুটে বেগেল। বিনিমি স্থানে
পুঁকতে পুঁকতে একজন লক্ষ্যে এসে মতাব বিজানার পুহত
অসহ্যাবু শেষে তাকে গ্রেপ্তার করল।

অসহ্যাবু তখন ত্যাগ করে প্রভাসবাঈ আরন্ত অসহ্যাবু
তিন মাইল হেঁটে কামাখ্যা পাগাড়ে উপর উঠলেন।
ওপরেও তেতরে অসহ্যাবু কাটেনি। আহত লক্ষ্যে থেকে
অনবহত রক্ত কবছে; পুলিস সেট রক্তের দাগ অসহ্যাবু
বরে কামাখ্যা পাগাড়ে বহুত এল। প্রভাসবাঈ অতি
কটে হাফাওড়ি দিবে এক চমকলের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে
ছিলেন। শুনি বিধি পা নিরে আর চলতে পাওছিলেন
না। এখানে পরদিন রাত নটা চলটাও সময় পুলিস এসে
তাকে গ্রেপ্তার করে। ওপন তিনি চলবন্ধি করি, পা
দিয়েছে কীধনভাবে হুল। তার উপর বিনিমি অনাগার।

এদিকে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে অগ্রগত সকলকে নলিনীবাঈ একত্র করলেন। আসামে আর বিদ্রোহীদের পক্ষে থাকার সম্ভাবনা নাই। তাই সবাই মিলে পরামর্শ চলল। কে কোথায় যাবেন। পরামর্শের সময়ে কি ভাবে সংযোগ রক্ষা হবে এবং শতাব্দী বৈরিতিক কাছাকাছি কি হবে সে নিয়েও আলোচনা চলল। দশই জাহাজী লোক প্রত্যক্ষভাবে এবং যশীবাঈ বাতীত আর সকলেও নিরাপদে কেটে গেল। অসম্ভবতঃ টাকা পরমা দিয়ে ট্রেনযোগেই আসামের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তিনি নিরাপদেই সৌহাগী ত্যাগ করলেন। তিনি আর বাঙালিগণে অপেক্ষা না করে এতদ্বারা দক্ষিণ ভারতের দিকে চলে গেলেন। স্কোর ভাবনে তিনি আর থাকা পড়েন নাই। হুজুতে মটর টেন্ডার কোর্ডে যে যাত্রার পরে মতিলাল রায়ের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহকারের এক চুক্তি হয়। ঐ চুক্তির পরে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। চলে যাবার সময় অমরবাঈ নলিনীবাঈকে বলেন, 'চলো নলিনী, তুমিও আমার সঙ্গে চল।' কিন্তু নলিনীবাঈ বলেন 'এতগুলি মানুষকে বিপদের মুখে ফেলে আমার পক্ষে আসাম ত্যাগ করা সম্ভব নয়, মাঠামশাই! অসম্ভব সময় আমার স্থান সকলের আগে কিন্তু পালানোর সময় আমার স্থান সকলের পরে।'

তৃতীয় দিন এগারই জাহাজী পৌরহী নবগ্রহ স্যারাজের পূর্বদিকে এক প্রান্তরে সব বাড়ীর বিদ্রোহী মিলিত হয়েছেন। স্থানটি পুরাতন শিল্প রোডের ধারে। পৌরহী ঘেঁড়ে কে কোথায় যাবেন কাজ কর্তৃক তাই ভাবে চলবে এবং আবার কোথায় মিলিত হবেন তাইই পরামর্শ চলছে। এই সময় এক বিরাট পুলিশবাঈনী চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল। নলিনীবাঈ দেখলেন এ অবস্থার পালানোর চেষ্টা বাড়ুপতা মাত্র সংগ্রাম বাতীত আর উপায় নাই। তিনিই প্রথমে গুলি চালালেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে দুজন পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই আহত হয়ে খরাসারী হল। কিন্তু পুলিশ সংখ্যার বহু। তাই প্রাণপ্রণয়ন এবং মরনবাঈকে তারা ঘরে ফেলল।

তারা প্রাণপ্রণয়ন আহত অবস্থার প্রেষার হয়। অতীত বিদ্রোহী যে যেমন পারাছিলেন সংগ্রাম করছিলেন নলিনীবাঈ কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে গুলি চালাতে থাকলেন। কিন্তু চতুর্থ একজন পুলিশ লাঠি দিয়ে তার হাতে প্রচণ্ড এক আঘাত করে। আঘাতের ফলে নলিনীবাঈ পড়ে খান সঙ্গে সঙ্গেই দু তিনজন পুলিশ তার উপরে চলে গেল। এই অবস্থার নলিনীবাঈও প্রেষার হলেন। নলিনী বাগচী ও শ্রবোধবাঈ এর আগেই পুলিশের লাঠি কেড়ে নিয়ে দু তিনজন পুলিশের মাথা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নলিনী বাগচী উদ্ধার করার জন্য অল্প নলিনী বাগচী তার চাত খবে টানটানি করতে থাকেন। নলিনী বাগচী এই সময় তাকে এবং শ্রবোধবাঈকে বলেন, তোমরা সবে পড় তারা ইত্যদ্যঃ করছেন দেখে তিনি বললেন মনোহা হিসাবে আমি তোমাদের আদেশ করছি তোমরা আর বিদ্রোহী অপেক্ষা না করে পালানো। ফলে মনোহার আদেশ পালন করে তারা দুজনে সংগ্রাম ক্ষেত্র থেকে সরে পড়লেন। কিন্তু ওরান থেকে একটু দূরে এসেই তারা পথ হারিয়ে ফেললেন। অকস্মাতঃ পাহাড় অক্ষয়ের পথ তাদের অকস্মাতঃ। অপ্রত্যাশিত ভাবে এক নাপা সন্ন্যাসীরা আবিষ্কার হল সেখানে। তারা কেবলি বিশেষ পড়েছিল। জলার দিক দিয়ে পালানো। পালানোর স্থানটা আত্মল দিয়ে নির্দেশ করেই নাপা সন্ন্যাসীরা অক্ষয়ের মধ্যে অদৃষ্ট হয়ে গেলেন। তার নির্দেশিত পথে চলে দুজনে অক্ষয় থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এলেন। এরপরে বিদ্রোহীরা বিনা হুজু আর কোথাও থাকা কেন নাই। বগুড়ার এক বিদ্রোহীকে প্রেষার করতে দিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর হুজুদাস নিজেকে প্রাণ দিতে হয়। পৌরহী ত্যাগ করে নিতু পাল আটবতিয়ার এক অপ্রত্যাশিত ছিলেন। সেখানে তার সঙ্গে ছিলেন দোখিম কর। পুলিশ তাদের প্রেষার করতে গেল তারা থাকা পড়েন। টাকা ফলতাবাধ্যমেও নলিনী বাগচী এবং তারিণী মনোহরের ভীষণ দৌড় পুলিশ পারিনি। তারা সর্বস্ব-সময় স্তূভবণ করে।

(চলবে)

রাষ্ট্রপুরু শ্বরেজ্ঞ নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অংশাবলি]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

১৯০৯ সালে আমার বিলোভ ভ্রমণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এতদ্ব্যন্বয় আমি যা বলেছি তা ১৯০৯ সালের
শ্রাবণ মাসে। এখন আবার আমার ১৯০৯ সালে
কিছু বেতে হচ্ছে। ১৯০৯ সালের প্রথম দিকে আমাকে
লন্ডনের ইম্পেরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে যোগদানের জন্য
আমন্ত্রণ জানান হয়। পরবর্তী জুন মাসে এই কনফারেন্স
কলকাতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অসংখ্য সমস্ত সংবাদপত্রের
প্রতিনিধিগণের এই সম্মেলনে যোগদানের ব্যবস্থা হয়েছিল।
এখানে ইতিহাসের চাড়া ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে
কেবলমাত্র আবারোই এই সম্মেলনে যোগদান করার জন্য
আজ্ঞান জানান হয়। আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন
বিঃলোডাট ক্রেসার যিনি পূর্বে টাইমস্ অব ইন্ডিয়া
সহ ব্রুজ ছিলেন। এই সম্মেলন ডাকার সময় তিনি ব্রুজ
ছিলেন বি টাইমসের সঙ্গে। এই আজ্ঞান আমার কাছে
একটা সম্মেলনের বিষয় বলে মনে হয়েছিল এবং আমি তা
বেশ উপলব্ধি করেছিলাম। কিন্তু আমার লেখা কিছুটা
বাধা ছিল। এটি সময়টার বিশ্ববিদ্যালয়ের নব বিধান
অনুযায়ী রিপন কলেজের পরিচালনা ব্যবস্থা নিকলপন করার
কাজ চলছিল। কলেজটি এখন সবে মাত্র একটা
সাংবাদিক দলকে আকর্ষণ করে উঠেছে। সচরাচর
কলেজের আইন শিক্ষা বিভাগের স্বীকৃতি নিয়ে।
একটা সময় কথা বিবেচনা এখন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ
এই আইন শিক্ষা বিভাগটিকে আর স্বীকৃতি দেওয়া হবে
না বলে মনে হয়েছিল। যা হোক, তার একগুচ্ছ
বেকার এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে দৃঢ়তা জানাতে
হয়। তার বেকারের অন্তর্ভুক্তি হওয়ায় কলেজ এবং

কলেজ কর্তৃপক্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদাকে যেনে নিতে
প্রস্তুত হওয়ার পথে দলটি দ্বীভূত হয়। মাত্র আশ
জানেন যে কয়েক কলেজ ছাড়া বাংলার কর্তৃপক্ষের
বিশেষ অগ্র সম্মেলন কলেজগুলিকে দাখিল করে দিলেও
রিপন কলেজকে তার স্ব স্বার্থের ও বে অবস্থায় আছে
নেই অবস্থার রাখতে প্রস্তুতি দেওয়া হয়।

তথাপি আমার যে বিশেষ বেতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে
শেয়েছি, তা বলা যায় না। এই অবস্থায় আমি তার
একগুচ্ছ বেকারের পরামর্শ চাইলাম। তিনি আমার
অগ্রপথিত কলেজের কোন কতি হবে না এমন আশা
দিয়ে আমাকে এই আশ্রয় গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন।
গ্রিক একই সময় আশা দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন
চ্যান্সেলার তার আন্তোয় মুখাতি। আন্তোয় মুখাতি
ছিলেন তখন বিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ। এইভাবে আমি
ইংল্যান্ডে রওনা হওয়ার পূর্বে কলেজের আইন শিক্ষা
বিভাগ সম্পর্কে কতকটা নিশ্চয় হলাম। কারণ বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সদস্য আনন্ডিত হয়ে
দিতোকেটে মেম্বারদের সঙ্গে কলেজের গঠনস্থল নিয়ে
আলোচনা করার সময় কিছুই দ্বিভূত হবে না। অতঃপর
আমি নিশ্চিত মনে যে বাংলার মাঝামাঝি সময় ইংল্যান্ডে
যাত্রা করতে করতে সময় হলাম। তা না হলে আমার
অগ্রপথিত কালে আমাকে কলেজের অগ্র প্রকৃষ্টি হইন
করতে হত।

আমার ভাগ্যই আমাকে আমার জীবনে একজন বড়
পর্যায়ক করে তুলে। তবে দুই প্রধান খাফা কালে

করে সেখানে সে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তার পরিপ্রেক্ষিতে—
সবকিছুই ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দিতে
হবে এবং কারণে: মাদ্রাস বঙ্গল অধ্যাপক প্রকৃত উদ্দেশ্য
হবে।

দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে আলোচ্য বিষয় ছিল, সাধারণতঃ
সুপ্রসার। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কার্ট নড
অথবা এড্‌ মিগনটি য: ব্যাক কেহা। আলোচ্যটি
বীড়ান দিয়ে নো-প্রতিকার প্রেরণ উপর। আমি সভা
সম্মুখে চলে যাওয়াও জন্য সব মাত্র বন্ধিত্ব করছি,
কারণ আবারও কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির এক সভার
ফলে হবে, এমন সময় অসম্মত এবং অসাম্প্রদায়িকভাবে
লক্ষ্য কোমার যেন অসম্মতই ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট
কবে এক চাপের প্রকোপে 'জেন্সন কবে বসলেন যে
একবার টিক শিলা যে ভারতে যে সমস্ত অসাম্প্রদায়িক
ঘটনাবলী ঘটছে তা সেখানেই এক দেশীয় সাধারণ-
পাত্রের দ্বারা জানিয়ে উক্তিতে লাগা। পাড়ে? দুঃখিত
যদি ও 'সিয়ার' সহিত আমি সেই চাপের 'উক্তি'
জনা। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বলেই যেন
বিশ্ব সাধারণের একেই কোন রেহাই পাওয়ার উপায়
নেই যদিও আশংকা যে খাম্বাইন জানান হয়েছিল তা ছিল
প্রায় এক হকম ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারণ ভারতীয়
প্রেসে আমিই হিলাম একবার প্রতিনিধি। তাই একেই
কিছু না বলে চূপ করে বসে পাকা বানো এই খোঁজকে
বীকার করে নেওয়া। উত্তর যোগে বলে ঠিক
কবে ফেললাম। 'ক' সন-চিন্তা করে ঠিক করে চোখের
মানের কাছে কিছু বলতে চাই বলে আমার নাম পাঠিয়ে
দিলাম। সবকিছুই আমার কৈ 'সুজাতা' করার চেষ্টার
কাছে ভাঙা হল। আমার এই বক্তৃতাটি ছিল খুব
সংক্ষিপ্ত। তার পূর্বে কথটাই এখানে তুলে দিচ্ছি:—

"এই বক্তব্যের সাধনে যে সমস্ত বিষয় বিবেচনার
অন্ত আছে তাই সঙ্গে কিছুটা সাধারণ্য হীন বলে জন
হতে পারে এমন কোন মতবাদের ব্যাপারে মত প্রকাশ
করতে দিয়ে আমি দুঃখিত। কিন্তু সর্ব প্রকার
আমাদের কাছে এখন এক আত্মনির্ভরশীল মনোভাব,

যাকে আমি ঠিক জানে বলব না, তবে, যাতে তিনি
আমাদের কাছ থেকে জানতে চান যেন যে সাম্প্রতিক
কালে বাংলাদেশে যে সমস্ত অসাম্প্রদায়িক কার্য-
কলাপ ঘটছে তা এক দেশীয় ভারতীয় প্রেসের দ্বারা
জানিয়ে উক্তির ফলেই প্রকৃত কিনা। আমার কাছ
থেকে এই প্রস্তাব একমাত্র নির্ধারিত, নির্দিষ্ট, ও গুঢ়
প্রকার হল "না" (তখন, তখন, সাধারণ সাধারণ)।
ভারতীয় সাধারণ পক্ষে যা বলা হয়েছে তার সব কিছুই
সমর্থন করতে আমি এখানে আসিনি।
সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক অংশ থেকে যে সমস্ত সাধারণিক
ভাবের এখানে উপস্থিত আছেন তাইসেই আমি
জেন্সন করছি জনসাধারণের দ্বারা-সম্মতিত্ব বহু বহু
সময় সাধারণিক ভাবে সাধারণ পক্ষের তত্তে যা বলা
হয়ে থাকে তা তারা সমর্থন করতে প্রস্তুত কিনা।
আমরা কি সম্মত? না, তা নয়, আমরা সম্মত
নই। তুল করার সম্মত আমি আমার বোধ আছে।
এমন কি সময় সময় সাধারণিক ধর্মের তুল করার
সম্মত। সুজাতা আমি এই সবকিছু বলতে চাই যে
কোন কোন ভারতীয় সাধারণ পক্ষে সময় সময় দুর্ভাগ্য
করে যে সব দ্বারা জান হীন উক্তি প্রকাশ করেছে,
তার আমি সমর্থন করতে ব্যক্তি না। কিন্তু একবার
স্বপ্নে রাবা উচিত যে এই সময় সাধারণ পক্ষের সাধা
অতি অল্প দায় কোন ভাবনা নেই (তখন, তখন)।
এগুলির প্রচার অতি সৌমহদ এবং জনসাধারণের
উপর এর প্রভাবও খুব সাধারণ। আমার মনোভাব
সম্পর্কে যেন কোন তুল দায় এখানে না হয়। বাংলা
দেশে দুর্ভাগ্যকর যে সমস্ত অসাম্প্রদায়িক কার্য-
কলাপ ঘটছে তার থেকে দূরত্ব বোধের জন্য আমি
এখানে ছাড়ছি। এখানে দাঁড়িয়ে আমি যে কথা
বলছি তাতে বাংলার অসাম্প্রদায়িক উত্তর চিন্তাই প্রকাশ
করছি। শুধু বাংলায় কেন, সারা ভারতেরই উত্তরতর
চিন্তা কথা যোগ্য করে বলছি যে আমরা সবকিছুই
সেই অসাম্প্রদায়িক কার্য। কলাপের অন্ত পরিচালনা
বোধ করছি (হর্নসন)। আমার ভারতীয় সাধারণ-

গীতা এবং আদি নিজে আদ্যন্তের সংবাদ পত্রের দ্বারা
আমাদের সাধারণ পুস্তক ভাষার সেই সমস্ত ভাষার
নিম্না করেছি। আমাদের দেশের লোকের ধর্মনিম্ন
জীবন ব্যতীত যথেষ্ট জ্ঞাত পণ্ডিতই হোক আর অজ্ঞাত
সাধারণ হোক যে গভীরতম বিদ্যা আছে এই সমস্ত
ভাষাগুলি তার বিহীন। তাইকে কোন রূপ
অনুভব না করে বলতে পারি যে এনালিটিকের জন্ম
প্রাচ্যে নহ, পশ্চাতে। এটা হচ্ছে একটা ঐচ্ছিক
ভাব-প্রবণতা যা পশ্চাতে থেকে ভারতে নেওয়া
হয়েছে। আমরা আশা করি লর্ড বলির শক্তি প্রদত্ত
চিত্তের বিধান তা ভারত থেকে বিলুপ্ত হবে।
আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে যে সমস্ত কারণে ঐ অপ্রতিরূপ
ঘটনাগুলি ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করি। আমরা
আমি একথাও স্বপ্ন করি যে এটা একটা অসাম-
নৈতিক সভা। তাই আমি আমার যে প্রয়োজন
পূরণ করে আমাদের প্রাচ্যের আনন্দবোধই
অনুভবন এখানে করলাম (তুল্য স্বর্গদর্শন)।
প্রেমের স্বাধীনতাকে আমরা ব্রিটিশ শাসনের
অন্ততম স্তোত্র স্বাধীনতা স্বপ্ন পত্রকারি। সাম্প্রতিক
কারণেই যে কেবল প্রেমের স্বাধীনতা বেওয়া হয়েছে,
তা নয়। জ্ঞানের বিস্তার ও প্রয়োজনীয় সংবাদ
প্রচারের উপায় হিসাবে এটা বেওয়া হয়েছে। অন্তত
ভারতীয় প্রেমের সেই মহান মুক্তিযাত্রার সেই আশা,
সেই লক্ষ্য এবং সেই আকাংক্ষা ছিল বলেই আমি
আশা রাখি। ভারতীয় প্রেমের মুক্তি যাত্রার ক্ষমতা
যে পুঁ-উপন লক্ষ্য মৌলিকের লক্ষ্য লক্ষ্য করেছিলেন
তার প্রতিক্রিয়ার উত্তরে লক্ষ্য মৌলিক হলছিলেন,
'আমরা ভারতের শুধু শান্তি-শুখা লক্ষ্য লক্ষ্য, বাজনা
আমাদের ক্ষমতা এবং আর্থিক বাস্তবিক পূরণের ক্ষমতা
আছে, তা নয়। আমাদের এখন আমাদের আর একটা
উচ্চতর, মহত্তর উদ্দেশ্য আছে- তা হচ্ছে পূর্ব যেনে
পশ্চিম দেশের জ্ঞান, কৃতি লক্ষ্যতা চলে বেওয়া।
আমার বল বাসীর পক্ষ থেকে আমি বলছি যে তারা
এই ক্ষমতা লক্ষ্যের দ্বারা এবং দেশের জনগণের

সুবিধার ক্ষমতা ব্যবহার করছেন এবং প্রার্থনা করছি
যেন এটা আমাদের দীর্ঘ দিন ধরে ইচ্ছা-ও ও ভারতের দ্বারা
সমস্তায়েই ব্যক্তি ব্যক্তি (স্বর্গদর্শন)"।

লক্ষ্য উপরে আমরা এই বক্তৃতার প্রভাব কতখানি
পড়েছে তা আমার বলার কথা নয়। আমি স্বপ্ন বললাম
যে আমি কোন সাম্প্রতিক বিতর্কের মধ্যে দাঁড় না,
দাঁড় না, আমার বক্তৃতার আমি প্রাচ্য লক্ষ্য সংঘ প্রদর্শন
করত তখন সমস্ত পূর্ব তুল্য স্বর্গদর্শনিত মুগ্ধিত হয়েছিল।
সভা শেষ হতে গেল কনফারেন্স উপস্থিত কানাকা প্রেমের
জন্মে ল্যারি হিউ গ্রাহাম আমাকে বলেছিলেন যে আমার
বক্তৃতাকে একটি "বিতর্ক বক্তৃতার আদর্শ বলা যায়"।
প্রেম কনফারেন্সের আর একজন সদস্য বলেছিলেন "ঐ
বানাকি লক্ষ্য কনফারেন্সের সঙ্গে কনফারেন্সের পূর্ব তুল্যকেই
একবারে তেজি দিয়েছেন।" যোগাযোগ তাৎবে একথা
সকলেই অনুভব করেছিলেন যে আমরা এই প্রকৃতির বেওয়া
ঠিকই হয়েছে। আমিও মনে পূর্ব পূর্ণি হয়েছি এটা ভেবে
যে আমি সাম্রাজ্যের এই সাম্প্রতিক লক্ষ্যের ভারতীয়
লক্ষ্য পত্রের দ্বারা লক্ষ্য তুলে ধরবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

এইমিনিই আমাদের নামা বিশ্ব নিয়ে আলোচনার ক্ষমতা
সভা বলত। আর তার উপরে বানাকি পিয়ার আদর্শ।
এছিল এক নিরবস্থিতি কর্মের পালা যা উৎসব অনুষ্ঠানের
মধ্য দিয়ে লক্ষ্য হয়ে উঠতো। জ্ঞান হিসাবে ইংরেজরা
বাড়িয়ে পূর্ব আভ্যন্তর বেওয়া না; কিন্তু তারা খাটি অতিথি
পায়ন এবং তারা এমন উদ্ভব তাদের অতিথির প্রতি
আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন যা কখনও তুলে ধরবার সুযোগ
দেয় না। শেক্সপীয়ারে আমাদের প্রত্যেককে একবার
করে ছুরি উপহার বেওয়া হয়েছিল। শেক্সপীয়ার ছুরি
বানাকি লক্ষ্য বিখ্যাত। তেপস্টারে গোটের কাঠখানার
কাঠ বেওয়া শেষ হল আমাদের কাঠখানা পরিদর্শনে
কাজকে স্বপ্ন দাঁড় নির্দল স্বপ্ন একবার করে স্বপ্ন
পড়েট নোট বৃদ্ধি বিতে বলা হয়েছিল। তিনবার এবং
লাকের টেবিলে টেবিলে খোলা প্রাণে আন্তরিকতার সহিত
সব কথা বক্তা, আলোচনা আলোচনা হত।

11 DEC 1979

विश्ववो प्रसुक्काला।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ବିକାଶ ଶ୍ରମାନ୍ତର—ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୯୧—୩୦୦

विज्ञानी महाभाष्यक राजविहारी—प्रबोध ब्रह्मसमादेव—३००

कीदाम कमल मण्डल—

- | | |
|--|---|
| ১। বাংলায় অগ্নিবৃন্দ—১৫০ | ২। বহির্ভাষ্যে ভারতীয় বিদ্যে প্রচেষ্টা—১০০ |
| ৩। অমূল্য নগরিত্তরিত্তি, দ্বিতীয়—২০০ | ৪। জীবনী গণ্যম কাহিনী—১০০ |
| ৫। কাকোয়ী পদ্যবৃত্ত—১২৫ | ৬। কলকাতা বাহ্যিক সংগ্রাম কাহিনী—৪০ |
| ৭। মাদবিহারী ও অমূল্য নগরিত্তরিত্তি—১০ | ৮। বহির্ভাষ্যে ভারতীয় বিদ্যে প্রচেষ্টা—১০০ |
| ৯। বিদ্যাকামল ও মদ্যমদ্য—৫০ | ১০। বিদ্যাকামল ও মদ্যমদ্য—৫০ |
| ১১। মদ্যমদ্য ও মদ্যমদ্য—৪০ | ১২। মদ্যমদ্য ও মদ্যমদ্য—৪০ |
| ১৩। মদ্যমদ্য ও মদ্যমদ্য—৪০ | ১৪। মদ্যমদ্য ও মদ্যমদ্য—৪০ |
| ১৫। মদ্যমদ্য ও মদ্যমদ্য—৪০ | ১৬। মদ্যমদ্য ও মদ্যমদ্য—৪০ |
| ১৭। মদ্যমদ্য ও মদ্যমদ্য—৪০ | ১৮। মদ্যমদ্য ও মদ্যমদ্য—৪০ |
| ১৯। মদ্যমদ্য ও মদ্যমদ্য—৪০ | ২০। মদ্যমদ্য ও মদ্যমদ্য—৪০ |

ଆବିଷ୍କାର :- ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଦାଶ ଟି ଡକ୍ଟର/ଡା-୧୦୦୦୧

ଫାଇଲ୍‌ନଂ—୧/୧/୧/୮ ସମ୍ବିଧାନାଟାଳୀ ଗ୍ରୀଟ ବଳିକାତା-୧୦

— मन्त्रालय प्रमुख —

ଅଭିନବୀନ ଚଟୋପାଧ୍ୟାୟ (ମହାକବି) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତ୍ରିମୁଖ ଛାଟୋଡ଼ୀ

ਸਲਾਹਕ—ਤੈਜਾਤਿ ਨਾਨਕ ਗਾਂਧੀਭਰੀ

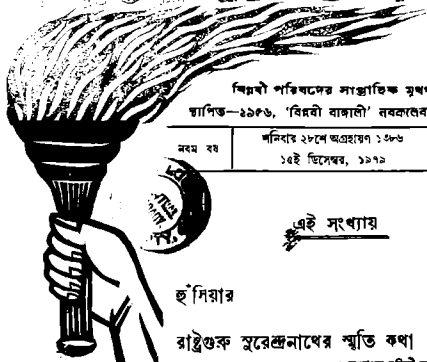
ବିକ୍ରିର ବିଶେଷ ଗୁଣ୍ଡିନିଧି—ଶ୍ରୀବୀରୀନ ଯୋଗ । ସେବାନା—ଶ୍ରୀକନ୍ୟାମାଳ ମାଳ ।

প্রকাশক ও বিক্রেতা :—শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত । প্রচার সচিব—শ্রী ব্রজেন দাস ।

बिहार की वापस का विधान :- २४ अक्टूबर १९५६, कलिकाता-१००००९.

মূল্য:—প্রতি: পাণ্ডুলিপি, ১১৭ নং কেমব্রিজ স্ট্রিট, কলিকাতা—৭০০০২২

বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
 প্রাপ্ত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবমাব্দে—১৯৭১

নবম বর্ষ

শনিবার ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৬

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

১২ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

ছ'দিয়ার

। সম্পাদকীয় ।

রাষ্ট্রপুত্র সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মণিমা মোহন দাস ।

আসামের ভূকম্পন

। ইন্দ্রজিৎ সেন ।

নির্বাচন প্রসঙ্গে

। কানীশ দত্ত ।

ইন্দিরার রাজনৈতিক কর্ম ও কূটকৌশল

। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শাসন ও স্বাধীনতা

। প্রবোধ বসু ।

সপ্তম লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

প্রার্থনা করে, যারা কেড়ে যায়
 তেজি কোটি সুখের গ্রাস,
 বেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায়
 তাদের সর্বনাশ ।

—নজরুল

ভূসিয়ার

পৃথিবী থেকে কৃতজ্ঞতাবোধ, স্বল্পক্ষের ফলাফল, প্রতিবেশী জনোচিত ভয়ব্যবহার এবং অস্বাভাবিক প্রকারের সম-গুণাবলী যেন উবে যাচ্ছে। কারো কারো অবিস্মৃতিভারিতা কি ভীষণ কলশ্রুতি হতে পারে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে, সে সম্বন্ধে সম্যক চেতনা বোধও যেন বীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এই প্রকারের ঘটনা ঘটছে ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও সৌদি আরব প্রভৃতি দেশগুলিতে। ইরানের ঘটনাবলী-গুলি সবার শীর্ষে স্থান পেয়েছে! মক্কার পবিত্র মসজিদ কে বা কারা অপবিত্র করল, তার সঠিক খোঁজ দর না নিয়েই, ধর্মোদ্ধ নেতার উদ্বাহিত আনুগত্যের নৃত্যবাসগুলিতে অগ্নিসংযোগ শুরু হয়ে গেল। ধর্মোদ্ধ ও মুক্ততার কত নগ্নপ্রকাশ হতে পারে, তার সাক্ষ্য দিতে এই সব ঘটনাগুলি। হুশের কথা, অবস্থার ভয়াবহ পরিণামের সম্ভাবনা বুঝেও বিশ্ব জনমত কতটা সোচ্চার ও সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল, ভতর্টা হয়েছে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় স্তরে একটি ঘটনার প্রতি বোধহয় বিশ্বজনমতের দৃষ্টি সম্যক আকৃষ্ট হয় নি। সেটা হল, বাংলাদেশ গত :কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতসীমাহে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গুলি বর্ষণ করে চলেছে। ভারতের তরফ থেকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমাধানের চেষ্টা হলেও, বাংলাদেশ কিন্তু সমানে গুলি বর্ষণ করেই চলেছে। অথচ বৈঠকে বসবার ভাগ করলেও, গুলি চালনা থামছে না। সাময়িক শক্তির তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করলে, বাংলাদেশের এই দুঃসাহসের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে, নির্দিষ্ট এ কথা বলা যায় যে ভারতের বিনা সাহায্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভ করা কোন কালেই কিছুতেই সম্ভব হত না। বাংলাদেশের বার্ষিক অনেক ভারতীয় জীবনহানিও করেছেন। কোটি কোটি মানুষকে আশ্রয় দিতে বিরাট কৃষি নিয়েছেন এবং প্রকৃত অর্থ ব্যয়ও করেছেন। কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে কোন লাভজনক প্রতিদান চাওয়া হয় নি। নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবার যে উচ্চ আদর্শ ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলেছে, এটা ভারই একটা অংশ মাত্র। এটা আশা করা অবশ্য অসম্ভব নয়, যে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে না ও প্রকৃত সং প্রতিবেশীর মত ব্যবহার করবে। ভারতের তরফ থেকে এই নীতি পূরাপূরি বাস্তবায়িত করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্বন্ধে সেকথা বলতে পারলে আমরা খুশী হতাম। বাংলাদেশ-কি কারো উদ্বাহিত ও কারো সাহায্যের উপর নির্ভর করে এই প্রকার উগ্রত্ব আচরণ করছে? কিন্তু জন্মের যদি কোন ক্ষণজ্ঞান থাকে, তবে এই উপদেশ শ্রবণে রাখা উচিত যে ‘কলীষসাম্পদ’র কথা শেখাব্যাক্ত তাদের পক্ষে জরম অশুভসায়ক হবে। একজন থেকে স্তারা বিজ্ঞত থাকলে, এই প্রত্যাশাই করবে বিশ্বের সমস্ত চিন্তাশীল মানুষেরা।

সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারকে আসামের ঘটনাবলী সম্বন্ধে শুধু সজ্ঞক থাকলেই হবে না, কয়েক ব্যবস্থা নিয়ে এই বিচ্ছিন্নতাবুলক অপচেষ্টাকে ব্যাহত করতে হবে। অস্ত্রব্যয় বেশের সংহতি বিপন্ন হবে এবং দেশ দুর্বল হয়ে পড়বে। এই সর্বসাধারণ পরিস্থিতি থেকে দেশকে বাঁচাতেই হবে। ভোট লাভের আশায় দুঃস্বভাবিকীকে যেন প্ররোচ দেওয়া না হয়। ভারতবর্ষের ভিতরে ও নিকটবর্তী কয়েকটি দেশে যে বিপদের অশনি সংকেত দেখা দিলে, সেদিকে অতদূর প্রহসার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন। সামান্যতম

আসামের ভূকম্পন

॥ ত্রিসতীহুণ সেন ॥

‘আসাম বন্ধ’ আরম্ভ হয় ১২ই নভেম্বর। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল যে বিদেশী নাগরিকরা আসামে অমুপ্রবেশ করেছে। ও এমন কিছু নতুন কথা নয়, আমরাও তখন গুরুত্ব সেইনি। এখন আবার শুনিছি শুধু নাত্র অমুপ্রবেশ করেই ক্ষান্ত হয়নি, ভোটার তালিকায় নাম উঠিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করতে। খুঁজে বের করে, তালিকা থেকে নাম কেটে না দেওয়া পর্যন্ত নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন একযোগে এই বন্ধের ডাক দিয়েছেন।

অমুপ্রবেশ কথাটার আর একটা অমুপ্রবেশের কথা মনে পড়ল। অনেকদিন আগের কথা। সেও একটা অমুপ্রবেশ দিয়েই শুরু। ঠিক এ জাতীয় নয়, কিন্তু আরও ব্যাপক। কোন ভোটার তালিকায় সে অমুপ্রবেশ খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন আসে না, বোঝাও যায় না কতদূর গভীর সেই অমুপ্রবেশ। সে অমুপ্রবেশ ছিল জনতার মনের ভেতর চুপি চুপি ঢুকে পড়ে বাসা বাঁধা। অভিশপ্ত বাণ্যাক্ত ব্যাপার সেটা।

তখনো বাইরে জাপানী লড়াইয়ের তাণ্ডব চলছে, ঘরে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষের কবাল ছায়া। তার মাঝে বেধে উঠেছিল আগষ্ট বিপ্লব। একদিকে গর্জন ‘ইংরেজ ভারত ছাড়ো’, অন্যদিকে প্রতিজ্ঞা ‘করবেই ইরা মরবে।’ ইতিবাসের সেই সন্ধিক্ষণে, রোগা শুঁটকো একটি মাছ, তাঁর শূন্য রাজনীতির ফোলা দেখাতে দেখাতে, শেষটার যখন একটা

আন্তো পাকিস্তান চেয়ে বসলেন, আমরা হেসে ফেললাম। আমরা বাঙ্গালীরা। অকারণেই হেসে ফেলি। কাউকে বলি ‘উড়ে,’ কাউকে ‘মেড়ে’, কাউকে ‘খোঁটা’, কাউকে ‘নেড়ে’। অপরিচয়ের তালিকা আর কি। তার মান্ডলও কম দিতে হয়নি আমাদের। জিন্না সাহেব, যিনি একবর্ষও বাংলা জানেন না, শুধু মাত্র একটা চাই এর জোরে, পূর্ব-বাংলার মুসলিম ভাইদের মাতিয়ে হুলবেন। এরচেয়ে হাসির কথা আর কি হতে পারে? বাংলার গ্রামের হিন্দু আর মুন্সিম, সে কি আলাদা? গভীর দুখীর কি কোন জাত আছে? বেঁচে থাকবার অধিকার দাবি করা ছাড়া, আর কি কোন দাবি থাকতে পারে ওদের?—আমরা তাই ভাবতাম।

জিন্না সাহেবের সঙ্গে জোড় বাঁধলেন আর এক সাহেব। তাঁর বেঁটে খাটো জালাব মত মুক্তি দেখে, আর তাঁর উর্দু টানের বাংলা শুনে, আমরা হেসে সাড়া। আমরা হাসতে থাকলাম, আর সেই ঠাঁকে পূর্ব-বাংলার মুসলিম চাষী-ভাইরা, একটি-একটি করে চুপি হয়ে গেল। ইংরেজ তান্ত্রিয়ে বেশ বাধীন করছি, আর সেই শেষের আধাবান। কেড়ে নেবার জন্ত যে গোপন বড়বস্ত্র চলেছে বেহাল করলাম না। যখন বেহাল হল তখন প্রতিবিধানের সময় নেই।—কলকাতা ধ্বংসের মুখে, নোয়াখালী বিধ্বস্ত।

জাতীয় জীবনের সেই মহা পরাজয় ভুলতে

চাইলেই কি ভোলা যায়?—প্রথম দিকে আসতে লাগল ফিস ফিস গুজব, দূর দূর গ্রামের ভয়াল অবিবাহিত কাহিনী। বিশ্বাস অবিবাহিতের সীমা তখন মিলে মিশে ভাল গোল পার্কিয়ে গেছে। একদিন খবর এল দূর গ্রামের গুণ্ডার দল এগিরে আসছে। 'লাঠি আনে', 'বোমা বানাও', 'টহল দেও গ্রামের পথে'। ওপাড়া আশ্বাস মিল, 'আমরা আছি ভয় নেই।' অনিশ্চিত শব্দায় কাটতে লাগল ঘিন, অনিশ্চয় রাত্রি।

অকস্মাৎ একদিন দূরের আকাশ লাল হয়ে উঠল। কানে এস সমবেত হুংকার। সেই গভীর নিশীথে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে, সেই লাতন্য নির্মমতা ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্ট বারা দেখেছেন মনে পড়লে আজও তাঁরা শিউরে ওঠেন। সেই আগুনের হলকা, সেই ধোঁয়ার গন্ধ, আহতের যন্ত্রণার সেই কাতর আর্তনাদ, আজ মনে হয় সবই অবাস্তব। মনে হয় একটা দৃশ্যের স্মৃতি।

এরপর ইষ্টিশন। পোটলা-পুটলি, কেনে-হাড়ি ভাঙ্গা টিনের বাস। দু' একটি শিশু, শতছিন্ন ময়লা কাপড় জড়িয়ে ওদের মা। বোমটার কীক দিয়ে ছুটি চোখ। লক্ষা সত্বেচ, ভয় বিখ্য, কোন অসুস্থি নেই সেই চোখে। হৃদয় ভাসছে ফেলে আসা একটি ছবি—হিজল বুলে লাল একটু পথ, গোবরালপা ঘরের পিড়া, ছোট্ট, একটু উঠল, এক কোণায় তুলসীতলা। মড়াই ভরা ঘান গোয়ালে গরু বাছুর। চালের উপর লাউ কুমড়োর ভণা। একটি অখ্যাত গ্রাম একটি শাস্তিপূর্ণ কুঠির।

সে কি আজকের কথা? আপনাতা বাবা তখন শিশু ছিলেন, কিন্তু বাবা তখনো পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেননি। আপনাতা বুঝেন না। নিজ দেশ, ঘর-বাড়ী, সহায় সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন

সব বিসর্জন দিয়ে, চির নির্বাসন কি নিদারুণ অভিশাপ। এর আঘাত মানুষকে কি পরিমাণ শক্তিহীন করে ফেলে। শুধু চোখে ভাসে টিমটিমে একটু আশার সঙ্গতে। মানুষের আশা এক অদৃষ্ট জিনিষ। নিবু নিবু করে, কিন্তু কখনই নেবে না।

এই তিরিশ বছর ধরে, ঘর ভাঙানো মানু-গুলো, কর্মজীবন নামে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ঠোকা-ঠোকি বেয়েছেন। আবেগ ও সন্তোষের জ্বাল, মনে থেকে সাক করে ফেলে দিয়েছেন। নিকটে দূর, দেশে বিদেশে আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটোছুটি করেছেন। ভরাইয়ের অরণ্য, আত্মমানের ধীপ, দণ্ডকারণের উষর বনভূমি। নানা কাজে ও চিন্তায় জড়িয়ে রেখেছেন নিজদেশের। ধীরে ধীরে, জীবন থিথিরে এসেছে, সঙ্গতিত হয়েছে। বাসা বেঁধেছেন, নতুন স্বদেশ পেয়েছেন। ঝাট থেকে গনিকটা মুক্তি, একটু বুদ্ধিবা নিরাপত্তার অনুভূতি। চরম সর্বনাশের পরে, খুঁটে খুঁটে শাস্তির বাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা।

তাদেরই কারো কারো পথ থেমেছিল এসে আসামে। আসামে, কাচাড়ে মেগালয়ে, ত্রিপুরায় আজও তারা ভরতবাসী। গ্রামের যে মাটিটুকু ফেলে এসেছেন, তা নেতারা বিলিয়ে দিলেন, না ডাকতে লুটে নিল, না কি রাক্ষসী পন্থা মেঘনাই ভেঙ্গে নিয়ে গেল, আজকে তাতে কিছুই বায় আসে না। গ্রাম-তো শুধু মাটি নয়, ক্ষেত পুকুর আর বাড়ীর ভিত্তি নয়, যে হারিয়ে গেলে সারা জীবন কেঁদে মরতে হবে গ্রামের অসল মনুষ্য, যারা আমার ভালবাসে। আমার সঙ্গ কামনা করে। জেমনি মানুষ বেখানে, সেখানেই আমার গ্রাম।

আজ কেন আবার তাদের স্মরণে হয় যে তারা বিদেশী? বছরের পর বছর বাস করার পরে আজ আবার কেন তারা বহিরাগত, তারা অব্যাহিত? কেন আবার স্মরণে হয় আসাম রাজ্যের জল-কল

ভাস্কর কল্ল নয়! আসাম কি ভারতের বাইরে? কিম্বা ভাড়াই কি অস্বাভাবিক?

নির্বাচন আগত প্রায়, ভোটার তালিকা সংশোধন হচ্ছে। তা হবেই তো। এতে আপত্তিই বা কি থাকতে পারে? বিতর্কিতই বা কেন আসবে? ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ার কথা নয়। ৭৭ সালে যে তালিকা অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেটিকে সংশোধন করে কাজ চালাবার কথা। সর্বাঙ্গই তাই করা হয়ে থাকে। ফলত: সেই তালিকাটিই থাকবে, শুধু যারা চলে গেছেন [কিম্বা মরে গেছেন] তাদের নাম বাদ পড়বে। ইতিমধ্যে যারা সাবালক হয়েছেন, কিম্বা স্থান পরিবর্তন করে এখানে এসে বসবাস করছেন, তাদের নাম যোগ হবে।

সমগ্র আসামে ৭৭ সালের নির্বাচনের সময় ভোটার ছিলেন ৭২ লক্ষ। এখন বেড়ে হয়েছে ৮৫ লক্ষ। আড়াই বছরের বাৎসরিক ১০ লক্ষ ভোটার স্বাভাবিক অবস্থার বাড়তে পারে না। কোথাও কারুপুি হয়েছে সন্দেহ নেই। যারা ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবীতে বড় ভেংকছেন তারা অস্তায় কিছু করেন নি। যে আইনী অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দিয়ে নতুন করে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু কথা এই, নির্বাচনের তো আর ঘেরি নেট, সময় আছে কিনা নতুন তালিকা প্রস্তুতের। সময় না থাকে, পরে সংশোধন করলেও বা ক্ষতি কি?

আসামে বিদেশী অনুপ্রবেশ কল্পিত পায়ে এক বাংলাদেশ থেকে আর এক নেপাল থেকে। ছুটে বেশই খুব দরিদ্র। অল্প চাকরি উপযুক্ত বাড়তি অর্থ নেই একটুকরো। আসামে এখনো বাক্যটি অর্থি অর্থে। বাংলা দেশীরা লম্বাঘাড় পোষাল পাড়া আর নগর এই দুটো জেলায়ই পছন্দ করেন।

কখনোই বাংলাদেশী কৃষক বহুদিন ধরে বসবাস করছেন। নেপালীরা বহুদিন ধরে সৈনিকদের চাকরী নিয়ে আসামে বসবাস করছে। প্রতিটি 'ক্যান্টনমেন্ট' এর কাছে একটি করে নেপালী বস্তী গড়ে উঠেছে। নেপালী আগন্তুকের সেখানেই আশ্রয় স্থল।

জেলা ত্রিভুজ হিসেব করলে ভোটার বেড়েছে ত্রিভুজগড় ও শতাংশ, দশল ও শতাংশ আর নগরীও ১১ শতাংশ এবং গোয়াল পাড়াও ১৪ শতাংশ। জাল ভোট দাতা ভ্রো গোয়াল পাড়াতেই সব চেয়ে ভারপূর্ণ নগরীও। এই সব মালুমের খুঁজে পেতে কের করতে হলে, গোয়াল পাড়াতেই তো আগে যাওয়া দরকার, নয় কি? কিন্তু মজার কথা এই, ভোটার তালিকার আপত্তি পত্র সবচেয়ে জমা পড়েছে ত্রিভুজগড় ও দর: জেলায়। সেখানেই খোঁজা হচ্ছে যে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের। দালা-হাকামাও জোর বেধে উঠেছে এই দুটি জায়গাতেই। গোয়াল পাড়া একেবারে শান্ত।

'নেটিভ' ও বহিরাগতদের মধ্যে বিরোধ, আসামে কিছু নতুন নয়। দালাহা প্রায়ই বেধে ওঠে। বাধ-লেই সেখানে আগুন লাগে, রক্তপাত হয়। বেশী হয় ত্রিভুজগড় ও দর:এ। একদল আক্রমণ করে, একদল প্রতিরোধ। কেউ কম যায় না। এবারের দালাহাও তারই পুনরাবৃত্তি। উপলক্ষ, ভোটার তালিকা সংশোধন। আসল উদ্দেশ্যে বলা নেওয়া। এবং বহিরাগতদের উচ্ছেদ করা। নইলে জাল ভোট নেই কোথায়? যার বত প্রতিপত্তি, তার হাতে তত জাল ভোট।

ভোটার তালিকা সংশোধনের পদ্ধতিতেও অভিনব। কোন নাম সম্বন্ধে আপত্তির আপত্তি আছে, আপনি বানার আপত্তিপত্র জমা নেকেন।

আপনার কর্তব্য ওখানেই শেষ। যে কোন ব্যক্তি
‘হত খুশী’ আপত্তি পত্র জমা দিতে পারেন। সেটা
কোন ঘোবের নয়। আপত্তি জমা পড়লেই, তার
নামে আপত্তি তাকে থানার ডেকে পাঠানো হবে।
বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে তার নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট
ও রেজিস্ট্রেশন নথির চাওয়া হবে। আপনার জন্ম
আসামে, পুরুষাধিকারে বাস করছেন। আপনি
সার্টিফিকেট পাবেন কোথায়? বেশ বিভাগের পরেই
যদি আসামে গিয়ে থাকেন তবু কি আর ‘বর্ডার
পাসপোর্ট’ পেরেছেন? বাঙ্গালী মুসলমানকে বলা হবে
তোমার জমির পাট্টাকবুলিয়ত দেখাও। আপনি
ভাগ চাহী কিবা ক্ষেত মজুর। জমিই নেই তার
পাট্টা কবুলিয়ত। ওসব না থাকলেই কি আপনি
বহিরাগত? ভোটার অধিকার থাকবে না? বার
বার নোটিসে ভিটে মাটি ছাড়তে হবে?

এবারকার লড়াইটা কিনা প্রধানতঃ ভোটার
জালিকা সংশোধনের লড়াই, তাই সেটা মোটামুটি
অহিংস। তবু একেবারে নৈতিক অহিংস কি হতে
পারে কোন গন বিক্ষোভ? তাহলে তো সহরে সহরে
কনকিউ জারি করার প্রয়োজনই হত না। দরকার
হত ‘পল্লীর সহায়তার’।

ভোটার জালিকার কাকিত্ব। একদিন মিটে
যাবে। কড় একদিন খামবে। আকাশ পরিষ্কার
হবে। গ্রাণ শিবিরে যাত্রা আশ্রয় নিরোধেন, ব্যাকুল
হয়ে দিন কাটাচ্ছেন, তারা কিংবদন্তি যাবেন নিজ নিজ
ভেরায়। তার পরেও তারা বহিরাগতই থাকবেন।
আচারে ব্যবহারে কথায় বাস্তব পার্থক্য থাকবে
নেটিভ অসমীয়াদের সঙ্গে। কণ্ঠজীবনে প্রতিবো-
গীতা আসবে, সম্মানসীতাও বাড়বে। অপরিস্রবের
দূরত্ব কমবে। বরফ গলবে। নেতৃত্ব পিপাসুর রাজ্যে
নীতির বেলোয়ার তখনও থাকবে দেশে। তাদের
নৈতিক চেতনা, হৃদয় বানিকটা কমবে।

শাশক এখনো রাজ্যের অর্থ নৈতিক ক্ষতি
বিকাশের কোন চেষ্টা করবেন না। শুধুমাত্র বড় বড়
সহর, উঁচু উঁচু অট্টালিকা, চণ্ডা চণ্ডা রাজপথ
নির্মাণ করে ‘আনপ্রডাক্টিভ’ কাজে টাকা ঢেলে
চলবেন। আকুল কুলে এলাগাছ হয়ে উঠবে
কতিপয় ঠিকাদারের। গরীবের অবস্থা আরও খারাপ
হবে।

তখন সময় হবে আর একটা ভূমিকম্পের। যার
রূপ হবে বহুস্তর, পরিণতি ভয়াবহ।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

৩

সবাইকে পড়ান—

নির্বাচন প্রসঙ্গে

॥ কালীপদ সরকার ॥

এক আধুনিক কবি লিখেছেন—

‘মুখে যদি রক্ত গুঠে

সেকথা এখন বলা পাশ ।

এখন চারদিকে শত্রু,

মহীদের গোবে ঘুম নেই :

এ সময় রক্ত যদি করা পাশ,—

বিদ্যা সংকট, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ, কল কারখানার উৎপাদন হ্রাস, শ্রমিক হাটাই, ষ্ট্রাইক, লক-আউট। অফিস আগালাতে স্তম্ভীকৃত নথিপত্র, বাড়বাড়ন্ত অধিকারের জীবকুল, ক্রমবর্ধমান ডাকাতি, খুন ধাওয়াপি, রাহাজানি। আইন রক্ষণ নিষ্ক্রিয়।

ভয়াবহ বরাকবলিত দেশ, সেচের জল দুঃপ্রাপ্য, নদীনালা পুকুর জলাধার জলশূণ্য ডিম্বেল সংকটে জালো কণ আচল। পানীয় জলেরও অভাব। শুধু এখনো কেবল জন্ম, সংকটকাল সামনে।

কম্বাক্ষ মানুষের এক তৃতীয়াংশ বেকার সংগঠিত সেকটরের শ্রমিক-কর্মচারীরা ধর্মঘটের ভয় দেখিয়ে ধাপে ধাপে বেতন বাড়িয়ে নিচ্ছে। পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে অসংগঠিত সেকটরের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, কর্মচারী, দিন মজুর। মুশাস্ত্রীতি বেড়ে চলেছে, সেই সঙ্গে প্রভাব্য। সরকার নাবিকহীন তরীরা জার তরঙ্গ প্রবাহে ভাসমান।

পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতা গম্ভীর এশিয়ার কেন্দ্রস্থি ভারতকে প্রাস করতে উদ্ভত। আন্তর্জাতিক গৃহ চক্রান্তজাল ভারতের চারদিকে বিস্তৃত।

কিন্তু এত বড়ো বার্ষতা-বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য দেশে সংঘবদ্ধ জোরাশো দাবি

নেই। নেই মুগটিত আন্দোলন। কিন্তু কেন নেই? উত্তর: ভয়। ভয় জানের, ভয় বাড়িবর পরিজন কুজি রোজগার হারাবার।

এরই আর এক নাম সন্ত্রাসবাদ-ভিত্তিক দলতন্ত্র শাসন। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন নয়, তাতেই এট ববদ্বা।

মহাকবি হাতে বলেছিলেন—“Let the flames of hell devour those who stand unconcerned in times of moral crisis” কথাটা বর্তমান ভারতের সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কদিন আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জি.দেবশাই নির্বাচনী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে সবথেকে বলেছিলেন, তাঁর শাসনকালে তিনি যে.সি.পি.আই (এম) শাসিত রাজ্য সরকারকে সব বকম সুবিধা দিয়েছিলেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগেই কান দেন নি, সেই সি, পি, আই (এম)ই দেবশাই মহিমসভার পতনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

প্রকারান্তরে জি.দেবশাই স্বীকার করলেন যে, সংবিধান দেশের সংহতি ও নাগরিকদের মৌল অধিকার রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে, তিনি তার প্রয়োগ করেননি। মরিচকাপির নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড এবং প্রবীন নেতা জি.প্রহ্লাদ সেনের আইন শৃঙ্খলার অবনতি সম্পর্কিত অভিযোগগুলি জি.দেবশাই উপেক্ষা করেই দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর গণদ্রোহ হওয়া সন্দেহই হয়েছিল। এমন দুর্বল, নিক্রিয় চরিত্রের নেতায় পক্ষে ভারতের জ্ঞান বিশাল রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সাজে না।

গান্ধীজী ভারতের মৌল জ্ঞান মুক্ত মুখবিশ্রোহের
পাঠ্য বিবেচিলেন, নেতাজী সংগ্রাম এনেছিলেন
স্বাধীনতা এবং পণ্ডিত নেহেরু গড়েছিলেন নব
ভারতের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি। এই তিন মুখ
পূর্ববের সকল উত্তর সাধিকা হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা
গান্ধী। ধীরে ধীরে দেশের সকল মানুষই বুঝছেন
যে, শ্রীমতী গান্ধীর ইতিহাস-সচেতন নির্দেশ প্রগতি-
শীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ চিন্তার সুবম বাস্তব-বিশ্বাস
ভিত্তিক দৃঢ় নেতৃত্বই শুধু পারে বর্তমানের রাজনৈতিক
মুখ্যনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে রক্ষা করতে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহ্য ও আদর্শ
কপারণ যে একমাত্র কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষেই
সম্ভব সে সত্যও জনচিন্তে প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই
কংগ্রেস নেতা এবং অধিপতি কংগ্রেসকর্মী আপন
স্বয়ং কংগ্রেস (ই) তে ফিরে আসছেন। নির্বাচনের
আগে এবং পরে আরো অনেকে দলে আসবেন।
কবিভবের নির্দেশকে যারা অস্বীকার করবেন, তারা
কম্বাকালে বিশ্বস্তির আধারে মিলিয়ে যাবেই।

সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ এবং গণ-
তন্ত্র হল কংগ্রেস (ই)র মূলনীতি। তাই হিন্দু
মুসলমান শিব গুটান সকলেই কংগ্রেস (ই) কেই
জাতির নিরাপদ নির্ভরস্থল বলে মনে করছেন।
নির্বাচন যদি অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় তা হলে
কংগ্রেস (ই) যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে
সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বৈরতন্ত্র ও
অস্বাভাবিক অধিকার সমালোচনা ও নিষিদ্ধ প্রচার
ন দশ বাও জলের নীচে, তাকে আর চেনে তোলা
সম্ভব নয়। বিশেষ করে সত্যাস শাসিত দলতন্ত্রের
নায়কদের মুখে বৈরতন্ত্রের কথা তো একান্তই অর্থ
হীন। শ্রীমতী গান্ধী যদি বৈরতন্ত্রী হতেন তা হলে
এক বছর হাতে থাকতে তিনি ১৯৭৭ সাধারণ
নির্বাচন অস্বীকারের সিদ্ধান্ত নিতেন না। সি. পি.

আই (এম) র পক্ষেও রাজ্য সরকার দখলে আনবার
সুযোগ ঘটত না।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান প্রবীন
রাজনৈতিক শ্রীভাসের পথ নির্দেশ অভিশব্দ স্পষ্ট।
দল ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে কমিউনিস্টগণ তাতে বর
সহকারে বিচার করে ইতিকর্তব্য স্থির করবেন বলে
মনে করা যায়। এই নির্দেশ ইতিহাস সম্মত।

শ্রীভাসকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ
প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে। তাঁর সঙ্গে বাপের মত ও
পুত্রের মিল নেই তারারও তাঁর স্ফুটন্ত অভিমতের
ওপর বয়েই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। শ্রীভাসে শুধু
ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ
রাজনীতিবিদ।

“মরে না, মরে না কতু সত্য হাতা পাতা পতানীর
বিশ্বস্তির তলে—

নাহি মরে উপেক্ষার অপমান না হয় অস্তির,

আঘাতে না টলে।”

সত্যের জয় সুনিশ্চিত, সত্য যে শক্তির উৎস, কে
তাকে কবিবে? বিশেষ আদালতের বাধ? না,
চৌধুরীদের চতুয়ালি?

আর কয়েকদিনের মধ্যে প্রার্থীরা প্রচারে নামবেন
নির্বাচনী আসর জমে উঠবে। খেউড় বিস্ত্রিও অল্প
বিস্তর চলেবে। মিছিল বেরুবে পথে পথে। প্রোগ্রামে
আকাশ বাতাস মুখরিত হবে। ভোটের তালিকার
প্রচুর ভুল থেকে বাবে। শুধু নির্বাচনে জয় পরাজয়
সুনিশ্চিত হবে silent majorityর ভোট। এঁরা
কথা বলেন কম, যে দলের কর্মীই আলুন, অর হেঁসে
জানের অভ্যর্থনা করেন। তাদের মানের কথা কেউ
জানতে পারে না। তাদের বাড়ীর বাইরের দেওয়ালে
যা লেখা থাকে অস্থিরের দেওয়ালে লেখা থাকে তার
বিশ্বকোষটা হালি ক্ষয়।

শাসন ও স্বাধীনতা

৬৫

॥ সুবোধ মহামশায় ॥

বর্তমানে কতগুলি পাপচক্রের নাসপাশে আবদ্ধ হয়ে, রবেছে আমাদের প্রাশাসন ও সরকার। অর্থের পাপচক্র, ক্ষমতার পাপচক্র, আইনের পাপচক্র প্রকৃতি কতরকম পাপচক্র যে আছে ঠিক নেই তার। অতীশ্রিয় প্রয়োজনীয়তায় পয়িশুট হতে না পারলে কেউ ভাঙতে পারবে না এই পাপচক্রগুলোকে। এই সত্যটাকে সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথম বিশ্লেষণ করব পাপচক্রের স্বরূপকে, তারপর বিশ্লেষণ করব অতীশ্রিয় প্রয়োজনীয়তার স্বরূপকে।

এবার ভারতে যে দলের সরকারই গঠিত হোক না কেন, তাকে অবশ্যই বিপ্লবী চেতনার প্রবৃদ্ধ হয়ে আটন প্রশয়ন ও প্রাশাসন পরিচালনা করতে হবে। নতুন সমাজের নীচতলার বিক্ষোভ বিরোধ তার পতনকে অনিবার্য অপরিহার্য করে তুলবে। আর বর্তমান অবস্থার সরকারের সবচেয়ে শুভ বৈশ্ববিক কর্ম হবে প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক পাপচক্র-গুলোকে ভেঙ্গে দেওয়া।

ভাষ্যশাস্ত্রে পাপচক্র বা vicious circle হচ্ছে এমন একটা হস্তকর জটিল পরিস্থিতি যখন কোন একটা ক্রিয়ার ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য যে সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হয় সে সাক্ষ্যের সত্যতা নির্ভর করে বিচার্য ঘটনাই সত্যতার উপর। যেমন—(বিচার্য ঘটনাটি হচ্ছে)—শিক্ষিতরা ববীশ্রবচনা পড়ে। (সাক্ষ্য ঘটনাটি হচ্ছে)—অশিক্ষিতরা ববীশ্রবচনা পড়ে না। (সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণকারী সাক্ষ্যটি

হচ্ছে)—ববীশ্রবচনা যাত্রা পড়ে তারাই শিক্ষিত। অথবা—আমি রাম চাটাজি। প্রমাণ? আমি দশরথ চাটাজির পুত্র। প্রমাণ? দশরথ চাটাজি রাম চাটাজির পিতা।

নায়দশাস্ত্রের পাপচক্র হস্তকর হলেও সমাজ ব্যবস্থার পাপচক্র বড়ই বেদনাসাহক। ইশ্রিয়বাহী বা সন্তোষবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বর্তমান ভারতের প্রশাসনটি হচ্ছে পাপচক্রের একটা দলো বিশেষ। এক পাপচক্র মদ্য দেয় অপর পাপচক্রকে।

একদিন একজন নিরীহ নির্যাসিত সঙ্কল্প ভারতীয় নাগরিক সংগঠিত সরকারী অফিস এসে এক কেরানী বাকুকে বললেন, স্বাম্, আমার সাতপুরুষের ভিটে-বাড়ীর মালিকানা থেকে আমার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি নিঃস্বতভাবে স্বাক্ষরপত্র দিয়ে এসেছি, এই স্বেপ্ন-স্মিত আর দলিলপত্র। কেরানী বাবু কাগজপত্র নিয়ে পুনশ্চে ফাইলের ঘরে গেলেন মিলিয়ে দেখতে। তিনি ফিরে এসে লেখালেন উপরওয়ার নির্দেশটি। ততলোক উপরওয়ার কাছে গেলে পর তিনি দেখালেন নীচওয়ার পত্রাঙ্কটি। উপরওয়ারা—নীচওয়ার পাপচক্রটি প্রাঞ্চলি করে ততলোক বহমিন কহরেন স্বীকার করে অবশেষে সংগঠিত মহামহাশয়কে বললেন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা। দেখা গেল কোন কর্মচারী যুথ থেবে নার পাপচক্রের ঘিরেছে। কিন্তু তাকে বরা সহজ নয়,

কারণ সেখানেও রয়েছে একটা উপরনীচ পাশচক্র।
যুগের পাশচক্র প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে ভ্রমলোক
গিয়ে পড়লেন কর্মচারী সমিতির পাশচক্রের প্রস্থে।
এই সমিতিক উপেক্ষা করে কোন সচিব বা মন্ত্রী
কোন অস্ত্রাঘের প্রতিকার করতে পারবেন না।

তৃতীয় পাশচক্রটি প্রশাসনিক ও রাজনীতিক
উভয় রকমই। কর্মচারী সমিতি বৃহত্তে পারল ভ্র-
লোকটির চরম ক্ষতি করা হয়েছে যুগের বিনিময়ে।
কিন্তু প্রতিকারের দায়িত্ব গ্রহণের বেলা শুক হলো
পাশচক্রের ক্রিয়া। অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার
পড়ল অর্থনীতিক পাশচক্রের ওপর। অর্থাৎ তাত্ত্বিক
কর্তৃপক্ষ বিচার করে স্থির কববেন বর্তমানের বাস্তব
পটভূমিকায় যুগ নেওয়া যুক্তিসংগত কিনা।

চতুর্থ পাশচক্রের প্রথম নেতা বললেন, কর্মচারী
সমিতি লক্ষ্য করেছে যুগ নেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন
করা বর্তমানে একটা নির্ভুর কাজ বলে গণ্য হবে।
ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করা শুধুমাত্র
বেতন আর ভাতা দিয়ে সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় নেতা বললেন, যুগের সম্পূর্ণ বোকাটা যে
মিছে পড়ে দরিদ্র জনগণের ওপর ঝাড়া উঠে যেত
বা ভাতা কোনটাই পার না।

তৃতীয় নেতা বললেন, ঝাড়া আমাদের দলের
অঙ্গময় সাহায্য করেছে, যাঁদের উদ্ধোপে আমরা
আজ ক্ষমতাসীন হয়েছি তাদের প্রতি বেইমানি করতে
পারব না আমরা।

দ্বিতীয় নেতা বললেন, সেটা দেখার ভার পে
আমাদের উপর দেওয়া হয়নি। আমাদের কর্তব্য
হচ্ছে যে জনগণ আমাদেরকে ক্ষমতাসীন করেছেন
তাদের শ্রম-সুবিধা মংগল কী ভাবে বাড়ানো যায় সে
উদ্দেশ্যে তত্ত্ব নির্ধারণ করা।

প্রথম নেতা বিজ্ঞকণ্ঠে জানালেন যে সাংবিধানিক
চিন্তাও ইহঁনে রাখতে হবে। আধুনিক গণতন্ত্র

কোন প্রতিনিধি অসহুপারে উপার্জিত টাকা ছাড়
নির্ধাচিত হতে পারে না যুগ্মস্বায়, কালোবাজারী,
চোরাকারবারী, এরাই আমাদের নির্বাচন তহবিলে
চাঁদা দেয় বেশী।

শেষপর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তেই পৌছনো গেল না।
কতিগ্রস্ত লোকটিরও কোন সুরাহা করা গেল না।
ইতিমধ্যেই কপর্দকহীন হয়ে গেছেন তিনি। তথাপি
আঁতের সাহায্যে সম্প্রতি উদ্ধারের চেষ্টা করতে
লাগলেন তিনি। কিন্তু উকীলের মাধ্যমে না গেলে
ঊষ নাশিগ্র গ্রহণ করা হবে না যে দেখা বিচার
বিভাগ জানিয়ে দিল থাকে। তিনি বললেন উকীলের
প্রয়োজন হবে না ঠায়, নিজেই তিনি বিচারকে
বুড়িয়ে বলতে পারবেন সব। তথাপি আবেদন
ঊষ গ্রহণ হলো না কোর্টে।

কতিগ্রস্ত ভ্রমলোক তখন বিপ্লবী মুখামুখী দৃষ্টি
দেখা করে বললেন ঊষ সর্বনাশের পূর্ব বিবরণটা।
মুখামুখী থাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সামগ্রিক
বিপ্লব ঘটতে না পারলে এর কোন প্রতিকার করা
সম্ভব হবে না তারও পক্ষে।

সংবিধানের বৈষম্যিক পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা
করছেন না কেন আপনাদের দলের সংসদ সদস্যরা?
—প্রশ্ন করলেন ভ্রমলোকটি।

যেন ভয়ে শিউরে উঠে মুখামুখী বললেন, সর্বনাশ
এখনই সংবিধানের পরিবর্তন করতে চাইলে কেন্দ্রীয়
সরকার যে ক্ষেপে যাবে আমাদের ওপর।

ক্ষেপে হ্যাঁ যাবেই, তাবলে কি জনকল্যাণের
জন কাজ করব না আমরা? —প্রশ্ন করলেন সংসদীয়
দলের একজন নেতা যিনি কাছে বসে থবরের কাগজ
পড়ছিলেন।

নিজেদের অস্তিত্ব বিপর্য করে জন-দমন দেখানো-

ইন্দিরার রাজনৈতিক

কর্মতৎপরতা ও কূটকৌশল শীর্ষে

দ্বিঃশীঘ্র বঙ্গোপাধ্যায়

১৯৭৭ সালে জনতাঙ্গল কেন্দ্রীয় সরকার দখল করার অনতিবিলম্বে সারা ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মলগুলি একত্রে ভাবে বা সুশ্লিলভাবে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও কূট কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাতে ব্যস্ত হইল। নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির তাগিদে। এছাড়া কোন কোন রাজনীতিবিদ স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে নানাভাবে চেষ্টা-চরিত্র করেতে উঠেপড়ে লেগে যায়। জনতাঙ্গল যুদ্ধবন্দ ও একই মার্শে বিশ্বাসী একটি দল নয়, যার বিপরীত আদর্শবাদী করেকটি দলের সমষ্টি মাত্র ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দাবীদার একাধিক ব্যক্তিবর্গ জনতায় তখন বিরাজমান সেইহেতু জয়লাভেই জনতাদলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ, বদ-বিসংবাদ ও ব্যক্তি প্রাধান্য পরিস্ফুটন দেখা যায়। ফলে জনতায় ভাঙন দেখা দেয় ও পরিশেষে জনতাঙ্গল ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য হয়, স্বীয় দলের উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বার্থসেবী ও সুবিধাবাদীদের হীন চক্রান্তে।

এই চক্রান্তের নাথক কিয়ৎপনো চরণ সিং যিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকাকালে শ্রীমতী গান্ধীকে অস্ত্রাঘাতের প্রেষণের আদেশ দিয়ে চরম অবিদ্যকারীতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি নিজ উচ্চাশাপূরণের তাগিদে শ্রীমতী গান্ধীর সাহায্য ভিক্ষা করেন নিতান্ত নিঃশঙ্কের মত প্রবৃত্তি বিমূঢ় হয়ে। শ্রীমতী গান্ধী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অদীন শক্তির

আঞ্চালনকারী জনতাদলকে কদম্বুদে ধরাশায়ী করার সুযোগ পেয়ে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বার্থক চরণ সিংকে সমর্থনের আশা ও অগ্রাস দিয়ে রাজনৈতিক দূর্বল ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তির মূলে কুঠাঘাত করার স্বাক্ষর রাখলেন অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে যা তাঁর বিচক্ষণতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

যারা তাঁকে লোকচক্র সামনে দেয় প্রতিপন্ন করেতে চেয়েছিল কমিশন বসিয়ে ও পরে বিশেষ আদালত বিল পাশ করে এবং পরিশেষে সেট বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত করে, তারাই তার স্বার্থ সাংঘাত্যের আশায়—কি চমৎকার এই অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন। শ্রীমতী তার রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, দূর্বলতা ও কূট নৈতিক কুশলতার যে স্বাক্ষর ভাঙত ইতিহাসে রাখলেন ১৯৭৯ সালে চির অগম্য হয়ে থাকবে কারণ যেসব দূর্বলতার খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ শ্রীমতী গান্ধীকে ক্ষমতার আসন থেকে নিয়ে নামিয়ে এনেছিলেন জনতাদলকে কূট কৌশলে খাড়া করে, তাদের জীবিতকাল মধ্যে ইন্দিরাগান্ধী সেই জনতার পতন ঘটিয়ে ছাড়লেন। জনতার নেতা ও স্তম্ভ বিশেষ ব্যক্তিত্বকে দিয়ে।

ইন্দিরাগান্ধী সত্যি কূটকৌশলের ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যের অধিকারী ও কথ্য প্রমাণিত হল আর একবার, কারণ ইতিপূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীন মূলে তার যে কূটনৈতিক জেষ্ঠ্য অবগান ছিল সেকথা সর্বজন স্বীকৃত ও প্রমাণিত

সত্যও হটে। ইন্দিরাজীর সমর্থণে চরণ সিং প্রধান মন্ত্রীর দাবীদার হলেন হটে, কিন্তু ইন্দিরাজীর সঙ্গে হুঁদীর খেলার পরাস্ত হয়ে চরণ সিং লোকসভায় তার সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণ কোরতে ব্যর্থ হলেন বলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সুশাসিত ভাবেই করতে হলো, যাতে করে তদারকি সরকারের কর্ণধার থেকে তিনি নির্বাচনে সুবিধা কোরতে পারেন। ইন্দিরাজীর রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল নির্বাচনকে রূপান্তরিত করা যাতে কোরে তিনি সেই নির্বাচনে তার জনপ্রিয়তা সূচী নামকে পুনরায় প্রমাণ করতে পারেন।

তার সে লক্ষ্য পূরণ হয় প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা চরণ সিংয়ের রাজনৈতিক নিবুঁজিতায় ও স্বাধীন উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, কাজেই রাজনৈতিক কূটকৌশলের ক্ষেত্রে ইন্দিরাজীর শ্রেষ্ঠ পুনঃ প্রমাণিত হয়। নির্বাচনের পূর্ণমুহুর্তে কি ভাবে ইন্দিরাজী তার পূর্বাভাসের ধীরে ধীরে ফিরে আসতে সক্ষম হইলেন তাও পনিধান যোগ্য। তার অত্যন্ত দিনের সহকর্মীরা তার পতনের পরাতীর কাছ থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছিল যারা তার আবার গুটি গুটি পায়ে কেমন আস্তে আস্তে তার কাছ ঘেঁসে পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করেছিল তা দেখলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যই একটা গতিশীল বিশেষ শক্তি থাকে উপেক্ষা করা অনেকের পক্ষে কঠিন।

তার পতনের মূলে তার বহুদিনের পুরাতন সহকর্মী, পরামর্শদাতা ও শুভানুধ্যায়ী যাত্রা ছিলেন পদ্ম—জগজীবন রায়। বসন্তনা, নন্দিনি সংপতি ইত্যাদি তারও আজ মনে মনে তার মঙ্গল কামনায ব্যস্ত কারণ তাদের চৈতন্যোদয় হয়েছে আর তারা সূর্যোদয়ে যে ইন্দিরাজী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা পরিসর্য্য মহাশক্তি বকে বাদ দিয়ে ভারত রাষ্ট্র মাথা উঠ রেখে চলতে সত্যই অক্ষম।

বাবু জগজীবন রায় যে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষেপে ইন্দিরাজীকে পরিভাগ করে ইন্দিরায় বিপক্ষ বলে সিং, এক, ডি, নেতা রূপে যোগ দিয়ে ইন্দিরায় পতনকে নিশ্চিত করার মানসে সমস্ত গোব ইন্দিরায় উপর আবেগ করে নিজে জরুরী অবস্থার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, সে প্রচেষ্টার আসল উদ্দেশ্য ছিল তার বেধে হয় তখন প্রধান মন্ত্রীর গুপ্ত বাসনা যা জয়প্রকাশজীর অনুগ্রহে তিনি সফল করে তুলতে পারবেন বলে গভীর ভাবে আশা করেছিলেন। তার সে আশা সফল হয় নি যদিও তিনি চেষ্টার কোন ক্রটি করেন নি। এবারে তিনি জনতাসলের (বিখ্যাত) সংসদীয় নেতা, বাস্তবে যদি জনতাসল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে তবে তিনিই হবেন প্রধানমন্ত্রী,

(৯ পাতার পরের অংশ)

টা কি বোকামি নয়, কমরেড?—পাটা প্রশ্ন করলেন মুখামন্ত্রী মহাশয়।

এভাবে অনেক তর্কাতর্কির পরও ভত্রলোকে বিপদটি কাটলনা। অগত্যা ভত্রলোকটি মামলা জঞ্জুর করলেন নতুন মালিকের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ এবার তিনি পদার্পন করলেন আইনের পাণ্ডচক্রের মধ্যে।

এবার আমলা কর্মচারী আইনসভার সদস্য দবাই এক হয়ে গেলেন কংগ্রেস ভত্রলোকটির বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে প্রমাণাদি কংগ্রেসের মনেক কিছুই হয়ে গিয়েছে বিপুল বা বিস্তৃত। তারওপর চলতে লাগল রূপকের উকীলের বড়দয়। নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে তারা কেবলি তারিখ নিতে লাগলেন হানিমের কাছে আবেদন করে করে। কপর্কহীন নির্ধারিত লোকটির পক্ষে আর সড়ব হলো না বাড়ী উদ্ধার করা।

স্বল্প তার জন কণে কণে সমের জাগে এই ভেবে যে যদি জনসংঘের নেতা থাকে সে সুযোগ না পেত তার পূর্বের আচার ও আচরণ স্বরণ করে তখন তিনি যে কূলে এনেও তরী তেড়াতে পারবেন না।

তিনি এই সব চিন্তার অস্থির হয়ে গোপনে গোপনে তার দূতকে ইন্দিরাজীর দূতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন বলে সংবাদে প্রকাশ। উদ্বেজ তার একটাই আর সেটা বেন-তেন-প্রত্যয়ে তার প্রধান মন্ত্রীর আসনটি চাই-ই, চাই। বিখণ্ডিত জনতামলে তার নিজ শক্তি অত দূর সীমিত তাই ইন্দিরাজীর শরণাপন্ন হতে পারলে ও তার প্রশ্রয় পেলে বাবুজীর অনেক দিনের আশা পূর্ণ হয়। কয়েক দিন কথাবার্তা ও দূত বিনিময় হলে।

বাবুজী রাজনৈতিক অস্থিরতার ও অসুস্থতায় ভোগেন ফলে জনতামলের নিবাতনী ইশতেহারে প্রকাশ হতে তার জন্যই এত অহেতুক শেরী হয়। জীমতী গান্ধী যে বাবুজীকে বিরুদ্ধজন মনে করতে বিধা করেন তা তার বুদ্ধিরই পরিচায়ক একদিকে আর অপরদিকে বাবুজীকে যে কোণঠাসা ও শোভী রাজনৈতিক প্রমাণ করে তবে ছাড়িয়েন তাতে ইন্দিরাজীর ভয়ের পথ প্রশস্ত হলো। চরণ সিং যে শোভী ও স্বার্থপর এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী তা তিনি আসরে কৌশলে প্রমাণ করে ছেড়েছেন।

এবারে জনতামলের সংসদীয় নেতা বাবু জগদীশ বাস যে প্রধানমন্ত্রী হবার আশায় ইন্দিরাজী কৃপা প্রার্থী তাও প্রমাণিত হলো, ফলে রাজনৈতিক মূল্যে ঘরে তুললেন জীমতী গান্ধী আর বাবুজী নিজেকে লোভাতুর নিম্নগামী প্রমাণ করে ছাড়লেন, ইন্দিরাজীর কূটনৈতিক চালের দৃষ্টি হয়ে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর আসনে উপবেসন করার সুযোগ এনে দেবে এই যথাকর্তী নির্দোষ যাত্রা ভিলকনকে যথা—জীমতী গান্ধী, বাবুজী ও চরণ

সিং, যদি কংগ্রেস (ই) বা জনতামল বা লোকদল সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে, নচেৎ নয়। কিন্তু তিন পক্ষই তো আর সংখ্যা গরিষ্ঠ হবে না, হবে যে কোনও এক পক্ষ কাজেই উক্ত তিন জনের মধ্যে মাত্র একজনই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন, বাকিরা নয়।

চরণ সিং যেভাবে তার নিজ ভাবমূর্ত্তি নষ্ট করেছেন খীয় দলের সঙ্গে চরণ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাতে তার আশা নিকশ হতে বাধ্য। বাবুজী নিজ দলের অজ্ঞাতে ইন্দিরাজীর সঙ্গে গোপন আড্ডাত চালাতে গিয়ে যেভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে গেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ তাতে করে তার দল ভরী হলেও তার আশা ব্যর্থ হতে পারে অটল বিহারী বাজপেয়ী চন্দ্রশেখর ও দলের অস্ত্রান্তের হস্তক্ষেপের ফলে। বাবুজী বড়ই কৌশলী হোন না কেন জননাদল একে পুরাপুরি বিশ্বাস করতে বিধাগ্রস্থ হবে ওর পূর্ব কার্যকলাপের ফলে এবং সেটাই স্বাভাবিক রাজনীতিতে তাই তার আশা কম। ইন্দিরাজী যদি মনে করেন যে তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবেন তবে তার দল কংগ্রেস (ই) তার জন্য সে ব্যবস্থা করে দণ্ড হবে। অবশ্য যদি কংগ্রেস (ই) লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তবেই, নচেৎ নয়।

বর্তমান অবস্থায় দেখা যায় যে কংগ্রেস (ই) অস্ত্রান্ত সকল দল অপেক্ষা শক্তিশালী ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দল ও ইন্দিরাজীর চিন্তাই দলের চিন্তা ভাবনা এবং সেটাই শেষ কথা। সুসংবদ্ধ দল বলতে এখন কংগ্রেস (ই) দল, ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আজ ইন্দিরাজীকে সম্মিহ করে চলছে আর সবাই মিলে ইন্দিরাজীর দলকে হারানতে সব চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে তার মোকাবেলার শেষপর্যন্ত কেউই পাত্তা পাবে না, কারণ

রাষ্ট্রগুরু শ্বরেঞ্জ নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অংশাবলি]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাসগুপ্ত

১৯০৯ সালে আমার বিলেত ভ্রমণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেখানে কোন লক্ষ্যমণ্ডল-বিধি-বিধে বা আশ্চর্য্যভিত্তিক অবকাশ ছিল না। অক্লান্তকোরে অলসোদ্ভাসু কলেজে এক লাফ বেওয়া হয়েছিল। সেই লোকের সত্য্য গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের যেকোন অধ্যাপক সিনবাট বাড়ি উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার পক্ষেই বসেছিলেন লর্ড কার্জন সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সিনবাট বাড়ি লর্ড কার্জনকে উল্লেখ করে বললেন “এই এক ভয়ঙ্কর যিনি অতি তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়কেও অতি উচ্চ ভাষায় অলংকার পরিচয় লাভিয়ে ওড়িয়ে তুলে বসতে পারেন।”

বার বছর পরে লণ্ডনে এসে এই সময়ের মধ্যে সেখানে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে তা লক্ষ্য না করে পারিনি। একটি বিষয় আমার মনে বেশ লেগেছে। লক্ষ্য করলাম যে এখানে নেশা খাবার করার এবং নিরাশ্রিত ব্যক্তি গ্রহণের কোনো ব্যবস্থা নেই। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, সমস্ত সমাজ কল্যাণ মূলক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন হুট, এখানেও তেমনই ঘেঁষামোম যে মাশা বাওয়া ও মস্ত পানের উপর ভার বেশ প্রচণ্ড পড়েছে।

কনফারেন্সের চতুর্থ দিনে সভাপতিত্ব করলেন লর্ড কার্জন। সেদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল “সাংবাদিকতা ও বাণিজ্য।” সেই সভায় আমি বক্তৃতা করেছিলাম। আমার পরে বললেন মিঃ ডি. পি. ও'কমোর এম. পি. তিনি আমার বক্তৃতার আমার উচ্চ প্রশংসা করলেন। আমার মনে হচ্ছে কেন লর্ড কার্জন সেই কনফারেন্সে সাংবাদিকতা ও বাণিজ্যের কথা বলার পর সেখানেই বিশ্রাম নেওয়া করেছিলেন। আবারও অলংকারটি নিয়ন্ত্রণ করে দিয়ে বাওয়া হল। সেখানে আমতা ১৪ হাজার সৈকতের এক পর্যবেক্ষণ করা যেন দেখলাম। এখানে আমাকে লর্ড কার্জনের সঙ্গে

পরিসর করে যেওয়া হল। লর্ড কার্জন ছিলেন তখন সমস্ত বিলাতের সেক্রেটারী। তিনি লণ্ডন প্রেস কনভেনশনে যের বাগত আমাতে এখানে আসেন। তার মধ্যে আমার অক্লান্তকোরে মস্ত কিছু কথা ব্যক্তি হয়। সেই কথা ব্যক্তির মধ্যে বেশ বিভাগের কথা উল্লেখ করে বললাম যে এটা বাণিজ্যীদের একটি বড় বক্তব্যের অভিযোগ। তিনি আমার সব কথা শুনে এবং শেষে বললেন, “হ্যাঁ লর্ড কার্জন এটা ব্যক্তি করে দিচ্ছেন না কেন?” আমার এই বক্তব্যের ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় আমি যে সমস্ত নাম-করা উল্লেখ রাখা নীতিবাদের সঙ্গে মিলেছি তাদের প্রত্যেকেরই মনোভাব গ্রীক এই বক্তব্যই ছিল।

লণ্ডন থেকে আমি এই বক্তব্য বাণী নিয়েই ফিরে আসি যে সেখানে যাঁদেরই নিজেদের দেশের উপরে কোন প্রচণ্ড আস্থা তারা কেউই বন্ধ-বিচার পছন্দ করেন নি। তারা সকলেই ছিলেন এর বিতর্কী এবং আমায় যদি আমায়ের দাবীতে লেগে থাকতে পারি তাহলে বেশ বিভাগ ব্যক্তি হবেন। লর্ড কার্জনের একজন বড় বড় লর্ড কোর্টের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। মিঃ উইনস্টোন চার্চিলের সঙ্গেও আমি দেখা করেছিলাম। সেই সময় আমার সঙ্গে ছিলেন মিঃ ব্যাকারনেস। তার খলিত ও অবিলম্বিত খুব কঠিন সময়ের ভাষ্যের যে সেবা করেছে তা খেতে পরিনামে ইতিমধ্যে লাক করে মি। এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার যে বাণী আমায়ের তরফে বলতে পারি যে আমায়ের যে ব্যক্তিগত একটি বড় বক্তব্যের অভিযোগ আছে সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত হয়েছিলেন এবং তারা দুজনেই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তারা লর্ড কার্জনের এই বিষয়ে বলবেন। আমায়ের আমায়ের কথা বা ব্যক্তিগত পারিভাষিক পরিভাষা সম্ভাব্য

মিঃ সি. পি. কুটের সঙ্গে। আমাধের প্রতি তার দূর্ব প্রকার
সহ্যক্ষুতি ছিল। আমি তাকে আমাধের বিষয়টি নিয়ে
মাকেরোঃ পত্রিকায় পত্রিকায় কিছু লেখার অন্তর্য
দিত্তিগাঃ। কিন্তু সে কালে তার কিছু অর্থবিশিষ্ট ছিল।
তা হল এই যে 'লভ' বলেছিলেন উহার মৈত্রিক হলেও
মোতা এবং সর্বোপরি এতজন ল্যাংকালারের লোক।

লগুন আমাধের কাল শেষ হইলে গেলে আমরা ১৪ই
জুন তারিখে দেশের অন্তর্ভুক্তের স্বপ্নের অন্তর্য
পড়লাম। এক স্পেশাল ট্রেন করে আমরা কলিকাতা
গেলাম। সেখানে আমরা মোটর নির্ধানের কাল দেখলাম।
একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেখানে থেকে আমরা
মোটর চেষ্টে সেলাম গুয়ারউইক ক্যান্সেলে। এখানে
গুয়ারউইকঃ আল'কাউন্টেন এক লোক নিয়ে আমাধের
আপ্যারিত করলেন কাউন্টেন একটি হুম্বর বক্তৃতা করে
আমাধের স্বাগত জানালেন। তার সেই বক্তৃতা শুনে
যেন সেই প্রাচীন জর্জের উৎসাহ উদ্বোধনার হৃৎ কণ্ঠ
হ'ছিল, যেন সেই মহা প্রভাবশালী রাষ্ট্রা নির্ধাতা আল'
অব গুয়ারউইকের নাম ও ধর্মের সঙ্গে সজ্জিত ঐতিহ্যের
স্মৃতি জন্মিত হয়ে উঠলো। আমাধের লোকের লোকটি
ছিল মহাধূমীয় বহুপাতি ও অন্যান্য শাসনিক সাঙ্ক-
লগুনঃবের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপ্তি সজ্জিত। কাউন্টেন তার
বক্তৃতা আমাধের স্বাগত করিয়েছিলেন যে যে হলগুটিতে
বলে আত আমরা লোক করেছি, অতীতে সেই হলগুঃ
বলেই ব্যারনঃ পদাধঃ করছেন এবং এখন থেকেই
সেই রাষ্ট্রা নির্ধাতার নেতৃত্ব তার শাসনিক অভিযানে
ব্যাপ্তি পড়লেন।

১৪টির এক সপ্তাহতরীতে আমাধ নির্ধন কালে গোয়েঃ
পদ্বয় লেখার সূত্রার মত অন্ত এক পরিবেশের মধ্যে বলে
আমি যখন এই কথা লিখি তখনও যেন কাউন্টেন
সেই ভরলো কর্তব্য আমাধ কালে লাই অন্তে পাচ্ছি।
তার সেই কর্তব্যের মধ্যে কেমনবার মারীর কর্তব্য
ছাড়া আমাধের যেন কিছু ছিল। সেই বন্ধ ভাবন যে
কুটরা ব্যক্ত ও মহাধূমীয় দ্বাভনভরীতে গুয়ারউইক
পরিবারের পৌরঃ কালী ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে

আরও কিছু জানতে চাইবার মত অন্তর্য বক্তৃতা করেন।
১৪টির সেট করি মত লুম্বর অবস্থিতি সম্বন্ধে এক বিস্তারিত
বক্তৃতা লাই পরিপূর্ণ কর্তব্য বা প্রায় বক্তৃতা সৌন্দর্য-
বিশিষ্ট—সব মিলিয়ে বা এক মহাধূমীয় তাঃবর, মহাধূমীয়
বিবাহ-বিসম্বাহ ও সম্বাহের গাত অন্তর্ভুক্ত এনে দেয়, তার
বক্তৃতা তাই কালিতে কুশেছিল।

(১২ পাতার পরের অংশ)

সব রাজ্যের পুরাতন নামী রাজনীতিবিদরা কংগ্রেস
(ই) দলে যোগ দিলেই স্বৈচ্ছ্য।

অস্বাভাবিক বেড্ডি হালে মন্ত্রী ছেড়ে ইন্দিরার
দলে যোগ দিয়েছেন। বহুগুণাক্ষী অনেক টাল
বাহিনার পর কংগ্রেস (ই) দলের সঙ্গে আঁতাত করে
নির্ধাচনে সি, এক, ডি নিয়ে নামবে মনস্থ করেছে।
অন্তো যে যেখানে আছে বোধ হয় দিন সাত-আটের
মধ্যে ইন্দিরার সঙ্গে একান্ত হয়ে নির্ধাচনে অংশ
নেবে। কাজেই কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষে আসার
নির্ধাচনে সফলতা এনে দিলেও দিতে পারে। এই
দলের ভবিষ্যৎ সর্ব দিক থেকে উজ্জল বলে প্রতীয়মান
হয়।

এই সফলতার মূলে আছে শ্রীমতী গান্ধীর কটিকা
সফর, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক কল্যা-
কৌশল যা অন্ত কোন দলের নেতাদের মধ্যে আজো
সেখা যায় নি। তার গতিশীল রাজনীতি ও সম-
যোগযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ তাকে এক বিশেষ দীর্ঘ
স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আর তার চরিত্রপাশে আজ
যারা সমবেত হইছেন তারা তার রাজনৈতিক কর্ম
তৎপরতা ও কূটকৌশলের শ্রেষ্ঠ প্রকার করে নিয়ে
তার দলে পুনরায় ফিরে এসেছে নিজস্বের রাজ-
নৈতিক দৃষ্টিকে পূরীকৃত করার আশায়। এই সব
পুনরাগতদের মনে বড় আশা যে ইন্দিরাজী প্রধানমন্ত্রী
হলে দেশ বিপুল উৎসাহে, আবার অগ্রগামী হইবে।

তদীয় উইক ক্যান্সেল থেকে আদায় মোটের কয়েক শতকোষতে সেলাম। পথের মধ্যে ট্রান্সকোর্ড অর্ডার থেকে সেলুলসিয়ারের বাড়ীর সামনে নেমে পড়লাম। তীরে প্রবেশের বত আদায় সেলুলসিয়ারের বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। প্রায় তিনটি বছর আগে ১৮৭১ সালে আমি এ বাড়ী দেখেছিলাম। সবুজ স্থিতি ছিলো তখন দেখেছি, সেলুলসিয়ারের যে ঘরে তখন তার দেখেছি। তা ছাড়া আর দেখেছিলাম জিকেল ও বাগানের স্থিতিতে উদ্ভিদগীত ফলকসমূহ। তখন আমি প্রথম একজন ছাত্র ছিলাম। সেই সময় যা দেখেছিলাম সেলুলসিয়ারের একজন। তৈলচিত্র ১১৫ আর নতুন কিছু দেখানে এখানে দেখিনি। তবে সেই মহান নিষ্ঠাকারের অধ্যয়নে সেলুলসিয়ারের ঘরের নামে একটি নিষ্ঠাশালা গড়ে উঠে যা তিনটি বছর আগে ছিল না সেলুলসিয়ারের সেই বাড়িতেই নেই তার অফিসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থার আদায়ের অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের পক্ষ থেকে একজন ডেলিভারি তার সম্বন্ধিত উত্তরে কিছু বললেন। এট সময় অসুস্থতার শেষ রক্তে ১০ মিনিটেই বেনী সময় লাগে। অসুস্থতাই থাকিবে সময় ছোট একটি হাসানে সম্পন্ন হয়।

ইংরেজরা তাঁদের দেশের বসেয়া ব্যক্তিদের সহায়
পরে তাঁদের স্বতন্ত্রতার প্রস্তাব ১৯৩৬ অবদান-চিন্তা করেন।
কিন্তু ফলাফলে কিছু সন্তোষজনক খুব বড় পত্রের বা আমের
লাভ করার মত প্রাপ্তি ছিলেন না। এখন তিনি ভা
হয়েছেন। স্বপ্নদেবের কাছে এমন কি একজন পরগণার
দর সময়ে লক্ষ্য পান না। তথাপি সন্তোষের মত-
কানীন লোকেরা কত বড়-মহাকার ও মনস্তত্ত্ব তার
স্বতন্ত্র চিন্তা-কল্পিত সন্তোষিত করে রেখেছেন। আর
আমাদের ভারতের সঙ্গে এর কত প্রভেদ। এখানে আমরা
এই ও পাশের দিকে দ্বিধা দ্বৈততার স্বতন্ত্র পক্ষে তার পুষ্টি
করি এই মূল বিধান নিয়ে যে স্বতন্ত্র তার মধ্যে আছেন।
কিন্তু কীভাবে দ্বৈততার দ্বারা আমাদের আগে পাশে বিচরণ
করছেন, আমাদের দ্বারা আমাদের আগে পাশে বিচরণ
করছেন, বিপদের মধ্যে স্বাধীন পড়ছেন, দেশের কত
স্বাধীন-স্বতন্ত্র করছেন—তাঁদের প্রতি কারো মন নেই।

আমরা আশ্বিনের নিজেকে বার্ষিক জ্ঞান তারের উপর উৎসর্গ করি আর আশ্বিনের দুই বিচ্ছেদের ভাষকে সূর্যোদয় আর বর্ষের নাম দেই ও বহুবর্ণপ্রসার কণা বলি। আশ্বিনের পূর্ব পুণ্যেরা বহান হামেশারি তারকে এক ঘরে করেছিলেন। যখন তার মৃত্যু হল এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ঈর্ষা-বিচ্ছেদের ভাষ কেটে গেল এবং যখন আমরা ছাফার ও তার কাজের সম্পর্কে শাস্ত্রিগণে নিবেদক বিচার বিবেচনার পরিবেশে তার কাজ থেকে স্থায়ীভাবে বা পেরেছি তা নিয়ে ভাবতে পেরেছি, তখন মাম তখনই আমরা তার কবর করতে শুরু করলাম এবং তার জন্ম বৃত্তি তার সম্মানে স্থিতি করার ব্যবস্থা করেছি। যে জাতি নিজের দেশের বীর পুণ্যেরা কিভাবে সম্মান করতে হয় তা জানেনা সে জাতি নিজেকেই ক্ষমা কোন বীরপুণ্যের পেতে পারে না, আর পাওও না।

সেকন্ড গির্ষেরে ওদয়ান খেত আমরা ভাড়াভাতি
করে সজ্জার কনবিলারমান অস্টে নিবালোকের ঘনো
অকস্কেড' চলে পোম। চাবিস্কেত জনপদ লুহ
একতি ও বাহুহ সব বেম হাতিব শাবিহম বিস্তারের
জত তখন প্রস্তুত হছিল। নারা দিনসব নানা ধরনের
বৈচিত্র্যময় আনন্দ উপভোগ করা সত্তেও আমরা শান্তি'বাপ
করছিলাম। তাই আমি এখন হোটেল আমায় ঘরে
এখনে কললাম তখন আমার ঘনে হ'কিল ঘেন আমি একট
উত দিনের শুভ কাজ সম্পন্ন করে মাঝারা বিস্তার'ল
করছি। আমায়ের শরের বিনের বাইকুম হিল বেশ খরা
বাঁধা। তা আমায়েই সব ঠিক করে রাখা হয়েছিল।
স্যার হ্যাতি বুটেইন আমায়ের জত সব বনে'বদল করে
হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আমায়ের গাইড হা'বিক
ওশবেটা এবং বহু। তার বত পা'বনী ন কর'কম স'ইত
আমি কইই দেখছি। বিবাবাস তিনি কাজ করে যেন
তখাশি কেট বরনও তার প্রশাঙ্ক এবং হাবির মুখমণ্ডল
বিশুয়ার প্রাতি বা'উ'গের চিহ্ন দেবতে পারনি। কন্
কাবেনলের আয়োজন তিমিই করেছিলেন, এ চিহ্নাটাও
হিল তারই। সবত সম্পন্নও করেছেন তিমিই। বাধ্য-
করের বগড়া তিমিই করেছিলেন এবং নিজে ও নৈশুকের
সহিত কার্বে উপায়িত করেন। (চলতে)

সপ্তম লোকসভা নির্বাচনের নির্ধিত

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার দ্বারা সশ্রমিক সত্তার নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ন্যূনো

এবার ২২টি গাছা ৬০টি কের-শাসিত অঞ্চল ভোট দিবে প্রায় ৩৬ ভোট ২০ লক্ষ ভোটার নির্বাচিত হবে ৪২ জন লোক, তারেরা ৭২টি তপনীশীখের ভক্ত সংরক্ষিত এবং ৪০টি সংরক্ষিত তপনীশী উপভ্যক্তির ভক্ত। ভোট হবে গ্রামিনে ০ কাসুদ্যারী ও ৬ কাসুদ্যারী। এই সঙ্গে মনিপুর বাজার এবং কেম্রিও শাসিত অঞ্চল অঞ্চলসে, গেরা-হুমন-বিক ও পতিভারীর বিধান সভার নির্বাচনও হবে। মনিপুরের বিধান সভার আসন হল ৬০ এবং কেম্রি শাসিত প্রত্যেকটির আসন সংখ্যা ৩০টি।

୧. ଡି.ଏସ.ଏଫ୍ ଅନେଇନ୍‌ସ ପକ୍ତ ବାବିଲେ ମେସ ତାରିଖ, ୧୧ ଡିସେମ୍ବର ମେଣ୍ଟାଲି ପଡ଼ିଯା ହବେ, ୧୭ ଡି.ଏସ.ଏଫ୍ ଅନେଇନ୍‌ସ
ପକ୍ତ ଗ୍ରହାଣୀକାର ମେସ ତାରିଖ ।

১মী বাক্য ও ২য়ী ক্রমশাধিকৃত অকমে ভোট প্রদত্ত হইবে ৩ জাহাঙ্গীরী, আসন সংখ্যা ৬৯টি। ৪টি বাক্যে ভোট প্রদত্ত হইবে ৬ জাহাঙ্গীরী আসন সংখ্যা ১৪০। অবশিষ্ট ১১টি বাক্যে ভোট নেওয়া হইবে দুই দিন ৩ ও ৪ জাহাঙ্গীরী আসন সংখ্যা ৩০৩।

যে ১টি বাজা ও ২টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ৩ জাহাঙ্গীরী ভোট গৃহীত হবে শেওলি-হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাদ্মালায় ও ওড়িশা, পাজাং, সিকিম, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অণ্ডামান প্রদেশ, চণ্ডীগড়, হাওড়া নগর (হাওরা, হিরা) পোয়া-লম্বন-দিউর লাক্ষাদ্বীপ, মিজোরাম ও পণ্ডিচেরী।

৬. জাহিরগাঁও, জহর গ্রামেণ, বিহার, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে ৫০টি প্রকৌত হবে।

যে সব বাজো দুই দিনে অর্থাৎ ৩ ও ৬ জাহাঙ্গীরী হোট গুলীত হবে সেগুলি হল—আশাম, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, কোয়লা, হ্যাংগ্রেশ, মহারাষ্ট্র, মনিপুর, চাওখাম, তামিলনাড়ু ও উত্তর প্রদেশ।

ବାସ୍ୟାଃଶ୍ରାବି ଆମ୍ଭେ ନାହାଁ :—

পলিডবল-৪২, অক্সপ্রেশন-৪২, আলোম-১৪, নিফা-৪৭ শুকরাট-২৬, হরিয়ালা-১০, হিমাচল প্রদেশ-৪, জম্মু ও কাশ্মীর-৬, কুর্দিস্তান-২৮, দেহল-২০, মধ্যপ্রদেশ-৪০ মধ্যপ্রদেশ-৪০ মনিপুর-২, মেঘালয়-২, নাগাল্যান্ড-১, ওড়িশা-২১ পাটনা-১৩, রাজস্থান-২৫ পিকিম-১, তামিলনাড়ু-৩২, ত্রিপুরা-২, উত্তরপ্রদেশ-৮৫, হিঙ্গল-৫, অন্ধ্রপ্রদেশ-২, গোয়া-২, অসম-১১, বিহার-১১ চণ্ডীগড়-১, হাফাভান রজেন-১ জাভাভা-১ মি:কারিম-১ পণ্ডিচেরী-১

ଯୋଡ଼ି ଉଠୁଅନ୍ତୁ ।—୧୫୫ ।

হাযজিগ পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনাস্থ
অব্যর্থ ফলপ্রসাদ

ଆୟତ୍ତା ହୃତ ବୁଦ୍ଧାବି

આયુર્વેદનિયુગ ઇ.સ. ૮૭૨

ସମ୍ଭା ୭, ୧୦ ଏବଂ ୧୨ର ମୂଲ୍ୟ

वाचिष्ठानः-

ଶ୍ରୀଅବତୀସୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

विमर्शके कुम्भीर • कृष्ण प्रभु • यद्वाचक • १३ पञ्चम

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অমূল্য নথিটির বিক্রয় প্রদান—ক্রয়প্রচলন বালেশ্বর—০০

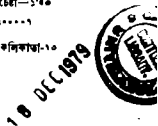
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুখোদয় মজুমদার—০০

কীর্ত্তন কুমার দত্তের—

- | | |
|------------------------------------|--|
| ১। বাংলায় অস্তিত্ব—১৫০ | ১। বঙ্গভাষায় গানের প্রভাব |
| ২। অমূল্য নথিটির বিক্রয় প্রদান—০০ | ২। দেশের সংগ্রাম কীর্ত্তন—১০০ |
| ৩। গভীর বঙ্গভাষা—১২৫ | ৩। কলকাতা বঙ্গভাষা সংগ্রাম কীর্ত্তন—৪০ |
| ৪। রাসবিহারী ও অমূল্য নথিটির—১০ | ৪। স্বাধীনতার পক্ষের মা ও মেয়ে—৪০ |
| ৫। বিপ্লবের ও সমাজবাদ—৫০ | ৫। বিপ্লবী বিপ্লবের—৫০ |
| ৬। স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা—৪০ | ৬। ভারতের নবজাগরণ ও গণিতের বিপ্লব—১৫ |
| ৭। দেশের সংগ্রাম কীর্ত্তন (১)—১০০ | ৭। দেশের সংগ্রাম কীর্ত্তন (২)—১০০ |
| ৮। স্বাধীনতার পক্ষের মা ও মেয়ে—৪০ | ৮। ১৯ই এপ্রিল জাতীয় স্বাধীনতা দিবস—১০০ |
| ৯। বিপ্লবের ও সমাজবাদ—৫০ | ৯। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অমূল্য নথিটির—৪০ |
| ১০। স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা—৪০ | ১০। লাল হত্যার প্রচেষ্টা—১৫০ |

প্রাপ্তিস্থান :—৪নং বঙ্গভাষা হাট কলিকাতা-৭০০০০৭

টেলিগ্রাম—১/১/১/A, বিপ্লবী চ্যাটার্জী হাট কলিকাতা-৭০



— মূল্যবদ্ধ বই —

বিপ্লবী চট্টোপাধ্যায় (মূল্যবদ্ধ) প্রত্নবৈজ্ঞানিক নথী, বিপ্লবী চ্যাটার্জী

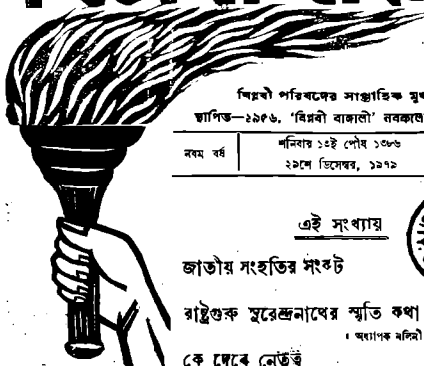
মূল্যবদ্ধ—প্রতিটি ১০০ পয়সা

বিপ্লবী বিপ্লব প্রত্নবৈজ্ঞানিক—প্রত্নবৈজ্ঞানিক বোধ। বৈজ্ঞানিক—প্রত্নবৈজ্ঞানিক পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—প্রত্নবৈজ্ঞানিক পেনসিল। প্রত্নবৈজ্ঞানিক—প্রত্নবৈজ্ঞানিক বোধ।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্গভাষা হাট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাকালী' নবকালেবার—১৯৭১

নবম বর্ষ

শনিবার ১৫ই পৌষ ১৩৮৬

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭২

১০-১৪ সংখ্যা

এই সংখ্যায়



জাতীয় সংহতির সংকট

রাষ্ট্রপুরু শুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মলিনী মোহন বাগুড় ।

কে দেবে নেতৃত্ব

॥ ডেবন চন্দ্র নন্দী ॥

বামপন্থীরা ভেবে দেখবেন কি ?

॥ অরুণ চন্দ্র দাস ।

ভোটের আসর সরগরম

॥ শ্রীকৃষ্ণবর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

শাসন ও স্বাধীনতা

॥ অরুণ মজুমদার ॥

কলিকাতার দেশপ্রিয় পল্লিতে কি ঘটছে

॥ শ্রীপতিচন্দ্র নন্দী ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ শ্রীযোষি দত্ত ।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
এ দুঃস্বপ্নের কেমন এড়ে
কালধোঁয়ায় বড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর ।

— নজরুল

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—CALCUTTA			
Acharya Smt. Manoram w/o Late Dinabandhu	69, Khaldhari Road, P O. Battala Calcutta-13	100	22 4 79
Bhattacharjee Hrishikesh	140A, Acharya P. C. Road Calcutta-6	200	14 4 74
Chakraborty Jiban Ranjan	Flat 6/1 ; Block 9 Poddar Park, Govt. Qtr. Calcutta-45	200	1 4 79
Cowdhury Smt. Aruna w/o Late Jadav Chandra	65/A, Sovabazar Street Calcutta-5	100	7 7 79
Das Smt. Nihar Kona w/o Late Santi (alias Prafulla)	17, Durga Charan Dr. Road Calcutta-14	100	13 6 79
Deb Purkayastha Smt. Jutbik w/o Late Birendra Deb Purkayastha	23, Parkside Rd, Calcutta-26	200	27 6 79
Dutta Smt. pushpa w/o Late Mrinal Kanti Dutta	94, Arandapalli, Calcutta-32	200	15 7 79
Ghosh Smt. Renu Bela w/o Late Naresb Ghosh	26/17, Dum Dum Rd. Cal -2	200	9 6 79
Guba Smt. Provabati w/o Late Kiron Guba	21, Justice Dwaraka Nath Road Calcutta-30	100	20 12 77
Nandi Smt. Usha w/o Late Manoj Nandi	25, Bidhan Palli, Calcutta-22	100	7 3 79
Pal Smt. Amala w/o Late Ashutosh Pal	5/2G, Panditia Road, Cal-29	150	15 1 79
S. Palamswami	59/1/A, Titjala Rd. Cal. 45	200	15 8 72
Dist—24 PARGANAS			
Das Manindra Mohan (alias Kshitish Chandra	C/o Kailash Bhawan Kalyangarh-10	200	1 7 76
Ganguly Jagadish Chandra	854/13 Kalyangarh	200	28 3 74
Ghosh Basudeb	30/13 Sahid Bandhu Nagar Colony Sajirhat, P.O. New Barrackpore	200	20 8 75
Ghosh Smt. Pratima w/o Late Subodh Ghosh	P. O. & Vill Sangrampur	150	16 12 78

(Contd. on 3rd cover)

জাতীয় সংহতির সংকট

আসামের পরিস্থিতি বীৰে বীৰে যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাতে শুধানে দেশের অজান্ত স্থানের মত এবারকার নির্বাচন হবে কিনা সে বিষয়ে কীতিমত সন্দেহের উদ্ভব হয়েছে। আসামের প্রশাসন শু একেবারেই বার্ষিকার ব্যস্ত রয়েছে এ বিষয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারও কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। উদারনী সরকারের ও পারের নীচে কোন ভিত্তি নেই। কৌশল করে গদী দল করা যেতে পারে। এমন কি কিছুদিনের জন্য গদীতে বসে থাকতে যেতে পারে। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে কোন সিদ্ধান্ত নিলে ভোটের ব্যাপারে ভাগ্য বিপর্যয় ঘোঁষ করা যাবে। সেটা কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে পারছেন না বলেই তারা ষিথএন্ড এবং নীরব হয়ে আছেন। অথচ আসামে একদল উন্নত দলক যদি তাদের খুদী মত নির্বাচন বন্ধ করতে সক্ষম হয়। তবে দেশের যে কোন স্থানে এই নজর অনুসরণ করতে পারে সামান্য কিছু সংখ্যক স্বাক্ষরকারী ও ছদ্মস্তকারী। এটা ঘটতে দিতে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করার কাজেই প্রচুর দেওয়া হবে। অথচ সম্ভাব্য কথা হল এটাই যে কমতানীল দল ও অজান্ত সব স্বাক্ষরকারীকে নিজেদের একমাত্র স্বাক্ষরকারী বলে নিজেদের জাহির করতে এবং ভোটের আসরে নেমে ভোট দিচ্কা করেছে। ক্রিমতী ইনিয়া গাভীকেই একমাত্র গণতন্ত্র হত্যাকারী বলেই কি সব লায়লায়িত এড়ানো সম্ভব হবে? ভারতবর্ষে নির্বাচনের দুখে এমন ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটেনি।

আসামের এই সর্বনাশা আন্দোলনের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে দেশের চিন্তামণী মাদুবেয়া আশেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং কর্তৃপক্ষকে সজাগ ও সক্রিয় থাকতে আহ্বোধ করেছেন। আজ ঘটনাস্রোত দেখে এ কথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে তাদের অনুসরণ শুধু অরণ্যে বোধ করার সামিল হয়েছে। বস্তুতঃ শতকোটি রোগকে যদি মুকুটেই চিকিৎসাধীন না করা হয় তবে রোগীকে শেবকালে বাঁচান সম্ভব হয় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে আসামে এই বিশিষ্টতাকারী আন্দোলন নতুন কিছু নয়। বহুদিন ধরে বাঙ্গালী বিরাড়নের মাধ্যমে এই অপকর্ম শুরু হয়েছিল। আজ সেটা আগে ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করে অজান্ত প্রদেশের ভারতবাসীর উপরও আঘাত হানছে। এখন সমস্ত অসমীয়াদের ধর্ম, মান, জীবন বিপদগ্রস্ত। বিশেষতঃ বিরাড়নের নামেই এখন আন্দোলন চলছে; অথচ 'বিশ্বেন্দ্রী' ব্যাটা। সেই সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়নি ব্যবহার অহুগোধ করা হচ্ছেও। ব্যাটা কোন স্বাক্ষরকারী

দলের বা মতবাদের সংশ্লিষ্ট নয়, মানব সেবাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই সাময়িক মিশন ও লোকজনদের উপর হামলা করা হচ্ছে। অথচ হুতরাবাদের সংহত ও সাজা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। ভারতের একটি প্রদেশে অন্য প্রদেশের কোন লোকজন বসবাস করতে পারবে না রুটী রোজগার করতে পারবে না এই দাবী জানাবার স্পর্ধা মুষ্টিমেয় কয়েকটি দল পেল কি ভাবে? তবে কি ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমাদের অধিবাসীরা আজ মোটা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে গায়ের জোরে এবং অন্য প্রদেশের লোকেরা শুধু অসহায় ভাবে এই নির্যাতন সহ্য করবে। এই প্রকারের কথাবলি শুনে হবে এবং কৈকিয়ৎ দিতে হবে কেন প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতা ও অক্ষমতার জন্য। সংবিধান অনুসারে ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সেই সংবিধান হত্যাকারীরা নিরাপদে দিনের পর দিন, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা ধরে, নিদ্রা পেয়ে যাচ্ছে কোন অজ্ঞাত ও রহস্যজনক কারণে। সরকারী প্রশাসকরা জনগণের টাকা নিচ্ছেন মাসের পর মাস কতগুলি জরুরী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য। সে কাজে এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলে, কোন অধিকারে পারিশ্রমিক গ্রহণ করছেন। তারা নিজেদের অক্ষমতার জন্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে জনগণের পক্ষ থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাদের বের করে দেওয়ার দাবী যদি গুঠে দেশব্যাপী, তবে সেটা কি খুব অসম্ভব ও অসঙ্গত হবে। এমন কি দেশপ্রেমী মানুষেরা যদি নিজেদের হাতে আইন ভুলে দেয়, তবে তাদের কি খুব ঘোষ দেওয়া যাবে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অবস্থায় যা ঘটছে এবং এখনও ঘটছে বিভিন্ন প্রান্তে। শুধু তবু কথা দিয়ে তার গতি রোধ করা আদৌ সম্ভব হবে না। হুতরাবাদের দেরীতে হলেও, এখন সব রাজনৈতিক দল ও প্রশাসকদের সজাগ হোন ও বধাকর্তব্য পালন করুন, এটাই আমাদের দাবী। হান্সাধিকারীদের হাতে দেশের ভাগ্যকে ছেড়ে দিলে, তাদের কিন্তু কোন পরিত্রাণ থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আন্দোলনকারীদের সতর্ক করে দিতে চাই। তাদের ক্রিম্যার প্রতিক্রিম্যার সম্ভাবনা প্রচুর ও ভয়ঙ্কর। হুতরাবাদের দেশের স্বার্থেই সম্মত হতে প্ররোচিত করি। আমাদের কোন সম্মত দাবী এবং সম্মত থাকলে, সংবিধান সম্মতভাবে তার সমাধান হতে পারে, গায়ের জোরে কখনই নয়। তাদের কার্যকলাপের ফলে জনতার ক্রোধের প্ররোচিত করলে, সেই আগুনে তাদের ভয়ঙ্কর হবার আশঙ্কা প্রায় নিশ্চিত। দাঙ্গাধামাকা করে নির্বাচন সাময়িকভাবে বাতিল করা গেলেও, ভারতীয় জনগণের মূল জীবনধারাকে বাতিল করা যাবে না কোন মতেই; এটাও প্রবাস্ত্য।

কে দেবে নেতৃত্ব

ভবেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

দেশের রাজনীতির সর্বভাষ্মী অধোগতির ফলে এবং রাজনৈতিক নেতাদের ঊষ্টাচার ও আদর্শহীনতার জন্ত দেশ আজ যেখানে এসে পাজিয়েছে তাতে অতীত দিনের আদর্শ তোলা বিপ্লবী কর্মী ও নেতারা তথা দেশের অগণিত স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা সম্মুখে এসে দেশবাসীকে আবার চাক দেয় না কেন দেশের লোক অনেকে আন্তরিকভাবে এ প্রশ্ন করেন। এ কথা মতি আজ একটা বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ও সুপরিকল্পিত আদর্শ-নিষ্ঠ কর্মপন্থার প্রয়োজন রাজনীতিতে অনিবার্যরূপে দেখা দিচ্ছে। অতীত দিনের বিপ্লবী কর্মীদের কর্মনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ ও আদর্শায়ুগল কর্ম-সাক্ষ্যের কথা স্মরণ করে অসহায় দেশবাসী একান্তভাবে আশা করে তাঁরা বর্তমান দুর্ঘোষের দিনে এগিয়ে এসে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। দেশের আদর্শ ঊষ্ট স্বার্থপর কুংসিত চরিত্র রাজ-নীতিকদের সন্নিবেশ দিয়ে দেশের ও সমাজের জন্ত মতি্যকার কল্যাণমূলক রাজনীতির নতুন আবহ সৃষ্টি করবেন। দেশবাসীর অনেকেইই বিবাস দেশের অগণিত প্রাণবন্ত তরুণদের মধ্যে নতুন সাদা জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা তাদেরই আছে। তাই দেশের লোক অনেকেই আজ আন্তরিকভাবে কামনা করে তারা আবার কর্মক্ষেত্রে কৌমর বেঁধে এগিয়ে আসুন। দেশকে বাঁচান।

বর্তমান নেতাদের ঊষ্ট চক্রের প্রভাবে এবং নিলজ্ঞ স্বার্থাষেবী নীতির অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার

ফলে দেশের সর্বত্র নৈতিক মানের চূড়ান্ত অবনয় লক্ষিত হয়। সমাজ-জীবনে সর্বত্র ব্যাপক অস্বা-অকতা, ছিনতাই, রাহাজানী ইত্যাদি। ঊষ্টা ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় ব্রব্যমূল্যের আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি, বেকার এবং তার ফলে অর্জিহার অনাহার। এ সবের ফলে মানুষের মনে স্বাধীনতার সমস্ত গর্ব ও আনন্দটুকু নিঃশেষে বিলীন করে দিয়েছে। মানুষ আজ একাতাই অসহায়। আসন্ন নির্বাচনে হাত তুলে ভোট সেবে কাউকে না কাউকে, কিন্তু এ কথা অত্যন্ত সত্য যে কোন নেতা বা কোন দলের উপর এদের আর এতটুকু বিশ্বাস বা আস্থা নাই। তারা চার সমস্ত অবস্থার আনুল প্রতিকার, প্রতিবিধান। কিন্তু কে করবে সে প্রতিবিধান। কার আছে সে দ্বিগুণ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীরা এই সব ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিশে একই 'ছুতনৃতো' মশগুল হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই নানা সুবিধা সুযোগ পেয়ে ভালভাবে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন। যারা এ সবের মধ্যে সুবিধা করতে পারেন নাই বা যুগঠিত হয়ে পড়েছেন তারা ই মাঝে মাঝে এক আধটুকু কোলাহল করেন। কিন্তু কার্যতঃ এরাও রাজনৈতিক দলগুলির কর্মপ্রবাহের গজালিকা-শ্রোতের টামে শুধু কালিমালিগু হন নাই—বিপ্লবী ঐতিহ্যকে কালিমালিগু করেছেন। যে সত্যতা, (বাকী অংশ ৪-এর পাতায়)

શાસન ૩ સ્વાધીનતા

कई

॥ प्रबोध मञ्जरी ॥

(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর)

এরকম বহু প্রকারের ঘটনার খবর আসতে লাগিল বিন্দী-দেউলের কাছে। সেই একই লাগতেই প্রবল দাশট। দুই মেওয়ার বিজয়ে কণা বসতে গিয়ে না বসে। দুই মেওয়ার বর্জ্যদ্রব্য রক্তে ঢাকি হয় সবাই হিন্দুভাণ্ড এবং ব্যক্তিগত মন। এই অর্থের প্রত্যেকটি করে অস্বাভাবিকভাবে প্রবীর্ণ হলেই কয়েকজন প্রকৃত জনসংগী নেতা। বিধব বৃদ্ধদের সন্তান মাতৃবাণীরে মধ্যেও কেন অস্বাভাবিক অর্থোপার্জনের প্রতি এখন তীব্র আগ্রহ? বহু মাতৃবাণী ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই মাতৃবাণী মনে চিত্তে একথা লয়। তাঁদের চরিত্র বোঝা যায়। কিন্তু বাণী শ্রেণীর নয়, বাণী মনে এগিয়ে মাতৃবাণীরে বিধব-দেউলের কল্যাণ সাধন করাটা বাণী সর্বাঙ্গতঃই চায়, তারা কেন প্রতিযোগিতা করতে পারে না নিজেদের অস্বাভাবিকতার প্রকৃতির? অর্থটুকু অস্বাভাবিক সাধারণ কর্মচারী আছে বাণী কিছুতেই কাজে লাগিতো যেত না, দুখ-দেউ না। তারা বলে কাজ না করে যেতেই নিজেদের পাশের বন প্রাকৃতিক বাণী, আর দুখের টোকা লাগতেই টুকলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা অস্বাভাবিক হবে। এমন লোকগুলো কম টাণা নিয়েও একটু বেনী দুখ মনে হয় অস্বাভাবিক। কিন্তু কেন?

[illegible]

একর শরী রক্তবর্ণীরে। ধীরবর্শন। জড়বর্শ যবে
 নক ইন্দ্রিই হুকে জানেব এংমাত উৎস, ইন্দ্রিগ্রাহ্য
 অগ্নই একাত অগ্ন, ইন্দ্রিবর্শই জীবনের একমাত লক্ষ্য,
 এং মাতঃবর্শ কর্ম নিবৃত্তি হর এংমাত ইন্দ্রিগ্রাহ্য লব্ধিবেশ
 দ্বারা। নক ইন্দ্রিই দ্বারা কোনো জৈবানিত্তিক মন্যবোধ
 জানা যায় না, অতএব তার কোনো বাস্তব সত্তা নেই।
 নক ইন্দ্রিই দ্বারা কোনো আদিত্তিক সম্পর্ক জানা যায় না,
 অতএব এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির কোনো আদিত্তিক
 সম্পর্ক নেই। নক ইন্দ্রিই দ্বারা কোনো অজীৱিগ্রহ তথ বা
 (শরী অং ১৩ শতাব্দ)

(৩ পাত্তাৰ পৰেৰ অংশ)

নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও মনের আধ্যাত্মিক গঠন
বিপ্লবীদের জীবনের মূল সূত্র ছিল স্বাধীনতা-উত্তর-
কালে তার স্পর্শমাত্র রাজনীতিক নেতা বা কর্মীদের
মধ্যে নাই। আরো বিশেষ করে বিদেশী 'ইজম'-
এর নানা জাবজাবার প্রভাবে 'সাইনিসিজম' ও
অবিশ্বাস মানুষের মনকে প্রভাবিত করেছে।
সত্যঃ, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতাকে 'বুর্জোয়া
মনোবৃত্তি' আখ্যায় অজ্ঞানতার বস্ত্রেতে পরিণত করা
হয়েছে। কলে মানুষের পাড়াবার পত্তন প্রায়টকর্ষে
চুপকার হয়ে গেছে। আজ সর্বত্র ছুটকফের
'কৌশলের' রাজনীতি মানুষ অনুসরণ করছে।
তার অনিবার্য ফলশ্রুতি আজ দেশের এই দুর্ভিক্ষ।
আর্থিক দুর্গতি, শাস্তি-শৃঙ্খলার হ্রাস, এবং
সর্বোপেক্ষা অধিক দুর্গতি মানসিক বিশৃঙ্খলা।
'ব্যা ক্রপলী অফ্ আইডেল' এবং 'ব্যা ক্রপলী
অফ্ ইমার্জিনেনস'।' এই সব কিছু আজ দেশের
মানুষকে চূড়ান্তভাবে অসহায় করে তুলেছে। কে
এর প্রতিকার করবে। তার জ্ঞান নিম্নঃ ॥

বাস্তবপন্থীরা ভেবে দেখবেন কি ?

—অরুণেন্দ্রনাথ দাস

এবারে নির্বাচনের বাস্তবীকরণ নেতাদের পরস্পর
বিশ্ববৈধের ও ব্যক্তিগত কুংসার কলুষিত। বৈয়াক্য,
পণ্ডিত, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি কতকগুলি বুদ্ধিতে বাঁধ
মান কংগ্রেস প্রদানে নেতারা সচেষ্ট। দেশের ও জাতির
সমগ্র লক্ষ্যের সম্মান ও পূর্ণ কর্মসাধনের সামনে নেই।
স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিখিল করে গিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন-
কারীরা স্বাধীনতা নিয়ে উঠছে, এরাই নেতা হয়ে
হাড়াইতেছে। গুরুত্ব নির্বাচনে দাঁড়িয়ে আর সূচনা করেছে
অনেক রাজ্যেই ইংরেজ আশ্রয়প্রাপ্ত রয়েছে। বৈদেশিক
নীতিতে আদ্যের অগ্রগামী কৃষক বিন বিন শ্রমিক।
অর্থনীতি দেখে পড়েছে, হুঁসুধ। গৃহের চাপে কর্মসাধন
শিষ্ট। কর্মসূচির চাপে চোখের চোখ চলেতে যেমন
বুদ্ধি ও বোনের যেওনা প্রতিক্রিয়া দাঁড়া, কিন্তু ইংরেজ
অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান না হতে সাধারণের প্রত্যাশা
বিন বিনই কবে চলেছে, সঙ্ঘের দীর্ঘ জায় পেরে হতে
চলেছে। আবার পণ্ডিতগণ অর্থনীতির বুদ্ধিগণের
জিহ্ম আক্রমণ করে নেতারা কেহ কেহ সূচক অর্থনীতির
দৃষ্টি ভুলে দেশের লোককে বোকা যেওনা চোখ
চলিয়েছে।

আবারের বস্তুবাদ পণ্ডিতগণ অর্থনীতির উপকার
জিনিস প্রদান বস্তুবাদ, পণ্ডিত কংগ্রেসের নেতাদের
স্বপ্ন করেছিলেন। বস্তুবাদপন্থিত পণ্ডিতগণের উপ
যেভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জোগান। উৎপাদনের সম্পূর্ণ
জায়গাটাই কৃষি ও শ্রমিকের হাতে যেওনার নিবেদ
ছিল। আবারের উন্নয়ন পণ্ডিতগণ যেভাবে কাঁচকাঁচ করা
হতেছে তা নিয়ে সমালোচনা হতে পারে কিন্তু আবারের
কত দেশে পণ্ডিতগণ উন্নয়নের নীতিটাই বিলুপ্ত বা সঙ্কো-
চিত করলে কর্মসাধনের অর্থনৈতিক সংস্কার অসম্ভব-
কর হবে এবং একবার এই বিবেচনা প্রদান হলে

অর্থনীতি কিংবা বাণিজ্য পণ্ডিতগণ সত্য হবে না,
একচেটিয়া পণ্ডিতগণ পেরে বসবে। দৃষ্টান্তে দেখে, কৃষি
নিঃসৃত উন্নয়ন উৎসাহিত সত্যেই বলছেন এবং বলছেন।
কারিগর অর্থনীতির উপকার প্রদান সব হল ও নেতারাও
জোর দিয়ে। কিন্তু দেশের আর কতদিনের জন্যে এলো-
বলো অর্থনীতির সংস্কার নিয়ে কোন কোন রাজনৈতিক নেতা
নিরপত্তার স্বতন্ত্র মিলিয়ে পরিবর্তনকে মূল নীতিটাই
আক্রমণ করেছেন, কেহ কেহ বলছেন উৎপাদনের ও
ব্যবসায়ের স্বাধীনতা কিংবা প্রয়োজন, কেহ কেহ
পণ্ডিতগণ ও নেতাদের দৃষ্টি কণা ভুলে পণ্ডিতগণ অর্থনীতি
বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা হোঁচলি পড়ি কংগ্রেস চোখ করেছেন।
এবার বস্তুবাদ, পণ্ডিত বস্তুবাদের মিলিয়ে আশ্রয়প্রাপ্ত হল
পণ্ডিত বস্তুবাদ। নিরপত্তা বাণিজ্য হতে আশ্রয়প্রাপ্ত হল
না পণ্ডিতগণ কারণ আশ্রয় প্রদানের নিয়মাবলীর প্রচেষ্টা
পণ্ডিতগণের এবং বস্তুবাদের এবং কংগ্রেসের কণা বস্তু
হয় নাই। নিরপত্তা বাণিজ্য নিখিল হল বস্তু ও উৎপাদন
প্রদান জোগান পণ্ডিত উৎপাদন করে নিরপত্তা ও
ব্যবসায়ের লক্ষ্যে অর্থ প্রদান।

বে যেন প্রাচ্য অর্থনীতি লোক জীবন নির্বাচন সূচক
প্রয়োজন ও বিচারে পেরে না সেই দেশে পরিবর্তন ও
নিরপত্তা হুঁচলি অর্থনীতির। পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টা ও পণ্ডিতগণ
কি হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হতে পারে কিন্তু পণ্ডিতগণ
না উন্নয়নের নীতি নিয়েই যদি দেশের স্বাধীনতা হয় এবং
জাতনৈতিক কর্মসাধনে এর বিধান সমাধানের চেষ্টা হয়
তা হলে আবারের স্বাধীনতা বিপদকে ভেঙে আসা হবে।
আবারের প্রচেষ্টা হুঁচলি নিঃসৃত বাণিজ্য কৃষির
উন্নয়ন করলে দেশের পেরে হতে বস্তুবাদ। আবারের
স্বাধীনতা পেরে হতে, হতে উৎপাদন নিয়ে স্বতন্ত্র
পেরে। এই চিন্তা মায়াবী। দেশের জন সাধারণ

সাব, সুবিধাজনক হারে ব্যাংকের ওপ ইত্যাদি সব সুবিধাই বন্ধ চাবীটা পেয়েছেন, এখন সুবিধার জন্ত বিচ্ছেদের আধিক ও রাজনৈতিক কমতা বাড়িরে নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঠোট চাবী সার বেয়েছে এবং আমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছি :

তুর্ন পত্রিকল্পনা ৪৮-১ ও ৪৮২২২২র জন্ত দ্বিতিন্দীল ও হদীর স্বাধিনিধিবেষে কাক করতে হক্তি এমন সবকার প্রয়োজন। কেবল দ্বিতিন্দীল সবকার প্রতিষ্ঠিত হলেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে এ ধারণা ভুল। দ্বিতিন্দীল একমাত্রক সবকার জনসাধারণের উপকারের জন্ত কিছু কাজ করতে পারে কিন্তু কমতা বন্ধার জন্ত সমস্ত বিরোধী মতকে উদ্বেগ করে দেওয়ার প্রবণতা কেবল দেয়, ইহার ফলে আনন্দাত্মিক আনন্দিতা বেড়ে যায় এবং তুর্ন পত্রিকল্পনা ও নিঃসঙ্গ বানচাল হয়। ১৯৭৪—৭৬ সালের রাজনীতির ইহাট শিকা।

আমাদের পণ্যেরের জিন বৎসর জীবনে সবচেয়ে সফটমর এবারের নির্বাচন। এবারের নির্বাচনের দুইটা সমস্যা হল-পাঁচ বৎসর ব্যবধানে স্কু ও স্বাধীন নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত পণ্ডর বন্ধ করা এবং অগণিত দুর্বল হাণ্ডের আধিক উন্নয়নের জন্ত পত্রিকল্পনা ও নীতি বন্ধ করা। এই দুটির প্রয়োজন সকলের নাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। জনশিক্ষার যে উচ্চতরে এই উপলব্ধি হতে পারে যে প্রেরে আমরা পৌছিতে পারি নাই। কিন্তু আমার কথা শিকা ও বুদ্ধি এক জিনিষ নয়। এই নির্বাচনের মূল সমস্যা কোথার জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া নক নয়। আমার নির্বাচনের অবদান ও পত্রিকল্পনা উন্নয়ন নীতির অংশুপ্তি বা ন্যোচন যে কাম নয় এটা বুঝবার মত নক্তি

আমাদের দেশের জনসাধারণের আছে। জন সাধারণকে এই সমস্যা বুঝিয়ে দেওয়া বাম ক্রুটের ঐতিহাসিক কতখা ছিল, কিন্তু বাম ক্রুট বাম ও পণ্ডাত্মিক ঐক্যের সোপান তুলে নিছক ইচ্ছা বিরোধী ক্রুটের নামে সুবিধাবাদী নীতির দিকেই খুঁকে পড়েছে।

ঐমতী উদ্ভিদা পান্ডীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার পট্টক মূল্যায়ন না করে ইচ্ছাকৃতীয় অন্ধ বিরোধীতার পথ একমাত্র পাথের করে প্রতিক্রিাদানীল চক্রের দ্বালা আবদ্ধ হতেছে। ঐমতী ইচ্ছাকৃতীয় দশ বৎসর কমতার অদ্বিতীয় সময়ে রাজনীতিগত বিলাপ দ্বারা ভারতে সামন্ত-ভক্তির চিহ্ন সূঁছে দিয়েছে, ব্যাককে জাতীয়করণ করে সূঁচ শিল্পী ও সাধারণ শ্রম শিল্পীদের স্বপ্নবানের ব্যাবস্থা করে এক চোটিয়া পুঞ্জির হাত পছ করে দিয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে বৃদ্ধ করে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করে কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে জাতি ও রাষ্ট্র বধ না এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ফলে আমাদের বিশ্বকোঁড়া কান্দীর সমস্যা সমাধান হয়েছে আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। বিভিন্নতা মূলক চিন্তাধারা বিলুপ্তি করে ভারতবাদী এক জাতি, একগ্রাণ এই উপলব্ধি কিবিয়ে এনেছিলেন, নাকিণ শাস্তাভাষ্যেরে স্কুটি উপেক্ষা করে সোভিয়েতের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীন পন্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারত সব দিকে এগিয়ে চলছিল। অমতী হলোর—ভেরিণ (৩৩) মাল শালনের ফলে সবই বানচাল হতে চলেছে। ঐমতী পান্ডীর এক হায়েক ও বৈরাচার প্রবণ-কর্মের প্রতি কণাখাত করে তাঁর প্রগতিশীল কর্মপ্রত্যেকে আরও বেশবতী ও কার্যকরী করাই বাম আগর্ষের ও কর্মপ্রচার সক্ষমপূর্ণ-নয় কি।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

কলিকাতার দেশপ্রিয় পল্লীতে কি ঘটছে

সাবেক গোলাঘাটা জে. এল. নং ২৭ এবং বাঁড়চাঁদা
পশ্চিম জে. এল. নং ৩০, সাবেক মিউ কাট ক্যানেলের পূর্ব
পাশ, বাঁধা ক্যানেল সাধারণ ল্যাণ্ড হিসাবে চিহ্নিত ছিল।
এই ক্যানেল সাধারণ ল্যাণ্ডে পূর্বে বলাগত কিছু সংখ্যক
সরকারি পংখর সরকারের খাসমহাল কর্তৃক দেয় অস্থায়ী হো-
মিলিং মূলে বদলদার, নিজেদের অর্থে ও প্রমো বদলবাটী
নির্মাণ করতঃ বাস করিতে থাকে, বিগত ১৯৪২-৪০ খাল
হইতে এবং বিগত সেটমেন্ট কর্তৃপক্ষের পরচা অস্থায়ী
করা যাবে বলি।

অতঃকর্তে দত্তাবাস যৌদ্ধার বহুসংখ্যক আদিবাসী
 বংশজ্ঞানী রাজবংশী সম্প্রদায়ের দোক পুত্রোপপুত্রসে বসতি
 বিস্তার করিয়া আছে বেলেঘাটা মহানগর। উক্ত ব দিক
 থেকে ক্যামেল সাবগ্রান ল্যাণ্ড (নিউ কট ক্যামেলের
 পূর্বপাড় এবং বিজ্ঞাপি মেডো জেডের পশ্চিম পাড় দত্তাবাস
 রোড নামে চিহ্নিত ছিল, বর্তমানে বেশপ্রিয় সরণী) বাহা
 দত্তাবাস যৌদ্ধার বাগুরার একমাত্র কটমাকীর্ণ রাস্তা।
 নিম্নলিখের বেশপ্রিয় পলী ও দত্তাবাস দুটা খালদা গ্রাম।

গোলাঘাটা ও বাউতাড়া পল্লিরের যে অংশে উষান্তরা
 বাস করিতে থাকে সে স্থানের নাম জাতীর নেতা, বাগীন্দা
 লগ্ন্যনে পূর্বস্থতার নেতা সেনপ্তির বজ্র নেতেন সেনপ্ত-
 ণের বৃত্তি শরণে "বেশপ্রিয় পত্তী" নাম রাখা হয়।
 বেশপ্রিয় পত্তীজাত ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে পত্তীবাসির
 প্রভেদ আছে। বৃদ্ধির বয়সে বেশপ্রিয় প্রাথমিক বিভাগের
 প্রথম পত্র ১২৫৫ লাগে হইতে পত্তিবাসির সন্তান অধিগ্রহণ
 করিয়া পরিচালনা করিতেছে। প্রাথমিক বিদ্যা
 বিভাগের অব্যবহার্য নকশা পুস্তক উপরে চান ছাড়া
 আর কিছুই নাই—না আছে কল পুথি নির্মাণের পরিকল্পনা,
 না আছে মেসার্সের কোন প্রকার উদ্ভোগ। অবিস্মরণীয়
 জাতীর নেতার বৃত্তিকল হিন্দাবে বেশপ্রিয় ও নেতা

ক্রেমেশ পথে—জাতীয় সম্পদ হিসাবে। এই দেশটির
পল্লীতে অধিবাসের স্বাধীনতা। সংক্রামী তথ্যের পরিবাহের
বাস আছে।

পূর্ববর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রণকার শত্রুত জাতি বিধান
রায় লবণহস্ত উগ্রন প'রকল্পনা কালে লবণহস্ত এবং
বেশজির শরীর যাকখনে জল ত্রিকানী নানা কটিয়া
এবং নানার পূর্ববর্তে দিলার দিয়া সীমানা চিহ্নিত করিয়া
ভাগ করিয়া দেন বাহা আজও সীমার দিলানি দিলাবে
বিদ্যমান। সীমানা :—পূর্ববর্তে জল ত্রিকানী নানা;
পশ্চিমে-অধুনা লুপ্ত নিউকট ক্যান্সেলের উগ্রবান সমস্ত
কুসি-উগ্রের কৃষ্ণপুর দাল ও পশ্চিমে বেশকারী বাসুদেব
বাহা সীমান্ত।

বিগত ১৯৭৭ সালে ২৬শ কাব্রদারী প্রকাত্তর নিবসে টালিগুড়ের জারেলকা মহলানে আয়োজিত এক বিশাল উদ্‌যাপনসময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর দাব ভাঙ্গল নতুনকাল এবং পশ্চিমবঙ্গ নতুনকারের তরফে ঘোষণা করিলেন "এখন হইতে পশ্চিমবঙ্গের আর কোনো প্রকার উদ্‌যাপন হইবে না—যে যেখানে আছে সেই বঙ্গালী জনের হাট্টো বালিকানা বঙ্গ পাইবে" এই পরিপ্রেক্ষিতে আরি দেশপ্রিয় পরী কল্যাণ সমিতির সভাপতি হিন্দুধর্ম শ্রীসিদ্ধার্থ দায়ের নামে ঘোষণাঘোষণা করি এবং দেশপ্রিয় -রী জনবান্ধব প্রতীকরণ এবং বিন্যাস্তো বালিকানা বঙ্গ দেশের আবেগন হাট্টি পত ৭ ৬ ৭৪ তারিখে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় মাঝেবে সমর্থনে সম্মতি জানান এবং প্রাক্তন উদ্‌যাপন বিজ্ঞাপকে দেশপ্রিয় পরীকে প্রতীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ যেন। পত ২৬, ৬, ৭৪ তারিখে হিন্দুধর্ম নং ৩৩৭৭ চিঠিতে উদ্‌যাপন বিজ্ঞাপন—কোমক স্টাটু টাইমস অধিকর্তাকে বর্ণাবিবীত ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ যেন, তদবধৌ উক্ত

কার্যবি, সম্পদ করিয়া; বেশপ্রিয় পত্নী কল্যাণ নারায়ণ
স্বভাবগতি হিসাবে আবারে নিরক্ষিত চিঠি লিখেন—

Govt. of West Bengal

(Squatters' Colonies and Development
Section)

10 Camac Street (2nd flr.) Calcutta-17

Development Section Development

No. 1187 Re (Dev) Dt. 10.8.78 Group

From the Development Branch

Officer, R. R. & R. Directorate.

To Shri Sripati Ranjan Nandy, Preside-
nt Deshapriya palli Kalyan Samity.

This is to inform him that his colony
has been enlisted for regularization as Post
1950 Squatters' Colony and it will be taken
up along with such other colonies.

Sd/- Illegible

10. 8. 78.

স্বাভাবিক বিকাশ কর্তৃক বেশপ্রিয় পত্নীকে স্বাধীকরণে
নিষ্টকৃত করা চাওয়া বেশপ্রিয় পত্নী পর্যন্ত সম্প্রসারিত
জাতীয় পর্যায়ে কোন পরিবর্তন নাই। আছে প্রতিশ্রু-
তিবাদী আয়লাভকর, প্যেন বুল্ট—কি করে উৎসাহের
উৎসাহ করে নিজের বার্ষিক অধিকার লাগানো যায়—
উৎসাহের তিন বৎসরের অধিকতর পর্যন্ত বন্দী ও বাড়ী
বিক্রী করা হইয়াছে বলিয়া প্রচার চালানো হইতেছে।
কিছু একজনকে ন্যায় সমস্ত বন্দী যদি অন্তর্যমের কাছে কি
করে বিক্রী করা যায়—বাগাও জুই করিলেন তাহারো নেত্র
তুলিয়া না দেখিয়াই কি ক্রয় করিলেন—এই ক্রয় বিক্রয় যদি
সত্যি হয়—আইনগত চিন্তা তাহারো বিবেচনায় বিষয়।

অপরদিকে বহুবার সাক্ষর লবণ হুথের কোন সেক্টরে
জাতীয় টেক্সটাইল নির্মাণের কাজ আছে ১৫০০০ টন
প্রায়ের কয়লার ব্যবহারের মতবন্ধী রাজবংশী সম্প্রদায়ের
লোক বহুদিনের বহুবারে তাগে স্বাভাবিক হওয়ার অবস্থা

আবি আভারে দেখা যায়। প্রায়শাশীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়
হইয়া পড়ে এবং সরকার পক্ষও একতরফা পোলের পুনর্বাসন
সমস্যার মোকাবিলায় অতঃপাত্তা পুঁজিতে থাকেন।
'গোলাপ গোলাপ' ন্যায় দেখা দিলে বিবৃতি লিখিতান দেবার
লক্ষ্য বাহা নিগ্রাহর এবং নিবন্ধ ভিত্তিকভাবে বান্ধবদের
সম্মান করিয়া দেয়। এই বিষয় সংক্রান্ত বেশ কয়েক লক্ষ
টাকার অর্থব্যয় আজ্ঞার লবণতুল্য করার প্রত্যয় পাইলে—
লবণতুল্য প্রাপ্তি সনদে প্রত্যয় গ্রহণ করে এবং বহুবার
মোক্তার রাজবংশী সম্প্রদায়কে (যদিও এরা নিবন্ধর বা
নিবন্ধ মতে) উক্ত পরিবর্তনের আওতার অপর্যাপ্ত করার
মতলব জ্ঞাতি হয়। ভিত্তিকভাবে সম্পূর্ণ বন্ধিত করিয়াই
রাজবংশীকে বিয়া এই স্থান পুণে করা হইবে বলিয়া প্রচার
চালাইতে থাকে এবং বলীর কৈতর হারকম সকলেই রাহি
করার প্রচেষ্টা চলে। রাজ-পরজাতি-নীতিগত অধিক
ইত্যাদি টালবাহানা দেখিয়া বলীর নেতারা ২১-জুন-ই
জারিগের একজন বক্তার ঘোষণা করেন ভিত্তিক আভানায়
বাইতে হইবে মতে এই অকলকে বিত্তীয় বহির্ভুক্তি পা
নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা পূর্ণতার পরিণত করা হইবে—তাতেও কিছু
হয় না। গত ১১ই আগস্ট সভ্যের পোশন এবং পাওয়া
সেল ১২ই তারিখ রবিবার সকালবেলা অপর্যাপ্ত হইবে—
তত্ত্ববৎসে পোশন এবং প্রকাশ হওয়ার কয়েক বক্তার।
যথোচিত প্রতিবেদন যদিও আভান বৃত্ত বণিতা এক-
প্রান্ত হইতে অতঃপাত্তা বিয়াট লবণতুল্যের মাধ্যমে বিক্ষা-
ভের ধানি বিয়া আভান-বাতাস কাপাইয়া তোলে
হাজির। পরের দিন সকাল বেলা ১১ই আগস্ট রবিবার
প্রতিবেদনকারী হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ নর-নারী মানিকতলা
-নাড়িকেলভা-বেলোটা বহুবার প্রাপ্ত জমপদ অর্থপ্রায়
করিয়া থাকে এবং ধানি-প্রতিবন্ধিত মূখ্য হয়।
অন্যদিকে সাতোটা বাড়ী পুলিশ বাহিনী অসংখ্য কৈতর ও
বলীর নেতারা সম্মত বৃত্ত-পাঠ্যক কয়েক থাকে—সলী-
নেতারা এখন লবণতুল্য খানার বাগাও পুঁজি মতল্যে শাসকের
সদে বহুকৌশলগত কয়েক বাত। মতে-সাতোটা গুলি
করার প্রচেষ্টা চলে বিক্ষুব্ধ, গুলিবৃদ্ধ ও গুলিবৃদ্ধদের
মতল্যে শাসকের মতল্যে দ্বিতীয় ভিত্তিক পান—বিনা বাহরে
রক্তপাত এবং প্রাণহানিতে তিনি অসম্মত জ্ঞাপন করিলে

নেতৃত্ব সহকৃপা শাসকের উপর বিরক্ত হইয়া ও তাহা করিয়া
থানি ত্যাগ করেন। আলাপ অংশেচনাৎ মাধ্যমে সমস্যা
সমাধান করিতে চান এই প্রস্তাব দিয়া বিকোভকারীদের
সহ্য হইতে প্রতিনিধি স্থানীয় সংসদকে জাতিয়া আনয়ন
প্রোতন এম. এল. এ. লালবাহাদুর সিং, পৌরাজ্য দায় আনয়ন
কন দুই এবং আমি প্রতিনিধি হিসাবে থানার দিয়া সহকৃপা
প্রশাসকের লামে দেরা কর। তিনি সমস্ত পরিষিতির
বিবরণ সেওয়ার পর প্রস্তাব রাখেন—কি চান ইত্যাদি
বিশদ ভাবে ওনার কাছে জানাইলেন—উনি কোলা শাসকের
লামে আলোচনা করিয়া একটা স্থানান্তর আশাস দিলেন
—আরও জানাইলেন অগ্রর ভবিষ্যতে এতদকলের সকলেই
উঠিতে হইবে—প্রয়োজন বোধে অগারেলনের সংকেত
দিলেন। বিকোভকারীদের এই প্রস্তাবে রাজি কহাইবার
আশাস দিয়া প্রতিনিধি চলিয়া আসিলে উনিও পুন্নি
দাম্বী দিয়া স্থানান্তর করেন। এর মধ্যে আলাপ আলো-
চনার কিছুটা অগ্রগতি হইয়াছে মনে হয় গত ১১ই নভেম্বর
বিশ্বায় প্রায় তিনশতাব্দিক লোক খোজার নিদিষ্ট আভ্যনার
দ্বিধা। শোনা যায়ভেদে যে স্থানীয় বাচীওয়াল ও
জাফাটে ছাড়াও যাহা হইতে কেডোবের কিছু কিছু লোক
দ্বিধা আভ্যনার দশ নেতরা হইয়াছে।

সহকৃপা শাসক মহাপ্রের লিখিত আলোচনার বেশ বুঝা
যাইবেক অগ্রর ভবিষ্যতে পর্যায়েক্রে সমস্ত উপর অগ্রর
আক্রমণ বা অগ্ররেশন চলিতে পারে। এই আশংকার
উৎপত্ত পুনর্বার দত্তর কর্তৃক স্থানীয়দের লিষ্টকৃত
“শেষপ্রিয় পলী” বহুভাষ্য উক্ত আশংক্যে ভাব্যীয় লাম্বি-
বেব ২২৩ দ্বারা মোতাবেক শেষপ্রিয় পলীতে ইনআংলনের
অগেডার বাধা হইয়াছে। বক্তাবাদের অবশিষ্টাংশও অগ্রর
ইনআংশন পাইয়াছে।

এই লম্বে অনুসন্ধানের জাভার্থে জানাইতেছি শেষপ্রিয়
পলীও উৎসাহও বিরক্ত কোন ব্যবস্থাতেই মাধ্যম করিতে
হানী নহে—উৎস পুনর্বার কর্তৃক স্থানীয়দের লিষ্টকৃত
শেষপ্রিয় পলী স্থানীয় সংগ্রামের অগ্রগামী জাতিয় নেতা
শেষপ্রিয় দত্তের মোহন সেনগুপ্তের স্বত্বাধিকারিত। এই
শেষপ্রিয় পলীর স্থানীয়করণ ও বিনা সত্তে বিনামূল্যে ভবিষ্য
মালিকানা আদায়ের সংগ্রাম চালাইয়া হইতে বহুপরিকর।

ইতি—

শ্রী উপাধিকার মন্ত্রী

সভাপতি

শেষপ্রিয় পলী কলাম লিখিত
৩, শেষপ্রিয় পলী, কলিকাতা-৩৩
(বিধানসভা-কলকাতা)

স্বাস্থ্যের সেরে বয়স, অল্প, অসুস্থ ও সেরে বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রসাদ

আমলা হাত বুঝারী

অমৃতবেদনায় স্নাত ১০০০ মুদ্রা ৩, ৫০ অল্প অসুস্থ হওয়া
আমলা হাত বুঝারী

শ্রী অমলা হাত বুঝারী চক্রবর্তী
কলিকাতা-৩৩ • কলকাতা • কলকাতা • কলকাতা

রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নজিরুন্নাহন দাশগুপ্ত

১৯০৯ সালে আমার বিলেত ভ্রমণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একাজ তিনি এমন হৃৎতার লবিত লম্পা করেন যে
সাম্রাজ্যের সাংবাদিকদের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে
তিনিই হয়ে পড়েন দর্শকের আকর্ষণীয় পুত্র। এমনতো
বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে আমরা মিলিত হয়েছিলাম।
কিন্তু তার সত্যতা ও সেখানকার তার কথা কন্সকোয়েন্সের
সভাসভার মনে অবশ্যই জিরিয়ে দেয় তাঁরা থাকবে।

আগেই বলেছি আমাদের কার্যকর পূর্বেকেই ঠিক
করে রাখা হয়েছিল। তদুপাধী আমরা আমাদের কাজে
দেখে গেলাম। আমাদের এই দিনের কাজ শুধু চল নিউ
কলেজ পরিদর্শন নিয়ে। এই কলেজটি এক রকম আমাদের
হোটেলের বিপরীত বিকটেই, ঘুরে ঘুরে দেখান। প্রায়
প্রতিটি কোণ ঘিঁষি লোকচারণ, কমনরুম, ঘুমানের ঘর,
এমন কি মন্ত্রণালয়ের কুঠীও দেখলাম। আমি একজন
ভাষ্যের শিক্ষাব্রতী, শিক্ষাপ্রতি সম্পর্কে যে পনিজ ধারণা
আমাদের দেশে আছে সেই ধারণা নিয়েই বাসব হয়েছি।
আমাকে হাঁকান করতেই হচ্ছে যে কলেজে ঘুমানের
ঘর ও মন্ত্রণালয়ের ঘর সেবে আমি নির্দিষ্ট হয়েছি।
তারকো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা হোটেলে এ রকম
কোন লগ্নিই পাবা নেই। আমরা আমাদের ছাত্রের
ঘুমান পছন্দ করি না এবং তাদের ঘুমান করতে বাধ্য
করি। আর মন্ত্রণালয় সে তো আমরা অতি সমাজ
পরিমাণে বলেও বুঝা করে থাকি। হৃৎ এতে নীতি
নির্দিষ্ট কিছু নেই এবং এও হৃৎ ঠিক যে এরকম মন্ত্রো-
ভাষের দেখেন কোন স্থির বিচার নেই। কিন্তু আমাদের
দেশের শিক্ষার ধারণাটা প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণা নীতির
উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতিগত জাবে তা ছিল অতি খটো,

স্বাভাবিক এবং তার সকল কাজের সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী
গড়ে উঠেছে, তার উপরও আছে এই নীতির প্রভাব।
গারিড, পরিভাষা, আপত্তিক জীবনের সমস্ত বিলাসিতার
প্রতি অবজ্ঞা এই মূলোভূত ধারণার উপরই গড়ে উঠেছে
প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এবং এই ধারণাই আমাদের
কুঠী ও সভ্যতাকে তপ দিয়েছে। ঘুমান ও মন্ত্রণালয়ের
প্রতি ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তির দিক থেকে প্রকৃতিগত জাবেই
বিস্তৃতা আছে। তবে ভিন্নদেশের সভ্যতার অপূর্ণতাকে
অনুভব করে সে কখন কখন ঘুমান ও মন্ত্রণালয় করে
থাকে।

আমার সাথে জীবনে আমি ঘুমান করিনি। স্বপ্নত:
যি: চার্চুল ছিলেন আমার এওজন বন্ধ। তিনি খুব
অব্যক্তি প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাকে
তার সঙ্গে ঘুমান করার জন্য জেব করতেন। কিন্তু
তিনি তাতে দাকল্য লাভ করেন নি। অবশেষে তিনি
এক কবি করলেন। তিনি আমাকে একটি হৃৎ
দিগায়েট হোন্টার উপহার দিলেন। এটি তিনি প্যারিস
একু-কিশিমে কিনেছিলেন। এ রকম একজন হৃৎধারন
ও পছন্দ হৃৎ এই নীতির ধারণা আমি উপেক্ষা করতে
পারলাম না। এই হৃৎ দিগায়েট হোন্টারটি কাজে
পাওয়ার আমি ঘুমান শুরু করলাম। কিন্তু সে অভ্যাস
করেছিলাম আর করেতকিনের আর। যাত্রা তিনিই কি
চাখিনি সে অভ্যাস ছিল। ঘুমান আমার সত্য হৃৎধারন
না। শরীরের সমস্ত রোগলুপ দিয়ে এর জীব গড় পেলাম।
এরপরে আমি ভিন্নদেশের মত সেই দিগায়েট কেনসি কলে
দিলাম। গবেষণা জানতে পারলাম যে আমার একজন

চোর-প্রভৃতির চাকর পেটী ছুঁচি করে নিয়েছে তখন আমি বসি খোঁধ করলাম।

অকস্মাত্‌ আমায়ের এক লাফ বেওয়া হল। লাফ বলে অল্‌ সোলন্‌ বসেজের লাইব্রেরী বাড়ীতে। লর্ড কার্জন ছিলেন ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর। তিনি আমায়ের কলেজের বাগানে অস্ত্রাধনা করলেন। পরে তিনি ঐ লাফ অহুঠানে সজাগতিয় করেন এবং বক্তৃতাও করেছিলেন। ঐ অহুঠানের মধ্যে বা বক্তৃতার মধ্যে সে বক্তব্য উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। অকস্মাত্‌ থেকে আমায় পেলার সেকিছে। এখানে মেয়র আমায়ের আপ্যায়ন করলেন। এখানে বাংলাগের ভিক্টোরিয়ান্স্‌ হ্যাণ্ডিক্রিস্‌ এণ্ড কো-এর কারখানার কাজ দেখাবার জন্ত নিতে বাওয়া হল। এই কারখানাটি হল অস্ত্র তৈরীর একটি বিখ্যাত কারখানা। আমার কাছে—এবং আমি মনে করি আমায়ের অধিকাংশের কাছেই, এটা ছিল একটা হৃৎযুক্তির দৃষ্ট। আমরা কেবলমাত্র তাকিয়ে যেখানায় এবং নিশ্চিত হয়ে পেলাম—এটা হল এখানকার অভিজ্ঞতার দর কথা। এখানে একটা প্রস্তাব এসেছিল যে আমি কিছু বলি। কিন্তু আমি এতে একটু আশঙ্কিত করলাম। ম্যাকটোয়েই কিছু বলবার জন্ত মনটাকে প্রস্তুত করে রাখা অধিকার হুক্তিসম্পন্ন বলে মনে ক'লাম। আমার মনে হচ্ছে আমায় এ সিদ্ধান্তটা ঠিকই করেছিল।

১৮ই জুন তারিখে আমরা ম্যাকটোয়ের উপনীত ওলাম। আমায় হোটেলের প্রবেশ দ্বারে আমার ভারতীয় বন্ধুণ আমাকে আগন্ত জনগণে উপস্থিত ছিলেন। তাদের প্রধান ছিলেন মিঃ হুবে। মিঃ হুবে ছিলেন উত্তর ভারতের লোক। তারা আমার পলার মালা গড়িয়ে সিলেন। ফুলের তোড়াও ছিলেন। আর সেই সময় প্রেস কন্‌ফারেন্সের অস্ত্রত লক্ষ্যবাসী বন্ধুরা বেশ তৌড়হলী হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে এই অভিনব দৃষ্ট দেখতে লাগলেন। এই বর্ণকায়ের মধ্যে ভেইলী মেইল পত্রিকার সংবাদ-বাহতা মিঃ ম্যাককেন্ডিও ছিলেন। বেস্ট মাত্র আমায় চোখ ফোর দিকে পড়ল, আমি তাকে বললাম, 'তুমি ভেইলী মেইল পত্রিকার আমার রাজ্যাভিষেক বলে

বা বর্ণনা করেচ, এই বেশ, সেই রাজ্যাভিষেক।' তারপরে লক্ষ্যনিত বন্ধুদের এই বক্তব্য অধিবেশ পাখারপত্ত প্রতিক্রিয়াই হয়ে থাকে।' তিনি হেসে কল্ললেন। আমি ফুলের সেই বাড়তি লাফটা তার হ্যাটী বুটেরের হাতে তুলে দিলাম যেহি বুটেরকে তা উপহার দেওয়ার জন্ত। দিইই আমি আমার হোটেলের ঘরে চুকে পড়লাম।

ম্যাকটোয়ে, টাউন হল এক লাফ পাঠি হলেন। দেখানে বক্তৃতা করার জন্ত আমায় রায় গ্রিক করে রাখা করেছিল। লর্ড মেয়র ছিলেন এই অহুঠানের সজাগতি। তিনি 'কি ইন্‌স্ট্রিয়াল প্রেস'র টোটে প্রস্তাব করার সময় আমায় নামটিও তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। আমায় সেই বক্তৃতাটি একটি ক্রোড়াক্ষে মুদ্রিত করার অধিকার আমি গ্রহণ করেছি। কারণ আমার সেই বক্তৃতার আমি আমার সাধারণ বক্তব্য সত্ত্ব কার্যকর ভাবে আমায়ের বায়ব্‌গনসন লন্ডনের আকাক্ষ্যকে বসিত করতে চেষ্টা করেছি। সেই বায়ব্‌গনসনকে আমি 'সম্রাজ্যের লাকা গ'খুনি'-কল্লই তুলে ধরেছি। সেই বক্তৃতার আমি বলেছিলাম যে আমায়ের বায়ব্‌গনসনই সম্রাজ্যের মধ্যে ঐশোর সংঘর্ষে লক্ষ্যবাসী হকা কবচ, ইংল্যান্ডের সব বক্তব্য কুট-কৌশলের বিরুদ্ধে ঝড়োয়ার মত সংঘর্ষে পুড় পুর্ণ। তখন আমি যা লাভ করার জন্ত আমার সেই বক্তৃতার সাঙল করে বলেছিলাম আজ আমরা তা লাভ করার পথে অনেকখানি এসিঁয়েছি। কারণ বারিষ্মনীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। যদিও বর্তমানে তার মধ্যে কাল মেঘের ভ্রুটি ছাড়া বোঝা থাকে, তবলেও আমি আশা করি সময় পূর্ণ হলে সেই বারিষ্মনীল শাসনব্যবস্থা আবিস্কৃত প্রতিটি কল্লকল্লের মধ্যে লক্ষ্যন অশীলারূপে ক্ষুদ্র তুলবে। আমার বক্তৃতার শেষ কথাটিতে আমি বলেছিলাম,

'বায়ব্‌গনসন লুকল বসি ভারত ভোগ করে, তাহলে এক সমুদ্রবাসী বিদ্রোহী এবং হাবী ভারত সম্রাজ্যের এক মহাশী লহার লক্ষ্যন হয়ে ঝড়াবে এবং সম্রাজ্যের ঐক্য হকাং বাপারে সংঘর্ষে বেসী লক্ষ্যবাসী হুর্ণ হয়ে উঠবে। এই ভাবে পাখারপ

সাম্প্রতিক অধিকার ও স্বাধীনতার ঐক্য পক্ষে প্রবর্তিত হবে সাম্রাজ্য তার বিরুদ্ধে দস্তাবেজ নথীপত্রিকা পত্রিকাশীল জোটের উপেক্ষা করতে পারবে এবং সব রকম ঘটনা বিপর্যয়ে দীর্ঘ স্থিরভাবে সত্যের আশ্রয়স্থান নিয়ে যোগাযোগ করতে পারবে ইতিহাসের দিকের যে ঘটনা বিপর্যয় নতুন রাষ্ট্রের পূর্ব রাষ্ট্রকে এবং সাম্রাজ্যবাদ-নৃত্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। এই সময় রাষ্ট্র নিরাপত্তার ভর হল প্রোগ্রেসের আটনের উপরই নির্ভর করেছে, নৈতিক নিয়মের নথির পক্ষের উপর নির্ভর করেই যে নৈতিক নিয়ম সময় মানবীর কর্মের ব্যাপারে ইহকের বিধানেরই অঙ্গীকার সংকল্পে বহন করে।'

এ কথা বহন করা হয়েছিল তখন ছিল ১৯০২ সাল। পরে বহন ১৯১৪ সালে আবার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এমন এক দুর্ভাগ্য পক্ষ-জোটের মুখোমুখি হয়ে ঝাটলায় সে রকম পক্ষ জোট উত্তিপূর্বে আর কখনও পড়ে ওঠেনি, তখন আবারের শাসন ভর্তাৎ বৃত্তে পারছেন যে প্রতিপক্ষ নীল শাসন ব্যবস্থা প্রত্যয়ের দ্বারা তারতকে নৃত্যশীলী ও নৃত্য করতে পারলে যে নিরাপত্তা দেখা দিলে তারই মধ্যে বহুতে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও পক্ষের দিকেরতা। এই দৃষ্টিতে যদি তারা আগে উপলব্ধি করতে পারতেন এবং তৎসমুদায়ী কাণ করতেন তাহলে সাম্রাজ্যের সেবার আরও অধিক পরিমাণে লোকবল ও অর্থবল খোলাখুলি জোঁকই পাওয়া যেত।

প্রোতারা আবার বক্তৃতাটি সাগ্রহে এমন কি উচ্চস্বরে পড়তে প্রচণ্ড কলহন এবং গ্রেগ প্রতিনিধি বিবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আবার পাশেই বসেছিলেন, তিনি আবার বক্তৃতা শেষ করে আদরে এসে বলতেই আবারকেই বললেন, 'মিঃ ব্যান্ডি, তোমার বক্তৃতা যদি ২ শত জন লোক তারতে থেকে থাকে তাহলে আগামী কালই তোমাদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।' আমি বললাম, 'আমার মত ২ শত লোকের বিশদ সংখ্যক লোক তারতে আছে।' অহুঠান পূর্ব শেষ হল আমি বহন হল ঘর ত্যাগ করতে বাচ্ছি—এমন সময় তৎসমুদায়ীক এসে আবার

সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, 'স্যার এই বইটিতে আপনার নামটা দিখে দিই না।' আমি বহন আবার নাম দিখে দিচ্ছি সেসময় তিনি বললেন, 'স্যার আমি বলতে পারি, এই বইটির নিমিত্ত হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত এ রকম বক্তৃতা এখানে আর হয়নি।' এই কথাগুলো বহুত প্রশংসার বাড়িবাড়ি হতে পারে। কিন্তু এটা সত্য যে এই কথাকথার কথা দিখে তার একত মনোভাবই প্রকাশ করেছে। কারণ তিনি বহন কথাগুলো বলছিলেন তখন স্পষ্টই তার আগ্রহ ও সরলতা প্রকাশ করেছে।

ম্যাক্টোবের সংবাদপত্র নতুন প্রতিনিধিগণ অহুঠানে উপস্থিত ছিলেন। তারও বক্তৃতার প্রশংসা করে তারের কাগজে দিখেছেন। রক্তবর্ণীল দলের মূলপত্র ম্যাক্টোব কোরিয়ার পত্রিকা তারতের আশা-আকঙ্কায় প্রতি সব সময় খুব বক্তৃতাখণ্ড নয়। সে পত্রিকাটির আবার বক্তৃতা সম্পর্কে দিখেছে, 'ম্যাক্টোবের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের এই পরিচয়গত সবচেয়ে নাক্তরী ঘটনা হল এই বক্তৃতা। অতিথিগণের সঙ্গে সাক্ষাতের ভক্ত লর্ড মেয়ার ম্যাক্টোবের যে সময় নাক্তরীক আশ্রয় আনিতেছিলেন তারের সকলের উপরই বিশেষ স্পর্শের মত এই বক্তৃতার প্রভাব পড়েছে। একজন তারতীয় নেতি তারের সংখ্যন করে তাহেরই ভাষায় এমন অথাক অনর্থকভাবে যা বলেছেন, উপস্থিত সকলেরই মনেই তা ঈর্ষার উত্তেক করে এবং যে আবেগ উজ্জ্বল নিয়ে সে বক্তৃতা করা হয়েছে তা কেবলমাত্র একজন স্বতাৎ-দিত্ত দাবী পূর্বের পক্ষেই আরও করা সম্ভব। এ রকম বক্তৃতা তারার অতিমতা দীর্ঘমে একবারই দাত ঘটে।'

অহুঠান শেষ হওয়ার প্রায় শেষ সময়ে আমি ম্যাক্টোব ছেড়ে চলে এলাম। কারণ আমার লজনে পার্লিয়ারমেন্টের সদস্য মিঃ হাইনেসের (পরবর্তীকালে স্যার উইলিয়াম) বাতীতে একটি জিনার পাটিতে বোম্ব দিতে হবে। জিনারে পৌঁছতে আমার কিছুটা বিলম্ব হল। জুজ মিঃ ও মিলেগ হাইলেগ ছিলেন তারতের সদস্য। সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা আমার কাছে ছিল একটা আনন্দের বিষয়। (চলবে)

(৪ পাতার পরের অংশ)

আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না, অতএব সত্যতা, সহনতা, পরোপকার, ব্যাপক প্রচুতির অহুসীলন থেকে যে তুলি ও আনন্দ লাভ হয় সেটা বিধো। লোকের অস্ত পন্থাকে বিদর্শন বেওয়া যায়, অতএব ব্যক্তিগত ইঞ্জির হুণের অস্ত সত্যতা, সহনহুতি, কর্তব্যনিষ্ঠা, সাধন প্রচুতি নীতিগুলি বিদর্শন হিসেবে কোনো অপরায় হই না আমোদের। অতএব কোনো উচ্চাঙ্গী পানক বা কন্নীর পক্ষে সত্ত্ব নর সামাজিক পাপসত্তে আবাস্ত করা যদি সে-পাপচক্র তাকে সাহায্য করে ইঞ্জিরহুত লাভ করতে।

অপর পক্ষে আদর্শবাহীরা অতি সহজেই পারে দুব বা কমতা বা আলস্যের লোভ সম্বরণ করতে। এর কারণ, ব্যতীতস আদর্শবাদ বা বেদান্তবাদ বলে মাস্তবের আস্থা অপর। আস্থার পদম লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দ লাভ। আনন্দের উত্স হচ্ছে স্রেয়োমৈত্রিক মূল্যবোধের অহুসীলন। আস্থার অভাবেরই মিহিত রয়েছে দর্শপ্রকার জ্ঞানের মূল-ভুলি। চিরস্থায়ী আস্থার ন্যূনতই অভিধে আছে স্রেয়ো-নীতিগুলি, অতএব চিরস্থায়ী ভাবনা। লক্ষ্য ও পন্থা একই পন্থার দুই দিক। অশ্লিষ্টত লক্ষ্যকেই বলা হয় পন্থা, আর শ্লিষ্টত পন্থাকেই বলা হয় লক্ষ্য। অতএব আদর্শ-বাহী মনে করে সত্যিকার মূহ সে পথে পাবে মুনীতি অহুসীলনের পরেই, আর মুনীতির পথ তাকে টেনে নাযাবে সত্যের ছাংয়ের মধ্যে। এই বিশ্বাস কিরকি সে চলছে পাপ-চক্রগুলি ধোলে ভারত তথা বিশ্বকে শোষণমুক্ত নীচতমুক্ত করতে।

আজ ভারত ও বিশ্বের সংকটের মুহুর্তে বেদন নির্বাচন বসে চলছে তাতে নির্বাচকমতলী ও নির্বাচনপ্রার্থী সমাই-কেই স্থির করতে হবে কোন্ পথে এগিয়ে যাবেন ওঁরা। লক্ষ্যবাহী ইঞ্জিরবাহী সমুদায়বাহী ব্যক্তিবাহী প্রমুখ আদর্শব-দের পথে? অথবা বেদান্তবাদ আস্থাবাহী আনন্দবাহী সমায়বাহী প্রমুখ আদ্যোক্তাদের পথে? মনে রাখতে হবে সামাজিক সাধা, অর্থনৈতিক সাধা ও সামাজিক সাধা হচ্ছে একটা আদর্শ। ইঞ্জিরবাহী অশ্লিষ্টের দৃষ্টান্তী আদ্যমাকে অস্ত করে বিশেষ সাংঘ্যের প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্ব হই শুদ্যব আদর্শবাহীর পক্ষে। ইঞ্জিরবাহী পাপকদের পক্ষে

সত্ত্ব নর ইঞ্জিরপন্থ আদ্যমাকে অতিষ্ঠ করে অস্তান্তির সাংঘ্যের প্রতিষ্ঠা করা। কারণ লক্ষ্যবাহীরা যদি চক্ষে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশে ব্যাধা নিরস্তিত হয়, তাকে সংঘোষিত বা নিরস্তিত করা নর যদি তার থেকে ব্যক্তিগত ইঞ্জিরহুত লাভ করা যায়।

['তন]

যদি শাসন না থাকে তাহলে সমাজ-জীবন চলে না। সমুপূর্ণ স্বাধীন সাম্প্রতিকতা বিচ্ছেদই ইচ্ছামতো স্রোতস্রোতা করে বহি কতবে পরাম্পরের স্বাধীনতা। প্রতিটি ব্যক্তির মনে থেকে অশ্লিষ্টত চলে নির্যাপত্তা-বোধ। অর্থনৈতিক-জীবনে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা চেকে অপর তার স্বাধীনতা ও বিপন্ন। আবার পূর্ণ স্বাধীনতাও তাকে টেনে ধরে দুব আর বিপন্নও মধ্যে ভাঙি আমোদের একটা মূলমন্ত্র সত্ত্ব করতে হচ্ছে শাসন ও স্বাধীনতার মধ্যে।

খুব কঠিন মনে হয় এই মূলমন্ত্রটাকে। কারণ ফলটা আদ্যবের আদ্যর চলে আছে ইচ্ছাবৎ তাবা ও ভাবের প্রভাব। ইচ্ছাজীতে ক্রোড়ন মন হচ্ছে স্বাধীনতা। যে কী ব্যক্ত, তার চলাপ পথে থাকবে না কোনো ব্যাধি। মূহ-স্বার্থের পথেও না, অস্ত-স্বার্থের পথেও না। কিন্তু ভারতীয় সাম্রাজ্য স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে স্ব-স্বাধীনতা, অর্থাত্ যে ব্যক্তির শুদ্যব নিজেই নিজের স্বাধীন সে-ই হচ্ছে সর্বাঙ্গেকা বেশী মুক্ত বা কী। নিজ হচ্ছে বিবেক। আদি যদি আদ্যর বিবেক ব্যাধা শাসিত হই তাহলে আদিই হচ্ছে স্বাধীন। এই অসামাজ্য বিধে বিভার কারণে দুব কঠিন মনে হবে না শাসন আর স্বাধীনতার মধ্যে সমস্ত সাধন করাটাকে। অথবা এখানেও প্রশ্ন উঠবে—স্বাধীন ও পরশাসনের মধ্যে সমস্ত ব্যাধিনো যায় কী করে? যে নীতি ব্যাধা সমাজ আমাকে শাসন করে সে-নীতিটা যদি আদ্যর বিবেক গ্রহণ করে নিজেই নীতি বলে তাহলেই ফিটে যায় সমস্যটা।

তাহলে সমস্যটাটা অংশে হচ্ছে—কীভাবে সমাজকে মনে করতে পারি এত অপন্ন যে, সমাজের সাধন হয়ে যাবে আদ্যর বিবেকও না ইন, সমাজের ভালটা মনে হবে আদ্যর বিবেকও ভাল? অতি সহজ এ-প্রশ্নের

উদ্ভট। এখন আশাধের সাম্যবোধ আশাধের ক্ষমকে বলবে যে সকল মানুষ মূলতঃ সমান, সকল মানুষ সমান মহাশয় লাভে: অধিকারী, তখনই আশাধের মূহুর্ত সমাজের আইন-কানুনগুলোকে যেনে নেবে নিজের বিবেকের আইন-কানুন বলে।

কিন্তু এই যেনে কতাব পথে বরাবর আসে দুশ্চিন্তা জনিত থেকে। উগ্রপ্রিয়গ্রাধ্য কপতে কোনো দুটি জিনিষ সমান নয়, প্রত্যেকটিকে বিচার করছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। দুটি মানুষ ঠিক সমান হয় না যেহেতু বা মনে। দুটি পাছ হয় না ঠিক একই রকম, একই পাছের দুটি পাখা বা দুটি কল হয় না ঠিকই একই রকম। সব্বটই দুটি হয় অসাম্য, কেবলি অসাম্য। এই অসাম্য দৃষ্টি করে মানুষের প্রবৃত্তিকে। কলে একজন মানুষ গার আর একজনের চেয়ে বহুসংখ্যক বড় হতে। নামে বলে, ধনে মানে, পরীক্ষােই প্রত্যেক মানুষ অতিক্রম করতে চায় অপর সবাইকে। যেন-সব সামাজিক আচরণ-অচরণ ভিত্তি-মৌলিকতা একসময়ের প্রবর্তিত হয়েছিল সম্ভবতা ও সম্ভবত্ব প্রকাশের মাধ্যম রূপে দেশলোকে আত্মকাল ব্যাবহৃত হয় অসাম্যিক নাম ভিত্তিতা প্রকাশের পরীক্ষা বলে।

চতুর্দিকে এই অসাম্য, এর মধ্যে সাধারণ স্থান কোথায়? কীভাবে আশাধ মনে করবে সকল মানুষ মূলতঃ সমান? কীভাবে অসাম্য দর মানুষের হৃৎ-স্পন্দ থেকে যেনে নেবে নিজের স্ব-স্ব-বলে? কীভাবে সামাজিক আত্মকে যেনে নেবে বিবেকের আইন বলে? অথচ যেনে না নিলেও হৃৎ-স্পন্দ যোগে পেরে যাচ্ছে মানুষের সমাজ থেকে। সমাজের সকল অসাম্যের মূলে দ্বিধিত রয়েছে এক সর্বব্যাপী সাম্য, তাই তাকে কুল পেলে হৃৎ-স্পন্দ আশাধ আশাধের কীমত। এই কলে আশাধ কিংবদন্তি মানুষ অসাম্যভাবে চলছে সামগ্রিক আশাধমানে দিকে।

সাম্যবোধের পথে অসাম্যকেই হচ্ছে সাম্যবোধের আকাঙ্ক্ষা। অসাম্যকে অগ্রগামী ইউরোপ ও আমেরিকা আশাধ পরিচালিত করেছে বিশেষ সমাজকে। ইচ্ছাযে হোক কি অসাম্যের হোক, সকল সমাজ বেশই আশাধ অসাম্য করেছে উগ্রপ্রিয়গ্রাধ্য পান্ডিত্য সমাজকে। কিন্তু পান্ডিত্য সমাজের মধ্যে নেই কোনো সাম্যবোধী জীবনধর্ম। অসাম্য জীবনধর্মের

সকল বৈশিষ্ট্য, তেমনি তার পেরে অসাম্য। সাম্যবোধের অসাম্যের মধ্যে একসময় লেখা দিচ্ছেলি একটা সমাজের ইতিহাস। কিন্তু সে-ইতিহাস অসাম্যেরই ইতিহাস হয়ে গিয়েছে অসাম্য জীবনধর্মের চাপে। একসময় বেলা প্রমিত্য ছিল সর্বগ্রাধ্য, আশাধ তার অসাম্য-প্রবৃত্ত সমাজ-সাম্যের প্রবোদন প্রবর্তিত হচ্ছে পুঁজিবাদী বিলাসিতার দিকে। আশাধ ট্রেড-ইউনিয়ন-সমাজের মর্মবানী হচ্ছে 'এক উগ্রপ্রিয়গ্রাধ্য ক'রে বেশী মজুরি উপার্জন করো'। কলে বড়লোক হচ্ছে শুধু ধনীত্ব, প্রমিত্য, আশাধ ট্রেড-ইউনিয়ন-মেম্বার। বেশের সামগ্রিক লোক হয়ে যাচ্ছে গরিবদের থেকে দরিদ্রদের।

বিশ্রাম চূড়ান্ত-প্রভাবিত সমাজ-ব্যবস্থা একমাত্র। অসাম্য ওই হচ্ছে অসাম্য-বিশ্রামের অসাম্য আশাধ-বিশ্রাম জীবনধর্ম। তার সমাজ হচ্ছে একটি অসাম্য-বিশ্রাম কোমো যান নেই উগ্রপ্রিয়গ্রাধ্য কপতে। অসাম্য সকল আশাধ-বিশ্রাম জীবনধর্মই সাম্যকে প্রবৃত্তি জীবনধর্ম ক'রে তুলতে পারে না আশাধের দ্বারা। বেশের অসাম্যবোধী চিন্তা-বিশ্রাম উগ্রপ্রিয়গ্রাধ্য কপতে বা পরমার্থকে মনে করে জনিত থেকে এক মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন তারের এট বৈশিষ্ট্য এনে বেশ বহুসংখ্যক। আশাধ সাম্য প্রভাবিত হয় পেরে-বিশ্রাম জীবনধর্ম দ্বারা তার সমাজে না সর্ব সাম্যে সমগ্রণী হতে। ব্যক্তিগত বিবেক ও বৈচিত্র্য যে সমগ্রণিত সাম্য ও ঐক্যেরই প্রকাশ এটা উপলব্ধি করতে পারে না তার।

বেলায় কলে মানুষ ও বিশ্বের অস্তিত্ব। নিজের ইশ্বরব্য প্রকাশ করাই মানুষের সাম্য। সীমার দ্বারা অসাম্যকে বৈশিষ্ট্য বহু বেশী প্রকাশ করতে পারে সে-মানুষেরই হয় তত বেশী হয়। অসাম্য উগ্রপ্রিয়গ্রাধ্য কপতে সামগ্রিক হৃৎ-স্পন্দোদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বহু বেশী তার অসাম্যের সমাজে সর্বত্র বহুসংখ্যক তারে সে-মানুষের আশাধ হয় তত বেশী দ্বারা, সমাজ ও বিচিত্র। সাম্য তার অসাম্যতা প্রকাশ করতে পারে সাম্যের সংগে একান্ত হয়ে। সাম্য তার অসাম্যতা প্রকাশ করতে পারে প্রমিত্যের সংগে একান্ত হয়ে। বিবেক তার অসাম্যতা প্রকাশ করতে পারে ক্রোধানের সংগে একান্ত হয়ে। উগ্রপ্রিয়গ্রাধ্য তার অসাম্যতা প্রকাশ করতে পারে ভোক্তাদের সংগে একান্ত হয়ে।

সেবক তাঁর অসীমতা প্রকাশ করতে পারে সেবিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে।

যোদ্ধাবাহী জীবনধারণ ব্যাপ্তি অহুপ্রাণিত হয়ে সমাজ-বাসীরা যখন এই সর্বব্যাপী একাত্মতা উপলব্ধি করবে এবং এক পরম পতীর নিবিড় সুখ-শান্তি-আনন্দের আশায় পায়ে তখন সমাজ সেই থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হবে সর্বপ্রকার শ্রম-শোষণ, উত্তরোচ্চ গ্রহণ, চোরাকারবার, কালোবাজার, ভেৎসাল-মিশ্রণ, কান্ডে-কাণ্ডি, অসহুপার্জন, অপপাশন, অসব ঘটন এবং যিঘোয়ামলা। বেলাজ ব্যাপ্তি অহুপ্রাণিত কোনো বিশালী আবিষ্কার বা স্রষ্টা করতে না কোনো সমাজ—বিপ্লবী সমরাস্ত্র, কোনো সেবক সিংহের না সমাজ-পতনকারী সাহিত্য—কোনো প্রলোভনের কপেই তাণ্ডা কংসে না এ—কাজ। সমাজে যখন এরকম সাম্যপুত্র একান্তগামী মনোভাব বেধা হেবে তখনই ন্যায়বিচারের বিবেক রাষ্ট্রীয় আইনকে যেনে নেবে নিজের আইন বলে, রাষ্ট্রীয় শাসনকে যেনে নেবে হুশাসন বা স্বাধীনতা বলে। অর্থাৎ তখনই সময়ে সাধিত হবে শাসন ও স্বাধীনতার মধ্যে।

আজ নির্বাচনের শ্রাঙ্কালে বুদ্ধিবাহী ন্যায়বিচার ডোট-হানের আগে অগ্রগই তাৎপর্ন্যে জাতীয় সমস্যা ও তাঁর সমাধানের কথা। সাম্যবাহী বা বেলাজবাহী বুদ্ধিভাগী জাতি কেউ পারবে না তারতক বা বিধকে বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার করতে। ব্যাঙ্গি বৈশী সাম্যবাহী বা বৈশী শোষণবাহী ব্যাঙ্গি প্রচলিত হয়ে ভারতকে বিখণ্ডিত করেছিল এক এখনও বহুপ্রতিভা করতে চাইছে ভারত—কংগ্রেসই হোক আর কমানিষ্টই হোক আর মুসলিম লীগই হোক—ভারতের বিরোধিতা নিশ্চয়ই করবেন ন্যায়বিচার। আজ ন্যায়বিচার শুধু বিচার করবেন কেন শাসন হুশাসন বজায় রাখে ভারতকে নিয়ে যেতে পারবে উপযুক্তবৈশী পদপ্রেক্ষার দিকে, কারণ ভারত—পাকিস্তান—বাংলাদেশের জুখ কখনও পুড়ে না উপহাসবৈশী একা ব্যতীত।

আজ ন্যায়বিচার কিছুতেই যেন না জোলে সর্বব্যাপী বিলাত কার্যের আশেই কথা। কার্যের আশেই বিলুপ্তম

টিকে থাকতে চায়। আজকাল মানুষের মনজিনে নির্ভার পবিত্র কার্যের আশেই রয়েছে কার্যের খেয়ে। মন্দির মন্দির নির্ভার অধিকারীরা ভর পার পাচ্ছে সুখের লোকের হস্তীক কর্তব্য পরায়ণ হয়ে ওঠে। বহু তাহর তাহলে মন্দির মন্দির নির্ভার কোনো প্রয়োজন থাকবে না আর। পুত্রত যোদ্ধা পাত্রী বেকার হয়ে বাসে সব। টিক সেহক প্রতিক-দরী ফেউইনিগনি নেতাগণ মনে করে প্রতিকের জুখ ঘুচে গেলে ইয়েইউনিগনের প্রয়োজন থাকবে না আর। তাই তারা কীয়ে হয়ে প্রতিকের সমস্যাগুলো। সেসে সেসে মন্দিরবাহীরাও তাই মানারজন ব্যাঙ্গি সৃষ্টি করে পূর্ণ সাম্যবাহী প্রতিষ্ঠার পথে। এসব কার্যের আশেই বিরোধিতাকে অতিক্রম করেই ভারত তথা বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বৈশ্বাভিত সাম্যের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পনীতি, ব্যবসায়নীতি, সমাজনীতি, বর্জনীতি প্রভৃতি সবকিছু।

আমাদের এত কথাই সংক্ষেপে একত্রে যে, অনেক সময় নেতারা ঘেঁটে বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও পরিষ্কার অধিকারী হয়েও হুশাসনের ব্যাপারে সাধারণ অর্জন করতে পারেন না—ওইমানে জীবনধারণের অভাবে। এর প্রকট উদাহরণ তিরিশ বছরের কংগ্রেস রাজত্ব ও আড়াই বছরের জনতা রাজত্ব। প্রাথমিক জয়ে বেগতে পাই তেরলের ও পশ্চিম বাংলার মন্দিরবাহী শাসন নিজের নীমার ব্যাঙ্গি সাধারণ অর্জন করতে পারছে না জুজবাহী জীবনধারণের প্রভাবে এবং বৈশ্বাভিত সাম্যবোধের অভাবে।

চরম অজ্ঞতা হেতু অনেক নেতারা বলেন—বেলাজ বলে জনত যিঘো, অতএব বেলাজ বর্জন জাতিগত ব্যাপারে অগ্রযোজ্য। তাঁদের জানার জ্ঞান লোভ—বেলাজ কোনো কিছুকে যিঘো বলে না, সবকিছুকে সত্যি বলে। বেলাজ সত্যকে দুজনে ভাগ করে উল্লিখিতব্য অগতকে বহুক্ষে প্রতিক্রাসিক সত্য, আর অজ্ঞানির জনতকে বহুক্ষে পারমাণবিক সত্য। পারমাণবিক সত্য হচ্ছে চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ও নিরপেক্ষ। প্রতিক্রাসিক সত্য হচ্ছে কণস্থায়ী, পরিবর্তনীয় ও অপেক্ষাকৃত। আধুনিক বিজ্ঞান

ভোটের আসর সরগরম

শ্রীবাণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাচন আসরপ্রায়, তাই সব রাজনৈতিক দলই উঠে পড়ে লেগেছে। নিজ নিজ দলের বক্তব্য ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে। দেওয়াল লিখন বহু এলাকার সমাপ্তপ্রায়, তবুও এখনো অনেক জায়গায় দেওয়াল লিখনের কাজও চলছে। একে অপরের ত্রুটি-বিদ্রুতি, ব্যর্থতা, অপশাসন, পক্ষপাত-মূলক বাবদ্যা গ্রহণ ও স্বার্থান্বেষিত কথ্য সবিস্তারে দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে চলছে, বিপুল উৎসাহে। দেওয়ালগুলির মালিকরা ধরেই নিয়েছেন যে, দেওয়াল তাঁদের হলেও দেওয়ালে লেখার অধিকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের। কু বেরাঘরের বাহ্যে বাহ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে ভোটারদের উদ্দেশ্যে, যদিও ভোটাররা এ লেখার দিকে কন্যাচিত্র দৃষ্টিপাত করছে। কংগ্রেস (ই) ও সি, পি, আই, এম দেওয়াল লেখার এমন প্রতিদ্বন্দ্বীতা শুরু করে দিয়েছে যে, বলা শব্দকে বেশী প্রগতিশীল। কে যে বেশী দল এ বিষয়ে, তাও বলা সত্যই কঠিন। বহু এলাকায় দেখা যায়, কংগ্রেস (ই) দলই প্রবল, আবার কোথাও কোথাও বা সি, পি, এম দলই প্রবল। এই দুই দলের মধ্যে কে যে এবারে অধিক ভোটে নির্বাচিত হতে পারবে, তা বলা বেশ দুঃস্বপ্ন, কারণ দু-দলই বেশ শক্তিশালী পশ্চিমবঙ্গে। জনতা, লোকদল, আমবা বাঙ্গালী ও অগ্নাস্ত্র বহু ছোটখাট দলও এই নির্বাচনে নেমেছে; কিন্তু কংগ্রেস (ই) ও সি, পি, এম দলের তুলনায় এ সব দলের প্রচার নিতান্ত সীমিত ও এদের দু-দলের সঙ্গে কেউই পাছা দিতে পারছে না এখনও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বোঝেই নীমাহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে এখন।

সি, পি, এম ভোটারকে বোঝাতে চাইছে যে, বিজ্ঞতাচর্চাটির জন্য পূর্বতন ইন্দিরা সরকারই দায়ী, যদিও সি, পি, এম দল নিশ্চিৎ ভাবেই জানে যে, ওদের এ মিথ্যা ও উদ্বেগ প্রণোদিত প্রচার ভিত্তিহীন ও অবিশ্বাস্য। চাবিদিকি যে মসীময় অন্ধকার প্রত্যাহার বিরাজ করছে সে অন্ধকারের অপসারণ সি, পি, এম এর সাধ্যাতীত; কারণ এ দলের চালাবার সঠিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ সি, পি, এম দলে নেই—একথা বললেন এক প্রবীণ ভোটার সেদিন বাসের মধ্যে। যেন বোমা ফাটলেন এ বুদ্ধ জয়লোক। তাঁর আরো বক্তব্য শুনে বাসযাত্রীরা তাঁকে বাহবা দিতে লাগলো, কারণ তিনি বললেন “মশাইর গ্যাস টারবাইন এনে জ্যোতিবাবুকে কেবল কয়েক কোটি টাকা ব্যয়বশেই করলেন, অথচ বিজ্ঞতা ব্যবহার কোন উদ্ভিই কোরতে পারলেন না। অব্যোযাজ্য একেই বলে, কারণ ওরা বা চাইলো তাই শেলো তবুও কোন হুয়াহা করতে পারলো না কেন? বাসের অস্ত্রযাত্রী পাশ থেকে বলে বলেন: “মশাই! কেন্দ্রীয় সরকার যে ডিফেন্স দিচ্ছে না, কাছেই গ্যাস টারবাইন অচল, জ্যোতিবাবু আর কি কোরবেন?” বাসওড় সবলোক তখন হেসে ওঠে, আর একটি তরুণ তখন বলে: “চিকই তো গ্যাস টারবাইন কি ডিফেন্সে চলে? —কে এই কথা বলেছে? তরলোক জ্বলেন না যে, এ যন্ত্রের নাম তাহলে গ্যাস টারবাইন না হয়ে ডিফেন্স টারবাইন হতো। সি, পি, এম এর চামচারা মাথাগণ বুদ্ধিতেও দেখছি

কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর লোহারোপে খুসী থাকতে চেয়েছিলেন তিনি তখন আবার মূখ্য খোলেন কৈফিয়ৎ দেবার জন্য। তিনি বলেন: “কি করবো মশাই, নির্বাক্তানী বর্ত্তায় ওরা যে ঐ কথা বলে আমাদের বুঝিয়ে দিলে। আমরা গোলালোক ও সব নারপ্যাচ্ কি বুঝি মশাই?” এখন দেখছি ওরা মিথ্যা ও ভাঙতায় সবার উপরে। ঐদের কুণ্ডে কুণ্ডে গড় করি। বাসন্ত্য সবাই হাসে, আর সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে বহু কুটাকা করতে করতে সবাই বলে:

“এর চেয়ে ইন্দিরা চের ভাল ছিল। তাঁর আমলে, বিশেষ করে জরুরী অবস্থার সময়ে কোথাও একনিম্নের জন্তুও বা এক মিনিটের জন্তুও লোডশেডিং হয়নি। ইন্দিরা ছিল বড় লোকের ঘন আর গরীবের বন্ধু, হাট্ট ধনীরা এককাত্তা হয়ে থাকে সঠিয়ে দিলে। এবার সবভেটি ইন্দিরাকেই দেব কারণ বিহাত হীন পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরাই বিদ্যুৎ-কম্পাণ্ডের শায়েস্তা করে বিদ্যুৎ-বাবস্তা সঠিক পথে চালাতে পারবে, অজকেউ নয়।” মহিলা যাত্রীরা একবারে এ কথায় সায় দিয়ে বলেন: “সব মেয়েরাই ইন্দিরাকে ভোট দেবে কারণ অন্ধকারে হারিকেন জালিয়ে যে গৃহস্থের রাত্তা বাত্ম হবে সে উপাত্ত নেই। কেবরসিন পাগুয়া যায় না, মমবাতি টি ঘাট পয়সা, কি দিয়ে কোন আলোয়, বন্ধন কাঠ চলে তা আমরা হাড়ে হাড়ে জলে জলে বুঝি, তাই সি, পি, এম কে একটিও ভোট নয়। সব ভোটই ইন্দিরাকে দেবো ও লোককে বলবো যে সব ভোট ইন্দিরাকে দাও, বসি বাঁচতে চাও।” সাধারণ মানুষের কথা-বারতায় আজ একথা মুম্পট যে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে সি, পি, এম এমন ব্যর্থতার পথকাঠা দেখিয়েছে যে সাধারণ মানুষ যাত্রা কোন রাজনীতির ধার ধারে না, তারা কিছুতেই এবার সি, পি, এম কে ভোট দেবে না।

(১৫ পাতার পরেঃ অংশ)

সমর্থন করে ওরাওঁর এই পরিবর্তন বাঃ ও আপেক্ষিক ঠা-
বাংকে। খামী বিবেকানন্দ বলেন :—

“এম্বায় প্রভত বেলাইই তাঁহার চার মাতবকে
সংভাষ করিতে পারিহেন ও বিনা বিধার তাঁহার জীশনান
করিহেন, কাছপ, তিনি আনেন তাঁহার বৃত্তা নাই। ওপ্তে
বতকণ একটি মাত্র পোকাও জীবিত থাকিবে, ততকণ
তিনিও জীবিত থাকিহেন।”

বেলাতের মধ্যগান বা আপেক্ষিকতাধার বৃক্কু জান
প্রবৃত্ত। কিন্তু অভাবনী তথা ইন্দিরাদ্বারাও চাঞ্চল্য
অজাত প্রবৃত্ত। বেশকি পাঠকের মারা যান অজ,
সাতকণ মারা যান করে, অতএব মারা গিরে মারা
সংভার করতে তুল হর না তার। কিন্তু অভাবনী
প্রবৃত্তকণ বতকণি মারা যান করে, প্রবোব চাঞ্চা টেকে
ততকণ মারা যান করে। বতকণ যে প্রবৃত্তা আপেক্ষিক
এমপতি তারা বুঝ দিয়ে বৃত্তলেন দ্বন্দ্ব মঃ বৃত্তক পাঠ
না। অর্থাৎ পরিমার্গ কৃতি যে তার মূল্য হাস করে একটা
ভেনেও তাং বেহন বৃত্তক মধ্যম মৃত্যক হি ঘটিয়ে অর্থাৎ
মূল্য হাস করে। ১৯৭১ সনে যে চাঞ্চল্য টাকার শ্রেন লেন
দেবে বৃত্তমান মূগের তন রাজার টাকার বেহনানীও সত্য
ধনী সে—কথা কুলে গিরে অভাবনী চাঞ্চল্য টাকার
বেহনখাটিকে আগে বেহনন করত তার চেয়ে অনেক
বেশী সত্যান করে এখনকার বিন হাটকটিকে। প্রাঃজনের
অনিক প্রবৃত্তক অভাবনী যান গবে সামাজিক মধ্যম
বৃত্তির উপাত্ত। কলে প্রতিটি অভাবনী চার বলাসত্তব বেদী
অব উপাত্তন করত। অর্থাৎ বনের সবহাটা বলাঃভেন
পত্যকিক বনঃ পূর্বা তংগা সবাই অজ মঃতে প্রভত
লম্বার হালিক। তথাপি অভাবনী প্রমক নেতা
তাংক বলাচেন সবহাটা, আর তাংক বেহনগিরি অজ
আখোলন করছেন মিঃকঃ সন্ধ্য বাড়ানার উদ্দেশ্য।
যদি তাঁদের বন বেলাচলন মঃগা আলোচিত হতো তাঁরা
কাঁচা কলে কিছুতেই বৃত্তলেন না চাঞ্চল্য পত্যতে।

বাবু জগজীবন রায় বে, সি. পি. এম কে ভোট দেওয়া মানে ভোট নষ্ট করা বলে গেছেন কোলকাতায়, তা সত্যই প্রাণধান যোগ্য। বাবুজীর যুক্তি যে অকুটা, সে বিষয়ে সবাই একমত কারণ সর্বভারতীয় স্বাধীনতাতে সি. পি. এম বায়ে বায়ে বিশ্বাসবাতকতার ও স্বার্থপরতার যে বেলা দেখিয়েছে; তাতে করে বাবুজীর বক্তব্য সঠিক। সি. পি. এমকে জনতা দলই কবরের হিম শাতল প্রকৃষ্ট থেকে তুলে আনে ১৯৭৭ সালে, অচ্চ সেই জনতার সঙ্গে প্রয়োজনের সময়ে চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করে সি. পি. এম। ফলে জনতার পতন অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়ে, আর বক্তার সময়ে দেওয়া বেশী অর্থের হিসাব সি. পি. এম কে দেবার জন্য তাই চরম সিং আর বিরক্ত করে না। সি. পি. এম বিশ্বাসবাতক চরণের, চরণাশ্রিত হলে মোরারজী দরকারের পতন ঘটায়, হিসাব দেবার শাখি থেকে মুক্তি পাবার আশায়। কেন্দ্রে যেই এখন সরকার গঠন করুক না কেন, সেই বণ্যার টাকার হিসাব না পালে, সি. পি. এম এর গঙ্গা বাত্যা করবে।

সি. পি. এম এবারে মহা কাঁপরে পড়ে সি. পি. আইকে দোষার করেছে সুকৌশলে; কিন্তু এ. আই. টি, ইউ, সিং প্রধান ও সি. পি. আই লের এমনও চেয়ারম্যান প্রখ্যাত প্রতিভাবান পমিউনিষ্ট প্রেঙ্ক এস. এ. ডাঙ্কে (ঈশ্বর অদৃত হস্তে) দুই কঠে ঈমতী খাতীর প্রমিউনীল পিতির ও রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতার ভূমী প্রশংসা দেবে যে বাণী দিয়েছেন; সে বক্তব্য সি. পি. এম-র ও তাঁর দলের কিছু কর্মীর ও কিছু তথাকথিত নজার বিরুদ্ধে প্রকাশ সমালোচনা এবং তিনি দ্বিবার নীতির ও কার্যের একনিষ্ঠ সমর্থক দেশের হস্তব স্বার্থের চিন্তার, বিশেষ করে অমিক কৃষক

প্রকাশে বিরতি দিয়ে দেশবাসীকে অবহিত করেছেন। এর বাস্তব মূল্য অনেকখানি। ডাঙ্কে-পন্থী বিশেষ করে ভাল ভাল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মী ব্যাড়া সি. পি. আই দলে আকো আছে, তারা প্রায় অনেকেই সক্রিয়ভাবে ইন্দিরাকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করার জন্য মধ্যবর্তী নির্বাচনে জনগণকে এগিয়ে এসে ইন্দিরাকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করার কাজে সানিল হয়েছেন দেখা যায়। কাজেই সি. পি. এম এবারে নির্বাচনে কোনটাসা হয়ে পড়ছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন থাকার একদিকে যেমন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাহায্য ও সমর্থন পাবার তার অশেষ সুবিধা হয়েছে, তেমনি স্বাধা শাসনকার্যে সীমাহীন ব্যর্থতার জন্য সি. পি. এম তার অনেক সমর্থককে দিনের পর দিন হারাতে বাধ্য হচ্ছে। নিট ফল, সি. পি. এম এবারে ক্রমশঃ ক্ষীণবল, হেতাভ্রম ও নিরাশ হয়ে পড়ছে। নির্বাচন সঠিক, নিরপেক্ষ, মুঠু ও গণতন্ত্র সম্মত করতে সি. পি. এম ভয় পাচ্ছে, দলগত দুর্বলতার জন্য ও আত্মতত্ত্বীতার জন্য। ধোঁকাবাজী, মিথ্যার বসতি, ভোটের তালিকায় তারমাজি ও সর্বোপরি প্রশাসনিক চরম ব্যর্থতা সি. পি. এমকে তার আশাভুরূপ ভোট পেতে দেবে না এবারে, আর দলনেতারা সে কথা ভালভাবে জানেন বেশেই, তাই আগ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে তাঁদের পূর্ব গৌরব অক্ষর থাকে। কিন্তু হস্তের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাব যে, সি. পি. এম এবারে একদিকে যার বাবে জনতাসলের কাছে, অস্তদিকে যার বাবে কংগ্রেস-ই) দলের কাছে। পশ্চিমবঙ্গে এবারে কংগ্রেস-ই) সবদলের চেয়ে বেশী ভোট পাবে, তারপরেই জনতাসল ভোট পাবে আর সি. পি. এম

হুই ও গণতন্ত্র সম্বন্ধ উপায়ে প্রকৃত ভোটাররা ভোট দেবার সুযোগ পায়। কিন্তু ভোটার তালিকা দেখলেই জানা যাবে যে, বহু অপ্রাপ্ত বয়স্ক নতুন ভোটারের নাম তালিকায় উল্লিখিত। অথচ ১৯৫২ সাল থেকে যারা ভোটার ও এখনও জীবিত তারা ভোট দেবার অধিকার থেকে এখানে বঞ্চিত। এর ফলে যে শক্তি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে, তারা সি, পি, এমকে ভোয়াজ করেছে কারণ এ ছাড়া তাদের গুস্তার ছিল না। বহু সরকারী মর্যাদাসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও দেশনেতা এই ভোটার তালিকাকে নীতিহীন, গণতন্ত্র বিরোধী ও যেকোনো চরম দৃষ্টিতে বর্ণিত করতে পিছ পড়েছেন নি, ওয়েভে ভোটার তালিকা ভুলে ভরা ও গণতন্ত্র বিরোধী একটি দলিল যা আদালতের অধীনে থাকলেই সত্য প্রকাশ পাবে দিনের আলোর মত। এত বকম কারসাজি ও ছলনার আশ্রয় নিয়েও কিন্তু শাসকদল এই নির্বাচনে বিপুল ভোটে পরাজিত হতে বাধ্য হবে; যেহেতু সাধারণ মানুষ যারা প্রকৃত ভোটার হয়েও ভোটের অধিকার এখানে পেল না, তারা ছেড়ে কথা কইবে না। তারা দলবদ্ধভাবে কংগ্রেস-ই বা জনতান্ত্রিকের পক্ষপৃষ্ঠে আশ্রয় নিয়ে সি, পি, এম-এর তৈরী জাল ভোটের মোকাবেলা করবে, নিজেদের স্বার্থরক্ষার ভাগিদার সি, পি, এমকে তারা পরাস্ত করবেই করবে। কিন্তু ও বঞ্চিত মানুষের দল এখানে আর সি, পি, এমকে

বোকাই দেবে না। এদের সঙ্গে আবার রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন মানুষেরা যোগ দেবে সি, পি, এমকে উচিত শিক্ষা দেবার মানসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যে, সব কর্মীরা ভোটের সময়ে কাজ করে তারা সংখ্যায় সমগ্র ভোটার সংখ্যার ত্রিশ শতাংশ মাত্র। বাকী সত্তর শতাংশ ভোটার কোন দলেরই কমিটিতে ভোটার নয়। তারা যেসকলে বেশী মাত্রায় সমর্থন দেবে সেইদিকই জয়ী হবে। এগারের নির্বাচনে প্রকৃত গড়ই হবে জনতা বনাম কংগ্রেস-ই। জনতান্ত্রিক বিপুল জন সমর্থন পেয়েও ঘব্বী পুরা সময় অর্থাৎ পাঁচ বছর শাসন ক্ষমতায় থাকতে পারবে হয় নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত তখন ভোটারগণ এবার পুনরায় ইন্দিরাকে সমর্থন করে স্থায়ী ও স্থিতিশীল সরকার কেন্দ্রে গড়ে তুলতে চাইবে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, যারা গত আড়াই বছর সি, পি, এম-এর শাসনে ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয়েছেন ও চাল, তেল, চিনির ও অন্যান্য আদায়-পাতির অত্যধিক উচ্চ মূল্যের দাপটে আধপেটা বেয়ে কার্যক্ৰেণে বাঁচতে চেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছেন। অনেকের মনে একটা মারাত্মক ধারণা বাস। যেখানে যে, সি, পি, এম যেহেতু সরকার চালাচ্ছে সেইহেতু তারা ভোটে জয়ী হবার জন্য সব বকম অস্ত্রায় সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে সংবিধান বহির্ভূত পথে।



ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ স্বাধীনতা দিবস ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গোহাটতে এ কেবল জীবন সম্পর্কে সীমিত-চক্র পাকড়ানী লিখেছেন। ‘পুলিশের আক্রমণ আশঙ্কায় প্রতি রাত্রিতে আমরা পাল্লা করে পাহারা দিতাম। কাঠের বাড়ীর দেতলায় বাসা। সেদিন রাত্রিতে আমার পাহারা দেবার পাল্লা। পাঁচ ঘণ্টা ঘুম বন্ধ নিতাম। আমি কখন ঘুড়ি দিয়ে বসে মশার পিছুলাট হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। খুব শীত। ঘটাখানেক ঘুবি হয়ে বসে আছি। কত কথা মনে আসে। মনটি ভাবাক্রান্ত। জেল থেকে এসে আজ প্রায় পাঁচ বছর অধি এই ছরজাড়া জীবন। থাকার কোন ঠিকানা নেই—কাপড়-জামাও নিজের বলে কিছু নেই, বিজ্ঞান নেই, কত জায়গায় ঘুরলেন, কত নাম পরিবর্তন করলেন, শিক্ষক, গৃহ-শিক্ষক, কম্পাউণ্ডার, দোকানদার, ব্যবসায়ী, নৌকার মুসলমান মাঝি ইত্যাদি কত না বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে চলেছি—সুখ একটা যাত্রা উদ্দেশ্য স্বাধীনতা। ভারী ভাল লাগে এ জীবন। আনন্দময়ের সম্মানদলের মত বিদ্রোহীর দল, বাড়ীঘর, ছা-পুত্র, স্বজনবর্গ সব ছেড়ে আসা অপূর্ণ এ জীবন। কাজ...কেন্দ্র কাজ। রোষ কুটি মাথার উপর দিয়ে বাব—শীত ঐষি মেহের উপর দিয়ে বাব। দিনগুলি কুটিতেই কাটে। জীবনে অবসাদ নেই, ভয় নেই মরণেও।’

সতীশচন্দ্র এবং নিকুঞ্জ পাল সেদিন নৌকা কিনতে ধুবড়ী গিয়েছিলেন এ বাড়ী থেকে, নৌকা কেনা চরমি। রোষ ওসকল যাত্রা। মিসিনী-

বাবু সঙ্গে পরামর্শ করে কি নামের মধ্যে কি ধরনের নৌকা কিনবেন, তারপরে নৌকা কিনতে হবে। তাই কিংবদন্তী জানালায় বসে সতীশবাবু পাহারা দিচ্ছেন। ইত্যাং দেখলেন, একটি লোক জটগতিতে অন্ধকার পথ দিয়ে চলে গেল যাবার সময়ে টর্চের আলো ফেলে গেল এ জানালায় সতীশবাবুর গায়ে। সতীশবাবু সজ্ঞ হয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন, পিছুলাট হাতের মধ্যে চেপে ধরলেন। কিন্তু তার পরেই আর একজন লোক, তার পিছনে আগে একজন। ভীষণ শীতের মধ্যেও বস্ত্র গরম হয়ে উঠল সতীশবাবু, নিম্পলক নেড়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। পিছুলাট উঠিয়ে ধরলেন একবার। তারপরে উঠে গিয়েই নিশ্চিত এক বন্ধুর কপালে হাত দিলেন, তিনি জেগে উঠলেন। তিনি মাথার তলা থেকে বিভ্রমবারতা টেনে নিয়ে বহু মুগ্ধিতে বরলেন। সতীশবাবু তাঁকে আস্তে আস্তে বললেন, ‘পর পর তিনটে লোক চলে গেল সন্দেহ জনকভাবে। আপনাকে সতর্ক থাকুন। কি জানি কি হয়।’ বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, ‘বন্ধু যেখেনি তো?’ সতীশবাবু হেসে জবাব দিলেন ‘হ্যাঁ এ ঘর বটে; তবে জেগে, চোখ মেলে।’ দাক্ষণ শীতের মধ্যে আরাম ছেড়ে সবাই উঠে দাঁড়ালেন যে যার বাড়িয়ার নিবে। ঘড়িতে তখন তিনটে বাজে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হবে। তবে কুয়াসার অন্ধকারে চারদিক ঢাকা। ইত্যাং ঘুরে বন্ধুকের শব্দ শোনা গেল, মুগ্ধও বন্ধুকের শব্দ, বিপ্লবীরা বুঝলেন, তাদের অস্ত্র কোন বাড়ী আক্রান্ত হয়েছে।

নির্বাচনকে মার্কসবাদীরা

ক্ষমতা দখলের লড়াই হিসাবে নিয়েছেন

॥ : বিশেষ প্রতিনিধি ॥

পশ্চিম বাংলার মার্কসবাদী নমুনিষ্ট পার্টি এমন পুরোপুরি একটি নির্বাচনী দল। নির্বাচনকে তারা ক্ষমতা দখলের লড়াই হিসেবে নিয়েছেন। এ লড়াই ওঁরা পরিচালনা করছেন মার্কস এর সেই যাবী 'এনড বাটিকাইজ বিকস' অত্মদর্শন করে। প্রেমে এবং রপে ক্ষমতা নীতি বলে কিছু নেই। উদ্বেগ সাধনই বড় কথা। নির্বাচনী লড়াই-এ এই হল ওদের মূল মন্ত্র।

এ লড়াই এর প্রকৃতি শুধু হয় ক্ষমতা হাতে আসার পর থেকেই। এ লড়াই ওদের 'সবচেয়ে বড় কাহিনী হল কো-অর্ডিনেশন কথিটি। এই কথিতিকে ভোটার তালিকা প্রকৃতির সকল স্তরের কাছে কমরেডদের নিয়োগ করার হৃদয় মেতরা হয়। এই হৃদয় অক্ষর অক্ষরে পালিত হয়েছে।

৪২টি কেন্দ্রে ৪৩ লাখ নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর বেশির ভাগই তুয়া। কিন্তু কেউ যাতে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে, তার জন্য বাংলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে তুয়া ভোটাররা তুয়া রেশনকার্ড নিয়ে যাবেন। হাজার চাক্ষুষক কর্মী নিয়োগ করা হবে এই তুয়া ভোটারদের হয়ে ভোটারদের জন্য। আদলে যে কাণী দেওয়া হয় তা তুলবার পাকা ব্যবস্থা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন হওয়ার সামনে অফিস বাংলা নিষিদ্ধ করার জোড়িবাবু প্রমোদবাবু চট্টোপাধ্যায় তো। তুয়া ভোটার দিয়ে বুঝ দখল করতে হলে বাংলার কাছে অফিস চাই। সংস্কার মানব মার্কসবাদীদের সমর্থক নয়। অতএব অফিস করা মুখিল হবে এমন হুজুতো জোর করেই, কিংবা বেশি টাকা দিয়ে অফিস খুলবেন। এই অফিসগুলো আগলে তুয়া ভোট দেবার অফিস হবে।

নির্বাচন ঘোষিত হবার আগেই বিধান সভার জোড়িবাবু যে ঘোষণা করেছিলেন, সকল বিরোধী দল এক হলেও তারা ৪২টি আসনই পাবেন। তার পিছনে এমন একটি সত্য ছিল

যা দলের পক্ষে কখনও প্রকাশ করা হবে না। প্রতিটি কেন্দ্রে যদি এক লাখের মত ফালিতু ভোটারের নামে ভোট পড়ে, তাহলে এদের হারাবেন কে?

তুখু যে ভূয়া ভোটারই করা হয়েছে তাই নয়। বিবোধী সকল দলেরই নিশ্চিত ভোটারদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। এদের সংখ্যা লাখ দশেক হবে। পরে চেষ্টা করে লাখ দুই ভোটার হয়েছে।

ভোটার তালিকা এদের কাছে অনেক আগেই এসে যায়। ফলে ষ্ট্রাটজি শেষ হয়েছে অনেক আগেই। অস্ত্র দল যাতে ভূয়া ভোট না দিতে পারে তার জন্য নানাভাবে আয়োজন করা হয়েছে।

এ লড়াইয়ে অস্ত্র দল জিতবেন কি করে। তারা আগে ভোটার তালিকার দিকে স্তোভান নি। দলের অনেকেই ভোটার হতে পারেন নি। ভূয়া ভোট দেবার কৌশলীত্বও আয়ত্ত করতে পারেন নি।

জিততে পারেন দুটো পথে এক, মার্কসবাদীদের সকল উল্লেখ আয়োজন সবেও শতকরা আশী শতাংশ মানুষ যদি তাদের বিরুদ্ধে যায়। দ্বিতীয় পথটি সম্ভব নয়, কারণ সরকার এদের-হাতে। সি আর পি ও যদি আসে এদের নির্দেশেই চলবে।

বিবোধী পক্ষের এখন একমাত্র কাজ মামলার জন্য কেন্দ্র প্রেরণ করা। ভূয়া ভোটার বাদ না গেলে, একজনের একাধিক ভোট দেওয়া বন্ধন না হলে এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলকে হারানো সহজ হবে না।

[সৌজন্য সৈনিক জননী]

ভোট দান

আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার

নির্ভায় ভোট দিন

(Contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs	Date
S n Gupta Smt. Bibhabati w/o Late Nalini Ranjan Sengupta	Maheshtola	100	16 4 79
Dist—HOOGLY			
Banerjee Smt. Mrinalini w/o Late Akinchan Banerjee	Vill Sripur P.O. Kamarpukur	100	2 6 79
Chatterjee Kumari Ranu & Ira d/o Late Durgapada Chatterjee	215, Pearabagan Rd. P.O. Hooghly	150	25 11 77
		(Renu 100/- & Ira 50/)	
Sarkar Badal Kumar	Vill Bagajal, P O. Arambag	200	1 4 77
„ Smt Jasoda Bala	P. O & Vill Bhalia	100	2 7 79
w/o Late Ratan Sarkar	P. S. Arambag		
„ Mrityunjoy	Jalapara, Barsat	200	1 10 76
Dist—NADIA			
Chakraborty Harendra Kumar	Sribash Angangbat (North) P O Nabadwip	200	22 10 74
Majumdar Probhat Kumar	Chutarfar P.O. Krishnanagar	00	1 4 77
Dist—BURDWAN			
Dutta Smt. Biva Nani w/o Late Harendranath Dutta	Senkar Pukur Colony P. O. Burdwan	200	15 8 72
Dist—DARJEELING			
Chatterjee Dr. Khagendra Nath	Asrampara P. O. Siliguri	200	1 2 74
Dist—MIDNAPUR			
Das Jitendra Nath	Vill Jaramnagar P. O. Memria	200	29 3 76
Giri Smt. Rajeshwari w/o Late Lakshmi Giri	Sribachhipur P.O. Khalsabhanes	100	1 10 76
Hawinder Jiten	Vill Raghunathpur P.O. Jhargram	200	2 5 74
Maity Smt. Hiranmoyee w/o Late Bhupendranath Maity	Vill Lohabari, P.O. Baksibari	150	25 11 73
Mondal Charu Chandra	Antofa'a, P. O. Golachak	200	28 2 74
„ Hrishikesh	Vill Anarpur P. O. Kukrahati	200	20 10 73
Nayak Srikanta	Dalalpur P O Khalsabhanes	200	20 2 74
Pal Smt. Rajabala w/o Late Panchanan Pal	Vill Mandargachi, P.O. Keshabpur	100	15 8 7

মূল্য :—পত্রিক ১৫.০০ টাকা

সাপ্তাহিক :—৮.০০ টাকা

ক্লা—৩০ পত্রিকা

বিপ্লবী পুস্তকমালা

cf/31

অহুশীলন সমিতির জীবন গ্রন্থাগার—ব্রহ্মপুত্র নদে—০০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুখোদ মনুসংগ্রহ—০০০

কীর্ত্তন কুমার দত্ত—

- | | |
|------------------------------------|--|
| ১। বাংলায় অহুশীলন—১৫০ | ২। বহির্ভাষিত ভারতীয় বিপ্লবী গ্রন্থ—৫০০ |
| ৩। অহুশীলন সমিতির পি. মি. মি. —২০০ | ৪। দৌলতী সংগ্রাম কাহিনী—১০০ |
| ৫। কাকোয়ী শহীদ—১২৫ | ৬। কলকাতা বাঙালি সংগ্রাম কাহিনী—৪০ |
| ৭। রাসবিহারী ও অহুশীলন সমিতি—১০ | ৮। খাদ্যনির্ভর শহীদ মা ও মেয়ে—৪০ |
| ৯। বিপ্লবী ও সমাজবাদ—১০০ | ১০। বিপ্লবী বিপ্লববাদ—৪০ |
| ১১। মহাত্মা ও ব্রহ্মপুত্র—৪০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ত্রিনিদাদি বিপ্লব—১৫ |
| ১৩। দেশ বাঙালি জাতি (১)—১০০ | ১৪। দেশ বাঙালি জাতি (২)—২০০ |
| ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর বসু—৪০ | ১৬। ১৯৫৫ এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১০০ |
| ১৭। হাতিয়া হত্যা প্রচেষ্টা—১৫ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অহুশীলন সমিতি—৫০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৪০ | ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১৫০ |

প্রতিদান :—১নং বঙ্গবাস ট্রাষ্ট কমিটি—১০০০০

টেলিগ্রাফ—১১/১/৭৮ বঙ্গবাস ট্রাষ্ট কমিটি—১০০০০



— সম্পাদক দল —

শ্রীমতী জাহাঙ্গীর (সভাপতি) শ্রীমতী নন্দী, শ্রীমতী জাহাঙ্গীর

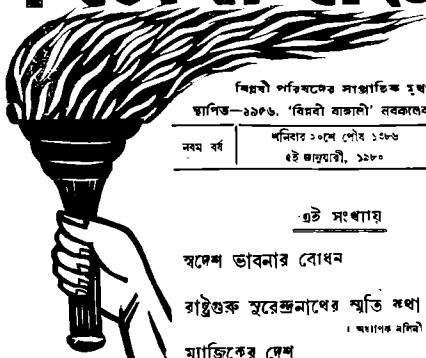
সম্পাদক—শ্রীমতী শরণ চন্দ্রদেবী

দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীমতী বোম্বা : বেঙ্গাল—শ্রীমতী সোমেন্দ্র পাল

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীমতী সেনগুপ্ত : প্রচার সচিব—শ্রীমতী সোমেন্দ্র

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—১নং বঙ্গবাস ট্রাষ্ট, কমিটি—১০০০০

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক পত্রিকা

স্থাপিত—১৯৭৬. 'বিপ্লবী বাংলা' সর্বস্বত্বস্বাধীন—১৯৭৯

নবম বর্ষ	শনিবার ১০শে পৌষ ১৩৮৬ ৫ই জানুয়ারী, ১৯৮০	১৫ সংখ্যা
----------	--	-----------

৭ষ্ঠ সংখ্যা



স্বদেশ ভাবনার বোধন

রাষ্ট্রপুরু যুরেক্তনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মিলি মোহন রায়চন্দ্র ।

ম্যাজিকের দেশ

। বিপ্লবী কৃষ্ণ সেন ।

জাগ্রত জনগণ মুখোমুখি এবার খসাবেই

। বিপ্লবী বঙ্গবন্ধুসংগঠন ।

বিকল্প

। মাতাঙ্গণ কুমার ।

West Bengal List of Candidates

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। কীর্ত্তি রত্ন ।

মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর স্মৃতিরক্ষা কমিটি

‘দেশ মুক্ত নহ, সে চিরমৃত’

মামুষ যদি প্রকাশমান হয়,

তবেই দেশ প্রকাশিত’

—ববীন্দ্রনাথ

যুগান্তর বিপ্লবী সন্মিলনী

পঞ্চদশ প্রতি সন্মেলন, ১৩৮৬ (ইং ১৯৭৯)

সবিনয় নিবেদন

আগামী ২৮শে পৌষ ১৩৮৬ (১৩ই জানুয়ারী ৮০') রবিবার গঙ্গা সেবা সমিতি প্রাঙ্গণে এবার প্রতি সন্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ৮টায় শুরু এবং বিকেল ৪টায় সমাপ্তি।

সকাল ২টায় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেনীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। অমুঠানে আপনার উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি।

প্রমোদ রায়

সদস্য ভট্টাচার্য,

যুগ-সম্পাদক

৩১শে, ডিসেম্বর ১৯৭৯

ভূভেক্ষাণে :—

মনোহর মুখোপাধ্যায়

দুর্গাবাস হালদার

মায়া ঘোষ

সতীর্ঘ সংহতি

৩২, দিল্লী স্ট্রাট, কলিকাতা-১৭

প্রিয় সতীর্ঘ, আগামী ২০শে জানুয়ারী ১৯৮০ সতীর্ঘ সংহতির পঞ্চবিংশতি বার্ষিক সন্মেলন প্রতিবারের মত এবারও গোবিন্দপুরে ব্রিস্টোলে চক্রবর্তী মহাশয়ের বাগান বাড়ীতে (বর্তমানে শালিক অস্ত্রা) অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসবে আপনার সম্প্রদায় উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি। কোন 'সতীর্ঘ কোন কারণে এই নিমন্ত্রণ পত্র না পাইয়া থাকিলে 'সতীর্ঘ সংহতির পক্ষ হইতে আপনি তাহাকে এই অমুঠানে ঘোষণার আর্থিক জানাইবেন।

অভিনন্দনসহ—

সময় : সকাল ৭টা থেকে অপরাহ্ন ৪টা পর্যন্ত।

স্ববোধ রায়

সাধারণ সম্পাদক

॥ স্বদেশ ভাবনার বোধন ॥

দীর্ঘ ঐতীকার অবশান ঘটিলে, আর ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরে, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সপ্তম সাধারণ নির্বাচন হতে চলছে। বিশাল ভারতবর্ষের ৩৬ কোটি ২০ লক্ষ ভোটার দেশের প্রতিটি রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট ৫৪২ জন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবেন, যাদের সংহত প্রচেষ্টায় অনাগত দিনগুলিতে দেশ এদিকে যাবে নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে। এই ব্যালট-বুকে কোন্ বল বা গোষ্ঠী জয়লাভ করবে তার চেয়ে বড়ো কথা, দেশের বৃহত্তম স্বার্থকে সামনে রেখে, জনসাধারণের অসংখ্য সমস্যার মোকাবিলায়, কোন্ জাতীয়তাবাদী শক্তি জনগণের সার্বিক কল্যাণের দায়িত্ব নিতে পারবে।

জীবন ও জীবিকার জগ্রে মানুষের বে সংগ্রাম, রক্ত, আর চোখের জলের সৈন্যনি-নতায় বাস্তবকে জানায় যে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, তা-ই ভারতবর্ষের দ্বিতীয় জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক চেতনায় ও দেশাত্মবোধে দীক্ষা দিয়েছে। অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতবাসী তাই স্বদেশ ভাবনায় অঙ্গপ্রাণিত। বৈদেশিক বিপ্লববাদ অথবা বিশ্বজনীনতার মোহময় আবেদনে সাময়িকভাবে উদ্দীপিত হলেও দেশের ঐতিহ্যপূর্ণ সংগ্রামী ধারা থেকে সহজে তাদের বিচ্যুত করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের জগ্রে যে অমল স্বদেশ ভাবনা একদিন বিশাল ও অথও ভারতবর্ষের জনজীবকে সংগ্রামের লগ্নে দীক্ষা দিয়েছিল—বংশপরম্পরায় তার ওপর নব নব বিপ্লবচিন্তার প্রলেপ পড়লেও মূল শিকড় কিন্তু আজও রয়ে গেছে চেতনার অনেক গভীরে। তাই দেশের কল্যাণকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের মানুষ আজও অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারেন—ভারতবর্ষের স্বদেশী ভাবনার ঐজ্জ্বল্যকে নতুনরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হোক সেই স্বদেশীভাবনারই সার্থক বোধান।

জয় হিন্দ, স্বদেশাভিমান

২৪ জানুয়ারী, ১৯৮০।

বিকল্প

॥ নারায়ণ কুমার ॥

বনামান এক দুর্ধোগপূর্ণ রাজনৈতিক পারি-
পালিকতার মধ্যে নেতৃবহীন, উদ্বেগবহীন, লক্ষ্যহীন
ভারত, আগাইয়া চলিরাছে গভীর হইতে এক
গভীরতম সঙ্কটের দিকে। জনমনে আজ প্রশ্ন
আসিয়াছে, খণ্ডিত ভারত তাহার বর্তমান অঙ্গটুক
অথবা অটুট রাখিতে পারিবেতা? না, খণ্ডিত
ভারত আবার ষণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া তাহার বর্তমান
অঙ্গটুকও হারাওয়া ফেলিবে? কোন দিকেই এমন
কোন আশার আলো দেখা বাইতেছিলনা,—তখন.
হঠাৎ বনমেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ কলকেরই মত, দেশের
রাজনৈতিক আকাশে একটি নূতন আগুয়াজ, আশার
আলো হইয়া আমাদের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে
'বিকল্প'। দলমত নির্বিশেষে অধিকাংশ রাজনৈতিক
দলই একটি বিকল্প শক্তির কথা বলিতেছে। মনে হয়
বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলিও তাহাদের নেতারা
গত বর্ষ বহুরের তাহাদের চলারপথের ভুলে ভরা
দিনগুলি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া এতদিনে
তাহাদের সখি করিয়া পাইয়াছেন। তাই আজ
তাহারা দলমত নির্বিশেষে একই সুরে আগুয়াজ
তুলিয়াছেন 'বিকল্প চাই'। বর্তমানের উপর আস্থা
হারাইলেই বিকল্পের প্রশ্ন আসে।

রাজনৈতিক দলগুলির 'বিকল্প' দাবীর একটিই
মাত্র অর্থ হইতে পারে যে এই দলগুলি এতদিনকার
তাহাদের নিজ নিজ দলের 'মত ও পথ' সম্বন্ধে আস্থা
হারাওয়া ফেলিয়াছে তাই তাহারা একটি বিকল্প শক্তি
অর্থাৎ একটি নূতন মত, পথ ও দলের প্রয়োজনীয়তা
বোধ করিতেছে। একজন চিকিৎসক তাহার রোগীর
উপর তখনই কোন বিকল্প ঔষধ প্রয়োগের কথা চিন্তা

করিয়া থাকেন। যখন তিনি স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছান
যে তাহার পূর্বের ঔষধ ঔষধে রোগীর কোন উপকার
হইবেনা।

দেশের রাজনৈতিক আকাশটি আজ পরিষ্কার
ভাবে দুইটি ভাগে বিভক্ত। কতগুলি দল বিশ্বাস
করে, একমাত্র গান্ধীবাদের পথেই জন জীবনের সব
রকমের ভাবসমস্যাকুলির সমাধান সম্ভব। ইহারা
গান্ধীবাদী নামে পরিচিত। অপর কতগুলি দল মনে
করে, একমাত্র মার্কসবাদের পথেই সব সমস্যার
সমাধান হইতে পারে। ইহারা নিজেদের মার্কস-
বাদী বলিয়া দাবি করিয়া থাকে।

এই উভয় গোষ্ঠির প্রায় সব দলগুলিই যখন
বিকল্পের আগুয়াজ উঠাইয়াছে তখন ধরিয়াই লইতে
হইবে যে ইহারা 'মার্কসবাদ' ও 'গান্ধীবাদের' উপর
আস্থা হারাওয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ এই উভয়
গোষ্ঠির দলগুলি আজ এই স্থির সিদ্ধান্তে
পৌছাইয়াছে যে, গান্ধীবাদের পথে বা মার্কসবাদের
পথে আমাদের বর্তমান জাতীয় সমস্যাকুলির সমাধান
সম্ভব নয়। তাই আজ বিকল্পের প্রশ্নটি আসিয়াছে।
ইহারা যদি বলিত যে সব মার্কসবাদী দলের একা
চাই বা সব গান্ধীবাদীদের একা চাই, তাহা হইলে
একটা অর্থ হইত। কিন্তু তাহা তাহারা করে নাই।

একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিতে হইলে
তাহারা একটা স্পষ্ট লক্ষ্য, মত ও পথ থাকা চাই।
যদিও এই উভয় গোষ্ঠির (মার্কসবাদী ও গান্ধীবাদী)
প্রায় সব দলগুলিই বিকল্পের আগুয়াজ তুলিয়াছে,
কিন্তু গুণের বিবয় কোন গোষ্ঠির কোন দলই
আমাদের সামনে কোন বিকল্প 'মত ও পথ' এর

কথা উপস্থিত করে নাই—বা করিতে পারে নাই। কতকগুলি দলের বক্তব্য—কংগ্রেস ও কমিউনিষ্টদের বিকল্প চাই (ইহারা মোটামুটি সকলেই গান্ধীবাদী গোষ্ঠির)। কিন্তু কি তাহারা চায়, তাহাদের মত ও পথই বা কি তাহা তাহারা কমন ব্যাখ্যা করিয়া বলে না। আর অপর কতগুলি দলের বক্তব্য কংগ্রেস ও জনতার বিকল্প চাই (ইহারা প্রায় সকলেই মার্কসবাদী গোষ্ঠির)। ইহারা অবশ্য বলিয়া থাকে—

‘প্রগতিশীল, বাম ও গণতান্ত্রিক’ একা গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু ‘প্রগতিশীল, বাম ও গণ-তান্ত্রিক’ বলিতে তো কিছুই বুঝা যায়না। ইহাতো কতগুলি কথার মারপ্যাচ ছাড়া আর কিছুই নয়। ‘প্রগতিশীল, বাম ও গণতন্ত্র’ শব্দগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্মৃতিশিষ্ট কোন অর্থবাহক শব্দ নয়। আপেক্ষিক অর্থেই এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হইয়া থাকে— ইহার কোন বিশেষ মূল্য নাই। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থাতেই একটা বাম ও প্রগতিশীল অংশ থাকে।

এমনকি একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেও প্রগতিশীল বাম অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। আবার এই বাম অংশের মধ্যে নূতন বাম ও প্রগতিশীলদের অভ্যুত্থান ঘটয়া আবার দল বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহার পরিচয় সকলেই জানেন। আর ‘গণতন্ত্র’ সে যে কত ধরনের আছে তাহার সীমা টানা কঠিন। এক পশ্চিম বাংলাতেই দেখা যায়—‘জাতীয় গণতন্ত্র’ ‘জনগণতন্ত্র’, ‘ধনগণতন্ত্র’, ‘সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র’ ইহা ছাড়া ‘সর্বহারা গণতন্ত্র’ ও ‘নয়া গণতন্ত্র’ বিভাসী গোষ্ঠিও এখানে আছে। এ সবকিছু আলোচনা

বাড়াইয়া লাভ নেই। এক কথায় প্রগতিশীল, বাম ও গণতান্ত্রিকবাদকে বলা যায়—সাম্যবাদ। যাক এই উভয় গোষ্ঠির কোন গোষ্ঠির কোন দলই যখন আমাদের সামনে কোন বিকল্প মত ও পথ উপস্থিত করিতে পারে নাই, অথচ সকলেই বিকল্পের আহ্বান জানাইতেছে। তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে

ইহাদের কাহারও কোন বিকল্প মত ও পথের কথা জানা নাই। এই বিকল্পের দাবীটি হইল আমাদের কাছে তাহাদের অবচেতন মনের গভীরে এতদিনের চাপিয়া রাখা সত্যটির, সবল, সচেতন আত্মপ্রকাশ।

ইহাকেই আমরা বলিমাছি—‘আশার আলো’।

রাজনৈতিক দলগুলি ও তাহাদের নেতারা যখন এতটা আগাইয়াই অসিয়াছেন, তখন তাহাদের কাছে আমাদের আবেদন, সবল মানে দৃঢ় পদক্ষেপে আর একটু আগাইয়া আসুন, বিকল্প পথ আছে—যে পথ আমাদের জনগণকে তাহাদের অভিষ্ট একো পৌছাইয়া দিতে পারিবে। সেই পথটি হইল, বিশ্ববাসিত মহাবিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন দর্শন। সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সমন্বয়। ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণ-তন্ত্রের নাম ও সুবোধ লইয়া বিদেশী চক্রান্তকারীরা ও তাহাদের প্রমোদ বাদীন্দর, দেশ ও জাতির সর্বনাশের পথটি প্রশস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। একমাত্র জাতীয় একোষ মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের সত্যিকার বিকাশ ঘটিতে পারে।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনদর্শনের মূল কথা হইল ‘সমন্বয়বাদ’ সুভাষচন্দ্র বলেন, এক শতাব্দীর পুরান কমুনিজম আচকের জ্ঞান বিজ্ঞানের ধোপে টিকিছেন। ক্যাসিবিদ প্রজ্ঞাঘাত। প্রাচীনপন্থী গান্ধীবাদও দল নয়। মানব সভ্যতার জীবন দর্শন এগিয়ে চলেছে কয়াসী বিপ্লব থেকে চীন বিপ্লবে, নূতন সভ্যতার মর্যবানী নিয়ে। এগুনের শেষে গণ-বিপ্লব হবে ভারতে। সমন্বয়ের আদর্শ হবে এই গণবিপ্লবের দিগদর্শন।

স্বাধীন ভারতের দৃষ্টি হবে প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের কল্যাণকর শিকড়গুলির পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধন—এটাই হইল, ভারতীয় সাম্যবাদ।

আমরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পর এই সমন্বয়ে বিস্তারিত ভাষা আপনাদের সামনে উপস্থিত করিব।

West Bengal List of Candidates

The following is the West Bengal list of candidates in the mid-term Lok Sabha elections, 296 are contesting 42 seats.

Cooch Behar/sc. Amar Roy Pradhan/fb. Ambicacharan Roy/cong-i. Durgacharan Roy Kayet/ind. Dharma Narayan Barman/janata-s. Paresch chandra Barman/janata, and Surendra mohun Roy/ind.

Alipurduar / st. Gopal Oraon / ind. Tuna Oraon / cong-i. Denis Lakra / cong-u. Pijush Turkey / rsp.

Jalpaiguri : Arun kumar Moitra / cong-u. Choudhury Chachan Hari Kisan / ind. Joydeb Mondal/suci. Panchanan Mallik/ind. Bankim Roy / ind. Dr. Manmatba Nandy / ind. Rabin Sikdar / janata. Sriram Singh/cong-i. Subodh Sen/ cpi-m.

Darjeeling : Ananda Pathak/cpi-m. Abdel Karim Chowdhury/cong-u. K. B. Chettri/con-i Tapan Biswas/ind. Paul Ranjit Montosh/jan-s. Mohammed Ekramul Hoque/janata. Rencendra nath Barma (ind) Lakshmi Kanta Joshi (ind) Sampat Roy (ind)

Raiganj : Abdul Hafiz (cpi-m) Dr. Zainal Abedin (cong-u) Kamala kanta Singh (ind-amra bangali) Gopalji Kedia (ind) Dr. Golam Yazdani (cong-i) Mahammad Elias Razi (ind —workers' party) Mohit Sikdar (janata).

Balurghat (sc) : Khagendranath Roy(cong-u) Narayan Sarkar (ind—amra bangali) Palas Barman (rsp) Ranjit Sarkar (cong-i) Sudhir Roy—janata.

Malda : A. B. A. Ghani Khan Chowdhury (cong-i) Dinesh Joardar—cpi-m.

Jangiput : Amiya Sinha Roy—cong-u Krishnadas Chattopadhyay (janata) Zainal Abedin—cpi-m Parichay Dasgupta—ind. Lakshmi narayan Das (suci) Lutfar Haque—con-i.

Murshidabad : Abdus Sattar—cong-i. Abu Raiban Biswas (suci) Dr. Gopal Ghose (ind) Prince Scientist Bose (ind) Barin Ray—ind. Masudal Hossain Syed—cpi-m. A. K. M. Hassan Uzzaman—muslim league. Syed Kazim Ali Meerza—janata.

Berhampur : Azizur Rahman—cong-u. Jagadisa Singha—cong-i. Tridib Chowdhury —rsp.

Krishnanagar : Arun Biswas—ind. All India Christian Democratic Party. Arun Mondol ind.—amra bangali. Azizul Haque —suci. Kashi Kanta Maitra (janata). Renopada Das cpi-m. Sankardas Banerjee—cong-i.

Nabadwip (sc) : Amulya Biswas—janata-s. Ananda mohun Biswas—cong (i). Krishnendu Biswas—rpi. Nilkamal Sarkar—janata. Bibha Ghosh (Goswami)—cpi-m. Sushil Roy—cong-u.

Basarat ; Ananga mohun Ash—ind. Asoke Krishna Dutta—janata. Upendra nath Halder —ind. Chitta Bose—fb. Dr. Narendra Mallik —ind. Nurjahan Begum—ind. Saugat Roy—cong (u), Swapan Chakraborty (indi. Harasit Ghosh—cong (i).

Basirhat : Abdul Gaffar Quazi—cong (i). Alhaj M. A. Mannan—janata. Alhaj Md. Abdus Salam—muslim league. Indrajit Gupta —cpi. Paresch Kayal—ind. Mihir Halder—ind.

Joynagar (sc) : Gobinda Naskar—cong (i)
Rejaram Roymondal—suci. Sakti Sarkar
Janata—Sanat Mondal—rep.

Mathurapur (sc) : Bimalendu Naskar—
cong (i). Brindaban Gayen—janata. Makhan
Baidya—ind. Mukundaram Mondal—cpi(m).
Renupada Halder—suci.

Diamond Harbour : A. K. M. Ishaque
—cong (i). Prof. Karuna Nidhan Roy—ind.
Jamila Khatun—muslim league. Jyotirmoy
Bose—cpim. Paresah Pal—ind. Shaikh Abdul
Hakim—ind.

Jadavpur : Abdul Mannan Khan—janata s.
Prof. Karuna Nidhan Roy, ind. Ganesh
Mukherjee, ind. Nityanand Saha, ind. Sachin
Mitra, cong (i). Somnath Chatterjee—cpim.
Haripada Bharati, janata.

Barrackpur : Debi Ghosal—cong (i) Bijoy
Narayan Misra, (ind). Mahammad Ismail—
cpi (m) Rabi Sankar Pandey—janata (s).
Ramjit Ram—janata.

Dum Dum : Aniruddha Bera, ind. Prof.
Karuna Nidhan Roy, ind. Kalyan Brata Roy,
janata. Niren Ghosh, cpi(m). Barid Baran Das
—cong (i). Rampriti Gond—rpi. Salil Biswas
cong (u). Sahabir Shaw, ind. Swapan Dutta
—ind.

Calcutta North-West : Ashoke Kr. Sen,
—cong (i). Upen Halder, ind. Prof. Karuna
nidhan Roy, ind. Ganadeb Mullick, ind.
Durga Dutta Agarwal, (jan sangha) Pratap
Narayan Tiwari, ind. Bikram Singh Chanda-
lya, ind. Bijoy Singh Nahar, janata, Bisnu
Kant Thakur, ind. Milanchand Choraria, ind.
Mohanalal Soni, ind. Ranajit Mitra, janata (s)
Ramendra Singh, ind. S. C. Roy, ind. Shew

prasad Gupta (socialist) Shyam Sundar Gupta
—(fb).

Calcutta North-East : Ajit Kr. Panja—
cong (i). Prof. Karuna Nidhan Roy—ind.
Panchanan Mondal, ind. Dr. Pratap Chandra
Chandra—janata. Md. Nasim Ali Ajad, ind.
Mubarak Mazdoor, ind. Rameswar Agar-
wala, ind. Ritendra Ghosh, ind. (amra bengali)
Sudip Bandyopadhyaya, cong (u) Sunil Moitra
—cpi (m) Sk. Noyimudin—ind.

Calcutta South : Anil Banerjee—ind. Prof.
Karunanidhan Roy, ind. Prof. Dilip Chakra-
borty ind. Priya Ranjan Das Munssi, cong (u)
Bholanath Sen, cong (i). Rabi Chowdhury, ind
Shakya Sen, ind. Satyasadan Chakraborty—
cpi (m). Subir Basu Roy, suci. Subrata Cha-
tterjee, ind. Sunil Roy, ind.

Howrah : Asit Chakravarty, Bharater
Biplabi Communist Party. Prof. Karuna
Nidhan Roy, Ind. Jibandhan Mukhopadhy,
Ind. Durgaprasad Nathany, Janata. Dr
Dwijendra Lal Ghosh, Jana-S. Nityananda
Dey, Cong I. Sailendra Nath Ghosh, Ind—
Amra Bengali. Samar Mukherjee, Cpi m.
Surya Narain Singh Ind.

Uluberia : Ardeendu Hazra Cong I. Prof.
Kanailal Patra Ind. Nityananda Bhuniya,
Janata. Nirmal Sengupta, Ind. Dr. Ranjit
Ghosh Chowdhury, Cong U. Suphal Chandra
Sau, Ind. Hannan Mollah, Cpi m.

Serampore : Amar (Paltu) Sen, Cpi ml.
Gopal Das Nag. Cong I. Dinen Bhattachary,
Cpi M. Dwarka Prasad Thirani, Ind. Prof.
Bimal Kanti Ghosh, Cong U. Brajmandan
Prasad, Rspi Ml. Hrishikesh Pyne, Labour
Party of India.

Hooghly : Satya Charrn Ghosh, Rpi.
Prabhat Palit, Janata. Rupchand Pal, Cpi m.
Santimohon Roy, Cong I. Snehamoy Dutta,
Ind—Amar Bangali.

Arambagh : Arun Masji, Janata S. Dr
Panchanan Ghosh, Ind. Prafulla Chandra
Sen, Janata. Bijoy Krishna Modak, Cpi m.
Lutful Goyesh Khan, Ind.

Panskura : Abha Maity, Janata. Gita
Mukherjee, Cpi. Rejani Kanta Dolai, Cong I.
Dr Saswati Prasad Bag, Janata S.

Tamluk : Asutosh Samenta, Suci. Pra-
santa Kumar Gayen, Janata. Bhaktipada
Mandal, Ind. Satyagopal Misra, Cpi m.
Syamadas Bhattacharyya, Cong I. Sridhar
Chandra Dolui, Hindu Mahasabha. Sitangsu
Sekhar Das, Ind. Susbil Kumar Dhara, Jana-
ta S.

Contai : Atal Kumar Giri, Janata S.
Sudhir Kumar Giri, Cpi M. Pradip Sarkar,
Cong I. Prasanta Kumar Gaunia, Ind. Sasa-
dhar Maity, Ind. Samar Guha, Janata.

Midnapore : Gyan Sing Sohan Pal,
Cong U. Dulal Chandra Murmu, Jharkhand
Party. Narendra Das, Janata. Narayan Cho-
ubey, Cpi. Bhim Charan Tudu Ind. Bhusan
Mondol, Suci. Satya Ghosh, Ind—Amar
Bangali. Sudhir Kumar Ghosal, Cong I.

Jhargrui (St) : Tusbar Tudu, Cong I.
Dakshin Murmu, Janata. Bisnupada Saren,
Jharkhand Party. Mangal Baskey Ind—Amra
Bangali. Leba Tudu Ind—Cpi ML. Hasde
Matilal, Cpi M.

Purulia : Amulya Mahata Ind—Amra
Bangali. Gomosta Prasad Saren, Jharkhand
Party. Chitta Ranjan Mahata, FB. Nirmal-
endu Dey, Janata. Priya Ranjan Das Munsi,
Cong U. Sri Radharaman Ghosh, Ind. Ram
Pada Singha, Cong I. Sri Sarit Kumar
Chakrabarty, Ind—Hindu Mahasabha.

Bankura : Basudeb Acharia, Cpi m.
Asutosh Banerjee, Suci. Gunamoy Chattopa-
dhyay, Janata. A. C. Patra, Ind—Hindu
Mahasabha. Basudeb Dutta, Janata S. Bhag-
bat Mahata, Ind—Amra Bangali. Mahant
Swamy Rudranand Giri, Ind. Majhi Shyam-
nanda, Ind. Saktipada Mukherjee, Ind. Sing
Deo Sankor Narayan, Cong I.

Vishnupur (SC) : Ajit Kumar Saha,
Cpi M. Aswini Kumar Malik, Jharkhand
Party. Tulsi Das Mandal, Cong I. Madan
Mohan Mallick, Janata. Shila Saha, Janata S.
Durgapur (SC) : Krishna Chandra Halder,
Cpi M. Kumari Nihar Saha, Janata. Ban-
kim Chandra Santra, Ind. Bimal Krishna
Saha, Janata S. Suryya Kumar Roy, Cong I.

Asansol : Ananda Gopal Mukhopadhyay,
Cong I. Ghanty Manik, Ind—Amra Bangali.
Joy Shankar Chowdhury, Ind. Doman
Prasad Bhuiyan, RPI. Pradip Kumar Bhatta-
charyya, Cong U. Badal Bouri, Ind. Moha-
deb Mukherjee, Ind. Mohammad moslem
Khan Ind, Gopikaranjan Mitra, Janata.
Robin Sen, Cpi m.

Burdwan : Narayan Chowdhury, Cong I.
Renuka Mitra, Ind. Satyanarayan Roy,
Janata. Sahadev Dutta, Ind—Amra Bangali,
Sushil kumar Bhattacharyya, Cpi m. Hari
ballav Jha, Janata s.

Katwa : Dharendra Nath Basu, Cong I.
Lakshminarayan Rej, Cong U. Saifuddin
Chowdhury, Cpi m.

Bolpur : Kaitish chandra Chattopadhyay,
Ind. Gour Hari Chandra, Cong U. Dilip
Banerjee, Ind. Narayan chandra Mondal,
Ind. Nirmal Saha, Ind. Pranab kumar Mu-
kherjee, Cong I. Modeswar Hossain, Janata S.
Saradish Roy, Cpi M.

Birbhum (SC) : Kenai Saha, Janata.
Gadadhar Saha, Cpi M. Golok pati Mandal,
Janata S. Badal Chandra Bagdi, Cong I.
Baidya Nath Mal, SUCI. Ranjit Mal, Ind.

মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী স্মৃতি রক্ষা কমিটি

অনুশীলন ভবন

৩২/৮ চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০ কোন-৭২-৪১৪৫

আবেদন—

আনুষ্ঠানিক সংগ্রামী মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথের বিচিত্র কর্মময় জীবন তবিস্মৃতের কাছে ভাষ্য করে রাখার উদ্দেশ্যে স্মৃতিরক্ষা কমিটি প্রথম পর্বের প্রকল্প তৈরী করেছিল। কেওড়াভাঙ্গা মহানন্দনামে 'স্মারক স্থাপন, জনাকীর্ণ জনপথ ব্যাবোর্ধ রোডের নাম পরিবর্তন করে 'বিপ্লবী মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ সরসী নামে নামাঙ্কন, ত্রিবেণী সঙ্গমেও বৃষ্টিগঙ্গার পূণ্যসলিলে মহারাজের চিতাভস্ম বিসর্জন, বিপ্লব তাপস মহারাজ 'ত্রৈলোক্যনাথ' নামক তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী প্রকাশ, রোগশ্রেণী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চিকিৎসার্থে দশ শয্যা বিশিষ্ট ওয়ার্ড স্থাপন সম্পূর্ণ। প্রতি বৎসর 'মহারাজ স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশিত হচ্ছে।

এবার দ্বিতীয় পর্বে কলিকাতায় মহারাজের একটি স্মৃতিমূর্তি এবং তাঁর কর্মবহুল বিচিত্র সংগ্রামী জীবনের একটি 'ফিল্ম' তৈরী ও প্রদর্শন, কমিটি পরিকল্পনা করেছেন। হৃৎকণ্ঠে পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শ্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় কলিকাতা কর্পোরেশন, মহারাজ সরসী ও রাসবিহারী সরসীর (প্রাক্তন ক্যানিং স্ট্রীট) সঙ্গমস্থলের উত্তানবীপটি মহারাজ স্মারক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন এবং পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী মহারাজের আবক্ষ ব্রোঞ্জমূর্তি এই উত্তানে স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। জমি হস্তান্তর প্রায় সম্পূর্ণ, আবক্ষ ব্রোঞ্জমূর্তি তৈরীও সম্পূর্ণ।

এখন উত্তানটিকে পুনর্গঠন করে মূর্তি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায় দায়িত্ব কমিটির উপর হুস্ত। বলাবাহুল্য একাজ ব্যয়সাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু মহারাজের স্মৃতি অমর হয়ে থাকুক এতদুপ ইচ্ছা পোষণকারী মহারাজের সতীর্থ ও স্নেহপুত্র লোকেরও অভাব নাই। আমরা সকলের কাছে উপরোক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করি। ইতি—

বিনীত—

স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে—

দীনেশচন্দ্র ঘটক, সাধারণ সম্পাদক

চেক বা নগদ সাহায্য উপরোক্ত ঠিকানায়, এবং চেক 'মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী স্মৃতি রক্ষা কমিটি'

ভাবাত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ কীর্ত্তন নন্দ ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হয়তো এ বাড়ীও এখনই আক্রান্ত হবে, তারই উদ্ভোগ আয়োজন চলছে। স্থির হল আর কাল কিসের না করে এ বাড়ী ত্যাগ করতে হবে। সবাই এক সঙ্গে বেবিবে পড়লেন রাতের অন্ধকারে। এর পরেই তারা মিলিত হয়ে ছিলেন নবগ্রহ পাহাড়ের পাশে। সোঁহাটা ত্যাগ করা যখন স্থির হল, সতীশবাবু অস্ত্র একজন বিদ্রোহীকে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে ছোট্টে নুবর্তী এক ট্রেনে গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন এবং নানাদিক ঘুরে কলকাতা চলে এলেন।

কামাখ্যা পাহাড়ের উপর ধরা পড়েই প্রভাসবাবু বললেন, 'আমি আহত, চলবার শক্তি নেই। আমাকে নিয়ে বেতে হলে বাহনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

পুলিশের দল প্রভাসবাবুকে কাঁধে করেই সমভুলে নিয়ে আসলেন। এরপরে নিয়ে বাগদা হল থানায়। সেখানে চলল নির্ঘাতন ও প্রেলোমিনের পালা। একবার প্রশ্নারে জর্জরিত করছে, তারপরেই টাকার কাড়ি এনে সামনে রাখছে—'এই টাকা সবই আপনার। যা জানেন বলে দিয়েই নিয়ে যান। বিদেশে গিয়ে পড়াশুনা করুন, তারপরে দেশে ফিরলেই গভর্ণমেন্ট আপনাকে বড় চাকরী দিবেন।' এই ভাবে সমস্ত রাত ধরে চলল। পরদিন প্রভাসবাবুকে আদালতে উপস্থিত করা হল। তিনি পুলিশের কাঁধে ভর দিয়ে আদালতে প্রবেশ করলেন। চারদিকে অপদিত দর্শকের দল।

হাসিমুখে আদালতে প্রবেশ করতেই একজন বলে উঠল, 'দেবেছ। এরা মানুষ না দেবতা। গুলীতে আহত, চলতে পারছে না, কাঁদার দড়ি গলায় কাছে ঝুঁকছে, কিন্তু ভবুও মুখের হাসি মিলায় নি।' বিচারকের অহুমতি নিয়ে একখানা চেয়ারে বসেই প্রভাসবাবু জবানবন্দী দিলেন :

১৯১৬ সালের পূজার ছুটিতে আমি কলকাতা থেকে বাড়ীতে আসি। সংসারে আমার আপন জন বলতে একটি ছোট ভাই এবং একটি ছোট বোন ছাড়া আর কেউ নেই। বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আমার বাবা মা জীবিত নাই। এক কাকা আছেন, পারিবারিক ব্যাপারে নিয়ে কাকার সাথে আমার মতানৈক্য হয়। ফলে পূজার পরেই আমি আবার কলিকাতার ফিরে বাই। এর কিছুদিন পরেই আমি সংবাদপত্রে দেখি, আমার ছোট ভাই জিতেশকে পুলিশ রাজসাহীতে ভারত ক্লাব আইনে গ্রেপ্তার করেছে। আমার ভাই অতি মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিল, বংশের সে সুশোভন করবে এই ছিল আমার আশা। সেই ভাই-এর ধরা পড়ার সন্বাদে আমি মর্মান্বিত হয়ে পড়ি এবং সংসারে আমার বিরাগ উপস্থিত হয়। অল্প দিনে সংসার ছেড়ে তীর্থ ভ্রমণে বাই। গয়া, কাশী, কুম্ভাবন প্রভৃতি তীর্থ আমি ভ্রমণ করেছি। কামাখ্যাতেও আমি পূর্বে এসেছি। এই তীর্থ পর্যটনকালে সংসার বা বাড়ীর সঙ্গে আমার কোন সংযোগ ছিল না। হুই বংসর কাল এমনি ভাবে

কাটিয়ে আমার মন কতকটা হুহু হয়। তখন বাড়ী ফিরে যাবার ইচ্ছা মনে জাগে। মনে করি কামাখ্যাসেবীকে দেখেই আমার দেশে ফিরে যাব।

৯ জাহ্নবীর সন্ধ্যার পাড়ীতে কামাখ্যার উপস্থিত হই। পাণ্ডুবাট ও কামাখ্যাতে সেদিন কোন পাণ্ডাকেই দেখিনি। কামাখ্যা স্টেশনটি একটি ব্রগে স্টেশন মাত্র। খাত্রীদের রাতে থাকার কোন ব্যবস্থা নাই। অন্ধকার রাতে জঙ্গলাকাধ পাহাড় পথে পাহাড়ের উপর উঠতে সাহস হল না। তাই আমি গৌহাটি সহর পর্যন্ত বাই, সেখানে আমি তৃতীয় শ্রেণীর খাত্রীদের বিশ্রামাগারে শুয়ে থাকি। শেষ রাতে লার্লশ শীতে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হবার উপক্রম হল। আমার সঙ্গে জামা-কাপড় ছাড়া কোন শীত বস্ত্র ছিল না। আমি ভাবি, ঐভাবে থাকলে মরে যাব। কিছুটা হাটলে শরীরটা গরম হবে মনে করে আমি রেল লাইন ধরে কামাখ্যার দিকে অগ্রসর হতে থাকি। কিছুটা পথ চলার পরে কতকগুলো বন্ধুকের আওয়াজ শুনি। সঙ্গে পালালো। পালালো শব্দ। হঠাৎ একটি গুলি এসে আমার উরুদেশ ভেদ করে। আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। ব্যাপার কি হয়েছে কিছু বুঝতে পারি না। মনে করলাম পার্শ্ববর্তী বাড়ীতে ডাঙ্কাত পড়েছে। আমি কামাখ্যার পথেই অগ্রসর হই এবং আমার পূর্ব পরিচিত পাণ্ডা লক্ষ্মী দত্ত মহীশূরের বাড়ীতে বাই। তখন সকাল হবে গিয়েছে। পাণ্ডাঘরে এক ভাই গৌহাটি গিয়েছিল। সে এসে বলে সেখানে পুলিশের সঙ্গে স্বদেশীবাঘীদের এক লড়াই হয়ে গিয়েছে। হুই পক্ষেই বহু লোক হতাহত হয়েছে। প্রাণের ভয়ে আমি সেখান থেকে সকলের অসাক্ষাতে জংলা পাহাড়ে পালিয়ে যাই। এরপরে খেজুর পুলিশের কাছে আত্ম-সমর্পণ করি।

কিন্তু কামরূপ জেলার পুলিশসাহেব ক্যাথল

তার সাক্ষে বলেন, প্রভাসবাবু খেজুর আত্ম-সমর্পণ করেছেন এটা মিথ্যা কথা। পুলিশই তাকে ধরেছে। মামলার সময়ে বিদ্রোহী পক্ষে ব্যারিষ্টার ছিলেন এম. এন. হালদার তাঁর সঙ্গে ছিলেন টাংকার উকিল ঐশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আসামে তখনকার প্রখ্যাত নামা উকিল নবীন বরদলৈ এবং আরও কয়েক জন। নবীনবাবু পরে আসামের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা হয়েছিলেন। পুলিশ হেতাজত থেকে বিদ্রোহীদের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিনের জেল ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত রকম। দিনের মধ্যে পাঁচ ছ'বার স্নানটা করে কয়েকদলের তলাসী করা হত। পরে এ ব্যবস্থা এমনই গা-সহ্য হয়ে গিয়েছিল যে, জেল-কর্মচারী তলাসী করতে এলে বিদ্রোহীরা আগেই কাপড়খানা খুলে দূরে ফেলে রাখতেন, জেলে প্রত্যেকে পৃথক পৃথক জেলে ছিলেন। মনীন্দ্র রাবকে আগেই জেলে আনা হয়েছিল। নলিনী ঘোষ, ভাত্রাপ্রসন্ন দে. এবং নরেন বানার্জী জেলে আসেন প্রভাসবাবুর পরে। ৫ জনের জেলের সামনে ৫ জন রাইফেলধারী প্রহরী থাকত। গৌহাটি জেল থেকে বিদ্রোহীরা পালাবার চেষ্টা করেন। আদালতে যখন মামলা চলছিল, উকিলকে পরামর্শ দেবার ছলে কাগজে লিখে সংগঠন সংক্রান্ত সমস্ত খবর বাইরের বিদ্রোহী কর্মীদের নিকট পাঠানো হত। বিশেষ করে ঐশ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে এই সকল খবর পাচার হত। ঐশবাবু শুধু অহুশীলন দলের সমর্থকই ছিলেন না, তিনি বিশিষ্ট কর্মাক্রমে কাজ করতেন। জেলখানা থেকে কিতাবে বিদ্রোহীদের উদ্ধার করা বেতে পারে তার একটা পরিকল্পনা ঐশবাবুর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরিকল্পনা মত কাজও আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু বিদ্রোহীদের ব্যারিষ্টার হালদার সাহেব বলেন, 'মনে হচ্ছে নও বিশেষ হবে না। (১৯৪৬)

জাগ্রত জনগণ মুখোমুখি এবার খসাবেই

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার মধ্যস্থতী 'নির্বাচনের দিন দ্বি-
তরফে আগামী ৬ই ফাল্গুন ১৯৮০ সালে। আর
কংগ্রেস লগ্নেই ভোট গ্রহণ হবে। সব রাজনৈতিক
দলই নিজ নিজ মনোনীত প্রার্থীর অঙ্গুষ্ঠে ব্যাপক
প্রচারণা করে। দূর-দূরান্তের মাধ্যমেও প্রচারণা চালাচ্ছে
তারা। ভোটগ্রহণের সময়ের আগ পর্যন্ত এলাকার
ভোটারগণ তারা রাজনৈতিক-সচেতন তারা এই সব
প্রচারণার মাধ্যমেই প্রভাবিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে
না। কারণ তারা মনে মনে প্রায় ঠিক কোরে নিচ্ছে
যে এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস ভোট বিলম্বিত হলে
সামগ্রিক ক্ষতি হবে, তাই তারা অসি মূল্যের পটভূমিতে
সি.এ.স. বামপন্থার নির্মিত চক্রে মূল ভরষা রাখা ছাড়া
অন্য কিছু। নারীরাও প্রভুত ভরষা রাখা ছাড়া
যদিও আইন-মূল্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে, বলীর চক্রান্তের
দলি, দ্বিগুণ ও অসমতা লাঘবের দাপ্তর হাঁপ চক্রে বীচবে,
পক্ষপাতমূলক ও নিরপেক্ষ আদর্শবোধ। পুনরায় চানু হলে
পূর্বের মত এবং লক্ষ্যশিলা দাপ্তর কিছুটা অতিরিক্ত
কেনে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নির্ভর যেতে পারবে ও নিজ
নিজ বৃত্তিতে কর্মরত থাকতে পারবে। বিজ্ঞান বাস্তব
সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গে এম.জি.সি.পি.এম.বলের দলবাকী
বৈষম্যতা, পক্ষপাতবিশূণ্য পানন, বৈষম্যতা, বিখ্যা
ভোক, বৃত্তিবৎ, খুলশী-জুসু, পল্লারতী প্রভৃতি,
প্রভৃতি, সমাজবিষয়ী বৈষম্যতা, অসমতা, পাননের
নামে পোষণ, রাজনীতির উদ্দেশ্য প্রভৃতি কাছাকাছি
সমস্ত ও অতিরিক্ত হয়ে উঠেছে। এবারের ভোটে বাস্তবের
সেই বিরুদ্ধ ও বিক্ষোভের প্রকাশ দেখা যাবে স্পষ্টভাবে
যেই অসমতা হবে। সি.পি.এম. হল তাদের প্রধান ও
একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বংশের (ই) হলকই সত্য
করে তাই তাদের প্রচারণা ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়া

এখনো। ইচ্ছার ভাবমূর্তিকে লোকসভায় দেয় করণ
মানসে তারা পানন চিন্তার শুরু করে দিয়েছে পন-পন
অসমতা ও বৈষম্য লাঘবের মাধ্যমে। এবার প্রচারণা
বেগেই মনে হয় যে এরা ইচ্ছা প্রার্থীকেই ভরষা করে,
আর তাড়াতাড়ি সি.পি.এম. প্রায় নির্ভরভাবে মনে
পিয়েছে অসমতার দাপ্তর যে এবার ইচ্ছা প্রার্থী
ও কংগ্রেস প্রার্থী পরস্পর পরস্পর। ইচ্ছার অর্থ এবার
অসমতার বাকী সি.পি.এম. সবচেয়ে বৃত্তে পেরিয়ে,
তাই সি.পি.এম. তার অসমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে
কোন প্রচারণা চালিয়ে কেবল ইচ্ছা প্রার্থীর বিরুদ্ধে
অসমতার বিখ্যা প্রচারণা চালিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে সব।
এর ফলে বহু চাক-চাক প্রাথমিক ও বিধান বৃত্তিমূলক
পন্থার নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ইচ্ছার
অপেক্ষে বহু বৃত্তি-ভরষা ও বৈষম্যতা করে, তাদের
প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থ প্রভুত হয়ে বৈষম্যতার চোটা করছে।
যাতে তারা সবাই হল বৈষম্য এবার কংগ্রেস (ই) হলক
ভোটের ইচ্ছার দূর হাতের দূরত্ব ও বহুত্ব করছে।
কংগ্রেস (ই) হলক নির্মিত কর্মসূচির চেয়ে বহু ভরষা
করছে এবারের নির্মিত বাস্তবের হল যারা সি.পি.এম.
বলের অসমতার, অসমতার, হলক, পৌতন ও অসমতার
বাস্তবের অর্থ সি.পি.এম.বলের ওপর বীচবে।
হাজারে হাজারে বৈষম্য অসমতার হাজারে বাস্তবতা
কেন্দ্রমূলক হাজারে হাজারে ছোট বৈষম্যতার ও হাজার
হাজারে হাজারে প্রচারণা বাস্তবতা সামগ্রী হাজারে
হাজারে বৈষম্য ও অসমতার দাপ্তর বৈষম্যতা পাননি
বলীর চক্রান্তে, হাজারে হাজারে বহু ও কংগ্রেস-কং-
কংবানার পন ছাড়াই করা যেতে পারছে বাস্তবের দল
লক লক লাঘব বাস্তব হাজার সি.পি.এম.এম. চক্রান্তিক
হাজার করে এবং হাজার হাজার কর্মসূচি বাস্তবের চোখ দৃষ্টিতে,

যোহা বেবেছে সি, পি, এম হলের একমাত্রকর্ত্তী কাব্য-
কলাপের বাস্তব তথ্যপূর্ণ মূল্য তথ্যও বলবৎভাবে আদ্য
ইন্দ্রিয় পিছনে লাবি বিবেচনা ডিউয়েছে গুণ্ডমবৎ ।

তারের সকলের আশা ও বিশ্বাস এই যে, যদি সি সি এম-কে এই নির্বাচনে বড় রকমের খাড়া সেওয়া না যায়, তবে সি সি এম দলের অত্যাচারে মানুষ রাস্তার বশতে ঘাঘা হবে, তাই তারা সবাই মিলে ইলিয়ার বন্ধকে জোরে চালাতে প্রস্তত হ'য়ে সমুদ্র সমরে এসিয়ে এসেছে। ইতি-পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণের মুখে মুখে টন্দিয়ার অনেক এক জোর নির্বাচনী প্রচারণা হেথা হাটনি। মানুষ যেন নিজেদের ইচ্চার তাগিদে ছুটে এসে ইন্দিরার নির্বাচনী তরঙ্গের বাল ধরতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ইন্দিরা নাগে হাওয়া এগার এক জোর ঘটতে যে তাকে ঠেকায় কে না সি সি এম বা অন্য কোন দলটি তৎপর (হ) দলের সমরক তো নই, বরং অনেক নিচে তারা। পশ্চিমবঙ্গে অত্যাচারে বাতালে ইন্দিয়ার জবোনি আজ দু'র সেকারগেই।

কংগ্রেস (ই) দলের যোগ্য ও প্রতিভাবান কর্মীরা
এবার দেশ দাতব্য ও সুস্থিতির সঙ্গে সি পি এম দলের
বিকল্পে শক্তিক তথ্য পরিবেশন করে জনগণকে সাংগঠনিক
স্বাধীনতার সঠিক উপযোগীতা বোঝাতে এমন সূচক
সাথে প্রচারে নেবে যে, ইন্দিরার স্বাধীনতা দিনের পর
দিন উন্নয়ন প্রাপ্ত হচ্ছে। জনগণ আজ একবারো
ইন্দিরার প্রেমের পক্ষপাতি নয়। কেউ কেউ আবার গভীর
অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। কবি-কায়ার উল্লেখ করতে
কিন্তু কতই না। তাদের প্রধান বক্তব্য: গভীর অসন্তোষ
সংসারী কর্মচারীরা, গ্রামিক কৃষকরা, বেল কর্মীরা,
বানবান কর্মীরা ও অগ্রাধিকারী নিম্ন নিম্ন কর্মচারীরা যে
নিষ্ঠা, নিয়মিতগতি, ও কর্মে স্পৃহা বাজে দেখিয়ে
তা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিশূল দাবী এনে দিয়েছিল। কলে
স্বাধীনতার আর ছেড়েছিল, স্বাধীনতা সীমিত হয়েছিল ও
মাত্র কিছুটা সুস্থিতির পথে এগিয়ে যেতে পক্ষ হয়েছিল।
অন্য এক আবার বলেন যে, একেবারে মাত্র বিশূল দাবী
ছেড়ে নীর সুস্থিতিপূর্ণ জীবনে কিয়ে আসবে যদি ইচ্ছা
হয় প্রাথমিকই হবে পক্ষ হাতে পান বন্ধ, ধর্ম।

সেদের জুখ ও সমুদ্রের স্রোত চাই উন্মীলায় বলিষ্ঠ : অকৃতব ।

[illegible]

দলবদ্ধভাবে সাহায্য করা সম্ভব একত্রিত করে। 'সি, সি, এম'এল এবার যে কঠিন যিবোদীতাব সম্মুখীন তা তাং নিজেদের আগুই বুকেতে, তাই এবারের ভোটের তালিকাভুক্ত কংগ্রেসি করেছ তারা অনেক বুদ্ধি খাতিয়ে। এতদ্ সত্ত্বেও তারা হাল পানি পাচ্ছেনা, কারণ দায়িত্ব তাদের অশাটরে এমনই বঁকে বলেছে যে, কোন কবাই তারা আর পুতে রাখিনয়। তারা এবার সি, সি, এমকে হারাবার মস্ত বল বেঁধে, হয় জনতাতে আর না হয় ইন্দিরাকে ভোট দেবেই। জনতা-বল কিছ দুব সক্ষীয় নয় এখানে, উপরোক্ত জনতারদের কর্মসূচীয়া বেশ কম আর তাড়াতাড়ি পক্ষিবৎ জনতারদের চেয়ে কংগ্রেস (ই) বল অনেকখানি শক্তিশালী। কংগ্রেস (ই) দলের সংগঠন বেশ মজবুত ও কর্মীসংখ্যা অসংখ্য আর সংগঠন দিন দিন আরো শক্তিশালী হচ্ছে, বিপুল জনসমর্থনের জোরে। অনেক আবার আশংকা করছে যে, জনতা-কে ভোট দিতে গিয়ে যদি কংগ্রেস (ই) কে ভোট না দি, তবে হয়তো বা ত্রিভুজাকার সংঘর্ষে সি, সি, এম তরী হয়ে যেতে পারে; তারচেয়ে যে আশংকা যে বেশী শক্তিশালী তাংকেই ভোট দেওয়া ভাল, কিছু কোন ঘোরেই এমনভাবে ভোট দেওয়া উচিত হবে না যাতে সি, সি, এম তরী হতে হতে পারে কোন উপায়েই। সি, সি, এমকে পরাস্ত কোরতে পারে একমাত্র কংগ্রেস (ই)—এ কথাও প্রচার করতে কিছু কিছু প্রবীণ-ব্যক্তি কারণ তারা নিত নিশিৎ যে জনতারল কোনমতেই সি, সি, এম বংশের সঙ্গে টেড়া হিতে পারবে না। তাদের সংগঠনী শক্তির দুর্বলতার জর। সে কারণ এবারের কংগ্রেস (ই) বলকে যদি দলাই যুদ্ধে সমর্থন করে, তবে সি, সি, এম ভাল ভোটের জোরেও বিশেষ হুম্বা করে উঠতে পারবে না। সের্গিন বাজারে এক প্রবীণ ব্যক্তি হঠাৎ

চিংকার করে বলে উঠলেন—“সি, সি, এম যখন বাজারে আশ্রম লা গরুচে, সব নিতা প্রয়োজনীয় জিনিষের দাব ভেগুচাবে বাড়িগে দিতে ও ঘরে থরে আছকাঠকে স্থায়ী করেছে বিস্তার ব্যয়গকে বান্ধাল করে দিয়ে, তখন এবারে সি, সি, এমকে এক ভোটও নয়। গতবারে ওয়েই ভোট দিয়েছিলাম হুয়ের আশা, তা দ্বন্দ্ব এখন আর ধবে না, তাই এক ভোটও নয় এবার সি, সি, এমকে”।

ওনার কথা শেষ হতেই এক যুগ চেঁচিয়ে উঠে জিগেল করে “তবে কাকে ভোট দেবেন?” উনি বেগে বলেন “তোমার বলকে নয়। উম্মিরাকে শুধু ভোটট দেবনা, ওয়ের কংগ্রেস (ই) দলের হয়ে বাটাখাটনি করবো, আর লোকজনকে বলবো সব ভোট ইন্দিরাকে দিতে। আলুর কোঁ একটাকা আদী, গিরাজ পাঁচ টাকা, সাতৈল লাভে তের টাকা কোঁ, চিনি চার টাকা। সবই আশ্রম, হাত পুড়ে যাচ্ছে। তুমি কি মনে কর যে এরপরও সি, সি, এম ভোট পাবে? কখনো নয় জেনে রাখ। এবার লোকে মনে হয় সাবিত্রীভ ভাবে উম্মিরাকে ভোট দেবে। আশিও হবেো তাই। তোমাদের কংগ্রেসে মাটি ধোঁড়ী শুক হয়ে গেছে বন্ধু। পরীক্ষের বন্ধু দেখে সি, সি, এম নিজের আখের শুছিয়ে নিরেছে। ওরা কারো ভাল করেনি। কেবল দলের কাছে খোটা টাকা লগা করে নিয়ে খুশীতে মর। এবার ইন্দিরার জর অস্বাকার সারা ভারতের সর্বত্র। কে ঠাণ্ডে কথবে মিথ্যা ধাম্যক আর বলে প্রচারে? ‘তার কথাই এটাই প্রমাণ হগো যে, বল মিরগেফ প্রবীণ দায়িত্ব আক ইন্দিরার দমর্থণে। তার আশাও বিদায় এই যে ইন্দিরা জিতলে ভারতে আবার সাধারণ দায়িত্ব বিচার আদালত আদালত করে পাবে।

ম্যাজিকার দেশ

॥ ঐদত্তীহরণ সেন ॥

সে ছিলেন ডাঃ গোয়েবেলস্। এক বাতল কালো মিথ্যা নিয়ে এক আউল উজ্জল সত্যে মেশাতেন। সেই সঙ্গে কি যে মন্ত্র পড়তেন, কে জানে! অমনি বাতল কে বাতল একেবারে শুভ্র সত্যের মত ভাবের হয়ে উঠত। জা'হানীর এই ম্যাজিশিয়ান দেহরক্ষা করেছেন অনেক দিন আগে। ইহানী: অনেক ম্যাজিশিয়ানের খেল দেখেছি, তাঁরা কেউ হের ডউয়ের কাছেও পৌছতে পারেন নি।

তবে কি না আমাদের দেশের কথা আসলো। এদেশে দেশান্তরোধ আজও শুরু হয়ে বসে নি; নৈতিক মান আমাদের হেমন উচু নয়। রাজনৈতিক নেতারা তো দেখতেই পাকেন, নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে পাখল হবে ছুটোছুটি করছেন। উচ্চতম পর্ষায়ের মানুষও একে অপরকে যে কোন উপায়ে বশত করার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত। তাই এদেশে মিথ্যাকে সত্য করতে ম্যাজিকের বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। যে কেউ একজন একটা মুখ-বোচক গুচ্ছ হাড়ুলেই হল, সেটা বচাই অসম্ভব মনে হোক, তাইই গরম পিঠের মত বাজারে চলবে।

ইহানী: যে সব গালগল্প মুখেমুখে [কিন্তু কাগজ পড়ে] প্রচার হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সুখবোচক, বিবাস্ত, অশচ আশ্চর্য্যামান মিথ্যা হল সেইগুলো, যেগুলো ইনিয়ার সম্বন্ধে রটেছে। তাঁকে আমরা 'ম্যাজার' 'ডিলেন' করে দেখেছি। গায়ে কালো cloak, হাতে কব্বাকে dagger! make-up এ কোন ক্রটি রাখিনি।

এই সেদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন, গান্ধীজীর স্নেহ-

যজ্ঞা, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্রী; শি'তা নেহের শেষ বয়সের নির্ভর দণ্ড।—ভৃতীয় বিশ্বের আশার বহিষ্কা, জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রদান মন্ত্রী। হু'তিনটে বহর খুঁতে না খুঁতেই, একেবারে নয়কে নিক্ষেপ! অবশ্য জগতের স্বীকৃতি এই। ব্যক্তিগত সমারোহ, নলিনী পল্লভ নীড়ের মতই অসম্ভাবী। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যারা অভিনয় করেন, 'স্বপ্নহাস্তে' গড়ি স্বপ্ন হাতে তাঁদের ক্ষমতা সেরে প্রাপ্ত থাকতে হয়।

ইনিয়ার সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা আগেও ছ' একটা কানে না এসেছে তা নয়, কিন্তু avalanches মত তারা নেমে আসলো নির্ধাচনে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পরে। সুদিনে যারা ইনিয়ারকে দেবী বলে পূজা করেছেন, দু'দিনে তারাই ইনিয়ারকে 'ডাইনী' বলে ত্যাগ করলেন। যে যোড়ার উপর সর্বদা বাজি ধরে মানুষ, 'হেরে' হেরে গেলে তাকে কেউ ক্ষমা করে না। তখন নাগালের মধ্যে পেল, মাঝায় একটা দিয়েও ফেলতে পারে।

আগে যখন তুর্কোমান শেটের বেলবল জমি উদ্ধারের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতাম, ভাবতাম ছুটপাত কেন এরকম বাতারাতি সাক করা হয় না? নাসাবন্দীর জবরদস্তীর গুচ্ছবে খুঁসী হয়ে ভাবতাম এইবার কলকাতার ভিখারীদের বংশবিস্তারও করা সম্ভব হবে। দেখে শুনে বেশ আশাবিত্ত হয়ে উঠছি, এমন সময় বেজে উঠল ৭৭এর নির্ধাচনের বাজনা। পুরানো দিল্লীর বাহুর বেরিয়ে পড়লেন তাঁর খেল দেখাতে। গায়ে জোকা, চোখে সুদীর্ঘ উপরে

কালো চশমা, হাতে বাঁধা আরব দেশের 'জিন'। সেই অভিনব নাটকীয় পরিবেশে, পিষাচিস্তা ঘাড়কবের কেরানীতে, চোখে বাঁধা লেগে গেল দর্শকবৃন্দের। "গুণ হইয়া পোষ হইল বিজার বিজায়।"

কেটে মুন্সের মড় কেটে বাগুয়ার পরে, আকাশ যখন স্নায় হয়ে এল, তখন লড়াইয়ের হিসেব নিয়ে বঙ্গলেন পণ্ডিতেরা। দেখলেন, মুসলিম প্রধান অকলে কংগ্রেসের বড় বড় গাছগুলি সব খুলিয়া হুইছে। স্বাধীনতার তিরিশ বছর ধরে, মুসলিম ভোটটি ছিল কংগ্রেসের সহায়। আজ কেন তারা কংগ্রেসকে বর্জন করল? সে কি দিল্লীর তুর্কোমান গেটের তুচ্ছ কয়টি ঘর বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়ার অপরাধ? সে কি হরিদ্বারের গ্রামে নাসবন্দী নিয়ে পুলিশ চুলুমের শাস্তি? এ জটাই কি পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম ভোটার ইনিরাকে মনে করল ক্রমশঃ? কিংবা আরো কোন গুরুতর কারণ ছিল পেছনে?

ইনিরা শাশদের বৈশিষ্ট্য আর বৈদেশিক নীতির অসামান্য সাফল্য। স্বাধীনোত্তর দুশে বিশেষে ভারতের ভাবমূর্তি এখন উজল হয়ে আগে কখনও ফুটে ওঠেনি, যেমন উঠেছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পরে। দুর্বল বাংলাদেশকে উদ্ধারের জন্য প্রবল প্রত্যাপ আমেরিকার হস্তচক্ষু উপেক্ষা করে। সৈন্য প্রেরণ, এবং জয়লাভের পরে প্রত্নিবন্দী রাজ্যের শাশ ভার ভারই অস্থায়ী সরকারের হাতে ন্যস্ত করে সৈন্তদল সরিয়ে নিয়ে আসা; পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা বিরল। কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্রের সৈনিক, একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে পরাজিত করবে, সেটাই বা সকলে বরদাস্ত করবেন কি করে?

ভারতীয় মুসলিমের যাবাই ছিলেন উম্মী ও সাইদী, ভারাই দেশবিভাগের পরে পাকিস্তান

গেছিলেন, নিজেই ভাগ্য নিজে গড়বার আশা নিয়ে। কেউ গেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে, কেউ পূর্ববঙ্গে। পূর্ববঙ্গে যারা গেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশটাকে Colonise করা। অফিসার গেছিলেন চাকরীতে প্রমোশন নিয়ে, শাশনের কাজ সুচারুরূপে চালাবার জন্য। ব্যবসায়ী গেছিলেন নতুন ব্যবসার কলন নিয়ে কিংবা নতুন শিরের প্রস্টিট রূপিত করবার আশায়। অফিসারের স্বপ্ন ছিল বড় সাহেব বা মেজো সাহেব হয়ে বসবেন। ব্যবসায়ীর স্বপ্ন ছিল সহর বন্দর উন্নত ও সম্মান্যরিত করে ব্যবসা ও শির প্রস্টিট করবেন। সেই স্বপ্ন যখন প্রায় সফল হয়ে উঠেছে, তখন বেজে উঠল বাঙ্গালাদের মুক্তি-সংগ্রাম। এই অসামরিক বিকোভকে দমন করা পাকিস্তানী চমুর পক্ষে মোটেই কঠিন হত না, যদি না ভারত শিরে আক্রমণ করত। কৃতপূর্ব ভারতীয় মুসলিম-কি কমা করতে পারে ভারতের এই বাহ্যার? কিংবা তাদের আত্মীয় স্বজন যারা আজও ভারতে বাস করছে, তারা কি পারে ইনিরাকে ভোট দিতে?

কিংবা ভারতীয় হিন্দুই কি কমা করতে পারে, একবার বাহবলে দেশবিভাগে রক্ত করবার পরে, আবার সেই বিহিতে রাজ্য মুখের মত ছেড়ে চলে আসা?

ভারতের বৈদেশিক নীতির আর এক সাফল্য, আমরা মনে করতাম সিকিমের ভারত ভুক্তি। একদিকে ভ্রাগনের বাবা, অপর দিকে আমেরিকান নারীর (কিংবা রানীর) উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়। বাইরের ও অন্তরের শক্তি দুটির। গোপন পরিকল্পনা যৎ ধরবার আগেই, ম্যাজিকের কৌশলে সেই দুই রাজ্যটিকে ভারতীয় পূর্ণত্বের আশ্রয়ে নিয়ে আসার বিবরণ কাহণ অজানা নয়। এরোপেন থেকে একটিও বোমা কেনতে হয় নি, যাওয়ার ভালে

ভালে পা কেল মার্চ করে যায়নি একজনও সৈনিক
একবারে অহিংস উপায়ে, সামান্য একটু সাংবিধানিক
কৌশলে, মধ্য যুগীয় কৃশাধন থেকে, সিকিমের
দরিদ্র প্রজাদের উদ্ধার করা! এই কাজটিও যে
জাতীয় কারও মনঃপুত না হতে পারে, আগে সেটা
বুঝতে পারিনি। জানলাম প্রথম ৭৭.৪৭ নির্বাচনে
ইন্দিরার পরাজয়ের পরে, প্রধানমন্ত্রী মোরারজীর
জবানীতে।

ইন্দিরা খেজাচাট্টী, ইন্দিরা অথরোটেবিয়ান,
ইন্দিরা ব্যক্তি স্বাধীনতার শত্রু। সবটুকু হবত
ছিলেন। তবে এগুলো তখন ছিল তাঁর দুর্বল
রক্সাণের প্রকাশ। রাষ্ট্রতন্ত্রতা অধিকারের পরে
জনতা নেতৃবৃন্দেরও কম রক্সাণের পরিচয় পেলাম
না। অত্যা নির্বাচনের পূর্বে তাঁরা যে সব
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জয়লাভের পরে, রাজা হয়ে
সিংহাসনে বসার পরে কল্পিত হয়ে সেই সব
পালন করবেন, এটা আমরা আশা করিনি। কিন্তু
তাঁরা রাজনীতির একটু স্বস্থ পরিবেশ আমাদের
করবেন, জাতীয় চেতনার স্মৃতিকাগারে সূচিভা ও
স্বচ্ছতা রক্ষা করবেন, এইটুকু আশা করেছিলাম।
কিন্তু পরিবর্তে দেখলাম যে সব অপরাধ দ্বিগুণ
ইন্দিরাকে কনবাসে পাঠানো হল, তারই পুনরাবৃত্তি
হতে লাগল নতুন জমানার শাংকড়ের দ্বারা।

প্রথমেই ধরুন 'বরোদা ডিনামাইট কেন্দ্র'-এর
অভিযুক্তদের মুক্তির ইতিহাস। ইণ্ডিয়ান পেনাল
কোডের ১১১ এ এবং ১১০বি ধারামতে তাদের
জীবন চলছিল। এই সাংঘাতিক ধারা দুটির সঙ্গে
আমাদের পরিচয় থাকার কথা। বাংলার
সহস্রাবিক বিদ্যবী, এই ধারাতেই যাবজীবন কারাগারও
ভোগ করেছিলেন অভিশপ্ত ধীপ আন্দামানে। তাঁর
খোট্টা পলিডা ম্যাক্সিমট্টে 'মিঃ মথির' এর আদালতে
জর্জ কার্ণাডিক সহ অজ্ঞাত বন্দীর বিচার চলছিল।

আমার পক্ষে উকিল বহুবীর জামিনের আবেদন
করেছেন, অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচারক
সে আবেদন প্রতিবার আগ্রহী করেছেন। কিন্তু
কার্ণাডিক মন্ত্রিসভার যোগে গেলেন, আর তাঁর
অপরাধের গুরুত্ব উড়ে গেল, এবং জামিন
করলেন বিচারক দুদিন পরে, সরকার পক্ষের উকিল
আবেদন করলেন, জনগণের স্বার্থে এক পরিবর্তিত
অবস্থার পরিপেক্ষিতে, আসামীদের বিরুদ্ধে অভি-
যোগ প্রত্যাহত হোক। একদা যা ছিল জামিনের
অবাধা অপরাধ, তার বিচারটুকু পর্যাহত হল না।
সংশ্লিষ্ট আদালতের মানহানির প্রসঙ্গ উঠল না।
অভিযুক্তরা বেকশ্বর মুক্তিলাভ করলেন।

বিহু পট্টনায়কের হেসের বাড়ীতে জিনিসো
নিষিদ্ধ বিলাতী মাল পাওয়া গেল কি গেল না,
কিন্তু সিন্ডিকেটের ডিন লাব টাকার আসল মালিককে
এসব ছোট কথাই কান দেওয়ার দরকার নেই।
মোরারজীর ছেলে কিসের লোভে বাবার গায়ে
অঠার মত লেগে বিদেশ ভ্রমণ করতেন। সে সব
কথাও ছেড়ে দিন। ওগুলো ছোটোখাটো টাকা
পয়সার নোংরা ব্যাপার। যে ছোটো মাংসা নিয়ে
সে যুগে বানিকটা হৈচৈ হয়ে, শেখটায় সব লুপফাস
হয়ে গেছিল, তার প্রথমটি হল হার্ভার্ড শিক্ষিত
আর, এস, এস নেতা লোকসভার সমস্ত স্বরক্ষণ
স্বামীর বিরুদ্ধে। এই কবিত্ববর্ন ভ্রমলোক,
পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, Pas-Port Regu-
lation & Foreign Exchange Low
গুলিকে বন্ধাবৃষ্ট দেখিয়ে জরুরী অবস্থার সময়ে
ইউরোপ আমেরিকা চলে বেড়াচ্ছিলেন। নতুন
জমানার আত্মপ্রকাশ করার পরে সেই সব অভিযোগ
তো প্রত্যাহত হলই, বিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে
কুংসা প্রচারণার যে সব অভিযোগ ছিল, তার কোন
তদন্ত পর্যাহত হল না। দ্বিতীয়টি হল, সংগঠন
(বাকী অংশে ১৮ পাতায়)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ମରଣେ ଗାଥାର ସୃଷ୍ଟି କଥା

["A Nation In Making" ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସଂଗଠନ]

ଅନୁବାଦକ—ଅକ୍ଷାପକ ନମିନୀସ୍ବାମୀନ ମାଧବୀ

১৯০৯ সালে আয়ার বিলেভ ত্রয়

(ପୂର୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧାସିଂହେର ପର)

ହେମ ଡେଲିଗେଟ ସହବାବୁ ଲେଉଟି ମିଲିଆଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲେ ଏଲେମ୍ ।

এই পূর্বে আমরা ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে উইৎসলর ব্যাংকিং কোম্পানী
লেখা-এ আমাদের কত কথা বসিয়েছিলুম। সেই বস্তু
আজকের বাস্তবিক জগতের ভূমিকা কতটা অসঙ্গত দেখা
করা যায় তা বোঝাই। আমাদের বস্তুনিষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠ
কথা হয়েছিল কৃষকের পক্ষে এখানে মিঃ আমির
আমির সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেল। এই সময়টায়
লেখা-এ দুই ভাগে দুই ভাগে চাওয়া হয়েছিল। আমির
আমির হেবলার, উইৎসলর উইৎসলর পূর্বে এখানে।
তার পোষাকে কতটা উল্লসে 'কম্পানী'র অর্থ ইতিহাস
এখানে' যার লগান আছে। কিন্তু তিনি নোভে
বের কাপড়ের দল হল আমার কাছে এসে প্রথমেই
তিনি যে কথাটি বললেন তা হল এই : 'মিঃ বামামি
কৃষি ও কৃষক কোটটি পূর্বে এসে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ
করছে।' আমি বললাম, 'ইংল্যান্ডের এই বামামি
পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার জন্যে সাধারণত এটিকে চাড়া
আমি বন্ধনও চিনি না।' এই যে চ' বাস কাল আমি
ইংল্যান্ডে কটালার, তার মধ্যে যে আমাকে কখনও সচি
কণিশে ভুলতে হয়, তা হচ্ছে আমি যে বুদ্ধিমানের
কাজ করেছি তাই প্রমাণ। একবার আমি লন্ড
মিডেল্টনের সঙ্গে দাবাং করতে গিয়েছিলাম (ইনি হলেন
মিঃ এড্রিক যিনি তারক পল্লভপে বস-বিভাগ অধ্যক্ষ
করেছিলেন)। আমি যেতেই তিনি এসেই এসে বস
বুলে গেলেন এবং চোখ পাকিয়ে আমার কতটা কোটটির
বিকে তাকালেন। আমার কোটের বিকে তার এ রকম
ভাবে চাহিয়ে অর্থ আমি বুঝতে পারি বললাম, 'হুজু,
আমার পেনের আবেগের বড় বামামি, এ

(୧୫ ମାତ୍ରର ମଧ୍ୟର ଅଂଶ)

কংগ্রেসের নেতা ও বিশিষ্ট বাৎসর্যী জাহালাল
গুপ্তজীর একান্ত ঘরোয়া কাহিনী। গুপ্তজী একটি
কলেজের এডোমেন্ট কাণ্ড-এর টাক। নিয়ে নিজের
বাৎসর্যে লগ্নী করতেন। শেখটার পুলিষের হাতে
ধরা পড়ে যান। সেই অভিযোগও প্রত্যাাহবী
করেছিলেন মোরারজী মরকার।

আজ বহুর তিনেক জনতার শাশনের পরে, চোখের সম্মুখে ভেসে পড়তে দেখছি আমার সেই আশ্চর্য্য দেশটিকে, যাকে একদা ভারত বলে জানতাম। তীব্র প্রাদেশিকতা ফনা ধরে উঠে ছোবল মারছে, আজ এখানে কাল ওখানে। আসামে পোষ্টার বসছে, 'গো থাক উড়িয়ানস'! আগুন জ্বলছে গুলি চলছে মেঘালয়ে। একদিকে গভর্নর বসেছেন, 'বন্ধ কর নির্বাচন,' অঙ্গদিকে নির্বাচন কমিশনার বসেছেন 'নির্বাচন হবেই।' দেশে আইন নৃশংস নেই, মহারা একযোগে পদত্যাগ করছেন, ভবু দুসামতী গঙ্গা আকড়ে বসে আছেন। কোর্ট কাছারীতে পিকেটিং, জনজীবন স্বক! শাবক ও শোষিত যেন মিছিল করে চলেছেন এক অজানা থাকের মুখে। এর নামটি কি গণতন্ত্র? এই কি রাজনীতির লক্ষ্য?

এই রাজনীতির মিছিলেই কি একদা আমরা
পড়তাম। বয়েছি : বইতে বইতে শেষে দিশে হারা
হয়ে আঁক ঘুরে মরছি ? এখন চোখ খুলে দেখছি
সামনে অস্ত্রহীন সত্ত্ব। আশ্বাসের তটরেখা
কোথাও নেই। স্বাস্থ্যের চোরাবাগিচাও চোখে
পড়ছে না। আঁক দেশের কাছে কি আমরা উদ্ভূত ?
যে ম্যাগজিকের মায়ায় পথ ভুলে মরেছি এতদিন,
এখন সেটাকে ভেঙ্গে ফেলবার সাহস কিছা মন কি
আমাদের এতটুকুও অবশিষ্ট নেই ? নতুন কড়ি
আমরা চাচ্ছি কিনা? হ্যাঁ, তাই কি করিয়ে দেওয়া যায় ?

শান্তিসেনা পরিষদ

বিগ্গবী মহানরক ৩ পূর্বচন্দ্র দাস প্রতিষ্ঠিত। ৪৮ বি, বাঁবাগীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৭

আগামী ১১ই জ্যৈষ্ঠবার্ষিকী রবিবার, ১৯৮০ শান্তিসেনা পরিষদের বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন সকাল ৯টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্যন্ত ১২/৭এ নতুনটোল সড় ষ্ট্রীট, কলি ৬ অনুষ্ঠিত হইবে। আপনায় উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

যাঁদের সম্বন্ধে জানােন হবে :— অরুণ গুহ, জামানন্দ সেন, ননীমোহন ভট্টাচার্য্য, নিকুঞ্জ বিহারী সেন, বলিনী সেনগুপ্ত।

সভাপতি

সাঃ সম্পাদক

ঐপকানন চক্রবর্তী

ছানলিনী গুহ

অনুশীলন সতীর্থ বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন—১৯৮০

স্থান—মহারাজ হৈলোকা চক্রবর্তী ও শহীদ মতীন দাস স্মৃতি সমিতি প্রাঙ্গণ,

৪৭, চৌতলা গেন, টাঙ্গীগড়, কলিকাতা ৪০

ক্রিয় সতীর্থ,

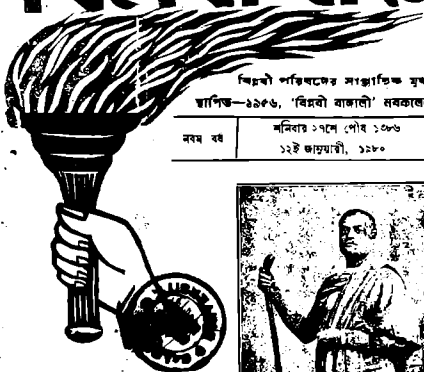
অনুশীলন সমিতি সতীর্থগণের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন এবার ১১ই জ্যৈষ্ঠবার্ষিকী, ১৯৮০ রবিবার, উপরোক্ত স্থানে (টোলীসড় ট্রাম ভিপোর অনতিদূরে, চালিশা রোল মিল ষ্টেশন) সাবাদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হইবে।

অনুষ্ঠানে আপনায় যোগদান ও সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রার্থনা করি। ইতি—

বিনীত—

পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সংস্কারিত মূলপত্র
 ছাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাংলা' সবকালোয়ার—১৯৭১

নবম বর্ষ	শনিবার ১৭শে পৌষ ১৩৮৬ ১২ই জানুয়ারী, ১৯৮০	১৬ সংখ্যা
----------	---	-----------



'ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র কাল-
 মার্কসের এই থেকে জন্ম
 নেয়নি, বিবেকানন্দের চিন্তায়
 আবির্ভূত।'

—নেতাজী

অমর বাণী সংকলন

নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাক্স ধরে, চাবার কুটার ভেপ করে, জেলে, মালি, মুচি, মেথরের
কুপড়ি মধা হতে। বেরুক মূর্খির লোকান হতে, কৃনাওখালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কাষখানা
থেকে, হাটি থেকে, বাজার থেকে—বেরুক কোণ ছলল, পারাড়ি পর্বত থেকে।

ভারতের কোটী কোটী মানুষ কেবল অর চাহতেছে। তোমরা কেবল শুক কথা শুনাইতেছ।
নিরাম, কুদার্ত মানুষদের ধর্মকথা, দর্শনশাস্ত্র শোনানো যোগ্যতর অন্তায়।

হতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পথসার
শিকিঁড়ি অথচ তাদের দিকে চেয়েও দেখেছেননা, এতপ ব্যক্তিকে আমি দেখছোহী বলে মনে করি।

একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিবার জন্য কোটি কোটি মানুষকে বলি দিয়া লাভ নাই।
যদি কোটি কোটি মানুষকে নিষ্পেষিত করিবা। একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা
অসম্ভাব। বরং সৃষ্টির জন্য একজন মহাপুরুষের দুখেভোগ প্রেরণ।

‘সৃষ্টি অর্থে পূর্ব-অবহীনতা—ভালোমন্দ উভয়ের বন্ধন থেকেই মুক্ত হওয়া। লোহার শিকলও
শিকল, সোনার শিকলও শিকল। ঐরামচন্দ্রদেব বলভেন পারে একটা কাঁটা ক্টলে সেই কাঁটা তুলতে
আর একটা কাঁটার প্রয়োজন হয়। কাঁটা উঠে গেলে দুটো কাঁটাই কেলে দেওয়া হয়।’

মৌতি একটি আশেচ্ছিক কাজ। জগতে বিস্তৃত নীতি বলিয়া কোন পন্থা আছে কি? এ
জগৎ কুসংসার মাত্র। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই আগেরের দ্বারা বিচার করবার অধিকার
আমাদের নাই। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের পরিবর্তনও অপরিহার্য।

আমরা কখনো মিথ্যা থেকে সত্য, মন্দ থেকে ভালোয় বেতে পারিবা। সত্য থেকে অধিকতর
সত্য, ভালো থেকে আরো ভালোর দিকেই পৃথিবীর গতি।

আমরা সার্বজনীন গ্রাম কি বলল, শ্রাম কি বলল না—তাই বলে আসছি, নিজে কিছুই বললাম
না। তোমার নিজের কি বলবার আছে বলো। পাণ্ডিত্যের মূল্য কি? মনকে বলিষ্ঠ ও নিরস্ত্রিত
করার মধ্যেই রয়েছে জ্ঞানের একমাত্র মূল্য।

দুইটি জিনিষ হইতে বিজ্ঞান সাবধান থাকিবে—কমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা।
অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।



PARTY POSITION IN STATES

The following, according to UNI, is the Statewise party position in the Lok Sabha till the time of going to press.

	CI	JP	LD	CU	CPI	CPIM	Others	Ind	Total
Andhra (42)	41			1					42
Assam (14)	2								2
Bihar (54)	30	8	5	4	4		2		54
Gujarat (26)	25	1							26
Haryana (10)	5	1	4						10
Himachal (4)	3								3
Jammu & Kashmir (6)	1			1			2		4
Karnataka (28)	27	1							28
Kerala (20)	5			3	2	6	4		20
Madhya Pradesh (40)	35	4						1	40
Maharashtra (48)	39	8		1					48
Manipur (2)	1								1
Meghalaya (2)	1								1
Nagaland (1)							1		1
Orissa (21)	19		1						20
Punjab (13)	12						1		13
Rajasthan (25)	18	4	2	1					25
Sikkim (1)							1		1
Tamilnadu (39)	20						19		39
Tripura (2)						2			2
Uttar Pradesh (85)	51	3	29		1				85
West Bengal (42)	4				3	27	7		41
Andaman & Nicobar (1)	1								1
Arunachal Pradesh (2)	2								2

	CI	JP	LD	CU	CPI	CPIM	Others	Ind	Total
Chandigarh (1)	1								1
Dadra Nagar									
Haveli (1)	1								1
Delhi (7)	6	1							7
Goa, Daman,									
Diu (2)				1			1		2
Laksha dweep (1)				1					1
Mizoram (1)								1	1
Pandicherry (1)	1								1
Total	351	31	41	13	10	35	39	3	523

পশ্চিম বাংলায় ভোটের ফলাফল

আসন—৪২ — ১ = ৪১ মোট ভোট—২,৮২,৬১,১৪৬

প্রদত্ত বৈধ ভোট—২,০০,৪৫,৬৩০

দল	প্রার্থী	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
সি. পি. এম	৩০	২৭	৭২,০৬,৮২১	৩৬.৪২
কং. ব্রহ্ম	৪	৩	২,৩৬,০১২	৪.৬৬
আর. এস. পি	৪	৪	১০,৭১,৬১০	৫.৩৪
সি. পি. আই	৩	৩	৮,৭৮,৭২৩	৪.৬৮
বাম ফ্রন্ট	৪১	৩৭	১,০৭,২৩,৩১০	৫৩.৮০
কং (ই)	৪০	৪	৭৩,১১,৪২৮	৩৬.৪৫
জনতা	৩৫	০	২,৩১,১৫৩	৪.৬৪
জনতা (এস)	১৭	০	১,০০,৪২১	০.৫১
কংগ্রেস	১৮	০	২,৪২,৮০০	১.২২
অজ্ঞাত দল ও নির্দল	১২৮	০	৬,৭৬,২৭৫	৩.৩৮
	১২৮	০	১২,৪২,৭১০	৬.১৫

জনতা, জনতা (এস) কংগ্রেস ও অজ্ঞাত দল ও নির্দল প্রার্থীরা ১২,৪২,৭১০ ভোট পেয়েছে কিন্তু একটি

একটি গৌরবময় প্রত্যাবর্তন

॥ মল্লর ঘোষ ॥

নতুন শতকের শুরুতেই ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে সংবাদটি—তা হ'ল ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার নেতৃত্বে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঐতিহাসিক ইন্দিরার গৌরবময় প্রত্যাবর্তন। বিগত ৭১ থেকে ৭৭ এই সাত বছর এবং তারও আগের চার বছর ভারতীয় নেতৃত্বে আসীন এই বিশ্ববিশ্রুত মহিলা সম্পর্কে বতো প্রশস্তি-নিন্দা, স্তুতি-অশ্রুতি রটেছে—যা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে এক কিংবদন্তীর না হিঁকা করে তুলেছে—সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এই দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। ৮০র নির্বাচনে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের বলিষ্ঠ সমর্থনকে ভিত্তি করে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে হিন্দী গৌরবময় প্রত্যাবর্তন—তার এই ইন্টেলভার্শাল ইমেজকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে এতে সন্দেহ নেই।

গত ৭৭-এর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় নবমুঠ জনতাদলের কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষ শুধুমাত্র দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া আর কোথাও এই দলের পা রাখার পর্যন্ত জায়গা থাকেনা। দলের এই অচিন্ত্যনীয় বিপর্যয়ের জন্য অধিকাংশক্ষেত্রেই দাবী করা হয় দলনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাকে—যিনি নিজেও বিশালসংখ্যক ভোটে উত্তরপ্রদেশের রায়েবেরিলীতে পরাজিত হন। কংগ্রেস দলের যথোই ছোটবড় অধিকাংশ নেতা জরুরী অবস্থার বাড়িবাড়ি, সমগ্র প্রমুখকে প্রত্যাগমন ও বেচ্ছাকারীতার অভিযোগ আনেন দলনেত্রীর বিরুদ্ধে এবং প্রায় প্রকাত্রেই বিব্রোহ ঘোষণা

করেন। কলতঃ, জাতীয় কংগ্রেস বিধিবিস্তৃত হয়ে ইন্দিরার নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) দলের জন্ম দেয়—বীর্ষ প্রায় তিনটি বছরের ব্যবধানে যে দল ৮০র মধ্যবর্তী নির্বাচনে সংসদে মোট ৩৫১টি আসন পেয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে শীর্ষস্থান দখল করে।

মাত্র ৩৪টি মাস—কিন্তু জাতীয় জীবনে অনেক ভিত্তি অভিজ্ঞতার এক গৌরব কালপরিক্রমা। জাতীয় নেতৃত্বে আসীন জনতাদলের প্রচণ্ড অন্তর্যমন, মেকী রাজনৈতিক সততা, দ্রাস্ত অর্থনৈতিক চিন্তা এবং জাতীয় সংহতি ও মর্যাদারক্ষায় নপুংসক আচার আচরণ—ধীরে ধীরে দেশকে এক অমোঘ ঋণসের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। ক্ষমতালিপ্সার কাণ্ড-জ্ঞানহীন কয়েকটি নবদস্তহীন বুদ্ধের অধিনায়কারীতাব বলি হল ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ। রাজ্যে রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠল, অধিক আর্থিক ক্ষমতা দাবীর নামে জাতীয় সংহতি-বিনাশের বড়বয় শুরু হলো, রিজার্ভ ব্যাংকের মজুত প্রায় ২৫০ কোটি টাকার সোনা ‘‘পবীক্স্মলকভাবে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হলো যার ফলে সোনার দাম তো কমলোই না বরং বহুলাংশে বাড়লো এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটলো চরমে, অপদার্থ প্রশাসন ব্যবস্থার সমগ্র দেশে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটলো—বিব্রোহ বেধে দিল কেন্দ্রীয় পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও, ক্রা-মূল্য ও বেকারি বৃদ্ধির অভিশাপে সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ হয়ে পড়লো, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে গেল। এইভাবে ২৮ মাস (বাকী অংশ ১৪ পাঠ্যে)

রাষ্ট্রপুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অঙ্কিত]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

১৯০৯ সালে আমার বিলেত ভ্রমণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাই যদিও আমার দিনটি বেশ উজ্জ্বল, তাৎপরেও আমি ভাবলাম যে এতটু বেশী নতুন হওয়ার কোন যোগ নেই।' লর্ড মিডেলটন একটি সম্মতি-সূচক হাসি হেসে আমার পিছনে হরহাটা বন্ধ করে দিলেন।

উইগসর পরিচর্য্যার পরে মিঃ এস.কুইলের কাছে ক্যাব্লেটের রেট কমানোর ব্যাপার নিয়ে এক ডেপুটিশন বের করা হল। আমি সেই ডেপুটিশনের একজন সদস্য ছিলাম। এস.কুইলের সঙ্গে লাক্সাম্বাউগে বসতি স্থাপন করা হল। কিন্তু এস.কুইল এ বিষয়ে কিছু করা সম্পর্কে কোন বকম প্রতিশ্রুতি দিলেন না। প্রেস কন্ফারেন্সের সভাসভাতে আমি যে সব অঙ্কানে যোগ দিয়েছিলাম এটাই হল তার মধ্যে শেষ অঙ্কান।

গ্রেস প্রতিনিমিষেই ইংল্যান্ডে হাওয়ার সময় আমি যে প্রতিশ্রুতি বন্ধ হয়েছিল এবং নিজের উপরে বস-ভরের ব্যাপার নিয়ে যে হারিষ ভার চাপিয়ে ছিলাম তা আমি ভুলিনি। ইংল্যান্ডে হাওয়ার প্রাকালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন আমার সম্মানে একটি সাফা পার্টি আয়োজন করেছিলেন। এই অঙ্কানে আমার সহযোগী মিঃ ইকোড'ভিসিওর আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেই সময় আমার বক্তৃতার আমি বক্তৃতা বন্ধেছিলাম যে গ্রেস কন্ফারেন্সের প্রতিনিমিষেই হিলাবে দেখানো আমার যে কতটা সম্পাদন করতে হবে, তা করে, তারপরেই বস-ভর বদ করার বিষয়টি প্রতিই আমার মনে মনেই থাকবে। অতঃপর আমি সে কাজে বসে দিলাম। কন্ফারেন্সের অত্যন্ত সভাসভা ইংল্যান্ডে তারের কাজ শেষ হয়ে গেলে ঘটনাগুলো যখন বসে দিই বসে। আমি সারা চ্যারি ক্রিটেইনকে বললাম যে এখন আমাকে

কন্ফারেন্স সম্পর্কীয় ব্যাপার থেকে ছুটি দিতে হবে। আমি ওয়াশিংটন হোটেল থেকে দিয়ে ক্রিটেইন ইমে কয়েকটি বস তাকা করবার এই ক্রিটেইন ইমে ক্রিটিসিটি আমেরিকার প্রথম কর্তৃত্ব। অবশ্য আমার এই আমেরিকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সব বসে চিঠিপত্রের মিঃ কোয়ারান্স দাশগুপ্তের সঙ্গে একত্রে হয়েছি। এখন উল্লেখ করতে চাই যে এই কোয়ারান্স-দাশগুপ্তের আমার ঘোরা ফেরার কাজে খুব প্রভাবান্বিত সাহায্য করেছেন। তিনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং এই বিশাল শহরের প্রতিটি অলি-পলি বসে তিনি রাখেন। তা ছাড়া লগুনো আমি বসে বসে লগুনো করেছি এবং বসে দেখানো গিয়েছি, তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন।

প্রথম যে অঙ্কানে আমি আমার প্রথম বক্তৃতা দিবার বক্তৃতা নিয়ে বক্তৃতা কবি পেট্রন আমার সম্মানে লগুনো অবস্থিত ডাবলীশপের একটি কমিটি কর্তৃক আয়োজিত একটি জিয়ার সভা। এই সভার চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ পার্থক। জিয়ারটি হয়েছিল গ্রেস মিঃস্টার প্যালেস হোটেলে। অতিথিদের মধ্যে অনেক পাদিনামের সভ্য উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন স্যার হেনরি কটন, মিঃ ম্যাকডোনেল এবং রায়গে ম্যাক ডোনাল্ড। এক অর্ধে এটো সমাবেশ ছিল অত্যন্ত অসুখ ঘটনা। তারপরে লগুনো অংশের লোকই এখানে উপস্থিত থেকে সেই-সেই অংশের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন প্রতিনিমিষ করেছেন। কিন্তু এটা যে কেবলমাত্র ডাবলীশপেই একটা প্রচার সভার ব্যাপার ছিল তা নয়। প্রত্যেক লগুনো এটা হয়ে উঠেছিল তারপরে ইংরেজ বক্তৃতাও একটা কন্ফারেন্স দেখানো তারা

এমন একজন ভারতীয় সেনা সৈন্যের কথা শুনেই সমবেত হয়েছেন তিনি তার প্রকৃত কালের কঠিনতম বাস্তবনৈতিক সংগ্রামে ত্রুটি ছিলেন। যেমনটি আশা করা গিয়েছিল তেমনই হল। বহুতরল ও প্রাণবন্ত আচার সংযোগীতা এবং বাহ্যি যে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছি তার প্রতি পতীরকম লক্ষ্যহীনতা ও প্রাণনাশ বনোচাষ তাহের কাছ থেকে পাওয়া গেল।

বাস্তবনৈতিক আন্দোলনের যোগাযোগের ক্ষর যে স্বয়ং নীতির প্রকাশ্য এই প্রথম যেবা শেষ তার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে প্রবণ ও সত্যকে দেখে উঠলো। বিনা বিচারে লাফা—এটা ইংরেজের কাছে একটা দৃঢ় বাণীর তা কেবলমাত্র সাধারণভাবে আটক করে রাখার চেয়ে কঠোরতার লক্ষ্য না হলেও। এমন কি লর্ড বলে তিনি স্পষ্টতই 'কলিত্রি' কণ্ঠস্বরীয়ে ঘেঁষে পরামর্শের উপর নির্ভর করে নিবাসন হও অসম্বোধন করেছিলেন, তিনিও অজ্ঞেয় পতীরে নিজের সে কাছের সমস্ত নিষ্ঠে শায়েন নি। তার নিঃসঙ্গই লেখা "রিকলেসনস্" থেকে তা জানতে পারা যায়। সাম্প্রতিক কালে যে সমস্ত স্বয়ং মুগ্ধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার উল্লেখ করে আবার বক্তৃতায় আমি স্বয়ং বললাম যে "স্বয়ং নীতির এমন হতাশাব্যাধিক নিষ্ফলতার স্বীকৃতি আর করেনও হুটনি। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথায় এমন আছে যে স্বয়ং নীতি সকল হয়েছে?" তখন এমন স্বীকৃতিও হয় যে তা প্রতিরুদ্ধিত হয়ে উঠছিল।

আবার পরে বলতে উঠলেন স্যারহেনরি কটন। তিনি বললেন, "ভারতে জাতীয়তাবোধের, বিশেষ প্রেমের ও মাতৃভূমির প্রতি পতীর সমস্ত বোধের কাগরণ যদি কোন একজন লোকের প্রচেষ্টার ফলেই বলা যায়, তাহলে সেই লোকটি হচ্ছেন বাবু মুক্তেশ নাথ ব্যানার্জি।" এর পরে বলতে গেলেন মি: কিং হাভি। ইনি ছিলেন ভারতের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। প্রথমে বিষয় তিনি অত্যন্তে পণ্যাবে চলে গেছেন। তিনি বক্তৃতা করতে উঠে বললেন, "মি: ব্যানার্জি হচ্ছেন সেই আর কয়েকজন লোকের মধ্যে একজন যার পুণ্যভিষি ফলে ব্যক্তিগতই বড় হয়ে প্রকাশ

পেয়েছে।" আর একজন ভারত বন্ধু হলেন মি: ম্যাকারনেল। তবে তাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি তার সুরকারী বলে নিঃসঙ্গের ফলে। তিনি সভার বললেন, "বক্তৃতাটি বাস্তবতার কল্যাণমুখরতক ও চাপিয়ে উঠেছে; রাষ্ট্রনীতি কিংবা স্বতই বক্তৃতা হয়েছে পানিয়ারেটের আইরিশ মেম্বর মি: গুইকট্, ম্যাকলিন ছিলেন আর একজন ভারতবন্ধু। ভারতের হিত সাধনে তার উৎসাহের অভাব কখনও হয়নি। ইনি ছিলেন সেই দাড়া লগা শেখ বক্তা। তিনি বললেন, "ভারত বানীশের ভাষা ভাল যে তাই মি: সুব্রহ্মনাথ ব্যানার্জির মত একজন মেতা পেয়েছেন। অনেক বড় বড় বক্তৃতাটি আমি শুনেছি। কিন্তু মি: ব্যানার্জির বক্তৃতার মত অল্প কোন বক্তৃতাটি এত পতীরভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করেনি। মি: ব্যানার্জি এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বড় বক্তা ও উচ্চ চারিত্রিক মানের যে চমৎকার অতি প্রকাশ্য ধৈর্যের জন্যে তাই আমার হৃদয়কে এত পতীরভাবে স্পর্শ করেছে।"

এই প্রকাশ্য ভিনারের পর একটি ব্রেকফাস্ট ও বেগলা হয়েছিল। তার আরোহণ করেছিলেন তার উইলিয়াম ওয়েজার বান। এই ব্রেকফাস্টে তিনি পানিয়ারেটের বড় সহস্রকে ও ভারতের উন্নতি বিষয়ে আগ্রহী আরও অনেককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আর আমরা স্যার ওয়েজার বার্ষিকে হারিয়েছি। মি: আলেন হিউব, স্যার ফেরি কটন এবং স্যার উইলিয়াম ওয়েজার বান—এই তিনের জুটি ছিলেন ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। এদের চারিইে আমরা অপুণ্ডারীভাবে কতিগ্রহ হয়েছি। আর আমরা যে লংট কালের কথা দিয়ে চলেছি তাতে তাদের পরামর্শ আশাশের কাছে মহামূল্যবান বলে মনেচিত হত। শিক্ত ভারতীয়ের মনের উপর অল্প কোন ইংরেজই এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ আর কেহই ভারতের প্রতি এত পতীর ভালবাসা ভারতের উন্নতির কাণ্ডে এতখানি নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন নি। যে জায়গায় তারা ভালবেসেছিলেন, যে জায়গায় তারা নিজেদের বেশ করে নিয়েছিলেন সেই ভারতের বাঁধে আত্মবাসিনে মতোই ছিল তাদের জীবন। একশের বড় বান সফরে ইতিহাস

মনে নেবা হবে তখন যাগা 'মহোৎসব' প্রম ও চৈত্রীযাত্রা ভাংয়ের প্রতিবাদ উচিত। কল্লার অবশ্যম্ভাব্যেই চৈত্রীর মধ্যে এতের কর্ম-দলী প'রমানে উক্ত ৭ সম্ভাবনমূলক আসন দিতে হবে। আমাদের প্রধান ব্যক্তিত্বের প্রতি মন্বিরে এটি উৎসাহ পুঙ্খপূর্ণ আশাযের প্রদুববর্তী ভবিষ্যৎ বংশবংশের জন্য ও সম্রাটের দ্বারা বৈজ্ঞানিক থাকবেন। আজ যদি তাই বৈজ্ঞানিক থাকতেন তাহলে বর্তমানে যে বিজ্ঞান আশাযের বিজ্ঞান করে বিজ্ঞান বিজ্ঞানী শিবিবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার উপরে বড় প্রজা ও লক্ষ্যমণের প্রজাটই না তারা 'বিত্ত' করতেন। বাক, সে বেধ করে কোন লাভ নেই।

নতুন একটা ব্যবস্থা যে পৌরট চাপু বহুত বাচ্ছে তার আভাস দ্যার উইলিয়াম ওয়েভার দান ত্রিকট পেয়েছিলেন। শের পরিপত্তির দিকে অগ্রসরমান জীবন শঙ্কাকে যে প্রজ্ঞে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তার আর্থিক সাফল্য লক্ষ্যের পক্ষ তত্ত্ব তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন। ১৯১৭ সালের ১০শে আগস্টের ঘোষণা বাণীর কথা তিনি শুনে গিয়েছেন। সেই ঘোষণা বাণীতে ছিল ভাষ্যে লিখিতবলী সহকার্য পক্ষের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র ঘোষণা বাণীর কথাটাই শুনে গিয়েছেন। কারণ যি: বৈজ্ঞানিক যখন ভাষ্যের দিকে হওয়া হওয়াই উৎসাহ করেছিলেন তার একটু পক্ষেই তিনি দ্বারাযান।

দ্যার উইলিয়াম ওয়েভার বার্ষিক নামের প্রতি যে বোধ আছে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সক্ষম যে ভাষ্যবাসী অধিকতর আছে তাতে তার সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজ্যতা তাইয আশা বা বলতে দ্বিধালাভ, তা থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে এসে পড়েছি। দ্যার উইলিয়াম ওয়েভার বার্ষিক মেওয়া বৈজ্ঞানিক অস্থানটি যুবক বাধ্যবদ্ধিত হয়েছিল। পানিয়ারেটের এ্যাংলো-ইউজিয়ান মহলাঘের মধ্যে আবার যখন বর তিনিই ছিলেন লক্ষ্যের প্রত্যাবাসী ব্যক্তি। তার সহ এবং আত্মবিশ্বাস আভাস-আভাসের মধ্যে ছিল একটা বহুত দৃঢ়তা; তার উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল একটা বহুত আত্মবিশ্বাস; আর ছিল যুবতীর আত্ম-প্রত্যাবাসের প্রবল শক্তি। এই সহ কিছুই শুনে ছিল তার ভাষ্যের প্রেম ও ভাষ্যবাসী

এটি ভাষ্যবাসী এবং ভাষ্যের সম্ভাব্যবলী সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান। তাই তিনি যা বলতেন তার চাপ ছিল অপ্রতিরোধ্য।

বৈজ্ঞানিকের এর সমাবেশটা বেশ দীর্ঘায়ান হয়েছিল। পানিয়ারেটের অনেক দলদ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে স্বপ্নান্ত: ল্যার চার্লস ছিলেন এবং যি: দ্যাবশেষ ব্যাকভোগ্য ও উপস্থিত ছিলেন। আদ্যকে অবতাই সেখানে কিছু বসতে চলেছে। একটা কথা আদ্যকে বাক্যের করতেই হচ্ছে যে আমি কখনও ইংরেজের প্রভাবমূল (আমার মনে হয় এটা ইংরেজবাসী দেশলক্ষ্যেরই প্রভা) ভাষ্য-সভার বক্তৃতা করার বাজে নিচ্ছে পাপ বাইয়ে নিতে পারিনি। আদ্যের ভাষ্যভাষ্যে যখন কোন ভাষ্যে নিম্নস্থিত হয়, তখন সেখানে আদ্যের হাই থেতে এবং সেখানে যাবের সঙ্গে বেশী সাফল্য হয় তাইযের সঙ্গে বহুতপূর্ণ আলোচনা-আলোচনা ও প্রেম প্রম করতে। হাওয়াটাই সেখানে বড় কথা, প্রেম প্রমটা আত্মবিশ্বাস দীর্ঘ ব্যাপার দ্বারা। কিন্তু ইংরেজের কোন অস্থানে যদি ভাষ্যের ব্যাপার বাক্য তাহলে সেখানে তাইযের টিতি তত্ত্বকটা তির ধরেবে। সেখানে হাওয়াটাই বিনিময়ই হচ্ছে দ্বারা ব্যাপার, ভাষ্যকটা প্রেম। ফলে এই হয়, তিনিই যৌক আর লাভটই হোক, যাবের সেখানে বক্তৃতা করতে হয় তাইযের ভাষ্যকটা একেবারে মাটি হয়ে যায়। অদ্যে চিত্তা থাকে তখন তারা বক্তৃতা কী বলবেন তার মধ্যে নিবন্ধ: জিন্যের আদ্যক আর থাকে না। কোন প্রজা: দ্বাসীর কাছে এই সহব অস্থানের দ্বারাটাই তাই এই তাইযেই হয়। পক্ষে এই আত্মীয় বক্তৃতাযি যে প্রয়োজন আছে যে বিজ্ঞান আমার কোন দল্যেই নেই। লক্ষ্যে যাবের জোখ লক্ষ্যে যদি বক্তৃতা নেই বাবে তাহলে সেই জোখ লক্ষ্যের তৌলুপ ও পৌর সম্পর্ক অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। এ কেবল ব্যক্তিগত জাবে আমি। কাছে যখনটা যখন হয়েছে, তাই বললাম। কারণ আদ্যকে এই সহ জোখ লক্ষ্যের বক্তৃতা করতে হওয়া ভাষ্য-সভার পূর্ণ আদ্য উপভোগ্যে তা ব্যাপার পূর্ণ করেছে। এ কথা যেন কেউ যেন না করেন যে বক্তৃতা

শাসন ও স্বাধীনতা

চার

॥ সুবোধ কলকাতা ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এটা ঠিক যে আমাদের বিবেক যদি রাষ্ট্রীয় আইনকে যেনে নিতে পারে নিজের আইন বলে ডাকলে সুর্তে ঘিটে যার শাসন ও স্বাধীনতার স্বত্বস্বাধীন। কিন্তু সেটা সম্ভব হতে পারে না যদি রাষ্ট্রীয় আইন না হয় বিবেক-সম্মত। রাষ্ট্রীয় আইন কিছু আর যিনি প্রকৃত নয়। বাহুবলী হয় রাষ্ট্রের পরিচালক, প্রণয়ন করে আইন। সে-বাহুবলী যদি বিবেকবান না হয় তাহলে তাহের প্রণীত আইনও হতে পারে না বিবেক সম্মত। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্তব্যবোধ যদি ঐকান্তিক সামান্যবোধের অবিকারী না হয়, তাহা যদি জন-স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম না হয়, তাহলে কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই তাহের বাঁচত আইনকে যেনে নিতে পারেন না নিজের আইন বলে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ভারতের রাষ্ট্রীয় আইন—স্বাধিবাণিক বা প্রশাসনিক, কোনোটাই নয় বিবেকসম্মত। কিছু কিছু বিধান তাৎ মতো আছে বিবেকসম্মত কিন্তু বিবেক-বিরোধী বিধানগুলি বাধ করে দেয় তাহের কার্যকারিতাকে। যেমন, ভারতের সংবিধানে একটা বিধান ছিল ১৯৩২ সনের মধ্যে ভারতের সকল অধিবাসীকে সাক্ষর করে তুলতে হবে। পরে সংবিধান পরিবর্তন করা হয় ১৯৩৭ সনের মধ্যে সাক্ষর শেখ করতে হবেই। কিন্তু অসম্পূর্ণ পুণ্ড্র সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভব নয় এবং দৃষ্টান্ত: কোনো বাধ্য না ব্যক্তি ১৯৩৬-১৯৩৭ সনের মধ্যে আমাদের লোকসভা সাক্ষর করে তুলে নিতে পারেন অথচ অধিবাসীকেও না। এর কারণ, আমাদের দেশের সকল রাষ্ট্রীয় নেতারা ইচ্ছেন পান্ডিত্য-বিশিষ্ট ও শাসনবিদগণ। ফলে তারা স্বাক্ষরকর বিধানগুলিকে অসম্পূর্ণ করে যার কারণে বিবেক-বিরোধী অসম্পূর্ণ আইনগুলোরো। স্বাধীনতার স্বাধীনতার নামে তারা বিশেষ থেকে অসম্পূর্ণ

পুণ্ডর ও অসামান্যিক যদি স্বাধীনতা করে এবং অসম্পূর্ণ। বিশেষী ভিত্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিশেষে ছাত্র পাঠ্যের পশুপাক্য টাকা সুর্তের ফেলেন, তাই বেকাজী করতে পারেননি অসম্পূর্ণ। বঙ্গলোকের গার পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। তারা পূর্ণ ভালভাবেই জানেন পরীক্ষা ফেলেরা লেখাপড়া শিখলে তাহের সঙ্গে কর্তব্যক্ষেত্রে এঁতে উঠতে পারবে না স্বাধীনতার। পরীক্ষার ফেলেরা বিশেষে যেতে পারবে না তাই স্বাধীনতা বিশেষী সার্টিফিকেটকে বেনী করত ফেলেরা হয় দেশী প্রকৃত সার্টিফিকেটের চেয়ে।

এই হচ্ছে আমাদের দেশের গার ও অসম্পূর্ণ সব অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র নেতাদের অনাজ্ঞা ও কাঙ্ক্ষা। সুখে তারা নিজেদের পুঙ্খবাহী, সমাজবাহী, জাতীয়তাবাহী হাই বলুন না কেন, কারণ: তারা সকলেই হচ্ছেন টাইলরবাহী। তাই এখানে ক্যান্টিনেট, ক্যান্টিনেট, সবারই ক্যান্টিনেট মূলত: এক—সুখে পরীক্ষার বন্ধ হও অথবা কাকে ধনীরে ধরত হও। তারা এঁরা না করে পারেন না, কারণ তাহের সকল কথের পরম লক্ষ্যই হচ্ছে সমাজের বেনী বর্তমান ব্যক্তিগত ইচ্ছারূপ। এই জীবনসম্পন্ন ১৯৩৬-৩৭ সনে তাহের বাধ্য করেছিল ভারতের গার-বিশ্বাসকে বাধ করে ধনীর সিংহাসন কার্যে করতে।

এখানে আগের পূর্ণ-বিশ্বাসের সম্মতীয় হয়েছে ভারত। বিশ্ববাস-বিশিষ্ট ও জ্ঞাত এনিমি ফেলেরা এক বৈদ্যবিশ্ব-সামাজিক বৈদ্যবিশ্ব-গার-বিশ্ববাসের দিকে। এই অসম্পূর্ণ পূর্ণ লক্ষ্যে আগের উদ্দেশ্য করা হচ্ছে সে-তথ্য বা পূর্ণ-বিশ্ব-প্রবর্তনীয় বাধ্যমে বাধ করে অসম্পূর্ণ হয়েছে এই 'বাসী বাধ্যতা' পৃষ্ঠার। সমস্ত বিবেক অসম্পূর্ণ থেকে

স্বকীয় কঠোর হলে অবশ্যই সুশিক্ষিত পটভেদ হবে লাগন ও স্বাধীনতার মধ্যে। এতদ্ব্যতীত রাজনীতিক, অর্থনীতিক, প্রয়োজনীয়, জীবননীতিক, সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতি সকল দিক বিচার করে দেখে শুধু বাংলা পরিচালিত হওয়া উচিত তা হচ্ছে এরকম :—

(১) জড়বাদী জীবন চর্চন মানবজাতিকে অসংযত পন্থিক নিয়ম চলেতে আত্মহত্যার দিকে।

(২) জড়বাদ দ্বিভেদে পারে না কোনো বস্তু প্রয়োজনীয় বাস্তুয়ক পাবে না সুখী সমাজজীবন স্থাপন করতে।

(৩) বস্তু প্রয়োজনীয় উদ্ভূত হতে পারে শুধু স্বা-মানবের সামর্থ্যের থেকে। মানব জাতির বর্তমান আত্ম-হীন প্রবণতা প্রতিরোধ করতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান-ভিত্তিক সাম্যবাদ। শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক আদর্শবাদই দ্বিভেদে পারে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ আর বস্তু সর্ব প্রয়োজনীয়।

(৪) সাম্যবাদ হচ্ছে সমষ্টিবাদ বা কম্যুনিজম্ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাম্য চাড়াও সমষ্টিবাদ পড়ে ওঠে তার মধ্যে সাম্যবাদ কম্মি নিতে পারে। কিন্তু জড়বাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমষ্টিবাদ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় কম্মিজম্ হতে।

(৫) কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই ক্যাপিটেলিজম্ আর কম্যুনিজম্‌র মধ্যে, অর্থাৎ পুঁজিবাদ আর সমষ্টিবাদের মধ্যে, কারণ উভয়ের মূলেই রয়েছে জড়বাদ। উভয় মতবাদই বাস্তব সমাজকে নিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে। কিন্তু আদর্শবাদ-ভিত্তিক বৈদ্যুতিক সাম্যবাদ তাকে নিয়ে যায় আনন্দময় পরিপূর্ণতার দিকে।

(৬) পুঁজিবাদের মধ্যে রয়েছে যেমন আত্মত্ব ভেদনি লব্ধিবাদ বা কম্যুনিজম্‌র মধ্যেও রয়েছে আত্মত্ব। অর্থনীতিক দিক থেকে যেমন, তেমনি আবার সামাজিক দিক থেকেও কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই কম্যুনিজম্ আর ক্যাপিটেলিজম্‌র মধ্যে। যে কারণে পুঁজিবাদী ব্রিটেন চেরেভিল তারককে তার অধীনে রাখতে চিক সে কারণেই সমষ্টিবাদী রাশিয়া চেরেভিল চীনকে তার অধীনে রাখতে। সর্বোপরি, পুঁজিবাদ ও সমষ্টিবাদ উভয়েই সমাজকে জড়বাদের সমর্থক ও সাম্যবাদের

(৭) মূল কথা হচ্ছে—জড়বাদ, না আদর্শবাদ? পুঁজিবাদ বা সমষ্টিবাদ মূল কথা নয়। জড়বাদ চার উৎপাদন আর প্রাপ্যন পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক করে থাকি-স্বাধীনতা: আর ব্যক্তি আত্মতারও বর্ষ করতে। আদর্শবাদ চার উৎপাদন আর প্রাপ্যন পদ্ধতিকে বহু-কেন্দ্রিক করে ব্যক্তি স্বাধীনতা আর ব্যক্তি আত্মতারকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

(৮) যেসকল হোক আর অসিদ্ধায হোক, জড়বাদীরা সকল কর্মে পরিচালিত হই কতকগুলো মূল বিধান দ্বারা। সে বিধানগুলো হচ্ছে :—(১) আত্মবোধের প্রাপ্য-অসিদ্ধ সব কিছু সৃষ্ট হই ইঞ্জিরগ্রাফ জড়পদার্থ থেকে। যন্ত্রের ইচ্ছা আবেগ আশা লক্ষ্য সব কিছুই নিষ্কৃতি হয় জড় পরিবেশ দ্বারা। (২) জীবন যাত্রার পরচরন লক্ষ্য হচ্ছে বসন্তকাল বেগী ব্যক্তিগত বর্তমান উদ্ভেদ মূল উপভোগ করা। যন্ত্রের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ওক। এই পক্ষ উদ্ভির ব্যতীত আর কিছু নেই বা যাত্রা আত্মতা বহির্বিষয়ে জানতে পারি। যেমন যাত্রা আত্মতা সম্মুখিতক জানি সেটা হচ্ছে যন্ত্রিক। (৩) চেতন প্রয়োজনীয় বসে নেই কিছু। সত্যতা, নরলতা সেই প্রেম লব্ধ সমাহৃত উৎসাহতা পরোপকারিতা সমাজসেবা সাম্যবোধ প্রভৃতি নৈতিক বোধগুলির শেষ লক্ষ্য হচ্ছে নিজের চম্ভিরত্ব লাভ, অতএব একলোর কোনো দ্বিগ্ধি বা পরিবর্তন নেই। যদি এগুলো সত্যি বা স্বাধী হতো তাহলে পক্ষ ইঞ্জির দ্বারা একলোকে জানা যেত। কিন্তু তা জানা যায় না।

এই তত্ত্বগুলো পর্যালোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারি :—(১) কেন কোনো যন্ত্রিই তার আন্তরিক সন্ধিষ্ঠা থাকে সবেও সামাজিক সাম্য বা লব্ধ-কল্যাণ-প্রাপ্য এগিয়ে আনতে পারে না। (২) একান্ত অসিদ্ধা থাকে সবেও কেন কোনো দেশের জন-কল্যাণমূলক কোন বিপ্লবকে যন্ত্রিষ্টা সমর্থন না করে প্রতি-বিপ্লবী পন্থিক লগ্নে বোপ দেয়। (৩) বিধান বুদ্ধিবাদ জীবনোপ-প্রেরণিক যন্ত্রিষ্টাও কেন ব্যর্থ হয়েছিলেন ১৯৪৭

বিভাগ সম্বন্ধ করতে এবং ১৬ই আগস্ট উৎসাহিত সুবাদে
বিশ্ব হত্যা দিবসে আগ্রহ গ্রহণ করতে। (৭) কেন
কোনো মৌলিক বিভেদ থাকে না জড়বায়ু প্রভাবিত
পুঁজিবাদী সরকার আর মার্কসবাদী সরকারের মধ্যে।
(৪) কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে সাম্যবাদ আর মার্কসবাদের
প্রিয়োদিতাটা। (৫) কেন আমাদের দেশের মার্কসবাদী
বা গান্ধীবাদী কেউ পারেন না সাম্যবাদী সরকার গঠন
করতে এবং বিবেক-সম্মত রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করতে।

এখানে জড়বাদী সরকার ও আদর্শবাদী সরকার এ-
প্রতি ব্যবস্থার উপর সবচেয়ে কিছু বাংলাদেশের একান্ত প্রয়ো-
জন। আদর্শবাদীর মতে হচ্ছে জনগণকে বঙ্গোপস্রব ক্রম
নিয়ন্ত্রণ করে বঙ্গোপস্রব বেনী স্বাধীনতা দেওয়া। জড়
বাদীর মতে হচ্ছে বঙ্গোপস্রব বেনী শাসন করে বঙ্গোপস্রব
কম স্বাধীনতা দেওয়া। আদর্শবাদী শাসক ও তার
কর্মচারীরা মনে করে ভবিষ্যতের চরম লক্ষ হচ্ছে আনন্দ,
আর আনন্দ উদ্ভূত হয় স্বাধীন-প্রেম থেকে। প্রত্যেক
মানুষকে নিজের আনন্দ লাভের জন্যই হতে হবে কর্তব্যনিষ্ঠ,
নিরামায়াবৃত্তী, সমগ্রামৃত্তী, আত্মনাশক, সৎ ও সাধু। কেউ
জানি হবে না দুঃখ নিয়ে বা কান্নে কান্না না গিয়ে। কেউ
সেতকা বা কান্নে পারলেও এবং শান্তি বা দুর্ভিক্ষের ভয় না
থাকলেও জানি হবে না। আনন্দলাভের জন্য নিজের
ইজ্জত হুম পরিহার করেও পরোক্ষভাবে আত্মনিয়োগ করবে
[জানি]।

অপর পক্ষে জড়বাদী শাসক ও কর্মচারীরা মনে করে :-
জীবনের চরম লক্ষ হচ্ছে যে আনন্দ তা উদ্ভূত হয়
ইজ্জতম্ব থেকে। এই ইজ্জতম্ব হারানোর ভয়ে ভয়ের
হতে হবে নিরামায়াবৃত্তী, সমগ্রামৃত্তী, কর্তব্যনিষ্ঠ, আইনাশক,
সৎ ও সাধু। যদি শান্তির ভয় না থাকে তাহলে ভয়
দুঃখ নিয়ে ও কান্নে কান্না দিয়ে ইজ্জতম্ব বৃদ্ধির চেষ্টা
অসম্ভবই করবে। কোনো কারণেই ইজ্জতম্ব পরিহার
করবে না তারা। এই দার্শনিক ভাবগুলো পাকিস্তানে
ও হিন্দুস্তানের বাস্তবায়িত হচ্ছে আত্মকাল। জ্যোতিবাবু
ও নূরেন চক্ৰবর্তী একান্ত সজ্জিব ধাক্কা দেবেও জনকল্যাণ-
ের পক্ষে এগিয়ে পড়েন না কিছুতেই। মার্কসবাদী
সরকারী কর্মচারীরা চায় বঙ্গোপস্রব কম কাল করে বঙ্গোপস্রব

বেনী অর্থ উপার্জন করতে। স্বাধীনতার আদেশ অস্বীকার
করেও কান্নে কান্না দেবে তারা। হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা
চালীশের অগ্রগতি করেছে বঙ্গোপস্রব বস্তুরে এল বঙ্গো
কর্তব্যনিষ্ঠ করতে, কিন্তু অমিতকাল পরেই বাক্য করে
ছিলেন সে-অগ্রগতি প্রত্যাহার করতে। পাকিস্তানের
সুধাময়ী বাস্তবতা করেছে বিন্দুবা উৎসাহিত কাছকে
সম্মত করার, কিন্তু মার্কসবাদী কর্মীদের চাপে অমিতকাল
পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন সে-বাস্তবতা বাস্তব করতে। মার্কস-
বাদী কর্মচারীরা ইজ্জতম্বের পক্ষে বা আনন্দম্বের পক্ষে
কোনো বিদ্য লক্ষ করতে পারেন না, সেতকাটা কর্তে
বিশ্ব হতেছিলেন সুধাময়ীরা।

মার্কস ও লেনিন ছিলেন বাস্তববাদী বা বৈজ্ঞানিক
আদর্শবাদী। 'কিন্তু ইজ্জতম্বের চলনার প্রলোভন
জীবের অনেক চেষ্টা করে পড়েন জড়বাদী। জীবেরই
পরে মার্কসবাদ আর তৎপারিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক
বুদ্ধিগমি এত চাওয়াবলে। চাওয়াবলের ধর্ম হচ্ছে
কান্নে উল্লেখ করে চাওয়া পেতেন বাস্তব হওয়া,
স্বাধীনতা উল্লেখ করে পোষকের পেটেরে বাস্তব হওয়া,
এক স্বত্বকে উল্লেখ করে উল্লাসের পেটেরে বাস্তব হওয়া।
তাই তারা আত্মকাল দেয়া থাকে মার্কসবাদীরা প্রবোধ
চেয়ে বেনী চার পেটমকে, উপযোগিতার চেয়ে বেনী চার
উপকরণকে। এর দ্বারা যে তারা বুদ্ধিগমি পোষকের
সংগে দরবোধিতা করতে তাঁও বোকা সম্ভব নয় ভাবের
পক্ষে। মার্কসবাদী হেডইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিদ্বন্দ্বি
তোটি তোটি টাকার ভাতীর সম্পদ বিনষ্ট করে, লক্ষ লক্ষ
কিলোমিটার ভ্রমের অশ্রু করে, এক অকারণে সারাদিন
বিদ্রোহালা জাগিয়ে রেখে দলারুদ্ধি ও দুর্ভিক্ষভিত্তে
সাতোকা করছে। এর ফলে দ্বিভিত্তি আরও দ্বিভিত্তি হচ্ছে,
দনী আরও দনী হচ্ছে এবং কিন্তু মার্কসবাদী নতুন
বুদ্ধিগমির সঙ্গি হচ্ছে।

অতএব শাসন ও স্বাধীনতার মধ্যে বঙ্গোপস্রব
কান্না হয়ে পড়েছে অতিশয় জটিল। বৈজ্ঞানিক
সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জনগণকে মুক্ত করতে
(যাকি অংশ ১৩ পাতায়)

ভায়াত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ কীর্ত্তন পদ ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মামলা শেষ হওয়ার আগে এ ধরনের কিছু না করা হইত।' একত্র বিপ্লবীরা অপেক্ষা করাই স্থির করলেন। কিন্তু মামলা যেদিন শেষ হল সেদিন রাত্রিতেই সবাইকে পোহাটী জেল থেকে স্থানান্তরিত করা হল। তারাপ্রসন্নবাবু এবং প্রভাসবাবুকে পাঠানো হল কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে। নলিনীবাবু এবং মনীন্দ্রবাবুকে পাঠানো হল আলীপুর সেনাইল জেলে। নরেন বানার্জীর বিরুদ্ধে বেনারস বড়োয় মামলা চলছিল। তাকে বিচারার্থী আসামী করে সেখানে পাঠানো হল। মামলা সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত ততটা মনে করা গিয়েছিল ততটা হয়নি। বিপ্লবীদের কাছে ছিল মশার পিতুল একটা মাত্র। ভায়া ১৮০ বোর পিতুলে মশার পিতুলের কার্ত্ত্বক ভাবে গুলী করেছিল। কিন্তু মামলার ব্যাপ্তির হালদারের জেবার সরকারী বিশেষজ্ঞ নিজেই স্বীকার করেন যে, মশার পিতুলের গুলী অল্প পিতুলে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ফলে একমাত্র নলিনী ঘোষই ৮ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তারাপ্রসন্নবাবু ও নরেন বানার্জীর দণ্ড হয় ৫ বৎসর এবং মনীন্দ্র বাবু ও প্রভাস লাহিড়ী ও ২০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ডের পরে তারা ঐ দিনই স্থানান্তরিত হওয়ার আর পালানোর প্রয়োজন হয় নাই। সম্ভবতঃ অল্প দণ্ড বলে পালানোর প্রয়োজনও বিপ্লবীরা অনুভব করেন নাই।

এর প্রায় ৬ মাস পরের ঘটনা। ১৯১৮ সালের

জুন মাস। অনুদীলন সমিতির বিশিষ্ট নেতা কেদারেশ্বর সেন তখন ঢাকায়। ১০২ বাতা মতে এক বৎসর জামিন মুচলেকার সময় সবেমাত্র শেষ হয়েছে। নতুন করে কোথায় গিয়ে কাজ আরম্ভ করবেন সেই কথা ভাবছেন। বাহা নিকটে থাকেন মাঝে মাঝে এসে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করেন, নির্দেশ নিয়ে যান। এই ধরনের পরামর্শের জন্য বাহা আসতেন তাঁদের কথা তারিনী রজুদার একজন।

বিপ্লবী আহত মূর্খ অধস্থার হাসপাতালে শাখিত। জীবনের আশা তার নাই সে ত জানে। পুলিশ সূতাকালীন জবানবন্দী চাইছে। পুলিশ জানতে চাইছে—সে কে তার নাম কি, এবং বাড়ী কোথায় ?

কিন্তু বিপ্লবী অসচ্ছ যত্ননা সন্তোষ সূতুর জন্য অপেক্ষা করে আছে। সাধারণ লোক এই সূতুর মুখে ধাড়িয়ে আত্মগোপন করতে পারে না, সে জানিয়ে যেতে চায় দেশের জন্য দেশের জন্য, জাতির জন্যই সে সূতায়ন করেছে। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী শুধু শহীদ নয়, সে সাধকও, সে আত্মজয়ী বীর। তাই মরণের ঘরে দাড়িয়েও সে আরও চায় না Unwept, Unhonoured, Unsung চলে যেতে তার কিছু মাত্র দুঃখ নাই। তাই মরণোদ্বগ্ন বিপ্লবীর একমাত্র উত্তর—“Don't disturb me. Let me die peacefully.

১৯১৮ সালের জুন মাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রায়

শেষ হয়ে এসেছে। অনশীলন সমিতির ফ্রন্ট বিপ্লবী মোহাতি সংগ্রামের পরে কেবল অবস্থার চাকার এসে আগ্রহ নিয়েছে। পুলিশী ধমনীতির সঙ্গে লড়াই করে রাস্তা তাঁরা। এঁদের মধ্যে এক জনের নাম জািলী মজুমদার ও মজুমদার নলিনী বাগচী, চাকার কলতা বাজারে গোপন প্রাঙ্গণে তাঁরা অবস্থান করতেন।

এর আগে ১৯১৭ সালের কথা। সরকারী নিষেধণ তখন চরমে উঠেছে। বিপ্লবীরা দ্বলেন, পুলিশের অবস্থান তাদের পক্ষে নিরাশ নয়, তাই তাঁরা বাংলা ভাঙ্গ করে মোহাতির পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। দলের নেতা নলিনী ঘোষ, অজ্ঞাত বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন উত্তর পাড়ার অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজসাহার প্রভাস লাহিড়ী, নলিনী বাগচী, প্রবোধ দাসগুপ্ত মনীন্দ্র রায়, সতীশ পাকড়াশী। গভীর রাতিতে কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনার কেবল গয়েদারের নেতৃত্বে এক দল পুলিশ গিয়ে বিপ্লবীদের আবাস ঘিরে ফেললো। বাইরে থেকে সাহেবী কণ্ঠ শোনা গেল—'open the door' বিপ্লবীরাও মউদার পিতল নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। দলনেতা নলিনী বাবু প্রজ্ঞাস্তর দিলেন—'Enter and be killed.' দুই মলে গুলী বর্ষণ চলল, বিপ্লবীরা প্রতিবোধ করবে, একজ্ঞ সাহেব প্রস্তুত ছিলেন না। কিছুক্ষণ গুলী বিনিময়ের পরে তিনি সদলে সরে পড়লেন। এই অবসরে বিপ্লবীরাও আগ্রহ ভাঙ্গ করে বেরিয়ে এলেন। বিপ্লবীরা সকলেই আহত। পুলিশ পক্ষেও ৩০ জন আহত হয়েছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য পার্বত্য পথে বেশীদূর যেতে না যেতেই পুলিশ ও সামরিক বাহিনী অধিকতর সংখ্যায় এসে আবার তাদের ঘিরে ফেলল, আহত অবস্থায়

প্রবোধ দাসগুপ্ত সংগ্রাম করত করত পুলিশ বেল্টের ভেদ করে হেঁটে শীর্ষস্থান পরে বিহারে এসে উপস্থিত হলেন। বিহার থেকে কলকাতার এলে প্রবোধ দাসগুপ্ত প্রেপ্তার হলেন। এবং নলিনী বসন্ত রোগে অসুস্থ হয়ে সতীশ পাকড়াশীর আগ্রহে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন। সতীশ বাবুও হাঁটা পথে এর আগেই কলকাতা এসেছিলেন। নলিনী কিছুদিন পরে ঢাকা দিয়ে তারিণীর সঙ্গে মিলিত হলেন। মজুমদার এবং অর্ধাঙ্গ কোথায় কি আছে নলিনী ঘোষ মাঝলার উকিল জিহ চাটাজী ও ব্যারিষ্টার এস এন রায় মারকু তা জানালে তারিণী একদিন এসে তা দলের সর্বোপরি নেতা কেশবচন্দ্র সেনকে জানিয়ে গেলেন।

সংঘর্ষের দিন অন্যান্য দিনের মতই তারিণী ঘোষ শেষ রাতিতে উঠে ব্যায়াম করছিলেন। সঙ্গী হরিচৈতন্য তখনও নিদ্রিত। নলিনীও উঠে হাত মুখ ধুয়ে শায়ামের জ্ঞত প্রস্তুত হচ্ছিলেন, হরিচৈতন্য ছিলেন সমিতির গৃহী সদস্য। তার নামেই বাড়ী ভাড়া লওয়া হয়েছিল, তার বাড়ী ছিল বরিশাল জেলার সৈলা গ্রামে, ঢাকাতে তিনি সিংগার কোম্পানীতে চাকুরী করতেন। তিনি পুলিশের সহিত সংঘর্ষে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই, শুধুও তিনি ৭ বৎসর কারাবাসেও দণ্ডিত হয়েছিলেন। (চলবে)

(১১ পাতার পরে অব্য)

হবে চালাক থেকে। মজুমদার মানব-সমাজকে নিয়ে চলেছে সামরিক আধারননের দিকে। একদিকে সে নাগরিক অধিনিতি বৈধতাও আগ্রহ বেধে পড়কে কোর্সের দিকে, অন্য দিকে তার সাম্যবোধকে চেষ্টা রেখে চলেছে বৈধতা একই করে তুলতে। বৈধতাধারন (বৈধতা) দ্বিধা বা দ্বাধা বলতে, সভ্যকে সভ্য বলেছে, অসভ্যকে সভ্যকে তাই বলেছে, কিন্তু মজুমদার-প্রচারিত মার্কস-

(৪ পাতার পরের অংশ)

আত্মত্যাগের পর বণ্ড বিগণ জনতা সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে যে চরণ সিং মন্ত্রীসভা একটি নড়বড়ে সংখ্যালঘু সরকার গঠন করলো—জাতীয়তাবাদের তারাও কোন ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচি নিতে পারলো না—বরং দেশকে আরও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে এগিয়ে দিলো। মোরারজী সরকার অস্তুত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার লড়াই করতো, পরবর্তী চরণসিং নেতৃত্বাধীন লোকসল-কংগ্রেস (আর্ম) কোতালিশন সরকারের সে ভূমিকাটুকুও হইলো না—বরং গ্রামা কলংকদের প্রতিনিধি স্থানীয় নেতা হিসাবে এট সরকারের প্রধান চরণজী, সাধারণ জমজীবী মানুষের দাবীর চেয়ে অর্থবান কৃষামীদের সার্বিক সহায়তাও দিকেই অধিকতর নজর দিলেন—যার অনিবার্ণ প্রতিকলন ঘটলো কেন্দ্রীয় বাজেটেও।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশের শতকরা ৫৫ ভাগ লোক নিরক্ষর, শতকরা ৭০ ভাগ দারিদ্রাসীমার নীচে বাস করে—এসব অর্থনৈতিক সমীক্ষা। কিন্তু মানসিক সমীক্ষায় ও ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের মধ্যে একটি অস্তুতগত মিল পাওয়া যাবে—যেটি হলো তাঁদের সহজ বিচার বিপ্লবেদের ক্ষমতা। ভারতবর্ষের অজগ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশেও যে সামান্ত জমজীবী মানুষটি বহির্জগতের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কবিহীন অবস্থায় তাঁর কর্মব্যস্ত দিন গুলি কাটান তাঁকে জিজ্ঞেস করুন—আর মিলিয়ে নিন বছরের কোন ওরাকিবহাল মানুষের বক্তব্যের সঙ্গে; রাজনৈতিক প্রণে তাঁরা মোটামুটি ভাবে একমত হবেন। জাতীয় স্বার্থরক্ষার চিন্তায় তাঁরা একই মননের অঙ্গসারী হবেন। কারণ অসংখ্য কর্মকাণ্ড, নৈরাস্ত বেসনাবিক্ষোভের মধ্যেও ভারতের আপামর জনসাধারণের

মন্য দিয়ে আবহমানকাল ধরে ক্ষমতাপ্রার্থন বয়ে যাচ্ছে এক অনিবার্ণ অস্তুততার প্রোত—তা হল তাঁদের সাম্প্রতিক দমেশভাবনা। দেশরক্ষার সংগ্রামে জাতীয় স্বার্থের অঙ্গকলে তাঁদের সিদ্ধান্ত তাই সর্বশেষেই সমর্থবাহী।

এই অস্থূলীন অস্তুততাই বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ৮০-র নির্বাচনে ত্রিমতী ইন্দিরার মার্কলো। বস্তুতঃ পক্ষে এ জয় ইন্দিরার জয় নয়, এ জয় ভারতের জনগণের জয়, তাঁদের দেশপ্রেম ও জাতিস্বাধীনতার জয়, আশা আকাজ্জব জয়। ক্ষত্র ও সংস্কার স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করে তারা জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রণে একমত হলেন, একমত হলেন কেন্দ্রে একটি স্থায়ী ও নির্ভরশীল সরকার গড়ার আশু প্রয়োজনকে সামনে রেখে। তু' বছর দশ মাসের অস্থূলীন অনিশ্চয়তার ও শৃঙ্খলাহীনতার ফলপ্রতিভে তাঁরা এই বিশাল দেশের সার্বিক দায়দায়িত্ব অর্পণ করলেন ত্রিমতী ইন্দিরারই হাতে—তাকে স্বৈরতন্ত্রী বলা হতোছিল, 'গণতন্ত্রের হত্যাকারী আখ্যায় কৃত্ত করা হয়েছিল।

ত্রিমতী ইন্দিরার এই ঐতিহাসিক বিক্রমকে বিশ্বের প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ অভিনন্দন জানিয়েছেন, ভারতবর্ষের ছোট-বড় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ-নেতৃবর্গও তাঁর গৌরবময় প্রস্তাববর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট দল ও বা সি. পি. এম দলের নেতৃগণ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলেছেন 'ইন্দিরার জয়ে গণতন্ত্র আবার বিপন্ন হতে চলেছে'। আমাদের সর্বিনের জিজ্ঞাসা—মার্কসবাদ অনুসারে গণতন্ত্রের সার্বিক সংজ্ঞা কি? বামফ্রন্ট নেতৃবর্গ গণতন্ত্র কি গণতন্ত্র অর্থে দেশের সংহতি-বিনষ্টিকে বোঝেন?—

মাসামে, মেম্বলরে বার সূচনা হয়েছে— তাঁরা
 গণতন্ত্র অর্থে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী স্বৈরাচারী
 স্বার্থকল্পনাকে সমর্থন করেন। যে গণতান্ত্রিক
 অধিকার হুমুসকারীদের অজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতা
 নয়, দেশের মানুষকে চরম গরিব ও নিরাপত্তা-
 যীনতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে, জাতীয় উন্নয়ন
 কর্মসূচীকে প্রতিপদে বাস্তব করে—অর্থনীতিকে
 ধ্বংস করে এবং সমগ্র দেশে সংহতি ইীনতার বিধ
 পন করে—সে গণতন্ত্রের বিপরীত হওয়াটাই উচিত
 জাতীয় স্বার্থে সাধারণ মানুষের স্বার্থে ইন্দিরা গান্ধী
 ও তাঁর দল জনগণের সমর্থনেই বিপুল সংখ্যা-
 গরিষ্ঠতা লাভ করেছেন—তাই তাঁর জয়কে হের
 হবার অর্থ ভারতের জনগণকেই অপমান করা,
 তাঁদের গণতান্ত্রিক চিন্তা ও অধিকারে হস্তক্ষেপ
 করা। গণতন্ত্রের প্রজ্ঞাবাণি কোনো রাজনৈতিক
 দলের পক্ষে একপাশে মনোভাব পোষণ নিঃসন্দেহে
 অসম্ভব। বিশেষতঃ '৭২ সালে চিকমগালুর
 উপনির্বাচনে বিজয়ী ইন্দিরা গান্ধীর লোকসভা-
 দলপদে বাতিলে যে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অঙ্গসংগঠনের
 দলে জনতা দল আদ্য নিঃশেষে মুছে গেল, জন-
 শৈলীর স্বায়ত্ত্বকে উপেক্ষা করার সেই অমোঘ পরিণতির
 প্রত্যক্ষ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট নেতৃবর্গকে অরণে
 পাশে অঙ্গরোধ করি।

'৭৭ থেকে '৭২, '৮০—দীর্ঘ দিন: বছরের হস্ত
 চালপত্রিকার স্রীমতী গান্ধী অনেক দেখেছেন,

চিনেছেন, ভেদেছেন। তাঁর পৌরস্বয় প্রজ্ঞাবাণির
 পেছনে এত অমূল্য অভিজ্ঞতার অনেক অবদান
 আছে। কর্মশিল্পের পর কর্মশিল্প, সংবাদপত্রের
 নির্লজ্জ আক্রমণ, কাছাকাছি, একাধিক মনো। কলংক
 এমনকি প্রাণনাশের প্রচেষ্টাও তাঁকে নিরুত্তর করে
 পারেনি, কারণ বার বার তিনি জনগণের কথা
 বলেছেন, বারংবার পৌঁছেছেন জনতার দরবারে।
 যেখানেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, মানুষ কষ্ট
 পেয়েছে বেলচীতে, নদীয়ায়, হাফিজাবাদে—সেখানেই
 পৌঁছেছেন তিনি স্রীমতী অম্বাসের মতো, মায়ের
 মতো ও ধোমের মতো। ভারতের সাধারণ
 মানুষ—শ্রেণী-ক্যাটাগরি, বৃত্তি-মাধ্যম—সেই মানুষ
 ইন্দিরাকে চেয়েছে, যাঁর কাছে নিজেকে ছোট
 ছোট আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, প্রেম-স্বপ্নের কথা
 বলা যায়—অনেক উদ্ভুক্ত করা যায় নিঃসন্দেহে।
 রাজনৈতিক অসুযোগীরা নয়, বরং শ্রমপতিরা নয়,
 কোন বৈদেশিক সহায়তা নয়—ইন্দিরার প্রধান
 শক্তি ভারতবর্ষের এই আপামর জনসাধারণ, তাঁদের
 অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। জনগণের এই আশীর্বাদকে
 মনন করেই ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে
 চলছেন জাতীয় উন্নয়নের পথে নব নব কর্মসূচীর
 রথে সওয়ার হয়ে। স্বামীজী, মহাত্মাজী, নেতাজী
 নেহেরুজী, মহানায়ক রাসবিহারী, মাতীবরা, কুদিরাম
 ও অসংখ্য শতীদের গর্বের, অপ্রের, আশা আকাঙ্ক্ষার
 ভারতবর্ষ নবীন নিঃসন্দেহ পাবে স্রীমতী গান্ধীর
 বলিষ্ঠ নেতৃত্বে—এই প্রার্থনা করি।

✽

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

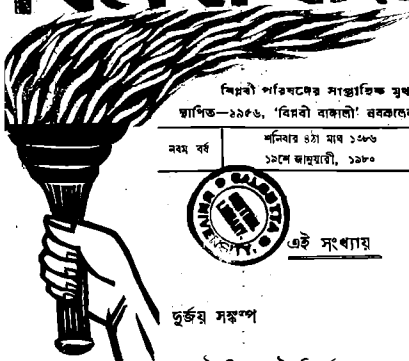
৩

সত্যাত্মক পড়ানো—

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—CALCUTTA			
Acharjee Kshitish Chandra	45B/1B Moore Avenue Cal-40	200	22 2 74
Bhattacharjee Saileswar	4 Harisava Lane, Behala Calcutta-60	200	29 1 74
Biswas Priya Nath	18 Golap Susti Lane, Cal. 14	200	17 4 78
Chakraborty Shyam Mohan	30/C Sreemohan Lane, Cal. 26	200	1 4 78
Chowdhury Sukumar	226 R. N. Tagore Rd. Cal. 50	200	1 1 75
Dasgupta Satyendra (alias Benu)	1 Crooked Lane, Cal. 69	200	2 6 79
Kar Smt. Kalpana	c/o Kariswar Nandy Roy	200	22 6 79
w/o Late Nalin Kanta Kar	18 Nainaupara Lane, Baranagar		
„ Smt. Nani Bala	2/63 Naktala Govt. Scheme	100	18 7 79
w/o Late Narendra Kar	Calcutta 47		
Krishna Smt. Elizabeth	1 Madan Street Flat 6, 2nd Floor	100	3 9 73
w/o Late P. A. Krishna	Calcutta 13		
Mazumdar Jyotishchandra	117 Acharya Jagadish Bose Rd.	500	1 10 78
(Ex-Andaman Political Prisoner)	Calcutta 14		
Pal Smt. Gita Rani	6A Kebal Krishna Sur Street	200	28 7 7
w/o Late Krishnadas Pal	Calcutta 5		
Roy Amar Kumar	54 Chakraberia North, Cal. 20	200	14 4 74
Roy Monimohan	281 1 B B. Chatterjee Rd. Calcutta 42	Restoration of suspended pension	
Roy Santimoy (alias Bradyoot)	52 Garfa Main Rd. Cal. 75	200	2 6 72
Sen Priya Ranjan	15 Nilgong Road Calcutta 56	Restoration of pension previously suspended on allegation of higher Income.	
Sen Gupta R. K.	160 Jodhpur Park, Cal. 68	200	1 5 74
Dist—BURDWAN			
Roy Sureshchandra	P. O. & Vill Purbaaswali	Enhancement Rs. 200/- from 15 8 72, instead of 28 9 73	
Chakraborty Subhasini	Vill Dhenua P.O. Galatia	100	15 8 79
w/o Late Bibhuti Bhuvan	Via Mantirwar.		

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণপত্র

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাকালী' সবকাশ্যে—১৯৭৯

নবম বর্ষ	শনিবার ৪ঠা মার্চ ১৯৮৬ ১৯শে জামুয়াবী, ১৯৮০	১৭ সংখ্যা
----------	---	-----------



এই সংখ্যায়

দুর্জয় সঙ্কল্প

রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

চিঠিপত্র

“জীনে এক অথও অঙ্ককার
ঘর; যেখানে আলো প্রবেশ
করলে প্রতিটি কোণ আলো-
বৃত্ত হইয়া উঠিতে বাধ্য।”

—নেতাজী

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—BANKURA			
Dutta Smt Debala w/o Late Gour Mohan Dutta	P. O. & Vill Sarenga	100	19 5 79
Das Smt Dhaneswari w/o Late Nitai Pada Das	P. O. Dubrajpur	150	30 1 79
Dist—24 PARGANAS			
Bose Smt Saraji Bala w/o Monoranjan	L/o Bramhapur Govt. Colony P. O. Baedroni	100	17 5 72
Chakraborty Surendranath	L/O Tinkori Ghosh Tarapukur South P. O. Agarpara	200	20 9 73
Ghosh Smt Milanmala w/o Late Atalchandra Ghosh	H. N. 821/1 Ashokenagar	200	20 6 79
Mukherjee Gokuleswar Smt Renuka w/o Late Jitendranath	223/8 Ashokenagar (Restoration of suspended pension) Barendragali P. O. Halisahar (Previously of Chakparer Colony Howrah Dist.)	150	21 6 72
Roy Smt Nandarani w/o Late Tarini Roy	G. Bose Colony P. O. Baruipur (Enhancement)	150	1 10 76
Roy Smt Sachi Rani w/o Late Biren Roy	Vill Puñandarpur P. O. Baruipur	150	24 6 79
Sen Jatindra Chandra	P. O. Nonachandanpur 182A Mathpara Barrackpur	200	12 6 78
Dist—WEST DINAJPUR			
Dey Sarker Birendralal	Vill Kurthapare, P. S. Balurghat	200	Restoration of suspended pension
Dist—JALPAIGURI			
Chakraborty Dharendra Ex-Andaman Political Prisoner	Vill Gharghoria P. O. Gharghoriahat	200/- to 500/-	Enhancement
Dist—COOCH BEHAR			
Basu Smt Saroj Bala w/o Late Nareish Basu	Cooch Behar Town	100	12 12 78
Dist—MIDNAPUR			
Mahapatra Smt Gouri Rani w/o Late Jibankrishna Daulalaparra	Vill Kalyanpur P. O. Khar	200	12 2 71
Ghosh Smt Sudha Rani w/o Nafar Chandra Ghosh	Vill Paharipur P. O. Midnapur	100	31 7 79
Jana Priya Nath	P. O. & Vill Putputia Via Moyna	200	1 10 76
Mondal Kumari Indubala d/o Smt Phuli Mondal	P. O. & Vill Gokulpur (till marriage)	100	19 12 74
Mondal Kamala Kanta	Vill Sarbaria P. O. Madhyabtingli	200	15 8 72
Pradhan Smt Sushila Bala w/o Late Umapada Pradhan		100	5 7 79
Patnaik Nirapada	Vill Garb Kamalpur P. O. Mohishadal	200	15 8 72
Sahoo Kedar Nath	Vill Patna, P. O. Aiyava		

হুজুয় সফল

ভারতবর্ষের সপ্তম লোকসভা নির্বাচনের কাজ সমাধা হয়েছে। নির্বাচনের আগে সংবাদপত্রের বিশেষজ্ঞরা রাজনীতিবিদরা নানা প্রকার ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। তারা সকলেই বলেছিলেন যে কংগ্রেস (আই) বড় জোর দুই লাখ আসন পেতে পারেন। কেউ কেউ অবশ্য এ কথাও বলেছিলেন যে ইন্দিরা কংগ্রেসের আসন সংখ্যা তার থেকেও অনেক কম হবে। অবশ্য এসব কথা হস্তত্ব বলেছিলেন নিজ নিজ দল বা গোষ্ঠির মনোবল অনুসারে। তারা একথাও বলেছিলেন যে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। একবার মধ্যে তাদের দলীয় আর্থসিদ্ধি ঘটতে সুবিধা হবে, এই মানসিকতা কাজ করেছিল নিশ্চিতভাবে। কিন্তু ফলাফলের চিত্রটি বখন পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল যে এরা সকলেই এক চক্ষু হরিণের মত সর্পির্ষ দৃষ্টি নিয়ে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছিলেন। ভারতবর্ষের জনগণের বৃত্তিমত্তা ও প্রয়োজন অনুসারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতাকে অত্যন্ত ছোট করে দেখেছিলেন। এই সব বিচ্ছিন্নদেরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই চমকপ্রদ ঘটনার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারছেন না। অধিকন্তু নিজেদের মনগড়া বৃত্তি খাড়া করে নিজেদের মুখ বন্ধ করতে সচেষ্ট। কেউ কেউ অর্ধাচারের মত ভারতবর্ষের কেটী মানুষের মত দানকে স্বীতিমত্ত অপমানিত করেছেন। বলেছেন তাদের মতদানের ফলশ্রুতি হবে স্বৈরতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের সমূহ বিপদ। কোন বিশেষ দল যদি শেষের কোন অংশে ভোটার তালিকায় কারুচুপি করে, তালা ভাঙ্গা ব্যালোট বাস্তবের ভোট গণনা করে এবং আরো নানা রকমের সম্মেলজনক কাজ করে। ভোট বেশী পায়, তবে সেটাই হবে গণতন্ত্র এবং অস্ত্র কোন বিশেষ দলকে সমস্ত ভিত্তিক বিচার বিবেচনা করে যদি কেউ ভোট দেয়, তবে সেটা হবে স্বৈরতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক, এমন সব উক্তিকে যদি কেউ প্রলাপোক্তি বলে মনে করে, তবে কি খুব ভুল করা হবে ?

এই নির্বাচনের ফলাফল সমীক্ষা করলে দেখা বাবে যে কতকগুলি কারণ এর পেছনে কাজ করেছে। প্রথমেই একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতবর্ষের ভোটারদের বোকা দিয়ে। বোকা বানিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কনুদা ভোলা আর সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় এবং এখানকার মানুষ সমস্ত সমস্তার বিচার বিবেচনা করেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সমর্থ। হুজুয়ের কথা অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী এই সত্যকে উপলব্ধি করতে চাননি বা পারেন নি। বিদ্যত সাধারণ নির্বাচনের পর জনসভা গঠন করে যারা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা শোচনীয় ভাবে কার্য হয়েছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দলবাজী তাদের নৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ব্যক্তিগত আকোশ ও জিবাংসা প্রযুক্তি তাদের এতই উন্নত করে তুলেছিল যে সেই একমাত্র অশকর্মই তারা তাদের সমস্ত শক্তি ও মনোবোপ নির্যোগ করেছিল। দেশ ও দেশের কথা তারা বেমাণুম বিশ্বস্ত হয়েছিল। নিজেদের অধোপাতারও ভুবি হুরি প্রমাণ তারা রেখেছিল জনগণের সামনে। শেষ পর্যন্ত দেশে প্রশাসন ব্যবস্থার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এই অবস্থার মধ্যে কোন

দেশ বাঁচতেই পারে না। দেশের উন্নতির কথা শুনেই না। তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বাজেট কাঁচমান বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়, আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, আকাশচুম্বী অভাবভুক্ত জব্বা সামগ্রীর মূল্য, দেশকে অন্ধকারের অভয়ভূমে নিয়ে বাচ্ছিল। অতি সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অশনি সংকেত দেশের মানুষকে বিনিত্র করে তুলেছিল। তাই তারা চেয়েছিলেন একটি স্থিতিশীল, সাহসী, প্রশাসন দক্ষ মানুষকে পুনরায় ক্ষমতার আসনে বসাতে। এই বিচার বিশ্লেষণ কোন ক্রমেই নৈতিবাচক নয়, বীতিমত 'ইতিবাচক' ও উদ্বেগ ভিত্তিক। হেরে যেয়ে তারা একে নীতিবাচক মতদান বলে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের বিচার শক্তি, বোধশক্তি, রাজনৈতিক দূরদর্শিতাকে ছোট্ট করে দেখাতে চাচ্ছেন, তাদের মানুষ করুণা করতে পারে কিছু কোন হাতেই তাদের অভিযন্তাকে কাপাকড়ি মূল্য দিতে পারে না। এই অভিযন্ত পোষণ করে যদি কেউ মূর্খের স্বর্ণে হাস করতে চান সেটা আলাদা কথা। গণতান্ত্রিক দেশে মূর্খেরাও নিশ্চয়ই বসবাস করতে পারেন, তাদের সে স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আছে। সর্বোপরি একটি সত্যকে আজ অস্বীকার করবে না কোন চিন্তাশীল মানুষ। ইতিহাসে দেখা যায় যে অনেক সময় কোন দেশে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পট পরিবর্তনের অঙ্গুলি হলেও, তাকে ঠিক সময়ে ঠিকভাবে নেতৃত্ব দেবার মত নেতা না থাকলে সব ব্যর্থ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে এই দেশে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। দেশের লোক তাই তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেনি। শ্রীমতী গান্ধীর প্রশাসনিক দক্ষতা, সতর্কমোচনে দীক্ষা; বিপদকালে হুজুঁর সাহসকে তারা স্বীকৃতি দান করেছে। তারা নিশ্চয়ই ভরসা করেছে যে দেশের এই ছদ্মবেশে নেতৃত্ব দেবার শ্রীমতী গান্ধীই যোগ্যতম ব্যক্তি। তারা হয়ত একথাও মনে করেছে যে তার উপর যোর অবিচার করা হয়েছে। জনমত যে তাঁর পিছনে সর্বতোভাবে আছে, এটাই তারা প্রমাণ করেছে তাঁর পক্ষে তিন চতুর্থাংশ সদস্যকে নির্বাচিত করে। এর ফলে মতলববান্ধ রাজনীতিবিদরা হতাশ হতে পারেন, তবে জনমতের অবমূল্যায়ন নির্লজ্জ ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না।

ভারতবর্ষের জনমত অচ্ছেদ্য মত কারো স্তাবকতা করে না। তারা প্রয়োজনবোধে, নেতাদের উপরে টেনে তোলে, আবার দরকারমত তাদের টেনে নামাতে দ্বিধা করেনা। এক্ষত তাদের সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য।

শ্রীমতী গান্ধী ও তার দলের পক্ষে এটা শিষ্কারীয়। অতীতের ভুলত্রাস্তিকে সশোধন করে, নিষাদ শোধন, চরিত্রকল, আদর্শনিষ্ঠা, জ্ঞান ও সেবাজনকে মূলধন করে তাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, দেশের মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে উপনীত হবার হুজুঁর সঞ্চয় নিয়ে। চলার পথটা কুন্দমার্জিত নয় জানি। তবু যদি গণ করে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হন, সে 'গণ রাবেই হবে।' বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নেত্রী ও দলের নতুন নতুন জীবনে যে শ্রবণ এসেছে, তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, বহু শহীদেব ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরে ধ্যানের ভারতবর্ষ গড়ে তুলবেন। এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

চিঠিপত্র—

সম্পাদক মহাশয়

সমীপে—

বিদ্যুৎ বাণী

৪নং, বঙ্গভাস ট্রাষ্ট,

কলিকাতা-৭

১। আমি একজন বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আপনাদের পত্রিকার গ্রাহক। আমার বিজ্ঞাপন নাই বৃদ্ধিও নাই লেখাপড়াও জানিনা। বর্তমান নির্বাচন সময়ে ২।১টি কথা আপনাদের পত্রিকামারফত নির্বাচন কমিশনার দিল্লিকে জানাইতে চাই। পশ্চিমবঙ্গে জাল ভোট হয়েছে এবং আমার বাড়ীতে বাধা দিয়া ভোট দিতে দেয় নাই আমার পাড়াতে আমি প্রমাণ করিতে পারিব যে সমস্ত লোক বহু বৎসর এখানে থাকে না তাদের ভোটগুলি ভোট ব্যাল্পে পড়েছে তাই দিল্লির নির্বাচন কমিশনার এ ব্যাপারে তদন্ত করে পশ্চিমবঙ্গে পুনঃ নির্বাচন করিতে অগ্রবোধ জানাচ্ছি।

২। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের ইতিহাসে কেন পৃথিবীর কোন ইতিহাসে নাই—এই বিপুল ভাবে পুনঃ নির্বাচিত হয়। একমাত্র তিনিই ইতিহাসে চিরবরণীয় থাকিবেন এবং ভারতে ৫৭ কোটি লোকের দায়দায়িত্ব গ্রহণ ৫০ কোটি লোক সমর্থন করেছেন এই জয়ের পরও প্রমোদবাবু, জ্যোতিবাবু বৈরতন্য বলে দেশ বিপন্ন বলে প্রচার চালাচ্ছেন। আমি আপনাদের পত্রিকা মারফৎ বৈরতন্য অর্থ কি জানিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম।

ইতি—

প্রিন্স চন্দ্রবদা

কলিকাতা-৫৭।

রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন

শ্রীঃশীখর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরাজী তাঁর প্রার্থীর সাক্ষর রাখলেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিম, সারা ভারতে ইন্দিরা জটিকা প্রবল বেগে অস্বাভাবিক রাজনৈতিক দলগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধরাশায়ী হল। একমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম. দল ক্ষমতাসীন বলেই কি এখানে ইন্দিরাজীর পক্ষাভাব জন সমর্থন অপেক্ষাকৃত কম? না তা কখনই নয় এবং একথা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ বেশ ভাল ভাবেই লক্ষ্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেবেছে কি সীমাহীন ধোঁকাখোঁড় গলদ ছিল প্রাথমিক ভোটার তালিকা এবং পরবর্তী কালে সেই তুলে ভরা ভোটার তালিকাই শেষ ও সংশোধিত তালিকা বলেই সরকার তার বিশ্বাসভাজন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের পরামর্শে ও ব্যৱস্থাপনায় তা চালু করেছে এই নির্বাচনকে প্রেক্ষানে পরিণত করে।

প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার সাধারণ মানুষ বিস্ময়কর হলেও ফাইনাল ভোটার লিষ্ট দেখে, কারণ আসল অধিবাসীরা বাদ পড়েছে হাজারে হাজারে, আর নতুন নাম এই তালিকার প্রকাশ করা হয়েছে বারো সেই এলাকার অধিবাসীই নয় কোন কালে। এই অভিনব কার্যকারী ভৈরী করা ভোটার তালিকা প্রতিষ্ঠা এলাকার মূল নিয়ন্ত্রণকর মানুষের চরম বিরক্তি উপাধন করে একদিকে এক অজদিকে তারা এতই ক্ষুব্ধ হয় যে রাগে দৃশ্য তারা ভোট বিজ্ঞে যায় নি।

এদের সংখ্যা নিহাত মগনা ছিল না। প্রশ্ন হতে পারে যে তবে এত ভোট পড়ল কি ভাবে? এর জবাব খুবই সহজ কারণ তারা ভোটের দিন বিভিন্ন পোলিং স্টেশন ঘুরে দেখেছেন তাদের বক্তব্য হ'ল যে পনের বোল বছর থেকে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে ও ছেলেরা সি, পি, এম দলের ব্যাজ পরে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে বাত্রে বাত্রে ভোট দিয়েছে। প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টরা এই অস্বাভাবিক দল অপত্তি জানালে পোলিং অফিসাররা বা প্রিসাইডিং অফিসাররা সেই সব আপত্তি মানেন নি, অপর পক্ষে এই সব নাবালকদের তারা ভোট দিতে দিয়েছেন।

এই ঘটনার ফলে বহু এলাকার সংঘর্ষের সূচনা হয়, পুলিশী হস্তক্ষেপে তা সাময়িকভাবে শান্ত হয় বটে তবে পোলিংয়ের বাইরে এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্বেগজনক সৃষ্টি হয় আর ভোটাররা মন্থন করে যে সবই গড়াপেটা ব্যাপার, ভোট এখানে অন্য দলকে দিলেই বিশদ ঘটবে। একজন প্রবীণ ও পণ্ডিত ব্যক্তি মন্তব্য করেন যে এবারে ইন্দিরা ফের প্রধান মন্ত্রী হবে এবং একথা কেউ না জানলেও মানুষ জিগাশ জানে, তাই প্রমোদ-জ্যোতিষকে সে পরামর্শ দিয়েছে হলে বলে কৌশলে যেমন করবেই হোক পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কড়কে তিনিত করে দিতে। তার ধারণা নির্বাচন পর্বেই শুরু শেষ পর্যন্ত।

সি, পি, এম যত রকমে পারে জাল-জুয়াচুরি করে ভোটারের ভোটা কড়কে আর নির্বাচনের দিনে

তিনি আজ দেখছেন যে তার ধারণাই ঠিক। তিনি সম্মতও ভোটারদের সমর্থন করে বলেন “ভোটের ব্যয় খুললেই আপনারা জানতে পারবেন যে ইন্দিরা কংগ্রেস জিতছে, পশ্চিম বাংলার বাইরে সব রাজ্যেই কারণ যেসব রাজ্যে ভোট হচ্ছে অবাধ, মুঠু ও নিরপেক্ষ, কেবল পশ্চিমবাংলায় দেখতে পাবেন সি পি, এম অর্থাৎ বামফ্রন্ট জিতছে কারণ বামফ্রন্ট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচনকে দলীয় লোকদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিত ছিল। একটু খোলাখুলি ভাবে বলতে হলে বলতে হয় যে বেকারভাতা প্রাপ্ত ছেলেরা ও সি, পি, এম কাডাররাই ভোটের তালিকা তৈরী করার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল, কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরাই সরকারী কর্মচারী বলেই নির্বাচনী ব্যবস্থার সর্বস্তরে নিযুক্ত ছিল।

ভোটের তালিকায় যে তুল দেখা গিয়াছিল তা কেঙ্কাকৃত ও উদ্বেগ প্রণোদিত বলে দেখা গেছে। ভোটপত্র গণনা করবে এ কোঅর্ডিনেশন কমিটির টাইরা বাবা জেলা শাসক ও মহম্মদ শাসকের এখন প্রভু, সি, পি, এম দলের দৌলতে। কাজেই পশ্চিমবাংলার নিরপেক্ষ ভোট নয়—সি, পি, এম দলের ইচ্ছাই ফলবতী হবে। যদি পশ্চিমবাংলার স্বাধীন দলবদ্ধ ভাবে সি, পি, এমের এই চালক্রিয় বোকাবোলা করতে পারতো ভোটের আগেই এবং স্তম্ভ প্রদর্শনের সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে ভোটের ব্যবস্থা গ্রহণ করতো তবেই এখানে কংগ্রেস (ই) নিশ্চয় জিতে যেত, কিন্তু তা হয় নি দেখা যাচ্ছে।

এখন দেখছি ভোটলানে জালিয়াতি হচ্ছে, পরে গণপার দিন দেখবেন আপনারা যে, পুতুর চুরি চলছে।

ইন্দিরা কংগ্রেস কিছুতেই এখানে জিততে পারবে না, কারণ এরাভো যে বন্ধক সেই ভকত।

অবাধ, মুঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যদি এখানে হত তবে এরাভোও কংগ্রেস (ই) প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ইন্দিরার হাত আরো শক্ত করতে পারতো কিন্তু সি, পি, এম তার বাঁচার তালিদে মরীয়া হয়ে এ রাজ্যে নির্বাচনকে সুপরিষ্কারে উপায়ে দলীয় কাজে লাগিয়েছে যা সভ্যই নির্দীয় ও সংবিধান বহির্ভূত গুরুতর অপরাধ। শাসকদল যদি নির্বাচনকে দলীয় আত্মবাহ কোরে তোলে এবং এর মাধ্যমে কনরা আকড়ে ধাক্কাতে চায় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একান্ত ভাবে করণীয় কাজ হবে এই রাজ্যে নির্বাচন ব্যবস্থায় যে সব দুর্নীতি দেখা গেছে তার তদন্ত করা ও যোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া যাতে ভবিষ্যতে কোন শাসক দলই যেন নির্বাচনকে তাদের দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির কাজে না লাগাতে পারে। এ রাজ্যে গণতন্ত্রের সমাধি দিয়েছে সি, পি, এম তার দলীয় স্বার্থ পূরণের নেশায় যা ভোট গণনার সময়ে প্রকাশ হয়ে পড়বেই বলে বিশ্বাস রাখি। ভ্রমলোক যা বলেছিলেন ভোটের দিনে, তা সভ্যে পরিণত হলো ভোট গোণার দিনে। কি অপূর্ণ দুরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ তিনি আজ হাড়ে হাড়ে হাড়ে তা বুঝছে। ওনার কথা বর্ষে বর্ষে সভ্য হবে তা আগে বোঝা যায় নি। এ রাজ্যে নির্বাচন বহুত করাই বোধ হয় যুক্তি সম্মত কাজ হতো। সি, পি, এম জন মানসের সমক্ষে এত হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে যে কেউই আর সি, পি, এম দলের জয়ে উল্লসিত নয়, বরং সবাই এদের মুবেশহীন চেহারা দেখে রণায় মুগ্ধ বাঁকাবে।

পশ্চিমবঙ্গে এমন কোন নির্বাচনী এলাকা খুঁজে বার করা যাবে না যেখানে লক্ষাধিক জাল লোকের জাল ভোট তালিকাভুক্ত ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত করলেই এ সভ্য প্রকাশ পাবে। চূড়ান্ত

ভোটার তালিকা খুলে যে তালিকা চূড়ান্ত ভাবে
এবার চাপা হবেছিল কো-অর্ডিনেশন কমিটির
লোকজনদের তত্ত্বাবধানে তা হলে ভয়া শুধু নয়, তা
জাল নাম ভর্তি ও একই লোকের নাম বিভিন্ন
এলাকার দেখা গেছে বলে জনৈক সরকারী আমল।
মন্তব্য করার তাকে ভৎসনা করা করতে হয়। তিনি
কোন দলের লোক নন ও নিরপেক্ষ তাই এই
ভৎসনা। তদন্ত কমিশন বসলেই নিশ্চিত ভাবে
প্রমাণ হবে যে কো-অর্ডিনেশন কমিটিতন্ত্র সরকারী
কর্মচারীরাই নির্বাচনী কার্যের প্রধান প্রধান দায়িত্বে
ছিলেন এবং তারা সি, পি, এম সরকারের মন
হুগিয়ে নিজেদের আখের গুহিবে নেবার মতলবে এ
রাজ্যে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে বলে
সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের মূলে
যে সত্য নিহিত আছে তা অগ্রাহ্য করা যাবে না।
জনস্বার্থেই এ রাজ্যে পুনরায় সংশোধিত ভোটার
তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত
প্রয়োজন।

ভোটার তালিকার নবিত্বজনক জাল লোকের নাম
বাদ পড়লে ও আসল লোকের নাম তালিকাভুক্ত হলে
দেখা যাবে তালিকা অনেক ছোট আকার ধারণ
করবে কারণ এই ক্ষীণ তালিকার অনেক উদ্দেশ্য
প্রণোদিত কারসাজী আছে সি, পি, এম দল স্বার্থে
যা ধরা পড়ে যাবে নিরপেক্ষ মানুষের তত্ত্বাবধানে।
সেই সংশোধিত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে পুনরায়
এখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেখা যাবে সি, পি,
এম জন সমর্থন হারিয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে।
কি এর কারণ এর হতে পারে। জবাব বড়ই
সোজা। অপ্রতিভ জনসমর্থন কোন রাজনৈতিক
বরাবর পায় না আর তা ছাড়া ক্ষমতাসীন দল
সরকার চালাতে গিয়ে কোন না কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ

হয়। সে ব্যর্থতার মানস সরকারী দলকে নুবে
আসলে দিতেই হয়।

সি, পি, এম বিদ্যৎ ঘাটতির অল্প জন চক্ষে দেব
হয়ে গেছে। সি, পি, এম বাক চাফুড়ী অনেক
বেশিরেও জনমনে তার ভাবমূর্তি তুলে ধরতে ব্যর্থ
হয়েছে।

দলের মানুষ সি পি এম এর কাছে অনেক
সুযোগ সুবিধা পেলেও সাধারণে বঞ্চিত
হয়েছে। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বহু মানুষ সি পি
এম দলের কর্মীদের অকথা অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ও
বিস্কৃত। তারা সি পি এম কে শাসন ক্ষমতা থেকে
ইটাতে বহুশক্তিকর। সি পি এম লোকসভা নির্বাচনে
জরী হয়েও এমন মনমরা কেন?

বোধহয় হয় হীন পন্থার জরী হওয়ার ব্যাপারটা
জনগণ জেনেগেছে বলেই সি পি এম বেশ চিন্তায়িত
দেখা যায়। সংবাদ পত্র যে ভাবে দিনের পর দিন
ব্যাটবায়ের ও ব্যালট পেপারের রসদন রহস্যের
কথা প্রতিনিরত প্রচার করছে সত্যের ভিত্তিতে,
তাতে সি পি এম দলের কুলের কথা জনগণ জেনে
বাচ্ছে। মিথ্যা চালাকি দিয়ে আর কতদিন মানুষকে
ভুলিয়ে রাখা যায়? সব কিছু এমন নয় ভাবে প্রকাশ
হবে পড়েছে যে কারো জানতে বাকী নেই সি পি
এম দলের কুলের কথা জনগণ জেনে বাচ্ছে। মিথ্যা
চালাকি দিয়ে আর কতদিন মানুষকে ভুলিয়ে রাখা
যায়? সব কিছু এমন নয় ভাবে প্রকাশ হবে পড়েছে
যে কারো জানতে বাকী নেই সি পি এম কি উপায়ে
পশ্চিমবঙ্গে এত বেশী ভোট পায়। সি পি এম
দলের পায়ে তলার মাটি এবার কলমান পশ্চিম
বঙ্গেও, আর সে কথা জ্যোতিবাবু জানেন।

সাধারণে অবাক, বিস্ময় হতবব, তারা ভাবতেই
পারে না কি করে সি পি এম লোকসভার এত

সেইটো পায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে রাজ্যে তাদের প্রকৃত জনপ্রিয়তা কবিত্ব প্রতিনিয়ত। মাহুকের মন এখানে এত উত্তেজিত ও বিরক্ত যে তারা চায় সি পি এম দলের হাত থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা কেড়ে নিক তা না নিলে এরা আত্মা ক্ষতি করে দিতে পারে। সেদিন জনৈক সাংবাদিক মন্তব্য করেন কেন্দ্রে যখন ইন্দিরাজীর্ষ নেতৃত্বে স্থায়ী সরকার গঠিত হবে, তখনই এ রাজ্যে শান্তি ফিরে আসবে, তার আগে নয়।

সুদূর ইন্দিরা পাক্ষীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাজেই এ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পুনরায় ফিরে আসবে বলে ধরে নেওয়া যায়। সি পি এম গত ঘটকারী হোক না কেন, ইন্দিরাজীর্ষকে ওরা দারুণ ভয় করে কারণ ওরা জানে যে শ্রীমতী গান্ধী ওদের নাজিনক্ষত্র সবই জানেন, আর শাসন বন্ধু কি ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরতে হয় তাও তিনি জানেন।

সি পি এম এখন আর রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা আসারের মিথ্যা বায়না তুলতে সাহস পাবে না। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পক্ষপাত লোকে চুষে তা কারোই অজানা নেই এবং নির্বাচন কমিশনার এম, এল, সাকসের খুবই চিত্তিত এদের এই পক্ষপাত ছুঁই নির্বাচনী কৌশলের সংবাদে যা প্রতিদিনই আংশিক ভাবে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সত্যের হুতারে আগুড় দেওয়া হচ্ছে কঠিন কাজ, তাই সভা প্রকাশ হচ্ছে ধীরে ধীরে। মাহু কুর্বে কেলছে যে পঃ বাংলার নির্বাচন কি নোয়া রাজ্য ও কত নোয়া জাবে সম্পন্ন হল, কাজেই এর কলাকল যে মিথ্যার

ওপর গঠিত তার মূল্য নিতান্ত নগণ্য।

সারা ভারতে ইন্দিরাজীর্ষের জয় জয়কার, কেবল এ রাজ্যে প্রার ব্যতিক্রম এবং কেন যে তা সম্ভব হল, সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে একমাত্র জ্যোতি বাবু। জ্যোতিবাবু ইতিপূর্বে বরানগরে হেরে গিয়ে রিগিং কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন ১৯৭২ সালে, কিন্তু বরানগরে আর ঠাড়াতে সাহস করেন নি তারপর থেকে। জ্যোতিবাবু এই লোকসভা নির্বাচনকে এবার কি আখ্যায় কবিত্ব করেন তা জানতে লোকে আগ্রহান্বিত। সি পি এম দল নির্বাচনে জিতেও কেন মুক মধির জানতে ইচ্ছা হয়। বোধ হয় ইন্দিরাজীর্ষকে ওরা এমনই আতঙ্কিত যে মুখে বা সরে না আর। সদা সম্বন্ধিত এখন সি পি এম দলের চাইরা কারণ কেন্দ্রে যে স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার গঠিত হল এখন, সে সরকার কন্যার দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারে টাকা ও ধাক্কার বখাষহ হিসাব নেবে অতি সবার এবং হিসাবের কার্যচূপি যদি কোথাও থাকে তাও ধরে ফেলবে।

মহা কাপরে পাড়ছে সি পি এম কারণ বাম ফ্রন্টের অস্ত্রাস্ত্র শরিক দলের লোকসভা বাঁচার ভাগিদে কোথায় কি গলদ আছে তা ধরিয়ে দেবে অবশ্য যদি একরূপ থাকে। ইন্দিরাজীর্ষ আইন ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য রাজ্য সরকারের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করবেন। অবশ্য লকআউট বা ব্লাইক তিনি বরদাস্ত করবেন না জাতীয় স্বার্থে। সি পি এম দলের ত্রমিক সংস্থা দিটুর দলবাজী ও কথায় কথায় বিনা কারণে ধর্ষণটো তিনি বরদাস্ত নিন্দে করবেন না।

ভাষাতত্ত্ব শিল্প আক্ষালাভের ইতিহাস

॥ কীর্ত্তি বসু ॥

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

তারিণী ব্যাচান্স ভরতিলেন। ষষ্ঠ্য বৎসরে শেস্তেন, এক
মাসিক সেওয়ান উপকির্মে ভিতরে এসে বহুলা মুলে ছিল,
সুতরাং মধ্যে তিনি সব ব্যাপার বুঝতে পারলেন, আর বেগে
বহুত মধ্যে গিয়ে মাউন্টর শিল্প নিজে সাংগ্রেমের জন্ত
প্রস্তুত হলেন। পুনিপদলও ঠিক এই সময়টুকু ভিতরে
এয়েল বহল। তাদের পুত্রোপাঙ্গে ছিলেন ইন্সপেক্টর
জেনারেল ব্রিগস তারিণীর স্ত্রী তার ওপাস বিহ বহল,
তিনি পড়ে গেলেন, কিন্তু তার আঘাত বেশী ছিল না, তবুও
আর উঠবার চেষ্টা না করে বুকের তাল করে পড়ে রয়েলেন,
শিল্পে বহুতন স্ত্রী ছিল তারিণী স্ত্রী চালিয়ে গেলেন।
এই মধ্যেই মিলিনী দ্বিতীয় মাউন্টর শিল্প নিজে এসে তার
সঙ্গে যোগ দিলেন। দুই মাসে অধিকার স্ত্রী চালিয়ে
লাগলেন, দ্বিতীয় পুনিপ ইন্সপেক্টর বহল সুখাচী
সাম্প্রতিকভাবে আচর্য হয়ে কুতলপারী হলেন, যে
কনট্রোল পত্রিকা নিহত হয়। কিন্তু পুনিপদল সংখ্যার
বহু ছিল, তাঁকে তাঁকে স্ত্রী এসে ছুট দিলেন। সে বহু
করতে লাগল, তারিণী আর পারলেন না, তিনি পড়ে
গেলেন, কিন্তু মিলিনী তখনও স্ত্রী চালিয়েলেন। কিন্তু
কিছুকাল পরে তার বহুত অংশ হয়ে এল। শিল্প হতে
ছেকে বহল পড়ল। এই অবস্থার সুতরাং অব্যবহিত পূর্বে
পুনিপ মিলিনীকে হেথার করে। তারিণীর জীবন বহু
পুনিপ পার মাই। কয়েক বর্ষ পরে হাসপাতালে মিলিনীর
মৃত্যু হয়। হাসপাতালে মিলিনীর মৃত্যুর একমাত্র উক্তি—
Please don't disturb me. let me die peacefully

কলকাতা বাজারের এই সংগ্রামই বিদ্যার ভারতের এখন
কলকাতা সংগ্রাম প্রতিষ্ঠার শেষ অব্যয়।

পূর্বেই ত্রিপুরা কোলাজ ক্রিয়া বহুতমাত্র কানীনদর
গ্রামের অধিকার সুত্রে তারিণী মজুমদার ১৮৯২ খৃঃ অব্দে
অন্তঃস্থল হলেন। তার পিতার নাম মনীন্দ্র মজুমদার।
তারিণীর মাতা বহুতমাত্র মনীন্দ্র মজুমদার।
মিলিনী ছিলেন। তারিণীর পিতৃব্য কানীনদর মজুমদার,
বহুলা প্রদর মজুমদার, মনীন্দ্র মজুমদার, বহুত কুমার
মজুমদার এবং কাকীবা হেথপ্রদর মজুমদার বাংলায় বিদ্যার
অন্তঃস্থল প্রশস্তিত। মেজকাকী কানীনদর বাবুই
তারিণীকে অহুশীলন সমিতির সভ্য প্রেরিতক করেন।
হেলেনেংলা থেকেই তারিণী সবলবহে ছিলেন এবং সুতী,
মারিগেল, অমিচালনা এবং যোড় মোড়ে খুব বহু ছিলেন।
অমিচার বাড়ীতে দুটা যোড় ছিল। তাই শৈশব থেকেই
তারিণী মজুমদার যোড় লগার হয়ে উঠলেন। তারিণী
ছিলেন ইংরেজ। তার বহু ছিল ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। তারিণী
ও তার পিতৃব্যগণ অধিকার বংশের মজুমদার হয়েও অহুশীলন
সমিতির শিকার তারা বহুতমাত্র তার জীবন বাগন
করতেন। প্রতিবেশীকে আদর বিপক্ষে এঁরাই ছিলেন
মহার। একত এই অক্ষরে এঁরা ছিলেন। মজুমদারের গ্রাম,
তাম্রা ও তার বিদ্যার পিতৃব্যগণ কানীনদর মনীন্দ্র,
মহার প্রকৃতি অক্ষরে অহুশীলন সমিতির বহু মাতা
প্রদর পড়ে গেলেন এবং এই অক্ষরে এক মজুমদারের
উদ্যোগ করেন। প্রথম মহাপ্রকৃতির সময়ে ঢাকা বহুতমাত্র,
বহুতমাত্র বহুতমাত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় মজুমদার অহুশীলন সমিতি
বহু কলী প্রোগার ও প্রতিষ্ঠ হয়ে যান। তারত বহু
আইনেক বহু কলীকে প্রোগার করা হয়। কলি তারিণীকে
সা ঢাকা বিয়ে ফেরা জীবন অবলম্বন করতে হয়।
কোর জীবনে তারিণীর নাম ছিল 'প্রদর'। মজুমদার
জীবনে তারিণী উত্তর বহুলা পূর্বেই এবং উত্তর ভারত

বিভিন্ন স্থানে নানা ধারিতপূর্ণ কাজে বৃত্ত ছিলেন। একবার ভদ্রাচলার ভাণ্ডারীপুরে অবস্থান কালে পুলিশ এই গুরু খিয়ে ফেলে। তামিলী বোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে কিছুকালের মধ্যে পলিগের দ্বারা মর্মে হন।

—বিদ্রোহী কথা—

১৮১৮ সাল, এপ্রিল মাস। সবেমাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসেছি, অস্থানীয় সমিতির বৃত্ত ছুটিল। নেতার অজ্ঞান কবীর অজ্ঞান। ইংল্যান্ড-নির্যাক্ষর রেল-লাইনের লাফিকী বোম্বাইয়ের ট্রেনের কাছে ছিল আমায়ের বাড়ী। প্রায়ই বিভাগে বেড়িয়ে যেতাম ট্রেনে। একদিন সন্ধ্যায় একটু পরে বাড়ী এসে ঠাকালো নির্যাক্ষর মিলে ফিলে। ট্রেনের মধ্যে দেখলাম একটি চেম্বার-পরিচিত মুখ। চোখের ইশারার জালদেয় আধাতে। বললেন চলো আমার সঙ্গে। বাড়ীতে বলে আনিমি তুও কিংবদন্তি হন মিরে উঠে বললাম ট্রেনে। কুতূহল জেদী একটি ছোট কামরাং লুকোপের বসে আছেন তিনি। মুখে বুক পড়ত হন কুক দাড়ি; মাথায় একটা টুপিও ছিল হলে হত। হেবলে বুঝা মুক্তি পিছু না হুলসমান। আমাকে বললেন, কোথায় অজ্ঞান, পাটির কর্মী আর বাইরে প্রায় কেউ নেই, আর বাড়ী দিয়ে কি হবে, বতখিন বাইরে থাকতে পারো কাজ করে থাক। বললাম—আমার উপর অজ্ঞানদের আবেশ আরো করা হয়েছে। তাকলে দুই-বৎসর ফেল। —কেনের ফেলের পথে পা দিয়েই তো সমিতির পত্নী হয়েছিল—কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছো, আরও করতে হবে। দুই পণ করে যে পণব মিছেছো, এখন ফেলের করে পিছিয়ে গেলে চলবে কেন? আমার নৈমিত্তিক-স্বাধীনতার মুখে যদি জীবন হারত তবো তাই হবে বতখী দুই। সে সন্ধ্যায় পৌড়াই বা ক'নের ফোটে?

মন স্থির করে ফেললাম—আর বাড়ী ফিরবো না। ইংল্যান্ড ট্রেনে বেয়ে লিভিং মিলে উঠে বললাম দু'জনে। যিনি আমাকে মিরে এলেন তার নাম জামজাম 'ট্রার'। জামজাম মিরে ফেললাম তার শরীক হবার পরে। আমি ঢাকার এসে গুরু সমিতির গোপন আড্ডায় আলম নিলাম।

'ট্রার' নামে তামিলী অস্থানীয় তখন অস্থানীয় সমিতির

ভারপ্রাপ্ত ফেলো। কেরার অবস্থায় পৌক দাড়ি হেবে কখনও সাধু লোক কখনও কত মুখ দেখে চমকেচমকে করতেন। তাকে প্রেস্তার করার গুরু নতকার থেকে পুণ্ডার ফেলো করা হয়েছে। তখন ঢাকাই ছিল অস্থানীয়দের প্রধান কেন্দ্র।

বিশ্বাসের হারিচৈতন্য হে ছিলেন সমিতির গুরুী সন্ত। মধ্যে মধ্যে তাঁর বাংলায় কেরারী বিদ্রোহী এসে আমায় প্রবণ করতেন। লুপ্তিবারে কলকাতা যাওয়ার বাস করতেন তিনি। ফলত বাজার ঘটনার কয়েকদিন আগে আমি ও আমার ২ জন সহকর্মী গহরের অত্র এক প্রান্তে প্রেস্তার হয়ে তখন ঢাকা ফেলে আমি। ককবিন জন্মলায় অস্থানীয় বাবুদের সঙ্গে সাগ্রহণ হর পুলিশের। আরও অবস্থায় অস্থানীয়কে ফেল হাসপাতালে এনে রাখা হয়েছে। হে কে জামজাম ট্রেনে হল। সুযোগের মুটে গেল। ককামায়ের ফেলে আকাত হয়ে ফেল হাসপাতালে গতি চলায়। ২৩ দিন পরে ব্যাংকার ফেলা হয়ে গেল হঠাৎ। সর্বদা কত-বিকৃত, মুখ-তোষ কোনো মাথার, জাতে, পায়ে ব্যাংকর বীজ, নাকশীও টের বাঁকিতা মিরেছে। ব্যাংকার ফেলি হরে অতি কষ্টে দাড়িবে আছেন। কি করেছিল জানতে চাইলাম। কিছুকণ মুখের দিকে তাকিয়ে ফেলোতিনি কেঁবে ফেললেন বললেন আমিই তুই বেঁচে হইলাম। আর ক'রে বাঁচতে পারলাম না। চোখের ফল মুটে বলে চললেন—বালা বালি ছিল, বোঁ ও ফেলেশির বাড়ী গাতিয়েছি ৭৩ 'হন আগে। টার ও নগিনী ২৩ দিন আগে এসেছে। আমি দুঃখলায়, গড়ার হারে শ' বানের পুলিশ প্রথম বাড়ীটা খিয়ে ফেলল। ভোরের নিক্ত গুলী মাঝরাতে ঘুম কেড়ে গেল, তাকাতাকি উঠে বাইরে এসে দেখি 'তারিনী হ' হাতে দুই মবার শিকল মিরে লম্বায় গুলী ঢালছেন। পুলিশের রাইফেলের গুলী কাকে কাকে বোম্বা জামজাম মিরে হেরে অস্থা পর্বত এসে পড়ছে। এরপর নগিনী শিকল মিরে এলেন কিন্তু বেনীকণ বাঁচাতে পারলেন না। গুলী আমাকে পুটিয়ে পড়লেন বাড়িতে।

(ফেলো)

রাষ্ট্রগুরু ম্যুরেজ্জ নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অঙ্কন]

অম্বাবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাসগুপ্ত

১৯০৯ সালে আমার বিলেত ভ্রমণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে, তিনি তার স্বপ্নে বাস্তবের প্রতি যে আভাস দেন, সে সমস্ত আভাস তারের থাকার উচিত ইত্যাদি বিষয় তিনি এমনভাবে ভুলে গিয়েছেন যে তার মধ্যে এমন কিছুই বলা বা লেখা হারানি যাতে তার পক্ষের তার বিরুদ্ধে নির্বাসন ব্যবস্থার প্রচেষ্টার ইংরেজ ঐতিহ্য বিরোধী আইন প্রয়োগের কোন সুযোগ পায় (বিচার, বিচারপন) ।

আগেন হিউস যে কেবলমাত্র একজন বড় সংগঠক ছিলেন, তা নয়, তিনি ছিলেন একজন অভিলষিতের প্রবণ লোক । তার চরিত্রে ছিল কর্মমায়ার পুঙ্খ নুতন চাতুর্য ও ব্যবহারিক সৃষ্টির সঙ্গে প্রাচ্যের উন্নয়নমূলক ও আবেগ প্রবণতার একত্র সংমিশ্রণ । তার ভারতীয় বন্ধুদের তিনি পুঁই ভালবাসতেন । তারের ব্যক্তিগত ও লাভের ভ্রমশূন্য ছিল তার কাছে অতি আকাঙ্ক্ষার বিষয়, এবং, তারার তার এই ভালবাসার প্রতিফলন ঘটেছে পরিমানে গিয়েছেন । এই অবসর প্রাপ্ত আই. সি. এস কর্মচারী শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে হতবানি সত্তম বোধ ও অস্বাভাবিক উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন, তার সমস্ত তেমন আর কোন ইংরেজই তা করেন নি । একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কংগ্রেস আন্দোলনের আদি পর্বে যে সমস্ত ইংরেজ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন তারা সকলেই ছিলেন ভারতীয় শিক্ষিত শাস্ত্রের লোক, যে শাস্ত্রের মধ্য দিয়েই তারা বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন । ভারতীয় শিক্ষিত শাস্ত্রের লোকের এ দেশের জনগণের কাছ থেকে আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যাশা অর্জন করার কত প্রচেষ্টাই না ছিল । আর কত অর্থ পরিমানেই না তারা সে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন । বহি তারা সে প্রচেষ্টা পূর্নাবস্থায় গ্রহণ

করতেন, তাহলে এক সাধারণ নাগরিকের বন্ধন হয়ে তারা ভারতীয় ও ইংরেজের আদর্শ করতে পারতেন । তবে সৌভাগ্যের বিষয় এখন দৃষ্টান্তীয় পদ্ধতিতেই ঘটতে । এখন চিন্তামূলক ভারতীয়গণ এই আলো নিয়ে এই আশা নিয়ে আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে আছেন যখন সমান নাগরিক অধিকার তাদের মধ্য দিয়ে এক নতুন ও অদ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রকাশিত হতে পারে ।

২৪শে জুন তারিখে সেই প্রাতঃভোজের আগেরাৎ । এর এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে ভারত ও ইংল্যান্ড উভয় দেশের মধ্যেই প্রবল চাক্ষুষ্য সৃষ্টি হয় । ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তারিখে হার্ডিং নামে এক ভারতীয় মুখ্য ভাসনাল ইতিহাস এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় অস্ট্রেলিয়া চলা কালে ভারত পটভূমির প্রতিচ্ছবি স্যার উইলিয়াম কার্জনউইলি এবং তার লাল কাপাকে গুলি করে হত্যা করে । ঠিক প্রায় এই সময়েই লর্ড ইন্ডিয়ানো ইন্ডিয়ানাল প্রেস কর্মচারীদের সম্মানার্থে উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক ভিনায়ের আসরে আচার্যের আগম্যণ করছিলেন । ভাসনাল ইতিহাস এসোসিয়েশনের সেই বার্ষিক অস্ট্রেলিয়া সভায় আচার্যের নিমন্ত্রণ ছিল এবং সে অস্ট্রেলিয়ায় যোগদান করার ইচ্ছাও আচার্যের একবার হয়েছিল । কিন্তু রাত বেলা হয়ে যাওয়ার আদি ভিনায়ের আসর থেকে কেটে পড়ান এবং ক্রিমিওয়েল্টের আদার হয়ে চলে এলা । তখন দেখানো টোটা প্রত্যাশা হচ্ছে, বর্তমান হচ্ছে । বিচার আদি দেখানো যে আচার্যের পক্ষে বড় বৈধি হয়ে থাকে । তাই আদি দেশের আর পদার্থকে দেখানো তারের ভোজের পদার্থী বন্ধুত্বমূলক উপভোগ করার ক্ষমতা হবে যাতে যাতে চলে এলা । আচার্যের বন্ধু কি কে. এন. দাসগুপ্ত আচার্যের

বাণীর নিয়ে বাণীর ভক্ত অপেক্ষা করছিলেন। তিনি প্রত্যহ করলেন যে অভ্যাস: এক মিনিটের মত ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউটে গিয়ে জাঙ্গল ইতিহাস এসোসিয়েশনের অফিসিট কি রকম চলে তা দেখে সেজে বসে রত্না। কিছু আমি জানি হতে গড়েছিলো এবং আবার বসে বসে গাড়ি। তাই এ লড়াই মকলিসের উদ্ভাবনীয় বাসায় গিয়ে শব্দা প্রবনই ভাল হয়ে করলো। তখন স্বপ্নের ভাবতে পারিনি যে আমি এখন সে অফিসে যাব কি বাব দ্য চার্টার্ড, ঠিক সেই সময়েই এই ভয়ংকর দুর্ঘটনাটি ঘটতে বাসে।

পরের দিন ২৪ জুলাই সকালবেলা আমি লগ্নে বাসে সন্ধ্যার প্রাতভোজন শেষ করেছি, এমন সময় একজন সংবাদপত্রের রিপোর্টার আমায় লগ্নে দেখা করতে আসেন। তিনিই প্রথমে এই দুর্ঘটনার সংবাদটি শেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার উইলিয়াম কান্টাইলির ইত্যা সম্পর্কে আপনি যা লগ্নেন এমন কোন সংবাদ আমাকে দিবেন কি?" আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সঙ্গে আমি বললাম, "স্যার উইলিয়াম কান্টাইলির ইত্যা। আমিতো এ ব্যাপারের কিছুই জানিনা। এই তো এখন আমি এই ঘটনার কথা শুলাম। আমি তাকে আরও বললাম, "আবার মনে হচ্ছে আমার চেরে আপনিই এ বিষয়ে আরও বেশী জানেন।" তখন পর্যন্ত আমি যা জেনেছেন, তার বিবরণ তিনি আমাকে দিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কিংবা কে, তা আমি জানি কিনা। আমি বললাম, নামে তো পাঁচকরাই মনে হয় যে সে বামদলী নয়। কিন্তু সে তারতের কোন অফিসের মোক ভা বলা কঠিন। আমার কাছ থেকে আমার সম্পর্ক ব্যক্তিগত অভিমত ও দূরার ভাব ভাড়া—যে দূরার ভাব সমস্ত ভারতবাসীর মনেই এই ভয়ংকর অপরাধের জন্য প্রকট হয়ে—আর এমন কিছু দূর্য্যবান সংবাদ তিনি পাননি যা তিনি কণি করে নিতে পারেন। একটু পরেই সে লগ্নে রিপোর্টার আমায় আর আশ্রিত আরও করলেন। একটু মিণ্টুমান অভ্যাস বিরক্ত হয়ে গেল। সে তার এক বন্ধুকে বলল, "এই পাত্রীগুলো অভ্যাস বস, কিন্তু তার

চেরেও বস হচ্ছে এই ভাবটাইটা (অর্থাৎ আমি)। এই মেটাই আমাদের বক্তব্যে বিচ্ছেদ।" স্টিভেনসনের যে ভাবগার আমি থাকতাম সে অফিসটি ছিল পাত্রীদেরও প্রথম কর্মক্ষেত্র।

সন্ধ্যা পর্যন্ত রিপোর্টারদের আনা বোনা চলতে থাকে। তারপরেই শুরু হয় ভারতীয় ছাত্রদের আসা যাওয়া তারা মনে মনে আমার কাছে পরামর্শ নেওয়ার ভক্ত আমাকে লাগল। এই অবস্থায় কি করা কর্তব্য তাই হচ্ছে তাহের মশাল। কারণ, পরিস্থিতি অত্যন্ত তরতর। একজন ভারতীয় ছাত্র একজন উচ্চ গণ্য ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করেছে। তাছাড়া তার নিজের দেশেরও এক জনকে তিনি তাকে বাঁচতে এসেছিলেন, তাকেও হত্যা করেছে। এই যে-পরোহা হত্যাকাণ্ড ইংরেজ জন-চিত্তে একটা প্রচণ্ড আঘাত হয়েছে। লগ্নে তাদের মনে এক ব্যাপক কোমের ভাব দেখা দিয়েছে। যদি ভারতীয় ছাত্ররা অন্যত্র বিলগ্নে তাদের লগ্নে এই অপরাধের কোন সম্পর্ক নেই, একথা বোঝা না করে এবং এই হত্যাকাণ্ডকে অবিমিশ্র ভাবের ক্রোধভাবে মিথ্যা না করে তারলে ইংরেজ জনসাধারণের আকোশ ব্যক্তিগতভাবে সেই হত্যাকাণ্ডী ছাত্রকে ছাড়িয়ে গিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের উপরই পড়বে এবং গোটা ভারতীয় ছাত্র সমাজের উপরই যোঝায়ে বসা হবে। সুতরাং এই পরিস্থিতি থেকে বকা পাওয়ার ভক্ত অবিলম্বে মনোবৃত্তি কোন বাবদা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মি: জি. সি. থোম এবং মি: এইচ. এম. হোম তখন ইংল্যাণ্ডে ব্যাবিটারী পড়ছিলেন। তারা নেতৃত্ব দিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের এক সমবেশ সম্পর্কিতের গার্মি গ্রহণ করলেন। কিছুমাত্র দ্বৈতী না করে তৎকাল্য সেই সমবেশ সম্পর্কিতের সিদ্ধান্ত আনসা গ্রহণ করলো। নিউ রিকর্ড ট্রাভের করেকটি ঘর আনসা ভাড়া করলো। পরের দিনই সে লড়াই অহুষ্ঠিত হয়ে এবং হির হল যে আমি সে লড়াই সভাপতির কাছ করব। ভারতীয় ছাত্রদের পৌজাধ্যক্ষে সেই দিনই জাঙ্গল সিংগল সাথে সাময়িক বন্ধুত্ব এক লগ্নে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আসের দিন রাত্রে সেই

দুখটনের বিপরীতভাবেই আলোচ্য বিষয় সমূহের মধ্যে পড়ল। স্থির হল যে আমি প্রেসে একটি স্তম্ভ রেখে এখানে সে পত্রটি—অন্ততঃ তার একটি প্রথমে অংশ প্রেসে একেশ্বরীয় দাব্যের যেশের সব পত্রিকা জালিতেই প্রকাশিত হবে। পত্রটি বজ্রা করা হল এবং সন্ধ্যার আশেই তা আমার স্বাক্ষরে ইক্সপ্ৰেসের দ্বারা পত্রিকা অফিসে চলে গেল। এইভাবে সেই আট সপ্তকের পত্রিচিহ্নিতক নামলাবার প্রথম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।

পরের দিন নিউ রিকর্ড ক্রাফের বাড়ীতেই এই পত্রার অঙ্কন হল। যে কক্ষে সন্ধ্যা বসেছিল, ভারতীয় স্ট্রীতে সেই একটি বড় কক্ষ ছিল না। কিন্তু কৌতুকী ও আগ্রহী জোতার দ্বয় সমাবেশ হয়েছিল। তাতে বসটি করে গেল। ভারতীয় ছাত্ররা অধিক লাগায় সে সন্ধ্যার বোস দিল। তারের মধ্যে বিঃ লাভ্যকরও ছিলেন। এই সাংবাদিকতার পরের দিন সেই একই উদ্দেশ্যে আহুত এক সন্ধ্যার মূল প্রত্যয়ের বিরোধিতা করে এক সূত্রের অবতারণা করেছিলেন। অবশ্য আমাকে এই সন্ধ্যার কোন বিশদূষণ ঘটনা ঘটেনি। সব কিছুই বেশ সাত পয়সার মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সেই সন্ধ্যার আমি যে বক্তৃতা করেছিলাম, ব্রিটিশ পত্রিকাজালি তা ভালভাবেই গ্রহণ করে। দেবদাসের আমার একটি উক্তিও তাৎক্ষণিক আপত্তি হয়েছিল এবং তা হল এই যে আমি প্রথমমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলাম যে তিনি যে সময় ভারতে একটা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি চলেছে বলে মন্তব্য করেছিলেন তা ঠিক নয়। প্রথমমন্ত্রীর মন্তব্যের তাৎপর্য ছিল এই যে খিড়ী এই ক্ষয়ক্ষতিই হলোই লোক। টাইমস্ পত্রিকা প্রথমমন্ত্রীর (বিঃ এফুইথ) এই উক্তির সমর্থন করেছিল, যদিও পরবর্তীকালে বিচারের দ্বারা পরিষ্কার দেখা গেল যে খিড়ী এককভাবেই এই হত্যাভাণ্ডার দমে অভিভূত এবং সে নিম্নের উদ্ভোগে ও আক্ষেপের প্রকাশ্যই এ কাজ করেছে।

তার উইলিংহাম কার্জন উইনিয় এই হত্যাভাণ্ডার কক্ষে ভারতের ভারী-গাফার প্রথমটি পুনঃস্থাপন পড়ে গেল। যে সময় প্রাকৃতিক বটামণ্ডলীর দ্বারা বিবেচনা অতিক্রম করছে, সে সময় বটামণ্ডলীর তাৎপর্য অস্বাভাবিক হয়ে

আমি এটাই বুঝতে পেরেছি যে আচরণ, চাকলাকর প্রাকৃতিক অপর্যায় নিম্নলিখিত অভিযোগ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের দিক থেকে উত্তর বিভাগের দাব্য করে যাচ্ছে, কিন্তু তা সমাজের বহুজনীন গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পরিণামে প্রাকৃতিক উন্নতির দ্বারা বাধারই সৃষ্টি করে। বর্তমান আবারের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যে বার্ষিক প্রায় কোল অফিসের কথা হচ্ছে সে সম্পর্কেও এই একই কথা বাটে। কনিষ্ঠ নিম্নলিখিতের কাব্যবন্দী প্রথম তার কলে যে সময়সীমার প্রয়োগ করা হয়েছিল সে ইতিহাসের উল্লেখ করে না। সে এক দীর্ঘ দিন দ্বারা উন্নতির ও বিমলী পত্রিকার মধ্যে সংঘর্ষের কথা দ্বারা পরিপাকিত বহুপত্রিকার ক্ষমতার আশীর্বাদ হয়। সে নিম্নলিখিত এই সূত্র চাংপের ক্ষেত্রেও দেখা আসে না। তবে আমি আপা করেছিলাম যে যাদের নির্বাচন দেওয়া হয়েছে তাদের কয়েক জনের বিপরীত মনে পুনঃবিবেচনা করেছেন। বিশেষ করে কৃষ্ণসুয়ার দিন ও নির্বাচনসুয়ার দ্বারা উপর যে নির্বাচন দেওয়া হয়েছে তা আমার দৃষ্টিতে ছিল। পরবর্তীকালে আমি এখন তার সঙ্গে দেখা করলাম, তখন তাদের সূত্রের দ্বারা আমি অনেক করে বলেছিলাম। কিন্তু সবই বুঝা গিয়েছে। আমার কথাগুলি তিনি বৈধ্য পরকারে শুনেছেন। কিন্তু যদিও তাৎক্ষণিক পানন লাভের প্রতিশ্রুতি না হওয়া পর্যন্ত তাদের সূত্র দেখা হয়নি।

ইতিহাসে আমি যে সময় কাল করে বাড়িলাম তা সম্পূর্ণ লক্ষ্যের দিকে না এগোলেও তার কিছু কিছু ফল সম্পর্কে কিছুটা আশাবিত্ত হয়েছিলাম। কিন্তু এই হত্যাভাণ্ডার আমার সে কাজকে ব্যাহত করল। আমাকে এটি সাংবাদিকতা করার ক্ষমতা অক্ষয়ণ করা হয়েছিল। তার পর দিনের মধ্যেই সেই ক্রাফের ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে এক পুণ্যক বিতর্ক সন্ধ্যার আমাকে বক্তৃতা করার ক্ষমতা অক্ষয়ণ আনন হয়। এই ক্রাফটি ছিল লিথামেল পার্টির একটি সংগঠন। ক্রাফের দক্ষ থেকে সন্ধ্যার দিন ঠিক করে সব প্রয়োজনীয় আয়োজন করা হয়েছিল। সন্ধ্যার অঙ্কন হল ঠিকই; আমিও সেখানে বক্তৃতা করলাম। কিন্তু অঙ্কনটি

যদি বিভিন্ন পরিমাণে একটা বাত্মী ব্যাপারই হয়ে পড়ত।
লেজী কান্নার উইলিয়ম শোভে সম্ভবত্যা প্রকাশ করে
এক প্রত্যয় সত্যের সূচীক হল। কিন্তু যে প্রধান জিনিস
মিছে আমি দিখাবেন পাঠীর মোতাবেক কাছে সাধারণ কথা
দলয় বলে গ্রিক কল্লিজিলাস, তা স্পষ্ট করাও হল না।
একটি স্বর্ণ স্বপ্নে মতে হয়ে গেল। স্যার উইলিয়াম
কান্নার উইলিয়ম হত্যাকাণ্ডই একত বারী। অবশ্য
সেইবিদ্যান তার উপলব্ধির স্বচ্ছতা বশতঃ—
'ভারতের সাম্প্রতিক গঠন ক্ষেত্রে উন্নতি ও তার ক্রম-
বিকাশের ব্যাপারে আমরা আমাদের লাভ্যত্ব কল্প
নায় ইচ্ছা পোষ করি।' ব্রিটিশ পণ্ডিতের এই ব্যাখ্যায়
আমরা কোম কিছু করতে হন বহুর সময় লেনে বার।
হুদ বহি না এসে পড়ত এত হুদের ফলে হুত উপবোধী
অবস্থায় সময়ের গতি বহি প্রকাশ না পেত, তা হলে
হুত আরও বেশী সময় লেনে বেত।

এই সময়ে আমি যে সময় 'প্রতাপ' বক্তৃতা করেছিলাম তার দর্শকের বক্তৃতা হয়েছিল 'ক্যাকটাস' বলে। সেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার চার্লস ডিলেক। স্যার ডিলেক ছিলেন তখনকার দিনের একজন খ্যেত বন-প্রতিনিধি। তার স্বচিহ্নিত অস্তিত্ব প্রেক্ষিতের বহিঃস্থ জনতার সাম্প্রতিক পরিচিতি সম্পর্কে তার জ্ঞানের জন্য সকলেই তাকে বেশ মজা করে মনে রাখত। তারই সময়টা সম্পর্কেও তার সভার স্মৃতি ছিল। আর তারই আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও তার সবার স্মৃতি ছিল। আশাশেখ সভার তাকে সভাপতিত্বের পাঠ্যবই ছিল একটা বড় ঘটনা। আমি সভার বন-বিভাগও সম্বন্ধিত। পরিচয়নার উপরে বক্তৃতা করলাম। প্রাথমিক স্বায়ত্ব শাসনের প্রতিশ্রুতি লক্ষিত করার সময়কার ভেদ-ভাষার ভিত্তিতে পূর্বে এবং বর্তমানীয় সময়ের পটভূমিতে।

“এই ক্রোমের (বল-চিট্টো) মধ্যে এখন কোন

স্তম্ভিকা দেখিয়া এখনি তাঁ কোন্‌মো কোন্‌ আঁবে পুং পুং
 চাকরা কর্ণি। এই ভীমে কোন উভাওতা তো নেই-ই,
 বহু আঁবি ভলব অনেক ক্ষুদ্রপুর্ন বৌদ্ধিক ভিন্ন সম্প্রদায়
 আভ্যন্তরে প্রাশংসা কর্তৃক বিবেক ব্যক্তি। বুদ্ধের বক্তব্য
 ভেদে পাকি, ভাষা চাকি ভাব ভাষাভে উপর কথতা,
 আভ্যন্তরীণ হাট্টে অকৃত্য ভেদ ভেদ প্রবল বক্তব্য
 উপর বহা ভাষা, নিকা ও পুত্র বিত্তপের উপর জ্ঞানসের
 বিনিমিত্ত নিমন্ত্রণ কথতা। আগনাগা ক কামেন প্র কামেন
 সেরে হাজার হাজার সৌক প্রতি বহু স্যাক্ষরিত্তি এবং
 কথেনার সাতা বাহ, অকৃত এই প্রোগ্রামিত্তি প্রকৃত্তি
 কতা বাহ? বহি আভ্যন্তরীণ জ্ঞানসের হাট্টে ভাবিত্তি
 অকৃত্তি বহি বাহ নিমন্ত্রণের কথতা, অকৃত্তি কথ-সাত্তি
 কলকৌর বাহবাণি উপর কৃত্তি পেনতা, তাহলে জ্ঞানসের
 বুদ্ধ প্রত্যয় আছে যে আভ্যন্তরীণ অকৃত্তি পত্রিত্তি এই
 কথের বুদ্ধের হাট্টে কথাত পত্রিত্তি যে বুদ্ধের কথ-সাত্তি
 পত্রী পুত্রকিত্তি উভাও হয়ে থাকে। নিকাও জ্ঞানসের
 কতা চহ তা মোটেই পর্ণাথ নয়। প্রাথমিক নিকা
 সম্প্রদায় কিহু না বলিই চাহ। আভ্যন্তরীণ ভাবিত্তি
 উপর কৃত্তি চাই, আর চাই হস্তি এবং অকৃত্তি বাহ
 পাল। তা আভ্যন্তরীণ ভীমে পত্রিত্তি। লব সাহুগে
 এই শাস্ত্র সত্যের পত্রিকিত্তি স্য কথিত্তি—আঁবি সম্প্রদায়
 প্রোগ্রাম প্রোগ্রামি বলি। তাহলে এই যে হাট্টে কথ
 মত প্রবল ভিত্তি পত্রিত্তি সত্যের বেহাও হয়ে যে বাহা কথ-
 কিত্তিভিন্নপত্রিত্তি কথেনার পত্রিকিত্তি নৈতিক জ্ঞান বেহাও
 কতা প্রত্যয়কাবে পত্রিকার উপর আর কোন প্রত্যয়ই
 বিচার করবে পত্রিত্তি না।

ইংল্যান্ডে ১৯০২ সালে আবার বক্তৃতায় আসি দুইটি
বিশ্বের উপর বহুচেহের কেনী আবার বিবেচি। একটি হল
বহু-ভল আইনের ল্যেপাধন। আর একটি হল বারত
শাশন প্রাধিকার; এবং আবার বক্তব্য জিটিল প্রোভাবা যে
ভাবে প্রবণ করেছেন, তাতে মঙ্গলর মিক্তিত প্রত্যয়
অন্তেছিল যে দুইটিই প্রায় এসে বাছ। শীঘ্রই হোক
শ্যোভিকিং বিলুপ্তই হোক বহু-ভল আইনের ল্যেপাধন
হবেই। আর ইংল্যান্ডে এই রকম একটা মনোভাবও পড়ে

মানবমূত্র-নিভার টনিক

(AUTO URINE)

স্বমূত্র রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিরোধক—স্বাস্থ্য সংরক্ষক ও সংপষ্টক।

ডাঃ নলিনী রাঘ চৌধুরী এম বি, বি-এস

প্রতি রবিবার সকাল ১০—১২টা কিনা পার্শ্বশ্রমিক বস্তু ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ দেন
এবং হস্ত-কলমে যোগাঙ্গন শিক্ষা দেন।

স্থান : ৩ সূর্য সেন স্ট্রীট (কলেজ রোডার) কলিকাতা-১২

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬—৭ টা নাম লেখান হয়।

অগার জন চিকিৎসকের তথ্যপূর্ণ অঙ্গোচনা এবং অতিমত সত্বক পুস্তক—

সর্বোবধি শিবাধু সঙ্গক—ঐশাঙ্কিলাল ভট্টাচার্য

সাম—লাচ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :

এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং—৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ১

ফাফা কে. এল. এম প্রাঃ লিঃ— ২৫৩বি, বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি ১২

চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং—১৫ কলেজ স্টোয়ার, কলিকাতা-৭৩

প্রচারে সহযোগিতা দিয়েছেন :—

- শ্রীমান্তোষ ভট্টাচার্য—বহড়া।
- শ্রীসমরকান্তি পণ্ড মজুমদার—লেকটাউন।
- শ্রীশুশেন্দু সোম—বিরগাটি।
- শ্রীমাধন চ্যাটার্জী—মিয়ালমহ।
- ভারত ষ্টেশনার্স
১৫ কলেজ স্টোয়ার, কলিকাতা-৭৩
- হাওড়া হার্মিমান হল
১০'১ ছি, টি, রোড, হাওড়া-১
- রেণু মেডিকেল হল
২৫ সূর্য পুত্র বাজার, কলিকাতা ৬৩
- সি. সি. মেডিকেল হল
হিপুবা হস্তশাধিনী সঙ্গ-ভবন
৩ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

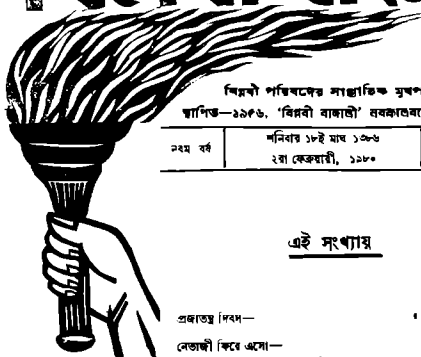
যোগ্য প্রচারে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি :

ঐশাঙ্কিলাল ভট্টাচার্য

অঙ্গানাইলার শিবাধু চিকিৎসা প্রচার কেন্দ্র

২২৩ এইচ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
স্থাপিত—১৯৪৬, 'বিপ্লবী বাজারী' মনোহরদ্বারে—১৯৭৯

২য় বর্ষ	শনিবার ১৮ই মার্চ ১৯৬৬ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০	১৮-১৯ সংখ্যা
----------	--	--------------

এই সংখ্যায়

প্রজাতন্ত্র দিবস—

। সম্পাদকীয় ।

নেতাজী কিং এমো—

বাধীন ভারতে পথনির্দেশ—

। হুমায়ুন কবীর ।

সপ্তম লোকসভা নির্বাচন-এর বিশেষ ভাষা—

এক নজরে—নেতাজী জীবনপন্থা—

জাপানী কাহিনী—

। সত্যজিৎ রেন ।

বাধীনতার মূল্যবোধ কি কীরমান ?

। বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রপুত্র সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা—

। অধ্যাপক মলিনীমোহন দাসগুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। কীর্ত্তি দত্ত ।

নেতাজী জন্মদিন

ও

প্রজাতন্ত্র দিবস

বিশেষ সংখ্যা

১৯৮০



— প্রজাতন্ত্র দিবস —

ভারত রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। এই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে বহু শহীদদের আত্মদান, বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ, সুদীর্ঘ কারাবাস এবং আরো বহু রক্তের ত্যাগ ও নিরলস দেশসেবা। তাঁরা চেয়েছিলেন এমন একটি ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে, যেখানে বনৌদ্ভিদের কোন বৈষম্য থাকবে না। দেশের মানুষের ক্ষুদ্র থাকবে প্রচুর স্বাভাবিক সামগ্রী, বাসস্থান, শিক্ষালাভ ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা, মাথাগুঁজবার ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় বাসস্থান। তাঁদের এটাও কামা ছিল যে পরাধীনতাসূক্ত হয়ে 'ভারত আবার জগৎ সভার স্রষ্টা আসন লবে'। কোন অগ্রগতি হয়নি একথা একদল মতলববাজ রাজনীতিবিদদের মত আমরা বলব না।

মানাসিকে বোধে উন্নতি হয়েছে একথাও স্বীকার করতে কোন স্তূপ নেই কিন্তু লক্ষ্যস্থল আজো বহুদূরে অবস্থিত একথাও দৃঢ়কণ্ঠে, বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করব। জানি যে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য কিছুটা থাকেই। কিন্তু লক্ষ্যের পথে দৃঢ়পথক্ষেপে চলবার কোন বিরতি থাকতে পারে না এবং সেই অতীষ্ট লাভের পথে দেশকে যারা পরিচালিত করবেন, তাদের চরিত্র বল, আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ ও তিভিকার মানসিকতা, সর্বোপরি নিখাদ দেশপ্রেম থাকতে হবে। তাদের সম্মুখে পড়ে আছে বিরাট কর্তব্য। দেশের মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে তাদের উচ্চদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হবে। তাদের ব্যস্ত করতে হবে মানুষের মনোলোকে 'সুস্থাহিত, অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি'। আপন চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে হবে। তাদের মন থেকে মুছে কেলে দিতে হবে সব মলিনতা, সব সঙ্কীর্ণতা, সব হীনতা, সব দীনতা। 'অজ্ঞান তিমিরাত্মা জ্ঞানোজ্জ্বল শলাকারা' পথের আলো দেখাতে হবে গুরু মত। এক কথায়, তাদের মনুষ্য করে তুলতে হবে পরিপূর্ণভাবে। কিন্তু সেকাজ করতে হলে, স্বামীজীর উপদেশ শ্রবণ করতে হবে 'Be and make'। আগেকার দলগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রত্যেকটি দল সামর্থ্য অসুব্যবহারী কম,

বেঙ্গী সত্যিকার মানুষ তৈরী করেছিলেন নিজেদের চরিত্রপ্রভাবে। আজ দেখে ক্লেশ হয়, এখনকার দলগুলি তৈরী করছেন স্বার্থসর্বস্ব স্বার্থকে, অমানুষের দল। এসব দেখে শুনে চিত্তাশীল দেশপ্রেমিক মানুষ হচ্ছেন লজ্জায়, ক্ষোভে, হতাশায় মিশ্রমাণ। অথচ দেশের পূর্বসূরীদের দৃষ্টান্ত অমূল্যরূপে কয়লেই একাজ আবার সম্ভব হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ, ঐতর্যকিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী এঁরা স্রষ্টার অতীতের লোক নন। অতি সাম্প্রতিক কালের মানুষ ছিলেন চাপেকার ভাইয়েরা, ক্ষুদ্রিকাম, সত্যেন বসু, প্রমুখ চাকী, সূর্য্য সেন, বিনয় বাবল ধীনেশ। রাসবিহারী বসু, বাধাবর্তন, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত এবং বচ প্রসন্ন ও বিখ্যাত বিপ্লবী নেতারা এখনও চোখ খুললেই আমাদের শরণপথে ও দৃষ্টিপথে অবিরূত হন। দেশের নেতাদের মধ্যে আজ এমন নেতৃত্বের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

গত তিরিশ মাস ধরে রাজনীতিকক্ষেত্রে কৃতের নৃত্য আমরা দেখেছি। দেশ আজ এক বিষম বিপদের সম্মুখীন। আজ প্রয়োজন একটি শূন্যহত, সমৃদ্ধিশালী, ঐক্যশালী, আদর্শনিষ্ঠ ভারত গড়ে তোলবার। অনেক আশা ভরসা নিয়ে দেশের মানুষ আজ দলনৈত্রেী ঐক্যপাঙ্কী পুনরায় নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর নিকট দেশের মানুষের দাবী রাজনীতিক্ষেত্রে থেকে সব আগাছার উৎপাটন, স্বার্থপর আদর্শহীন মানুষদের বিতাড়ন, দেশের মধ্যে প্রকৃত এবং উপযুক্ত মানুষ গড়ে তোলবার বিরাট মঙ্গলযজ্ঞ। একাজের জন্য 'মস্তুর সাধন কিংবা শরীর পাতন' এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে কি ঐক্যপাঙ্কী দেশসেবার কাজে আত্ম-নিবেগন করবেন না? আজকের সাধারণতন্ত্রের উৎসব উপলক্ষে তাঁকে এই শপথ নিতে হবে।

অক্সফোর্ড ইতিহাসের পাতায় তাঁর কোন গৌরবোজ্জ্বল স্থান থাকবে না। এমন স্বর্ণমুখোভা তিনি হেলায় হারাবেন না, এটাই আমাদের বিশ্বাস বিশ্বশ্রুতি। তাঁকে স্তম্ভস্থির সঙ্গে সম্মুখ করুন, এটাই অগণিত দেশবাসীর আন্তরিক প্রার্থনা। এবারকার প্রজাতন্ত্রবিনস সার্থক হয়ে উঠুক, আশা ভরসার নতুন দিগন্ত খুলে দিক দেশের মানুষের সামনে। নতুন নতুন সত্যিকার মানুষ গড়ে উঠুক, এটাও তাদের একান্ত কামনা। কোটী কোটী মানুষের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা দেশনেত্রীর মনের বীণায় অমূল্যগীত হোক, এর থেকে বড় শুভেচ্ছা আর নেই।

জয় হিন্দু ॥

নেতাজীর বাণী

আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, সেই কেবল জীবনের অর্থ বুঝিতে পারে এক জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পেতে পারে।

নূতন ভারত দ্বারা সৃষ্টি করতে চায় তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেকে বিলিয়ে কামাল হয়ে যেতে হবে প্রতিদানে কিছু না চেয়ে।

কোন একটি জীবনব্যয় মানব প্রগতির শেষ কথা এই সিদ্ধান্ত করা সুবোধসঙ্গত নয়। মানবপ্রগতি কখনো থামতে পারে না—অতীতের অভিজ্ঞতার পটভূমিতেই আমাদের গড়ে তুলতে হবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের নীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু ভারতবর্ষ মতো বা ওয়াশিংটনের কারো অন্ধ ত্যাক বা তাবোর হবে না। ভারতবর্ষের নীতি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয়।

এই মরজগতে সব বিনাশ হয়ে যায় এবং যাবেও। কিন্তু বিনাশ নেই স্বপ্ন, আদর্শ ও মনীষার। আদর্শের সাধনায় ব্যক্তি বিলীন হতে পারে, কিন্তু তার অবশুস্তির পরে আদর্শ পুনর্জন্ম হয়ে ওঠে সহস্র আত্মায়। এই-ই আত্মার ধর্ম। ব্যক্তি আত্মাহুতি দেবে জাতিকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য। আজ আমি প্রাণ অর্পণ করব—যেন ভারত বেঁচে উঠতে পারে, লাভ করতে পারে পৌরবর্মের মুক্তি।

ভরুণ বাংলা (ভাষা ভারত) কে আত্মহু হতে হবে, বহু শক্তির উপর নির্ভর না করে তাকে স্বাধীন হতে হবে। নূতন জাতি সৃষ্টির দায়িত্ব আজ ভরুণ সম্প্রদায়ের উপর স্তূত। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে জীবন পণ করে সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

কোন মহৎ কাজে নির্ধ্যাতন সহ্য করার মধ্যে এক অনির্বচনীয় আনন্দ আছে। এ আনন্দের সঙ্গে জীবনের কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না। আর সমস্তই এর নিকট তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ।

যে ভরুণ, ভরুণের ধর্ম পালন কর। ভরুণের ধর্ম কি? হিসাব না করা, হিসাব না করে এগিয়ে যাওয়া। ভরুণকে এগিয়ে চলতে হবে। চলার পথে বিগ্রাম নেই, বিশ্রাম নাই। পথে কাঁটা আছে, হুং আছে, বেদনা আছে।

॥ प्रजातन्त्र दिवसे आबेदन ॥

- १। गणतन्त्राक वक्ता ओ सम्प्रसारित करुन ।
- २। साम्प्रदायिक सम्प्रीति ओ जातीय संहतिक अक्षुण्ण बाधुन ।
- ३। श्रमजीवी मानुषेव अधिकारक एवम् तांदेव जीवनयात्राव म्मानक उन्नत करार संह्रामाक शक्तिशाली करुन ।
- ४। पञ्चायतव म्माधाम गणतन्त्रव धाराक ग्रामे ग्रामे प्रसारित करुन ।
- ५। शिक्षाक्षेत्रे नैराश्र्य दूर करुन । शिक्षाव श्रमजीवी जनसाधारणव अधिकारक प्रतिष्ठित करुन ।
- ६। केतनश्रुव वर्गान्दार सह समस्त कुशकव म्मार्ध वक्ता करुन । कृषिव उन्नति ओ कृषि संह्रामेव काज आवदान करुन ।
- ७। एहि राज्याव शिषव पुनरुज्जीवाने सहायता करुन ।
- ८। जनगण ओ सबकारव सहायोगिताक आवओ शक्तिशाली करुन ।
- ९। एतिक्रियाशील कायमी म्मार्धेव सकल चक्रान्तर विकसन् सतर्क धाकुर ।

पश्चिमवङ्ग सरकार कर्तृक प्रचारित

आइ सि .ए ७१२/८०

স্বাধীন ভারতে পথ নির্দেশ

—ভূত্য চন্দ্র বসু

আমি স্বাধীন ভারতের কয়েকটি সমস্কার কথা আলোচনা করছি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পরে সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য একটি জাতীয়বাহিনী সংগঠনই হবে আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রতিরক্ষার জন্য যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন তা উৎপাদন করবার জন্য আমাদের আধুনিক যুগোপযোগী অস্ত্রনির্মাণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। ফসল, আমাদের এক বিরাট শিল্পায়ন পরি-কল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পর ভারতবর্ষকে তার দারিদ্র ও বেকার-সমস্যার সমাধানে ত্রুটি হতে হবে। ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশসমূহের অন্তর্গত। কিন্তু ব্রিটিশশাসনের অধীনে আসবার পূর্বে তার এই দারিদ্র ছিল না। বস্তুত ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের জন্যই ইউরোপীয় জাতিসমূহ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। জাতীয় ঐশ্বর্য অথবা সম্পদের দিক থেকে ভারতবর্ষকে দরিদ্র বলতে পারা যায় না। আমরা প্রকৃত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী কিন্তু উৎসবেও ব্রিটিশ ও বৈদেশিক শোষণের ফলে ভারত-বর্ষকে দারিদ্রগ্রস্ত হতে হয়েছে। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ কর্মহীন লোকের কীভাবে কর্মসংস্থান করা যায় এবং কী ভাবেই বা ভারতীয় জনসাধারণের এই শোচনীয় দারিদ্রের অবসান ঘটানো যেতে পারে গুরুত্বের দিক থেকে সেইটাই হল আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা।

স্বাধীন ভারতের তৃতীয় সমস্যা হল তার শিক্ষা-সমস্যা। বর্তমানে ব্রিটিশশাসনাধীনে লক্ষ লক্ষ

ভারতবাসীই নিরক্ষর হয়ে রয়েছে। ভারতীয় জন-সাধারণকে যথাসম্ভব দ্রুত অল্পত প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষিত করে তোলার এবং সেইসাথে উচ্চতর শিক্ষার জন্য চিন্তাশীল শ্রেণী সমূহকে অধিকতর সুবিধাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষাসমস্যার সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও জড়িত হয়ে রয়েছে। সেটি হল হরকসমস্যা। ভারত-বর্ষে প্রধানত দু'ধরনের হরক চলে। একটি হল সংস্কৃত (অথবা নাগরী) হরক অন্যটি হল আরবী (অথবা ফারসী) হরক। জাতীয় কার্যাবলী ও সম্মেলনসমূহে এ যাবৎ আমরা দু'ধরনের হরকই ব্যবহার করে এসেছি। এ প্রসঙ্গে কলা প্রয়োজন যে, কয়েকটি প্রদেশে এমন কয়েক ধরণের হরক প্রচলিত রয়েছে প্রকৃত পক্ষে বা সংস্কৃত হরকেরই রকম করে। মূল হরক দুটিই এবং সর্বপ্রকার জাতীয় কার্যাবলী ও সম্মেলনে আমাদের এই দুই ধরণের হরকই ব্যবহার করিতে হয়।

ল্যাটিন হরকের প্রবর্তন করে এখন এই হরক-সমস্যা সমাধানের একটা আন্দোলন শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি ল্যাটিন হরকের সমর্থক। আধুনিক যুগে আমরা বাস করছি এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আমাদের চলতে হবে। এ কারণে, ইচ্ছা হোক আর অনিচ্ছা হোক ল্যাটিন হরকটা আমাদের শিখে নেওয়া দরকার। দেশের সমস্ত স্থানে যদি আমরা ল্যাটিন হরকে লেখার ব্যবস্থা করতে পারি, আমাদের সমস্যা তাহলে

সমাধান হবে। যাই হোক এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমার বনিষ্ট বন্ধুবাচক ও সহযোগিতাও এই অভিমতই শোষণ করেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষের তিনটি সমস্য়ার উল্লেখ আমি করেছি। জাতীয় প্রতিরক্ষা, নারিত্ব দৃঢ়ীকরণ ও জনসাধারণকে শিক্ষাদান। এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্য়ার সমাধান আমরা কোন পথে করব? নারিত্বটুকি যে সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত উদ্ভোগের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে, না কি রাষ্ট্র স্বহস্তে এই সমস্য়ার সমাধান নারিত্ব গ্রহণ করবে? এ ব্যাপারে বর্তমানে ভারতবর্ষের জনমত হল এই যে, এই সমস্ত জাতীয় সমস্য়ার বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্য়ার সমাধান ভার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দেওয়া চলে না। দৃষ্টান্তরূপ, নারিত্ব ও বেকার সমস্য়ার সমাধান ভার যদি বেসরকারী প্রচেষ্টার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, সমস্য়ার সমাধান হতে তাহলে বোধ হয় কয়েক শো বছর লাগবে।

ভারতবর্ষের জনমত এ ব্যাপারে তাই বানিকটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী, সমস্য়ার সমাধান নারিত্ব এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না, রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক সমস্য়া সমাধানের নারিত্ব গ্রহণ করবে। শিল্পপ্রসারই হোক আর আধুনিক কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তনই হোক, ভারতীয় জনসাধারণ যাতে অত্যন্তকালের মধ্যে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে, রাষ্ট্র তার জন্য স্বয়ং নারিত্ব গ্রহণ করে ক্রম সংস্কারসাধন করবে এইটাই আমাদের কাম।

তবে একটা কথা। সমস্য়া সমাধানের ব্যাপারে নিজ পদ্ধতিবাহী আমরা কাজ করতে চাই। অস্বস্ত্য দেশে যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে, স্বভাবতই আমরা তা বিচার বিবেচনা করে দেখব মতে, তবে ভারতবর্ষের অবস্থাভাবায়

ভারতীয় পন্থাতেই আমাদের সমস্য়ার সমাধান করতে হবে। কলত, ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থার উপযোগী ভারতীয় ব্যবস্থারই আমরা প্রবর্তন করব। ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশই দরিদ্র। এদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি না আমরা অর্থনৈতিক সমস্য়ার সমাধান করতে আগ্রহের হই তা হলে চীনে আজ যে বিশৃঙ্খলা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষও সেই একই রকমের বিশৃঙ্খলা ও জটিলতার সৃষ্টি করা হবে। চীন যে এ অবস্থার সৃষ্টি হল কেন এবং কুর্যোমিনটং দল চীনা জনসাধারণের স্বার্থকেই তাদের দ্রুতই স্থান দিয়ে থাকলে কমুনিষ্ট দলের মত বৈদেশিক প্রভাবাধীন আর একটি দল সৃষ্টির সেখানে প্রয়োজন হত কি না জানি না।

অভিজ্ঞতার থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি। চীন যে হুল করেছে, সে জুলের আর আমরা পুনরাবৃত্তি করতে চাই না আমাদের দেশে আজ দেখতে পাচ্ছি যে এ যুগের জাতীয় আন্দোলন জনসাধারণের অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষাণদের স্বার্থের সঙ্গেই অঙ্গারী ভাবে নিজেদের জড়িত করেছে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ এরাই। জনসাধারণের স্বার্থকেই আমরা দ্রুতই স্থান দিয়েছি। এ কারণে ভারতবর্ষে আজ কমিউনিষ্ট পার্টির মত অলাদা একটি দল থাকবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদীরা যদি জনস্বার্থকেই দ্রুতই স্থান না দিচ্ছে, তা হলে চীনে আজ যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষও সেই একই অবস্থার সৃষ্টি হতো।

এবারে রাষ্ট্রব্যবস্থা বা গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে বিবেচনা করে দেখা যাক। সমাজবাদী পদ্ধতিতে যদি আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হয় তো রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে করে সেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সর্বাভাবে বাস্তবে রূপান্তরিত

করা সম্ভব হয়। তথাকথিত তাত্ত্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজবাদী ভিত্তিতে অর্থ নৈতিক সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। এ কারণে আমাদের পূর্ণ কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

ভারতবর্ষে আমরা গণতান্ত্রিক সংস্কার কিছু কিছু নমুনা দেখেছি। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে কিতাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কাজ চলে তাও আমরা বিবেচনা করে দেখেছি। অতঃপর এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হয়েছি যে, গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে স্বাধীন ভারতের সমাজ-সমূহের সমাধান করা যাবে না। ভারতবর্ষের আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তা ধারণা একটি কর্তৃত্ব-সম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থারই পক্ষপাতী। সৃষ্টিমের বন অথবা চক্রান্তকারীর সেবায় নয়, জনসাধারণের সেবাতেই সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা নিযুক্ত থাকবে। স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের বিবেচনায় এই রকমই হওয়া উচিত। শিল্প, শিক্ষা প্রতিরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নব নব সংস্কার সাধনের পূর্ণক্ষমতা সম্পন্ন এমন একটি শাসনব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন যে শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের সেবাতেই কর্মনিযুক্ত থাকবে।

ধর্ম ও বর্ণ সম্পর্কে স্বাধীন ভারতের মনোভাব কি হবে, সে বিষয়েও আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এ সম্পর্কে প্রায়ই প্রত্নাদি উত্থাপন করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে নানা ধর্ম বর্তমান। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এই সমস্ত ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন মনোভাব অবলম্বন করতে হবে এক ধর্মচরনের ব্যাপারে প্রত্যেককেই পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।

বর্ণ সমস্যা আজ আর কোন সমস্যা নয়। তার কারণ প্রাচীন যুগে এই বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল আজ তার কোনও অস্তিত্ব নেই। এখন এই বর্ণপ্রথাটা

কি? পেশা অথবা বৃত্তির ভিত্তিতে কোনও একটা সম্মান্যকে করেকটি গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা এবং বিবাহ ব্যাপারে নিম্ন নিম্ন গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে পাত্রপাত্রী নির্বাচনই হল বর্ণপ্রথা। এ যুগের ভারত বর্ষে এরকম কোনও বর্ণ বৈধ্য নেই। পেশা নির্বাচনের ব্যাপারে প্রত্যেকের আজ স্বাধীনতা রয়েছে। সে অর্থে আর আজ বর্ণপ্রথার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। এর পর আসে বিবাহের প্রস্ন। প্রাচীন যুগে বিবাহের ব্যাপারে নিম্ন নিম্ন বর্ণগোষ্ঠীর বাইরে যাওয়া হত না। বর্তমানে বিবাহের ব্যাপারে অবাধে বর্ণ সীমানা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। স্ত্রীরাও বর্ণপ্রথারও ক্ষত অবদান ঘটছে। বস্ত্রভাঙ্গা জাতীয় আন্দোলনে আমরা কখনও কান্ড বর্ণ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। এমন কি আনালের বনিষ্টতম সহকর্মীদের কান্ডের কান্ডের বর্ণ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এযুগে বর্ণ সম্পর্কে আমরা কিছুই ভাবিই না। স্বাধীন ভারতের পক্ষে বর্ণ কোনও একটা সমস্যাই নয়।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাদের জানানো প্রয়োজন মনে করি। বৃষ্টিপ শক্তি পৃথিবীর সর্বত্র এই ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, নিজেদের মধ্যেই আমরা ঝগড়া বিবাদ করে মরিছি, বিশেষ করে ধর্মের ব্যাপারে আমাদের কলহের অন্ত নেই। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এতে করে একটা মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে কোনও কোনও ব্যাপারে হুহুতো মতানৈক্য থাকতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি থেকেই সেরকম মতানৈক্য দেখতে পাওয়া যাবে। পৃথিবী তথাকথিত প্রগতিশীল দেশগুলির কথা যদি বলা যায়, দৃষ্টান্তরূপে যুক্তপূর্ব ফ্রান্স অথবা হিটলার ও তাঁর দল ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেকার জার্মানীর কথা যদি বিবেচনা করে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে এই সমস্ত দেশের জন-

সাম্রাজ্যের মধ্যেও ভীতি বিরোধ বর্তমান ছিল। এমন কি স্পেনে পুয়ান্তের একটি গৃহ যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু এই সমস্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিবাসবিসম্বাদ ছিল বলেই যে নিজেদের হাতে শাসন ভার গ্রহণ করতে তারা অক্ষম, কেউই এমন কথা বলবে না। একমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই ইংরেজরা বলছে যে, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যেহেতু কয়েকটি বিষয়ে বিরোধ রয়েছে, অতএব স্বাধীনতা লাভের তারা যোগ্য নয়। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে বিবাসবিসম্বাদ রয়েছে বললাম তা আবার ব্রিটিশ সরকারের সৃষ্টি। ব্রিটিশ শক্তি যে সদাসর্বদা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সর্বপ্রকার উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বিরোধ সৃষ্টির জন্য এতখানি করে ব্রিটিশ শক্তি এখন কলছে যে আমরা স্বাধীনতালভের যোগ্য নই।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, সোভিয়েট রাশিয়ার মত একটি আধুনিক রাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করে দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, চরিত্রগত বৈষম্য সবেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহুসংখ্যক জাতিগত সেখানে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে একাত্ম করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষেত্রে যদি তা সম্ভব হয়ে থাকে, সোভিয়েট রাশিয়া অপেক্ষা অধিকতর সমন্বিত চরিত্র ভারতবর্ষকেও সেক্ষেত্রে একজাতি হিসেবে একাত্ম করে তুলতে না পারার কোনও কারণ নেই। বর্তমানে ভারতবর্ষের বাইরে যেখানে ব্রিটিশ প্রভাব নেই, সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখতে পাওয়া যাবে না। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা

আন্দোলনের এবং আফ্রিকা হিন্দু কৌন্সেলের মধ্যে ধর্ম বর্ষ অথবা শ্রেণীগত কোন সমস্যাই নেই। একমাত্র ভারতবর্ষই অর্থাৎ ব্রিটিশ শক্তির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সেখানে বর্তমান—এই সমস্ত বিরোধ দেখতে পাওয়া যাবে!

স্বাধীন ভারতে আমরা কি ধরনের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা গঠনের পক্ষপাতী তা আপনারাদের বলেছি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের রাষ্ট্রদর্শন কী? শ শ বংসর পূর্বে আমি ‘The Indian Struggle’ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। এ বিষয়ে সেখানে আমি আমার অভিমত জ্ঞাপন করেছি। তাতে আমি বলেছিলাম যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ব্যবস্থার সময়সমাধান করে আমাদের নতুন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদিকে ক্যাসিজম (একে স্ফল্গু সোস্যালিজমও বলতে পারেন) ও অন্য দিকে কমিউনিজমের বিরোধের কথা বিবেচনা করুন। গুটি ব্যবস্থার মধ্যেই যে সমস্ত কল্যাণকর দিক রয়েছে তার সময়সমাধান করতে না পারার কোনও কারণ নেই। কোনও একটি বিশেষ ব্যবস্থা যে মানব প্রগতির চূড়ান্ত পর্যায়স্বরূপ, একথা বলা যুক্তিভরই নামান্তর। দর্শনের দ্বারা হিসেবে আপনারা জানেন, মানব-প্রগতির কোনও বিরাম আমরা পরম্পরবিরোধী ব্যবস্থাসমূহের একটা সময় সাধন করিতে চেষ্টা করব। বিরোধী ব্যবস্থাসমূহের কল্যাণকর বিষয়গুলির সেখানে মিলন ঘটবে।

এবারে স্ফল্গু সোস্যালিজম ও কমিউনিজমের কল্যাণকর বিষয়গুলির একটা তুলনা করে দেখা যাক। কতকগুলি গুণ উভয় ব্যবস্থার মধ্যেই বর্তমান। গুটি ব্যবস্থাই গণতন্ত্র-বিরোধী আধবা

একনায়কদ্বারা। দুটি ব্যবস্থাই পুঞ্জিবাদিদের। কিন্তু এই মিল সবেও কয়েকটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। ইউরোপে স্ত্রাশনাল সোস্যালিজমের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আজ কি দেখতে পাওয়া যায় ?

স্ত্রাশনাল সোস্যালিজম জাতীয় একা ও সংগতি বিধানে এবং জনসাধারণের অস্থায়ী উন্নতিসাধনে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু পুঞ্জিবাদী ভিত্তির উপরে যে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল স্ত্রাশনাল সোস্যালিজম তার আমূল সংস্কারসাধনে সক্ষম হয়নি।

পঞ্চাত্তরে কমিউনিজমের ভিত্তিতে সোভিয়েট রাশিয়ার যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা যাক। একটি বিরাট মাকল্যের সেখানে সজ্ঞান পাওয়া যাবে, তা হলো তাদের পরিকল্পিত অর্থনীতি। কমিউনিজমের ক্রটি হলো এই যে জাতীয় মনোভাবের সে মূল্য বোঝে না। জাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে ব্যবস্থা জনসাধারণের সামাজিক প্রয়োজন মেটাতেও সমর্থ, ভারতবর্ষ এমনই একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা। আমরা গড়ে তুলতে চাই। অর্থাৎ সেটা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদেরই একটা সমন্বয়রূপ। আজকের আধুনিক স্ত্রাশনাল সোস্যালিজম সেই সমন্বয়সাধন করতে পারেন নি।

কয়েকটি ব্যাপারে ভারতবর্ষ সোভিয়েট রাশিয়ার অনুসারী নয়। প্রথমত, ভারতবর্ষে শ্রমী সংঘর্ষের কোন প্রয়োজন নেই। স্বাধীন ভারতের গড়নমুঠে যদি জনসাধারণেরই মূখপাত্র হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন, তাহলে সেখানে শ্রমী সংঘর্ষের কোন প্রয়োজনই ঘটবে না। রাষ্ট্রকে জনসাধারণের সেবা

নিবৃত্ত করেই আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে পারি।

শ্রমিক শ্রমীর সমস্তর উপরন্তে সোভিয়েট রাশিয়া অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ভারতবর্ষে প্রধানত কৃষকদের দেশ। শ্রমিক শ্রমীর সমস্তর উপরে তাই সেখানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

আর একটা কথাও আমরা পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না। মার্কসবাদে মানব জীবনের অর্থনৈতিক দিকটির উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পূর্বে এদিকটিকে অবহেলা করা হতো। অর্থনৈতিক দিকটির গুরুত্ব আমরা বুঝি কিন্তু তাই বলে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনও প্রয়োজন নেই। আবারও বলছি স্ত্রাশনাল সোস্যালিজম ও কমিউনিজমের সমস্তরই আনাদের রাষ্ট্র-দর্শন হওয়া উচিত। জিন্দা ও প্রতিক্রিয়ার যে দৃশ্য, মহত্তর কোনও সমস্যার মধ্যেই তার নির্যাসাদন করতে হবে। কলনিত্তি সেই কথাই বলে। এ যদি না করা হয় তো, মানব প্রগতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ভারতবর্ষ তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার জন্যই চেষ্টা করে যাবে।

আনুষ্ঠানিক বিধান সম্পর্কে আমাদের ধারণা কি সেই সেই কথা বলেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। টেকিগুণে বারকয়েক এ বিষয়ে আমি বক্তৃতা দান করেছি। স্বাধীনতা, ছাত্র বিচার ও পারম্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে পূর্ণ এশিয়ার একটি নববিধান সৃষ্টি সম্পর্কিত বৃহৎ যোগ্যতা যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আনুষ্ঠানিক সমস্তা বিচারে বাস্তব গতভাবে আমি যথেষ্ট আগ্রহশীল। আমাদের আন্দোলনের জন্য সমর্থন অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভাজন

দেশে আমি কাজ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি এবং এ ব্যাপারে লীগ অব নেশনের কার্যকলাপ পরিবর্তনের সুযোগ আমার ঘটেছে।

লীগ অব নেশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার কারণ কি, তা বিচার করে দেখা বহুদূর, তাতে আমাদের লাভই হবে। আমাকে যদি এ ব্যর্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় তো আমি বলব উত্তোক্ত রাষ্ট্রসমূহের অতিরিক্ত স্বার্থপরতা ও অদূরদর্শিতার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছে। উত্তোক্ত রাষ্ট্রসমূহ ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা। আমেরিকা লীগ থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের হাতেই এর নিরস্ত্রতায় এসে পড়ে। এ ছাড়া নেতৃত্বানীরা রাষ্ট্র নিঃস্বার্থপরতার দুষ্টান্ত স্থাপন না করে তার পরিবর্তে লীগ অব নেশনকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি ও অভীষ্টসাধনের হস্ত হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। একমাত্র স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ববিচার ও পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তিতেই একটি আন্তর্জাতিক বিধান গড়ে তোলা সম্ভব। এর থেকে বৃহতে পাতা যায় যে, বস্বার্থ পন্থা ও বস্বার্থ ভিত্তিতেই পূর্বে এশিয়ায় কাজ শুরু করা হয়েছে। এখন বৃহৎ যোষণার নীতিসমূহ বাস্তবে কার্যে পরিত্যক্ত হয় সেইটাকে ব্যবস্থা করাই হলো আমাদের একমাত্র কর্তব্য। নীতিসমূহকে কার্যে পরিত্যক্ত করা হলে এ ব্যবস্থা সাক্ষ্যমান্ত হতে পারে তা যদি না করা হয়, এ ব্যবস্থা ব্যর্থ হবে।

(উত্তোক্ত রাষ্ট্রের আচরণ দৃষ্টান্তের উপরই এ ব্যবস্থার সাক্ষ্য নির্ভর করেছে।) উত্তোক্ত রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থপরতা ও অদূরদর্শিতার জন্যই লীগ অব নেশনকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ বিশেষতঃ উত্তোক্ত রাষ্ট্র যদি স্বার্থপর ও অদূরদর্শী নীতি পরিহার করে চলে

এবং একটি নৈতিক ভিত্তির উপরে কাজ চালিয়ে যাবার পরীক্ষাটা তাহলে সাক্ষ্যমান্ত হতে পারে। হবার কোনও কারণ নাই।

উত্তোক্ত রাষ্ট্রের ক্রিয়াকার্য অবতীর্ণ হয়ে জাপান যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রহণ করেছে, পুনরায় আমি তার উল্লেখ করতে চাই। রাষ্ট্রের দায়িত্বের উল্লেখকালে যুবসমাজের দায়িত্বের উপরেও আমি যথেষ্ট গুরুত্ব আদ্যপন করছি। আজকের যুবসমাজই ভবিষ্যতের জাতি, ভবিষ্যতের নেতৃত্বভারও তাদের গ্রহণ করতে হবে। যে পরিকল্পনা আজ যুবসমাজের হস্তে আছে ও সমর্থনলাভ করেছে সমগ্র জাতিই একদিন তাকে সমর্থন করবে। যে পরিকল্পনার পিছনে যুবসমাজের সমর্থন নেই, আত্মবিক্রমাবেই তার দৃঢ়তা অনিবার্য। সেব বিচারে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, এই নববিধানকে সাক্ষ্যমান্ত করে তুলবার দায়িত্ব এ দেশের যুবসমাজেরই। এই নববিধানের প্রবর্তনায় জাপান যে বিরাট নৈতিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, আমার আশা ও কামনা হ্যায়সমাজ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। জাতির ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি তারাই।

কোন রাষ্ট্রের পক্ষে উচ্চ একটি নৈতিক মান অর্জন করা এবং দূরদৃষ্টি ও নিঃস্বার্থ মনোভাব নিয়ে একটি নববিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব কিনা, কেউ কেউ সে বিষয়ে সন্দেহান হতে পারেন। মানবতার উপরে আমি আস্থাশীল। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যদি নিঃস্বার্থ হয়ে পরিক্রমাবে জীবনযাপন সম্ভব হয়, তাহলে একটি জাতির পক্ষেও তা সম্ভব না হবার কোনও কারণ নেই। একটা বিপ্লবের ফলে সমগ্র জাতির দৃষ্টিভঙ্গি পালটে গিয়েছে এবং সে জাতি একটা উচ্চ নৈতিক মান অর্জনে সমর্থ হয়েছে, (বাকি অংশ ১২ পাতায় প্রাপ্য)

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ স্বাধীনতা ২০ ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহান নলিনী বাগচীও বাগী ছিল সুশিখাযাচ কেশর।
বিপ্লববিদ্যালয়ের একজন সেরা ছেলে তিনি। ঘাটী-
সুদেশম পত্রিকা সম্পাদনা পেরে বহরমপুর কলেজে ভর্তি
হয়েছিলেন। এই সময় পাঠ্যে কবীর অত্যন্ত প্রেমে তিনি
কবীর জীবন অধ্যয়ন করে বিপ্লব কণ্ঠের সর্বকণ্ঠের কণী
হলেন। সমিতির বিহার সংগঠনের তার নিয়ে তিনি
কাজ করতে লাগলেন। বাংলাদেশে তখন পুলিশের
বড় উৎপাত। একতর বিদ্রোহীরা প্রায় সকলেই বাংলা
ছেকে আশ্রয়, বিহার অথবা উত্তরপ্রদেশ অকলে আশ্রয়
নিচ্ছেন। নলিনী বিহারে মজেকরপুরে থাকতেন বিহারী
সাথে। তাঁর পরে ঘোড়া কাপড়, মাথায় টিকি, হাতে
লোটা-কমল, মুখে বিহারের বেগুণী কথা। আচাধ্য
কে, বি, কপালনী তখন মজেকরপুর কলেজে অধ্যাপনা
করতেন। তিনি নলিনীকে খুব প্রেমে করতেন। সময়ে
অসময়ে কিছু অর্থ দিয়ে সমিতির সাহায্য করতেন।

এই সময়ের বন্ধুত্ব নলিনী ঘোষ তখন আদ্যে
থাকতেন। সংগঠন সম্পর্কে তাঁর মধ্যে পরামর্শ করবার
জুড়ই নলিনী সোহাটী গিয়েছিলেন। এইবার সোহাটী
নগরে তাকে হুকুম হতে হয়। এখন রাহির সংঘের পর
তৃতীয় দিন বিকাল বেলা সোহাটীর বিত্তর আশ্রয়ের
বিদ্রোহী নলিনী ঘোষের সঙ্গে এসে মিলিত হসেন নবগ্রহ
পাহাড়ের পূর্বদিকে। কিন্তু সংঘাতীত পুশিন এসে
এই সময়ে তাদের ঘিরে ফেলে। এর মধ্যে নলিনী
ছিলেন। ছই পকে ভাল বিনিয়র চলে। নলিনী ঘোষ
আশ্রয়ের যে অন্য নকল বন্দোবাস্যর প্রেরার হলেন।
নলিনী বাগচী ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু নলিনী ঘোষের
কঠোর নির্দেশ হল-বলনোতা হিগায়ে আন আবেশ
করাহি, সময়ে পড়। কলে নলিনী বাগচী অন্য প্রোষ

মাসকর স্থান অ্যাস করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু কোথায়
হায়েন? পার্বত্য অমলে চাহকি পূর্ণ। কোন দিকে
কোন পথ নেই। হঠাৎ এক মাগা সন্ন্যাসী বেগা পেল।
বিদ্রোহীর প্রেমেই তিনি বললেন, তোরা এখানে পড়েছিল।
ঐ জলার পথে পালা। মাগা সন্ন্যাসী পথ দেখাইয়া
ছিলেন। সেই পথে চলে ছই বিদ্রোহী নিবিয়ে অমল
শ্রেক ঘেঁষিয়ে এলেন। রাহির অন্ধকারে মথোত
ক্রমাসত তাঁরা পথ চলেছেন। ফেরেন তাঁরাবার অমল
ছিল না।

২ই জাহাঙ্গীরী প্রথম দিন সংঘের পর আর তাদের
আহার মোটামুটি। কলে বিদ্রোহীরা সার হয়ে পড়লেন।
এই জাবে ২ই জাহাঙ্গীরী তারা তখন পার্বত্য অমলের
কিমারার এসে পাড়ালেন তখন রাহি ঘনিয়ে এগেছে।
রাহিতে বের দুর্বল, আর চলবার শক্তি নেই। জাহাঙ্গীরী
অপেক্ষাকৃত নিরাপন্ন মনে করে দুজনেই বের এলিয়ে
ছিলেন পত্র মাথায়। অরক্ষণের মধ্যেই নিরাপত্তিত
হলেন তারা। সকালে সুবোমর হলে দুজনে উঠে
বললেন। কিন্তু মাথায় একি নিরাপন্ন বাধ্য। সুতা পেল
রাহিতে চলবার সময়ে পার্বত্য অমলে বিরাড পোকা
মাথায় চুলের মধ্যে ঢুকে এখনও কাঁড়ে রয়েছে।
শোকাঙলি এমন শক্তভাবে মাথার মধ্যে আটকে গেছে
যে, সবে একখানি ছুরি সাহায্যে একে অপরের চুল
কেটে তা থেকে দূর হলেন।

কিন্তু এখন কিছু বাবার বাবু না হলেনই না।
রেল লাইন ধরে চলতে লাগলেন দুজনে। কিন্তু দুবে
মোকাঙ্গরর সন্ধান পাওয়া গেল। নলিনী অসহীরা তারা
কিছুটা শিখেছিলেন। নিজেই অসহীরা পঠির বিয়ে
কিছুটা ডিঙাঙ পগ্রহ করে আনলেন। তাই বলে

(১০ পাতার শেষাংশ)

ভিজিয়ে পরম তৃপ্তির লগ্নে দুজনে আহার করলেন। খাওয়ার পূর্বে দুজনে আহার পাখাড়ের কোলে এসে আশ্রয় নিলেন। কয়েকদিনের জাহাজে আহার তারা নিষিদ্ধ হয়ে পড়লেন। ক্রমে বিকল হল, রাত্রিও এগিয়ে চলল। অধিক রাত্রিতে জাহাজের কিনারাও বাঘের ডাক শোনা গেল। হাতের রিকলবার ছুটি নিয়ে দুজনে উঠে খাঁড়ালেন। অতীত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দুজনে পাড়ে চড়ে বসলেন। অশ্বশিঠি রাত্রি তাৎপের পাড়ের উপরেই কাটল। ভোর হতেই আহার চলা শুরু হল। পাথে এক বেল ট্রেনে কুলীনের কাছে চেষ্টা কিছুটা ছাড়া খেয়ে খুঁচা ইন্নিবুতি করলেন। এইভাবে লক্ষণ নৌদের পঁচি রাত ও চারদিন চলার পরে তারা এক ট্রেনে এসে লামডিং-এর টিকেট কিনে সেখান থেকে ষ্ট্রাইট চলে এলেন। বাত্মায়েশ নিরাপন্ন নহ মনে করে বিদ্যাবীরা কাটিহার-হরে বিহারে এলেন। বিহারে গিয়ে নদিদী বখারীতি বিহারী লাঙ্কলেন। তাঁর অর্থাভাব বুঝে কপালদীর্ঘ তাকে কিছু টাকা দিলেন।

কিছুদিন পরে প্রবেশ্য লক্ষণতত্ত্ব বাত্মায়েশ এসে থাকা পড়ে যান। নদিদী ফেরলেন, সেদিনের সেই তারা। হাটে কোয়ার বিদ্যাবীনের লগ্নে লগ্নোৎসাহ স্থাপন করতে না পারলে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। তাই কোয়ার কে আছে নতুন করা জন্ত তিনি কলকাতা চলে এলেন। কলকাতার এসে তিনি গড়ের মঠের এক গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু এই অসহায় কারও সাহায্য পাবার আশেই তিনি নিরাশ্রয় দলভ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে সতীশ পাণ্ডাভানী দোহাটী থেকে নানান্যায়ন দুই কলকাতা এসে পৌঁছলেন। নদিদী ঐ অসহায় অসহায়ই কোনক্রমে একজন পরিচিত ব্যক্তিকে বুঝে বার করলেন। তিনি একথা সতীশপাণ্ডাকে লগ্নোৎসাহ দিলেন। এ লক্ষণে সতীশপাণ্ডা পাণ্ডাভানী দিগেয়েলেন, 'ঐ ব্যক্তি এসে আবারে আনাল, আশ্রয়দাতার এক বন্ধু বিহার থেকে এসে গড়ের বাঠে অসহায় অসহায় গাছতলায় পড়ে আছে। তার কথা শুনে আমি রাত্রির অচণ্ডার গড়ের বাঠে গিয়া দেখি, নদিদী বন্ধুদের কাছে এক

বিষ ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। শ্রুতরাঃ একটা জাহাজ পক্ষে সামগ্রিকভাবে সেই জ্বরে উন্নীত হওয়া সম্পর্কে যদি কারও কোনও সন্দেহ থেকে থাকে তাহা তার সঙ্গে আমি একমত নই।

উপসংহারে আমি আবারো বলছি যে উল্লোক্ত লক্ষণ যে বিরাট দৈনিকতার গ্রহণ করেছে, তার গুরুত্ব তাকে উপলক্ষ্য করতঃ হবে। এ দায়িত্ব শুধু নেতৃগণ ও রাজনীতিকদের নয়, এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির। বিশেষ করে যুবসমাজ ও ছাত্রগণ—সেদের বার। আশাশুভ—এ দায়িত্ব তাঁদেরই।

গাছতলায় কখন মৃত্যি ঘটে তার আছে। যেন কোন কুলী। তার সর্বাঙ্গে বসন্তের দাপ। বেহেশ হয়ে পড়ে ছিল, কিন্তু রিকলবারটি তখনও হাতের মৃগের মধ্যে। আমি স্থির করলাম, পুনিশের হাত থেকে এবং জ্বরের হাত থেকেও নদিদীকে বাঁচাতে হবে। আমি তাকে গোসলে নিজ ঘাটার নিয়ে এলাম এবং গুরুত্ব করে বাঁজিয়ে জুললাম। কিন্তু নদিদী কোয়ার বিদ্যাবী, কোন ডাক্তার থেকে তার চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

হাসপাতালেও তার চিকিৎসা হতে পারে না। তাই আর যেন কিছুই চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। কয়েক বসন্তের জটিলে সর্বাঙ্গ চেয়ে বেল। কয়েক তার কথা শুধ হল। এইতরফ জীবন-বরণের লগ্নে লগ্নোৎসাহ করে দশমিক পরে নদিদী গেরে উঠল। এই লগ্নে তাহাণী বন্ধুদের উত্তরবনের বিভিন্ন স্থান দুই কলকাতার চলে এলেন। তিনি নদিদীকে নিয়ে ঢাকার চেষ্টা গেলেন। স্থির হল নদিদী এর পর পূর্ববঙ্গ লগ্নোৎসাহ তার নিয়ে ঢাকায়ই থাকবেন।

এরপরেই কলকাতার লগ্নোৎসাহ ১৯১৮ সালের ১০ই জুন।

(চলাবে)

নেতাজী ফিরে এসে

বাংলা তথা ভারতের বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন দেশের মানুষদের উদ্দেশ্য করে যে 'জগতে যখন এসেছি, তখন একটা দাগ রেখে যা'। স্বামীজীর উত্তর সাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্র জগতে শুধু দাগ রেখেই যাননি, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে বে অবিস্মরণীয় দাগ, রেখে গিয়েছেন, তা দেশকাল অভিক্রম করে নিরবধি কালের কশোলভলে সমুজ্জ্বল ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। নেতাজী নিজেকে নিজের অমরকীর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বহুজনহিতের নিবেদন করে, কিন্তু প্রতিদানে কোন কিছু না চেয়ে, ভারতবাসী, তথা পৃথিবীর, সমস্ত দুঃখী পরাধীন মানুষের কল্যাণ সাধনার, নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। অসাধারণ দেশপ্রেম (যেটা মানবপ্রেমেরই নামান্তর) নৈরাশ্রধ্বংসী নিধা, ইচ্ছাপাত কাঠিন্য সহ্য, দুর্জয় সাহসিকতা, অদ্বুত চরিত্রবল ও অপরামেয় মনোবল নিয়ে তিনি জীবনের পথ পরিক্রমা করে গিয়েছেন এবং জগৎবাসীর সামনে অশুঙ্করনীয় আদর্শ ও নৃষ্টান্তস্থাপন করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন এমন একজন মহামানব যার মূল্যায়ন সমসাময়িক কালে পরিপূর্ণভাবে করা সম্ভব হয়নি। কতদিন যাবে, বিকাশিত শতাব্দের মর্ত, তার মহৎ কৌতুকাহিনী আত্মপ্রকাশ করবে ও মানুষকে অশুপ্রাপ্তি করবে।

ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনার কল্পতে।

নেতাজীর সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। দেশে থাকতেও তাঁর প্রমাণ মিলেছে এবং

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মিলেছে তাঁর আত্মজ হিন্দু বাহিনী সংগঠন ও পরিচালনার মধ্য দিয়ে। আজাদ হিন্দু বাহিনীর দ্বারা প্রথম সারির নেতা ছিলেন, তাদের অনেকেরই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে কোন সংশয় ছিলনা। বরং তারা ইংরেজ শাসকের সঙ্গে যুদ্ধে ছিলেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে কীর্তিদান করে হুহু প্রাচ্যে ইংরেজদের সমস্ত সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে হটিয়ে দেবার জন্য বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর অবদান অসামান্য। বস্তুতঃপক্ষে নেতাজীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় রচনা করার মূলে ছিলেন এই বিপ্লবী মহানায়ক। দুই জনের চরিত্রগত ও নীতিগত সামঞ্জস্যও ছিল প্রকৃতভাবে। দুই জনেই শত্রুবিপদের ঝুঁকি নিয়ে, নিজেকে জীবন বিপন্ন করেও দেশ জননীর মুক্তির জন্য উদ্ধার মত সারা পৃথিবী পর্যটন করে বেড়িয়েছেন একজন যেন জগজ্ঞনার চরিত্রের পরিপূরক। ভারতবর্ষের মৌভাগ্য যে এমন মহামানবেরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন।

নেতাজীর মৃত্যু সংবাদটি আজো রহস্যাক্রান্ত রয়ে গেল। হু শের কথা, আমাদের জাতীয় সরকারও সম্বন্ধে যথাযথ কর্তব্য পালন করেন নি। রাসবিহারীর শেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর চিত্তাভ্রম দেশে ফিরিয়ে আনার অঙ্গ। দীর্ঘ বর্ষের বছরের মধ্যে স্বাধীন ভারতের কর্তব্যারণ্য দেখা করেন নি। তেমনি ভাবেই তারা ব্যর্থ হয়েছেন নেতাজীর জীবন বা মৃত্যু সম্বন্ধে যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করতে।

অঞ্চল দেশ এদের নিকট বিশেষভাবে স্তনী। এদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের কল্পনাও করা যায় না। এই দুই জনের কেউ নিজেদের নাম, বংশ বা প্রতিষ্ঠার কথা জেবে কোন কাজই করেন নি। এই স্ববিশ্বাস যদি পরিশোধ না করা হয়, দেশের মানুষের অকৃতজ্ঞতাই তাতে প্রমাণিত হবে। নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষে আমরা ভারত রাষ্ট্রের কর্তব্যবোধের প্রতি আহ্বান জানাই এই সম্বন্ধে স্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। সন্তে সঙ্গে দেশের মানুষকেও অগ্রবোধ করি সজাগ হয়ে স্ববিশ্বাস পরিশোধ করার জন্য। আরো একটা করণীয় কাজ দেশবাসীদের আছে। সেটা হল এদের সম্বন্ধে সে অপবাদ ও বিকৃত ইতিহাস রচনা করেছেন কিছু লোক, তদন্ত কমিশনের বিচারপতি, সেগুলিকে জজালের বৃত্তিতে কেনে দিয়ে, প্রকৃত তথ্যভিত্তিক ইতিহাস রচনা করতে হবে, যাতে তাদের অবদানের সঠিক মূল্যায়ন হবে এক বর্তমান ও আগামীদিনের বংশধরেরা অমৃতকবীর 'আদর্শ' খুঁজে পাবে এবং নিজেদের মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবার অগ্রপ্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে যেটা দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

ষষ্ঠি বর্ষমস্ত্র যেমন 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র সৃষ্টি করে নিজের অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তেমন 'জয় হিন্দ' মন্ত্রের উল্লাস হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জাতীয় ইতিহাসে এই দুই বঙ্গ-সন্তানের অবদান সমস্ত বাঙ্গালী জাতি শুধা ভারতবাসীকে গৌরবান্বিত করে রাখবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে নেতাজীকে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি।

ইংরেজ কবি একদিন যেমন অল্প একজন বিশিষ্ট ইংরেজ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে Milton, thou Shouldest be living at this hour, আজকের কলঙ্কমলিন পরিবেশের দিকে তাকিয়ে সমগ্র দেশবাসীও বলতে চায়। 'Nataji, thou Shouldest be living at this hour.'

ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এমন একটা নৈরাশ্রজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেটা দেশের পক্ষে গভীর উদ্বেগজনক। অধিকাংশ রাজনীতি-বিশ্ববের কোন আদর্শের বাংলাই নেই। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা দেশের সামগ্রিক স্বার্থ বিসর্জন দিতেও পরাশ্রয় নয়। এদের অল্প যে কোন গুণ থাকুক না কেন, দেশপ্রেম নামক সদ গুণটিকে এদের মনের মধ্যে ভুবুঁরি নামিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সব চরিত্রহীনদের মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তন আনতে পারেন তারাষ্ট, যাদের নিজেদের অসাধারণ ও অমৃতকবীর চরিত্রবল আছে। তারাষ্ট পারেন নিজেদের চরিত্র প্রভাবে অন্তর্ভুক্ত চরিত্রবান করে তুলতে। নেতাজী ছিলেন সেই স্তরের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নেতা। তাই আজ তাঁকে আমরা কিরে পেতে চাই সমস্ত অন্তর দিয়ে, তাই কামনা করি 'নেতাজী জুমি কিরে এসো।' ইত্যদ্যদে তাঁর প্রাণশিত পাথে যদি আমরা চলি, তাঁর চরিত্রের সঙ্গুণাকলী যদি আবৃত করতে সচেষ্ট হই তবেই তাঁর জয়জয়ন্তী উৎসব পালন সার্থক হবে।

সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে

[সি. টি. আই পরিবেশিত ইন্টারভিউয়েল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ককর্ক প্রকাশিত তথ্য]

- ১ম লোকসভা নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি ১০ লক্ষ : তন্মধ্যে ২০ কোটি ১৫ লক্ষ ভোটার ভোট দিয়েছে।
- ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ভোটার ইন্দিরা কংগ্রেসের অগ্রদূত ভোট দিয়েছে, এটি ভোটের হার প্রাক্ত ভোটের ৫০ শতাংশ, আসন সংখ্যা ৩৫১টি কংগ্রেস ও আধিকারিকের জল্প সংশ্লিষ্ট আসনের ৩৬ শতাংশ পেয়েছে ইন্দিরা কংগ্রেস।
- ৬ কোটি ৭০ লক্ষ ভোট পেয়েছে জনতা, লোকসভা পেয়েছে এর আর্ডেক, কংগ্রেস (আ) পেয়েছে এক কোটির সামান্য বেশী।
- জনতা, লোকসভা ও কংগ্রেস (আ) একত্রে পেয়েছে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ভোট, মোট ভোটের ৩৫ শতাংশ, আসন সংখ্যা কনতা ৩১, লোকসভা ৪১, কংগ্রেস (আ) ১৩, মোট ৮৫টি।
- সি. পি. আই (এম) ১ কোটি ১৬ লক্ষ ভোট পেয়ে ৩৬টি আসন দখল করে জনতা থেকে এগিয়ে মোকামের পরেই স্থান করে নিয়েছে। সি, পি, আই (এম) ১২৭৭ চেং ৬ শতাংশ ভোট বেশী পেয়েছে :
- সি, পি, আই এয়ার ১২৭৭ চেং ৩ লক্ষ ভোট কম পেয়েছে ১২৭৭ চেং ৩১ আসন বেশী পেয়েছে। ১২৭৭ এ পেয়েছিল ৭টি, এয়ার পেয়েছে ১০টি আসন।
- হিম্মি, বোম্বাই, যাত্রাক, কলিকাতা এই চার মহুরের জনগণ বিভিন্নভাবে তাদের প্রতিনিধি বেছে নিয়েছে—
দিল্লী—হিম্মি কংগ্রেস (৬) চরী, জনতা (১) একতী বোম্বাই ইন্দিরা কংগ্রেস (১) একটি, জনতা (৪) পাটী যাত্রাক, ইন্দিরা কংগ্রেস (১) একটি, সি, এম, কে (২) চরী কলিকাতা ইন্দিরা কংগ্রেস (১) একটি সি, পি, এম (৪) চারটি।
- কমিউটিংয়ের সপনার বেলা ধার এই চারটি মহুর ইন্দিরা কংগ্রেস ৩৭ শতাংশের বেশী ভোট পেয়েছে।

পরলোকে প্রবীন বিপ্লবী প্রফুল্ল দত্ত

১৫ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ১৯৮০

ত্রিশের দশকে বাংলার বিপ্লবীদল কৃষ্ণ সাম্রাজ্যের উপর সশস্ত্র আঘাতের পর আঘাত হেনে জনমনে এক স্রোতার আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিপ্লবী বিত্তি দল ছিল এই আক্রমণের পুরোধার। ঢাকায় লোকেম নিধন, রাইটার' বিল্ডিং-এ সশস্ত্র অভ্যয়ান সিমখন হত্যা—যেধিনীপুরে পর পর তিন জন মেজিষ্ট্রেটকে (পেডি, ডগলাস, ব্যাক) নিধন এই দলের মহান কীর্তী। বিপ্লবী প্রফুল্ল দত্ত ছিল এই দলের একজন স্বেচ্ছাভার অস্ত্রভন নেতা, স্বাধীনতার পর তিনি গঠনমূলক কাজ ও নিজেস্ব ব্যক্তিস্বের সাক্ষর রেখে গেছেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর।

আমরা এই মহান বিপ্লবীর স্মৃতিতে স্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

WANTED
SALES AGENTS
FOR
Navrang Plastics (I)
MEERUT CITY (U. P.)

মেঘনা নদীর চর

—মাধন গুহ—

পরিবেশক :

ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স

৩১/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রাতিষ্ঠান :

লোকভারতী, ১২৬, লিংটন স্ট্রিট, কলিকাতা-১৪

ও

এইকার : ৪০, কৈলাস বন্স স্ট্রিট, কলিকাতা-৬

মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

এক নজরে নেতাজীর জীবন পঞ্জী



জন্ম—১৮৬৭ সাল, ২৩শে অক্টোবর, শনিবার।

স্থান—কটক শহর, ওড়িশা।

শিখা—জানকী নাম বহু।

মাতা—প্রভাবতী বহু।

১৯০২ সাল, জামুয়াবী—বিভাগে প্রবেশ।

১৯০২ সাল, জামুয়াবী—বিভাগের পরিবর্তন।

মিশনারী স্কুল থেকে ব্যাচেলর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি। অল্পের শিক্ষক। কৌমাধব দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বামী ক্রিস্টিয়ানের 'ভাবানন্দ'ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

১৯১৪ সাল, এপ্রিল—সদন্তর অধিবেশে গৃহভাগ, এক বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন।

১৯১৬, ১৫ই মে—কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক প্রণীত ছাত্র থাকে অবস্থায়, অধ্যক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে দুই বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত। (Rusticated)

১৯১৭—প্রাথমিক সাময়িক শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোর-এ যোগদান।

১৯১২, ১১ই সেপ্টেম্বর—পঞ্চম বার্ষিক প্রণীতে অধ্যয়ন কালে, পরবর্তী নয় মাসের মধ্যে আই, সি, এম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে ইংলণ্ডে যাত্রা।

১৯২১, ১৬ই জু—বিলাতে অবস্থান কালে দর্শন শাস্ত্রে কেবিন্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ডিগ্রীলাভ।

আই, সি, এম, পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েও, বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের উদ্বুদ্ধন অনুসরণ করে সরকারী চাকুরী প্রত্যাহান ও দেশে প্রত্যাপন।

১৯২১, ১৬ই ডিসেম্বর—দেশে ফিরে কলকাতার আসবার পথে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর নির্দেশ ক্রমে দেশবহু চিন্তনরূপের নেতৃত্বাধীনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ।

১৯২৪, ২৫শে অক্টোবর—অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়ে আসার পর, বাংলার বিপ্লবী সংগঠন সমূহ ঘনন নতুন করে বিশ্বআন্দোলন শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার অভিযোগে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ।

১৯২৪, ২৫শে অক্টোবর—ক্রমবশেষে মন্ডালর জেলে স্থানান্তরিত।

১৯১৭, ১৬ই মে—জেলের মধ্যে দুর্গাপূজা করার দাখিলে দীর্ঘ অনশন, এবং অনশনের ফলে বাস্তব ভঙ্গ, প্রকল গণআন্দোলনের ফলে মুক্তিলাভ।

কারাগারে অবস্থানকালে বরাক্ষা দলের প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে জয়লাভ।

১৯২৭—কারামুক্তির পর, সর্বস্বত্বত্বক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিপদ লাভ।

১৯২৮—কলকাতার অধুনা তৈরী জাতীয়

কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে নির্বাচিত সর্বাধিনায়ক হিসাবে আদর্শ সেক্রেটারসবক বাহিনী গঠন।

কংগ্রেস অধিবেশনের পর নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯২০ জ্যৈষ্ঠ:—১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতায় একটি রাজনৈতিক মিছিল পরিচালনা করবার জন্য নয় মাসের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত।

১৯২০, ২০শে ফে:—এ সময় থেকে, ১৯০৭ সাল পর্যন্ত বহুবার ভারতের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অভিযোগে ও বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও কারাবরণ। বন্দী অবস্থায়, চিকিৎসার জন্য প্রথমবার বিলেতে প্রেরণ।

১৯২৪, ২রা ডি:—বোগশব্যাশায়ী বুদ্ধ শিতাকে দেহব্যবর জন্য দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯০৭, ১৮ই ন:—দেশে ফিরে আসবার সর্বজনস্বার্থের অভিযোগে গ্রেপ্তার ও পুনরায় ইউরোপে প্রেরণ।

১৯০৮ ও ১৯১২—পরপর দুইবার, স্বাধীনতা হরিপুরা ও ত্রিপুরা অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯১০—নিখিল ভারত আপ্যায় বিরোধী সম্মেলনের সভাপতি (বামগড়ে অনুষ্ঠিত)।

১৯১০, ২রা জু:—হলওয়েল মহামুদে অপসারণের আন্দোলন আরম্ভ ও উৎসর্গস্বর্গে কারাবরণ।

১৯১০, ৫ই ডি:—জেল থেকে সরকারের নিকট হুজুরি দায়ক লিপি প্রেরণ বা রাজনৈতিক দলিল রূপে ব্যাভ। আমরণ অনশন ঘোষণা অনশনের নয়দিন পর প্যারিসে মুক্তিলাভ ও এলগিন রোডের বাসভবনে গৃহবন্দী।

১৯১১, ১৭ই জা:—জাতীয় বিশ্ববৃদ্ধের হুজুরে

ইংরাজ রাজশক্তিকে চরম আঘাত হানার ও সমস্ত সংগ্রামের পরিচরনা নিয়ে যোগদানে ছয়বৎসে, গভীর রাতে মোটর যোগে নিজগাত।

১৯১১ ফে: মাসের ১ম সপ্তাহ—আন্তঃমোপন অবস্থায় ছয়বৎসে গোমো স্টেশন থেকে ট্রেন যোগে পেশোয়ার গমন। সেখান থেকে তিব্বিওস্তালার মশকের (বিশেষ ধরনের চামড়ার ব্যাগ) সাহায্যে খরস্রোতা কাবুল নদী পার হয়ে সেখান থেকে নিম্নাঙ্গ শীতে একঘনি মাল বোঝাই লরীর ব্যস্ত শেটির ওপর আবরণহীন অবস্থায় সাতারাত কাটরে অবসানিহানের রাজধানী কাবুলে পৌঁছোলেন।

১৯১১ ২০শে মার্চ—দীর্ঘ ৪০ দিন হাবা-বোবা ও কালা স্বেচ্ছ পলাতক অবস্থায় কাবুলে অবস্থান করে—ইতালীয় রাষ্ট্রদূতের সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে সিমর অবলাগো মোজেরটা এই ছয়বৎসের পাশপোর্ট নিয়ে আকস্মিক সীমান্ত অতিক্রম করে মস্কো পৌঁছোলেন।

১৯১১ ২৮শে মার্চ—সেশত্যাগী রাজনৈতিক আশ্রিত অতিথি হিসাবে রুশদেশে অবস্থানের প্রস্তাবে রুশীয় সরকারের নিকট থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মস্কোতে অধস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাহায্যে জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে পৌঁছোলেন।

১৯১১ ডি:—বিজয়া জার্মান সৈন্য আকস্মিকস্থানে এসে পৌঁছতে পারলে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী নিয়ে তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এসে পৌঁছতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে জার্মানীর সংসে এক চুক্তির ভিত্তিতে জার্মানিতে ভারতীয় বুদ্ধবন্দীদের নিয়ে ইতিহাস স্মরণাল আদ্রি' গঠনের সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জার্মানিতে 'ইতিহাস ইতিপেওন্স লীগ' গঠন, জার্মানীয় ডেসডেন শহরের সন্নিকটবর্তী অগ্ন্যকূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করে ভবি-

শ্রুত আজাদ হিন্দ ফৌজের গোড়াপত্তন এবং উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা প্রচারের জন্য 'আজাদ হিন্দ রেডিও কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা, এই রেডিও মাধ্যমে জার্মানিতে তাঁর অবস্থান ও বর্তমানের বিরুদ্ধে সমস্ত সংগ্রামের কর্ম পরিকল্পনা। বিশ্ববাসীর কাছে নিজের কঠোর বোষণা করিতে আরম্ভ করেন।

১৯৪৩ চই কে—বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু—বিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে—সমস্ত বিপ্লবের পরিকল্পনা নিয়ে নব উন্নয়ন সংগ্রাম পরিচালনার পরিকল্পনা নিয়ে আয়োজ্যোপোন অবস্থায় জাপান চলে গিয়েছিলেন—দেই বিপ্লবী মহানায়কের সমস্ত আমন্ত্রণ পেয়ে জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে ইউরোপে (ডুবো জাহাজ) জার্মানীর কিতল বন্দর থেকে জাপানের পথে যাত্রা।

১৯৪৩ ২৮শে এ—জার্মান ডুবো জাহাজটি মালদ্বীপের নিকটবর্তী একটি নির্দিষ্টস্থানে এসে পৌঁছোলে, একখানি যাবার যোটের সাহায্যে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে অপেক্ষমান অপর একখানি জাপানী ডুবো জাহাজে উঠে দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা শুরু।

১৯৪৩ ২রা জুন—ডুবো জাহাজের বিপদজনক পরিস্থিতির অবসানে পেনাঙ বন্দরে এসে পৌঁছোলেন।

১৯৪৩ ১৩ই জুন—পেনাঙ থেকে উড়োজাহাজে জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে এসে পৌঁছোলেন।

১৯৪৩ ১৬ই জুন—জাপান সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে, জাপানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো ফুমিতোর স্বাক্ষরিত সংগ্রামে বিনা সর্তে সর্বপ্রকার সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি বোষণা করেন।

১৯৪৩ ২১শে জুন—জাপানী রেডিওর মাধ্যমে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অবস্থানে কার্যাব্যবস্থার সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত বোষণা।

১৯৪৩ ৪ঠা জুলাই—সিঙ্গাপুরে প্রাচ্য দেশে বসবাসকারী ভারতীয় প্রতিনিধিগণের প্রথম অধিবেশন। বহিষ্কৃত বিপ্লবীমতের রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণ ক্রমে প্রাচ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্সলীগের সভাপতি পদ গ্রহণ এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন লাভ।

১৯৪৩ ৫ই জুলাই—আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের বোষণা এবং 'জয় অথবা মৃত্যু'র মন্ত্র নিয়ে সর্বত্র অর্পণের প্রতিশ্রুতির মধ্যে 'চলো পল্লী' স্লোগানের উৎপত্তি। (সিঙ্গাপুর সময়দান)।

১৯৪৩ ৯ই জুলাই—ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বিতীয় ব্রট উদ্বোধনের সূচনা হিসাবে সর্বত্র সংগ্রামের জন্য সার্বিক প্রস্তুতির আহ্বান।

১৯৪৩ ১০ই জুলাই—সিঙ্গাপুর ক্রিকেট ক্লাবে অনুষ্ঠিত প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে অনতিবিলম্বে প্রাচ্য স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বোষণা।

১৯৪৩ ২২শে জুলাই—ইণ্ডিয়ান ক্রাশনাল আর্মির অংশ হিসাবে পৃথক একটি নারী বাহিনী গঠন বিশ্ববাসীর নিকট প্রথম বোঝিত হল।

(পরবর্তীকালে এই নারী বাহিনী 'স্বাধীনতা বাহিনী' নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল)

১৯৪৩ ১লা আ—ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা বোষণা, ইণ্ডিয়ান ক্রাশনাল আর্মিকে আধুনিকতম সাজসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯৪৩ ২৫শে আ—ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগের সভাপতিত্বের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ক্রাশনাল আর্মির সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ, এবং বেতার বার্তার সেই সম্বোধন বিশ্ববাসীর নিকট বোষণা।

১৯৪৩ ২১শে অ—সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত 'স্বাধীনতা বাহিনী' গঠনের ভারতীয় প্রতিনিধিগণের সভাপতিত্বের



সভায়—বিভিন্ন শাখির পূর্ণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও কর্ম কর্তাদের নামের তালিকা সহ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের ঘোষণা। রাষ্ট্র প্রধান, আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সমর ও বৈশেষিক নগরের স্থানীয় এহদের ঘোষণা।

১২৪৩ ২০শে অঃ—জাপান সরকার কর্তৃক অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের স্বীকৃতি ঘোষণা।

১২৪৩ ২৪শে অঃ সকাল ১২টা ১৫ মিনিটে—আজাদ হিন্দ সরকার কর্তৃক ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

অশরাফ বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক আজাদ হিন্দ সরকার স্বীকৃতি ঘোষণা—

ক্রমদশ—১২৪৩, ২৪শে অঃ . ফ্রেট্‌য়া—২৭শে অঃ; জার্মানী—২৪শে অঃ; চীন জাতীয় সরকার—১লা নঃ; মালুকো—১লা নঃ; ইতালী—২ই নঃ; থাইল্যান্ড—১২শে নঃ।

১২৪৩ ৫ই নঃ—জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া জাতিপুঞ্জের সম্মেলনে উদ্বোধন।

১২৪৩ ৭ই নঃ—জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো কর্তৃক আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিকার ও শাসন ভার আজাদ হিন্দ সরকারের হস্তে অর্পনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১২৪৩ ১৮ই নঃ—সম্মেলনের পর টোকিও ভ্রমণ।

১২৪৩ ২৫শে নঃ—সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্তন।

১২৪৩ ২২শে ডিঃ—বাধীন আন্দামান দ্বীপে প্রথম পদার্পণ।

১২৪৩ ৩০শে ডিঃ—পরের দিন ভারতের কুখ্যাত বাঙালিকণী আন্দামান সেসুলায় জেল পরিদর্শন জাতীয় সঙ্গীত সহ বাধীন ভারতের জাতীয়

পতাকা উত্তোলন।

১২৪৪ এর গোড়ার—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নব নামকরণ 'শহীদ ও দরাজ'।

১২৪৪ ৭ই জাঃ—সংগ্রাম পরিচালনার সুবিধার জন্য আজাদ হিন্দ সরকারের সদর দপ্তর বার্মার স্থানান্তরিত।

১২৪৪ ৪ঠা কেঃ—আসাকানের পথে। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে পৌঁছবার জন্য ইণ্ডিয়ান জ্যানশাল আমির আক্রমণাত্মক অভিযান আরম্ভ।

অভিযানের প্রাথমিক জয়ের পর্থাৎ—

টুংবাজার—৪ঠা কেঃ; সেতাধিন—১লা মার্চ; কালোধান—৫ই মার্চ; কোর্ট হোয়াইট দুর্গ—৮ই মার্চ; কোর্ট লালসট দুর্গ—১২ মার্চ।

১২৪৪ ১৮ই মার্চ—কেনেডি পর্বত চূড়া থেকে মূল ভারত ভূমি—সৈন্যদলের দৃষ্টির মধ্যে আসবে বলে, মহাপরাক্রমের সঙ্গে কেনেডি চূড়া আক্রমণ ও দখল।

১২৪৪ ১২শে মার্চ—পরের দিন ভারতের মূল ভূখণ্ডের মাটিতে বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

আরও জয় ও অগ্রগতি—

টাইন জ্ঞান—২০শে মার্চ; উফস—২১শে মার্চ; টিডিম ও মোলন—২৩শে মার্চ; সাংকক—২৪শে মার্চ; মোরস—৩১শে মার্চ; ভামু ও কবাউ—১লা এঃ; হোংটান—৫ই এঃ; কোহিমার আত্মসমর্পণ—৬ই এঃ; কাংরা টোলী—৭ই এঃ; ময়রাড ১৮ই এঃ; পলেত্যা ও টেংনাউ পাল—২০শে এপ্রিল।

১২৪৪ ৭ই মে—ইণ্ডিয়ান জ্যানশাল আমির দ্বিতীয় বাহিনী দক্ষিণ দিক দিগে ভারত ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মূল ভূখণ্ডে এসে পৌঁছার

যেদিন, সেদিনটি অবিস্মরণীয়।

১৯৪৪ ২২শে মার্চ—ইন্ডিয়ান স্যামনাল আমি কর্তৃক ভারত-ভূখণ্ডের সকল অধিকৃত অঞ্চলের উপর আত্মা হিন্দু সরকারের শাসনাধিকার স্বীকার করে আগানের প্রধানমন্ত্রী জোহা জাপানের পার্লামেন্টে জাপান সরকারের নীতি ঘোষণা করেন।

১৯৪৪ ৪ঠা এ:—নেতাজীৱী বুবোভার ভাষণ :—
আজ্ঞা হিন্দু সরকারই ভারতের একমাত্র আইন সম্মত সরকার। ভারতীয় জনগণের বার্ষিক ভারত ভূমি থেকে ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্যদলকে বিতাড়িত করে ভারতীয় জনগণের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী ভারতের সর্ব-জন স্বীকৃত স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠাই আজ্ঞা হিন্দু সরকারের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে নেতাজী ভারতীয় জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা আহ্বান করেন।

বোভার ঘোষণা : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর উদ্ভূত করার প্রতিশ্রুতি আমি বন্ধ করেছি। আমাদের সামনে এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ জয় লাভের গুরুদায়িত্ব বিস্তারিত। ভারতের অপরিমিত বক্তাবলী প্রয়োজন।

১৯৪৪ ৪ঠা জুলাই—‘রক্ত দাও—আমি তোমা-দের পূর্ণ স্বাধীনতা এনে দেব।’

১৯৪৪ ২২শে জুলাই—বধীর আগমনের মুখে সৈন্যদের অগ্রগতি প্রতিহত হতে লাগল। জার্মান সীমান্ত থেকে সৈন্য অপসারণ শুরু হল।

১৯৪৪ ১২ অ:—অপরিহার্য পশ্চাদগমনের পরিস্থিতিতে নতুন সংগ্রাম কাউন্সিল গঠন।

১৯৪৪ ২১শে অ:—জাপানের রাজধানী টোকিও-তে পুনরাগমন।

১৯৪৫ ১লা জা:—১৯৪৫ সালের নতুন সময় জনি—আন্তোংসর্গ ও বক্তাবলী।

১৯৪৫ ১২ই জা:—বার্ষিক প্রেক্ষাপট।

১৯৪৫ ১৮ই কে:—সীমান্তবর্তী ক্ষেত্রে পুনরাগমন।

১৯৪৫—পরাজয়ের অধ্যায় শুরু হতে সৈন্যদল-গণ বধন তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে বিপদ সীমানার বাইরে থাকতে অনুরোধ করলেন, নেতাজীৱী জবাব ‘ইংরেজ এখনও এমন বোমা তৈরী করেনি যা দিয়ে জায়া আমাকে জেগে বুদ্ধত পাবে’।

১৯৪৫ ২৪শে এ:—বিভিন্ন বুদ্ধত্রে জাপানের পরাজয় সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে জবাব আশার অবসান। সীমান্ত ত্যাগ। যাবার সময় সৈন্যদলকে বলে গেলেন,—‘আমি যেখানে যে ভাবেই থাকি না কেন, আমার প্রতিশ্রুতি সংগ্রাম চালিয়ে বাব। তোমাদের যদি অনিবার্য ভাবে পরাজয় বরণ করে নিতে হয়, তবে বীরের মতই পরাজয় মেনে নিও, তোমাদের প্রতি এই আমার শেষ নির্দেশ’।

১৯৪৫ ১৫ই মে—সোলমিন বোত ঘরে ব্যাককে উপস্থিত।

১৯৪৫ ৮ই জুলাই—শিঙ্গাপুরে শহীদ স্মৃতি জন্মের শিলাস্তাস।

১৯৪৫ ১৩ই জা:—মালয় হয়ে শিঙ্গাপুরে পুনরাগমন।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকাশিত সরকারী সন্ধান অনুসারে দেখা যায় যে—

১৯৪৫ ১৭ই জুলাই—ব্যাক থেকে বিমান ঘোষে হাজা।

১৯৪৫ ১৮ই জা:—কয়েডিবায়র জুবে সহরে উপস্থিত।

১৯ই জা: বেলা দুটায়—করমোজার তাই হাকু বিমান বন্দরে উপস্থিত।

ঐদিনই আবহবর্তার মধ্যে বিমান যোগে কোন অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে যাত্রা।

তিনদিন পর আপানের ডোম'ই এজেন্সী টোকিও থেকে বেতার যোগে তার তাইহাকুর বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ পরিবেশিত হল। সংবাদ পরিবেশিত হল তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনী।

তৎকালীন বৃটিশ ও আমেরিকান ইনটেলিজেন্স তাইহাকুর ওই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার কাহিনীকে বিশ্বাস করেনি। মিত্র বাহিন্যের, কামাওয়ার ইন চীফ জেনারেল অকিপলেক তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেন—এবারও ঐক্যবদ্ধ চন্দ্র বোস আমাদের

চোখ এড়িয়ে আত্মগোপন করলেন। তাঁকে আমরা ধরতে পারলাম না।

বিমাণ দুর্ঘটনায় নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু সংবাদ ভারতীয় জনগণ বিশ্বাস করেন। এই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা ও মৃত্যু সংবাদ অবিখ্যাত ও বহুসংখ্যক বলেই সকলে মনে করে।

তিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন—আমাদের দুঃখ সুখের সংগী হয়ে আমাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেছেন—আমাদের মধ্যে আজও তিনি বেঁচে আছেন—তাঁর জীবন বেদ—তাঁর সংগ্রামী আদর্শ চিরকাল আমাদের পথ নির্দেশ করবে। জয়হু নেতাজী—জয় হিন্দ।

“স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক
অধীনতা থেকে মুক্তি বোঝায় না,
বোঝায় সম্রাটের সুসম্ম বর্গের,
জাতিভেদ প্রথা ও সামাজিক
অন্যায়ের বিলোপ সাধন
একং সাম্প্রদায়িকতা ও
ধর্মীয় গোড়ামী নির্মূল করা”
“সুভাষ চন্দ্র বসু”

स्वाधीनतारु वृत्तयोवाध कि क्रियमान ?

স্বাধীন-সাম্প্রদায়িক-পন্থার বিরুদ্ধে-সমাজতান্ত্রিক
রাষ্ট্রের ন্যায়বিক্রমের মৌলিক অধিকার সাধনাবে নীতিও,
তাই স্বাধীনতার ন্যায়বিক্রমের জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও ভাষা
নিষিদ্ধে প্রত্যেকের সমান সুযোগ, সুবিধা, স্বাধিকার ও
বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; ভোটাধিকার ও মন-মতীর
পক্ষে সমান, অবাধ্য প্রান্ত সংসদেবের ক্ষেত্রে। স্বাক-
স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, চলোকেবের স্বাধীনতা, সভা-
সমিতি ও সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রে
স্বাধীনতা, সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতা, গবেষণার
স্বাধীনতা, সরকারী ও বেসরকারী মীতিও কাব্যক্রম সংগঠন
সমালোচনার স্বাধীনতা, জ্ঞানভাণ্ডার ও জ্ঞানমানের
স্বাধীনতা, বিজ্ঞানীয় উপরওয়ালার বৈজ্ঞানিকতা বা নীতিবীন
আবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বাধীনতা, দেশের অভ্যন্তরে
যে কোনও এলাকার বসবাসের, কণ্ঠসংস্থানের, বৈজ্ঞানিকের,
জীবিকাক্ষমের ও বৃত্তি লাভের স্বাধীনতা আদম্ভা সমাই
ভোগ করি।

স্বাধীনতা নষ্ট হয়—ইহাই প্রকৃতির অযোধ্য নিয়ম, এটি ব্যতিক্রম হয়না। স্বাধীনতাশেখের স্বাধীন জাতি হিসাবে প্রতিটি পালনের ক্ষেত্রে এমনও কত বৈধী আনন্দ পিছিয়ে আছে তা তাৎপল্যপূর্ণকৃত হতে হয়। চারভেত জাতি পাঠের চিন্তা ও পরামর্শের ওপর বসেছে। কি অমোহা আনন্দ! নিশ্চিন্তে বসন্ত কতবে অথবা তাতে ইচ্ছা বোপান্তে থাকবে? প্রান্তিক কল্যাণ কিহে রাখবে কি এখন? সম্ভল্যে সম্ভল্যে চান্দাচান্দ বনোমালিক কি হু হু করা যায় না! স্বর্গলোকে লেখে অপর স্বর্গাবলম্বী মাহেবের স্বর্গাশেখের চিন্তা কি চারভেত পাঠবে না এত হানাহানি, প্রাণনাশ, বনস্পত্তির কতিপায়নের পরেও? হরিজনদের ওপর অমানবিক নিষ্ঠাভ্রম, অকথা অত্যাচার, লুণ্ঠি তরাজ ও অত্যাচার পুঙ্খানুপুঙ্খ কি বহু হেবে না আনন্দ?

আমি বিচারা দিব। ভারত আবার ওসত সত্যি স্রেষ্ঠ
আশন পাবে কি? সেই লক্ষ্য তো এখনো দেখা যায়নি।

কবে তা পরিবর্তন হবে সেই আশায় কি শুধুই দিন
গুনবো, না এখনই সখাটী হিলেমিলে বেশ গভীর পথিকতাকে
স্বাধীন পদ্ধতি? কোনটা করবো? এই মুহুর্তে তাও কি
আমরা পূর্ববর্ণা করতে বোধ্য? ইতিমধ্যে যে
অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ভারতের বিভিন্ন
প্রান্তে তা কি একটা ভাঙির মুহুর্তে পরিণত?
এদেশের এক অকলুষ বাহুর যদি অত অকলুষ মাতৃকে
লগ্ন করতে না পারে, তবে অপরায় কার? সে অপরায়
কি লক্ষ্য জাতীয় অপরায়? আকস্মিক ব্যত্যয়ে চিন্তা
বা বিধিভাবাব্যয়ের বাস্তবতা তা কি কারো পক্ষে তত
হবে? তা কখনই নয়। তবু কেন আসাবে বহিরাগত
আবায় অবস্থা সৃষ্টি করে বহিরাগতের ওপর এই হীন
নির্যাতন ও ভাবের আঘাত থেকে বিতাড়ন কার্যে চলে
বিকল বেশ কিছুকাল থেকে, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার নীরব
দৃষ্টিভঙ্গি। এক্ষেত্রে যদি আমরা পরস্পরকে সহ করতে
না পারি, তবে সত্যিই যোব দুর্দিন ভারতের তথা
ভাঙনপানীয়। কেন এই বিধিভাবাব্যয়ের পিছনে আমরা
পরিণত হচ্ছি? এতে কারো দম্পন হবে না। স্বাধীন
রক্তে বেশ বীরে বীরে কখনোই হয়ে পড়বে ও তার
নিষ্কর বৈশিষ্ট্য দ্বারা যে অতিয়ে যা কিছুতেই কানো নয়।
এদেশের বৈরাগী-চিন্তা নিম্নাধী ও দুর্বল্য পরিভাষা, তার
যে এম কমে দুর্বল হয়। সর্বভারতীয় চিন্তাটী দেশকে
নয়ন ও উন্নত করতে পারাধা করে—একথা কি আসামের
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জানেনা? তবে কেন এই হীন
অপটো ও অকার্য বিবোধ আসাম যুবকর অভ্যন্তরে
বসন জবন ও হস্ত তত্ত্ব প্রকাশ পায়? পরিণামে আসাম,
পশ্চিমবঙ্গ, বেঙ্গাল ও তৎসংলগ্নিত জ্ঞ অকল কতিপয়
হবে এবং ভারতবর্ষ উচ্চ কতির কারণে দুর্বল হবে তার
আভ্যন্তরীণ সুস্থতির অভাবে যা সর্বোচ্চ মুখ্য দক্ষা করা
একটা প্রয়োজন, দেশবন্ধার অত্যাবশ্যক কারণে।

বর্তমান অশান্ত আসাম সারা ভারতের চিত্তবিন্দু
এমন বারম্বার হাডা দিয়ে আসাম কেনেছে যে, তার

সুদূর বহুদূরপাল্লার হস্তগত সত্যান্বিত সত্যিক, অথচ সেই
তত্বেতন্ময় অর্থাৎ যে এখনও কেন—তা যোজ্য তত্ত্ব।
মুসলমানবন্দীরা, অতন্তর্য্য পাইন্ডীরা তপসিনকৃত
ট্রাটবের মাধ্যমে ও ঐতিহ্যময় বন্দীরা লগ্ন বলে সাপে
সংকতি আসনের অত বিশেষ প্রবিশা ভোগ করে, অথচ
বৌদ্ধবন্দীরা তা থেকে বঞ্চিত কেন—সে প্রশ্ন হালে ভারত
অন্যমনসে উঠেছে। এই প্রকার যদি আমরা কেবল পৃথক
বাগেতে চাই ও পৃথক চিন্তায় পরস্পরের বিতর্ক থেকে ক্রমশঃ
দূরে সরে বেতে ভালবাসি, তবে বেশ দক্ষার প্রয়োজকে
আমরা কিতাবে একত্রিত হবে কারে কারে মিলিয়ে বিদেশী
দক্ষর দক্ষ মোকাবেলায় দক্ষতার পরিচয় দেব ও সেই
আমর বাগেতে ইতিহাসে সর্বত্র লগ্না—শেষটী আমর সবচেয়ে
বড় সবজা এবং কঠিন প্রশ্ন দেশের স্বাধীনতাকামী বাহুর
কাছে। অসমিয়া, বামালী, পাহাড়ীরা বা ব্রাহ্মণ, হরিজন,
বাহন, সুবিহার, আঠা, ঠাণ্ডা, মুতা, সীংগাং এই সব
পৃথক চিন্তা ও পরস্পরের ওপর বৈরাগ্য কেন? কেন
আমরা ভারতবাসী বলে নিজেকে ভাবে ও পরিচয় দিতে
একান্তবোধ উৎসব বহনি মাঝে? ইতিমধ্যে পলা, হুন্সা,
কফা, কাংগো, নরখা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি এম নবীতে অনেক
জল হয়ে গেছে, তবু চৈতন্যবাহু হলনা কেন আমাধেব?
যদি লগ্নাধির দোলাধেব জাতি, তাই কি এই অবস্থা আম?
হীনমস্তত্বরূপে কুণি কি এখনও সেই কারণে? কবে
আর তবে আমরা স্বাধীনদেশের বাহুর মত বোধ্যতা ও
স্বাধীনতার অধিকারী চবো? বড়ই ব্যথিত হবার এমর কথা
উপাধন করত হর বড়ই হুংগে, বড়ই মনস্তাপে। —
বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক হলের নির্মাণে প্রচার কাব্যের মধ্যে
উচ্চ বিভেদ ও বিধিভাবাব্যয়ের গৌণ উত্থান দেখা গেল
হলে। কেউই আমর বিশর দক্ষে সচেতন নয়, যদিও
আম্রান সীমান্তে পাকিস্তান সৈন্ত সমাবেশের ভোড়াম্বর
জ্ঞ করে দিয়েছে। চীন ও পাকিস্তান আবেহিকার দোলাধ হরে
হাশিয়াব বিকছে যেভাবে অগ্রসরমান, তাতে ভারত কুণির
বিশদবে, যে কোনও মুহুর্তে আমতে পারে তা কি আমরা
বোধ্যব্রটো করছি? তা যদি করতাম তবে নিজেকে

ভিতর যে পরস্পর বিকল্পতা জ্বিঁয়ে রেখেছি তা নিস্তর ভূলে গিয়ে এক হতে পারতাম। আরপ্রান্তে যিমেনা সৈন্য সমাবেশ কার্যক্রম বর্ধমান, অথচ আতপাতের লড়াইয়ে যেতে কি আশারামে যাবে—না বিজয় চিন্তায় মনোনিবেশ করে দ্বিত্বি হয়ে উপস্থিত সমস্যাও বিপদের মোকাবিলায় সম্মিলিত শক্তিতে নিষ্ঠার করে যেনরক্ষার যোগাচিত প্রস্তুত হবে। ভারতের স্বাধীনতার মূল্যবোধ কি কিরমান না তা ক্রমবর্ধমান, তার স্বাক্ষর রাখার জন্য প্রতিটি ভারতীয় কি একযোগে দৃঢ় পদক্ষেপে লক্ষ্যের এই সমস্যার সমাধানে ত্রুটি হবে তীব্র বৃদ্ধি ও কঠিন তাগ স্বীকারের জন্য তৈরী হবে, যেটাই এখন পরীক্ষা হয়ে যাবে বর্তমান হুঃসময়।

পৃথিবীর শক্তিমার বেশগুলি আধুনিক সমরাস্ত্র বেতন বলদ্রুত ও হুড়ায়াক্রমে বেতন পই, তাতে মনে হয় যে কোনও অস্ত্র মুহুর্তে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে হুড়ে লিপ্ত হতে পারে। বিশেষ করে, বর্তমানে রাশিয়ার আকস্মিকভাবে সৈন্য সমাবেশ ও কলে আমেরিকার ঐ বাপারে উৎসাহ সামরিক প্ররুতি, যে কোন সময়ে যেনে ভূতীর বুরহত হুড়েও আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে বলে আশংকা হয় এবং সেই হুড়ে ভারত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কঠিনে পড়তে বাধ্য হতে পারে।

ইদর ককম, সেই হুঃসময় যেন ভারত স্বীয় স্বাভাৱ স্বাধার রেখে স্ব স্ব ক্ষেত্র শত যোজন দূরে থাকতে পারে, মানবিক ভার দীতির একান্ত প্রয়োজনে—এটাই মেলনাসীর কাব্য। কিন্তু বর্তমান ভূগে সেই অবস্থার উপনীত হতে

হলেও ভারত ভূমিতে লক্ষ্যের আঁচ প্রয়োজন বা আশ নেই বস্তুলেই শত্রিক কথা বলা হবে। তাই ভারতীয়ের প্রাণিক স্বপত্তা-বিগাধ ভূলে গিয়ে, স্বর্গীয় কোষল বহু বেবে, এতই স্বর্গীয় স্বাভাৱের মতো আত-পাতের লড়াইকে গুহ্য করে গিয়ে, একমন-একপ্রাণ-একআঁচ-একবেগ, এই চিন্তায় বিভোজ হয়ে লক্ষ্যে সমবেতভাবে যেনের অবতরু স্বাধার রাষ্ট্রে ও মেলনকার মহান এতে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে ধার বখাসায়া বিজয়, বৃদ্ধি ও শক্তি নিয়ে আজ এই অবশেষ বিপদজনক মুহুর্তে সংবৎস্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে ভারত ভূমিতে সংহতি বাজবে কিংবা আসে ও সংশ্লিষ্ট কোরে যেন স্বকীয় তেজে পুনরায় একত্রিত হবে পৃথ্বে গুহ্য, তেজোভন ভূগে একই সমাধ। ভারতীয়রা প্রকৃতই যদি স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদ হেমাধ হারাতে না চায়, সেক্ষেত্রে তাদের জিবের বরখার সপ্রমাণ করে দিতে হবে যে ভারত সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত একটি মহান আঁচ, যে আঁচ এততাবছ ও অশ্লিষ্ট স্বাধীনতা স্বাক্ষর সবিশ্বপণ করে সপ্রস্কার ক্রেশ স্বীকারে লগ প্রস্তুত যেন-স্বাক্ষর মহান বখে। তারা যে পৃথল্য পরাম্পর এগ বিরাট সংবৎস্র ত্যাগপ্রতী আঁচ, যাঁরা দ্রুত বরণ করে, কিন্তু কোন মতেই শত্রুর হানত স্বীকার করে না। তা বাস্তবে প্রমাণ করতে হবে, তবেই স্বাধীনতার মূল্যবোধ সর্বেই তারা যে সমাস্বেচনে তা খোঁজা যাবে। স্বাধীনতা প্রাণের চেয়ে স্বাধীনতা স্বাক্ষর অনেক বেশী মূল্য গিতে হয়, এতখা আঁচকে সপ্রমাণ করতে হবে আজ।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বিপ্লবী সতীন সেনের অকল্পন সহকর্মী শৈলেশ্বর চক্রবর্তী কিংবা ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার তাঁর নিজ বাসভূমি বরিশাল শহরে পরলোক গমন করিরাছেন।

বিশেষী আত্মার শান্তি কামনায় ২০শে জানুয়ারী রবিবার বিকাল ৩টার গড়িয়া সতীশ্র পরীশ্র সতীশ্র স্মৃতি ভবনে এক স্মৃতি তর্পণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজীবন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী নিজ কর্মভূমি বরিশাল শহরেই সমাজ সেবা ত্রুতি নিহত ছিলেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

জাপানী ফানুস

॥ ত্রিদশীকৃষ্ণ সেন ॥

ফানুসটা কেমন সঁ। সঁ। করে আকাশে উঠে
বাড়ে। একটুও থামছে না, একবারও নাযছে না।
কলতে পারেন ওটা উঠছে কিসের শক্তিতে ?
উত্তরটা খুঁজে বের করা অতীব দুরূহ।

আশির দশকে পা দিয়ে মাত্র হুগো বানেক
কেটেছে। রেডিওর খবর শুনে বুঝলাম বছর
তিনেক হাবুডুবু খাওয়ার পরে এবার ভেসে উঠে
মন নিতে পারব। এখন আমাদের সামনে দুরূহ
কাজ হবে, দেশে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে
জনতার মনে নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তোলা। আর
স্বাভাবিক উদ্ভগতি বোধ করে দেশের আর্থিক
অবস্থা ফিরিয়ে আনা। প্রথমটার দ্রুত ভাবতে
হবে না, ওটা আপনা-আপনি হয়ে যাবে। দ্রুত
বোড়া যেমন সওয়ার চেনে, দ্রুততরবারিও জানে
ইনিয়া কি চীজ। নইলে সেখান না, এমন যে
মদসর্বী স্বাধীন আসাম, বার উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে
ব্রহ্মদেশ, পূর্বে মহাচীন, পশ্চিমে বাংলাদেশ, উর্ডেঞ্চ
কেলা চারদিকে, সেখানেও কিনা ভারত বিরোধী
হান্সা মুহুর্তের মধ্যে থেমে যায়। সিক্কিমের
(ফায়ার ইটার) আগুনযুগো শাসকগোষ্ঠীও
চোগিয়ালকে বন্ধন করে ইনিয়ার শিবিরে যোগ
দিতে ছোট। আমাদের খয়ের অর্থনীতির ক্ষুদ্র
বিকৃপালের কথাই বলুন। গত তিন বছর তিনি
স্বাসকাবারী হিসেব-নিকশের সময় এলেই একবার

করে হুকার ছাড়তেন 'আউর রুপিয়া লাও' তিনিও
মুখটি চুন করে পুথানো ডাউচার তৈয়ারী করতে
বসে গেছেন। তাই মনে হয় প্রথম কাজট
'আপুসে হো যাগা,' ভর দ্বিতীয়টাকে নিয়েই।
আর্থিক অবস্থা ফেরানোর চেষ্টাই হবে আসল
চ্যালেঞ্জ।

সেই দ্রুতই জাপানী ফানুসটার দিকে চোখ
ফেরাতে হচ্ছে। তিরিশ বছর আগেও জাপানীদের
গড়পড়তা আয় আমাদের গড়পড়তা আয়ের সামান্য
ওপরে ছিল। আর আজ সে কোথায় উঠে
গেছে।—জাপান, ছোট একটি দ্বীপ, আরতনে
আমাদের মহারাষ্ট্রের চেয়ে মোটেই বড় নয়; মাত্র
তিন কোটি বাহান্তর লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। জন
সংখ্যা; কিন্তু মহারাষ্ট্রের দ্বিগুণ। সেই জাপান আজ
পৃথিবীর দ্বিতীয় সমৃদ্ধ দেশ। আমেরিকার পরেই
ভার স্থান। ওর অর্থনীতিতে সড়কের পর সড়ক
এসেছে, এমন এক একটা গালা বেয়েছে যে মনে
ভয় হয়েছে সনুন্ধির বুদ্ধবুদ্ধটা বুঝিবা গেল এবার
ফেটে। কিন্তু ঠিক সামলে নিচ্ছে শেষ পর্যন্ত;
ভারপর একই পতিতে উঠে চলেছে উপর দিকে।
যে পতিতে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই এই
শতাব্দীর শেষে এভারেস্ট জাপানী, এভারেস্ট
আমেরিকানের দ্বিগুণ বিদ্যমানী হয়ে পড়বে।
কোন আলাদিনের প্রাণীপ হাতে পোবেছে জাপান ?

ও কি একটা দেশ, না কি একটা 'মিরাকল' :

তিব্বি বহর আগে জাপানে গড়পড়তা আর ছিল বছরে মাত্র ৮০০ টাকা। এশিয়ার দরিদ্রতম দেশেও আজকে গড়পড়তা আর প্রায় ঐ রকম। তিব্বি বহর পরে, আজ জাপানের গড়পড়তা আর বাড়তে বাড়তে কোথায় উঠেছে জানেন ? বার্ষিক ৪৮,০০০ হাজার টাকা। যেখানে ব্রিটেনের গড়পড়তা আর ৪৪,০০০ হাজার টাকা, ইটালীর ৩২,০০০ হাজার, আর সোভিয়েটের মাত্র ১৬,০০০ টাকা। ইউরোপের উন্নত দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েটই সবচেয়ে গরীব।

যে চোটে জাপান ছুটে চলেছে, কবেক বছরের মধ্যেই সে আমেরিকা আর পশ্চিম জার্মানীকে ছাড়িয়ে যাবে। বিগত তিব্বি বহর ধরে জাপানের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে বছরে ১০% শতাংশ হিসাবে। অর্থাৎ প্রতি সাত-আট বছরে উৎপাদন বিগুণ হয়েছে। মানব ইতিহাসে এই জাতীয় ঐতিহ্য আর কখনো দেখা যায়নি। চল্লিশ দশকের শেষ ভাগে এর আরম্ভ, তখন এদের ও আমাদের আর্থিক অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। সস্তা শ্রমী হলে আমরাও তখন আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। এই তিব্বি বহর ওরা একটানা 'বুম'-এর মধ্য দিয়ে ছুটেছে। আর আমরা পড়ে আছি প্রায় সেই একই জায়গায়।

মাঝে মাঝে depression যে এদের আসেনি তা নয়। কিন্তু তা ছিল অপ্রত্যাশী। আসতে না আসতেই তাকে কড়া করে, কবে দিয়ে, আবার চালিয়ে দিয়েছে Boom-এর স্রোত। ধরে কেলেছে পূর্বের দশ শতাংশ ঐতিহ্যকে। আমরাও মাঝে মাঝে প্রায় ঐ গতিতে ঐতিহ্য করছি,

ভারপরেই এসেছে দীর্ঘস্থায়ী depression। একটা depression এসেছিল বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধের সময়। তার ঠিক পরেই কয়েকটা বছর গেল 'বরা', উৎপাদন কমলো ব্রাবদ্য বাড়ল। জরুরী অবস্থার কঠোরতার ফলে মোড় ঘুরল উৎপাদন বাড়তে লাগল। ৭৭ সালে সেটা যেতে হল ৭'৪৭ শতক ঐতিহ্য। ৭৮-৭৯এ উন্নয়ন আবার কমে গিয়ে হল ৪'৩০ শতক। ৭৯-৮০-এ সেটা আরও কমে বলে রিজার্ভ ব্যান্ড অনুমান করছেন। কিন্তু জিনিষপত্রের দাম যে পরিমাণ বেড়েছে তাতে Planning Commission-এর Deputy Chairman Mr. D. T. Lakdavalta মনে করেন এবার ৪% পর্যন্ত Negative উন্নয়ন হওয়াই সম্ভব। উৎপাদন তো বাড়েনি বরং কমেছে আগের বছরের চেয়ে।

ইতিপূর্বে আমরা গড়পড়তা উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করেছি। সম্পূর্ণ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে একটা জাতির সমৃদ্ধি। শিল্প সমৃদ্ধ জাতি বা Industrial Power-দের তালিকায় জাপানের স্থান চতুর্থ। আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী ও সোভিয়েটের পরেই তার স্থান। শেষোক্ত দুটি দেশকে সে ৮০-র দশকেই ধরে ফেলাবে। আজকের জাপান Cement ও T. V. Set আমেরিকার চেয়ে বেশী উৎপাদন করে। পশ্চিম জার্মানীর চেয়ে বেশী উৎপাদন করে বিদ্যুৎ, ইস্পাত ও এলুমিনিয়াম। সোভিয়েটের চাইতে বেশী উৎপাদন করে বাই-গাড়ী ও কৃষি মতক এবং মাছ ধরে সমগ্র ইউরোপের চেয়ে বেশী। যে গতিতে তার উৎপাদন বাড়ছে নানাবিধে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে সে পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প-সমৃদ্ধ জাতি হয়ে উঠবে।

এই যে প্রায় গোটা দুনিয়াটা ছেঁবে কেলেহে Colour T. V. ও মোটর গাড়ী দিয়ে সেই অহঙ্কারে জাপান যে বুক চিতিয়ে চলা-কোচা করে তা নয়। খুবই বিনীত লম্বা লম্বা ডাব, যেন কত অপরাধ করে কেলেহে আমাদের কাছে। এই কুলে ওঠা আর্থিক ফায়ুসটা সম্পূর্ণও ওদের জারি ভয়। জাপান সরকার থেকে আরম্ভ করে জাপানী শিরপতি ও ব্যবসায়ী, যার সঙ্গে কথা বলবেন, এই কাহুসের কথা উঠলেই তিনি গভীর হয়ে মাথা নাজুঁবন। তাঁরা বলতে চান যে তাঁদের দেশ খুবই Vulnerable; বাইরের আর্থিক চাপের সম্মুখে আত্মরক্ষার একেবারে শিউর মত অসহায়। হেহেরান বা মজা, যে কোন সময় একটি ভুড়ি ধিলেই জাপানী কাহুস 'কট' করে কেটে বাবে।

কারণ শিমের কাঁচামাল বলতে গেলে জাপানে বিশেষ কিছুই নেই। লোহা, কয়লা, বনিজ তেল রবার, লৌহের ধাতু সবই ওদের আমদানী করতে হয়। তবু এটা কুলে চলাবে না, যে দেশের মোট উৎপাদনের মাত্র এক দশমাংশ কুলোর কাঁচামাল বাইরে থেকে কিনে আনে। অত্যন্ত শিল্প-সমৃদ্ধ বড় বড় দেশের কুলনার সেটা মাত্র আর্ধেক। পশ্চিম জার্মানী ও ব্রিটেনকে কিনে আনতে হয় এক পঞ্চমাংশ। জাপানের অর্থনীতি যদি Vulnerable হয় ওদের অর্থনীতি তো দ্বিগুণ Vulnerable শুধুমাত্র ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানীই নয়, ইউরোপের প্রতিটি দেশই material resource-এর জন্য অন্য দেশের উপরে নির্ভরশীল। তবু তো জাপান বাস্তবত্বের সম্পর্কে স্বয়ং নির্ভর বা ইউরোপের কোন দেশই হতে পারেনি। বুদ্ধিমান জাপানীরা কি

এটা বোঝেন না? বোঝেন ঠিকই, তবু প্রচাৰ করিতে ছাড়েন না যে তাদের সমৃদ্ধি অতীত ক্ষমতাস্বার্থী।

দেশে যে কোন কাঁচামাল নেই, নেই মাটির নীচে কোন বনিজ পদার্থ, সেটাই ওদের এক বুকমের সম্পদ। যদি আমাদের মত বনিজ সম্পদ হবে থাকতো, তবে কি ওরা এত বেটে মরত? হয়ত পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আধপেটা বেঁধে ঢেঁকুর তুলত আমাদের মত আর শুয়ে শুয়ে রাজা উজির মরত। অবস্থা এমন Vulnerable বলেই তো ওদের পরিশ্রমী হতে হয়েছে। ঠিক একই কারণে পরিশ্রমী হতে হয়েছে বিলেতের ফটদেরও।

তাহলে, এমন আবার সেট প্রশ্নে কিংবদন্তি আসা থাক, জাপানী কাহুস উজ্জ্বল কিসের জোরে? সন্দেহ নেই ওরা স্বভাবতঃ পরিশ্রমী, যা আমরা নই। কিন্তু চীনাগণও পরিশ্রমী কিছু কম নয়। তার উপরে চীন কমিউনিষ্ট দেশ, কাজ না করলে ছাত জোটে না। তবু চীনাগণের আর্থিক অবস্থা তো প্রায় আমাদের মতই নীচু। আর জাপানের যে স্বীকৃতি পৃথিবীতে তার কুলনা নেই।

এর কুলে আছে ওদের প্রতিভা যা দেশের জনতার কর্মক্ষমতাকে হাজারি সাহায্যে বিপুল পরিমাণে উৎপাদনে নিরুক্ত করতে পারে। মানুষের Talent-কে Mass Scale-এ organise করা কাজটি সহজসাধ্য নয় মোটেই। জনতার কর্মক্ষমতাকে সংগঠিত করার ক্ষমতা, সেটা সকলের মধ্যে দেখা যায় না। সব জাতির মধ্যেও নয়। আমেরিকানরা এটা পারে, জার্মানরাও পারে। ব্রিটিশ পারে না, সোভিয়েটও নয়। সেই জন্যই সোভিয়েট শেখনে পড়ে গেছে, আর কুবে জাপান, তার

ভাঁড়ারে সোভিয়েটের তুলনায় নেই কলতে কিছুই নেই, সেও এগিয়ে গেছে কয়েক পা নয়, মাইল বানেক। মাত্র তিনটি বর্ষক সময়ে।

Man power অর্গানাইজ করতে পারে সোভিয়েট, কিন্তু Mass Talent সংগঠিত করে কাজ আদায় করা, ওদের ক্ষমতার বাইরে। Talent শব্দটা কমিউনিষ্ট অভিধানে নেই। (থেরের কোণার talent-এর গন্ধ উঠলেই, প্রমোদদা কেমন ভেপে ওঠেন দেখেছেন? সব বোঁটিয়ে দাফ না করা পর্যন্ত শক্তি পান না)। তার উপরে আপানারা বহু পরীক্ষার পরে, ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে, বার সাহায্যে উদ্ধৃত প্রতিটি বিতর্ক একটা সর্বদম্মত সম্মতি বা consensus দিয়ে সমাধান করতে পারে। প্রাচীন জাপানের সামুরাই সমাজ ব্যবস্থার এই জাতীয় কতকগুলি বাধ্যবাধকতা ছিল। ইউরোপের বিজ্ঞান, জীবনবাপন প্রণালী, পোষাক-পরিচ্ছদ সবই গ্রহণ করেছে আধুনিক জাপান, কিন্তু প্রাচীন সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে দেরি। সে দিকে ওরা রত্নদলীল। জাপানী সমাজ-জীবনের এই অন্তঃদলীল শক্তির কথা ভুললে, ওদের অতীতপূর্ব আর্থিক অগ্রগতির ব্যাখ্যা পাওয়া বাবে না।

জাপানের ব্যবসায়িক সংগঠনের কথা বরন। জাপানের প্রথা হল Life long employment। সামুরাই সমাজ ব্যবস্থার একটা কলঙ্কতি। চাকরীতে একবার বোগ দিলে শেষ জীবন পর্যন্ত নিশ্চিত। পৃথিবীর আর কোথাও এই প্রথা প্রচলিত নেই। আর একটি হল Seniority wage system। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বেড়ে চলবে। আগের দিনে সরকারী-চাকরীতে

আমাদের দেশেও এই সুবিধাগুলি ছিল। কাজ করুন আর নাই করুন, গুরুতর অপরাধ না করলে চাকরী খাওরার ভর ছিল না। প্রমোশনও কেউ ঠেকাতে পারত না। বৃদ্ধা বয়সের জন্ত ছিল পেনশন। তাই কম মাইনের সরকারী চাকরীও বেশী মাইনের সদাপরি আফিসের কাজের চেয়ে কাম্য ছিল। এখন inflation-এর দাক্তার সব গেছে গোদ্রায়।

জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলির আসল শক্তি হচ্ছে যে কোন বিরোধেই consensus দিয়ে সমাধানে আসার নীতি। দুই পক্ষ যখন আলোচনা বসেন, তখন তাঁদের মধ্যে কোন confrontation-এর ভাব থাকে না। কেউ অপর পক্ষের উপর টেকা মারবার চেষ্টা করেন না। Public Sector ও Private Sector-এর মধ্যে এসেলে যেমন ধন্য লেগেই আছে, কিংবা শ্রমিক মালিক বিরোধের ফলে এখানে যেমন কথার কথায় Strike ও Lockout দেখতে পান, জাপানে সে সব কিছুই নেই। বিরোধ বাধলেই তাঁরা আলোচনার বসবেন আর একটা সর্বদম্মত বীমাংসার না পৌছানো পর্যন্ত উঠবেন না।

এই সর্বদম্মত বীমাংসার ফিলসফিতে এতই বিশ্বাস জাপানীদের যে, বীমাংসার ফলে তার শক্তি হয়, বদ সে বা চাইছিল তা পায় না। তখনও লিখত মনে কোন অসন্তোষ পুবে রাখে না। সেই জন্তই ওখানে কোয়ার ডিট্রিবিউশন অফ ইনকাম সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে মালিক ও শ্রমিকের আয়ের আকাশচুম্বী পার্থক্য কমিয়ে আনা। ইদানীং একটা Poll নেওয়া হয়েছিল, তাতে দেখা গেছে যে শতকরা নব্বই জনই মনে করে যে তাদের কেউ

গরীব নয়। তারা মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের পর্যায়ে পড়ে। তাই মনে কারও অসন্তোষ নেই।

টোকিওর চৌরঙ্গী এলাকার রাস্তিরে দেখা যায় সুন্দর সুন্দর মেয়ে তাদের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে রেক্সা ও সিনেমার অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা এক রাস্তিরে যা বরফ করে, আমাদের কাছে সেটা একটা কুবেরের বন। দিল্লী বা বোম্বাইতে তাদের মত ছেলেমেয়ে দেখলে আমরা মনে করি বড়লোকের বসটে ছেলেমেয়ে হুঁতু করে টাকা ওড়াচ্ছে। আধুনিকের ভাষায় ওদের নাম Jet Set। কিন্তু টোকিওতে ওদের অধিকাংশই হল গিরে আফিসের সাধারণ Typist বা Secretary। কাজের শেষে বেরিয়ে এসেছে Relax করতে। একজন ভাল সেক্রেটারির বেতন মাসে ৬০০০ হাজার টাকা। তাও ইনকামট্যাক্স ফ্রি। কারণ ইনকামট্যাক্স শুরু মাসে ৭০০০ টাকা বেতন থেকে। জিনিষপত্রের দামও তেমনি। ভালো এক পেট খেতে হলে একশো টাকার ঝাকা। হবে অল্প জিনিষের দাম কম। স্ক্রিপ্ট পাওয়া যায় অনেক জিনিষ এবং সুযোগ-সুবিধা কোম্পানীর দোকানে

ও Cariccen-এ গেলে।

জাপানের শ্রমিকেরা সকলেই সুশিক্ষিত। ছনিয়ার আর কোন দেশে এমনটি দেখা যায় না। তারা আধুনিকতম মেশিনে কাজ করতে অভ্যস্ত। তাই উৎপাদনও করে বেশী। (আর ভারতীয় শ্রমিক আধুনিক মেশিন বদানো হবে শুনলেই ষ্ট্রাইক করবেন) সমীক্ষায় দেখা গেছে জাপানের দুই তৃতীয়াংশ মেশিনই ৫ বছরের কম বয়সের, যেখানে শেখ আমেরিকাতেও দুই-তৃতীয়াংশ মেশিনই দশ বছর আগে নির্মিত। আমাদের দেশে টাটার ফ্যাক্টরীগুলিকেই আধুনিকতম বলা হয়। সেখানেও মেশিনগুলির গড় বয়স ২০ বছর। কারণ কোন মেশিন বদলানো হবে কিনা, তা স্থির করার মালিক টাটা নয়। সেটা স্থির করবেন দিল্লীর একজন সরকারী আমলা।

জাপানী কান্ডুসটির প্রাণ শক্তির মতান করাছিল আর মনটা একটা দোলনায় ঝুলছিল। দোলনাটা কখনো মনকে আকাশে তুলছিল, কখনো মর্ত্যে নামাচ্ছিল।—ইন্দ্রিয় কি পারবেন? ইন্দ্রিয়ও কি পারবেন না।

স্বাভাবিক পেটের ব্যথা, অম্ল, অকীর্ণ ও পেটের বেদনাদায়ক
অব্যর্থ ফলপ্রসূ

আমেরলা হাত ধুসারী

অমুর্বেদনীয় হাতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ এক মাত্র মাত্র
প্রতিদিনে গ্রীষ্মবতীমোহন চক্রবর্তী
শিল্পকলা কল্যাণ • কল্যাণ • কল্যাণ • কল্যাণ

রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অধ্যায়]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

১৯১১ সালে আমার বিলেত ভ্রমণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যখন কোন প্রকার জাতি বা অঙ্গরূপার ভাব না
হয়েছেই সকলে যোগ্য প্রাণে আশ্রয়-আলোচনা
করতে পারতেন। এই মিলনের ধারণাটা কালে মি-
টিতেই মনে। তিনিই এর আয়োজন করেন ও সমস্ত
আশ্রয়-আলোচনার ব্যবস্থাটাও পরিচালনা করেন। এই
বৈঠকেও লক্ষা ছিল যোগাযোগে ভারতের লব্ধ জ্ঞান সহস্যা-
কাল নিয়ে আলোচনা করা। সমস্ত ভারতবাসীরাই মনে
আছে, কিতাবে ১৯১২ সালে আটলান্টিক পেরিয়ে
টাইটানিক জাহাজ ডুবিতে মিঃ স্ট্রিটার শেচেনীর মৃত্যু ঘটে।
জাহাজে তার স্ত্রণগ্রামী অনেক লোক আছেন, তিনি ছিলেন
লিটারেচারের মত এক কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি; আধুনিক
নিরীক্ষার যুগের কামরূপের প্রতিষ্ঠিত তার দৃষ্টিগত যুগ; আর
ছিল সমস্ত মনুষ্য সমাজের স্বাধীনতার প্রতি মহাজ্ঞপ্তি—
যে মহাজ্ঞপ্তির মধ্যে কোন দেশ বা জাতির পায়ক্যোথ
ছিলনা, তা সে মহাজ্ঞপ্তির তীরবর্তী লোকই হোক বা
নেচার তীরবর্তী লোকই হোক। তার চরিত্রের এই স্তম্ভগণি
অকস্মাৎ মৃত্যু হবার উৎসাহেই স্বাধীনতা-কামরূপের
তার নাম উচ্চারিত হতে দেখানোই সে নাম প্রথম স্বপ্নের
আজ তার বছর অতীত হয়ে গেছে তিনি চলে গিয়েছেন।
আজ মহাজ্ঞপ্তির মনে তার প্রতি প্রভাবের ভাব রয়েছে, অতীতের
ব্যবস্থার বিস্তারিত মনে সেই প্রভাবের ভাব পরিমাণে কিছুটা
কমে যেতে পারে। কারণ আমাদের তীরবর্তী শোকে
তারও সমস্তের ব্যবস্থানে চোঁতা হয়ে যায়।

মহাজ্ঞপ্তি যে প্রকৃতির সন্ধানটিও হয়েছিল সেই রকম।
লব্ধ অধীনতা জুড়েই ছিলেন মিঃ স্ট্রিটার। যাদের
আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং যে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা
হয়েছিল, তা বিবেচনা করলে বলা যায় যে সন্ধানটি ছিল

সার্বজনিক। এর লক্ষ্য ও ব্যাখ্যাশ্রয় ছিল একবারে
স্পষ্ট, সোচ্চার। উপস্থিত ব্যক্তিদের সংখ্যা মাত্র হলেও
তার মধ্যে আমেরিকা, কানাডার এবং আয়ারল্যান্ডের
একটি লোক ছিলেন। আর ভারতীয় ব্যক্তি উপস্থিত
ছিলেন তার মধ্যে ছিলেন মিঃ বিশ্ণু চন্দ্র পাল। মিঃ স্ট্রি-
টারে একটি চাবুক নিয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন।
আমার মনে হচ্ছে যেন ঐ চাবুকটি ছিল একটি বাহকের
হাতের কুঠারের প্রতীক—এক মর্মেই বোঝাই যায় কোণ
থাকে পথের। মিঃ স্ট্রিটার মৃত্যুকালে আমার স্বাক্ষ-
ত্বের পক্ষে খ্রিষ্টীয় জাতির কাছে আমার কি বলবার আছে,
তা জানতে চাইলেন। আমারে অসুখই বলতে হচ্ছে যে
এই ঘটনাজিকে যদি একটা নাটকের অভিনয় বলেও ধরে
নেওয়া যায়, তাহলেও এরকম একটা জরুরি মৃত্যুর ক্ষণ
একটা চরম ও ইতিহাস-স্মৃতিকারী লব্ধাবিধির ক্ষণ
মোটাই প্রস্তুত ছিলনা। কিন্তু এ অবস্থা থেকে বেড়াই
নাওয়াও কোন উপায় ছিলনা। চাবুকতণী কুঠার
প্রস্তুত রয়েছে, এবং তা এমন একজন লোকের হাতে রয়েছে
যাকে তখন রহম করা যায় না, যিনি জানেন এ চাবুক
কিতাবে ব্যবহার করতে হয়। সে ব্যবহার তার নিজের
ধর্মের লোকের মধ্যে হই মহাজ্ঞপ্তির দৃষ্টি এবং মৃত্যুর
বোধ জাগ্রিত হুগে। আমি সেই চাপান দাবিয়ার
অবস্থায় আমার পক্ষ বতী সন্তান ভাল করেই লাভ
লিলাম। কিন্তু আমার অন্তরে যে তরঙ্গ কাঁপুনি ছিলনা,
তা নয়। তবে তার পেছনে এ রকম একটা স্তম্ভগণি ছিল
যে ব্যাধি তার নিজের মধ্যে এক বিরাট অংশে অনন্ত
দৃষ্টি ও নিরস্তর করেন, যত তাড়ের মহাজ্ঞপ্তি ও স্মৃতি
মহাজ্ঞপ্তি লাভ করতে পারবে।

ব্রিটিশ জনশ্রুতির কাছে আবার ঘেঁষের পক্ষে মৃত্যুকালীন বাণী ঘোষণার যে আহ্বান আবার কাত করা হল, তা আবার অস্বস্তির সমস্ত স্পর্শকাতর অস্বস্তিকে জাগিয়ে তুললো। এবং আমি মনে করি সম্পূর্ণরূপে নিজে থেকে তাকে নিষেধ করে ফেললাম। চ্যুতটি ছিল একটা। বাইরের প্রতীক মাত্র, প্রেমটি ছিল তার উজ্জীৱিত ভাব। তারচেয়ে স্বাধীনতার প্রতি এই মহান ইংরেজের যে ক্রীতি ছিল, তা আবার মধ্যে একটা পতীর ও অসুস্থত্বপ্রিয়ণ আবেগের লাড়া আঁদিয়ে দিল। আবার মনে হয় আবার প্রোডাটা ও তার আশ্রিতার হয়েছিলেন। যিঃ প্রীতি নিজেই তাহারই বা বর্ণনা করেছেন তা উদ্ধৃত করে প্রকাশ করার চেয়ে ভাল কাজ এখানে আমি আর কিছুই করতে পারি কিনা। এই উদ্ধৃতি একটা বিদগ্ধী উদ্ভূত সিদ্ধি করবে। তার একটা হল, আমি বা বলেছিলাম এবং ঘটনা বা ঘটেছিল তার একটা নথিও বরঙে থাকবে এবং আর একটা হল, একজন মানব প্রেমিক মহান ইংরেজ তারতন্য ও তারতম্যের লোককে কতখানি ভাল খেপেছিলেন তারও একটা স্মৃতি রক্ষা করা হবে।

“মিঃ বানান্জি, তোমাকে বহিঃসূত্র্যাদি দেওয়া হয় এবং আর মাত্র দু’খিনিটের মধ্যে তোমাকে ঘাড়ের উপরে খাতকের কুঠারখানি পতিত হয়, তাহলে, তোমার যথেষ্ট পক্ষে ব্রিটিশ জনশ্রুতির কাছে শেখ বাবের মত কিছু বলার সুযোগ পেলো তুমি কী বলবে?”

এক মুহূর্তের ভক্ত ঘিষা না করে-মিঃ বানান্জি উত্তর দিলেন: “আমি এত বলব (১) এক-তক আইনের সংশোধন কর (২) ঘাড়ের নির্বাণন হও বেগুনা হয়েচে, তাকে মুক্ত দাও এবং বাংলায় বেহিয়ার্স কর্পোরেশন খুল করার ক্ষমতা দে আইন করা হয়েছে, তা বহু কর (৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত দাও (৪) তারতীয়দের হাতে তাজা নিরস্ত্রতা যে কর দিয়ে থাকে তার নিরস্ত্রতা কমতা দাও (৫) কানাকড়ি বাচে তারতন্যে এক সংশোধন দাও। আবার বা বলার আছে তাহল এই। এত কথা বলেই আমি মৃত্যু বরণ করতে চাই।”

তিনি বললেন “বেশ কথা। এখন আবারের আদল

কথার আশা থাক। তুমি তো, আবার মনে মনে হয়েছিল, বেশ-বিভাগ বহু চেয়েছিলে তাই না?”

“হ্যাঁ, সমস্ত চলে বেশ বিভাগ রহিত আমি চাই। কিন্তু আমি স্বাস্থ্যবাহী মানুষ। আমি বুঝতে পেরেছি, লর্ড মেল-রহিত আগে থেকেই চাক্ষুশের সম্বন্ধীয় হয়ে এক অভিজ্ঞ জ্ঞানন করে ফেলায় যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে থেকে এখন তাকে সরে যেতে বলাটা বড় লজ্জা নয়। তাই আমি এখন বেশ-বিভাগ বহু চাক্ষুশ, চাক্ষুশ উহার সংশোধন।”

“কিন্তু আবার মনে হচ্ছে যে তুমি এর বোল-বলতে সমস্ত সব কিছুইই সংশোধন চাহ?”

“আমি বা-লেন্দেতে চাই তাহল এই যে বাংলাকে একজন লেপ্টেণ্ট গভর্নরকে অধীনে রাখা যাক। তার হুজুরের একটি একসিবিউটিড কাউন্সিল থাকবে যাদের মধ্যে দুজন হবেন ভারতীয়। এটা তোমাদের মনে নিতে হবে। কারণ নবগঠিত প্রদেশটি বহু মানে পুরান প্রদেশের সমিত সমান স্বাধীনতা নেই।

পরবর্তী প্রস্তাব হল, বাংলা থেকে-বিহারকে আলাদা করে নিতে হবে। এ প্রস্তাবটি বহুদিন আগে থেকেই সরকারী মহলেরও অভিমতের সঙ্গে ছিল যেনে চলে আসতে। বিহারের লোকেরা বাঙ্গালীকে থেকে তাহার ও কল্পনাত্মক সম্পূর্ণ পৃথক। বেশ বিভাগের মধ্যে প্রাদেশিক হকি সম্পর্কে বুল পরিকল্পনার যে লাবী করা হয়েছে, এই ব্যবস্থার সে সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে, অথচ তা কারও জাতীয় ভাবাবেগকে ক্ষুর করতে না। বহুদিন পর্যন্ত লর্ড কার্জনের অস্বাভাবিক বাতা বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্বাভাবিকভাবে বাঙ্গালী জাতি ঘিষা বিভক্ত হয়ে বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন ও অশান্তি চলতেই থাকবে।”

“আজ্ঞা, নির্বাসিতদের সম্পর্কে কি বলার আছে?”

“কোন অভিযোগ বা কোন রকম বিচার ছাড়াই ডায়ের নির্বাসন দেওয়া কখনই উচিত হয়নি। অভিযোগে তাবের নিম্ন নিম্ন মুক্ত প্রত্যাপন করতে দেওয়া উচিত। আদালত সে কালে আর বেশী বেশী হয়না। তাই সম্পূর্ণ ব্যক্তি, খাতি নাস্তরিক।

নির্বাসন হও তারা পেতে পারেন না।” (চলবে)

বিপ্লবী পুস্তকমালা

৮/৯০

অহুসীলন সমিতির বিপ্লব গ্রন্থ—অনুব্রত বসু—০'০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাশবিহারী—অনুব্রত বসু—০'০০

অনুব্রত বসু সঙ্কেত—

- | | |
|--|---|
| ১। বাংলায় অস্তিত্ব—১'৫০ | ২। বহির্ভাষ্যে ভারতীয় বিপ্লব—০'০০ |
| ৩। অহুসীলন সমিতির পি, যন্ত্র—২'০০ | ৪। দৌলতী সংগ্রাম কাহিনী—০'০০ |
| ৫। কলকাতা শ্রমিকসমূহ—১'২৫ | ৬। কলকাতা সংগ্রাম কাহিনী—০'০০ |
| ৭। রাশবিহারী ও অহুসীলন সমিতি—১'০০ | ৮। স্বাধীনতার শ্রমিক মা ও যন্ত্র—০'০০ |
| ৯। বিপ্লববাদ ও সমাজবাদ—০'৫০ | ১০। বিপ্লবী বিপ্লববাদ—০'৫০ |
| ১১। মহানায়ক ও সত্যবাদ—০'৫০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও জননী নিবেদিতা—১'৫০ |
| ১৩। দেশ বাসের ভোলেদি (১)—১'০০ | ১৪। দেশ বাসের ভোলেদি (২)—২'০০ |
| ১৫। শ্রমিক চতুর্দশের আত্মজীবনী—০'৫০ | ১৬। ১৯৪৭ এপ্রিল জাতীয় শ্রমিক বিপ্লব—১'০০ |
| ১৭। হাতিয়া হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অহুসীলন সমিতি—০'০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় শ্রমিকের ইতিহাস—০'৫০ | ২০। লাইট হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০ |

প্রতিস্থান :—৪নং বঙ্গবাস ট্রাষ্ট কলিকাতা-১০০০০১

টেলিগ্রাফ—১/১/১/A বহিষ চ্যাটার্জী ট্রাষ্ট কলিকাতা-১০



— সম্পাদক মণ্ডলী —

ঐক্যবদ্ধ চট্টোপাধ্যায় (সত্যবাদ) ঐক্যবদ্ধ নন্দী, ঐক্যবদ্ধ চ্যাটার্জী

সম্পাদক—ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সমিতির

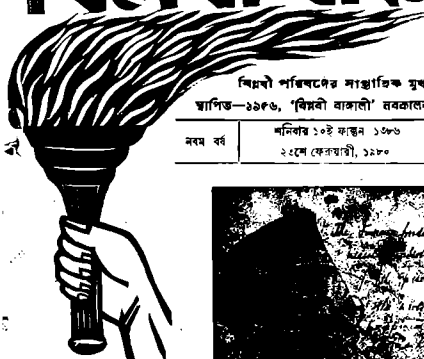
বিপ্লবী বিপ্লব প্রতিনিধি—ঐক্যবদ্ধ সোম। বেঙ্গল—ঐক্যবদ্ধ সোম।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—ঐক্যবদ্ধ সোম। প্রচার সচিব—ঐক্যবদ্ধ সোম।

বিপ্লবী বাণী কার্যালয় :—৪নং বঙ্গবাস ট্রাষ্ট, কলিকাতা-১০০০০১

মুদ্রক :—ঐক্যবদ্ধ সোম। ১ নং বঙ্গবাস ট্রাষ্ট, কলিকাতা-১০০০০১

বিশ্ববী বাংলা



বিশ্ববী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিশ্ববী বাংলা' লবকালবরে—১৯৭৯

নবম বর্ষ

শনিবার ১০ই ফাল্গুন ১৩৮৬

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০

২২ সংখ্যা

I was a fighter,
One fight more,
The last and
The best.
Rash Behari Dasgupta
25/2/72



কেন্দ্র ও রাজ্য

ঐমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দল বিপুল ভোটাধিক্যে গত লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করার পর কয়েকটা রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বীতিমন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। নানা প্রকার জ্ঞানীয়তার দোহাই পাড়তেও কন্থর করছেন না। গত বাবের নির্বাচনে জয়লাভ করে তারা গণী দখল করে বসে আছেন, তাদের ক্ষমতাসীনতাকে নাকি গণতন্ত্রের অবমাননা করা হবে, একথাও বলছেন। কিন্তু ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে অপ্রত্যাশীতভাবে সুদী দখল করার পর, কমপক্ষে নয়টা রাজ্যের কংগ্রেস সরকারকে বাতিল করতে এদের বিবেকের কোন দংশন অনুভব করেন নি। আজ তারা এই সম্ভাবনায় (কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এ সংক্ষে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি) আত্মবেলামাল হয়ে পড়েছেন, জনমতের বাবের দোহাই দিয়ে, তারা শুধু প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলিকে বাতিল করাই সমর্থন করেন নি, নিজেদের দলের লোকজনের বিরুদ্ধে গুরুতর মামলা প্রত্যাহার করেছেন। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নিজেদের লোকজনের কারামুক্ত করেছেন, বিচারাধীন মামলাগুলিও বহুক্ষেত্রে ছাড়া, নীতি ও আইনকাহ্নও মেনে চলেন নি। এগুলি কি গণতন্ত্র সম্মত কাজ হয়েছে বলে তারা তখন সোচ্চারে দাবী করছিলেন, তাদের সংক্ষে ধূসর পদার্থের অভাব ঘটেছিল বলে যদি কেউ মনে করেন, তবে কি সেটা খুব ভুল হবে? প্রকৃতির নিরম হল যে যেমন বীজবপন করে, কসলটা তাকে সেই রকমই তুলতে হয়। জিয়াবোশ্রুতির জাঙ্ঘার অনেক কমিশন বসিয়ে তারা কারো কারো রাজনৈতিক জীবন পদ্ করে দিতে চেয়েছিলেন, নিয়তির পরিহাসে আজ তাদেরই লোকজন তাদের নিবৃত্ত কমিশন কতক অভিযুক্ত হচ্ছে। তারা নিজ নিজ রাজ্য আইন শৃঙ্খলার অবনতি রোধ করতে পারছেন না, কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের হিসাব পর্যাপ্ত দাখিল করতে পারছেন না, চোরাকারবারী, দুর্নাকাখোর ও মজুতদারদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারছেন না। তাদের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশের দিন ঘনিবে আসছে বলেই কি আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে? কেন্দ্রে একটা নৈরাজ্যের অবস্থা থাকার ক্ষত, যারা যা সুদী তাই করে চলেছিলেন, আজ তাদের কৈকিহৎ দেবার দিন সমাপ্ত বলেই কি তারা নানা প্রকার ভূয় আওরাজ তুলে নিজেদের কৃতকর্মের সাক্ষী গাইতে চাইছেন? এইসব দল ও সরকারের অসহায় অবস্থার কথা অনুভব করলেও সমর্থনের পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

উত্তর প্রদেশে নারায়ণপুরে নারীবর্ষণ, গুলিচালনা ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের যে কাহিনী প্রকাশিত

তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা উচিত। নিজেদের অক্ষমতার দ্বন্দ্ব ভাবা লজ্জিত নয়, অস্বস্তিপূর্ণ নয়। উপরন্তু, বেহারার মত তারা বাণী হুজুচ্ছে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই নারকীর ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ, ও অভিযাচীরে গভীরতা সহজে ব্যক্তিগত জ্ঞান সঞ্চয় করতে গেলেও সেটা হবে উত্তর প্রদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। সংবিধান সম্বন্ধে এমন অত্যাধিকার অজ্ঞতার দ্বিতীয় নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না এই বৃকম প্রলাপোক্তির একটি সম্ভাব্য কারণ হল যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে, নিজেদের অপকর্ম ও অযোগ্যতারে তাদের প্রসঙ্গ এমনিডেই ভেঙ্গে পড়বে তাই এরা কেন্দ্রকে scape goal করতে চাচ্ছে। এই কৌশলে দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎটাকে একটু ঢাকা করে রাখতে চাচ্ছে। কিন্তু দেশের মানুষ এত অন্ধ নয়, এত মূর্খ নয়। এমন বিচার শক্তিশীল নয়, যে তারা অপকর্মের দোকার ভুলবে ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে অসমর্থ হবে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের বিবিধ আন্দোলনের কানুচী প্রকাশিত হয়েছে। হঠাৎ আন্দোলনের ছমকি দেওয়া হচ্ছে কেন? তবে কি উপরোক্ত মানসিকতা তাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে? বামফ্রন্টের নেতার তিমুরী আন্দোলনের আফলনের কথা মনে কোঁচুক অল্পতব করতে বাধ্য হতে হয়। ওদের প্রথম দুজ হল ইন্দিরা সরকার রাজ্য সরকারকে ভেঙে দিতে চান। দ্বিতীয় কারণ, প্রাথমিক বৃদ্ধি হচ্ছে। রাজ্যসরকার গুলিকে ভেঙ্গে দেবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই মূল্যবান তথ্য ওয়া সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে? রাজ্যগুলি যদি প্রশাসনে অযোগ্যতা দেখায়, তবুও কি কিছু বলা যাবে না? এত Spoilt Child এর অবদারের মত শোনায। রাজ্যগুলির উচিত কেন্দ্রীয় নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। তা না করে সংঘর্ষ বাধাবার এই সর্বনাশা প্রচেষ্টা কেন? তবে কি এটাই কারণ যে কেন্দ্র শক্ত হলে, তাদের অনেক কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক তদন্ত হলে যে রূপ তাদের প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তারপর জনতার আদালতের সম্মুখীন হওয়া আর তাদের সম্ভব হবেনা? নিজেদের কাজকর্মের চিত্র যদি পরিচ্ছন্ন থাকে, তবে ভয় করার কি থাকতে পারে সেটা সাধারণ বুদ্ধির অঙ্গম।

তারপর প্রথমলোকের অজুহাতটাই কি তাদের পক্ষে যুক্তদায়ক হবে? বর্তমান সরকার ত একমাসও সময় পাননি, তাদের নীতি নির্ধারণ করতে। উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা তাদের যেতে হয়েছে পূর্বতন সরকারের কৃতকর্মের ফলে, তার সমাধান কি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সম্ভব? একমাত্র বন্ধ উদ্ভাষ ভিন্ন, অল্প কেউ একথা বিশ্বাস করেন না।

কথায় বলে, নিজে কাঁচের ঘরে অল্পকে ঢিল মারাটা খুব বুদ্ধি মতাব পরিচায়ক নয়। এই প্রদেশের সরকারের কাজকর্ম কি ত্রুটিহীন? কোন প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান তারা করতে পেরেছেন? একটিও চোরাকারবারীকে তারা সায়েস্তাকরতে পেরেছে? সম্ভাবাক্ষেত্রে প্রাথমিক গতিবোধ করতে পেরেছে? আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতির কি উন্নতি ঘটেছে ওদের আমলে? চুরি, ডাকাতি, খুন, স্বাহাজানি ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যাবশক্তি সংবরোধ করার ক্ষেত্রে ও হিমালয়পর্বত

এমান বার্ষিকার পরিচয় দিয়েছে। এই অন্ধকারের পরিকল্পনা করতে সমর্থ না। হওয়ার জন্য কবি ও শিল্প এখানে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একান্ত হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়েছেন, হচ্ছে এবং আরো হবে। মাত্রাজান হারিয়ে না কেলে নিজদেশের রেকর্ডে সন্ধানী-আলোটা ফেলালেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাদের আমলে মরিচকাপিতে যে নবমেঘবজ্র ঘটছে, আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্ন যে কোন সরকার এই বার্ষিকার জন্য পদত্যাগ করত। হস্ত সাংস্কারিক নির্বাচনে জয়লাভ করে তাদের অহমিকা গড়ছে অবশ্য কিতাবে এই জয়লাভ ঘটছে, দেশের মানুষ সে সবচেয়ে অনেক কিছুই জেনেছে এবং একটা তদন্ত কমিশন বসালে আরো অনেক কিছুই প্রকাশ পাবে বলে দেশের মানুষ মনে করে। সাত ভাঙাভাঙি 'মুখ্য মেহি' আওরাজ তোলা হচ্ছে কোন প্রয়োজনে? প্রথা মূল্য বৃদ্ধি, চোরাকারবারী, আসামে নসরাজনক ঘটনাবলী ঘটন ঘটছে, তখন এই লড়াই, মনোবিনতি কোথায় ছিল? একটা নৈরাজ্য অবস্থা। পার হয়ে যখন দেশে একটা ব্রিটিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তার সঙ্গে সহযোগীতা করে, দেশের মানুষের মঙ্গল সাধন করবার কাজেই আত্মনিয়োগ করাইত অবশ্য কর্তব্য। সব দলের এবং দলীয় সরকারের। সুতরাং সব মানুষই এটা মনে করেন। জনসন্ধ্যায় কি শুধুই প্রোগান হিসাবেই ব্যবহার করা হবে? সীমিত শক্তি, আরো ক্ষমতা, আরো টাকা ইত্যাদি কথা বলে কি সব ধামাচাপা দেওয়া যাবে। নিখিল ভারত জনসংযোগ সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী উপদেশ দিয়েছেন এই বলে যে আমাদের মনে রাখা সরকার, কিছুলোককে কিছুদিন বিভ্রান্ত করা সম্ভব, কিন্তু সব লোককে সংশয়ময়ের জন্য বিভ্রান্ত করা যায় না। যুদ্ধ বাজরা এই উপদেশ মেনে চললে, নিজদেশের এবং সকল পক্ষেরই ভাল হবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আজ অগণিত। যে কোন সময় সাতা বিশ্বের চরম বিপর্যয় ভেঙে আনতে পারে। দেশের অর্থ নৈতিক, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও খুব খারাপ। সংঘর্ষের পথ পরিহার করে, সহযোগিতার পথে চলে দেশের সংহতি সৃষ্টি করাই প্রধান কর্তব্য সব দেশ প্রেমিকের। নতুন করে বিশ্ব শৃঙ্খলার প্রচেষ্টা যদি কেউ করে, তবে দেউ দেশজোড়ীতার সামিল হবে বলে চিন্তাশীল মানুষেরা মনে করেন। একদম যে প্রতিরোধ বাহিনী গ্রহণ করা উচিত, তা করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কোন জটী করবেন না, এটাই দেশবাসী প্রত্যাশা করে। দেশের স্বাধীনতা করতে যদি কেউ দুঃসাহসী হন, দেশের মানুষও নিশ্চয়ই তাদের ছায়া পাওনা মিটিয়ে দেবেন, এই ভরসাই অন্ধকারের মধ্যে আলোক-বর্তিকা জেলে রাখবে।

আসামের অহম-বিচ্ছিন্নতাবাদ

॥ কালীশৰ সরকার ॥

গত তিন মাস ধরে আসামে সেখানকার বাঙ্গালী অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যে সংঘবদ্ধ হিংস্র আক্রমণ চলল তাকে ভোটার ভালিকা থেকে বিদেশীদের নাম বান শেখার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বলে বিষয়টিকে লক্ষ্য করার যে চেষ্টা সম্প্রতি শুরু হয়েছে তা কোনমতে সমর্থন যোগ্য নয়। আসামে শান্তি শৃঙ্খলা সম্বন্ধে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে অহম ষাভুয়া বাদীদের বর্ষের অক্রমণের কারণটি হাতে উদঘাটিত হয় এবং অপরাধীরা শাস্তি পায় তা বেন কর্তৃপক্ষ মনে রাখেন। নতুবা এমন অনর্থপাত কিছুতেই ঘোষণা করা যাবে না।

ভোটার ভালিকা সংশোধন একটি আইনঘটিত বিষয়, আইন-আদালতের পথেই তার মীমাংসা সম্ভব। তাকে উপলক্ষ্য করে সংখ্যালঘুদের ভণ্ডার চড়াও হয়ে, তাদের ঘরবাড়ি দোকান গোড়ানো, সম্পত্তি লুণ্ঠন, বেপারোরা তাতে পুন জব্দ করার হেতু কি? আসামের রাজ্য কর্ণচাৰীরা আইন শৃঙ্খলা বন্ধার লক্ষ্যে তুলে এই হিংস্র আক্রমণেরই বা কেন অনীদার হবে? অবস্থা দেখে অনেক অনৈক সমস্বই মনে সন্দেহ হয়েছে যে, আসাম কি বাদীন গণতান্ত্রিক ভারতের অঙ্গ রাজ্য, না ব্রহ্মোৎসর্গ শতাব্দীতে উদ্ভব বার্মা থেকে আগত অসভ্য অহম উপজাতির দলপতি সখাকার শৈল রাজ্য?

আন্দোলনের পুরোভাগে আছে আসাম ছাত্র ইউনিয়ন এবং আসাম গণপরিষদ। তাদের মাধে আছে রাজ্য সরকারের কর্ণচাৰীবৃন্দ। প্রশাসন বলতে

আসামে প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই। আসামের রাজ্য-নৈতিক দলগুলিও আন্দোলনকারীদের নৃশংস আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। এমন কি অয়েল ইণ্ডিয়ার টেকনিক্যাল ম্যানেজার বিজ্ঞানী ড. ববীন মিত্রকে চক্রান্ত করে জেলে নিয়ে ধূলিয়ারাজ্য হাসপাতালের সামনে নির্ভরভাবে হত্যার বিরুদ্ধেও অসম্ময় সমাজের কর্তা ব্যক্তিরা একটা কথাও বলেন নি। হাসপাতালে বহু কর্মী এবং প্রহরী ছিল তারা ধাড়িয়ে ধাড়িয়ে সেই বর্ষের হত্যাকাণ্ড দেখল, একটি লোকও এগিয়ে এলো না নিরপরাধী বিজ্ঞানীর প্রাণরক্ষায়। বিশেষ শতকের শেষপর্বে এ ঘটনা কেমন করে ঘটলো ভাবাই যায় না।

এ থেকে কি বোঝা যায়? হয় সকল শ্রেণীর অসম্ময়তা এই বাঙ্গালী নিপীড়ন কর্ণকাণ্ডের সমর্থক, নয় একমল বিভেদপন্থী হান্সামাকারী অহম ষাভুয়া-বাদের প্ররোচনা দিয়ে তাদের কল্যাণ করেছে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের প্রাথমিক সংবাদ—বিস্ত্রাহী নাগা নেতা কিজো এবং মিজো নেতা লাল ডেংগার অমৃতচবর্গ আসামের গোলঘাগের পিতনে আছে। আসামকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি করে যে সব ইতারাহ ছাড়া হয়েছে তার বেশ কিছু বিদেশে ছাপা। বার্মার আব্বাকান ও বাংলা দেশের রাষ্ট্রমাটি অকলে বিভেদপন্থীরা গেলিলা হুন্ডের ভালিম নিস্তে এবং মিশনারীদের মাধ্যমে হান্সামাকারীরা অর্থ ও অস্ত্র পাচ্ছে। গোয়েন্দাদের হাতে যে সব কাগজ পত্র ও তথ্য এসেছে তা থেকে

ভাষা মনে করেন যে, বিষয়টি সুশ্রবিকল্পিত এবং ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে খুবই মারাত্মক।

অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা এই ছয়টি প্রান্তিক রাজ্যের সহিত মূল ভারতভূমির সংযোগ পথ আসামের মাঝ দিয়ে বিস্তৃত। আসামে অশান্তি সৃষ্টি করে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলতে পারলে; সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব এবং তখন সেখানে একটি ভারত বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটানো — এই ছিল হৃদয় সাপ্তাতিক গোলযোগের লক্ষ্য। হাক্কামা আরস্তের সময়টিও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বেছে নিয়েছিল বেশ বুকেরমুখে, যখন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল নড়বড়ে, রাজ্যে চলেছিল দলাদলির খেলা এবং লোকসভা নির্বাচনের ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। নির্বাচনের ফল অপ্রত্যাশিত ভাবে বিভেদনপরীদের প্রতিকূল হওয়ায়, তারা এখন সাক্ষাৎ গাইতে শুরু করেছে যে তাদের আন্দোলন বৈধ ও শান্তিপূর্ণ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের ওপর সমর্থক নয়।

এই গোলযোগের পিছনে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী আন্তর্জাতিক চক্রান্তের গোপন অভিসন্ধি থাকার সম্ভাব্য। মনে রাখতে হয় যে অকলটি চীন ও বার্মার সংলগ্ন।

আসামে বাঙ্গালী অধিবাসীর সঠিক সংখ্যা জানা যাচ্ছে না, তবে আসামে অসমীয়াদের পরেই তাদের স্থান। সংখ্যালঘু হলেও তারা নগণ্য নহে এবং আসামে বাঙ্গালী বসতি সুপ্রাচীন। বেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে বেশ কিছু সংখ্যক বাস্তুহারা হিন্দু আসামে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু আসামের ভূমি পরিমাণ ও লোকসংখ্যার বিচারে অসমীয়াদের গেল গেল রব ভোলায় কোন

আসামের ভূমি পরিমাণ ৭৮,৫২৩ বর্গ কিলো-মিটার, জনসংখ্যা দেড় কোটি, প্রতি বর্গ কিলো-মিটারে লোকবসতি ১৫০। সে তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের ভূমি পরিমাণ ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার, জন সংখ্যার চার কোটি তেত্তাল্লিশ লক্ষ, প্রতি বর্গ কিলো মিটারে জনবসতি ৫০৭।

ভারত বিভাগ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল। ইসলাম রাষ্ট্রপূর্ব পাকিস্তান (বাংলা দেশ), ছেড়ে যদি কোন হিন্দু ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয় তবে ভারত সরকার নীতিগত ভাবে তাকে ভারতে স্থান দিতে বাধ্য। সংবিধানে এই ধরনের উদ্বাস্তদের ভারতীয় নাগরিকত্বদানের বিশেষ বিধানও আছে। অম্বচ অহম বাস্তুহাবাদীরা বলছে যে, অ-অসমীয় হলেই সে বিদেশী, ইতিপূর্বে হুজিঁন বার সাধারণ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রেরাগ করলেও সে বিদেশী এমন কি শতাধিক বৎসর আসামবাসী হলেও সে বিদেশী। প্রাস্তুহুজিঁ চোরাড় না হলে এমন দাবি কি ভাবে করে? অহমদের আবদার, এই সকল বিদেশীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। আসাম থেকে তাদের তাড়াতে হবে। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে অহমরা এসেছিল উত্তর বার্মার মৌলং থেকে ভারতে। আসামের নাম ছিল তখন কামরূপ দেশ ভারতেরই একটি অঙ্গ রাজ্য। আহমরা সে বিচারে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। বাঙ্গালীদের প্রতি অহমবিভেদনপরীদের বিদ্বেষের কারণ—বাঙ্গালীদের উন্নততর শিক্ষা, সংস্কৃতি ভাষা এবং জাতীয়তাবাদ বা অহম বাস্তুহাবাদের পরিপন্থী। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাও যে সেই তা নয়। তবে সে প্রতিযোগিতা তো ভারতের সর্বত্রই আছে। ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা আসামের ভূমি উর্বর, রূটিপাত প্র

তাহাড়া আসামে আছে বনজ ও বনিজ সম্পদ, যার উপাদান বটন ব্যবস্থা বহু লোকের জীবিকা সংগ্রহের স্রবসোৎসব এনেছে। পাথর, কেশর, গালা, হস্তিনা, বেত ও বাঁশ থেকে নানা শিল্প প্রসারের সম্ভাবনাও আছে আসামে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত বিরল বসতি আসাম কিংবা মেঘালয়ে করবে হাজার বাস্তুহারা পূর্ববঙ্গবাসীর স্থান হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

আসামে ব্যাপক বিদেশী অনুপ্রবেশের কথা যদি বলতে হয় তবে তা ঘটেছিল ইংরাজ শাসন কালে, যখন ব্রিটিশ আসামকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বানানতে সিদ্ধান্ত করেছিল। এসম্পর্কে একটা উপাত্তর দিলেই অনুপ্রবেশের স্বরূপ বোঝা যাবে। ১৯১১ সালের আদম শুমারিতে আসামে মুসলমান সংখ্যা ছিল ৩,৫৫,৩০০। তারপর ১৯৪১ এর আদম শুমারিতে মুসলমান সংখ্যা বেড়ে হল ১৩,০৫,২০২। এটি অনুপ্রবেশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসামে উল্লেখ্য আগমন খুবই সীমিত ধরনের। অহম বাহাদুরাদীরা পূর্বে কি নাতে সহরের তেল দিয়ে ঘুমচ্ছিল? আজ সহসা তারা কেঁপে উঠল কেন? এ কেনর উত্তর বেশ গভীরে।

ইংরাজ শাসকরা যেমন আসামকে করতে চেয়েছিল একটি মুসলমান প্রদেশ, তেমনি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতিদের স্থগিত করে সেখানে গড়তে চেয়েছিল একটি অমূল্য বৃদ্ধী অঞ্চল। এ সবকে বিঃ হামিণ্টন তাঁর হিন্দুস্থান গ্রন্থে লিখেছেন—
‘Various suggestions were made to make Christianity a success. Considering as a means of policy, Christian population, holding a decent rank in the motley throng of tribes

and castes, world tend to consolidate the strength of the state and add to the probable duration of the empire. A colonisation of the nature alluded to, would serve to perpetuate the empire and attach the tribals to their European Superiors.’

এই উদ্দেশ্যেই ইংরাজ মিশনারীদের বসানো হয়েছিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে এবং হিন্দুধর্ম প্রভাব থেকে উপজাতিদের লোকদের বিচ্ছিন্ন করা চেষ্টা ছিল। মেজর এস. জোহরি এই সময় সম্পর্কে লিখেছেন, ‘Thus attempts to depopularise Hinduism were set afloat. As a result, Christianity succeeded in some areas and in others the absorption of the people into Hinduism completely ceased’—Where India, Burma and China meet.

ইংরাজ ভারত ছেড়ে চলে গেলেও মিশনারী এবং তাদের অনুগ্রহভাজন ভক্তদের অনেকে এখনও অস্তিত্বের ভারত বিরোধী মানসিকতা আঁকড়ে ধরে আছে। কিলো ও লালডেংগারা তার দৃষ্টান্ত। বেশ বিভাগ কালে বিদেশী মিশনারীরা উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে একটি Gown Colony স্থাপনের উদ্ভোগ নিয়েছিল তা হয়ত অনেকেই জানেন না। কংগ্রেস নেতৃবর্গের বাধ্যনামে সেই প্রস্তাব বেনিঙ্গুরে এসেতে পারে নি। ইংরাজ না থাকলেও মিশনারীরা নানা দেশের বৃদ্ধান সংস্থা থেকে ভাল টাকা পায় এবং তা দিয়ে তারা বর্ধ-প্রচারের সঙ্গে ভারত বিরোধী ভাষণবতা চালায়।

বার্ণা মূল্যে বৌদ্ধমতের প্রতিপত্তি ঘটলে

অহমরা ভারতে প্রবেশ করে এবং প্রথমে নাসাবেশে এবং পরে সমগ্র কামরূপ রাজ্যে অধিকার বিস্তার করে। তাদের শেষ রাজধানী ছিল কোড়হাটে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আসাম দখল করে। আসামের প্রাচীন নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষ মধ্যযুগীয় নাম কামরূপ। অহমগন বাক্যকালে হিন্দুধর্ম এবং প্রাকৃত বাংলা ভাষা গ্রহণ করে। ডঃ সুনীতি চ্যাটার্জি এ সম্পর্কে লিখেছেন—‘Hinduism of the Ahoms at first in culture and religion and then in language, commenced with vigour in 17th Century and by 1750, it was all over but complete.’

কামরূপ উপত্যকায় অহম অধিকার কালে শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মমতের প্রাধান্য ছিল। শক্তিপূজা ছিল তার বিশেষ রূপ। কামাক্যা দেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। স্বামী শংকর দেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন এবং তাঁর চেষ্টায় সমগ্র আসাম বৈষ্ণব মতাকল্য হয়ে যায়।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকালে অহম স্বাভাব্যবাদীরা

হলে যে, তারা ভারতীয় নয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অজ্ঞা পোষণ করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথাই কোন তাৎপর্য নেই। অহমদের সহিত যে প্রাচীন কামরূপবাসী এক হয়ে মিশে গিয়েছে তারা তো মহাভারতের যুগ থেকে ভারতীয়, আর্থর্ষ ও সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে একীভূত ছিল। ভারতীয় জাতি বিভিন্ন সময়ে আগত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির লোক নিয়ে গঠিত। আসামের অহমরা তার ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্নভাষাভাষীদের এ সকল প্রচার কুমতলব হাসিল করার কৈশল্য মাত্র।

অসমীয়াদের গ্রামসঙ্ঘত শাবির প্রতি সকলেরই সহানুভূতি আছে এবং যদি অবৈধ অশুপ্রবেশ-জমিত সমস্যা থাকে, তবে তার সৃষ্ট সমাধানও সবাই চায়। তাই বলে মারলাচা চাফিরে শাবি আদায় কিছুতেই বরাদ্দ করা হবে না, কিংবা বিচ্ছিন্নভাষাদিকে প্রাঙ্গণ দেওয়া চলবে না—একথা বিবেচনপন্থীরা যেন মনে রাখে। আসামে যে সব বাঙ্গালী এবং গুর্খা বসবাস করছে তাদের নিরাপত্তাবিধান সর্বগ্রে প্রয়োজন। অল্প সংখ্যালঘুতা সংখ্যায় নগণ্য, তাদের ওপর বিচ্ছিন্নভাষাভাষীদের আক্রোশ কম।

স্বাভাব্য পেটের বায়ু, অম্ল, জলীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলস্রাব

আমলা হাত বুসমারী

অ্যাম্বুবেনিয়াম ঘণ্টে ১০০০

মূল্য ৩.৫০ এক আন্তর্জাতিক

খ্যাতিমানঃ শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী

কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা

Hooghly District Congress Committee (I)

Camp Office : 175C, G. T. ROAD, SERAMPORE—2

President : Prof. Swaraj Mukherjee

Genl. Secys : Prof. Ganesh Hatui

Dr. Sailen Chatterjee

Rabin Mukherjee

Treasurer : Kisen Ta

Ref. No :

Date :

প্রসঙ্গঃ শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন

প্রভেদ সম্পাদক মহাশয়,

বিদ্যবী বাংলা সমীপে

সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক কারচুপি করেছে, হুগলী জেলা তার নিকৃষ্টতম উদাহরণ। এই জেলার ১৬ লক্ষ ভোটার ১৯৭৭ সালে ছিলেন, সেটাকে বাড়িয়ে ১৯ লক্ষ করা হয় এক কংগ্রেসী ভোটার কমানো হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজারের মত। ফলে বামফ্রন্ট প্রায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ভোট নিজেদের সপক্ষে তৈরী করেছিলেন, কংগ্রেসই সংগঠনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল নির্বাচনের আগে ডি, এম. সমস্ত মহকুমা শাসকদের নিয়ে সেই সমস্ত ভোটারভাণ্ডারের নাম লাল কালি দিয়ে দেন এবং তারা ঘণ্টারীতি ভোটদান থেকে বঞ্চিত হয়। ভোটের আগের দিন রাতে শোনা যায় যে সি, পি, এম এর পার্টি সদর দপ্তর হস্তে ডুকিট ব্যালট পেপার বিলি করা হয়।

এছাড়া জেলার সর্বত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক ভোটাররা ভোট দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে কোন অভিযোগই লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

কাজেই এই জেলায় যদি ৭৭ সালের ভোটার লিষ্ট অনুযায়ী ভোট নেওয়া হত তাহলে সি, পি, এম একটিও আসন পেতনা।

আমরা জেলা কংগ্রেসের পক্ষে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছি। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন পঠিত হলে আমরা সমস্ত প্রমাণ দাখিল করতে প্রস্তুত।

স্বাঃ বরাজ মুখার্জী

বিদগ্ধী বহিস্কারের নীতি কি হয় ?

শ্রীযুক্ত অম্বোপাধ্যায়

আগামের আন্দোলনকারী ছাত্রনেতাদের সাতটির মধ্যে পাঁচটি দাবীই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নিষেধের। ঐ দাবীগুলি মূলতঃ ছিল আগামে বহিঃসঙ্গত বিশেষনী বিভাজন সংক্রান্ত। বহিঃসঙ্গত বিশেষনী বাহ্যে আসামে ভোটাধিকারচ্যুত হয় তারও ব্যবস্থা গ্রহণ। এখন প্রশ্ন প্রকৃত বিশেষনী কে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তৈল সিংহের কাছে বাধ্য হয়েছেন যে, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে অবস্থিত অকৃত্রিম রাজ্যের নাগরিকরা আগামে বসবাস করলেও তাঁদের বিশেষনী আধার সূচিত করে বিভাজিত করা চলেবে না। ভারতীয় উত্তরবঙ্গের বাইরের কোন নাগরিক সে অস্ত্র যে কোনও রাজ্যের আগন্তক হউক না কেন, বিশেষনী বলে গণ্য হবে আগামে। প্রকৃত বিশেষনীর আগামে ভোটাধিকার দেওয়া হবে না—একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমান আন্দোলনকারীরা এই নীতি কি যেমন চলেবে বা ভবিষ্যতে যেমন চলবে? আগামের বহু প্রকৃত স্থানে গোষ্ঠীর পৃথক্‌করণ ইতিপূর্বে

‘ভারতীয়রা কিংবা বাক’ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা নিশ্চয় ভালো করেই ও সরকারের নজরে সে সংঘর্ষ এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আগামে কর্মরত সংখ্যালঘু বাঙালীদেরও হিংসাত্মক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বলি হতে হয়েছে যা সভাই নিস্কার ও বেহেনাসার প্রভৃতি গায়ত্রবাসীর কাছে। বেচে বেচে বাঙালী খড় বড় অকিঞ্চিৎকর কোণে হত্যা করা হয়েছে নিঃশব্দভাবে বার তুমরা বিহীন। এই বর্ষভুক্ত ঘটনা জাতীয় সংসদিকের বেশ বিপর্যয় করেছে এবং আগাম রাজ্যে অ-সংসদিক ভাড়া প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক চরম লাহুনা এমনকি দুর্ভাগ্যবশত বাধ্য হচ্ছে ঐ সব আন্দোলনের ফলে যা কোন মতেই বরখাস্ত করা যায় না। আগামে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিঃসঙ্গতা ও ব্যাধাঙ্গ্য ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকেই আরো বহুতঃ হবে। আগামে যে অস্বা

সংকর না ভুলে আগাম বিচ্ছিন্ন হবে যেতে পারে বলে আগামা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যদি আগামকে থাকতে হয়, তবে কোন ভারতীয়কেই আগাম প্রবেশ থেকে বহিঃসঙ্গত অধিকার ও প্রকার রাজ্য সরকার বা অনন্যীতা জনগণের নেই—একথা কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার প্রত্যয়ের মাধ্যমে সম্যক বুঝিয়ে দিতে হবে, নচেৎ আগামে অবস্থিত ভারতীয়রা তথ্য কাল-কারবার বা চাকরী উপাধি করতে ভরসা পাবে না এবং ফলে জাতীয় ক্ষয়-ক্ষতি হবেই ঐ সব ঘটনার আন্দোলনকারীদের দ্বারা বার বার বা লক্ষ্যকর ও প্রবলজনক। তৈল বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক ডঃ রবি মিত্রের দৃষ্টিতে যে পৈশাচিক অপ-কৌশলের মাধ্যমে ঘটনা হ’ল তা সভাই অমানবিক ও মিথ্যে বা দুর্ভাগ্য অস্ত্র অপরাধ। তিনি বাঙালী—এই অপরাধে কি তাঁকে ঐ বৃহৎসভাবে হত্যা করা হ’ল? আন্দোলনকারীদের বর্তমান অনৈতিহাসিক আগাম পরিবর্তন চাড়া একটিনি সমস্যার সমাধান নেই। মানবিক শ্রুতি বুদ্ধির উন্নয়ন ব্যতীত আগামের বহুতঃ উন্নয়নের পরি-সমাপ্তি ঘটবে বলে মনে হয় না। ‘সবার উপর মাহুর সভা, তাহার উপর নাই’ চণ্ডীগলের ঘটনা আগামাই এর সমাধান, অস্ত্র কোন পথ নেই। কিন্তু ছাত্র-যুগের কি আগামে সে বাণীকে সফল করার অস্ত্র এগিয়ে আগামে? যদি এখনও আসে তবেই মঙ্গল। অনন্যীতা সভাজেব শিক্ষিত জনমানসের সহযোগে এই আগামের নিবেদন। অস্ত্র : রাজ্য যখন কোন ভারতীয়কেই বিশেষনী বলে মনে করে না, সেক্ষেত্রে আগামের এই অস্ত্র বারনা কেন? কি তার দৃষ্টি? যদি অনন্যীতা অস্ত্রভব করে যে, বাঙালীদের সঙ্গে চাকরী যোগাড়ের ক্ষেত্রে তারা অপারগ জনগণের দিক থেকে, তবে তারা নিবিহার আগামে অনন্যীতার অস্ত্র সতকরা একটা নিমিষ্ট কোটা করে নেবার জন্য রাজ্য বিধান সভায় আসেন

বোধে নিশ্চয় করিয়ে নিতে পারে। এর অল্প সাক্ষ্যই
 নিম্ন উক্তের প্রত্যক্ষণ কি? কেন এই ছোট হানাদগণি
 ও 'বিক্রিষ্টতাবাদের' শিকার তারা হচ্ছে? কি সরকার
 এই লোকদের ও গণীকরণের হত্যা সাধন? অসমীয়া
 বন্ধু এইটুকুই ভেবে দেখেন কি জাতীয় স্বার্থে ও দেশের
 অর্থ ও প্রকারে? মনে হয় তাদের শুভ বৃত্তির উপর
 এতদূর হবে। অথচ এই বিশেষীর সমস্যা এভাবে আর
 জাতীয় ঐক্য ও সংগঠক বিপদায়িত্ব করতে পারবে না।
 আমাদের সকল ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা যাহা নিশ্চয়
 নিশ্চয় পানাপানি পথে বন্ধুত্ব মত সুখে-খন্ডে
 বন্ধবান পথে লাভের। অত্যাচার ভীষণ অনর্থ ঘটবে,
 যার পরিণাম 'বহন' পথের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকারক।
 আমাদের বর্তমান শক্তিশালী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই
 নিশ্চয় কীভাবে করণে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য
 বাস্তবিকভাবে অবস্থান উল্লেখযোগ্য বিরাট। বর্তমান
 আমাদের আর এমন উন্নতিপন্থী নতুন প্রজন্মের বহি
 মত। কারণ আমাদের মানবতার বৃত্তি পথে পথে
 ঘটে কেন? কি তার আলস কারণ? যোগ্য বাস্তবিক
 বাস্তবিক বিচারে এত ব্যস্ত না হয়ে উচ্চ বাস্তব
 নীতি চালু করে নিলে ভাল হয়। কেন এই হিংস্রতা
 অথবা সংগ্রাম? আমোলনকারীরা কানী করেছে রাজ্য
 সরকারের হাত থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে
 কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নাগরিকত্ব সন্যাসী সর্বপ্রকার
 সার্বভৌমত্ব চালু করতে অর্থাৎ রাজ্য সরকারের দেওয়া
 নাগরিকত্বের সার্বভৌমত্ব তারা মানবেন না, কেবল
 কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ প্রাধান্য উত্তরে চাই। এ এক
 অগ্রাহ্য বারনা। নাগরিক অধিকার অর্জনের কতকগুলি
 বিধি-সম্মত আইন-কানুন এসেছে চালু আছে এবং তা
 অগ্রাহ্য সকল রাজ্যই মেনে নিয়েছে। অসমীয়াদের তবুও
 এই ব্যাপারে আপত্তি কেন? কি তাঁর ভিত্তি? বিভিন্ন
 রাজ্য যদি পরস্পরকে এভাবে সম্বোধন চোখে দেখতে
 অসমর্থ হয় তবে সেটা কি বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়? কেনই
 এই অন্যায় হুক্তকে সমর্থন করতে পারে না। সকল
 রাজ্য যেখানে-সেখানে আইন আদায় করে চলে, আমাদের তা
 মানতে চায় না কেন?

ভাষ্যনৈতায়া মুখে বসি বসু না কেন, এই নজর-
 ভরক হত্যা আমোলনকে শুভ করে যেওয়া কেন্দ্রীয়
 সরকারের আশ্রিত করণ। এতটি বিশেষ প্রবেশ যদি
 অন্যায়কারী হয়েও এরূপ প্রস্তাব পাঠ ও দিয়ে দিয়ে
 নিজেদের প্রাধান্য এভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরও জারি
 করতে চায়, তবে তা নিশ্চয় বিরুদ্ধতাবাদ ও সমর্থনযোগ্য
 কোন মতেই নয়। আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লক্ষ্য
 কি উপায়ে ওখানে বসবাস করবে তা কেন্দ্রীয় সরকার
 সরকার ও সে বিষয়ে বধ্যাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত
 আবশ্যিক। একথা সত্য যে দেশ-ভারতের সকল অসমীয়া
 বাসোদ্দেশ ও পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অনেক সংখ্যালঘু
 ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আসার নিমিত্ত ঐতিহাসিক ও
 সাম্প্রতিক কারণে বাধ্য হয়েছে, তারি কিছু। অল্প
 সাম্প্রতিক কারণে আমাদেরও ইতিপূর্বে আসার পেয়েছে।
 তখন পরবর্তীতে তারা আসে তাদের অনেকের পক্ষেই
 তখন হস্তোক্ত বা সীমিত অবস্থিত উপায়ে অধিকারিকের
 কাঁচ থেকে ব্যাধনমত পরিচর পত্র সংগ্রহ করা
 সম্ভব হয়নি। বহু মিসের প্রতিপত্তি পণ্যকারী পক্ষে হস্তোক্ত
 বা সাম্প্রতিকের প্রমাণসম্মত সম্মত যোগ্য করা সম্ভব
 হয়নি। তাই বলে কি তারা বিশেষী বলে আশ্রিত গণ্য
 হবে? তা কখনই হতে পারে না।

তারা দেশ ভারতের সমস্ত একবার বাস্তবিক
 হস্তোক্ত সাম্প্রতিক বাস্তবিক আদায় তারা কোন মুহুর্তে
 গৃহীতারা পথ ক্ষুধার পথ্যের পক্ষে অগ্রাহ্য বিষয়
 শিকার হয়ে? কেন্দ্রীয় সরকারের এ ব্যাপারে গৃহীতাবাদ
 আছে বা অস্বীকার করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার
 কি এখন বলবেন যে এরা এক সময়ে সীমার ওপারে
 ছিল, হস্তোক্ত এরা বিশেষী? জৈল সিং অথবা আমোলন
 দিয়েছেন যে, এরকম কেন্দ্রীয় সর্বমুখী তারিখ থাকা
 ইচ্ছা-বৃত্তি হুক্ত অসমীয়া ১০ই মার্চ ১৯৭১ লাল।
 তাঁর এই আদায়ের সঙ্গে আমাদের আমোলনকারীরা
 কি এসবত চর্চেন? অথবা-দুটো মনে হয় তা হস্তোক্ত বা
 হস্তোক্ত না। আমোলনকারীদের কথার ও কারণে মিল
 পাওয়া যায় না এবং এতটি সমস্ত বিশেষীর সর্বমুখী চার

দাঁড়াতে পারে। চিন-চায় পুঁজব ধরে আসামের 'সংবাদ-কাণ্ড' বহু ভাষাভাষী হিন্দু সংখ্যালঘুবা কি ভাবে যশে আস্থা ফিরিয়ে আনবে—সেটাই আজ সিংহচেহে বড় চিন্তা কাধন'র কথা। অসমীয়াগণ যে অকথা অভ্যাচার, পুণ্ডাধ, নরহত্যা সূত্রন ও অমানবিক হুল্লু ইত্যাদি পত করেক বছর ধরে এক বাগাড়ে ঐ সব সংখ্যালঘু বহু ভাষাভাষীদের ওপর চালিয়ে এসেছে তাতে তারা আজ আসামে কান্ যান, ইচ্ছা ও কলি বোধগারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিগ্রহ ভোগ করেছে ও 'করছে। কলে তারা আস্থা হারিয়েছে ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সশঙ্কিত হলে পড়েছে প্রকৃতই।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক কাজ হবে এদের মনে সেই হত আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনা পর্বাগ্রে, তারপর অন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা বা উচিত মনে করবেন। বেশ ভাগের পরে বহু পূর্ব-পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী মুসলমান ভাইয়েরা আসামে এসে চাক-আব'র ও বসবাস শুরু করেছে অর্থনৈতিক স্থিতি ভোগের আশায় এবং সাম্প্রতিক চাইবা তাদের ভোটের তালিকা-ভুক্ত করে রাজনীতিতে চেষ্টা করছিল। অবশ্য তা সম্ভব হয়নি এখানে, যদিও আগে আগে তা হয়েছিল। পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী মুসলমানেরাই প্রকৃত বিদেশী বলে গণ্য হবে যদি তারা আসামে স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য তথ্য অসুবেশন করে থাকে। বহু বলে বলে উচ্চৈশ্ব প্রণোদিত গ্রন্থ বহু অসুবেশন অতীতে ঘটেছে এবং এ

ঘট/৮ মুসলমান বিদেশীদের ঘাটা, 'বিন্দু সেদিকে আবেগজনকভাবে নজর নেই কেন? এই আবেগজনের পক্ষেতে কোন বিদেশী গোপন হস্ত নাই তো? মনে হয় তা নাকি খুবই সম্ভব। কারণ হিন্দু বাঙালী দিনেই পর দিন আসামে নিহত হয় কেন? আসাম থেকে সর্বপ্রথমে বিদেশী মুসলিমদের বিতাড়ন অবশ্য প্রয়োজন, তারপর সর্বশ্রেণীর বিদেশীদের বিতাড়ন করা জাতীয় 'বাসে' একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য ভালভাবে কে বিদেশী কে তারতীয় তা সঠিকভাবে ঠাট্টাই করে তবে প্রকৃত বিদেশীদের আশায় থেকে তাড়াতে হবে। কে সেই ছাড়াইয়ের বা বাড়াইয়ের কাজ করবে? কেন্দ্রীয় সরকার ফলেই তবে নিরপেক্ষ ও প্রকৃত বাড়াই হবে; মতের বিশদ বাড়াই বইত করবে না। আশায় থেকে বাঙালী হিন্দু বিতাড়নের যে চকাক সার্থকবোধী ইতিপূর্বে করেছিল তা এখন আর অনেকক্ষেত্রেই প্রকাশ হবে পড়েছে এবং এবং আসল বিদেশীদের আসামে তোরাক করে পুবে মকল বিদেশীদের তাড়বার অপচেষ্টা আজ ধরা পড়ে গেছে। কোন তারতীয় যে হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক আসাম থেকে বিতাড়িত হতে পারে না, তারতীয় সাধারণ মেনুমতা কেন্দ্র বা রাজ্য; কোন সরকারকেই দেয়নি। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকে সাংবিধানের গ্যারান্টি মতাবেক প্রতিটি তারতীয় নাগরিককে আসামে বসবাস, কাম-কাজবার ও চাকুরী করতে দিতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

ব্রিটিশ যুগের জাতীয়তাবাদী

সাংবাদিকরা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

॥ পার্থসারথি সেনগুপ্ত ॥

বঙ্গ মাহুঘের সাধনায় ও ভাগে আমাদের এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। বহু বীর নিঃশেষে প্রাণ বলিদান দিয়ে স্বাধীন হয়েছেন। কত মাহুঘ কারাগারে দুঃসহ জীবন যাপন করেছেন। কত মাহুঘ দেশের মুক্তি সংগ্রামে আত্মত্যাগ বিসর্জন দিয়ে নীরবে দেশের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। ইতিহাসে তাঁরা উপস্থিত। স্বাধীনতার কলভোগ কিন্তু সেই সব ভাগা অনেক মাহুঘের পপলেট জোটে নি। শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মাসিক কিছু আর্থিক সম্মানীর ব্যবস্থা করে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী আর্থিক পুনর্দীক্ষিত হয়েছেন।

এখনে তুলে ধরছি, আর এক শ্রেণীর স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা। এঁরা হলেন ব্রিটিশ আমলে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামী সাংবাদিকবৃন্দ। দীর্ঘদিন সংবাদপত্রে চাকরি করে এই সাংবাদিকদের অনেকেই আজ বয়সের ভারে অবনত, অর্থকষ্টে জর্জরিত। স্বাধীন ভারতে এঁদের প্রতি উপেক্ষা জাতির এক লজ্জা। কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে কর্তব্য হল, এই সব সাংবাদিকদের সম্মানিত করা, এঁদের জন্য উপযুক্ত সম্মানী মজুর করা। এঁরা সারা ভারতে সংখ্যায় আজ আর কত জনই বা হবেন? কেবল প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের জীবিত সাংবাদিকরাই সরকারের কাছ থেকে এই সম্মানী পাবার বোমা বলে বিবেচিত হবেন। কেন্দ্রীয় সরকার যদি অবিলম্বে এই সাংবাদিকদের মাসিক আর্থিকসাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন তাহলে বেশ কিছু দুঃস্থ সাংবাদিক উপকৃত হতে পারেন।

সুদীর্ঘকাল সংবাদপত্রে চাকরি করে অবসর গ্রহণের পর সাংবাদিকদের কতকগুলি বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সমস্যাগুলির গভীরতা ভূত্বভাগী সাংবাদিকরা মর্মে মর্মে অনুভব করে থাকেন। সম্মানী জীবনে আর্থিক অসচ্ছলতার প্রশ্ন যদি বা কারো পক্ষে অবাস্তব, দ্বিতীয় প্রসঙ্গী সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এড্জিও বাবার উপায় নেই।

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকদের সকলেই ত্রুত হিসাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন এবং লেখনীর সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সারিল হয়েছিলেন। তাঁরা আর্থিক লাভ ও পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সব নিঃস্বার্থ সাংবাদিকদের অবদান যথেষ্ট। যে সাংবাদিক তাঁর জীবনের ত্রিশ-চল্লিশ বছর সাংবাদিকতার তথা দেশের সেবা করেছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে দিন রাত্তির সীমারেখা বুছে দিয়ে ও পারিবারিক জীবনকে বিসর্জন দিয়ে সাংবাদিকতার কঠোর ত্রুত পালন করেছেন, সেই সাংবাদিকই যখন অবসর জীবনে অকহলিত হন, অর্থকষ্টে কালান্তিপাত করেন তখন তাঁর চেয়ে দুঃস্থের বিধব আর কি হতে পারে।

চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের নিষ্ক্রিয় করে রেখে দেওয়া সাংবাদিকতার পক্ষেও স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। অবসর গ্রহণ করলেই সাংবাদিকের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা লুপ্ত হবে যাঁর না। অবসর গ্রহণের পরও তাঁর সাংবাদিক সত্তা ও কুশলতা অক্ষুণ্ণ থাকতে (বাকী অংশ ১৪ পাতায়)

সর্বভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান-এর

৬৫-তম স্মারক দিবস উদ্‌যাপন

—মলয় ঘোষ ২১শে ফেব্রুয়ারী '৮০

মহানায়ক রাসবিহারী বসু, পরিকল্পিত সর্বভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান দিবসের ৬৫ তম স্মারক অনুষ্ঠান সম্ভ্রান্তিক বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা উপস্থিতিতে মহাকাতি সননে সুসম্পন্ন হলো। বন্দেমাতরম সংগীতের সঙ্গে শহীদবেশীতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পূর্ণ ও গৃহনির্মাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের দুইটি ধারা—স্বাভাবিক অহিংস আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে বলেন যে বামফ্রন্ট সরকার চিরদিনই এই উভয় ধারাকে স্বীকার করে ও বিশেষতঃ ২য় ধারার বিপ্লবী স্বাভাবিক মূল্যায়নে এই সরকারের ইচ্ছা আন্তরিক। তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ও শোষণ-হীন এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকেও আজকের দিনে প্রচারের সঙ্গে সংযুক্ত করি।

“বিপ্লব মানুষের সৃষ্টি নয়—মানুষ বস্তু হিসাবে বিপ্লবের মাধ্যমে ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ করে। দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমানিক্ষপকারী সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশা ছাড়া আর কেহ নয়”।

—প্রধান অতিথির ভাষণে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পূর্ণচন্দ্রপ্রসাদ মিশ্র মহানায়ক রাসবিহারী বসুর বিভিন্ন রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতীয় বিপ্লববাদ সম্পর্কে মহানায়কের ধারণার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—ভারতের জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক বিপ্লব তুর্কী বিপ্লববাদের পরিণত হয় বৃটিশ রাজশক্তির

বিকক্ষে সংগ্রামে—যার তিনটি ধারা—অহিংস ও সত্যগ্রহ আন্দোলন, দল্লাসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম।

তিনি রাসবিহারী বসুরা ঘটনাবলী জীবনের দ্বৈতাদিক বিপ্লবী কার্যকলাপের উল্লেখ করে তাঁর জীবন ও শেষপ্রমে দেশবাসীর উদ্ভূত হৃদয়ের প্রার্থনা জানান।

অনুষ্ঠানে নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে বিপ্লবী ইতিহাসের রচয়িতা শ্রীকীর্ত্তি কুমার দত্তকে মূল্যবান উপহার দ্বারা সম্মানিত করা হয়। উক্ত সম্মেলনের পক্ষে শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্ত্তিবাসুর অবদানের উল্লেখ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সঠিক ও তথ্যনির্ভর ইতিহাস রচনার জন্য রাজ্যসরকারের উত্তোষে একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব রাখেন—সেই সঙ্গে রাজ্যের সরকারী কাজকর্মে, শিক্ষাদানে ও চিন্তা-ধারার আদানপ্রদানে মাতৃভাষা বাংলার প্রচারের জন্যও আহ্বান জানান। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, শ্রীকীর্ত্তিকুমার দত্ত ‘বিপ্লবী বাংলা’ সাপ্তাহিক পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক।

আর. এস. পি. দলের সাধারণ সম্পাদক মাখন পাল তাঁর আবেগদীপ্ত ভাষণে বর্তমান কাল ও দেশ, এর বহুবিধ সমস্যা, আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পন্থাধীন ও সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী জীবনদর্শন ও আদর্শের স্বাভিচারণার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

সভাপতির ভাষণে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক

ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী অগ্নিদূসেব বিপ্লব সাহিত্যের ব্যাখ্যাহিত্য ও এর লেখকবৃন্দের সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন। তিনি বলেন, “সাহিত্যের মাধ্যমেই বাংলায় প্রথম বিপ্লববাদের প্রকাশ : ১৮২৭ সালে মহাভারতে চাপেকার জাতকবৃত্তের আত্মনিবেদনের মাধ্যমে যথার্থ বিপ্লবের ব্যাখ্যা শুরু এবং বঙ্গ ভঙ্গকে কেন্দ্র করে পরবর্তী বিপ্লবের বিস্তার। বাংলার বিপ্লব প্রেরণা পেয়েছে সেই শ্রীমদ্ভাসবতঙ্গীতা থেকে শুরু করে, মহাভারত, টোডের গ্রন্থ, বামীজী, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রত্নলাল, রমেশচন্দ্র, বংকিমচন্দ্র, সখারাম গণেশ দেউকার, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও আরও অসংখ্য কবি ও সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম থেকে। সেদিনের বিপ্লবীরা যে অর্থ ও অবিভাজ্য বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে উঠে, অর্থনৈতিক সমতার সমাধান ও লোকশিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদকে যথাযথ প্রয়োগ করে সেই স্বপ্ন সফল করতে হবে। “উদ্বৃত্তির ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় বাসোই মানুষের অধিকার তার বেনী আত্মসং করণে সে চোর”—গীতা ও মহাভারতের এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে।” তিনি মূল কলেজের পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃতের বর্ষাবধি মর্যাদাদানের উপরেও জোর দেন যেহেতু “একদিন সর্বভারতীয় একা এসেছিল এই ভাবাই মাধ্যমে। প্রসঙ্গত তিনি কার্মী শ্রমীবাদের সঙ্গে ভারতীয় আত্মবাদের সাদৃশ্যের কথাও উল্লেখ করেন। “তবে সর্বোপরি বামীজী ও বংকিমের আদর্শে মানুষ গড়ে তুলতে হবে কারণ চরিত্রকেই একমাত্র পারে প্রকৃত ক্ষমতা আনতে।”

(১২ পাতার শেষের অংশ)

এই অভিজ্ঞতাকে নির্ধারন না দিয়ে কাজে লাগালে সমাজ উপকৃত হবে। প্রবীণ সাংবাদিকদের মূল্যবান অভিজ্ঞতার অপচয়ও একটা সমস্যা।

অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের বৃত্তিপত সমস্যা বাদ দিলে আর্থিক সমস্যাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বহু অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকের ও তাঁদের পরিবারের অর্থাত্মাবে চিকিৎসা হয় না, ছেলের উপযুক্ত শিক্ষা হয় না, মেয়ের বিয়ে হয় না, এমনকি সংসারও অচল হবে পড়ে। এহেন অবস্থার হুঃস্থ অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের সাহায্যাদানের প্রত্য বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। রাজনৈতিক কর্মী শিল্পী ও সাহিত্যিকরা যদি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও আত্মকৃত্য লাভ করতে পারেন। তবে প্রবীণ সাংবাদিকরাই বা তাঁদের শ্রুদীর্ঘ সমাজ সেবার স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হবেন কেন? আজকের সংবাদপত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সনাক্তর মূলে রয়েছে এই সব প্রবীণ সাংবাদিকদের নিরলস ত্রম ও অকুণ্ঠ ত্যাগ। অবসর গ্রহণের পর সেই সব সাংবাদিকের প্রতি সংবাদপত্র শিল্পেরও কি করণীয় কিছুই নেই?

অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিকদের স্বয়ংক্রিয় পুনর্বিধান, আর্থিক অসচ্ছলতার প্রতিকার অবসর বিনোদন। সাংবাদিকদের মধ্যে পারম্পরিক যোগাযোগ রক্ষা এবং অবসর প্রাপ্ত সাংবাদিকদের একটি জাগরণ আন্দোলনের দ্বারা ক্ষুদ্র প্রবীণ সাংবাদিকরা ভেটোরেন্স আর্গলিট এসোসিয়েশন বা প্রবীণ সাংবাদিক সঙ্ঘ নামে একটি সংস্থা গঠন করেছেন। এটি একটি রেজিস্ট্রীকৃত সমিতি। সমিতির ঠিকানা—১৫৫০ স্ট্রিট, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৭০০০০৬ টেলিফোন : ৫৫-৫২৭৬। সমিতির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও নানা রাজনৈতিক নেতার কাছে স্মারকলিপি দাখিল করা হয়েছে। প্রবীণ সাংবাদিক সঙ্ঘ সব শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রার্থনা করে।

(বাকি অংশ ১২ পাতায়)

রাষ্ট্রগুরু শ্বরেজ্ঞ নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অন্তর্ভুক্ত]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

১৯০৯ সালে আমার বিলেত হ্রদয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বেশ বিভাগ সংশোধন করা হয়। স্বাক্ষরবিধাধিত সন্ত্রাট বিদ্রোহে এই দিন তা ঘোষণা করেন। আমি তার দিন সাতকে আবেশে সংবাদটি শেরেগিরেছিলাম। কিছু জন সাধারণ ও সংবাদ পত্রের মাঝে থেকে বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল। বসন্তঃ স্রবতারী কর্মচারী মহল এক অস্ত্র যে সমস্ত লোক এ ব্যাপারে ছব যেনী আগ্রহী ছিলেন তারা আসল ঘোষণা খাটীটি প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেন নি। কেউ কেউ আবার ঘোষণা খাটী শুনে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার পরলোকগত নবাব সলিমুল্লাহ। এই সলিমুল্লাহই ছিলেন বেশ বিভাগের সমর্থনে এবং পূর্ববঙ্গের মুদলয়ন সম্প্রদায়ের সমর্থন আদ্যে সরকারে দক্ষিণ হস্তবতন, এর প্রতিদান স্বরূপ তিনি পরিতোষ লাভ করলেন জি. সি. আই. ই উপাধি লাভ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্তও তিনি অবুধই থেকে গেলেন এবং এই ঘোষণা খাটীতে স্থানী হতে পারেন নি। উল্লেখ্যক হিসাবে বলা যায়, নবাবের সমর্থক আর কেউ নেই। কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি ছিলেন সক্রিয় বুদ্ধি অধিক যেন চতুর সেই চতুরতার সঙ্গে তার ছিল একটা সাধারণ বিচার বুদ্ধির ভাঙার। তিনি তার সমর্থক এক সরকারের কাছে একটা পত্রের দ্বারা হয়ে থাকিছিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতার এক প্রতাপ্যার ডেউ ব্লেং প্রেরিত লাগল। সরকারই দৃষ্টি দিল্লীর স্বরূপের দিকে নিবদ্ধ। একটা কিছু ঘোষণা খাটী আসবেই বলে সকলে আশাবিভ। রাখা স্তরিতে এসেছেন। রাজা নিব্বই কম্পানমূলক, এবং বাংলার উত্তরনা ও অদ্যোভকে

প্রশংসিত করার পর একটা কিছু করবেন—এই রকম একটা আশাবিভাৎ জেনে উঠলো। কিন্তু তী তিনি ঘোষণা করবেন, সে বিষয়ে বসন্তঃভাবে কিছুই জানা গেলনা। কিন্তু আবার পিরাধিত বিশ্ব উপর খণ্ডে গঠে। সাধারণ হয়ে বেদনালী অক্সিলে তেবল আশাবিভ লোকলের ভিত্তি অমতে থাকে। সবলেই কোঁচুলী করে দিল্লী থেকে কি বরং আসে তা জানতে উৎসুক। ঘনটর পর ঘনটা ধরে সময় অতিবাহিত হতে লাগল, বরং আর আসেনা। উপস্থিত জনসংখ্যার চোখে মুখে বৈরাগ্যের ভাব ফুটে উঠলো। বিবেক প্রায়শেলে পড়েছে, কিন্তু বেশ বিভাগ সম্পর্কে কোন বরংই তো আসছে না। দিনের শেষে দিল্লী থেকে এসেলাগিটে জেনের একটা বরং এল। বিত্ব তটী তারমধ্যে হো বেশ বিভাগ সম্পর্কে কোন বরং নেই। আবার সম্প্রদায়ের ঘরে আবার পালেই কয়েকজন বহু আদ্য ও উৎসাহ নিয়ে বসেছিলেন। খলী থেকে ক্লাং শেষ সংবাদেও মধ্যে সেন্স বিভাগ সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকার ভাবের মধ্যে হতাশার ভাব যেন কয়েই বেড়ে যেতে লাগল। শেষে দিনের পরিকার প্রকাশের পর আমি একটি নিবন্ধের ক্ষত লিপি বলে থাকিলাম। নিবন্ধটিতে বেশ-বিভাগ সংশোধন না হওয়ায় গভীর অদ্যোভ প্রকাশ করে জনগণকে নিরাশ না হয়ে আশ্বাশন চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

নিবন্ধটির প্রতি-লিখন শেষ হয়ে গেলে দেরি পুয়ায় ঘেবে তিক করে নিজে নেচে নেমে গিয়ে অক্সিল থেকে চলে বাওবার উত্তোলন করছি এমন সময় এক টেলিফোন এল। কিরে গিরে টেলিফোন হলোয় এবং কুনলাম যে বেশ বিভাগ সংশোধন হয়েছে। বেদনালী অক্সিলে

সেই সময় লোকের খুব চীড় ছিল। স্মৃতি যথোক্ত নবাব চারিদিকে চড়িয়ে পড়ল। মল্ল রসে লোক 'বেতনী' অকস্মে আসতে লাগল। কলেজ ছোড়ারে এক বিশাল জনতা সমবেত হল। আবার বহুরা এনে আবারে কাপটে বের পাড়ীতে নিয়ে তুলল এবং প্রকৃত অর্থেই জোর করে আমাকে কলেজ ছোড়ারে নিয়ে গেল। সেখানে কেবলমাত্র এক প্রবল উত্তেজনার দৃশ্য। আরবাটার তখন কোন অসদা ছিল না, সম্পূর্ণ অন্ধকার; এমন অন্ধকার যে আমরা এক অন্ধকে দেখতে পর্যন্ত পাইনি। কিন্তু তখনই গেরেছি আনন্দ, উল্লাসের চিৎকার! আমি আঃ যথোক্তা নিকশিত কৌতূহলী প্রহ। সেই ভিড়ের মধ্যে একটি চিৎকার শোনা গেল, 'দিল্লীতে রাজধানী বহিরে নেওয়া সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন?' মল্ল সঙ্গে আমি উত্তর দিলাম, 'এতে আমাদের খুব বেশী কিছু কতি হবে বলে মনে হয় না। পরবর্তী ঘটনাবলীতে এটা দেখা গিয়েছে যে আমি চট করে যে উত্তর দিয়েছিলাম আমলে তা ঠিক কথাই বলেছিলাম।

চুই দিবে সভাবল কেউ বাড়ী করে এলাম। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে আমি মিছে এবং আমার বহুরা যিলে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি তা যে নিকশিত রহনি এবং বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণকে আবার যে তাদের পুরাতন বিদ্যন পুত্র ও ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়াস সাফল্য অর্জন করল, এই চিন্তা মনে খুব খুলী করে তুলল। এই সাক্ষ্যের মূল সংস্কৃতি বলতে চুই কথাও বরচ করতে হয় না। আমরা একতরফে নীরোক্ত করে দেপেছিলাম; সাক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল; আমরা ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে অতীব পরা এড়িয়ে চলছি, আর এড়িয়ে চলছি উন্নত তাবাকসের মুসলী যোগকে বা অতীব পরায় পটী করে ও তাবক শক্তিশালী করে। পুলিশ আমাদের আক্রমণ করলেও আমরা কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি। পুলিশের প্রতিটি লাঠির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'কমলাতর' আমি কুসেছি এবং তারপরে আশাপত্তে মাথলা উঠলে আইনের সাহায্যে প্রতিবিধান চেয়েছি। আমরা পশ্চাদ্ধ এতিয়াম নীতিই অহুসরণ করেছি।

(১৭ পাতার পর)

আধীনতা সংগ্রামী ব্রহ্মশ্রুত দাস ও পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁদের সন্ধিগু বক্তব্য রাখেন। অম্মলীন সমিতির পক্ষে দীনেশচন্দ্র ঘটক সমগ্র অম্মলীনট সুপরিচালনা করেন; তিনি জানান পূর্তমন্ত্রী বতীনবাবুর উজ্জাগে কলিকাতা ব্যাবোর্ধ রেডে মহারাজ হৈলোতা চক্রবর্তীর একটি আবক ব্রোজমুতি শ্রীই স্থাপন করা হবে।

সারাগিনের এই অম্মলীনে সকালে কুদবাটে অম্মলীন ভবনের একবিশতিভম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। মহাজাতি সগনের অম্মলীনে সংগীত পরিবেশন করেন সভ্যবর মুখোপাধ্যায়।

—

আশ্বপতিতে আমাদের বিশাল ছিল। কিন্তু এ বকম কোম লাগি আমাদের ছিল না যে অন-সেবার ক্ষেত্রে আশ্ব-নবের ও মৃদলাপূর্ণ জীবন-বাগনে অত্যন্ত ব্যক্তিগত ছাড়া অন্যর কারও ব্যাধা কোন প্রচেষ্টা নীর অথবা জাতীয় উন্নয়ন সাধনে এই আশ্বিক শক্তি প্রয়োগ করা যায়। কোন অবস্থায় কোন নীতির প্রয়োগ দৃষ্ট তা বিবেচনা না করে কোন নীতিকে একেবারে মরচাবে গ্রহণ করার কলেই এমন অনেক শোচনীয় ঘটনা ঘটে গিয়েছে যা সাম্প্রতিক কালের ভারত ইতিহাসকে মনোনিপুণ করেছে।

এটা একটা পরিচায়কের বিষয় যে ১৯০৬ সালে কি: জন বলে বহন পালিচায়েটের হাউস অব কমন্সে বহু-তমকে লিখা করে বলেছিলেন যে 'এ বাৎসরী সম্পূর্ণ এবং বিশ্ব নিশ্চিতভাবে লংগিট জনগণের অধিকাংশেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে' রেওরা হয়েছি আবার সঙ্গে সঙ্গেই একথাও বলেছেন যে এটা একটা 'বিশ্ব নিশ্চিত বাৎসরীয় ঘটনা' শুধুমাত্রই কোন এর সাপোদন করা হল না। এই বকম একটি ঘোষণা বাহ সিদ্ধান্তের সঙ্গে হুঁকার-মুচক পুত্রেরই কোন মিল নেই তা মতাবতঃই তিক্ততা বাড়িয়ে তোলে এবং অস্বাভাবিকতাকে আরও ছোড়াল করে তোলে।

(চলবে)

বিপ্লবী পুস্তকশালা

অগ্রদূত স্মৃতির বিদ্যুৎ প্রকাশ—প্রবন্ধচিত্র বাসেব—০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—প্রবোধ মজুমদার—০.০০

কীর্ত্তোর জুয়ার সত্তের—

- | | |
|--|--|
| ১। বাংলার অক্ষিপদ—১.৫০ | ২। স্বাধীনতাতে ভারতীয় বিদ্যুৎ প্রকাশ—৮.০০ |
| ৩। অগ্রদূত স্মৃতির পি. বিবির—২.০০ | ৪। পৌরসী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০ |
| ৫। কাকোরা পরিকল্পনা—১.২৫ | ৬। কলকাতা আত্মর সংগ্রাম কাহিনী—৪.০০ |
| ৭। রাসবিহারী ও অগ্রদূত স্মৃতি—১.০০ | ৮। স্বাধীনতার পরবর্তী যাত্রা ও যাত্রা—৫.০০ |
| ৯। বিপ্লববাদ ও সমাজবাদ—১.০০ | ১০। বিপ্লবী বিপ্লববাদ—৪.০০ |
| ১১। মহাত্মা ও ভারতবর্ষ—২.০০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও চিন্তা নিবেদিতা—১.৫০ |
| ১৩। দেশ বাসের ভোগেনি (১)—১.০০ | ১৪। দেশ বাসের ভোগেনি (২)—২.০০ |
| ১৫। শত্রুর চক্রান্তের আকার—৪.০০ | ১৬। ১৯৪৭ এপ্রিল ভারতীয় শত্রুর দ্বন্দ্ব—১.০০ |
| ১৭। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম—১.৫০ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অগ্রদূত স্মৃতি—৪.০০ |
| ১৯। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—৪.০০ | ২০। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম—১.৫০ |

প্রকাশিত :—৪৯ বঙ্গবাস ট্রাষ্ট কলিকাতা-১০০০০৭

চেষ্টা—১/১/১/A স্বাধীনতা ট্রাষ্ট কলিকাতা-১০



— সম্পাদক বঙ্গবাসী —

বিপ্লবী পুস্তকশালা (স্বাধীনতা) প্রবন্ধচিত্র বঙ্গবাসী, বিপ্লবী চ্যাটার্জী

সম্পাদক—প্রকাশিত পরে প্রবন্ধচিত্র

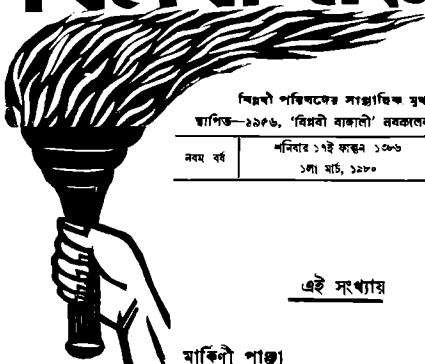
প্রকাশিত প্রতিদিন—প্রকাশিত যোগ। বঙ্গবাসী—প্রবন্ধচিত্র বাসেব।

প্রকাশক ও প্রকাশক :—প্রকাশিত সেনাধ্যক্ষ। প্রকাশিত প্রতিদিন—প্রবন্ধচিত্র বাসেব।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪৯ বঙ্গবাস ট্রাষ্ট, কলিকাতা-১০০০০৭

বঙ্গবাস :—প্রকাশিত পাবনা নিউজ, ১১৭ নং কেশব সেন ট্রাষ্ট, কলিকাতা-১০০০০৭

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পন্থিকদের সংগঠিতিক সংবাদ
ছাপিত—১৯৭৬, 'বিপ্লবী বাংলা' নবমসংখ্যায়—১৯৭৬

নবম বর্ষ	শনিবার ১৭ই ফাল্গুন ১৩০৬ ১লা মার্চ, ১৯৮০	২৩ সংখ্যা
----------	--	-----------

এই সংখ্যায়

মার্কিনী পাঞ্জা

॥ জীসতী ভূষণ সেন ॥

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ স্বীকৃত বস ॥

রাষ্ট্রগুরু নুরুল্লাহের স্মৃতি কথা

॥ অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত ॥

‘মিছা মণি মুক্তা হেম

বদেখের প্রিয় প্রেম

‘তার চেয়ে বড় নাই আর।’

—বিশ্বাসপার

মার্কিনী পাঞ্জা

॥ ঐসতীকৃত্য সেন ॥

প্রথমে নম্বরে পড়ল আমেরিকার।

‘ও কি হচ্ছে দাখা? হাত সরাও বলাহি।

এতো ছাত্রজন পরামর্শদাতা নয়, এবে দেবছি লাখ লাখ সৈন্য! দুরিয়ে নেও গুপের, নইলে ‘এটমিক ওয়ার’ বেধে যাবে। সাবধান!

ছানিয়া শুদ্ধ ভরে কেঁপে উঠল। লাগল বুঝি এতদিন পরে এবার সত্যি, বাবে আর মোবে।

সোনা রূপোর নাম লাকিয়ে লাকিয়ে চড়তে লাগল লগন আর জুরিয়ে। সাজ সাজ পড়ে গেল আমেরিকায়। সোভিয়েটকে একঘরে করল আমেরিকা। অলিম্পিক এর নেমস্তম্ভ ফেরত মিল। ‘লোকান বন্ধ’ করে দিল, গম এক ছটাকও বেচবে না। আর সেই সঙ্গে আকগানিস্থানের বয়রাতি সাহায্য মিল বন্ধ করে।

এই যে আজকের চমক লাগানো কাহিনী, যা দেখতে দেখতে কালবৈশাখীর মত ছেয়ে ফেলল আকাশ, এর মূচনা ঠিক পাঁচ বছর আগে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, ভিয়েত নামে। — সাবগনের পত্তন হল। যুদ্ধের কঁটা কোন রকমে গলা থেকে নামিয়ে, বাড়ী যাওয়ার সুখে, আমেরিকার সেক্রেটারী অব স্টেটস কিসিংগার, চীনের নতুন বন্ধুকে বললেন, ‘ভাই আমরা তো হেরেই গেলাম, এর ফল দুখবে তোমরা।’ সেই যে পাকিস্থানের দিকে হেলতে হেলতে (টিলট) একেবারে ঢলে পড়েছিল চীনের কোলে, সেই থেকে আমেরিকা ও চীন দুটি দেশের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। যদিও

একজন সোঁড়া ধনতান্ত্রিক, অপরজন কট্টর সাম্যবাদী। ভিয়েতনামে পরাজয়ের পরে সেই ভাব আরও গাঢ় হয়েছিল।

যদিও গলায় গলায় ভাব থাকার কথা চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যেই। শোড়ার দিকে ছিলও তাই। প্রতিবেশী দেশ, উভয়েই কমিউনিষ্ট। বন্ধুত্বও আজকের নয়। ১৯৪২ সনে হো-চি-মিন প্রতিষ্ঠিত করেন ইন্ডোচীন কমিউনিষ্ট পার্টি। আর ঐ সময়েই সীমান্তের উত্তরে চীনদেশে মাও-সে-তুং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিতে সংগঠিত করতে আরম্ভ করেন। পালাপালি দুটি বন্ধু দেশ, একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রূপায়িত করেছেন। চীন ভিয়েতনামকে সাহায্য করেছে, খাদ্য দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে, প্রচুর রনসস্তার পাঠিয়ে। সীমান্তে একটা রেল লাইন বসিয়েছিল চীন, বন্ধ রাষ্ট্রে সরবরাহ পৌছে দেবার সুবিধার জন্য। এরপর আমেরিকা এসে ভিয়েতনামের যুদ্ধে যোগ দিল, সাবগনের জনারেনদের পেছনে দাঁড়াল; সোভিয়েত দাঁড়াল হানঘ সরকারের পেছনে। সোভিয়েতের সাহায্য বাড়তে লাগল। শেষটার চীন হাত গুটিয়ে নিল। আমেরিকা ছায়ায় ১৯৭৫ সালে।

সেই বছর জুলাই মাসে থাইল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী কুকৃত প্রমোজ গেলেন পিকিং। ষাট প্রধান মন্ত্রী নয়চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিশেষতঃ যখন আমেরিকার পরাজয়ের ফলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়

ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এতদিন সরকারি ইয়ন, আমেরিকার বিমানঘাটি ছিল খোদ ব্যাক্তকে। এখন জে যে কোন দিন হ্যানস তাঁকে টুপ করে গিলে ফেলতে পারে। তাই সীমান্তের উত্তরের বড়লাদা চীনের আশ্রয় শিক্ষা করতেই কুকুতের পিকিং যাওয়া।

মাও-সে-তুং এর বরস হয়েছে। স্বাস্থ্যও আর তেমন নেই। গত এক বছর বিদেশী অতিথি কারো সঙ্গেই দেখা করেন নি। তাই কুকুত যখন শুনলেন যে মাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হয়েছেন, তখন তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। —মাহেন্দ্ররূপ উপস্থিত হল। মাও কোন রকমে ইঞ্জিনচার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। চুঃখ করে বললেন, 'পা দুটোতে আজকাল জোর পাই না একেবারে!' নাটক করতে কুকুতও কম যান না, তিনি হাঁটি পেড়ে বসে পড়লেন আর চেয়ারম্যানের, শোথগ্রন্থ ফীত চরণ ফুলে হাত বুলাতে লাগলেন। —হাক্কার বছর আগে, চীন সত্ত্বাটের ড্রাগন সিংহাসনের সামনে এমনি করেই প্রণিপাত করতে হত করদ মিত্র রাজাদের।

এতদিন পর্যন্ত চীন পুত্ভার সঙ্গে বলেছে, চীনও ভিয়েতনাম তাই ভাই, ঠোট ও ধাঁতের মতই বনিষ্ট। এখন কিন্তু কুকুতের সঙ্গে অস্ত্র ভাষার কথা বললেন, মাও তাকে সাবধান করে দিলেন। বললেন 'ছবের আনন্দে এখন 'হানস' এর ক্রিষে বেড়ে গেছে। সামনে যা দেখে তাই গিলতে চায়। আসলে ক্রিষেটা ওর নিজের নয়। পেছনে একটা ভারি তরুণ্ডাল আছে জে (অর্থাৎ সোভিয়েট) তারই সুখের ধার হল 'হানস'। এ ভুরোমানিটার ক্রিষেই হল সাংঘাতিক। কিছুতেই আর মেটে না।'

অনেক আলোচনা হল দুজনে। মাও বললেন, 'পর্যাক্ত সাত্ত্বাক্ষাবাদীদের (অর্থাৎ আমেরিকা)

তোমার দেশ থেকে বিভাভিত্ত করবার এখনই কোন ভাড়া নেই। ওরা চলে গেলে তো ব্যাক্তা পরিহার হবে অস্ত্র সত্ত্বাক্ষাবাদীদের (অর্থাৎ সোভিয়েট)। কুকুত মনে মনে নিজের কপাল চাপড়াতে লাগলেন। হায় হায় কি ভুলই তিনি করেছেন। ভয় পেয়ে গিয়ে, শেষের বামপন্থীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছেন, যে অবিলম্বে আমেরিকান গাঁটিগুলো দেশ থেকে নির্মূল করবেন। হাই হোক, তিনি যতটা চেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক, বেশী ল.ভ করলেন পিকিং এসে। চীন প্রতিশ্রুতি মিল, ভিয়েতনামের হাত থেকে ঝাইল্যাওকে রক্ষা করবে। মাও প্রকাতান্তরে ব্রুিয়ে দিলেন কুকুতকে, যে 'হানস' আজকাল আর চীন ও সোভিয়েটের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে না। গোপন চুক্তি করে বসেছে সোভিয়েটের সঙ্গে। সোভিয়েট, লড়াইয়ের হাতিয়ার পৌছে দেবে, আর জয় করে, চলেবে পাশের রাজ্যগুলি। চীন যদি রুই হয়, হোকগে, তখন রক্ষা করবে সোভিয়েট। তাই চীন স্থির করেছে 'হানস'কে একটা শিক্ষা দিয়ে দেবে। দেখি কে তাকে রক্ষা করতে আসে।

বর্তমান ভিয়েতনামে বৃদ্ধ চলছিল, ঝাইল্যাওর ছিল সমৃদ্ধির দশা। কমিউনিষ্ট প্রচারজন ছিল, তারা ছিল ঈশ্বরপূর্ব সীমান্তের কাছে। তেমন কোন উপদ্রব করত না। যদিও সরকারী প্রচারপত্র পড়লে মনে হত, ওরা ব্রুি রাষ্ট্রকর্মতাই অধিকার করে বসবে, এমনি ভয়কর। তবে কিনা ওরা ভিয়েতক কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা সেটাই ছিল ভয়ের। কোন সময় হঠাৎ সবক সত্ত্বত আসবে, আর সীমান্ত পেরিয়ে পিল পিল করে ঢুকে পড়বে ভিয়েতনামী লাল পল্টন। দুটি দেশের মধ্যে মাত্র সত্ত্ব এক ফালী লাগুস। তাও আবার ভিয়েতক এর শাখা 'পাংটেলাও' এর অধিকারে।

কায়েডিয়ার কমিউনিষ্টরা ভিয়েতকং এর শাখা নয়। তাদের নাম 'থেমার রুদ্ধ' বা লাল কায়েডিয়া। ওদের সম্পর্ক লাল চীনের সঙ্গে। তবুও 'থেমার রুদ্ধ' ও 'ভিয়েতকং' ভাট ভাইয়ের মত মিলে মিশেই 'নম পেন' ও 'সাইগল' উদ্ধারের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। ভিয়েতনামী সৈনিক আশ্রয় পেতো কায়েডিয়ায়। সংগ্রহ করত রসদ, ভাড়া করত কুলি। তারপর ওদিকে সাধারণের পতন হল, অল্প পরেই এদিকে উদ্ধার হল 'নম পেন'। ভিয়েতনামী সৈন্যরা কিন্তু কায়েডিয়া ছেড়ে ভিয়েতনামে ফিরে গেল না। বরং বাড়িয়ে বেতে লাগল তাদের অধিকার। প্রথমে মনে হয়েছিল এটা সীমান্ত সংঘর্ষে অজ্ঞতা, শেষে আর সন্দেহ রইল না, ওরা ইন্ডোচীনের ফরাসী সাম্রাজ্যের সবটুকু অধিকার না করে রাখবে না।

চীনের অতীত ইতিহাস বরাবরই কটক। শত্ৰু। মধ্য এশিয়ার বড় বারবার ওদের দেশ পয়াদস্ত করেছে। হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ দুর্গের বেয়ালে গেরিলা সীমান্ত রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সীমান্তের ওপারে কোন শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, দেখলেই ওরা সন্ধিহান হয়। তার পেছনে যদি সোভিয়েট থাকে তবে তো মহা আতঙ্কের কথা। যেন একটা লোহার বাঁধনে পিবে ফেসবে চীনকে।

কাম্বোডিয়ায় (নতুন নাম কামপুচিয়া) পল পট সরকার চীনের আশ্রিত। ১৯৭৬ সালেই তার সঙ্গে হানই সরকারের সীমান্ত সংঘর্ষ আরম্ভ হল। থেমার রুদ্ধদের পাশে হ্যাঁড়াল লাওদের 'মেও' উপজাতীয় যোদ্ধা। তারা C. I. A. র হাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, এখানে ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধ আমেরিকার ডান হাত। এখন চীনের জাড়াটে। চীন থেকে এল কুটনীতিবিদ ও সমর বিজ্ঞানী দল। এসে

জেনারেল। জাহাজ বোঝাই হয়ে আসতে লাগল আহত। ও সময় সম্ভার। আলানী এবং আরো কত শত বস্তুর দরকার এ যুগের লড়াইয়ে; তার কি কোন হিসেব আছে? আগ বাড়িয়ে ধীকৃতি দিল নতুন 'পলপট' সরকারকে। যেন বলে দিল হুনিয়ার সবাইকে, 'আজ থেকে কামপুচিয়া আমার বন্ধু, সেই কথাটি যেন তুলো না।'

এদিকে তোপের মুখে পড়ে গেল ভিয়েত নামী চীনরা। তারা মধ্যবিত্ত, রাজনীতির দার ধারেনা; কমিউনিষ্টতো নয়ই। জ্ঞাত ব্যবসায়ী, পরিশ্রমী। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য তাদের হাতে। সাধারণের পতনের পরে, একটি দ্রুতি করে সরে পড়ছিল সিঙ্গাপুর আর মালয়েসিয়ায়, ব্যাঙ্কে কিনা অল্প কোথাও। এখন চীনের সঙ্গে ভিয়েতনামের বেধে বাণিজ্য, দলে দলে দেশত্যাগ করে পালাতে লাগল। চীন বলল, ওদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। ভিয়েতনাম বলল, প্রেম বাজে।—সীমান্ত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ল কামপুচিয়ার ভেতরে ভিয়েতনামীরা 'নমপেন' অধিকার করল ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে। পলপট সরকার বনে গিয়ে ঝাইল্যাওর সীমান্তে বাঁটি করল।

মাস দুই কাল বাকুদেহের পরে চীন আক্রমণ করল ভিয়েতনাম। তখন মাও দেহরক্ষা করেছেন। চীন আক্রমণ করল সীমান্ত অতিক্রম করে, প্রায় হাজার মাইল দ্রুত ভেঙে, ছয়লক্ষ সৈন্য এবং হাজার খানেক ট্যাঙ্ক নিয়ে। প্রচার করল, যে তার উদ্দেশ্য বেশ জ্বর করা নয়, ভিয়েতনামকে সহবৎ শিক্ষা দেওয়া কামপুচিয়া থেকে ভিয়েতনামী সৈন্য সরিয়ে আনলেই, চীনা সৈন্য দেশে ফিরে আসবে (৬২ সালে নেতং অধিকারের সময়ও এই বকম বিবৃতি দিয়েছিল, পরে ফিরে যেতেও ক্ষমতা করে নি) কিন্তু জেদি

হেঁড়ে সরে এল না। হুনিয়ার কেউ তার সরকারকে স্বীকৃতি দিল না (এক সোভিয়েট সরকার হুচার জন ছাড়া), ভবুও নয়। ভিয়েতনামের সীমান্ত বন্ধী বাহিনীই কবে কেলন, প্রকল প্রতাপ লাল চীনকে।

পরের চাল দেবার কথা 'হানই' এর। চাল দিয়ে বসল মস্কো। থাইল্যান্ডে নয় আফগানিস্তানে, কারণ আফগানিস্তানে আমেরিকার পায়ের ছাপ Pug Mark ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছিল। ইতিপূর্বে এই বাকার রাজ্যটিতে আমেরিকার স্বার্থ বন্ধী করতেন ইরানের সাহ, তার নিজস্ব C.I.A বা Savak-এর মাধ্যমে। সাহ বিবাসী হয়ে দেশ ছেড়ে যাওয়ার পরে আফগান গুপ্তচরদের পরিচালনা করা হচ্ছিল পাকিস্তান থেকে। ওই ভিয়েতনামের বৃদ্ধ এসারিত হল পশ্চিম দিকে। গড়ে উঠল মার্কিন চীন-পাক Axis.

হো-চি-মিন বখন ইন্দোচীন কমিউনিষ্ট পার্টি স্থাপিত করেন তার প্রায় চল্লিশ বছর পরে স্থাপিত হয় আফগান কমিউনিষ্ট পার্টি। নাম দেওয়া হয় পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি বা P. D. P. I. পার্টির নেতা ছিলেন তারাকি, আমিল ও সারমাল ছিলেন তার ডান হাত বা হাত। দু'বছরের মধ্যেই দ্ব্যস্ত হল, এক ভাগের নাম খলকী (জনতা) অপর ভাগের নাম পারচামী (পভাক)। তারাকি ও আমিন হয়ে গেলেন খলকী দলে, কবরমাল অপর দল গড়লেন পারচামী। ফেনাকেল লাউন তখন প্রধানমন্ত্রী, এবং কমিউনিস্টদের সংকে খুইই সন্ধান ছিল সোভিয়েটের সঙ্গে আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয় তারই প্রধান মন্ত্রীর সমর্থন।

এর পরে রাজ্যকে হটিয়ে লাউন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং নিজে হন প্রথম প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে ইরানের সাহের সঙ্গে প্রথম

ঘনিষ্ঠ হয় এবং কমিউনিস্টদের উপরে তিনি বিরূপ হয়ে ওঠেন। Savak-এর চরম প্রকাশ্য রাজত্বকে একজন কমিউনিষ্ট নেতাকে হত্যা করে। তখন খলকি ও পারচাস দুই গোষ্ঠী আবার এক হয়ে যায় এবং সৈন্যদলের বামপন্থী গোষ্ঠির সাহায্যে লাউনকে ক্ষমতাচ্যুত করে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তারাকি।

এর পরই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, আন্তর্জাতিক বিবাদ, কথতা নিয়ে কাড়াকাড়ি। খলকী ও পারচামীদের মধ্যে শুরু হল Civil War। কমিউনিষ্ট লড়াই সে বড় সাংঘাতিক। তার কিছু পরিচয় আমরা এখানেও দেখছি। দেখতে দেখতে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে আনলেন পরস্পরকে। ক্যান্ডার বলতে বড় কেউ অবশিষ্ট হইল না। দীক্ষা শুরু তারাকিকে হত্যা করে আমিন প্রেসিডেন্টের আসন অধিকার করলেন এবং নির্মম হাতে বিরাটদের দমন করতে লাগলেন।

আমিন নিষ্ঠুর ছিলেন, তাই বলে মনে করবেন না তারাকিও কিছু কম নিষ্ঠুর ছিলেন। আমিনের কুল বয়েছিল তিনি তার নিষ্ঠুরতাকে সামলিয়ে রাখতে পারেন নি। ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সারা দেশে। অন্ততঃ আফগানিস্তানের ছোট বড় মাঝারি প্রতিটি অংকে। শোনা যায় হাজার পকাশনেক আফগান তাঁর কয়েকমাসের রাজত্বকালে নিৰ্ধোঁষ হয়েছেন। সবাই যে নিহত হয়েছেন তা নয়, অনেকেই বেশ ভাঙ্গ করে পাকিস্তানে গিয়ে Savak-এর ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন। সেবিলায় ট্রেনিং নিয়ে কিংবে আসবার আশায়। সাম্যবাদ বখন বেশ থেকে প্রায় নির্মূল হয়ে এসেছে, তখন আর সোভিয়েত হস্তক্ষেপ না করে পারল না। আমিন কোতল হলেন, পরীক্ষিত বসলেন কারমাল। —এই সময়টার আবার এসে পড়ল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

(বাকী অংশ ৬-এর পাতায়)

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ কীর্ত্তি কবী ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত একটানা বাগো বহুর ধৰে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিপ্লবী ভারতের এক সংগ্রাম চলছিল। বিশেষ করে আন্দোলন সমিতিই ছিল এই সংগ্রামের প্রধান উদ্ভোক্তা। ঢাকার কলতা স্বাক্ষর সংগ্রামই এই পর্বের শেষ অধ্যায়। ১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গের লাট ব্যামকিন্ড স্কলার এবং পশ্চিমবঙ্গের লাট এণ্ড্রু ফ্রেন্সারকে হত্যার প্রচেষ্টায় এ অধ্যায়ের আরম্ভ এবং ১৯১৮ সালের ১৬ই জুন কলতাস্বাক্ষর সংগ্রামে এ অধ্যায় শেষ, বিপ্লবী সংগ্রামের এ পর্ব প্রকৃত চক্রবর্তী, প্রকৃত চাকী, সুদিবাম, সন্তোম বহু, কানাই লাল দত্ত, বতীন মুখার্জী চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন, তারিণী মজুমদার এবং নলিনী বাগচী প্রভৃতির আত্মদানে সমুদ্রল। 'বিপ্লবী সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয় ১৯২৩ সালে।

১৯১৭ সালেই বোকা গেল বিপ্লব যুগ শেষ হতে চলেছে, ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বিপ্লব ভারতবাসী অর্থ এবং সৈন্তগণ দ্বারা ক্রিষ্টিকে যে সাহায্য করেছিল তার বিনিময়ে ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে স্বাধীনতালাভে সাহায্য করবে। রূপ আশাস দিয়েছিল। ১৯১৭ প্রিষ্টলের ১০ই নভেম্বর ভারত সচিব মি: মন্টেগু সদলবলে ভারতে পদার্পণ করেন। ভারতবাসীকে কঠোর ক্ষমতা হস্তান্তর করা বাব সেই সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভই তাঁর ভারত আসনের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯১৮ সালের

২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত তিনি ভারতে ছিলেন, ভারতের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেশের শাসন ব্যবস্থার কঠোর পরিবর্তন সাধন করা বাব সে সম্পর্কে তিনি এক রিপোর্ট দাখিল করেন। নতুন রিপোর্ট ১৯১৯ সালের ৮ই জুলাই ভারতে এবং ইংল্যান্ডে একই সময়ে প্রচারিত হয়। ভারত সচিব মি: মন্টেগু এবং ভারতের বাল্মাট লর্ড চেম্‌স ফোর্ডের নামানুসারে এই রিপোর্ট মন্টেগু চেম্‌স ফোর্ড শাসন সংস্থার নামে পরিচিত। এই রিপোর্টকে ভিত্তি করেই ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের জন্য এক নতুন শাসন সংস্থার আইন প্রবর্তিত হল। নতুন আইন বিধিবদ্ধ হল বটে কিন্তু এর দ্বারা ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা লতাংশের একাংশও পূর্ণ হল না, ওর আগেই ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে বিপ্লব শেষ হয়েছিল। নতুন শাসন সংস্থার আইন ভারতবাসীর ক্ষুভাকেই বাড়িয়ে তুলল।

১৯০৬ সাল থেকে সমগ্র ভারতে, বিশেষ ভাবে পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশে যে বিপ্লব আন্দোলন চলছিল তাতে ইংরেজ সরকার বিশেষ বিরত বোধ করেন। কলে যুদ্ধের সময় দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য তারা ভারত বন্ধ আইন বিধিবদ্ধ করেন। ভারতবাসীর বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধের প্রকটী অবস্থা হিসাবেই এই আইন রচিত হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে এবার দেখা গেল আইনের কঠোরতা আরও অনেক খানি বাড়িয়ে নতুন একটি আইন রচনা

করবার চেষ্টা চলছে। বিদ্রোহ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিরূপণ করে স্থায়ী ভাবে এই আন্দোলনকে দমন করবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ শেখ হবার আগেই ১৯১৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর একটি নতুন কমিটি গঠন করা হল। কমিটির সভাপতি হলেন লণ্ডন কিংস্‌ ট্রাঙ্ক ডিভিশন-এর জজ মি: রাউলট, কমিটির অজ্ঞাত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি বেন্‌লি স্ট. গ্রাভাজ হাইকোর্টের বিচারপতি লাক্সী, উত্তর প্রদেশের বিচারপতি স্যার ভার্ণি লোভেট এবং কলকাতার ছিপ্রভাস চন্দ্র মিত্র, ১৯১৮ সালের ১৫ই এপ্রিল কমিটি যখন রিপোর্ট পেশ করল তখনও বিশ্ববৃহৎ শেখ হবার। এই রিপোর্টই সিভিলন কমিটি রিপোর্ট বা রাউলট কমিটি রিপোর্ট নামে খ্যাত। কমিটির রিপোর্ট বিদ্রোহ আন্দোলন দমন করবার ক্ষমতা এক আইনের বসড়া মাত্র। এর ফলেই বোকা গেল ভারত শাসন সংস্থার পরিবর্তনের ক্ষমতা মি: স্টেণ্ডার্ড প্রচেষ্টায় কোনরূপ আন্তরিকতা নাই। ১৯১৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় আইন সভায় বড়লাট লর্ড চেমস্‌ ফোর্ড' নিজেকে ঘোষণা করলেন যে বিদ্রোহ আন্দোলনকারীদের দমন করবার উদ্দেশ্যেই কঠোর আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। ১৯১৮ সালের ১৫ই এপ্রিল রাউলট কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করলেন, এই রিপোর্টে ভারত বৃদ্ধ আইনের বহু ধারা স্থায়ী করে একটি নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা হল। আইনের কঠোরতা দেখে সমগ্র দেশে এর বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হল।

সরকার দেশব্যাপী এই আন্দোলনে কর্তৃপাত করলেন না। নতুন সরকার যে কোন ব্যক্তিকে সম্মেলনকালে প্রেরণ করতে এবং প্রেরণের পরে তাকে নির্বাসিত করতে পারতেন। এই আইনের দ্বারা জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং রাজ-

নৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে দমন করা হল। এই আইনের বলে সরকার ইচ্ছামত যে কোন অঞ্চলকে আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারী বলে ঘোষণা করবার অধিকার পেল। এই বে-আইনী আইন পাশ হবার প্রতিক্রিয়ায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহেশ্বর আলী মিত্র প্রকৃতি নেতৃস্থানীয় ভারতীয়গণ ব্যবস্থা পরিবর্তনের মনস্তপ্ত ভাগ্য করলেন, আইনের কঠোরতা মহাত্মা গান্ধীকে পর্যন্ত বিচলিত করেছিল। তিনি বড়লাটের নিকট আবেদন করলেন যে এ আইন যেন কোন রূপে কার্যে পরিণত না হয়। তিনি ঘোষণা করলেন যে এ আইন বিধান সভায় গৃহীত হলে তিনি সভ্যগ্রহে আরম্ভ করবেন। তখনকারী ৩০শে মার্চ ভারতের সর্বত্র সভ্যগ্রহে পালিত হবে বলে তিনি ঘোষণা করলেন।

(চলবে)

(৪-এর পাতার পূর্বের অংশ)

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, যখনই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কর্তৃত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং দুনিয়ার কোথাও না কোথাও একটা গুরুতর হান্সামা বাধা বাধা হয়ে ওঠে। দেশ বিদেশের রিপোর্টাররা উদ্ভ্রাণে ছুটোছুটি করতে থাকেন, আকাশ বাতাস গরম হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র দত্তরা Portfolio ব্যাগ মাত্র সঞ্চালন করে বেরিয়ে পড়লেন, বিদেশ মন্ত্রীরা উড়ে বান বিদেশে। সপ্তম নোবহর ঘাটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, সোভিয়েত নোবহর পিছু নেয়। অকুস্থলে ছোট-খাট দেশরা চেলা-চিলি আরম্ভ করে: আগুনের খেলায় পুড়ে মরবার ভয়ে নয়। ছোটো পরমা কমিয়ে নেবার আশায়। তারা জানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে গেলেই মওকাও কুন্ডিরে বাবে।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি

অর্ধশতাব্দী কাল পূর্বে বাংলা মায়ের একমূল সামাল ছেলে মেয়েরা তদানীন্তন ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সর্বস্বপণ করে দেশ জননীৰ মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিবেদন করেছিল, একটি শুভ তেসরা ফেব্রুয়ারী তারিখে। তাই এই পবিত্র দিনটি শুধু নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের নিকটেই নয়, বাংলা, শুধা সারা ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ অরবীর দিন। এরাই ছিলেন গোটা ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলনের জনক। এই ছাত্র সমিতির হাজার হাজার সভ্যরা দেশের সহিংস ও অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা ও শক্তি যুগিবেছিলেন এবং রক্ত দিয়ে, শ্রম দিয়ে, অর্থ দিয়ে, তখনকার ইংরেজ শাসনের ভিত্তিকে অপ্রতিরোধ গতিতে ভেঙ্গে চুরমাচ করে দেবার দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হয়েছিল। কত ‘দুর্গম গিরি, কান্তার মরু ও দুহর পায়ালার’ এরা লজ্জান করেছিল, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যে আদর্শ নিষ্ঠা, যে অসাধারণ চরিত্র বল, যে দুর্জয় সত্ম নিয়ে এরা যুগবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই তিরিশের দশকে যে অসাধা-সাধন কর্তব্য কর্মে এরা ত্রুতী হয়েছিলেন, জনসেবার মূলধন নিয়ে সেই পথ পরিক্রমা করেছেন দেশের স্বাধীনতা লাভ করা পর্যন্ত। নেতাজীর কথার আসা যায়, এইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সেই শ্রেণীর মানুষ “যারা নতুন ভারত সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেদের বলিয়ে কাদাল হয়ে যেতে হবে—প্রতিদামে কিছু না চেয়ে।” প্রকৃতির নিয়মামুসারে শারীরিক দিক দিয়ে কিছুটা অপরূপ হয়ে পড়লেও, মনটা এদের এখনও সজীব এবং তাজা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে, গঠনমূলক সমাজ সেবার কাজের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত। ববীন্দ্রনাথের কথার বলা যায় যে নিজে যাক্তা ভুলক্যানো নয় এদের মন, বরং তাজা ত্রিভিভবস্। আজকের দিনেও এরা অমুকরণ যোগা।

প্রতি বছরই দুই একজন করে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ঐশ্বর্যশীল চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যাবাস্তুদারে প্রয়াত সুধীন নিয়োগী ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সকলেই দণ্ডায়মান হয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করে।

উপসহায়ে বলা যায় যে এ, বি, এস, এর প্রতিষ্ঠা দিবসে দুই জন সভ্যের অবদান অপরূপ। একজন সুধীন মজুমদার, বিনি নিজের অমূল্য দেহ নিয়েও এই অমুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন। অসুস্থতা হলেন এই সংস্থার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ঐবীবেদন রায়। প্রতি বছরই তিনি নিজ গৃহে এই শুভ মিলনামুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। আর যে ত্রুিতোষের ব্যবস্থা করেন তার তুলনা নেই। তাঁর আন্তরিকতা, তার বন্ধু প্রেম, এ, বি, এস, এর প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা ও মমতা আদর্শ স্থানীয়।

রাষ্ট্রগুরু শ্বরেজ নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অধ্যায়]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

১৯০৯ সালে আমার বিলেত ভ্রমণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাংলায় অসামাজিকতাবাদী আন্দোলনের মূল কারণই হচ্ছে দেশ-বিভাগ ও সেই বিভাগকে সমর্থনের জন্য অসুস্থত কর্তৃনীতি; এবং অস্বাভাবিক মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আন্দোলন এখন তার আকার ধারণ করে এবং লাভ্য বেশ বহন উদ্ভবনার ক্ষুদ্রতায় থাকে তখনই যদি এট সংশোধনের কাজটি সম্ভব হত, তাহলে বাস্তব এবং সম্ভবতঃ ভারতেরই ইতিহাস অস্বাভাবিক লেখা হত এবং আমাদের প্রবেশ অসামাজিকতাবাদের কলঙ্ক থেকে রেহাই পেত। এইভাবে এখানেও একটা পূর্ণ-অনুভবের অসুস্থল মুহূর্তকে কাজে লাগান হইল না। সংশোধন এল ঠিকই; কিন্তু এল এখন একটি সময়ে যখন তার আগের কাল অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। 'অতি বিলাসিত' কথাটি আর একবার ব্রিটিশ নীতির প্রতিটি দৃষ্টানে লেখা হয়ে রইল।

যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি দেশ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের অংশগ্রহীত হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে কিছু না বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে পারছি না। তাদের মধ্যে কয়েকজন এখন আর জীবিত নেই। সেই কয়েকজনের মধ্যে রয়েছেন মিঃ আনন্দমোহন বোস, মহানসিংহের স্বর্ধকাত আচার্য্য, বাবু অধিকাচন্দ্র বসুমাণ, এবং মিঃ কুসুমপ্রসাদ বসু এঁদের সম্পর্কে অন্য প্রসঙ্গে অন্তর্য্য আমি লিখেছি। দেশ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলন দেখা দেওয়ার পূর্বে মহারাজা স্বর্ধকাত আচার্য্য চৌধুরী রাজনীতিতে সে রকম কোন আগ্রহই দেখান নি। তিনি ছিলেন

একজন বন্যো ব্যক্তি। জীবনভর শিকার করার কাজেই ছিল তার আগ্রহ এবং তাতেই তিনি আনন্দ পেতেন। এই শিকার করার কাজটিকে তিনি এত গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন অনেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়কেও এতটা গুরুত্ব দেন না। প্রকৃতির দিক থেকে তিনি ছিলেন খুব উৎসাহী লোক। একবার কোন ব্যাপারে কোনজন অস্বস্থিতির কারণে তা চরিতার্থ করার জন্য অস্বস্থিতি বা কষ্ট স্বীকারে পরাজয় হতেন না। সেই দিনে এই 'রকম একজন পশু' ব্যক্তির পক্ষে সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ান কম সাহস ও ইচ্ছাশক্তির পরিচায়ক নয়। লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার চেয়েও এতাজ কঠিনতর। লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করেছেন; মহানসিংহের মহারাজার নিজ বাড়ীতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। রাজকীয় ধর্ম্যাবলম্বী ভাইসরোকে দেখানো আগ্রহের কথা হয়। কিন্তু মহারাজা বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে তার অনমনীয় মনোভাব দেখাতে এবং ভাইসরয়ের কাছে তা বোঝানুসিদ্ধায়ে প্রকাশ করতে কখনই কোনজন দ্বিধা করেননি। আন্দোলনের সমস্ত কালটা জুড়ে এখন কি এমন নির্ধ্যাজনের সেই নিষ্ঠুরতন দিনগুলিতেও, যে সময়ে দেশ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বকে সরকারের চক্ষু রাজনৈতিক লক্ষ্যেভ্রাস্তর ব্যক্তি বলে গণ্য করা হত, তিনি তার এই মনোভাব অটুট রেখেছেন।

আমার বেশ মনে আছে ১৯০৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে বর্ধন আন্দোলনের সেই প্রথম সভার তিনি

অধনকার বিনে লজা ঘোটা স্বদেশী ভাগত পড়ে এসে যোগদান করেছিলেন। তারই লোকের দাবীদার হোজের বাড়ীতে আহারের অনেক লজা হয়েছে এবং অতি শুকন পূর্ণ নানা নিছক গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলায় কয়েকজন নেতাকে স্বদেশী নির্ধারন দেওয়া হয় তারই প্রাচীনে তিনি পরলোক গমন করেন এবং এ সময় একটা আশুভাও তখন প্রকাশ পেরেছিল—হত পেন আশুভার কোন ভিত্তি ছিল না—যে তিনি বেঁচে থাকলে হত অনেক বন্ধু ও সহকর্মীর মত তার ভাগ্যেও নির্ধারন হত ঘটত। তার মৃত্যুতে পূর্ণ বাংলায় জঘন্যতার মতো এমন একটি স্থান মৃত্যুভূমি আর পূর্ণ হয়নি। সাংসিকতায়, নৌকায় এবং মনোভাবের কিক থেকে তার সমস্তের আর সকলের উপরে মাথা বাড়ান করে তিনি হাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চলে গেলেন, সেখানে থেকে গেলেন এক অস্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক করার মত চিত্রের বৃত্তান্ত।

বহিরাগতের দাবী অধিনীতকার মত হলে পূর্বদেশের আর একজন নেতা যিনি বিশেষ ব্যক্তিগত অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুদূর যাত্রী এবং বহিরাগত ব্রহ্মোদয় কলেক্টর সভাপতি। কলেক্টর তার শিষ্যের সমাবেশে পুণের পিতৃভক্তি পুষ্টি-বহন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অধিনীতকার হজের নিষ্ঠা এবং সংগঠন শক্তি বলে পূর্বদেশে কিংবা লুপ্ত প্রদেশেই বলতে পারি—এই প্রতিষ্ঠানটি একটি মূল্যবান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে পড়ে ওঠে। তখন থেকে তার লক্ষ্যের কবী বাবু মতীশচন্দ্র চ্যাটার্জির সহায়তায় সারা জেলাকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনেও অতঃপাশিত করেন। জেলার বিভিন্ন স্থানের সংগঠনগুলি অশুভ সেবার্ধ্য করেছে এবং বহিরাগত হস্তিক দেখা দিয়ে মিঃ হত ঙ্গি লোকের বহল পরিমাণে সাহায্য করতে পেরেছিলেন। দ্বিতিক-ঙ্গি লোকের সেবা এবং স্বদেশী প্রচার কাজ এক সঙ্গেই চলতে থাকে।

সে দুটো ছিল সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে জন-প্রতিনিধিত্বের এক দাবী ও মত বিরোধের স্থান। আর অধিনীতকার হত এবং বহিরাগতের বহুপন্থী পূর্ণ মাত্রায়

সেই সরকারী মহলের অস্বাভাবিক ও সেই অস্বাভাবিক কলে যা যা ঘটতে পারে তার চাপ অস্বাভাবিক করতে থাকেন। ১৯০৮ সালে মিঃ হত ও তার সঙ্গী মিঃ মতীশচন্দ্র চ্যাটার্জিকে বিনা বিচারে নির্ধারন দেওয়া হল সে সময় হত বহু মিঃ অস্বাভাবিক থাকে। বিনা বিচারে নির্ধারনে পরোক্ষো ব্যাপারটাই আইন ও বিচারের মাধ্যমে বিধি-বিধানগুলির বিরোধী। সে মিক থেকেও বহিঃবিবেচনা করা না হয় তাহলেও এটা অস্বাভাবিক থেকে অধিনীতকার মত ও মতীশচন্দ্র চ্যাটার্জির মত লোক থাকে মত কোনমিঃ কোন অধিনীতকারিক চিন্তা স্থান পার্থক্য বা দাবী তাহলে কীভাবে কোন মিঃ কোন অধিনীতকার মতের কোন কথার দাবী করেন মিঃ তাহলে প্রতি এমন একটা পুরাতন বিনের বিস্তার বিধানের সাহায্যে একপ ব্যবহার করা হবে যে বিধান প্রদান করা হয়েছিল বিদ্যোদীপের মত লোকের দিক থেকে প্রকাশ করা হয়। সরকারের এই কালের কলে এ সময় একটা সাধারণ দাবীর সই হল যে সরকার স্বদেশীয়কে পিছে রাখতে চায় এবং অতি ব্যক্তিগত কয়েকজন নেতার দিক থেকে অস্বাভাবিক সব ব্যাপার অবলম্বন করে স্বদেশী কর্মীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে চায়। কিন্তু নির্ধারন স্বদেশীয়কে হত্যা করতে পারল না। স্বদেশীয় যে কীরকান হয়ে পড়েছিল তার কারণ হল অনেকগুলি বাসিন্দার প্রতিষ্ঠানের অস্বাভাবিক এবং দেশ-বিদেশের সংশোধনের কলে আন্দোলনের মূল কারণের অস্বাভাবিক।

চাকার বাবু আনন্দচন্দ্র দাস। তার দিকে এমন মনোযোগ করা দাক। তিনি ছিলেন দেশ বিকাশ বিদ্যাবী আন্দোলনের একজন পুরোণা ব্যক্তি, চাকার উকিল সভার অধিনায়কী মেতা। চাকা দ্বারা আনন্দচন্দ্র দাসের মত আর কোন হিন্দু নেতাও এটা গুজবদারী ছিলেন না। স্বদেশী আন্দোলন ও দেশ-বিদেশের সংশোধন আন্দালের কাজে তার সেই সময় প্রভাবটী তিনি অতি প্রাকলোম সহিত প্রকাশ করেছেন। দেশ-বিদেশের পরিচালনা অস্বাভাবিক চাকার মত প্রদেশের রাজ্যদান থেকে চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যদানী স্বাধীন-স্বাধীনতা

লাভ হবে—পরিচয়—এই আকর্ষণীয় দৃষ্টান্তে অনঙ্গ চেষ্টার ধারা টেকেছে যেরূপে তিনি এবং হিন্দু নারিকণপ যেভাবে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংগতি বন্ধ করে যে জন-বান্ধবী ঘনন পরিচয় ঘোষণেন তা সামান্য ব্যাপার নয়। আনন্দময় এবং চলেই যেন-বিকাগ বিহীন আনন্দোৎসবের একজন প্রচণ্ড প্রেরণা। এই বিদ্যাবিত্তার তিনি কোন সময়ই পদপা হননি। যখননিঃসঙ্গের আনন্দে কুহক ছিলেন ঠিক এই বসন্তেরই আর একজন মেয়ে। তিনিও যখননিঃসঙ্গের উজ্জ্বল সভরে প্রাণে ঝুঁপে প্রাণবান্ধবী দোক ছিলেন। সেই দিনে একজন জনপ্রিয় মেয়ে হওয়া বান্ধবী চল কর্তৃপক্ষের অপভ্রান্ত-ভাজন হওয়া। আনন্দে কুহক তাইর কাশ্যে কেতাবে স্থান লাভ করলেন। দ্বিবাঙ্গনে অবতরিত পড়ানো হয়নি। যখন রায় অল্পের জ্ঞান তিনি বৈতে গেছেন। তবে কৌতুহালী আইনের ১১০ ধারা প্রয়োগ করা একটি পুল অপমানজনক ব্যাপার। তা ছাড়া এটা যে তার পক্ষে কেবলমাত্র একটি আত্মপ্রতিমান আইন হওয়া ঘটনা ছিল তা নয়। তখনকার দিনে প্রচলিত নিয়মাবলীতে এই ধারা প্রয়োগের ফলে স্থানীয় লোকের পণ্ডিত কাউন্সিলে দ্বিবাঙ্গনের অযোগ্য বলে পরি-পণিত হনেন। শ্রীম তার এই অযোগ্যতা দূর করার জন্য আবেদন করেছিলেন। স্থানীয় সংসদে তাতে দেওয়া দূর করার সমস্তা ছিল। কিন্তু স্থানীয় সরকার তার আবেদন পূরণ করেন। দোতপাক্ষকে সাইব-বহা-পণ্ডিতের প্রণয়িত অনুমতি এই নিয়মটি এবং এই কাজী আরও কয়েকটি বিধান প্রস্তাবের করে মেওয়া হয় এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতাসীম সীমিত করে দেওয়া হয়েছে।

যে সময় বিদ্যাবিত্তার যখন বিভাগ বিহীন এবং বসন্তী আন্দোলনের সঙ্গে নিঃসঙ্গের মিলিয়ে বিরে শুক থেকে দেব পণ্ডিত এই আন্দোলনে সমর্থন করে সিদ্ধেই তাইর মধ্যে আর একজন হনের অধিকাংশ মজুমদার। তার নাটক শেষে উল্লব করণে তার কৃতিত্ব অপর কারও

চেয়ে কম ছিল। তার নিজ জিলা করিমপুরে এবং পূর্ব-বঙ্গের অন্তর্গত তাকে বলা হত করিমপুরের প্রধান বক্তালাল। দার্শনিক তার এই নাম। বুদ্ধিমত্তার প্রাচুর্যে, কৃতিতার অধিকারীত্ব, যেন-মজুমদার প্রতি অচলাভক্তি ও শ্রীম তিনি বাংলার অল্প সব মেতাবের পুরোভাগে স্থান লাভ করেছিলেন। তিনি তার জীবন শুরু করেন একজন মজুমদার রূপে। বিভাগের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউটে তিনি আমার সহযোগী ছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি স্বাধীনভাবে যোগ দেন এবং সে কালে তার উল্লাহ কোন সময়েই স্থানান্তর হয়নি। বসন্তে গেলে কংগ্রেসের সম্মেলন থেকেই তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কংগ্রেসের একটি সভায় অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। এটি ছিল কংগ্রেসের ১১১০ সালের অধিবেশন যে অধিবেশনে লন্ডো হুজিয়ার প্রচণ্ড হয় এবং সমগ্র গণতান্ত্রিক উন্নতি লাভের প্রয়াসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে চূড়ান্ত-নিশ্চিত করা হয়।

দেশবিভাগ সম্পর্কে তার অনুভূতি এক প্রবল ছিল যে তিনি এক সময় আশা করেছিলেন যে দেশ-বিভাগ বাধ্যতাবহি সম্পাদন গ্রা হয় তাহলে নতুন প্রাণে তা পৈত্রিক কৃপান্তি বা অর্থে সব বিক্রী করে তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে বাস করবেন এবং দেশ জোড়ের সহিতই আশা করে তার জন্য ২৪ পরগণার কিছু জমি জর করতে বলেছিলেন। করিমপুরে জিলায় বসন্তী ও বস-ভক্ত বিহীন আন্দোলন তিনিও অচলাভক্তি করেছিলেন এবং প্রয়োজনমত সর্বত্রই উৎসাহ পদার্থ ও সক্রিয় সহায়তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। করিমপুরে তার প্রাণে এত প্রবল ছিল যে একবার বস-ভক্ত আন্দোলনের তীব্রতার মধ্যে সেন্টেন্সি পূর্ণতার বন্ধ করিমপুরে এসে তখন তিনি দেখলেন যে রেলস্টেশনে কোন কুলি নেই। রূপে অবতন পূর্ণি কর্তব্যবাহীর এই প্রাথমিক দান কর্তার মাল পর বহন করতে হয়।

একজন ব্যক্তির মধ্যে দেখা গিয়েছিল যে জন-পক্ষে প্রতি বৈরাগ্যবৃত্তির বাধ্যতাবহি পরিবারিক সাহায্য

কীধনের হোয়াহুজুরিই বিশ্বাস দাত্ত এবং স্বদেশপ্রেমের
 ১. মূল শিক্ষার ভিত্তিতে গৃহের পরিচর্যা ও গ্রাম্য কীধনের প্রশাসন
 পরিচালনার মধ্যে। তার নিজের জিলা ফরিদপুর চিরকালই
 তাকে একজন প্রধান হিষ্ট্রী ব্যক্তি বলে স্বপ্ন করবে।
 বহুবছর ধরে তিনি ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান
 ছিলেন। ফরিদপুর সংসদে যে জন সর্বসাধারণ বাবস্থা।
 হয়েছে, তা প্রধানতঃ তারই উদ্যোগ প্রশাসনিক পক্ষি এ
 বক্তার শুধে সন্তুষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি ফরিদপুরে একটি
 কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা তারই জন-সেবা মূলক
 কাজের আর এক বিরাট কীর্তি। বাকী কিছু পড়ে তোলা
 আর যে দায়বর্ত ছিল এই কলেজ তারই এক নিদর্শন।
 তা ছাড়া, যে জনপদের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন,
 কীধনধারণ করেছেন তাঁদের প্রতি তার যে কতখানি অকৃত

ভালবাদা ছিল তারও প্রমাণ স্বরূপ এই কলেজ। রোগ
 দ্বারা লাভিত থেকেও স্বজন বিধেগে শোক সন্তপ্ত
 পারিবারিক কীধনের মধ্যেও তার লোক হিতকর কাজে
 উৎসাহ আটট ছিল, এবং সময় সময়, যখনই প্রথম এসে
 পড়ত, এই মহান বৃদ্ধো লাভুটি তার কীধনের দিনগুলির
 কথা নিশ্চিত বিবরণের জোর দিয়ে বলে যেতেন। দিকম
 তাঁর মধ্যে জাতীরতাবাদী কলেজ ছুই দ্বারা যথো যখন
 কাটল খলল তখন আঁধারতল মজুমদার কোন সময়ই বিধা
 গ্রন্থ হননি, কোন সময়ই বিচলিত হননি; পরন্তু তার
 স্বভাব লিখ উৎসাহ নিয়ে তার সভ্যরেট পাটির বক্তৃৎগের
 পরিষদে নিজ ভাষণকে মিলিয়ে যিলেন। সারাটি জীবন
 তিনি তার এই সভ্যরেট বক্তৃৎগের সঙ্গে একত্রে কাট করে
 গিয়েছেন। (চলবে)

স্বাস্থ্যের পেটের ব্যথা, অম্ল, অকীর্ণ ও পেটের বেদনায়
 অব্যর্থ ফলপ্রসূদ

আমেলা হুত কুমারী

আমুবেলিয় মডেল ডেপ্তর মূল্য ৩.০০ এক কলমের মধ্যে

ব্যক্তিগত - গ্রীষ্মকালীন মোহন চক্রবর্তী ১৯৩৩

ফিল্মের দুইটি - কলম দুইটি - কলম দুইটি - কলম দুইটি

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—CALCUTTA			
Bhowmic Smt Uma Rani w/o Late Nirad Baran	C/o Debabrata Chakraborty 56 Sitaram Ghosh St. Cal-9	150	25 8 71
Bose Biswa Nath	21E Haralal Mitra St. Cal-3	200	30 3 74
Das Birendra Chandra	35 Balaram Majumdar St. Cal-	200	5 3 72
Dutta Naresh Chandra	6/4 Prince Baktiar Shah Road Calcutta-33	200	1 4 79
Datta Kiranbala (alias Kiranmoyeej w/o Late Profulla Kr Datta	C/o B. N. Kar Chowdhury 87 Baburam Ghat Rd. Cal-40 (Previous Vill Digha ; Gaighata, 24 Prgs)	100	22 1 79
Dist—24 PARGANAS			
Bhowmik Harendra Kumar	Vill Rajdanga ; P. O. Haltu	200	27 3 74
Chatterjee Kalidas	Netaji Palli, Manikdanga Gbola P. O. Sodepur	200	16 12 78
Dist—HOOGHLY			
Bhadra Smt Uma Rani w/o Late Brujendra Bhadra	4/C Dhsuresh Chatterjee Lane P. O. Uttarpara	100	17 11 79
Dist—BURDWAN			
Biswas Narendra Nath	Railpar Defopara, Karuna Niketan P. O. & Vill Asansol	200	2 6 71
Mukherjee Saraju Prasad	Vill Kulchanda, P. O. Bhatav	200	1 4 75
Dist—NADIA			
Mukhopadhyaya Smt Mira w/o Late Jiban Krishna	Nagendra Nagar, Mathpara P. O. Krishnanagar	150	10 10 79
Dist—PURULIA			
Gorain Smt Bilasi w/o Late Lambodar Sorai	P. O. & Vill Lakhanpur	100	3 8 79
Dist—MIDNAPUR			
Das Bishnupari	Vill Matilal Chak, P. O. Janka	200	14 12 73
Dey Smt Mayarani w/o Late Anil Kumar Dey	P. O. & Vill Dasagram	150	15 6 75
Gana Sadananda	Vill Chinadari, P.O. Bahadurpur	200	2 4 74
Mahato Sripati Chavan	Vill Katnimaro P.O. Mahimnischiana	200	15 8 72
Dist—COOC BEHAR			
Bose Smt Renu	w/o Late Satish Ch. Bose Roy	200	24 10 79

বার্ষিক :—মূল্যক ১৪.০০ টাকা

বার্ষিক :—৮.০০ টাকা

মূল্য—৩০ পৃষ্ঠিকা

130

বিপ্লবী পুস্তকমাল্য

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব গ্রন্থাল—ব্রহ্মবট্টা বাজার—১০০

বিপ্লবী মহানায়ক রামবিহারী—ব্রহ্মবট্টা বাজার—১০০

কীর্ত্তন কুমার দত্তের—

১. বাংলায় অস্তিত্ব—১৪০
২. বিচিত্রতায় ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—১০০
৩. অনুশীলন সমিতির পি, মিটিং—১০০
৪. খোঁজাটী সংগ্রাম কাহিনী—১০০
৫. কাকোয়ী শহীদত্ব—১২৪
৬. তলত্বা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—৪০
৭. রামবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—১০
৮. বাহীনতায় শহীদ মা ও মেরে—৪০
৯. বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—৬০
১০. বিপ্লবী বিবেকানন্দ—৪০
১১. মহানায়ক ও সূত্রাবলী—৪০
১২. ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—১৪
১৩. দেশ বাসের ভোলেনি (১)—১০০
১৪. দেশ বাসের ভোলেনি (২)—২০০
১৫. শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—৪০
১৬. ১০ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১০০
১৭. হাতিজা হত্যা প্রচেষ্টা—১৫
১৮. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪০০
১৯. ভারতের জাতীয় পতাকার উদ্ভাৱন—৪০
২০. লাঠি হত্যা প্রচেষ্টা—১৪০

প্রতিস্থান :—৪নং বরুড ল্যান্ড ট্রাট কলিকাতা-১০০০১

টেলিগ্রাফ—১/১/১/A দক্ষিণ জ্যাটাকী ট্রাট কলিকাতা-১০

— সম্পাদক বক্তব্য —

অনুশীলন চটোপাধ্যায় (সভাপতি) অধ্যক্ষ চন্দ্র নন্দী, শ্রীমূল জ্যাটাকী

সম্পাদক—শ্রীমতি শরণ দাসচৌধুরী

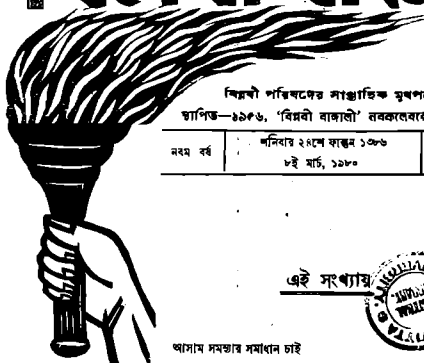
বিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীমতী সোণা । বেঙ্গাল—শ্রীমতীসোণা দাস ।

প্রকাশক ও প্রত্নক :—শ্রীমতি সোণা । প্রচার সচিব—শ্রীমতী সোণা ।

বিল্লীর বাংলা ভাষালাভ :—৪নং বরুড ল্যান্ড ট্রাট, কলিকাতা-১০০০১

ব্রহ্মবট্টা :—প্রতিষ্ঠা : লক্ষ্মীমণি, ১১১ নং ব্রহ্মবট্টা লেন ট্রাট, কলিকাতা-১০০০১

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
 ছাপিত—১৯৭৬, 'বিপ্লবী বাংলা' সপ্তাহিক—১৯৭৬

নবম বর্ষ	শনিবার ২৪শে ফাল্গুন ১৩৮৬ ৮ই মার্চ, ১৯৮০	২৪ সংখ্যা
----------	--	-----------

এই সংখ্যায়



আসাম সমস্যার সমাধান চাই

—সম্পাদকীয়

অমূল্য ডবন বাৎসরিক কার্যবিবরণী

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু অমর বাণী সংকলন

২১শে ফেব্রুয়ারী অরণে

—ত্রৈলোক্য বাস

আকস্মিকভাবে কল-কৌজের উপস্থিতির কারণ

—কালীন্দ্র সরকার

‘তুমি-মামু ভাই

সবার উপরে মামু সত্য

তাহার উপরে নাই।’

—চণ্ডীদাস

বিপ্লব-শক্তি বিদ্রোহ হতে পারে কি ?

আসাম সমস্যার সমাধান চাই

আসামের পরিস্থিতিটা দিন দিন উৎপন্নজনক হয়ে উঠছে। অবশ্য এতটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারত না, যদি না পূর্বতন দুটি দলীয় সরকার নৃপংসকের ভূমিকা পালন করত। একদল ছাত্র ও কিছু সংখ্যক মানুষ উদ্বাসের মত কাজকর্ম করছে। শত শত নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছে, হাজার হাজার মানুষকে গৃহহারা করেছে। অগ্নিসংযোগ, লাঙ্গাহাঙ্গামা, লুণ্ঠরাজ, খুন-খারাপি করে একটা নির্বাচন বন্ধ করে দিয়েছে, যার ফুলনা স্বাধীন ভারতবর্ষে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীব্যাপী ডেলসলভেটের কিনে, এরা তৈল শোধনাগারগুলির কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে এবং দেশের অন্তর এখান থেকে তেল সরবরাহ ব্যাহত করেছে। ভিন্নদেশের ভারতবাসীদের, বিশেষ করে বাঙ্গালী ও নেপালীদের উপর অকথা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে অবশ্য। অশচ আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে প্রাচ্যসনের তরফ থেকে এদের সংযত করা হয়নি এবং আসামীদের মধ্যে থেকেও এদের নিবৃত্ত করার কোন প্রচেষ্টা হচ্ছে না। তবে কি ধরে নিতে হবে যে বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন, স্থির বুদ্ধিবৃত্ত কোন মানুষ আসামে নেই? মুষ্টিমেয় একদল অমামুষ বা ইচ্ছে তাই করে পার পেয়ে যাচ্ছে কি করে, এটা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য কিন্তু এই দেশভ্রোহী মনোভাবকে দমন করতে না পারলে, দেশের সংহতি বিনষ্ট হবে এবং ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে বাবার আশঙ্কাও রয়েছে। অত্যাচার, অবিচার দীর্ঘদিন একতরফা ভাবে চলে না। প্রতিরোধ আসতে বাধ্য। দেশের সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যদি একাঙ্গে ত্রুড়ী না হন, তখন সাধারণ মানুষেরাই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ে দাঁড়াবে এবং তাদের কাজকর্ম সব সময় নিয়মতান্ত্রিক পথে নাও চলতে পারে। সে পরিস্থিতিতে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বাগত জানাবে না। তবে সম্ব-সীমার মধ্যে এই সমস্যার সমাধান না করলে, অন্তর মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। সুতরাং এখনই এই অবস্থার প্রতিকার করা দরকার।

শ্রীমতী গান্ধী যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন আমরা আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কয়েকটা গুরুতর সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলাম। আসাম সমস্যা তার অগতম প্রধান। বর্তমান সরকার আগেকার সরকারগুলির মত নীরব দর্শক হয়ে বসে নেই, একথা স্বীকার করতে কোন ঘিবা নেই। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাম দখল করেছেন এবং সর্বদল ও মতের লোকদের

সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। বিদেশীদের হাঠিমে দেবার দাবিতে এই আন্দোলন শুরু করা হয়েছে বলে আন্দোলনকারীরা বলেছে। ভোটের তালিকা সংশোধন করে নির্বাচন করতে হবে এটাও একটা দাবী ছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রিজেন সিং এ সংক্ষেপে একটা বাস্তবসম্মত প্রস্তাবও রেখেছেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাব সমর্থনও করেছেন। কিন্তু ভরী জো তুলছেন। ১৯৭১ সালের তালিকাকে মূল তালিকা ধরে সংশোধনের কাজ করার বিপক্ষে বাগা দাঁড়াতে চায়, তাদের আসল মন্তব্য ত কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রস্তাবকে বানচাল করে দেওয়া। শোনা যায়, এদের উদ্দেশ্য দিকে একদল ভারত বিধেয়ী বিদেশী। কেউ কেউ বলেন যে একদল ব্যবসায়ী একচেটিয়া কারবার কায়েম করার জন্য এই হাস্যামোকারীত্বের দস্ত দিচ্ছে। এদের ভাবগতিক দেখে মনে হয় Something more is meant than meets the eye অর্থাৎ যেটা উপর উপর দেখা যায় সেটা আসল কারণ নয়, সেটা রয়েছে একটু দৃষ্টির অগোচরে, অন্ধকারের মধ্যে। আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আবদ্ধ ভারতের পক্ষে ১৯৬১ সালের ভোটের তালিকাকে ভিত্তি করে কাজ করা সম্ভব নয়। এ সংক্ষেপে নমনীয় নীতি গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। কারণ তাতে বিশেষ ভারতের ইচ্ছাকৃত হানি ঘটবে। Spoilt child এর মত আবদার করলেই তা যদি গ্রহণ করতে হয়, তবেতো প্রশাসনের কোন অস্তিত্বই থাকেনা এবং তার কোনও প্রয়োজনীয়তাও থাকেনা। হাস্যামোকারীরা এই যুক্তি-পূর্ব দাবী যদি না মানেন, তবে তাদের ভবিষ্যৎ আন্দোলনকে বেশজোছাটীতার আন্দোলন বলে গণ্য করতে হবে এবং বেশজোছাটীদের জ্বায়া পাগুনা মিটিয়ে দিতে হবে। সরকারের তরফ থেকে দুর্বলতার পরিচয় কিছুতেই দেওয়া উচিত হবেনা। কঠোর হস্তে মোকাবিলা করলে কি ভোট না পাবার আশঙ্কা আছে? থাকলেও, ভোটলাভ থেকে সমগ্র দেশের স্বার্থরক্ষা করাই অবশ্য কর্তব্য। আমরা আশা করব কোন রাজনৈতিক দলই খোলা জলে মৎস্য শিকার করতে সচেষ্ট হবে না। প্রত্যেক দলেরই উচিত এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনে এগিয়ে আসা। অজ্ঞানতার চরম বিপর্যয় ঘটানোর আশঙ্কা আছে এক সেটা কারো পক্ষে মঙ্গলজনক হবেনা। এর হাস্যামোকারী মন্তব্যকে লঘু ভাবে নেওয়া সরকারের পক্ষে উচিত হবে না। এদের উদ্দেশ্য যে সং নয়, পথ যে আরো জঘন্য সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংস্কারকার নামে শত শত মানুষ খুন করার কোন-যুক্তি থাকতে পারেনা।

দেশের মানুষ বর্তমান সরকারের উপর, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর উপর বিরাট ভরসা রাখে। আসাম পরিস্থিতি আজ তার নেতৃত্বকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে। দেশের মানুষ একান্তভাবে আশা করে, তিনি এই সমস্যাটোয় নিশ্চয়ই সফল হবেন। আসাম সমস্যার সমাধান চাই এবং তা এখনই।

অমূলীন ভবন বাৎসরিক কার্যবিবরণী

১৯৭৯—

‘বন্ধেমাতরম্’

১ অমূলীন ভবনের একবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের ক্ষণ আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। এই দিনটিকে আমরা অতি পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। পরাধীন ভারতে সমগ্র অত্যাচারের ক্ষণ মহানায়ক রাসবিহারী বসু ১৯১৫ সনে এই দিনটি স্থির করেছিলেন। দেশভ্রোহর বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষণ তা বার্থ হলেও এদিনটিকে আমরা ভুলতে পারি না। কিন্তু অমূলীন ভবন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে দেশবাসী এদিনটার বিশেষত্ব প্রায় ভুলে যাচ্ছিলেন। তাই ভবন প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দ এই পবিত্র দিনটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার ক্ষণ ১৯৬০ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী অমূলীন ভবনের প্রতিষ্ঠা দিবস স্থির করেছিলেন আমি সর্বপ্রথমে বিপ্লবপ্রাণ সেই মহানায়ক রাসবিহারী বসু এবং ভবন প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী আন্তজোষ কাহালী, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই, শ্রদ্ধা জানাই সমগ্র স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদবৃন্দের প্রতি।

সময় সংকীর্ণ, তাই বাৎসরিক বিবরণীও সংক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছি। ভবন প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দের আরও সমস্ত কাজই শৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পুস্তকাগার সহ পাঠাগার, হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, ‘শক্তিসংগ’ ব্যায়ামাগার বথাক্রমে জন্মের দীনেশ বিবাস, ডাঃ শচীন কর ও ব্রহ্মভাজন মিলীপ সাহার তত্ত্বাবধানে সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পুস্তকাগারে পুস্তক বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৫০ নাঁড়িয়েছে, দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীর সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যায়ামাগারে কিশোর ও যুবকদের শরীর চর্চার অধিক আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য বিপ্লবীদের ব্রিহত্তা সেবাসদনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং বিপ্লবীদের পেলন প্রাপ্তির ক্ষণ বথাসমুদ্র সাহায্য করা হচ্ছে। আরও গান-মূলক কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থভাবে কোন কাজ করা যাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে ভবনসৌখ্যের অসম্পূর্ণ কাজের প্রতি বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করা, জীর্ণ ছাত ও দেওয়াল মেরামত অনতিবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন কিন্তু অর্থভাবে তা হচ্ছে না।

সেবাসদনের প্রতিশ্রুতি স্থাপন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী সংস্থা অমূলীন সমিতির গৌরবময় ভূমিকা জনমানসে সন্মজ্ঞাপ্রাপ্ত রাখা জাতীয় চরিত্র গঠনের সহায়ক বলে মনে করে বিপ্লবতাপস মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ সরণি (ত্র্যোবর্ণি রোড) ও বিপ্লবী রাসবিহারী সরণির সম্মুখে স্থলে অবস্থিত কূহ উত্তান দীপটিতে স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। শুধু ব্রোঞ্জ মূর্তি

স্থাপন নয়, উহা রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্বও বিপ্লবীরা গ্রহণ করেছে। অম্মশীলন সমিতি নীতিজ্ঞানহীন কমতালোভীদের সঙ্গে ঘন্থে অন্তর্দীর্ণ না হলেও শাসক গোষ্ঠীর অপশাসনের সমালোচনা এক শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে অভিমত ব্যক্ত করার জন্য ‘অম্মশীলন বাতায়’ সমিতি তার বলিষ্ঠ মতামত প্রকাশ করেছে। এ সমস্ত কার্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অম্মশীলন সমিতির সম্পাদক ও অম্মশীলন ভবন অছি পরিষদের আবেদন আপনারা নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আশাকরি আপনারা যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য দানে যিধা করবেন না। বিপ্লবী চরিত্রবল, নির্ভা ও ভাগ্য পরাধীন ভাবভুক্তে মুক্ত করেছে বলে তাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যাব নি। জাতীয় চরিত্র গঠন ও নবন্যায়ণ সেবায় অংশ গ্রহণ না করলে আমরা আদর্শ ত্রুট হব না কি ?

পরিশেষে অছি পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বিবরণী শেষ করছি।

ঐযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

সম্পাদক

২১শ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ সন।

ত্রিশের সশস্ত্র অভ্যুত্থান

ত : আশা দাশ

জাতীয় সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক
মূল্যায়ন ও মহানায়ক সূর্য সেনের চরিত্র অধ্যয়ন।

মূল্য : দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

দে বুক স্টোর্স

কলিকাতা।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুৰ অম্বৰ

ঃ বাণী সংকলন ঃ

বিপ্লবী মহানায়ক শ্ৰীৰাসবিহারী বসু ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পুৰোধ

জন্ম : ২৫শে মে, ১৮৮৬,

মৃত্যু : ২১শে জুলাই, ১৯৪৫

ব্যক্তিগত, গোপ্টিগত বা জাতিগত ভাবে যদি কিছু অৰ্জন করতে হয় তাহলে তার জন্য সংগ্ৰাম করতে হবে। সেই কাজে বা সংগ্ৰামে সাফল্য লাভ করতে হলে লক্ষ্যকে অবিচলিত রাখতে হবে। সামগ্রিক শক্তি, সমস্ত সম্পদ নিয়োজিত করতে হবে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—যা সহজে লাভ করা যায় না; বহু বিপদ আসবে পথে এবং দূর করতে হবে অনেক অশুবিধা, বাধা যত শক্তিশালী হবে, উদ্দেশ্য লাভ ততই কষ্টকর হবে। সমস্ত শক্তি এবং উৎসকে সম্মিলিত করা ততই অশুবিধাজনক হবে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সামগ্রিক একা অবশ্যই চাই।

উদ্দেশ্য সাধন না হওয়া পর্যন্ত যতদিন সংগ্ৰাম চলবে ততদিন ব্যক্তিগত, গোপ্টিগত, শ্ৰেণী গত বা সম্প্রদায়গত কোন স্বার্থে আনা চলবে না, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা যত দৃঢ়তর হব, সমস্ত স্বার্থগুলিকে আমরা আমাদের জয়ের পথে নিয়োজিত করতে পারবো, ততই আমাদের সাফল্য অনিচ্ছিত। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্ৰাম পথে আমরা ঠিক এই জিনিসের সম্মুখীন হয়েছি।

সংগ্ৰামের গতিপথে আমরা কোন ব্যক্তিগত, শ্ৰেণীগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থকে বরণান্ত করব না, যদি আমরা তা করি তাহলে আমরা কখনোই সাফল্যলাভ করতে পারবো না—আমাদের পরাজয়ের সম্মুখীন হতেই হবে, ব্যক্তিগত বা গোপ্টিগত স্বার্থ অবশ্য দেশের স্বার্থের অঙ্গুলে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু উদাহরণ আছে যেখানে দেশের স্বার্থের উর্দে ব্যক্তিগত বা শ্ৰেণীগত স্বার্থ হারিয়েছে তার স্বাধীনতা।

আমাদের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত—আমাদের মন, শক্তি এবং সম্পদ সমস্ত দেশের স্বার্থে নিয়োজিত করা।

- ১। সর্বদা যুবশক্তিকে উৎসাহ দাও, আত্মশক্তি অল্প অপেক্ষা শক্তিশালী।
- ২। বিনয়ী হও, এর জন্য কোন মূল্য লাগে না, অথচ ব্যক্তিকে দৃঢ় করে।
- ৩। অন্তরে মত সম্পর্কে সহনশীল হও।
- ৪। নেতার প্রতি অঙ্গীকার হও।

- ৫। আত্মজাতিক ব্রাহ্মণের অনুশীলন কর।
- ৬। সাহসিকতার অনুশীলন কর, ভারতের অতীত বীরত্ব স্মরণ কর।
- ৭। তুমি কতটা সহায়তা করেছ তাতে আসে যায় না, তোমার নেতার সাক্ষ্যে তাকে তাঁর প্রাপ্য সন্মান দাও।
- ৮। গোপনীয়তা রক্ষা করে রক্ষণ পূট কর।
- ৯। কর্তব্যে অবিচল থাক।
- ১০। জ্ঞানের মূল্য আছে, ছোট কাজের ক্ষুদ্র ইতিহাস: করো না অপরের নিকট উদাহরণ দাও।
- ১১। বাঁচো এবং বাঁচতে দাও।
- ১২। বিবর্ততা ও সহযোগিতা সাক্ষ্যের পথে নিয়ে যাবে।
- ১৩। মানুষকে ভালবাসবে এবং শ্রদ্ধা করবে, তারাই তোমার ভালবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে।
- ১৪। একতা, বিশ্বাস ও বলিদান—তোমার জীবনের ত্রুটি হোক।
- ১৫। ধর্ম সম্বন্ধে তোমার কর্তব্যবোধ দেখাও।
- ১৬। তোমার উপর নির্ভরশীল লোকের জীবন ও নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখবে, স্মরণ রাখবে তুমিই তাদের ক্ষুদ্র দায়ী।
- ১৭। যতক্ষণ না বিপরীত কাজ করে, ততক্ষণ মানুষকে বিশ্বাস করবে, মনে রাখবে বিশ্বাসই বিশ্বাস অর্জন করে।
- ১৮। বিশ্বাস ভুল করবে না।
- ১৯। তোমার গুরুজনদের সম্পর্কে আলোচনা করবে না, এ মূল উদাহরণ, যদি তুমি তা কর তোমার অধীনস্থ ব্যক্তিরও তোমার সম্পর্কে আলোচনা করবে।
- ২০। তোমার নেতার সঙ্গে মনোমালিঙ্গের কথা সম্মেলনে বা সম্মেলনে প্রকাশ করবে না, যদি তোমার কোন মত পার্থক্য থাকে প্রথমে তা মীমাংসা করবে।
- ২১। মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।
- ২২। পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করবে না বা বানিয়ে বলবে না। এরঘারা তুমি এবং তোমার আত্ম-মর্যাদা হেয় হবে, স্মরণ রাখবে, যতবার তুমি অপরের প্রতি কাঁদা ছুঁড়ে ততবারই কিছু তোমার আগলে লাগবে।

(বিদ্যবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু—শান্তিকুমার মিত্র পুস্তক হইতে শিপ্রা গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত।)

২১শ ফেব্রুয়ারী স্মরণ

—ত্রেজেন্স গাস

মাননীয় সভাপতি ও সমবেত বন্ধুগণ।

১৯১৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারী ইংরেজ সরকার উচ্ছেদ করার সময়ে বার্ষিক সিঙ্গাপুর সহ সারা ভারত ব্যাপি সমস্ত অত্যাখানের পরিকল্পনার আয়োজন প্রাজ্ঞ ও ভারতের জনগণের নিকট স্পষ্ট নয়। এই সমাবেশে আপনাদের নিকট বিস্তৃত বিবরণ উপস্থিত করার অবকাশ নেই, সীমিত সময়ের মধ্যে কেটকু সমস্ত তাহাই সংক্ষিপ্ত ভাবে নিবেদন করার চেষ্টা করব।

বিপ্লবী বাংলার আনুষ্ঠানিক জুলাই ১৯০২ সালের ২৪শে মার্চ এই অমূল্যীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অমূল্যীয় সমিতির এগিয়ে নিয়ে যাব অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্র, সতীশ চন্দ্র বসু, জীববিন্দু, ভগিনী নিবেদিতা, লেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ব্যারিষ্টার শ্রবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বাবীন্দ্র কুমার ঘোষ, ডাঃ কুপেন্দ্র নাথ দত্ত, দেবপ্রভ বসু, পুলিন বিহারী গাস, মাখনলাল সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রমুখচন্দ্র গাঙ্গুলী, হেলোকা নাথ চক্রবর্তী, মজিলাল রায়, রাসবিহারী বসু, শতীন্দ্র নাথ সান্দাল, গিরিজা দত্ত প্রমুখ এক আশ্রয় আনকে।

ইংরেজকে সমস্ত গণ-অত্যাখান দ্বারা পরাজিত করে স্বাধীন ভারত গঠন করার পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নেতা নেতৃবৃন্দ দিয়েছেন, ইংরেজের কারাগারে, দীপাবত্রে নেতাদের আবদ্ধ করলেও সমিতির কাজ স্থগিত হয় নাই, নয়া-নেতৃবৃন্দ

স্থান নিয়েছে। এই সকল মনীষীদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ দিগেছিলেন বর্তমান রেলার মুকলম গ্রামের বালক, চন্দন নগর ভূগে কলেজে লক্ষ্য সেন গঠিত প্রাচীন ঐতিহাসিক ক্রিয়গণী ইতিহাস শিক্ষক ইতিহাস বলে বলার প্রতিবাদে কলেজ হতে বহিষ্কৃত হওয়া, সেরাঙ্গ কলেজ অফিসে চাকুরী করার অবস্থার ১৯১২ সালের ২০শে ডিসেম্বর নতুন রাজধানী শিল্পে বড়লাটের রাজকীয় প্রবেশের দিন ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করে ইংরেজের স্থিতিশীল রাজত্ব করার দস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণকারী রাসবিহারী বসু।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে। যুদ্ধে বিপর্যাস হওয়ার সময়ই ভারতে ইংরেজ শক্তিকে চূড়ান্ত আঘাত দিতে হবে এই দৃষ্টি নিয়েই রাসবিহারী বসু সংগঠন করার কাজে ত্রুতী হন এবং সমিতির কর্মীদের বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীতে ও স্থানে কাজ করার ক্ষমতা নিযুক্ত করেন। সেই সময় অমূল্যীয় সমিতির প্রথম সারির নেতা প্রায় সবই গ্রেপ্তার, রাস বিহারী বসুও ফেরারী, তাঁকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ইংরেজ সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ, প্রচুত অর্থব্যয় এবং প্রলোভন দেখান সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় নাই। রাসবিহারী বসু পলাতক অবস্থায়ই তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারীর অত্যাখানের প্রস্তুতি সংগঠিত করেন।

পেশোয়ার হতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ২৯টি মিলিটারী ক্যাপ্টেনম্যান্টের সৈন্যবাহিনী এবং বাংলা-

দেশ পাতাব ও অস্ত্রস্ত্র স্থানের বিপ্লবীরা এই অত্যা-
খানে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত হয়।
আমেরিকাতে গদর দল, জার্মানিতে বালিন কমিটির
নেতৃত্বে বিপ্লবীরা এবং হিন্দেশের অস্ত্রস্ত্র স্থানের
ভারতীয় বিপ্লবীরাও এই অত্যাখান সকল করার জন্য
এগিয়ে আসে। বিভিন্নভাবে সমুদ্র পথে হাটো-পথে
দলে দলে বিপ্লব প্রচেষ্টায় সাক্ষিলে হয়। ভারতে
সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে রাজা মহেন্দ্র
প্রতাপ, সূফী অল্লাহুদাদ এবং অজিত সিংহের
নেতৃত্বে কাকুল প্রান্ত থেকে আক্রমণ পরিচালিত হবে
স্তির হয়। কেবলমাত্র সৈন্যরাই এই অত্যাখানে
অংশ গ্রহণ করবে বা সেই সঙ্গে বিপ্লবীদের কমিউন
তাদের সমর্থক এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত জনগণও
একই সময়ে বার্মা সিঙ্গাপুরসহ সারা ভারতে
স্বাধীনতা ঘোষণা করবে সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং এই সংবাদ ইংরেজ
গোয়েন্দা বিভাগে ফাঁস করে দেওয়ায় ইংরেজ
সরকার ভারতীয় সৈন্যদের আগেই বদলী করার চেষ্টা
করে, কিন্তু সৈন্যরা ইংরেজের আদেশ মেনে নেয় না,
ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়, সর্বত্র আরম্ভ হয়।
কিরোজপুরে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদের
তুমুল লড়াই হয়, ৫০ জন ভারতীয় সৈন্য মারা যায়,
অনেক আহত হয়। অস্ত্রস্ত্র স্থানও সংঘর্ষ হয়।
সিঙ্গাপুরে পনের (15th) Mahamedan
platoon এবং পঁত্রিশ (35th) শিখ (sikh)
রেজিমেন্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রায় এক সপ্তাহ
নিজেদের শাসন কার্যে রাখে। এই অবস্থায় সারা
ভারত ব্যাপি আপাততঃ সৈন্যদের অত্যাখান সম্ভব নয়
বিবেচনায় রাসবিহারী বসু অস্ত্রস্ত্র সংগ্রহ করে
ভারতে পাঠাবার উদ্দেশ্যে পি, এল, ঠাকুর প্রেনামে
১৯১৫ সনের ১২ই মে জার্মান চলে গেলেন।

বিপ্লবীরা সংগঠন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি
হলেন। ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের ঘাঁটির উপর
আক্রমণ শুরু করে। বিপ্লবীরাও আপসে পুলিশের
নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই ১৯১৫ সালের ২ই
সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে বুদ্ধিবালামের তীরে ব্রিটিশ
সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধে আত্মাহুতি কেন
বিপ্লবী বতীন নাথ সুবাজী ও তাঁর চারজন সহকর্মী
চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরঞ্জননাথ ও যতীশ পাল।
১৯১৮ সালে ৭ই ও ৯ই জানুয়ারী গোহাটী অটগাঁও
ও নবগ্রহ পাহাড়ে বিপ্লবী নলিনীকান্ত ঘোষের
নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয়।
সিরাঙ্গগঞ্জে আর্থবরিয়া তেজিমা গ্রামে পুলিশের সঙ্গে
সেবিন্দ কব ও নিকুন্ড পালের সঙ্গে দীর্ঘ সময় সশস্ত্র
লড়াই হয়। এই ধরনের লড়াই বাংলার বাইরেও
হয়। ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন ঢাকা শহরে
কলতাবাজারে সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে
বিপ্লবী নলিনী বাগচি ও বিপ্লবী তারিণী মজুমদার
অত্যাখান পর্ব্বাস্ত করে ইংরেজ সরকারের নির্মম
অত্যাচারের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম কলতাবাজারে
নলিনী বাগচি ও তারিণী মজুমদারের খণ্ডযুদ্ধ।

২১শে ফেব্রুয়ারী অত্যাখান প্রয়াসে কিরোজ-
পুরে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইএ ভারতীয়
সিপাহীদের ৫০ জনের মৃত্যুবরণের মধ্যে দ্বিগুণে সে
আত্মত্যাগের সূচনা হয়, সিঙ্গাপুরে ডাণ্ডি খাঁনের
নেতৃত্বে শিখ ও মুসলমান সৈন্যরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত
শাসন কার্যে করে যে দৃঢ়তা ও মনোবলের পরিচয়
দেয়, ঢাকা কলতাবাজারে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর
সঙ্গে লড়াইএ শহীদ নলিনী বাকচি ও শহীদ তারিণী
মজুমদারের আত্মোৎসর্গ ও মৃত্যু শিখারে মুমূর্ষু
অবস্থায় শহীদ নলিনী বাগচির শেষ কথা Let me
die peacefully. Don't disturb ২১শে

কেবলমাত্র মরণঞ্জয়ী সংগ্রামের আদর্শ টিভিহাসের পাতায় মহীয়ান হয়ে রয়েছে।

১৯১৫—১৮৮ এই ৩৫ বৎসরে ইংরেজ সরকার যুদ্ধে পারল সমস্ত রকম প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় গোড়ামি, দলীয় সঙ্ঘর্ষতা ভুলে গিয়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও বিপ্লবীরা যে জাতীয়তা বোধ, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছে তা কেবলমাত্র বন্দুক কামান দিয়ে বন্ধ করা যাবে না, তাই ইংরেজ ১৯২০ সালে মর্টেমু চেমসফোর্ড রিফর্মস এ্যাক্টের সঙ্গে সম্রাটের বাণী প্রচার দ্বারা রাজবন্দীদের মুক্তি ঘোষণা করে।

একাধিক ইংরেজ লেখক তাদের লিখিত পুস্তকে বিশেষ করে ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিজ ও পাভারের গবর্নর মাইকেল ওডওয়ার তাদের আত্ম-জীবনিত্তে রাসবিহারী বন্দুর বৈপ্লবিক মুক্তি সংগ্রামের কৃতির বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের জ্ঞানী ওণী ঐতিহাসিকরা রাসবিহারী বন্দুর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সঠিক মূল্যায়নে উদাসীন।

১৯০৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২১শে ফেব্রুয়ারী অক্সফোর্ডের নায়ক বিপ্লবী রাসবিহারী বন্দু জার্মানে জাপান-বাসী ভারতীয়দের ভারতের মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য ভারতীয়দের নিয়ে গঠন করলেন আত্মা হিন্দু ফৌজ।

১৯০২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব এশিয়াতে আত্মা হিন্দু ফৌজ গঠন করার সময় রাসবিহারী আহ্মান জানালেন 'যেদেশে ও বিদেশে ভারতীয় জাতিবৃত্ত, বিদগ্ধ একশ বৎসর বাবৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে আসছি, সহস্র সহস্র ভারতবাসী এই বিরাট সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ

করেছেন। কিন্তু অল্পের অভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারিনি। আজ আমরা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। আমরা এ সুযোগে ব্রিটিশের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করি।'

১৯০৩ সালের ১৩ই জুন রাসবিহারী বন্দুর আহ্মানে জার্মানি থেকে নেতাজী টকিহোতে পৌঁছেন। ৪ঠা জুলাই সিল্লপুর্ মহাদানে ৫০ হাজার ভারতবাসীর এক বিরাট সভার রাসবিহারী বন্দু, সুভাষ চন্দ্র বন্দুকে নেতাজী সম্বোধন করে আত্মা হিন্দু ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে বরণ করেন এবং ঘোষণা করেন আমি বিশ্বাস করি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সংগ্রাম বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে। নেতাজী রাসবিহারী বন্দুকে আত্মা হিন্দু সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। আত্মা হিন্দু ফৌজও ২১শে ফেব্রুয়ারী অক্সফোর্ডের জাতীয়তা স্বেধ ও ত্যাগের আদর্শে সংগঠিত হয়েছিল। আত্মা হিন্দু ফৌজের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ভারতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও জনতার মধ্যে প্রচলিত আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সৈন্যদের ও জনতার মধ্যে বৈপ্লবিক বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। ইংরেজ প্রমাদ গণগণন, শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হল ইহা ভারতের শেষ গবর্নর জেনারেল ও শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের নায়ক লর্ড মার্টিনবেটনেরও উক্তি। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের অবলান ও আদর্শ যথামোগ্য স্বীকৃতি না দেওয়ার ফলে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী-দের আদর্শে স্বাধীন ভারতের জনগণের জাতীয়তা-বোধ দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্ভূত হল না। নেতাজীও আদর্শ মানবিকতা বোধ জাগাইয়া তুলতে ব্যর্থ হলেন, স্থান নিল আত্মপ্রসাদ ও আত্মস্থ ভোগ, সর্বস্বের নানা দিকে অবক্ষয়ের পথে পথক্ষেপ (বাকী অংশ ১৫ পাতায়)

আফগানিস্তানের রুশ-ফৌজের উপস্থিতির কারণ

॥ কলীপদ সরকার ॥

ই-বেষ্টিত পাকিস্তান দেশ আফগানিস্তানকে ঘিরে আছে ইরান, সোভিয়েত রাশিয়া এবং পাকিস্তান। এ দেশে রেলপথ নেই, নেই পণ্যবাহী নদ নদী। কৃষি ও শিল্পসমৃদ্ধ নয় আফগানিস্তান। তবুও হিন্দু কৃষকের পাদদেশে শরান ক্ষুদ্র দেশটি কিন্তু ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ইংরাজদের আমলে আফগানিস্তান বহুকাল ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ স্বাধীন রাজ্যের হুমিকা পালন করে এসেছে, তবে বেশির ভাগ সময়ই আফগানিস্তানের উপর প্রভাব চালিয়েছিল ব্রিটিশ। ইংরাজ কর্তৃক ভারতবর্ষ অধিকারের পূর্বে ভারতীয় চুবুড়ার উপর হতগুলি বহিরাক্রমণ ঘটেছে তার সবগুলিই হয়েছে আফগান রাজধানী কাবুলকে পাশহুমি করে। তাই আফগানিস্তানে রুশ ফৌজের অবস্থিতি নানা কারণে পাকিস্তান ও ভারতের উদ্বেগের কারণ। চৌত্রিশ বছর আগে কড়াট লর্ড ওয়াডেল ভারত-বিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, বৃহৎ শক্তি রাশিয়া এবং চীনের দ্বারা ব্যতিত ভারতের এই ধরণের বিশদের কথা জেরের সঙ্গে বলেছিলেন।

কাবুলের নবগঠিত কমিউনিষ্ট সরকারের আনুগত্যে, আফগান-রুশ মৈত্রী চুক্তির শর্ত অনুসারে, বিগ্রহে দমনে সাহায্য করতে, রুশকোজ আফগানিস্তানে এসেছে ঠিকই এবং রুশ সরকারও বলেছে যে, প্রয়োজন শেষ হওয়া না হলে রুশ ফৌজ আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে। তাহলেও বিবর্তিত যত দক্ষ মনে

হয়, কার্যতঃ তা কিন্তু নয়। বিষয়টি বেশ জটিল এবং ঘটনার পরিণতি কেনে দিকে মোড় নেবে তা এখনি বলা শক্ত।

আফগানিস্তানে রুশ ফৌজের অধিপত্য বিস্তারকে কেবল সীমান্তবর্তী এলাকার উপজাতি ও কমিউনিষ্ট বিরাোধীদের দমনের ক্ষমতা, এ কথা কিন্তু সর্বাংশে সত্য নাও হতে পারে। সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের পিছনে আছে খুব সম্ভব ইরানের উপর সম্ভাব্য মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রতিরোধ কৌশল। ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপর্যয় ও নিগ্রহ ভিয়েতনামের সহিত তুলনীয়। কিন্তু ইরানের তেল না হলে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের চলে না, সে কারণে ভিয়েতনাম থেকে গুরুত্ব বড় ইরানের। যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক-বুল এখনো ইরানের হাতে কলী, তাঁদের ভবিষ্যৎ সীতিমত অনিশ্চিত। এ ধরণের পরামর্শকে বিশ্বশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব করা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে বহু মার্কিন রণতরী, বিমানবাহী জাহাজ ও নৌসেনা পারস্য উপসাগরে ঠিক ইরানের নাকের ভগ্নার উপর জমায়েত হয়েছে। তাদের পিছনে রণসম্প্রদায় সম্মিত হয়ে আছে ভারত মহাসাগর, কুমধাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরে টহলদার মার্কিন নৌ-বহরগুলি, দিয়েগো গারসিয়াস্কে মার্কিন সমর ঘাটি এবং হাওয়াই ও ওকিনাওয়া দ্বীপের রণরীতিবহর ও নৌবাহিনী। তাছাড়া আছে জাপান

অবস্থিত মার্কিন সামরিক বাসিন্দাগুলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরে জাটো জোটের রাষ্ট্রগুলি, জাপান, মিশর, সৌদি আরব এবং পরোক্ষ চীন। পাকিস্তানকেও এতে মহাজোটের টেনে নেবার চেষ্টা চলছে। এই সংকটের মোকাবিলা করতে হলে ইরাককে অবশ্যই সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য চাইতে হবে। ইরানের রাষ্ট্রনায়ক আয়াতুল্লা খোমেনি এখন পর্যন্ত পরিকারভাবে তাঁর নীতি বোষণা করেন নি, তবুও একথা বৃদ্ধে অসুবিধা হয় না যে, রাশিয়ার মদত না পেলে তাঁর পক্ষে মার্কিনী বন্দীদের এতকাল আটক করে রাখা কখনো সম্ভব হত না। ইরানের দক্ষিণাংশে রণতরীবাহিত মার্কিন সেনার আক্রমণ ঘটলে, সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে নীরব থাকা অসম্ভব। ইরাক রুশ সাহায্য প্রার্থনা করুক বা না করুক, রাশিয়াকে তার জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে উত্তর ইরানে কোঁজ পাঠাতে হবে। ইরানে এমন ঘটনা একাধিকবার আগেও ঘটেছে।

নৌ-শক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে পেরে ওঠা রাশিয়ার পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু রাশিয়া ইরানের হুমি সংলগ্ন দেশ বলে তার কিছু অতিরিক্ত ভৌগোলিক সুবিধা নিশ্চয়ই আছে। সেই সুযোগকে পরিসূরুপে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে খুব সম্ভব রাশিয়া ইরানের পূর্ব সীমান্তে আফগানিস্তানে সৈন্য সমাবেশ করেছে। ইরাক মার্কিনী আক্রমণ হলেই আফগানে সীমান্তে অবস্থানরত রুশ কোঁজ পূর্ব দিক থেকে ইরানে প্রবেশ করবে এবং কন্ডর আব্বাস মফল করে পারস্ত উপসাগরে প্রবেশমুখ হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করবে। তেমন কিছু ঘটলে মর্কিন রণতরী বহর ও নৌবাহিনী পারস্ত উপসাগরে আটকা পড়বে, যার ফল হবে সামরিক বিপর্যয়তুল্য। যুক্তরাষ্ট্র তাই এখন থেকে কল্য ঠিক করেছে, “রাশিয়া, সাবধান।

হরমুজের শিকে এগোলেই কিন্তু যুদ্ধ।”

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ এই কারণে আফগানিস্তানে রুশ কোঁজের অবস্থিতি নিয়ে পুৰ্ব্বো-যাপী দৈ চৈ আরম্ভ করেছে এবং বেশ কঠোর মনোভাব নিয়েছে। নতুবা হাজারী কিংবা চেকো-স্লভাকিয়ার ক্ষেত্রে রুশ কোঁজের অভিবানকে তারা যে দৃষ্টিতে বিচার করেছিল, আফগানিস্তানের বেলাতেও তারা তাই করত। অপর পক্ষে বলা যায় যে, সোভিয়েত রাশিয়ার আফগানিস্তান বা পাকিস্তানে অধিকার স্থাপনের কোন উদ্দেশ্য নেই। রাশিয়া আফগান রাষ্ট্র আক্রমণ করে নি, কিংবা পাকিস্তান সম্পর্কেও তার সে রকম অভিসন্ধি না থাকাই সম্ভব।

পাকিস্তান সাম্প্রতিক রুশ-মার্কিন বিরোধকে নিজেদের সামরিক ও আর্থিক শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ বলে বেছে নিয়েছে। পাক রাষ্ট্রপ্রধান মিঃ জিয়াউল হক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বলেছেন—“পাকিস্তানকে বাদ দিলে, ভিয়েতনাম থেকে হুকি পর্যন্ত বিশাল ভূভাগে আমেরিকার হবে কণা বলে এমন এক ইকি স্থানও নেই।” যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে যে, সে পাকিস্তানকে প্রচুর অস্ত্র তো দেবেই এবং ১৯৪৯ সালে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সব কিছু এবং প্রয়োজন হলে মার্কিনী সৈন্যবাহিনী পাঠাবে পাকিস্তানের সাহায্যে।

পাকিস্তান সীমান্তে বিরোধী আফগানরা আগ্রহ নিয়েছে এবং সেখান থেকে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তারা আফগান সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। এই হল পাকিস্তান ও আফগান সরকারের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধির কারণ। শোন। যাচ্ছে, পাকিস্তানে একটি পান্টা আফগান সরকার গঠনের চেষ্টাও চলছে। তেমন কিছু ঘটলে, পাক-আফগান

সম্পর্কের আরো অবনতি হবে এবং আকস্মিক মিত্র রাশিয়ার সহিতও পাকিস্তানের খোলযোগ বাধবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। হয়ত এমন কিছু একটা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। তা করতে পারলে তত্ত্ব অফলে একটি পা রাখবার ঠাই সে পেয়ে থাকে। তবে জেনারেল জিয়া মার্কিনী ক'রে জড়িয়ে পড়বার লোক মন বলেই ভাবতে হয়। তিনি বলেছেন, 'জলে বাস করে তিমিরের সঙ্গে শত্রুতা করা পোষায় না।' অবশ্য কাকতালে তিনি পাকিস্তানের অন্তর্ভাগ্যকে কাণায় কাণায় ভরে তুলতে যে চাইবেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

পাকিস্তানের অস্থলশক্তির অভিবৃদ্ধি নিম্নলিখিত ভাবে গুরুতর উদ্বেগের হেতু হতে বাধ্য। এই উদ্বেগের হেতু অতীতের অভিজ্ঞতা বারা পরোক্ষিতও। আমেরিকার অস্ত্র সাহায্যে বলীয়ান হয়ে পাকিস্তান ১৯৬৪ সালে কচ্ছের রাণ এলাকা আক্রমণ করেছিল, প্যাটন ট্যাংকের ঢালাও সরবরাহ পেয়ে পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে ভারতের অজমীর কাশ্মীর অধিকাংশেরে বুক বাধিয়েছিল এবং আমেরিকার বোমা ও দঙ্গী বিমান সাহায্য পেয়ে, ১৯৭১ সালে ভারতের বিমানক্ষেত্রগুলির উপর বোমা বর্ষণ করে একটা বড় রকমের ক্ষতির সূচনা করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে যে, পাকিস্তানকে সে যে অস্ত্রপাতি দিচ্ছে তা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু এমন প্রতিশ্রুতি আমেরিকা পূর্বেও দিয়েছিল। পাকিস্তান সে প্রতিশ্রুতি মানে নি, আমেরিকাও প্রতিশ্রুতি

ভঙ্গের বিহিত করে নি। সুতরাং আমেরিকার এই প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই।

ভারতের সঙ্গে আকস্মিকস্থানের মৈত্রী-সম্পর্ক বর্তমান। সে শেষে রুশ মৈত্রীদলের উপস্থিতিতে ভারত সমর্থন করেনি, কারণ বিশেষী সামরিক হস্তক্ষেপ একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। পশ্চিমের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি বিচার না করে ভারত একতরফা ভাবে রুশকৌজের প্রবেশকে নিষাধ করে নি। ছোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে ভারত সরকার তার নীতি ঘোষণা করেছে। সেই সঙ্গে ভারত সরকার উদ্ভূত জনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক প্রয়াসও অব্যাহত রেখেছে। সেই প্রয়াসের সাক্ষ্যেরে দৃষ্ট উৎকর্ষিত বিশ্বাসী ভারতের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে।

ভারত সরকারের পিছনে আছে বিরাট দেশের জাগ্রত জনমত, লোকসভার সরকার বিরোধী সদস্য-গণও সরকারের ঘোষিত নীতিকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু আশ্চর্য বোধ হয় যখন দেশের কিছু পরকৃতিক নির্লক্ষের দ্বারা বলে যে, তারা আকস্মিকস্থানে রুশ কৌজের প্রবেশকে তো সর্বতোভাবে সমর্থন করছে, এমন কি ভারতে রুশ কৌজ চুকলে তাদের তারা স্বাগত জানাবে। এদের সম্বন্ধে সতর্ক হবার যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে নিম্নরূপে।

যে আগুনে মেঘ পশ্চিম এশিয়ার আকাশ চেয়ে ফেলতে চাইছে, তা থেকে ভারতকে সতর্কতার সঙ্গে গুরু রাখা এবং আকাশ যাতে আবার প্রশান্তি নীলিমায় ভরে উঠে তার জন্য কাজ করে যাওয়া হবে, ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির বর্ণাঙ্গ লক্ষ্য।

বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হ'তে পারে কি ?

ত্রিবেদীর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানে কণ সৈন্তের প্রবেশ ও অবস্থিতি বিধে চ'ক্কা পড়ি করছে। আমেরিকা বৈধাচার্য হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে কূটনৈতিক প্রতিনিধি যাত্রকং কণ আশ্রয়নের বিকল্পে সেই সেই রাষ্ট্রের প্রতিবাদ জানাতে সচেষ্ট হয়েছে। এক্ষিকে, আর অন্যর দিকে পাকিস্তানকে কোটি কোটি ডলারের সামরিক সাহায্য দিতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার নতুন দোস্ত চীনও পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র ও অস্ত্রাভিযন্ত্রাদি সাহায্য দিতে আগ্রহ করেছে। কলে পাক-আফগান সীমান্তে পাকিস্তানী ও কণ সৈন্তবাহিনী পরস্পরের ওপর আক্রমণ ও প্রতি-ব্যক্রমণ করার অস্ত্র প্রতীকার, হত্মের অপেক্ষার। ভারত মহাদেশের ও অন্তর আমেরিকার সামরিক তৎপরতা ক্রমবর্ধমান। একই ভরণের কনকরণতা তাই পাকিস্তানেও পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার কূটকৌশলের বলি পাকিস্তান-রাষ্ট্র ও অন্তর ইসলামী রাষ্ট্রগুলি একজোট হয়ে ঐক্যমিত সাধারণ প্রতিরক্ষার দ্বা তুলে সংঘর্ষ হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, আমেরিকার অভিভাবকত্বে ও রাশিয়ার বিকল্পে। এই সার্বভৌম অবস্থায় ভারত মিষ্টি ও হীনবল হয়ে বলে থাকতে পারে না কোনক্রমেই। দিমলাচুটি অহুসারে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে এই অবস্থায়ও বহুত্বপূর্ণ প্রয়োজনিতর সম্পর্ক রেখে চলছে। ভারতীয় সীমান্তের কাছে পাক সৈন্তের কোনোকোন অব্যাবহিক বা বৈধমূলক তৎপরতা অস্বস্তি এখনও দেখা যায়নি বলে সাধারণে প্রকাশ।

আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক ও অবৈধনৈতিক সাহায্য হিসাবে চ'লন গোটি ডলার সাহায্য পাঠাবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সেই সাহায্য পাঠানও শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকার মধ্যস্থতাও সৌ হ় আরও থেকেও পাকিস্তান

দেশ উত্তরবাহো সাহায্য পাবে। টাইমস অফ লন্ডন কালু থেকে যে ববর শেষ তাতে প্রকাশ যে, 'সত সত আফগান রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধীতে রাশিয়ার আটকে রাখা হয়েছে।' আর প্রকাশ পাওয়া যায় রাশিয়া থেকে চোরগণের আসা এক শব্দে ! চিঠিটি লেখেন আফগান শিল্প সম্প্রদায়ের একজন বখীর মোস্তা, যাঁকে ১৯৭৮ সালে আফগান বঙ্গবীর পর রেপার করা হয়।' টাইমস-এর সংবাদপত্রতা রবার্ট কিম্ব্ কালু থেকে উপরোক্ত সংবাদ লওনে পায়নি। পাকিস্তান 'ভার্টো'র সঙ্গে সব সম্পর্ক-চ্ছেদ করে মুসলিম বেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও একত্র হয়ে চলে, তবে বহুভাষ্যদ্র চীনের সঙ্গে তার গাঁটস্থতা টিকই রাখা থাকবে। ইসলামাবাদে ৩-শে আগস্টেরী তারিখে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিহাউল হক আমেরিকার প্ররোচনায় সচেতন ঐশানিও সাধারণ প্রতিরক্ষার কথা তোলেন যেহেতু আফগানিস্তানে সোভিয়েট ইনকুপেশনের তলে বেশীর ভাগ মুসলিম রাষ্ট্র নিরাপত্তার অত্যাব দোষ করছে।

আফগানিস্তানে সোভিয়েট সৈন্ত প্রবেশ করার মুসলিম রাষ্ট্রগুলি বিশেষ পংকিত হয়, ফলে তারা বৌধ বিবৃতিতে রাশিয়ার বিক্ষে সাবধান দাবী উচ্চারণ করে, পা স্ত রক্ষার প্রয়োজনে। ইসলাম দেশগুলি এ ব্যবহ কোন বৃহৎ শক্তির বিক্ষে এরপ কঠোর মতব্য করেন। ইরান তেওল যাকিন সাম্রাজ্যবাদীকে বিক্ষেই কঠোর সমালোচনা করছিল এতদিন, কিন্তু সেও এবার কমিউনিষ্ট ও প'ক্ষীয় বৃহৎ শক্তিগণের বিক্ষে সমান সাবধান ও সতর্ক থাকার কথা বলেছে। আমেরিকা ও রাশিয়া, এট দুই বৃহৎ প'ক্ষের রাষ্ট্র তাদের আগের ও আগরণে বিশ্বের অন্তর্য রাষ্ট্রে চোখে বিশদ্রবনক বলে প্রতিভাত হচ্ছে রাশিয়া আফগানিস্তানে সৈন্ত পাঠিয়ে যেমন



বিশ্ব পরমাণু বুকের এক ভাগের আধাখণ্ডই স্বাধীন রয়েছে, উক্ত আধাখণ্ডের ভাগের মহাংশেরে অবস্থিত 'মহাশোণ'। পাসিফি উপসাগ্রে তার সাধারণ ভূপটভাট বর্ণিত করে, পাকিস্তান ও চীনের উত্তীর্ণত করে ও বাইরের ঘাঁটি থেকে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সীমান্তের সিলসিলার সাধারণত ঘাঁটি থেকে আফগানিস্তানের উত্তরাংশে বিংশ শতাব্দীর ব্যাখ্যাত সৃষ্টি করে চলেছে। ছুটি বৃহৎ শক্তিই আজ বিশ্বের চরম বিপদের কারণ-বস্তুপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের প্রগতিশীল শ্রমজী ইচ্ছাশক্তি পাকিস্তানের চোখে ভাঙারো '৩০ তারিখে গ্রিহীত বলেছেন যে, 'বিশ্ব-পরমাণু বুকের দিকে এগিয়ে চলেছে।' তবে তিনি বাইরের স্বত্বকে পছন্দ করেন না এবং তা উত্তরণের বিক্ষেপেই প্রযোজ্য, কারণ একদিকের দ্বারা বা দোষী করতে তিনি নারাজ। তিনি তাঁর পিতার অল্পবয়সে ছোট বিরুদ্ধতার নীতি থেকে পরচাট নীতি প্রচারিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর সেটাই ভারতের পক্ষে সর্বোত্তম পন্থা বিশ্বের পক্ষেও বটে। ভারতের পরচাট নীতি যে অস্বাভাবিক সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। আমেরিকা মানা চলে গলে ও কোমল ভারতের ওপর চাল সৃষ্টি করতে তার হাতে আমেরিকার চাপে পড়ে ভারত রাশিয়ার বিক্ষেপে প্রতিবাদ লিপি পাঠায়; কিন্তু বর্তমান প্রগতিশীল শ্রমজী পাকী আমেরিকার হাতের পুতুল নয়, তাই তিনি বেশ বিজ্ঞ-জ্ঞানোচিত ব্যাখ্যা করেছেন উক্ত পরিস্থিতি। তিনি আমেরিকার বৃহৎ জিয়ার কাছে পা হিতে নারাজ, কারণ তিনি সনাক্ত জ্ঞাত আছেন যে বর্তমান ঠাণ্ডা লড়াই যে কোনও মুহুর্তে পরমাণু বুকের রূপ নিতে পারে এবং তা বিশ্ব শান্তির পক্ষে নিশ্চিত বিপদ-বস্তুপ। ইরান তার মৌলী ও সামন্ততান্ত্রিক স্বতন্ত্র নিয়ে আমেরিকার স্বাধীনতাকে কুসংগীত করেছে কিন্তু কাল হতে। ইরানকে আমেরিকা উচ্চ শিক্ষা দিতে সাহায্য করেন সোভিয়েটের উদ্যোগ করে, আর সোভিয়েট এখন আমেরিকাকে বৃহৎদূর থেকে আকর্ষণিতানে সৈন্য প্রেরণ করে ও তথ্য একজন সোভিয়েট তীব্রবাক্যকে কোমল রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে বদলাতে বদলা তখন আমেরিকার পক্ষে দীর্ঘ বাঁকা বাক্যে

লক্ষ্য হইয়া।

আমেরিকা সোভিয়েটের এটী ক্ষমতা বহুসত্তা বহুসত্তা করতে অস্বাভাবিক হওয়া বিশ্বের ছোট বড় অধিকাংশ রাষ্ট্রের স্বতন্ত্রতা এর প্রতিষ্ঠার মানসে ক্ষেত্র সৃষ্টিতে বাধ্যমান হয়। তার উদ্দেশ্য বিশ্ব-জনস্বত্বকে রাশিয়ার বিক্ষেপে প্রয়োজন বোধ তা কাছাকাছি করা যাতে রাশিয়ার বিশ্ব বুকের ভেতর আকর্ষণিতানে থেকে সৈন্য সন্ধির নিতে বাধ্য হয়, বিশ্ব-জনস্বত্বের নৈতিক চাপে পড়ে। এখনও পর্যন্ত চীন ও পাকিস্তান ছাড়া অল্প পৌন রাষ্ট্রই আমেরিকার কোলে চলে পড়েনি, তবে বহু মুসলিম রাষ্ট্র ইসলাম বিশ্ব—এই ভিত্তির ভুলে আমেরিকার কুট-কৌশলের কাছে পা হিতে এগিয়ে আসতে চাইছে। আমেরিকা ও সোভিয়েটের মধ্যে এ ব্যাপারে পারস্পরিক আশা, আশোচনা ও মত বিনিময় এখনই হওয়া বরকার, নচেৎ অদূর ভবিষ্যতে যে ভাবনা ও স্বাধীনতা কৃত্রিম বিশ্ব-বৃহৎ সংঘটিত হবে তাতে বিশ্বের, বিশেষ করে এশিয়ার লজ স্বাধীনতা লজ বহু উত্তরণশীল দেশ কংস প্রাপ্ত হবে, বিশৃঙ্খল লোক কংসের ভয় ও পরমাণু অস্ত্রের অস্বাভাবিকতা অস্ত্র।

ভারতও এই বিপদের হাত থেকে নিত্যর পাবে না, বহু ভারতের স্বাধীনতা হবে সর্বাধিক, কারণ তার উত্তর চীনদেশের দ্বারা, পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তানীনের দ্বারা, দক্ষিণ-পশ্চিমে পূর্বে আমেরিকার দ্বারা ও পূর্বে এশ-উত্তর পূর্বে চীন, বাংলাদেশ ও আমেরিকান বৈরত্বের পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা সমধিক, যদি ভারত রাশিয়ার ক্রকে যোগ দেয়। অপরদিকে যদি ভারত আমেরিকান ক্রকে যোগ দেয় তবে তার কিছু কন বিপদ হবেনা, কারণ তখন রাশিয়ার আর্থিক অস্ত্রের যোকাবিলা করতে হবে ভারতকে বা সত্যি আরো স্বাধীনতা কৃত্রিম। তবে ওরা ভারতের এই যে শ্রমজীপাকী তাঁর যোগ্যতা, স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা সম্বল করে ভারতকে উত্তরণ বিশ্বের হাত থেকে বদলা করতে পারবেন—সে বিষয় অস্বাভাবিক আছে। তিনি স্বাধীনতার চেষ্টা চালিয়ে বিশ্ব বৃহৎ শক্তিবর্গকে নিশ্চিন্তভাবে

যাচায়েত পারবে যে তুমিই বিশ্বজুড়ে সবদিক্ত কতি হবে
 পৃথিবীর, কেউই একা পাবে না। আরএব অস্ত্র সাংঘর্ষ
 কঠাট একা প্রয়োজন বিশ্বজুড়ে ও মানবতাব্যক্তি।
 জনগণের নেতৃত্ব কেউ নিবেশে নেতিই হিঁদ পাশি
 অস্ত্র তাতে পারে ন হিঁদে হুগি। শান্তির একমাত্র পথ
 হ'ল পরাম্পরিক সহনশীলতা ও সহ-অবস্থান, আর নেতৃত্ব
 কঠাট কিংবা সার্বিক বিশেষ দুঃখ শক্তির্গের তাতে সেই
 অবস্থান রাখার যোগ্যতম উপদায়িকতা, তাই তিনি
 শিখর স্বর্গরাসি মাংস লভ্যতাকে স্পর্শিত করে আবেদিকা ও
 শিখা উভয় দুঃখ-শক্তিকে বুঝতে লাগেই তখন যাতে
 তারা আর শক্তি মনস্ফুট অধীৰ হয়ে বিশ্বশান্তি বিস্তার
 না করে। মুছেব সংস্করণই যেহি ভীষণ মারাত্মক ও
 লোকজনস্বার্থী তা উভয় হাটুই ভাল মনে, আর সেই
 কারণেই তারা শরণ্য একতাই সমস্তোক্তার শিখর আলোকে
 চটাবে মন-বস্ত্রযোগ্য উচ্চ তাৎ ও আবেশের মনোভূতাব
 কাবল তাতে কেউ নিবেশেতার নেতি থেকে কিছুতেই
 বিচ্যুত হবে না। ভারত মহনশীলতা ও সহ-অবস্থানের
 নীতিকে বিশ্বাসী। তাহলেই নৈতিক শক্তিই বিশ্বজনন্যতাকে
 বিশেষ তাৎ প্রভাবিত করছে সক্ষম হবে, ফলে যে
 কলোয়েদেব দেখা দিচ্ছে তা ভবিষ্যতে শিখর অপ্রতিত
 হবে—এই বিশ্ব শান্তি। শ্রীমতী পাদীর দীর্ঘ শরণ্য
 এখাপারে সত্যতাই আশাশ্রিত করছে যে তিনি শিখর
 অস্ত্র নিবেশে যেনগুলির তাই প্রভাবের সহায়তায় ও
 শরণ্যার্থে উচ্চ দুঃখ শক্তির্গে সন্তুষ্টতাকে বুঝে পরিবর্তে
 শান্তির পথে চিহ্নিত আনন্দে পাঠ্যতম।

(৯-এর পাতার পর্বের অংশ)

মুক্ত হল—ইরার ক্ষেত্রে, ফরাসিতে ১৯শে ফেব্রুয়ারীর জাতীয়তা বোম্ব, নিচা ও ভ্যাগের আদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এটি নিক জাতীয় সচেতন নটি আটটি করার প্রচেষ্টা হবে ১৯শে ফেব্রুয়ারী স্বরণ করার সার্বজনীন। আমেরিকের মনে রাখতে হবে ১৯১৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারীর নত জাতীয় এরা ও সংকল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তি স্বপ্নগুলি জন্মানের কালে ধরতে না পারলে জাতির মূল্যবোধ সঞ্চে নয়।

● গত ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা মহাজাতি
সমনের অস্থি পরিষদের সভাপতিত্বে অমূল্যসিন
সমিতির পক্ষে মহাজাতি সমনে বৈদ্যবী মহানায়ক
রাসবিহারী বসুত নেতৃত্বে দাবা ভারত বাণিজ্য সমষ্টি
অধ্যাপক প্রয়াসের ড। তম স্বাক্ষর 'সবদ উপায়পত্রের
আয়োজন করেন। অধ্যাপক ঐতিহ্যপূর্ণ শঙ্কর সেন
শাস্ত্রী এই অফিসে সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের পূর্বমন্ত্রী অফিসে উত্তোধন করেন এবং
প্রাক্তন বিচারপতি ঐশ্বর্য প্রসাদ মিত্র প্রধান
অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই সমাবেশে
ঐতিহ্যপূর্ণ চন্দ্র দাস উপরে প্রকাশিত ভাষণ প্রদান
করেন।

যাৰলীয়া পেটৰ বায়ু, অম্ল, অজীৰ্ণ ও পেটৰ বেদনাক
অব্যৰ্থ ফলপ্ৰসূত

ଆମଲା ହୃତ ବୁଦ୍ଧାରୀ

ଆମ୍ଭଦେବନିୟ ଯତେ ଦେବତା

श्रुत्या ७, ६० एक प्राचिनम् अस्मत्

वाचस्पत्यः

ସିଆବନୀସୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

विद्यार्थी • छात्र • छात्रा • शिक्षक • शिक्षिका

বিপ্লবী বাংলার মালিকানা ও অন্যান্য

তথ্যের ঘোষণা ৪—

৪নং ফর্ম (৮ নং ধারা)

প্রকাশের স্থান—	৪নং বঙ্গভদ্র নাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭
প্রকাশের কাল—	সাপ্তাহিক
সূত্রকের নাম—	অনিল সেনগুপ্ত
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৪নং বঙ্গভদ্র নাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭
সম্পাদকের নাম—	শান্তিশরণ রায়চৌধুরী
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৪নং বঙ্গভদ্র নাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭
সহাবিকাশী—	বিপ্লবী পরিষদ
	৪নং বঙ্গভদ্র নাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

আমি অনিল সেনগুপ্ত, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত

তথ্য সব আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

ঐ অনিল সেনগুপ্ত

প্রকাশকের স্বাক্ষর

বিপ্লবী পুস্তকমালা

C/30

অমূল্য স্মৃতির বিপ্লব প্রকাশ—প্রবেশচক্র বাসের—০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—প্রবেশ মঙ্গলবারের—০.০০

কীর্তি কুমার দত্তের—

- | | |
|------------------------------------|---|
| ১। বাংলায় অসহযোগ—১.৫০ | ২। স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার বিপ্লব প্রবেশ—০.০০ |
| ৩। অমূল্য স্মৃতির শি, মিত্র—২.০০ | ৪। দোহাঙ্গী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০ |
| ৫। কাকারী শহীদ—১.২৫ | ৬। কলতা বাহার সংগ্রাম কাহিনী—৫০ |
| ৭। রাসবিহারী ও অমূল্য স্মৃতি—০.০০ | ৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেরে—৫০ |
| ৯। বিশ্বকামন্য ও সমাজবাদ—১.০০ | ১০। বিপ্লবী বিশ্বকামন্য—৫০ |
| ১১। মহাত্মা ও স্বাধীনতা—৫০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—১.৫০ |
| ১৩। দেশ বাসের ভোলেদি (১)—১.০০ | ১৪। দেশ বাসের ভোলেদি (২)—২.০০ |
| ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—৫০ | ১৬। ১০ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০ |
| ১৭। হাতিজ হত্যার প্রচেষ্টা—১.৫০ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অমূল্য স্মৃতি—৫.০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৫০ | ২০। লাট হত্যার প্রচেষ্টা—১.৫০ |

প্রাপ্তিস্থান :—১ম বঙ্গ বাস স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০০০৭

টেলগ্রাম :—১/১/১/A স্বাধীন চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলিকাতা-৭০

11 MAR 1980



—সম্পাদক দল—

শ্রীমতী প্রমীলাবাঈ (স্বর্গগতি) শ্রীমৎ চন্দ্র নন্দী, শ্রীমূল চ্যাটার্জী

—সম্পাদক—শ্রীমতি শরণ চার্যচৌধুরী

বিপ্লবী বিশ্বাস প্রতিনিধি—প্রবাসী বোম্বাই। বেংগাল—শ্রীমৎ গোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীমতি সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমৎ সোম।

বিপ্লবী বাংলা কাংগাল :—১ম বঙ্গ বাস স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক :—প্রিন্টিং শাখা, ১১৭ নং কেমব্রিজ সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিশ্ববী বাংলা



বিশ্ববী পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ
 প্রাপ্ত—১৯৪৬, 'বিশ্ববী বাংলা' মনোনয়ন—১৯৭৬

নবম বর্ষ	শনিবার ১লা চৈত্র ১৩৭৬ ১৫ই মার্চ, ১৯৮০	২৪ সংখ্যা
----------	--	-----------

এই সংখ্যায়



আবু গানিমান ও তারিখ

—সম্পাদক

ভারতে বিশ্ব আন্দোলনের ইতিহাস

—লেখক

অশ্বিন, অশ্বিন ও পীঠা—

ভগবানের এই ভিন পৃথকে

আমি পৃথকভাবে দেখি না।

—গান্ধী

আসাম ও মেঘালয়ে বিকিউমি ভোগেশ্বরের নামক এই বি. সি.
 যোনের বিবৃতির সাহায্যে

—লেখক

হাইড্রো ইলেকট্রিকের স্বতন্ত্রতা

—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাস

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশ্ব বনায়ন

আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ

আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এমনই একটা রূপ ধারণ করছে যে তার একটা সম্ভাব্যজনক ফলস্রোতি। যদি শান্তিপূর্ণ পথে না করা যায়, তবে তার ফলাফল শুধু আফগানিস্তানেরই বিশদ ভেঙ্গে আনবে না, সেটা সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই চরম অন্ততদায়ক হবে। এই সমস্যাটির উদ্ভব এক দিনেই হয় নি। বৃহৎ শক্তিগুলির দাবা খেলায়, এই অঞ্চলে একাধিপত্য বিস্তারের চতুর নীতির আড়ালে, তারা নিজ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। একটি বৃহৎ রাষ্ট্র অল্প একটি রাষ্ট্রকে শিকার দিতে চায় ও তাকে হীনবল করতে চায় এ অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে, কোন একটি শক্তি চায়, অল্প একটি দেশের উপর প্রতিহিংসাবূলক বাসনা চরিতার্থ করতে এই সুযোগে। সেজন্য তারা নিজের মতবাদকে বামাচাণা দিয়ে, নীতিগত ভাবে যার নীতি ও প্রশাসনকে বনতদ্রব্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে করে তার সঙ্গে হাত মिलाতেও কোন কুঠা বা বিধা বোধ করছে না। জায়, নীতি ও আদর্শবাদের কোন বালাই নেই। রাশিয়ার প্রভাব নষ্ট করে নিজেদের একাধিপত্য বিস্তারের মোহ এদের অন্ধ করেছে। কিন্তু নিজেদের মতলব হাসিল করতে চাইলেই শু সব সময় সম্ভব হয় না, বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। আফগানিস্তানের ভিতরে আধুনিকতা ও বর্ধতদ্রব্যবাদের যে দৃশ্য আছে তাকেও অস্বীকার করা যায় না। আফগানিস্তানের স্থলপথ বন্ধ করে দিবে পাকিস্তান যে তাকে রাশিয়ার শিবিরে ধরে দিয়েছে নির্বোধের মত কাজ করে, এ সত্যও অস্বীকার্য। এ সত্য স্বীকার করেছেন ভারতে নিযুক্ত হুতপূর্ব একজন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অকল্যানে বা, তাতে এখানে বিচ্ছিন্ন শক্তির একাধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনাকে রাশিয়া নীরব দর্শক হয়ে নেবে নিতে পারে না। নিজেদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের জন্যই এমন প্রচেষ্টাকে রাশিয়া বাধা দিতে বাধ্য। নিজেদের দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাই রাশিয়া বহু আগেই আফগানিস্তানের সঙ্গে অনাক্রম্য ও বিশদে সাহায্য করার চুক্তিতে আবদ্ধ। রাষ্ট্রসংঘে আটন সম্মত এই ব্যবস্থা। কাজেই বর্তমান আফগানিস্তান সরকারের আমন্ত্রণেই রাশিয়া সেখানে সৈন্য সমাবেশ করেছে বলে তাদের বক্তব্য বোধেছে। বর্তমান আফগানিস্তান সরকার যদি রাশিয়ার মতদর্শনে বিশ্বাসী হয়, তবে সেটা শু অপরাজনক হতে পারে না। এই মতদর্শনের বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ, এমন কি অভ্যয়ান চালাতে হয়, তবে সে অধিকার আছে একমাত্র

আফগানিস্তানের লোকসেব। পাকিস্তান, চীন ও আমেরিকার সেখানে নাক পলানোর কোন অধিকার থাকতে পারে না। পাকিস্তান তার হৃ-ষও বর্তমান আফগান সরকারের বিরোধীদের শিক্ষাশিবির করবে, চীন তাদের সামরিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে, আর আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্র টাকা কড়ি দিয়ে বর্তমান সরকারকে উৎসাহিত করবে এবং আফগানিস্তান সরকারকে একটি জীবদায় রাষ্ট্রে পরিণত করবে, এটা সকলে বিনা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে স্বীকার করবে, সেটা কখনো করাটা আর বাই হোক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। আফগানিস্তানের মৌল সমস্যা এইখানেই নিহিত। এ সমস্যা যে কোন চক্ষুমান ব্যক্তির নিকট পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত। এটা রাশিয়ার তরফ থেকে একতরফা কোন ব্যাপার নয়। এই অভিমত প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে এই প্রকার শক্তিস্থাপনের কৌশল ও কাজকর্ম বন্ধ করতে হবে। প্রত্যেক দেশকেই বুঝতে হবে যে যুদ্ধ হলে কারো মঙ্গল ও হেই না। কারো কারো অস্তিত্ব বিস্মৃতির সম্ভাবনাও আছে।

এই পরিস্থিতিতে 'যুদ্ধ দেখি' মনোভাবকে পরিত্যাগ করে, কোন সমস্যা থাকলে, বীর স্থির ভাবে আলোচনার মাধ্যমে সেটা সমাধান করতে হবে। পাকিস্তান, চীন ও আমেরিকা খোয়া বুগদীপাতা আর বত দেব রাশিয়ার এই প্রচারা সমস্যার কোন সমাধান হবে না, বরং একে জটিলতর করে তুলবে।

ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গা সংক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে নীতি অবলম্বন করেছেন সেটা বাস্তবত্বসূচক এবং সঠিক। যে সব আমেরিকাপন্থী মানুষ চান্দের যে ভারত এই মুহূর্তেই রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুক, তারা ভ্রান্ত। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব দীর্ঘ দিনের এবং আন্তরিকতা ও সন্নিহিত উপর প্রতিষ্ঠিত। বিগত দিনে ভারতের শত্রুদের বিরুদ্ধে রাশিয়া প্রবর্তক সাহায্য করেছে এবং বিপদ তুলে করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাশিয়ার অবদান যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এমন কোন কারণ বটে নি যে মূর্খের মত সেই বন্ধুত্বকে লুপ্ত করা যায়। কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের সময় ঐক্য সাধনের ভিত্তির উপর। অন্ধ সাধারণভাবে এক দেশের উপর দেশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের নীতির বিরুদ্ধে পরিত্যক্তভাবে ভাবের জটিল রয়েছে। আমেরিকা, চীন ও পাকিস্তান ভারত সম্বন্ধে অত্যন্ত যে সব কাজ করেছে, তাতে তাদের সত্যতার বিশ্বাস করার যুক্তি নেই। ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করতে আমেরিকা পাকিস্তানের মাধ্যমে চেষ্টা করেছে। চীন ও এখনও ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করে আছে। সুতরাং তাদের অস্ত্রের কাজকে সমর্থন করে তাদের বাধিত করার কোন প্রসঙ্গ উঠতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পক্ষে ছোটনিরপেক্ষ নীতি অগ্রযাত্রা বিধে আসন্ন যুদ্ধ-সম্ভাবনাকে সৈকিতে রাখার জন্য সর্বশক্তি, বিচার বুদ্ধি ও প্রজাব বিস্তার করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। কারণ এতে আমাদেরও বার্ষিক বিশেষভাবে ক্ষতি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিপদ ঘনায়মান

শ্রীবাংলাধর বন্দ্যোপাধ্যায়



বৈরী নাগাদের অবিসংবাদী নেতা উগ্রপন্থী
কিজো এখন প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।
নাগাল্যান্ডের বিদ্রোহী কেডায়েল নেতারা ফিজোর
বিনা অনুমতিতেই শিলং চুক্তি সই করেছে।
বর্মার যে সব চরমপন্থী নাগা কিজোর সমর্থক ছিল
তারাও এখন বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। কিজোকে
ছেড়ে হালি চীনপন্থী নাগা-নেতা মুইভার প্রতি
ভাষা আন্দোলন প্রকাশ করেছে বলে সংবাদে
প্রকাশ। মুইভা ও পি, এল, এ-র নেতা বিশেষ
কটর মাওপন্থী। মুইভা বিচ্ছিন্নতাবাদী এক
সংস্থা গড়েছে, যার নাম—নাগাল্যান্ড, আসাম
মিজোরাম, মণিপুর অ্যাণ্ড ত্রিপুরা অরগানাইজেশন।
এই সংস্থার চেয়ারমানে মুইভা নিজে আর সম্পাদক
ভারই এক অনিষ্ট ব্যক্তি সেনা নাগা বৈরী নেতা
আইজাক মো। মুইভা ঘোষণা করেছে যে, তারা
আর নাগা জাতীয় পরিষদ ও কেডায়েল গভর্নমেন্ট
অক নাগাল্যান্ড এর কোন অস্তিত্ব বর্তমানে স্বীকার
করে না। মুইভার এই নতুন বিচ্ছিন্নতাবাদী
সংস্থা স্বীকার করেছে যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুক্তি
যুদ্ধে তারা চীন থেকেই কেবল সাহায্য নেবে।
অন্য কোন শক্তির সঙ্গে তারা যোগাযোগ রাখবে
না। তবে মূল আসামের কিছু লোকের সঙ্গে নাকি
যোগাযোগ রয়েছে ও ভবিষ্যতে চলবে।
সংবাদে প্রকাশ কিছু কিছু অসমীয়া যুবক নাগাল্যান্ড,
মণিপুর, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে নাকি বিদ্রোহীদের

সঙ্গে যোগাযোগের সক্রিয় চেষ্টা চালাচ্ছে।

১৯৬৯ সালে মুইভা চীন থেকে আনা ৪৪টি
বিশেষ ধরনের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল মাওপন্থী কোন
গোপন অসমীয়া সংস্থাকে উপহার দিয়েছিল বলে
সংবাদে প্রকাশ। দালভেতার অজ্ঞাতনামা বেল
কিছু উগ্রপন্থী মিজো বিদ্রোহী মুইভার সঙ্গে যোগ
দিয়েছে বলে জানা গেছে এবং তারাও মাওপন্থী।
ত্রিপুরা থেকে কোন মতে এদের সঙ্গে যোগাযোগ
রয়েছে চলছে তা সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি।
তবে ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম ও
নাগাল্যান্ডের লোকেরাই যে এই সংস্থার দলে ভারি
তা জানা গেছে। এরা মূলতঃ উগ্র চীনপন্থী এবং
ভারতবাসীদের বৈরী বলে সন্দেহ করার ব্যতীত কারণ
আছে বলে সংবাদে প্রকাশ। আসাম আজ যে
বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকারে পরিশ্রান্ত হয়েছে তার
মূলও মুইভা ও তার বিনেশী পৃষ্ঠপোষকদের বিশেষ
হাত আছে বলে নাকি জনশ্রুতি। ভারতের
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল আজ বারুদের তূপের ওপর
অবস্থিত। যে কোন সময়েই দারুণ বিক্ষোভ
ঘটিতে পারে ওখার। আসাম, মেঘালয় ও সম্ভ্রান্ত
এলাকায় যে বিনেশী হস্তক্ষেপ চলছে বেশ কিছু
কাল ধরে তা বর্তমানে তীব্রতর বাঙালী বিতাড়ন,
বাঙালী হত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠরাজ ও শিশু নারীর
ওপর অমানুষিক অত্যাচার থেকেই সহজে অনুমেয়।
বিস্মৃতি চক্রান্ত চলছে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং

এর মূল সম্ভবতঃ চীনে প্রোথিত। মিশনারীরা বহুকাল ধরে পাহাড়ীরা এলাকার, উপজাতি অধুষিত এলাকার ও আসামের সমতল ভূভাগে ভারত বিরোধী চক্রান্তের বীজ বেশ দক্ষতার সাথে ও ধর্মের আড়ালে নুকোশলে বপন করেছিল। সেই বীজ থেকে যে বিচ্ছিন্নতাকামী মহীতর এত দিনে জন্মেছে, তা আজ পদে পদে বিপদ থেকে আনছে, ভারতীয় একা ও জাতীয়তাবাদকে প্রাণনই কোশলে ধ্বংস করে তা সত্যই স্তম্ভর ও চরম ক্ষতিকারক। আসামে যে সব রাজনৈতিক দল বর্তমান আসামের খোলা জলে ছিপ ফেলে বড় কিছুই আশার অপেক্ষারত তারাও মোটা রকম ধোকা খাবে। অশান্ত আসামকে আরো অশান্ত ও বিপজ্জনক করে বাড়া বাগলে কার লভ? অসমীয়াদের, নাগাদের না চক্রান্তকারী বিদেশী চরদের বাবা আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল অজোয়ান, ত্রিপুরা ইত্যাদি এলাকার, এক কথায় সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থানীয় বিদ্রোহীদের দ্বারা পঞ্চমবার্ষিকী গঠিত করে ভারতবর্ষকে দুর্বল করে দিতে চাচ্ছে তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যা সমগ্রভাবে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের পক্ষে আহার্যক রকমেই ক্ষতিকর। অসমীয়া ছাত্র যারা এখনও জানে না কণের অঙ্গুলি হেলনে তারা নিজেদের বাসভূমিকে কলঙ্কিত করছে অথবা, কুল ধারণার বশবর্তী হয়ে। অসমীয়াদের অসমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার হয়ে বহু ব্রিগ ব্রিগ বহুরে বসবাসকারী বাঙালী পরিবার আজ ছিন্নমূল হয়ে আসাম থেকে চলে আসতে বাধ্য হইতেছে। এর বিষময় কুফল কলতে শুরু হয়েছে এখনই কাকপ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছেই। তাড়াতাড়ি আসাম থেকে আলাদা করে একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করার দোরদার দাবী উঠতে ইতিমধ্যেই।

এরপর আরো বহু এলাকা যেখানে অসমীয়ায় সংখ্যা লঘু, সে সব এলাকাও আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে, বাঁচার তাগিদে কারণ আসামের বর্তমান আন্দোলন কোন জ্ঞানবান নিরপেক্ষ মানুষই কিছুতেই সমর্থন করতে পারবে না; কারণ এ আন্দোলন পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ও ভুল তথ্যের ভিত্তিতে পারিচালিত, উপরোক্ত মিশনারী ও বিদেশী রাষ্ট্রের চক্রান্তকারীদের দ্বারা প্রভাবিত।

মিশনারীরা বিগত ষাট সত্তর বছর ধরে পাহাড়ীদের সাথে সমতল ভূমির বাসিন্দাদের কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে ভারতের অখণ্ডতাকে নষ্ট করে ভারতের স্বাধীনতাকে বেশ পেছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। এবারে যে উপপাত আসামে গত কিছুকাল ধরে মাথা চাড়া দিয়েছে তাও বিচ্ছিন্নতাবাদের আর এক অবদান, তবে, নিকট ধরনের ব্যাপার এটি যা সকলেই এখন স্বীকার করবেন। অসমীয়ায় কত বছর আগে আসামে এসেছে? ইতিহাস তার সাক্ষ্য দে কথ। বলে যা নিরূপণ :-

প্রায় সাত-আট শত বছর পূর্বে বাঙ্গাল (ব্রহ্মদেশ শাসন) রাজ্য থেকে যারা আসামে এসে বসবাস শুরু করে তাগেই 'অহম' সম্প্রদায়ের মাত্র এবং পরবর্তীকালে অহমিয়া বা অসমীয়া বলে পরিচিত হই। তাদের বহুপূর্বে আসাম উপত্যকার বহু আদিবাসীদের বসবাস ছিল তথ্য, একথা অসমীকাথা! আসামের 'বড়ো' সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা এখানে আদিম বাসিন্দা বললে ঠিক বলা হই। আর আসাম বৃহত্তর বঙ্গভূমির উত্তর পূর্বাঞ্চল, এলাকা ছিল লর্ড কালকনের লাটগিরির প্রায় বিশ বছর আগে। বাঙালীরা আসামকে বৃহত্তর বাংলার এক কীকা পাহাড়ীরা অঞ্চল বলে জানতো

তাই তারা দলে দলে আসামে বসবাস আরম্ভ করে প্রায় হাজার বছর আগে থেকে।

বর্তমান আসামের উত্তরপূর্ব সীমান্তে বাঙালীদের অবস্থান প্রচুর ও উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের আদ্য আসাম ব্যাপারে দৃঢ় হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়েছে ভারতীয় একা ও সংহতি রক্ষার ক্ষরী প্রয়োজনে। আসাম যে পথে চলতে চায় তা ভারতের পক্ষে বিপদজনক। ত্রি:সাতক আন্দোলনের পিছনে যে চরুর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত আছে তা আঙ্গ পরিষ্কার, নচেৎ ইউনাইটেড স্টেটস, অঙ্গ আসামের কথা প্রচারিত হয় কেন? ভারত রাষ্ট্রের অধীন একটা ক্ষুদ্র অঙ্গ রাজ্য আসাম—তার এই প্রকোপিত বিদ্রোহের শ্রবণ ধনিত হয় কেন? নিকোবাদের দল আবার বাধীন আসামের ডাক দেবার মত সাহস ও মনোবল পায় কোথা থেকে ও কাদের সাহায্যে? তাদের পক্ষে বার করে কেন্দ্রীয় সরকার কেই শায়েস্তা করতে হবে, দেশের অবস্থা রক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তায়। সাহিত্য ও একা পদে পদে আসামে বিস্তৃত হয় কেন? আসামবাসীদের এর কৈফিয়ত দিতেই হবে।

আসামকে এভাবে বেচ্ছাচারী ও বিভেদকামী রূপে দেখতে চাই না। আসামে যে মারকীর ঘটনা চাষ ঘূবকা ঘটিয়েছে, বিদেশী বার্গের সংরক্ষণে, তা নিশ্চাই এক চূষণজনক সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আসামে বসবাসকারী বাঙালীরা, বিশেষ করে হিন্দুরা, অঞ্চল আজো কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিতে পারে নি কেন? সমগ্র রাষ্ট্রে যে, অদলদল বিভেদকামী আন্দোলনের দ্বারা বারে বারে ক্ষতিগ্রস্তকারে অবস্থা বাধা হচ্ছে, সে অজ্ঞায় আন্দোলনকে হুঙ্কার করে দেওয়া কি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মত কর্তব্য নয়, জাতীয় বার্গে ও সংহতি সংরক্ষণে? তবে কেন কেন্দ্রীয় সরকার এখনও এর

প্রতিকারের সম্ভাব্য সকল ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাতে যিহাগ্রহ? কি এম আসল কারণ? এ শুধু বাঙালী বিভাঙ্কন বা বাঙালী হত্যার ব্যাপার নয়, এর গভীরে শুভাঙ্গসংধান করলে ব্যাট্ট বিভাঙ্গ কৃত্তে ও জানতে পারবে যে এর তলে তলে কি কিরাট কৃত্তম্ব ও ভারত রাষ্ট্রের সামগ্রিক ক্ষতি সাধনের ক্ষমত বিদেশী রাষ্ট্র নারকরা ও বিদেশী শক্তির বাহিনীর কৌশলীরা কিরূপ ছদ্মবেশে ও ছদ্ম উপায়ে কর্তৃত্বপর বা দেশের পক্ষে চরম বিপদজনক। এর ফলে বহু কষ্টাক্ষিত বাধীনতাও যে আজ বিপর্যয় হতে পারে, তাও কি প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করে দেখছেন না? তিনি এ ব্যাপারে এখনও বোধ হয় সঠিক সংবাদ পান নি। বুঝি সতর্ক হয়ে এখন উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ভাল ভাবে তত্ত্বাচালনা চলতে হবে, যাতে ভারতের পক্ষে বিপদ জনক যে সব বড়বড় ওপায়ে চীনের সাহায্যে দানা বাঁধছে তত্বে আন্ত প্রতিকার সংক্ষেপে ক্রম সমাধা করা বাস্তবে সম্ভব হয়।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আসাম—মেয়ালর ও তৎসম্বিত অঞ্চলগুলি সুরক্ষামনে তত্ত্ব কবে দেখা ও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে তৎপর হতে হবে, নচেৎ অচিরে সমগ্র বিপদ মাথা চাড়া দিতে পারে বলে গভীর আশংকা হয়। আসামে যা অবস্থা, বিশেষ পেট্রোলিয়াম ক্ষাত তৈল নিকাষণে ও বিন্ধ্যিকরণে তা যদি অতো কিছু কাল এভাবে চলতে, থাকে, তবে সারা দেশ হাই স্পীড ডিজেল, কেরোসিন ও অক্ষত পেট্রোলিয়াম ক্ষাত প্রবাহ অভাবে পরিবহণের ক্ষেত্রে অচল অবস্থার পড়বে। ফলে বর্তমান উর্ধ্বমুখী জ্বায়ালা আরো উর্ধ্বগতিশীল হবে ও সাধারণ মানুষ চরম সংকটের বলি হবে অকারণ। সবদিক যত্নে দেখলে আসামের শ্রব ও হাটদের অসংকৃত ও বিভেদ-

ভাষাতত্ত্ব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ কীর্ত্তন ৮৮ ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বুদ্ধের পরে ভারতবাসীগণ যখন আশা করেছিলেন যে এবারে তারা স্বাধীন্যসনের জনমত অধিকার লাভ করবেন, তখন তাদের অধীনতার নাগপাশেই দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করবার এট নতন প্রচেষ্টা তাদের আরও ক্ষুব্ধ করে তুলল। ভারতবাসীর এট কোভ বিশেষভাবে পাঞ্জাব অঞ্চলেই আত্মপ্রকাশ করল। এর কারণ বিষমুখে প্রধানতঃ এই অঞ্চল থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। আবার ১৯১৫ সালে বৈয়বিক অত্যাধীন প্রচেষ্টাও এই অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা হরণ করেছিল। ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে নরটি বড়বন্দ্য মামলায় বহু পাঞ্জাবী ভরসের কীসী এবং কঠোর কারাদণ্ডের ফলে সমগ্র পাঞ্জাবে এক অগ্নিসর্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

এর ফলেই গান্ধীজী যখন ৩০শে মার্চ সত্যগ্রহ পালনের আঙ্গান জানালেন পাঞ্জাবের অধিবাসীগণ এ আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দিল। গান্ধীজী পরে হরতাল পালনের জারি পৰিবর্তন করে ৩০শে মার্চের পরিবর্তে ৬ই এপ্রিল ঘোষণা করলেন কিন্তু সে সংবাদ সমগ্র মত সর্বত্র পৌঁছবার আগেই পূর্ব ভারতবর্ষেই অনেক স্থানে হরতাল পালিত হল। দিল্লীতে বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হল। সভার শেষে হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত জনতা যখন দিল্লীর রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করছিল পুলিশ তাদের উপরে গুলী বর্ষণ করে। বহুলোক হতাহত

হয়। ৬ই এপ্রিল সমগ্র ভারতে বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালনে জনসাধারণের অতৃপ্ত আগ্রহ দেখা গেল। ভারত সরকার এ দেখে বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। ৯ই এপ্রিল পাঞ্জাবে ডক্টর সভা পাল এবং ডক্টর কিচলুকে গ্রেপ্তার করা হল। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১০ই এপ্রিল অমৃতসরে হরতাল পালিত হল। জনগ্রন্থ নেতাদের যখন অজ্ঞাত স্থানে অপমারিত করা হকিল পিছনে পিছনে জনতা রেল ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পুলিশ তাদের হতভম্ব করবার জন্য দুবার গুলী বর্ষণ করে। এর পরে ক্রুদ্ধ জনতা কয়েকটি সরকারী অফিস পুড়িয়ে দেয়। ১১ই এপ্রিল সরকার শান্তি বক্ষ্যন্ত অমৃতসর শহরে সৈন্য মোতায়েন করেন। শান্তি বক্ষ্যন্ত ভার কেন্দ্রবলে ভারতের উপর অগ্নিত হল।

সকল প্রকার সভা সমিতি নিষিদ্ধ করে ১২ই এপ্রিল এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হল যেটো কিন্তু অনেক লোকেরই সে সহ্যে কিছু জানতে পারল না। এর আগেই স্থির হয়েছিল যে ১৩ই এপ্রিল ডক্টর কিচলু এবং ডক্টর সভা পালের মুক্তির দাবিতে জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই প্রায় দশ সহস্র মুসলমান ও শিখ জনতা জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে সমবেত হল। জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রকৃত প্রস্তাবে একটি ক্ষুদ্র বাগান—চারদিকে বড়

কড় প্রভুর নিমিত্ত গৃহ দিবে বৈরা। বাওরা-আসার
একটি মাত্র পথ। সে পথে ছই তিন জনের বেশী
যেতে আসতে পারে না। সভার নিষিদ্ধ সময়
চারটার আগেই সভার স্থল জনপূর্ণ হয়ে পেল।
কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনারেল সশস্ত্র সৈন্যদল নিয়ে
উপস্থিত হলেন। জনতাকে তিনি ভৎসনাৎ
হুজুত হবার নির্দেশ দিলেন। সভার উপস্থিত
নরনারী কি হস্তে বুকতে পারার আগেই তিনি
গুলী আরম্ভ করলেন। বাতাব্যন্তের একটি মাত্র
প্রবেশ পথ লক্ষ্য করেই তিনি গুলী চালাতে
লাগলেন। জনতা চলে বাক্ এ তাঁর উদ্দেশ্য
ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বেপরোয়া নরহত্যা
করে ভারতবাসীকে শিক্ষা দেওয়া। মুহূর্ত মধ্যে
জালিয়ানওয়ালাবাগ মহাশানে বক্তৃতা নদী হয়ে
পেল। দশ মিনিট ধরে গুলী চলল। উত্ত
ডায়াব শেষ পর্যন্ত বোষণা করেছিলেন—গুলী
ফুঁড়িয়ে না গেলে আমি আরও গুলী চালাতাম।
কুত্র প্রবেশ পথে বেসিনগান নিয়ে যেতে পারিনি
তা না হলে যেদিনগানও ব্যবহার করতাম। গুলী
বর্ষণ শেষ করে ডায়াব স্থান ত্যাগ করলেন।
পেছনে যাবে গেল হুতলেহের গুপ এবং মরণ-উদ্ভ
নরনারীরা হল। সমস্ত রাত ধরে আহতগণ
আইনাদ করতে লাগল। সরকারী হিসাবে
নিহতের সংখ্যা তিনশ উনিশ, আহত প্রায় দেড়
হাজার। বেসরকারী হিসাবে হত্যার সংখ্যা এক
হাজারেরও বেশী। এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের
পরেও পাঞ্জাবে অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস পেল না।
১২ই এপ্রিল লাহোর এবং অমৃতসর শহর ও অঙ্গ
কয়েকটি অঞ্চলে সামরিক আইন জারি করা হল।
সর্বত্র লোমহর্ষকর অত্যাচার চলল। ছাত্র, শিক্ষক
ও জননেতাগণ নিষিদ্ধারে গ্রেপ্তার হতে লাগলেন।
ডোট হোট শিকদের ধরে জোর করে ব্রিটিশ পতাকা

অভিবাহন করানো হতে লাগল। কোন কোন
বিশেষ ব্যক্তির নির্দেশ নেওয়া হল যে সে পথ
দিয়ে চলতে গেলে জনতাকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে
হবে। এ ছাড়া একান্তে জনতাকে বোঝাবার কথা,
হাত পা শৃঙ্খলাকৃত করে বক্তার পর বক্তা দাঁড়
করিয়ে রাখা ইত্যাদি বহু অত্যাচার অব্যাহত চলতে
লাগল। জন-সাধারণের এ লাঞ্চার প্রতিবাদে
রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মার' উপাধি ত্যাগ করে বড়লাটকে
এক পত্র দিলেন। পত্রে তিনি লিখেছিলেন
'The time has come when badge of
honour make our shame glaring in
the incongruous context of humilia-
tion and I for my past wished to
stand, shorn of all special distinctions
by the side of those of my country
men who for their so called insignifi-
cance are liable to suffer degradation
not fit for human beings.'

এর আগে পাঞ্জাবের অবস্থার কথা প্রচার করা
হয়নি, সেখানে যে নির্মম অত্যাচার চলছে তা
কাকেও জানতে দেওয়া হয়নি। সমগ্র পাঞ্জাব
বহিষ্করণ থেকে বহিষ্কৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই
প্রতিবাদের পরেই সমগ্র সভা জগতের দৃষ্টি পাঞ্জাবের
প্রতি আকৃষ্ট হল। পাঞ্জাব প্রবেশের চেষ্টা করে
গাণ্ডেশী গ্রেপ্তার হলেন। প্রায় ছয় মাস পরে
লর্ড হার্ডিগের সভাপতিত্বে সরকারী
উজ্জোগে এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হল।
সরকারী তদন্তে সম্পূর্ণ আশঙ্ক হতে না পেরে
কংগ্রেসের তরফ থেকে আরেকটি তদন্ত কমিটি
গঠিত হল।

১৯২০ সালের ২৭শে মার্চ কংগ্রেস তদন্ত
কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল। (চলবে)

নয়া দিল্লীতে আসাম ও মেঘালয়ের রিফিউজি ডেলিগেসনের নায়ক শ্রী বি. সি. ঘোষের বিরূতির সারাংশ—

—প্রজ্জ্ঞানন্দ দাস

ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষভাবে আসাম ও মেঘালয়ে কোন আইনের শাসন নেই। এই অঞ্চলের লোকের উপর বিশেষভাবে হিন্দু রিকিউজি-দের উপর অমানুষিক ও অকথা অত্যাচার ও অবিচার চলছে।

হুই হাকারের উপর লোক নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, পাঁচ হাকারের উপর বাড়ী ঘর পোড়ানো হয়েছে, আহত, লাঞ্চিতের সংখ্যা অগণিত। স্ক্রুতি ধনসম্পত্তির মূল্য এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের নিকট হ'তে আসামী অর্থের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ। আসাম ও মেঘালয়ের হিন্দুরা ভীত সন্ত্রস্ত। হামলাবাজীর কোন প্রতিকারের আশা নেই।

বাঙ্গালী সংবলঘূষের উপর বিভিন্ন অভ্যুত্থানে ১৯৪১-৪২ সাল হতেই হামলা শুরু হয়। ইহাট বিদেশী অনুপ্রবেশ বর্ধ করা আন্দোলন নামে বর্তমান রূপ নিয়েছে। এই আন্দোলন পরিষদ ও স্পষ্ট জাতীয়তা বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক Assam Liberation Front এর প্রচারিত পত্র পত্রিকা Join Assam Liberation Front : Save Assam—Save Our Motherland বক্তব্যে ইহা পরিষদ (ভবিষ্যতে এই সমস্ত প্রচার পত্র বাংলায় প্রকাশ

করা হবে—সম্পাদক) এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ, অহিংস মোটেই নয় এবং কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়—এই উক্তিও মিথ্যা। এই আন্দোলনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাদের কার্যকলাপে পরিষ্কার বিদেশী মানে ভারতের অস্ত্র রাজ্যের অধিবাসী, বিশেষভাবে বাঙ্গালী হিন্দু যারা বহুদিন ধাবং আসামে বসবাস করছেন যাদের অস্ত্র কোথাও বাণিজ্যের উপায় নেই।

১৯৬০ সালের রাষ্ট্রভাবার আন্দোলনে কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী আসাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল : ৫০ হাকারের মৃত্যু হয়েছিল আন্দোলনকারীদের গুল্লন, অগ্নি সংযোগ ও অত্যাচারের ফলে। এই ধরনের আন্দোলন ১৯৭২ সালেও শুরু হয়, বাঙ্গালী হিন্দু রিকিউজীরা রাষ্ট্র সংঘের (United Nations Organisations) দৃষ্টি আকর্ষণ করার আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সচেতন হয়—এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে আইনের শাসন স্থাপিত এবং শান্তি বিরাজ করে।

কেন্দ্রীয় সরকার পরিবর্তন হলে সি. আর. পি. সরিয়ে নেয়। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। নাগাল্যান্ডে ডিমাপুর সহরে কেন্দ্রীয় সরকারের জমি হতে Nagaland Armed Police

এর সাহায্যে ১৯৭৭ সনের ২৮শে মে বাঙ্গালী
হিন্দু রিকিউজার্সের উদ্দেশ্য করে। আসামে ভারত
বিবোধী প্রচার পত্র বিলি বাগা উত্তেজনা সৃষ্টি করে,
সেই সময়ের সরকার এই সমস্ত জাতীয়তা বিবোধী
কাছের প্রতিকারের ক্ষমতা কোন প্রচেষ্টাই করে না।
বরং আসাম সরকার ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের
পর আগত এই অজুহতে বাঙ্গালী হিন্দুদের বহিষ্কার
করার কাজে তৎপর হয়। শিখা প্রতিষ্ঠানে
বাঙ্গালী ছাত্রদের উপর নানা ধরনের অবিচার ও
অত্যাচার শুরু হয়। বাঙ্গালী ছাত্রদের পড়োত্তরা
করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

১৯৭৯ সালে মার্চ মাসে মঙ্গলদই উপনির্বাচনের
ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় এই আন্দোলন
দৃষ্টি হয়, এই ধারণা ঠিক নয়। ১৯৮০ সালের
জানুয়ারী মাসে নলবাড়ী ও ডিগবয় সহর এলাকায়
অসহন্যক অত্যাচার চলে। তৈল-শিখা বন্ধ করে
সেই সরকারী প্রশাসন এবং কর্মচারীরাও এই
আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে।

বিশেষীর সনাক্ত করা এবং বহিষ্কার করা যে
কোন ভারতবাসীই সমর্থন করবে, কিন্তু কোন একটি
সম্প্রদায়কে সংসদের আইনের ফাঁকে বিশেষী আখ্যা
দিয়ে বহিষ্কার করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না:
এবং তাহা মানিয়া নেওয়া যায় না।

মেঘালয়ের দশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র এক
লক্ষ বাংলাদেশী। শিলাং ১০০ বছরের উপর
আসামের রাজধানী হওয়ায়, রাজধানীর বাঙ্গালী
কর্মচারীরা শিলাং-এ বাস করিতে থাকে, ইহার ফলে
বাঙ্গালোভাসীর সংখ্যা এক লক্ষ হয়েছে। মাত্র এক
লক্ষ লোক কি নয় লক্ষ লোকে কোনটাসা করতে
পারে? কখনও সম্ভব নয়।

আসামে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর বাস।
প্রত্যেকেরই ভাষা ও কৃষ্টি আলাদা, এমনভাবে

বাঙ্গালীরা আদামবাসীদের কৃষ্টি ও ভাষা নষ্ট
করবে এ ধারণা অমূলক। বিশেষতঃ বর্তমানে
সকল সম্প্রদায় মিলেবিশেই আসামের কৃষ্টি রক্ষা ও
সম্প্রদায়িক করার প্রয়াস চলতে।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে বলা যায় অল্প রাজস্বের
লোকসই আসামের ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি
গড়ে তুলেছে, বাঙ্গালীদের অবদানই বেশী, কিন্তু
চাকরীর ব্যাপারে বাঙ্গালীদের দাবী অগ্রগণ্য নয়।

রেভিনিউরিকিউজার্সের বিশেষী আখ্যা দিয়ে
পুলিশের গাউন্টে তুলে গোলকগঞ্জে পাঠিয়ে দেয়,
সেখানে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে সীমান্তের দিকে নিয়ে
যায়, বাংলাদেশের টহলদারী সৈন্যরাও তাদের দিকে
বন্দুকের তাক করে। এই অবস্থায় রিকিউজার্স
আসাম ও বাংলাদেশ মধ্যবর্তী স্থানে (No Man's
Land) আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। রিকিউ-
জার্স পানীয় জল ও বাতের অভাবে উপবাসে দিন
কাটাতে বাধ্য হয়, কারো কারো পুলিশের গুলিতেও
হত্যা হয়।

ভারতের স্বাধীনতার ক্ষমতা পৈত্রিক বাস্তবজাগী
হিন্দু বাঙ্গালীদের ভারতের নাগরিক গণ্য না করার
প্রবৃত্তি কোন জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর হতে পারে
কি? পশ্চিম পাকিস্তানের রিকিউজার্সের ভারতীয়
নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষমতা কোন আইনের আশ্রয়
গ্রহণ করতে হয় না, বিধি নিষেধের বেড়া-

(৫ পাতার পরের অংশ)

কামো আন্দোলন যে কতদিক দিয়ে সাম্প্রদায়িক ক্ষতিকর
তা সহজেই বুঝা যায়। কেন্দ্রের আর নীরব থাকে
সাজে না। এখনই সর্ব প্রথমে এ আন্দোলন বন্ধ
করার জন্য কেন্দ্রকে দৃঢ় হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই
হবে অস্ত্রাঘাত সার্বশেষ সীমাহীন অধ্য-কৃত্তির মাওল
গুণতে বাধ্য হবে।



জালেও পড়তে হয় না। বাংলায় রিফিউজীদের প্রতি এই বৈষম্য কেন? ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়ারকন্ড, প্যাঙ্কি অম্বাওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতাগী রিফিউজীদের আশ্রয় ও পুনর্বাসনের অঙ্গীকার ছিল, তদনুযায়ী ভারত সরকার রিফিউজীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করতে বাধ্য। কিন্তু কৃষকের বিষয় এই বিষয়ে কোন আইনের বিধান হয় নাই। আসামে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নিষ্কল্যাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিদেশী শক্তির প্ররোচনায় বিদেশী আখ্যা গিয়ে সংখ্যালঘুদের বহিষ্কারের আন্দোলন মেতে উঠেছে। বাংলায় হিন্দু রিফিউজীদের ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট অফ ১৯৪৭ বিধি অনুযায়ী বিচার না করে পশ্চিম পাকিস্তানের রিফিউজির মত নাগরিকত্ব প্রদান করা বিধেয়। এই সিদ্ধান্ত দেবী হলে অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হবে এবং ভারতের রাষ্ট্র কায়দার সংহতি বিচ্ছিন্ন হবে।

সম্পাদকের মন্তব্য :—

আসাম সমস্যা সমাধান করে আমাদের স্বপ্ন

বাধতে হবে ১৯৫১ সালের নেহরু, লিয়ারকন্ড আলী চুক্তি এবং ১৯৭১ সালের ভারত বাংলা চুক্তি। আরও শরণ রাখতে হবে ভারত ভাষাভাষির ভয়াবহ ঠিকিহাস। জওহরলাল নেহরু সহ জাতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই স্বতন্ত্রা উদ্ধারদের সম্পর্কে সর্বভারতের নৈতিক দায়িত্ব আছে। আসামকেও সেই নৈতিক দায়িত্বের অংশ বহন করতে হবে। কারণ আসাম ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য। আসামের আন্দোলনের উজ্জ্বলতা আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের দ্বারা পুষ্ট। গোটা পূর্বাকালকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল পাড় করতে চায়। এই অঞ্চল হবে নাকিনের ও মাওপম্বী বিপ্লবীদের বাঁটি। পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এই দুইদিক হতে ভারতকে বিব্রত করাই এদের উদ্দেশ্য। আশা করব প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই দেশদ্রোহীদের প্রতি বোধোচিত দৃষ্টি নিবন্ধেই সমস্যা সমাধান করবেন। (সং: বিপ্লবী বাংলা—)

— — —

হাবিজির পেটের ব্যাঘ্র, অঙ্গীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলশ্রুতি

আমলা হুত কুমারী

আমুবেদনীয় মতে তৈরী

মূল্য ৩.৫০ এক প্রত্যেকের জন্য

খাতিসহান: প্রিঅবনীমোহন চক্রবর্তী

মিলকট কুর্কি • কলকাতা • কলকাতা • কলকাতা

রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

[“A Nation In Making” গ্রন্থ থেকে অন্তর্ভুক্ত]

অনুবাদক—অধ্যাপক নগিনীমোহন দাসগুপ্ত

ইম্পিরিয়্যাল কালিজিলের কাজকর্ম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ প্রথম আইনের সংস্থাপন হলে আমার লেজি-
সলেট কালিজিলে যোগদানে আর কোন আগ্রহি হইল না।
১৯১৩ সালের প্রথম দিকে বাংলার কালিজিলে এক
ইম্পেরিয়্যাল লেজি-সলেট কালিজিলে প্রাচীনতম
দাঁড়ানো। উই কালিজিলেট আমি সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট
পেয়ে নির্বাচিত হইছি। কিন্তু আমার এই নির্বাচন
একবারে সফল ও সফলভাবে হয়নি। একজনে আমাকে
অনেক ভোটালাপে পেরিয়ে গিয়েছে। অনেক বিরোধিতার
সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি সবেমাত্র বেশ বিভাগ
বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করেছি। এ কাজটি ছিল
একটি কঠিন কাজ। ফলে আমার অনেক শত্রুও
হয়েছিল। এদের বিরুদ্ধে আমার অনেক অস্ত্রের কথা
জ্ঞাতে হয়েছিল। তাই এখন এই সমস্ত লোককে এনে
আমার বিরুদ্ধে অভ্যস্ত করিয়ে এমন এক প্রবাদ চালান
আমার হল যাতে আমি ইম্পেরিয়্যাল লেজি-সলেট
কালিজিলে নির্বাচনের মধ্যে গা বলে বিবেচিত হই।
বেশ লেজি-সলেট কালিজিলের নির্বাচনে আমার যে
অযোগ্যতা ছিল তা লেট-সলেট সচিবের দ্বারা এতদূর
বিস্তারিতভাবে বুঝে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বহু
আগে আমাকে যে নির্দিষ্ট শর্তগুলির চাকরী থেকে বঞ্চিত
করা হয়েছিল সেটাই বুঝে বুঝে কালিজিলে আমার নির্বাচন
অযোগ্যতা প্রদান করার ব্যবস্থা নিয়ে গিয়েছে। লর্ড হার্ডি-
জেনের বিরুদ্ধে বেশী শত্রুতা পাওয়া। তার কারণ তিনি
কত তার উপর যে কাপুরুষত্বের অভিযোগ করে গিয়েছিল
তার জন্যই তিনি লেজি-সলেট কালিজিলে নির্বাচিত হইলেন।

সংসারী জাতি চালানোর তার ছিল এম্বিগুইটি কালিজিলের
এর প্রথম সফল সারা গর ক্রিটিক উইলসনের উপর।
তিনি একজন উদার মৈত্রিক মতবাদের লোক বলেই
পরিচিত ছিলেন। তিনি এবং তার সিউনিয়ান সহযোগিতা
বিলে আমার অযোগ্যতার প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা করেন।
বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানের কাজ শুরু হল। কলকাতার
ইম্পেরিয়্যাল লাইব্রেরী থেকে কয়েক গ্রন্থ ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকা
চেরে পাঠান হল এবং তা খুঁটিয়ে দেখা হল যে এর মধ্যে
কোনো কোনো প্রস্তাবের পক্ষ পাওয়া যায় কিনা।

ইতিমধ্যে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল নির্বাচনে
বিলম্ব ঘেঁষে অবৈধতা হয়ে পড়েন। আর এভাবে আমার
বন্ধুতা, বাবের মধ্যে কয়েকজন উচ্চ পর্যায়ের ইংরেজী
পরকারী কর্মচারীও ছিলেন, শর্তিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে
যে লর্ডে ভারত সরকার আমাকে নির্বাচনে অযোগ্য বলে
ব্যাখ্যা করে আমার একটা আবেদনকে খুঁটিয়ে জাতিয়ে
তোলেন। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষে এ যত্ন এতটা
সিদ্ধান্তে আনা আশংকিত অনশ্বব। কারণ বেঙ্গল লেজি-
সলেট কালিজিলে বহিঃযোগ্য হয়ে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই
ইম্পেরিয়্যাল লেজি-সলেট কালিজিলেও যোগ্য বলে
বিবেচিত হয়। লর্ড কারমাইকেল সহ অন্য সব লোকের
বৃদ্ধিতে পরামর্শে যে এক সময় কাজ হলে তা হবে একটা
অনিষ্টের দূর কাজ। সুতরাং বিষয় পরকারী পরামর্শ-
দাতারা শুধু খুঁচিই পরিচয় দিলেন এবং সে সময় তুল
তার পরামর্শ দা। আমার নির্বাচনের পরে প্রায় প্রথম
লর্ড কারমাইকেল ভারত সরকারের পক্ষে অবৈধতা প্রমাণ করে দিলেন।

ব্যানাজি, আমার তত্ত্বই তুমি আমার কাউন্সিলে স্থান পেয়েছে।' আমি মহামাত্র বতলাই বাগানঘরে দরবারে আনলাম। কিন্তু তার এই উক্তিই বিবাহটির সত্যের আর কোনমাত্র না। কারণ, তাহলে তা অফিসের গোপনীয় ব্যাপারকে তুমি বার কবার প্রকাশ হলে মনে হতে পারে।

১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি টেম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং পরের মাসেই সেখানে কৌশলকারী মামলার বিচারকার্য। পরিস্থিতির বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগের কাজকে আশা করে দেওয়ায় স্থানস্থিত করে এক প্রকার উৎসাহিত করলাম। আমার এই প্রস্তাবের মধ্যে অনুভব কিছু ছিল। বহুদিন থেকেই বিচার বিভাগকে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে পৃথক করার প্রসঙ্গ মনে পড়ত। সুযোগ্য অধিক পরিচিত জনকবীরী ভারতীয় কর্মী স্বয়ং মিঃ মনোমোহন ঘোষ এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এই দাবী নিয়ে যে আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয় তার সঙ্গে জড়িত আঁচে মনোমোহন ঘোষের নাম। তার মুখে তারই কৌশলকারী মামলার উক্ত হিসাবে তার মত ব্যাখ্যা নাগা আর কেউ ছিলেন না। বিচার কার্য ও প্রশাসনিক কার্য একই তরফ থেকে হওয়ার সুকলম্পকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। মিঃ মনোমোহন ঘোষ বিবাহটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করার ব্যবস্থা করলেন। ভারত সচিবের নিকট তা পেশ করা হয়। এই প্রতিবেদনেই লই করেছিলেন লর্ড হংগার্টন, বাংলার ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ল্যার ডিভার্ড দাব, বোম্বে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারক ল্যার রেমন্ড ওয়েট, বাংলার রেজিষ্ট্রার জেনারেল প্রাক্তন সদস্য মিঃ লর্ডার্ট রেনডল্ফ এবং আরও অনেকে। প্রতিবেদনে এই পদ্ধতির সুকলম্পের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং উহার সংশোধন দাবী করা হয়। সর্বত্র সম্মত হয়ে বৃত্ত বাংলার মধ্যে প্রবর্তনের জন্য সংশোধনের একটি খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন।

১৯০৮ সালে স্কটল্যান্ড কোর্ট মেম্বর স্যার হার্ভি এডামসন ইন্সপেক্টরাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সরকারী

ভাবে যোগদান করেছিলেন যে জার্সি ল্যান্ডের স্পেকিয়ারেই এটি সিন্ডিকেট করেছিল যে পরীক্ষা দলকভাবে দীর্ঘ দীর্ঘ সন্তকভাবে সচিব এই সংশোধন প্রস্তাব করতেন। সেই যোগদানের পরে পাঁচ বছর অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু কিছুই

করা হয়নি সুতরাং আমার প্রস্তাবটি সম্মোহনযোগ্য হতে পারে। এতদ্বারা বলা খুবই সম্ভব যে প্রত্যেকটি বেসরকারী ভারতীয় সদস্য আমার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু সরকার পক্ষের মোতাবেতি ভোটে প্রস্তাবটি ব্যর্থ হতে গেল। তবে এটা বোঝা গিয়েছে যে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে বহু কেউ কেউ ছিলেন যারা আমার প্রস্তাব সম্পর্কে অস্বস্তি মনোভাব পোষণ করতেন। তাই দেখা গেল যে সরকার অস্বস্তি পূর্ব শেষ করে গেলে স্যার ল্যার ট্রিউট উইলস, মিঃ ডাইসরয়ের অগ্রদূত হিসাবে কাউন্সিলের সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, আমার দ্বারা তারপরে এসে আমাকে বললেন : 'মিঃ ব্যানাজি, আমার বাক্যটি ভোট দেওয়ার আশঙ্কায় ব্যর্থ একটি সরকারী এবং আর একটি ব্যক্তিগত ভোটে আমার ব্যক্তিগত ভোটটি তোমার পক্ষেই দিলাম।'

আমার প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে গেলেও এতদ্বারা আমি সুত্রে পেতেছি যে ভারত সরকার পক্ষ থেকে ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত এক ভেদন্যায়ে বিবাহটি স্থান পেয়েছে। সে ভেদন্যায়ে, আমি বহুদূর জানতে পেরেছি, ভারত সরকার আমার প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে আশঙ্কিত ব্যক্তিদের প্রস্তুতি ব্যর্থ ইতিবা কাউন্সিল থেকে দাবী করতে হয়েছে। ইতিবা কাউন্সিল প্রস্তাবটি প্রস্তাবনা করেন। তা সে বাই হোক না কেন, প্রবর্তন যে অস্বস্তি দ্বারা উপনীত হয়েছে, তা বলা যায়। নতুন শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার গুটি বিভাগকে পৃথক করার জন্য একটি বন্য প্রস্তাব করেন। তা এখন বিবেচনায় রয়েছে। তবে যা বর্তমানে ঘটে আসছে, অর্থব্যয় সমস্যাই এখনও অস্বস্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অগ্রস্ত যে সমস্ত বিষয়ে আমি প্রস্তাব তুলেছিলাম তা হল : হোল অ্যাক্ট, লমঙ্গা, শিক্ষা, স্থানীয় ভারত শাসনকে

সম্প্রদায়িক কথার সম্পর্কে বিবেচনাকল্পন কামিনীর
 'সংগঠন, অস্তিত্ব, বস্তুত্ব বিবরণ পর্য্যালোচনার অত
 উপযোগী নথিটি খুঁজি এবং সংশ্লিষ্ট 'সাইয়েন্স কোড'
 জীম যে শাসন সংস্থারের প্রস্তাব আছে তা নিয়ে
 আলোচনা। আমি প্রেস জ্যাকট্ট সংশ্লিষ্টদের কলই চাপ
 দিয়েছিলাম সম্পূর্ণরূপে বহু করার ক্ষমতা। শাসন আমি
 জানিই যে রাজনীতির ব্যবহারিক দিকটা বিবেচনা
 করলেই বহু প্রস্তুতি পড়েন। আমি জোর দিয়েই
 বললাম, রাজতন্ত্রের যে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা
 দিয়েছেন, তা বেশ কার্যকরী করা হয়, ফলে তা নীতিকা
 পর্য্যালোচনা হয় বা কার্যতঃ হয়ে থাকে বলে কয়েক
 মাসের প্রচেষ্টা বিচারপতি ব্যার লুইস কেনকিন্স দেখা
 করেছিলেন। যে সরকারী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে যে
 চোটে বেওয়া হয় তা কার্যতঃ সর্বসম্মতই হয়। কিন্তু এ
 ক্ষেত্রেও ফো গেল সরকার পক্ষের চোটেবিকা, এবং আমার
 প্রস্তাব হয়ে গেল। অথবা আমি এর চেয়ে ভাল বল
 কিছু বলে বলে আশা করিনি। তবে আমি যেন বেবেছিলাম
 যে এইভাবে বিষয়গুলি নিয়ে পর্য্যালোচনা করলে প্রেস
 জ্যাকট্টের কার্য পরিচালনা ক্ষমতা আরও কিছুটা গা
 লওয়া ও তুলী সাধনের পথে চলবে। আমার যে আশা
 পূর্ণ হয়েছে, এমন কথা আমি বলতে পারি। প্রেস
 জ্যাকট্টের কার্য পরিচালনা সম্পর্কে অভিযোগ এই
 পর্য্যালোচনার পরেও আগের মতই উচ্চতর ও বৃহত্তর
 দৃষ্টি চলেতে থাকে। বেসরকারী সংশ্লিষ্ট ভারতীয়
 লোকদের পক্ষস্থলের প্রস্তাব সরকারী নীতিকে শোষণাব্য
 থাকে একেবারেই অক্ষম।

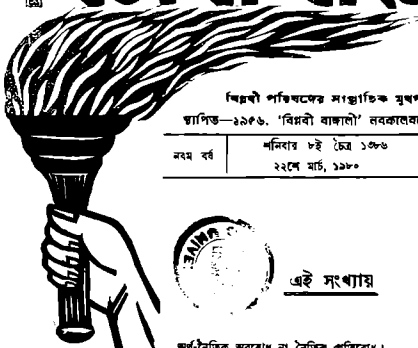
ফলে-কিন্তুটা শাসন ব্যাংকার অস্থায়ী গঠিত কাউন্সিল
 জন্ম উপযোগী কমিটি জন্মই খুঁজি করা হয়েছিল এবং শেষ
 পর্যন্ত এই কমিটিগুলি তাদের সেট বস্তু বজায় রেখেই
 চলেছিল। এমন কি বহু বর্ষাবধি চাষার জোরেও দৃষ্টি
 পূর্ণ সমস্ত ভারতীয় জনমত ব্যাংক হয়েছে এবং এই
 কমিটিগুলির সেই চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি।
 আমার মনে আছে সেলফাং টুটি ক্ষেত্রে বেসরকারী
 অধিকার চাপের কাছে সরকার পক্ষের চোটে নীতি
 দীকার করতে হয়েছে। তার একটি লেখন প্রেসিডেন্সী

ব্যাকগুলি খুঁজি সম্পর্কে আনিত বিলটিকে স্থগিত রাখার
 প্রস্তাব ইংল্যান্ড করা হয়, এবং আর একটি লেখন তার
 ও তার বিধানের কোনোই এবং অবস্থান কর্তৃত্বাধীনে
 অভিযোগ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় প্রস্তাব
 করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত প্রস্তাব তখন কোন গুরুত্বপূর্ণ
 প্রস্তাব নয়। কারণ নীতি ও কর্তৃত্বের এর ক্ষতি কোন
 প্রস্তাব এগুলি নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধনের বিষয়টি
 জনমতের কাছে খুব বড় হয়ে শোনা দিয়েছিল। 'জাতসং
 কামিন' নামে পরিচিত কমিশন যে বড় রকমের একটি
 সংস্কার সুপারিশ করেছিলেন, তা আমায়ের সামনে ছিল।
 এই সুপারিশের মধ্যে খুব বিস্তারিত পরিবর্তন ও বেশ মোটা
 রকমের অর্থ বিনিয়োগের কথা আছে। ১৯৬০ সালের
 মার্চ মাসে ইন্সটিটিউট লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কলকাতা
 বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালে চলমান গঠন-কল্পে আমার প্রস্তাব
 অস্থায়ী নামের একটিখানি পরিবর্তন হয়েছিল। আমি
 প্রস্তাব করেছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
 হবে, আর তাইল হয়ে পরিবর্তিত প্রাথমিক স্তরের যখন
 বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। এইভাবে স্থানীয় সর্বসম্মতের
 প্রচেষ্টার লক্ষ্য সম্পর্কে ব্যাংগরে এই পদ্ধতির মাত্রাও
 যথেষ্ট মত তদ্বিনী স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য
 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একই পারিভূক্ত আনা যায়।
 সরকার পক্ষ থেকে সবার পক্ষের ন্যায় আমার প্রস্তাবটি
 গ্রহণ করেন।

শিক্ষাবী হিসাবে সবার পক্ষের ন্যায় লাক্ষ্য অর্জন
 করেছেন; অতঃপর ভারতীয় নীতিতে লেখা বলা যায়।
 বিচার বিভাগ থেকে তাকে তাইলদের একমিটিউটিভ
 কাউন্সিলে বসলী করে আনা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কে
 কিংবা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে তার কোনরূপ
 কার্যকরী পরিচয় ছিলনা। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাংগরে
 তিনি বক্তৃতা, বিচার বৃদ্ধি ও বৃহত্তা প্রদর্শন করেছেন।
 তিনি তার কাজের দ্বারা আর এখার এই সত্য প্রমাণ
 করলেন যে আমায়ের যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব দীর্ঘকালের যে
 কোন কর্মস্থল থেকেই তার আনা যাবে না কেন

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পত্রিকাব্যবসায়ী সংস্থা
চাপিত—১৯৫৬. 'বিপ্লবী বাংলা' নবকালেব্যবসায়—১৯৭৬

নবম বর্ষ	শনিবার ৮ই চৈত্র ১৩৮৬ ২২শে মার্চ, ১৯৮০	২৬ সংখ্যা
----------	--	-----------



এই সংখ্যায়

অর্থ-নৈতিক অবরোধ না নৈতিক প্রতিরোধ !

—সম্পাদকীয়

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—কীর্ত্তন দত্ত

আফগানিস্তানের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে—

—কালীপ্রসন্ন সরকার

রাষ্ট্রপুত্র মুহুরপ্রনাথের শ্রুতিকথা

—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা—

ভগবানের এই তিন গৃহকে

আমি পৃথকভাবে দেখি না।

—গান্ধীজী

অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেশ পঞ্চাংগদ কেন ?

—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

অর্থনৈতিক অবরোধ বা নৈতিক প্রতিরোধ !

আসাম সমস্তা সম্প্রতি একটি বিপজ্জনক দিকে মোড় নিতে চলেছে। আসামে বিদেশী বিভাজনের নামে বাঙালীদের উপর অস্বাভাবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের একটি অসংখ্য প্রধান রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আসামের আন্দোলনকারীরা তাঁদের দাবীর সমর্থনে যেভাবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আসামের বাইরে ভেল সর্বস্বত্ব বহু করে গিয়েছেন, তার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আসামে সকল ভ্রম সর্বস্বত্ব তা বহুই অস্বাভাবিক ও নিত্য প্রয়োজনীয় হোক না কেন, বহু করে দেওয়া হবে।

আমরা এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করেও একে সমর্থন করতে পারি না। যেহেতু এর উপর নির্ভর করছে সমগ্র দেশের স্থিতিশীলতা ও সংহতি বন্ধার প্রসঙ্গ।

পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য আসাম চিরদিনই বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ চক্রান্তের কেন্দ্রস্থল। একটি সোমাজবর্তী রাজ্য হিসাবে এখানে একদিকে যেমন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অভিসন্ধিমূলক হস্তক্ষেপ ঘটে এসেছে চিরদিন—অপরদিকে ভেতর থেকে দেশের আভ্যন্তরীণ অন্তর্ভুক্ত শক্তিগুলিও মাঝে মাঝে দিলে উঠেছে বার বার এখানেই। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে থেকেই তাই আসাম সমস্তা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের স্বার্থে একটি নিরবচ্ছিন্ন ও মূল সমস্তা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে দেশবিভাগের ফলে ছিন্নমূল বাঙালী উরাস্তার ভিত্তিতে এই ভূখণ্ডে একদিন অন্ধপ্রবেশ করেছিল ও পরবর্তী কালপরম্পরায় আসামকে একটি মূল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিল, সে ইতিহাস ‘বিদ্রোহী বাংলা’র পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সে আলোচনায় এ সত্যও প্রকাশিত হয়েছে যে আসামে আজকের বাঙালী তথা ভারতবিশেষী আন্দোলন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। তা’ কালানুক্রমিক এক ভ্রান্ত চিন্তা ও চক্রান্তধারারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। খুব দীর্ঘে দীর্ঘে ও নিপুণতার সঙ্গে আসামকে ভারতরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যড়যন্ত্র করা হয়েছে—বৈদেশিক অপশক্তির প্রত্যক্ষ ও পరోক্ষ মদতে। আসামের ছাত্র ইউনিয়ন আজ যে উন্মাদ নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে, তার মূল প্রস্তুতি রচিত হয়েছে অনেক আগে ও বিদেশী কূটনীতিদের সক্রিয় সহযোগিতায়। তাই ‘বিদেশী’ নামের কোন সঠিক সংজ্ঞা অথবা ‘বিদেশী’ নির্ধারণের নির্দিষ্ট সময়-সীমা সম্পর্কে

কোন হুমুশ নীতি এই আন্দোলনকারীদের সামনে নেই। নিরর্থক ও অসার কিছু প্রোগ্রাম-ভিত্তিক দাবিদান নিয়ে এঁদের আন্দোলন শুরু এবং শেষ বা পরিস্থিতি সম্পর্কেও কোন ধারণা এঁরা করে উঠতে পারছেন না। ভারতের ভৈল-সম্পদের মূল কেন্দ্র আসাম থেকে বহিষ্ঠায়িত ভৈল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার পর্যাতি যে কত সূত্র প্রদারা হতে পারে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রতিক্রিয়া যে কত ভয়বহ পরিণামকে ডেকে আনতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা এঁদের না থাকলেও আন্দোলনকারীদের মূল চালক ষাঁরা, তাঁদের অবজ্ঞাই আছে—এবং তাঁরা সচেতনভাবে সেই পরিস্থিতির থেকেই দেখকে হেঁলে দিতে চাইছেন।

এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে পূর্বেক আন্দোলনের ভাক দেওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে চক্রান্তকারীদের বুগা পরিকল্পনাতেই সহায়তা করা। যেহেতু আসামকে কেন্দ্র করে এই অন্তত শক্তিগুলি সমগ্র ভারতবর্ষ হুড়ে এক চরম অস্থিভীলতা ও অরাজকতার সৃষ্টি করতে চায়—যাতে জাতীয় সংহতি সমূলে বিনষ্ট হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক বুনিন্দা একেবারে ভেঙে পড়বে। হিংসার সমাধান নয় প্রতিহিংসা—কারণ তা থেকেই আসে অতিহিংসা—Super violence : যার হাত থেকে কাণ্ডেরই রেহাই নেই।

আসাম সমস্যার সমাধান এখনই প্রয়োজন—এবং দেয়ন্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকেই উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রচেষ্টা ও ভূমিকার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেও বলা যায়, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না। যদিও শ্রীমতী গান্ধী যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গেই আন্দোলনকারীদের কার্যকলাপের প্রতি তাঁর তীব্র অনীহা জানিয়ে বিবেছেন, তবু সে-কিছু যথেষ্ট নয়। কিছু হ্রাস বিপথগামী অপরিণামবশী বৃদ্ধান্তের মূঢ় কার্যকলাপের ফলে সমগ্র দেশে যে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হতে চলেছে তাকে দৃষ্ট হতে মোকাবিলা করতে হবে। এর জন্য প্রতিটি রাজ্যের বৃদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক দলগুলিকে দলমত নির্বিশেষে হুসংহত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এবং তা করতে হবে আসাম ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে গিয়েই। পথভাড়া, প্রচার ও সভা সমিতির মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক স্তর চেতনার অন্বেষণ ঘটিয়ে সংহতি বিনষ্টের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। অর্থনৈতিক অবরোধ নয়, নৈতিক প্রতিরোধের মাধ্যমে আসাম সমস্যার সমাধান করতে হবে; এবং তার শুরু হোক এখনই—সমগ্র ভারতবর্ষ ‘আসাম’ হয়ে ওঠার পুর্বেই।

আফগানিস্তানের ঘটনাবলী প্রসঙ্গ—

॥ কালীন্দ্র সরকার ॥

আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপকে কেন্দ্র করে বিশ্বশান্তি বিষয় হবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তার তাপ কিছুটা মন্দীভূত হলেও সংকটের নিরসন হবার। শীতের প্রকোপ কটে গেলে আফগান বিজোহীদের সহিত রুশ বাহিনী বড় রকমের সংঘর্ষের আশংকা নিশ্চরই আছে। শ্রুতরাং রুশ সৈন্যবলের আশ আফগানিস্তান ভ্যাগের সম্ভাবনা নেই।

পশ্চিম এশিয়ার তৈল-সমৃদ্ধ দেশগুলির ওপর ধবরদারি বজায় রেখে তৈলের জোগান অব্যাহত রাখার দৃষ্টি এবং উক্ত অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি যোবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে যে সামরিক বাঁটি গড়েছিল তা :ভেঙ্গে গেলে, যুক্তরাষ্ট্র নতুন বাহ রচনার উদ্যোগী হয়। আফগানিস্তান এবং চীনের সহায়তার এই বাহ গড়ার চেষ্টা চলি, যার কেন্দ্রবিন্দু পাকিস্তান। সীমান্তে এই ধরনের সামরিক তৎপরতা দানা বেঁধে ওঠে রাশিয়ার পক্ষে তা নিষ্পৃহ মনে মনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

আফগানিস্তান জোট নিরপেক্ষ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তাই তাকে নিয়ে চলল দুই প্রতিপক্ষী বিশ্ব শক্তির দাবা খেলা। জুম্মো কূটনৈতিক চাপের মুখে নিয়ম-বদ্ধিত রাজা জাহির শাহ বেশি দিন ক্ষমতার টিকে থাকতে পারলেন না। ১৯৭৩ সালে জাহির শাহকে পদচ্যুত করে রাষ্ট্রকর্মতা দখল করলেন রাজার নিকট আত্মীয় জোকস প্রধীণ রাজনীতিক দাওয়দ শাহ। জাহির শাহ নির্ধাসনে গেলেন আফগান রাজতন্ত্রের

অবসান হল। স্থাপিত হল কাকুল প্রজাতান্ত্রিক সরকার।

গড়িম শাহ ছিলেন জোট নিরপেক্ষ নীতির উৎসাহী মনবর্ধক। তাই আফগানিস্তানকে দলে টানার চেষ্টা প্রতিপক্ষী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সহজ হল না। অপর পক্ষে দারুদের পশ্চিমী ধাঁচের গণ-তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান মোল্লাতন্ত্রী ও মার্কসবাদীদের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হল। পররাষ্ট্রে প্রতিপত্তি স্থাপনের দৃশ্যে সোভিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতি দৃশক। রাশিয়া অতুগ্রহণ করে দেখানে নিজস্ব বশংবদ দলের মাধ্যমে মার্কসবাদের তরুণ এটে। সমাজ জীবনে অসহ্যের জাগিয়ে শ্রেনী বিরোধ বাহিরে এবং নানানভাবে, স্বাভাবিকভাবে ভেঙ্গে, অতুগত দলের বেনামীতে সে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করে। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট দেশে প্রভাব বিস্তার করতে চায় প্রতিষ্ঠিত সরকারের শিঙ্কনে আর্থিক মদত জুগিয়ে—যার ফলে অনেক সময়ই লাভবান হয় সেখানকার কার্যেমো বার্থ ভোগীরা। শেষ পরিণাম উল্লর কেইই দাসত্বের নিগড়।

পরিত্র, অন্ড্রাস, মীমিত সম্পদ, পার্বত্য দেশ আফগানিস্তানে এক নতুন জীবন গড়ার মন মাতানো মার্কসীয় আবেদন বেশ ভাল ফল দিল। আফগান তরুণদের অনেকের নিকট কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণীয় হল : তারা দেনাখাহিনীর মধ্যে গোপন চক্র গড়ল, প্রেরণা ও সামর্থ্য জোগাল বাইরের বন্ধু দেশ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে এ সব করা খুব কঠিন ছিল না। ১৯৭৮ সালে ঘটল এক আকস্মিক বিপ্লব, নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দাদুনশাহ গদিত্যত এবং নিহত হলেন। কশগা তারাকি ক্ষমতা দখল করলেন। কমিউনিষ্ট বিপ্লবী পরিষদ দেশ শাসনের ভার হাতে নিল।

কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পরে যা ঘটে থাকে এখানেও তাই ঘটল। নতুন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল গণহুদী, যোদ্ধাহুদী, কায়মো স্বার্থভোগী এবং উপজাতীর সর্বাঙ্গণ। তারাকি সরকার গুন্ডাম গণলেন। তারা সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত এক মৈত্রী, সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে কেললেন। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টনক নড়ল। অহুদিনের মধ্যে ভাষাকির বিপ্লবী পরিষদের অস্ত্রতম নেতা হাকিমুল্লা আমিনকে যুক্তরাষ্ট্রে সংগোপনে দলে আনতে সক্ষম হল। ভাষাকির দিন ছুরিয়ে এল। দুই নম্বর কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘটে গেল। তারাকি ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হলেন।

আমিন কঠোর হস্তে দেশের স্থিতিশীলতা ও আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। আমিনের সঙ্গাস থেকে কমিউনিষ্ট ক্যাডাভররাও অধ্যাক্তি পেলেন না। কমরেড আমিনের নবযুগী উদ্যোগ করল সোভিয়েত রাশিয়ারকে। বছর পূরতে না পূরতেই আমিন কমরেড ভাষাকির দশপ্রাণ্ড হলেন। ক্ষমতার বদলেন ব্যবহার কার্যমাল। কার্যমাল মজোর হাতে গড়া মালুধ। তিনি বিদ্রোহী আফগানদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের আফগান-রুশ চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত রুশের সামরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। প্রান আগে থেকেই করা ছিল। রুশবাহিনী খরিংগতিতে প্রবেশ করল আফগানিস্তানে।

যুক্তরাষ্ট্রের কূটকৌশল বড় রকমের তা খেল। আমেরিকা ও বন্ধক রাষ্ট্রগুলি বলে উঠল—রাশিয়া আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে বিশ্বশান্তি বিপন্ন প্রতিবিধান চাই। পাকিস্তান তার সীমান্ত অঞ্চলে রয়েছে আফগান বিদ্রোহীদের সমর শিবির, বলল—আমার নিরাপত্তা বিপন্ন। চীন বলল—ঠিকই তো, রুশ সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদকে রোখা দরকার। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ৪০ কোটি ডলার অস্ত্র সাহায্যের অস্বীকার দিয়ে ফেলল অবাচিত ভাবে, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলিও পাকিস্তানকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। নাটক বেশ দ্রমে উঠল, একটা বড় যুদ্ধ বাবে আর কি!

ভারত হল উপকৃত অঞ্চলের নিকটবর্তী বৃহৎ রাষ্ট্র, সে কারণে দাবিও তার বিরাট। পাকিস্তানকে বিপুল সমর সজ্জা সাজিয়ে ভোলাতে আকলিক ভারসাম্য ও শান্তির অবনতি ঘটাব আশংকা ভারতকে সঙ্গত কারণেই উদ্বিগ্ন করল। অতীতের অভিজ্ঞতা ভারতের চিন্তাধারার শোষণভাও করে। আফগানিস্তানে রুশবাহিনীর আগমনকেও ভারত নীতিগতভাবে সন্দেহ করল না।

গ্রামস্ত্রী ইশিয়া গান্ধী ইতিমধ্যে নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন ভারতের। তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কার্ধ্যক্ষেত্রেও সেবা দেল, তাঁর বাস্তব চিন্তা এবং অপরূপাত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবন্ধী শক্তিশিবির দৃষ্টি-সহ বিবেচন প্রধান রাষ্ট্রগুলিকে উত্তেজনা প্রশমনের দিকে টেনে নিতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে। ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার কার্ধ্যপূর্যে সমর্থন না করার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাঙ্গো সাঙ্গো হবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি বিশেষ করে ফ্রান্স সুর না মেলানোতে, অবস্থা আরন্তের বাইরে যাব নি। আলোচনা অধ্যাহত আছে।

রাশিয়া ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তান আক্রমণের কোন অভিপ্রায় তার নেই, তবে পাকিস্তানকে সমক্ষে চলতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কশ-বিরোধী চক্রান্তের পন্থীমি হওয়া কোনমতেই চলবে না এবং আফগানিস্তানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলেই সে তার সৈন্য বাহিনীকে রাশিয়ার কিবিরে নিয়ে যাবে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বলেছেন যে, পাকিস্তান হুখতে আফগান বিদ্রোহীরা সমগ্র প্রান্তিকি চালাচ্ছে এবং পাকিস্তান বিদ্রোহীদের অগ্র দিয়ে সাহায্য করছে, এ অভিযোগ সঠিক মিথ্যা। তিনি আফগানিস্তানে শান্তি শৃঙ্খলা কিবিরে আনার

কাজে জাতিপুঞ্জ কিংবা ছোট নিরপেক্ষ সন্মেলন কর্তৃক আন্তর্জাতিক সেনাবল মোতায়েনের সুপারিশ এবং অবিলম্বে কশ বাহিনী প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছেন।

পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে উন্নতির দিকে। ভারত বহুবার পাকিস্তানের নিকট পরস্পর অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দিয়েছে, দান কেলে দেওয়াই আছে। শান্তি ও কল্যাণের দিকে চেয়ে, পাকিস্তান কি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে, অনাক্রমণ চুক্তি বাস্তবায়িত করবে? ইতিহাসের নির্দেশ কিছু সেই দিকে।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী নগেন্দ্র শেখর চক্রবর্তী

গত ৮ই মার্চ কলকাতার বাসভবনে প্রবীণ বিপ্লবী আমাদের সকলের নগাদা (নগেন্দ্র শেখর চক্রবর্তী) পরলোক গমন করেন। বয়স হয়েছিল ৮৭, তিনি যুগান্তর বিপ্লবী দলের অন্ত্যন্তম সংগঠক ছিলেন। বঙ্গ বিভাগের বিরোধী আন্দোলনের সময় হইতেই তিনি সক্রিয় বিপ্লবী আন্দোলনে প্রখ্যাত বিপ্লবী সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, যাকুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে ২০ বৎসর কারাবরণ করেন। সর্বজন প্রিয় অমরীক বন্ধু বৎসল এই বিপ্লবীর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

রাষ্ট্রপুরু শ্বুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাসগুপ্ত

ইম্পিরিয়াল কালিজিলের কাজকর্ম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে সরকারী
শাসনশক্তি ও উৎসাহীশক্তির ফলে এর বিকাশ হতে পাবেনি।
আমাদের হাত থেকে ক্ষমতা সরিয়ে আবার বাৎসরিক
করাই ছিল আমার কালের প্রকৃত স্বার্থ। এদিকে
আবার দারিদ্র্যজনিত এটা দেখা যায় যে ক্ষমতা হবে যত
আমলগা ততই ক্ষমতা হ্রাস হতে দেখা দেয় তার
বিপরীত। এই কথাটি লক্ষ্য করে তার এক
ভেলুয়াতে এইভাবে লিখেছেন যে স্থানীয় পৌর প্রশাসন
জাতির নির্বাচিত মনোভাবের প্রকৃত ক্ষমতা এত কম যে
তার ফলে তারা এই কাজে মোটেই আশ্রয় খোঁজ করেন না
কিন্তু তরল ও তাৎক্ষণিক। ১৯১৪ সালে যাচাই করে
আমি এই দাবী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি যে উল্লিখিত
বোতল র প্রেসিডেন্টগণ নিযুক্ত করেন নিরাক্ষরতার ভিত্তিতে
এক প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে লোকাল গভর্নমেন্ট
বোর্ড গঠন করতে হবে। এই প্রস্তাবের জালা সম্পর্কে
আমিই যেমন দাবী করে রাখা করেছিল ঘটনা তাই
ঘটল। সরকার আমার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা
করেন। ফলে প্রস্তাবটি ত্যাগ হল। তবে তা স্বার্থে
একটা আন্তঃপ্রাণী আমি লাভ করেছিলাম। কারণ এই
যে সত্য কয়েক বছরের মধ্যে সরকারী মন্ত্রণের অভিমত
দ্বিগুণিত আবার অভিমত প্রকাশে দিকেই এগিয়ে
আগতে থাকে। ১৯১৮ সালের ১৮ই মে তারিখে গৃহীত
সিদ্ধান্তে ভারত সরকার স্থানীয় সরকারগুলির প্রাধান্য
বোর্ডগুলির চেয়ারম্যান নিয়োগ বোঝাবে বোঝানে সত্ত্ব
নির্বাচনের ভিত্তিতে করতে হবে এবং বাংলার ক্ষেত্রে

সমস্ত জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড গুলিকেও এই
সময় থেকেই সে আকারে দেওয়া হয়। স্থানীয় আন্তঃ-
প্রাণী বিজ্ঞানের মতী বাংলা কালে আমার আদর্শ হলেই
এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে আমি
সহায়তা করেছি। ১৯১২ সালে মহারাজা টেপুটেনের
সেবার দ্বারা আমি বহন ট্যাংগে হাই, তখন ভারত
শক্তি আমাকে ট্যাংগে হাই ট্যাংগে স্থানীয় আন্তঃপ্রাণী
পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ কর্ম বিভাগে সম্পর্কিত হয় সে
সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য গঠিত এক কমিটি
একজন সদস্য নিযুক্ত করেন। এই কমিটির কাজ
ছিল ট্যাংগে হাই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলির
কাজকর্ম ভারতের ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োগ করা যেতে
পারে তা পরীক্ষণ করা। আমার মনে দৃঢ়তর্য আমি
যে বহুদূর সত্ত্ব ট্যাংগে হাই পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা
আমাদের দেশে প্রত্যেক প্রদেশে পৌর প্রতিষ্ঠান গুলির
মধ্যে সমস্ত সাধন ও কর্মোত্তাপের কলারের অন্ত একটি
করে স্থানীয় গভর্নমেন্ট বোর্ড গঠন করা বাস্তব।
আমার প্রতিবেদনে আমি এই অভিমত ব্যক্ত করেছি
প্রধানতঃ আদর্শ ও হ্যাংগে হাই সরকার আমার এই
অভিমত গ্রহণ করেছেন বলে আমি মনেছি। কিন্তু
বাংলা সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারগুলি এতে
আশঙ্কিত করেন।

নবগঠিত বেঙ্গল কালিজিল মিঃ ডি. সি. বোর প্রমুখ
উত্থাপন করেন। স্থানীয় আন্তঃপ্রাণী শাসন বিজ্ঞানের
জ্ঞান প্রস্তাবের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। কিন্তু

অর্থনৈতিক অবস্থাটাই কাজের গবেষণার দৃষ্টি করল। এরচেয়ে দুদিন ঘোঁরা ছিলে স্থিতি বিকাশশীল জনগণের চোখে আঁধার হওয়া আর বিস্তার পটভূমিতে ইংল্যান্ডের মূল শোণ প্রকৃতির মাঝে বাংলার একটি পল্লী-বৈষ্ণব বৈষ্ণব পড়ে গেল। তাহলে আমাদের স্থানীয় স্বাধীন-শাসন পদ্ধতিতে নিশ্চিত ভাবে প্রাপ্য পাওয়া যাবে; উত্তম চেষ্টাকৃত হবে, কর্ম পদ্ধতির মধ্যে একটা সমতা আনা যাবে যেগুলি একান্ত সাফল্য লাভের কল এবং প্রয়োজন।

সব খেলেই নিজ নিজ ভিত্তি ভিত্তি পরিবেশ ও ভিত্তি পরিবেশনীয় সামর্থ্য শীঘ্রই মধ্যে জনগণের নিষিদ্ধিত পরিবেশগুলি হচ্ছে জনগণের শক্তির প্রধান দূর্ব। কখন কখন দেখা যায় এইসব পরিবেশ চরম পর্যায় বিস্তারিত পড়ে এবং সরকারের অসুবিধার কথা চিন্তা না করে, সরকারের যে এমন কতগুলি দায় দায়িত্ব আছে বা কোন সরকারই আসন্ন করতে পারেনা, সে গুলিকে উপেক্ষা করে। তা সত্ত্বেও এটা সমস্ত পরিবেশের নিষিদ্ধিত মূল্য আছে। জনগণের নিষিদ্ধিত পরিবেশের মধ্যে সেই জনগণ পরিবেশের যে তা সে মত চরমপর্যায় মতও হতে পারে, আর এই ভাবেই তা সরকারের কণ্ঠস্বর হয়। সরকারের ভূমিকা হচ্ছে শান্তি স্থাপনের ভূমিকা সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করা এবং সাধারণত প্রাধান্য কল হতে রাষ্ট্রের মূল সাধন ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। ১৯১৮ সালে বাংলার বহু লোক একটি আইনের বলে অস্বাভাবিক ছিলেন। ঠিক এ সময় ইংল্যান্ডের অস্বাভাবিক একটি আইনের প্রয়োগ চলছিল। একই কেস প্রায় উত্তরভারতের ছিলই; তা আরও বেড়ে গেল সরকারি কলের জন্য, যে কলটি ছিল আইনটির প্রয়োগ পদ্ধতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যেণে সংযুক্ত। এই কলটি হল গোপনীয়তা, এবং বিজ্ঞপ্তিকে এভাবে চলা, যা বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে ন্যায় বিচারের সবচেয়ে পদ্ধতিগত রক্ষণাবেক্ষণ। একটা অস্বাভাবিক কলের দ্বারা হচ্ছে সিদ্ধান্ত। মাঝমাঝে পরিচিত মাঝমাঝি। আর এরকম কল এই একটিই মাত্র নয়। বীজ্যতা কোমর হইকম সিদ্ধান্ত ছিল। তাহলে মনে একজনকে পুলিশের স্বাক্ষর।

পুলিশের স্বাক্ষর মিলেই সবটাকে অন্যায়সেই লক্ষ্য করে নিল। তাহলে দু-জনকে প্রোগার করা হল এবং প্রকাশ্যে সবার দৃষ্টিতে দিলে হাটটিতে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল। অস্বাভাবিক ছিলেন পরানীকী মহিলা দ্বারা প্রোগার করা অস্বাভাবিক কলও প্রকাশ্যে বাইরে আসেন না। কিন্তু ব্যাপারটির চরম পরিণতি ঘটল তখন যখন সেবা গেল যে লতিয়া তাহলে বিজ্ঞপ্তি সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় তার তের দিন তাহলে চাকতি আটক রেখে পরে ভেঙে দেওয়া হল। জনগণের নাগরিক জীবনে এটা বাস্তবিকই একটা অতি বেদনা হতে পারে। এর চেয়ে অনিষ্টকর প্রোগার আর কিছু হতে পারেনা। এই ব্যাপারে লতিয়া পুলিশ কর্মচারীরা তা আর ত দের গোপনীয় বাইরে নয়। অন্যসব পুলিশ কর্মচারীরা যেমন তাহলে তেমন। তাহলে একেই একটা অস্বাভাবিক পদ্ধতি প্রোগারই শিকার হয়ে পল্লী যে প্রোগারি টার চেয়ারের মিনগুলি স্বরণ করিয়ে দেয়। তাই পুলিশের লোকেরা গোপনীয়তাকেই তাহলে সমস্ত কর্মচারের একমাত্র অবলম্বন করে নেয়। এই ঘটনার বাংলা উত্তরভারত টপক করে ফুটে থাকে। দ্বারা মহিলাদের এইভাবে অপমানিত ও হেরে কাটা হচ্ছে, তাহলে প্রতি অপরাধীর মত ব্যবহার করা হয়েছে; তাহলে প্রোগার সামাজিক মহাশয় ও স্থিতি তাহলে এই অবস্থাননা থেকে চলা কখনো এবং সব কিছুই ঘটেছে একটা আইনের আড়ালে যে আইন মাধ্যমের অবগতির আলোকে চলে করে রেখেছে। কল শাস্তি বাংলা প্রোগার কোর্ট ঘোষে ফেটে পল্লী! আমার মনে হয়, এই একটা প্রোগার যে প্রোগারে কাউন্সিলের মেম্বারগণ আমার প্রোগারের জনগণের প্রোগার অস্বাভাবিক বাস্তবিক করা কর্তব্য। ১৮১৮ সালের কল হেজেলসনের অস্বাভাবিক কোন কোন আইনে দ্বারা অস্বাভাবিক আর্থ বা নিবাসনে আছেন তাহলে 'বগর-জনি পর্যাশোভার জন। একটি উদ্দেশ্য কলটি রক্তের এক প্রোগার উপস্থাপিত করণ। প্রোগারি বগর এটিও:

“এই কাউন্সিল সারিধ মরণের কোনেয়েলের মিত্র
এই প্রোগারি কর্তে যে প্রোগারি বিধি সম্পর্কে
অস্বাভাবিক করে প্রোগারি দেওয়া কল প্রোগার

এখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভারতীয় সদস্য নিয়ে একটি করে কমিটি নিয়োগ করা হোক। বিষয়গুলি হল :

- ১) ভারত রক্ষা আইনে আটক হয়ে রাখার সময় ঘটনাগুলি;
 - ২) ১৯১৮ সালের বেঙ্গল রেগুলেশন ও অফিসারের দ্বারা আটক করে রাখা হয়েছে এবং অল্পকাল কোম বেঙ্গলেশনে মাস্ত্রী ও বোম্বেরে থাকা আটক আছেন, তাদের ঘটনাগুলি;
 - ৩) অতঃপর দ্বারের উপর উক্ত আইন ও রেগুলেশন প্রয়োগ করা হতে পারে তাহলে ব্যাপারগুলি।
- কমিটির ঐ সময় দ্বারীরা 'ভাত', আটক রাখার স্থান ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সুশাসিত করার কর্তব্য থাকবে।

এই প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হওয়ার পূর্বে রোম মেম্বর স্যার উইলিয়াম ডিন্সেটের সঙ্গে এ নিয়ে আবার আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল। এই আলোচনা আবার কালের সহায়ক হয়েছিল এবং আবার মনে হয় এটা সরকারের কাছেও প্রয়োজন হবে পড়েছিল। আলোচনার কথা শিরে আবার আবারের মধ্যে কোমার হতেও ছিল রয়েছে, আর কোমার অধিল রয়েছে, তা বৃক নিতে পারলাম এবং তার পরে যদি প্রয়োজন হয়, একে অন্যের উপর আক্রমণ চালাতে পারব। কোম মেম্বর অসহ্য আবার করার যে সময় উত্তর দিয়েছিলেন, তা ছিল সরকারের লক্ষ্য সমর্থন করে। তবে তার মধ্যেও একটুখানি সহানুভূতির ছোঁচ ছিল। মোটামুটি তাই তিনি আবার প্রকাশ প্রদান করলেন এবং একটি উপলক্ষ্যে পূর্বে নিয়োগে প্রদত্ত হলেন। ভারতীয় সংখ্যক নয় হল যাঁরা বিশ্ব পরবেশে চরম পহার হিকে সূঁকে পড়েছিলেন তারা এই মনোবৃত্তিতে দ্বারগত জানাচ্ছেন। যিঃ জাটিন বিজ্ঞানগু এই বর্ণিত স্যার নারায়ন চন্দ্র বরকার কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হলেন, এবং বাংলায়, আমি জানতে পেরেছি, একশত জন জেটিনিউর মধ্যে ৬ জনকে সূঁকে বেওয়ার জন্য কমিটি সুশাসিত করেছিলেন। এই কমিটি গঠন এবং তাহের কাজ কর্মমতের উন্নততকে কিছুটা প্রশমিত

করেছিল। অসহ্য অতীত দ্বারকার বিচ্ছেদ পক্ষে-এটা জনমতকে তাহের কাজ দুই করতে পারেনি; তবে এখন এই কমিটি তাকে আগের চেয়ে একটুখানি কম অগ্রহণযোগ্য করেছে বলা যায়।

রাউলট অ্যাক্ট সম্পর্কে ইম্পেরিয়াল কাউন্সিলে যে বিতর্ক হয়, সে সম্পর্কে এখানে কিছু কথা প্রাসঙ্গিক হওয়া। এই রাউলট অ্যাক্ট হল একটা মনন মূলক আইন, এ দেশের সাধারণ ফৌজদারী আইনের একটা ব্যতিক্রম। এই আইন দেশের সর্বত্র বিধোচিতার সূত্রী করল দ্বার দ্বারা যিহে কাউন্সিল চেম্বারেও লাগে। বিচারটি নিয়ে হোম সেক্রেটার স্যার উইলিয়াম ডিন্সেটের সঙ্গে আলোচনার জন্য যিঃ উনিয়ন দ্বারী ডঃ সেক বারাক্তর সাক্ষর এবং আবার এক হওয়া বৈধতা প্রাপ্ত হয়েছিল। আবার সেক্রেট্রী ঐ বিলের বিরোধিতা করেছিলেন। স্যার উইলিয়াম এটাকে একটা সাময়িক অস্থায়ী ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে চান। কিন্তু তা সংঘর্ষ আবার এই বিলটিকে সমর্থন করতে পারিনি। কাউন্সিলে আমি দুটোকার সঙ্গে বিশদিত বিবরণের কথা কথনাম এবং সন্তর্পণ করে দিয়ে বললাম যে সরকার একটি সাময়িক ব্যবস্থা নিতে বাঞ্ছন এবং এর ফলে অন্তত প্রচণ্ড আন্দোলন ও বিক্ষোভ দেখা যাবে। কিন্তু আবারের প্রস্তাবের কোন ফল হল না। বিলটি পাশ হয়ে গেল। তবে কার্যকর এই আইন দুই বছর পরে পেরে গেল। এর দ্বারা তুলিকে কোন সময়ে কার্যকরীতপ হওয়ার হয়নি কিন্তু আবার বা ভবিষ্যৎ দ্বারী করেছিলেন, তা অকরে অকরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই রাউলট আইনই অগ্রহণযোগ্য আন্দোলনের প্রসূ দিয়েছে।

১৯১১ সালের ২৪শে আগস্টের ডেসপ্যাচটি একটি স্বরূপে রাখার মত হল। আবারের দেশের ঘটনাবলীর মধ্যে এটি একটি জ্ঞানপ্রসূতির পথ-নির্দেশক কৃতিত্ব স্বত্ব। এই ডেসপ্যাচ বঙ্গদেশের সাধারণ সুশাসিত করা হওয়া আরও বেশী কিছু করেছে। এই ডেসপ্যাচ প্রাথমিক স্বাধীনতাপননের প্রতিশ্রুতি দান করেছে এবং আবারের পরবর্তী সমস্ত প্রাণেশিক সফলতায় এই প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বের কোম বিবে অধিলবে তা কাব্যে তপারিত করার দ্বারী জানান হয়। (চলবে)

অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেশ পশ্চাৎপদ কেন ?

শ্রীকেশব বন্দ্যোপাধ্যায়



বিগত আড়াই বছর ধরে ভারত তার অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। জনতাদলের অবিমুদ্রকারীতায়, কারণ জনতা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে জনতা নেতারা নিজেদের মধ্যে দারুণ অন্তর্ঘর্ষে লিপ্ত হন ও আত্মকলহের জন্য দেশ শাসনে ব্যর্থ হন পদে পদে, মতবৈধতার শিকারে পরিত্যক্ত হয়ে ; যা সভাই দেশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক বলে প্রতীয়মান হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে জনতা তার বিরুদ্ধ শক্তিকে পূর্নদস্ত করার জন্য একের পর এক কমিশন বসায় সরকারী খরচে ও তাতেই এত অসমর্থ হয়ে যায় যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করার মত সময় ও সমিচ্ছা তাদের আর অবশিষ্ট থাকে না। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় শাসকদলের নির্বুদ্ধিতায় যা যে কোন দেশের পক্ষে বিপদজনক।

জনতা আমলে এদেশের শিল্পোৎপাদন সব চেয়ে বেশী মার খেয়েছে এবং এর মূল কারণ দেশে সীমাহীন বিদ্যুৎ ঘাটতি। শিল্পক্ষেত্রে যেখানে প্রায় ছয় শতাংশ উৎপাদন বাড়ার মত অবস্থার কথা আশা করা হয়েছিল সরকারী দপ্তরে, সেখানে বাড়ী হা দূরের কথা শুৎপরিবারে চুই থেকে প্রায় তিন শতাংশ কমেছে। ভিক্সেল ও কেবোসিনের অভাবে এত তীব্র আকার ধারণ করে যে রেল পরিবহন ও ট্রাকপোর্ট পরিবহন প্রায় বানচাল হবার দশার উপনীত হতে দেখা যায়। খাজান্দা

উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে, বন্যা ও বগা উভয় প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে।

বিশ্বের সঙ্গে বার্নিকো ঘাটতি প্রায় গোল মত কোটি টাকার মত বাড়িয়েছে ১৯৭২-৮০ সাগে। রেলের রাজস্ব বাবা আয় প্রায় তিন কোটি টাকার মত কম হয়েছে। পাইকারী মূল্যসূচকে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় চক্কিম-পঁচিল শতাংশ যা বিশেষ ভীতিপ্রদ সাধারণের পক্ষে। ১৯৭৮-৭৯ সাগের ভুলনায় খানাদসার উৎপাদন প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টন কম দেখা যায়। অংশ এবারকার ধরা মারাত্মক ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ছিল, এতদসত্ত্বেও যে এগার কোটি আশি লক্ষ টন খাদ্যোৎপাদন সম্ভব হয়েছে—সেটাই আশার কথা দেশবাসীর পক্ষে। এ বছর স্বরায় সবচেয়ে বেশী চোট খেয়েছে আখ-চাষী, ফলে তিনি কলগুলির উৎপাদন বেশ কমেছে কাঁচা মালের বোগানের অভাবে।

কিছু কিছু রাজ্যে ইম্পাত ও সিমেন্ট শিল্পের ক্ষতি হয়েছে মারাত্মক রকমের। কয়লা উৎপাদন ও উত্তোলন প্রায়ই বাধা পাচ্ছে, হয় বিদ্যুতের অভাবে আর না হয় ত্রিভেলের অভাবে। কোন কোন শিল্পে কাঁচা মালের অভাবে অথবা ত্রমিক অসন্তোষের কারণে উৎপাদন মন্থর হতে বাধা হচ্ছে, ফলে হ্রাসমূল্য বৃদ্ধি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কয়লার অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনও সীমিত হতে বাধা

হচ্ছে, কারণ একে অপরের পরিপূরক অল্প দরকারী সামগ্রী বলে। ভিজিলের মাত্রাতিরিক্ত অভাবের ফলে ডীপ-টিউল প্রায় অচল, মালগাড়ীর প্রাধান্য চলাচলও বিস্তৃত প্রায়শই; ফলে খাচরিত উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি ও পণ্যদ্রব্য উচ্চমূল্যে হতে বাধ্য হয়। এসবের সময় থাকতে প্রতিকারের চেষ্টা জনতা সরকার বা চরণ সরকার কেউই করে নি, তারা শুধু পরস্পরের ওপর দোষারোপেই ব্যস্ত ছিলেন।

চরণ সিংহের তদারকি সরকারের আমলে গত বছর কেন্দ্রীয় মাসে এক হাজার তিনশত পঞ্চাশ কোটি টাকার মত ঘাটতি দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাজেটে। এ বছর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত অংকটি ছিল প্রায় দু'হাজার একশত চতুষ্শি কোটি টাকার মত। বিবেক বাজারে তেলের দাম বাড়ার ফলে সরকারকে বাড়তি খরচের দাকার পড়তে হয়েছে, তাছাড়া বরা-প্রাণে আরো বাড়তি খরচের কৃকি নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। খরচ কলে রাজস্বও ঠিকমত আসায় হয়নি। কাজেই কেন্দ্রীয় বাজেটে সব জড়িয়ে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় দু'হাজার কোটি টাকার গিয়ে দাঁড়াতে বলে অনুমান হয়। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছয়শত পঁয়ষট্টি কোটি টাকার মত প্রস্তাব এনেছিলেন, গত বাজেটে চরণ সিংহের প্রধান মন্ত্রীকালে। এ বছর ছয়শত বাড়ার ফলে সেই বাড়তি খরচ সংকুলানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে মোট অংকের মত প্রস্তাব দিতে বাধ্য হতে হবে। সুবের কথা, বাজেটে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি সেবার হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোন দৃষ্টান্ত করে বোকা চাপান হয় নি। পরে হয়তো বা বাড়তি করে বোকা জনগণকে বহন করতেই হবে নিরুপায় হয়ে। বরজমী মেঘের গুচ্ছ গজ'নই সাব, বর্ষণ শুধু সুবিধাজনক হয় নি।

গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে জনবিদ্বেষ কেন্দ্রে বিদ্বেষ উৎপাদন বেশ কড়ারকম ব্যাহত হয়েছে। সুবর্ণেশের অভাবে ক্ষেত্রে খামারে কল উৎপাদনও কম হয়েছে। উপরোক্ত কৃষি নির্ভর শিল্প সংস্থাগুলি সেকারণেই দারুণ মার খেয়েছে ও রপ্তানী বাণিজ্যে ঘাটতির সৃষ্টি করেছে। ভারত কৃষিজাত পণ্য ও উদ্ভিদ-তৈল এবং উদ্ভিদ জাতীয় সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে আমদানির ঘাটতি পূরণে সক্ষম হয়। এবারে রপ্তানী পণ্য কম উৎপাদিত হয়েছে ঘন ঘন শ্রম বিরোধের ফলে একদিকে, আর কাঁচা মালের, ভিজিলের, বিগ্গানের ও কলার অভাবে অন্য দিকে।

মোট কথা জনতা সরকারের ও চরণ সরকারের আমলে দেশ বেশ কড়া রকমের আর্থিক কতি স্বীকারে বাধ্য হয়, একদিকে ঐ উক্ত সরকারের দুর্-দশতার অভাবে, কর্মকুশলতার অভাবে, বৈষয়িক বিচার বৃদ্ধির অভাবে ও বণ্ডার্বাটির ফলে; আর অন্য দিকে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনের ও মাত্রাতিরিক্ত শ্রম বিরোধের এবং ধর্মঘট লে-অক লক আউট স্ট্রাইকের ফলে। রাষ্ট্রপতি যারা পরিচালনার নিযুক্ত ছিলেন তখন, তারা দেশের আর্থিক উন্নতির চেয়ে নিজ নিজ রাজনৈতিক ব্যক্তিগত উন্নতির চিন্তায় গভীর ডাবে মগ্ন ছিলেন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এতই ব্যস্ত ছিলেন যে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা তারা ভুলে গিয়েছিলেন, আত্মস্বার্থে ও নিজ নিজ পারিবারিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করার চিন্তায়। কাজেই ভারতের অর্থনীতি ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমানের পথে ধাবমান হতে বাধ্য হয়, জনতা ও জনতা (এস) অর্থাৎ লোকসলের নেতা যের অবিস্মৃতিকারীতার জন্য প্রধানতঃ। ১৯৭২-৮০ সালে ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থা বেশ হতাশাব্যঞ্জক বলেই দেখা যায়। সব মিলিয়ে দেখা যায় যে, অর্থ নৈতিক বিকাশের পথ শুধু প্রায় বন্ধ হয় নিতা প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের

পাইকারী মূল্য এবছর লাক্ষিতে লাক্ষিতে বাড়তে থাকে বলে জনগণ দারুণ দুর্বিপাকে নিশ্চিত হয়। যেমন ১৯শে জানুয়ারী থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এ বছরে মূল্য সূচক ৪.২ শতাংশ। তদারকি সরকারের আমলে অর্থাৎ ২১শে জুলাই ১৯৭২ থেকে ১৯শে জানুয়ারী ১৯৮০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মূল্য-সূচক ২১১ পরশট থেকে ২২০.৮ অর্থাৎ ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

ক্রীমতী গান্ধী প্রধান মন্ত্রীর পদীতে আসীন হওয়ার পর সকলেই আশা করেছিল যে, দাম বাড়ার এই সীমাহীন পতি বোধ হয় এবার স্তব্ধ হবে ও কমার দিকে মোড় নেবে। কিন্তু সে আশা বার্থ হয়েছে, বাস্তব অবস্থাই তা প্রমাণ করে। মূল্য সূচকের বর্তমানে বাড়ার হেঁচকই পরিদৃষ্টমান দেখা যায়। শিল্প বিকাশের গতিও বেশ লম্বা এখন পর্যন্ত বিদ্যুতের ঘাটতি তার জন্ত দায়ী প্রমাণিত। বিদ্যুতের অবস্থা ক্রমশ আরো শোচনীয় হতে দেখা যায়। কমলা উৎপাদন এখনও নিম্নস্থিতি। ধান শিরে কাঁচা মালের ক্রমবর্ধমান অভাব ও শ্রমিক সমস্যার ভীতিতে বৃদ্ধি অর্থনীতির ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিতে উদাত। ঠিকমত বর্ষের অভাবে সংরক্ষিত জলধারগুলি চাবের জল সময় মত যথা-প্রয়োজনে বোগান দিতে পারে নি, ফলে চাষ আবাদের ক্ষতিও কম নয়।

রাজস্থানে পর্যাপ্ত বিদ্যুত কেন্দ্রের ব্যর্থতায় এ রাজ্যে ইস্পাত উৎপাদন বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রেলের রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে বোধ হয় ৮০ থেকে ১০০ কোটি টাকা। ১৯৭২-৮০ সালে, অথচ ১৯৭২ সালের বাজেটে রেলমন্ত্রী মধু দত্তবতে তাঁর বক্তিত রেল বাজেটে ৮০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখিয়ে ছিলেন কি ভাবে তা প্রাণধানযোগ্য। অবশ্য বর্তমান রেল দপ্তর কমলাপতি গ্রিপিটার

সুযোগ্য পরিচালনায় ওই ঘাটতি পূরণে নেবার সবাই আশা রাখে। এবছর দারুণ ভারতবাসী ব্যয় সংকেতে বেশী চোট খেয়েছে আশ-চাষী ও উৎপাদন কেন্দ্রগুলি। সরকারী নীতি ও এক্ষেত্রে কম দায়ী নয়, কারণ চাষীরা গত মরসুমে লাভজনক দাম পায়নি সরকারী নীতির ফলে; তাই তারা এবার চাবের পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেয়, হিসাবে দেখা যায় যে, প্রায় ৪৫ হেক্টর জমিতে তারা এবার আখ-চাষ করেনি বেকার।

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। কাজেই চাবের ফলন কম হলেই এখানে অর্থনীতি মার যায়। তাছাড়া ভারতে বর্তমানে এ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিয় অর্থাৎ কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল শিল্প কারখানাগুলি অর্থ-নীতিকে চালা রাখতে সাহায্য করছিল বিগত কয়েক বছর ধরে রপ্তানী বাড়িভোর প্রসারের মাধ্যমে; কিন্তু ব্যয় প্রকোপে যেমন কৃষি মার খেয়েছে, সেইরূপ এই সকল শিল্প ও রপ্তানী বাড়িভা মার খেয়েছে এ বছর। মানুষ প্রকৃতির ও অবস্থার দাম আঁকও। বিজ্ঞানের উন্নতি আশাতিরিক্ত হলেও বরা (বদ্ধা) বা বরা (অনারপ্তি) কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি মানুষ আঁকও, ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই সে অসহায় এক্ষেত্রে। গত দিনের কেন্দ্রীয় সরকারের গলতিতেও ভুলে এবং অযোগ্যতার ফলে একদিকে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ও ভারতীয় শনিক-বণিকদের কারসাজিতে ও ভুলে ভরা ট্রেড-ইউনিয়নজনের ফলে অন্যদিকে; ভারত অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পঞ্চাংপন হতে বাধ্য হয়েছে, বিগত প্রায় কয়েক বছর ধরে। ক্রীমতী গান্ধীকে এখন শক্ত (বাকী অংশ ১৪ পাতায়)

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আবেদন

- ১। ● গণভদ্ৰাক বৰ্দ্ধা ও সম্প্ৰসাৰিত কৰুন।
- ২। ● সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি ও জাতীয় সংহতিক অক্ষুণ্ণ ৰাখুন।
- ৩। ● শ্ৰমজীৱী মাণুষ্যৰ অধিকাৰক এবাৰ তীব্ৰ ভাৱে জনগোষ্ঠীৰ মাজত উন্নত কৰাৰ সংগ্ৰামক শক্তিশালী কৰুন।
- ৪। ● পঞ্চায়াত্মক মাধ্যম গণভদ্ৰক ধাৰাকৈ গ্ৰাম গ্ৰাম প্ৰসাৰিত কৰুন।
- ৫। ● শিক্ষাক্ষেত্ৰ তৈৰাশা দূৰ কৰুন। শিক্ষায় শ্ৰমজীৱী জনসাধাৰণৰ অধিকাৰকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰুন।
- ৬। ● ক্ষেত্ৰমজুৰি বৰ্গীসাৰ সহ সমস্ত কৃষকৰ স্বাৰ্থ বৰ্দ্ধা কৰুন। কৃষিৰ উন্নতি ও ভূমি সংস্কাৰৰ কাজ জাৰদাৰ কৰুন।
- ৭। ● এই ৰাজ্যৰ শিল্পৰ পুনৰুজ্জীৱন সহায়তা কৰুন।
- ৮। ● জনগণ ও পৰকাৰৰ সহায়সিতাকে আৰও শক্তিশালী কৰুন।
- ৯। ● প্ৰতিক্ৰিয়াশীল কাৰ্য্যতী স্বাৰ্থৰ সকল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্ক থাকুন।

পশ্চিমবঙ্গ সৰকাৰ কৰ্তৃক প্ৰচাৰিত

ভাষাতত্ত্ব বিশ্বব্যব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ কীর্ত্তন দত্ত ॥

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

রিপোর্টে বলা হল যে পাঠ্যবইয়ের অবস্থা এখন ছিলনা যে আলিফান্ডালায়ানে তুলী করবে প্রয়োজন হয়। সরকারী হাঠীর কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল ২৮ মে। কমিটির দুজন ভারতীয় সদস্য হলেন, পাঠ্যবই সাময়িক আইন কার্যকর কোন বৌদ্ধিকতা ছিলনা। কিছু অধিকাংশ সদস্য ছিলেন ইংরেজ। তাঁরা হলেন যে পাঠ্যবই কোনরূপ বিস্তারিত লক্ষণ ছিল না যতই সাময়িক আইনের প্রয়োজন ছিল। অংশ তাঁরাও স্বীকার করলেন যে এত অধিকার হয়ে শুধী ধরন করা মেহায়েল ভায়ারের নকল উচিত হয় নাই। লতনে কমন সভা এ সম্পর্কে যে আলোচনা হল তাতে ভারত সচিব বস্টের স্বীকার করলেন, “মেহায়েল ভায়ারের গুরুতর বিচার বিষয় ঘটছিল তাকে আর ভারত সরকারের অধীনে নিয়োগ করা হবে না”। কিছু লভ নভার কমন সভার এই সিদ্ধান্তে গবে প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং সেখানে ভারতের কাংগনীর ক্ষত তাকে প্রমাণ করা হল। ইংল্যাণ্ডে ইংরেজ বক্তৃতা ভায়ারের কাংগনীর প্রমাণ করেন এবং তিনি ভারতীয়ের বিস্তারিত বিবরণে সত্যতা চক্রে ওয়েনে বলে তিন লক্ষ টাকা ঠালা জুড়ে তাকে উপহার দিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সচিব লর্ড অস্ট্রায়ে ডুংগের মূলতানকে কমস্বাক্ষরোপঃ মিত্র শক্তি বর্গের নম্বর বন্ধী করে রাখা হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যকে আরও প্যালেস্টাইন নিষ্কিয়া মিলোপটে মিত্র প্রকৃতি নানা অংশে বিভক্ত করা হল। তুরস্কের সম্রাট ছিলেন মুহিতার বলিকা। যুদ্ধের সময় রুটিন পদার্থযেই ভারতবাসী মূলমতানকে আর্থাগ নিয়ে তিনেন যে দুই অর্থের পরে বলিকা প্রাতি কোনরূপ অস্ত্রাধ অচল করা হবে না। কিছু দুই মেবে

সেই আর্থাগ বাক্য জুলে নিয়ে সচিব লর্ড নানাক্স কীপসর্ড আর্থাগ তরতে ভারতীয় মূলমতানক স্বঃ এবং উত্তরিত হয়ে উঠল। এই সময় মহাদ্রাশাক্তি বিদ্রুত মূলমতানকের পাশে নিয়ে ষাডালেন। এলাল্যাবনে মূলমতান মৌল কাউনসিলেও অধিবনে তিনি অসহযোগের অর্থ ও কাংগনীর বিবর্তা কাংগনীর করে মূলমতানকে বৃত্তিরে মিলেন যে অধিব অসহযোগই মিলাকং সমস্যার একমাত্র প্রতিকার। ১৯২০ সালের ১৮মে যে বোম্বাই নগরঃ নিবিল ভারত বিলাকং মংগলেন অস্বীকৃত হল। এই মংগলেনে পাণ্ডিকীর অসহযোগ পুত্রা গৃহীত হল। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লালসিঅলং রায়ে লভাণ্ডিঃ কলিকাতার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন অস্বীকৃত হয়। এই মংগলেনে পাণ্ডিকীর অসহযোগ পুত্রা গৃহীত হল। কংগ্রেস অধিবেশনের পরে মূলমতান কীপসর্ড এক অধিবেশন হল। এখানেও অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাণ্ডিকীর অধিব অসহযোগ প্রস্তাব ভারতের স্বাভাবিক ইতিহাসে এক মূলমতানী পরিবর্তন ঘটনা করল। সরকারী বিচারায় আইন সভা বিচার প্রতিষ্ঠান প্রকৃতি বর্গনেও সিদ্ধান্ত নিয়ে পাণ্ডিকী আকোলেন আরম্ভ করলেন।

এইভাবে পাণ্ডিকীর নেতৃত্বে পাণাণাণি দুটি আকোলনই যের একমত হল। বিলাকং সমস্যার সমাধানে মূলমতানকের বিলাকং আকোলন এবং আলিফান্ডালায়ান অস্ত্রাচরের সমাধানে কংগ্রেস আকোলন। তবে প্রথম দিকে পাণ্ডিকী বিলাকং আকোলনের প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব আর্থাগ করলেন। ঐতিহাসিক রমেন চন্দ্র মজুমদার এ সম্পর্কে বলেন— ‘পাণ্ডিকী বিলাকং আকোলনকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে এক পর্বাণে কেললেন এবং ১৯২০ সালের প্রথমে বিলাকং আকোলনই

তার কাছে জীবিত রয়েছেন। তাঁহার নেতৃত্বে অনেক হিন্দুও ইরাক্তে যোগ দিলেন। পাকীজী হুজি দেখাইলেন যে বিশেষ সহায়তাই বন্ধুত্বের পরিচায়ক, যদি মুসলমানের বিশেষ আমরা সাহায্য না করি তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য অসম্ভব। এই হুজি খুব উপভূক্ত পরিচায়ক সন্বেহ নাই কিন্তু পাকীজী ভাটীয়াতা বাহের মূল প্রকৃতি বুলিয়া গিয়াছিলেন। কোন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐক্যে একটি জাতি গঠন করিতে হইলে তাহার সর্বপ্রধান উপায়ান এই হইবে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটির সম্বন্ধ অন্যান্যের সম্বন্ধে বেশের বহুবৃত্ত অত্রকোন গোষ্ঠীর সম্বন্ধে তথ্যরূপ অথবা অধিকতর বহিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে না। যদি থাকে তাহা হইবে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় যদি ভারতীয় হিন্দু অপেক্ষা তুরস্কের বা অন্য কোন দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকতর ঘনিষ্ঠ মনে করে তবে হিন্দু মুসলমান মিলিয়া ভারতে এক জাতি গঠন অসম্ভব।" (বাংলা দেশের ইতিহাস-চতুর্থ খণ্ড-পৃষ্ঠা ১০২)

আমরা দেখি ঐতিহাসিকের ধারণা বিখ্যাত। পাকীজী সামান্যতঃ পর্যন্ত একমুখে বীরতে চেয়োচালন শিল্পকে আন্দোলনের কথা কহিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর ফল আজ স্পষ্ট। ভারত আজ হিন্দু ভারত এবং মুসলিম ভারতে পরিণত।

১৯২০ সালের ১৪-ই মে যুক্তশক্তি সমূহের সঙ্গে তুরস্কের সন্ধি সংক্রান্ত লেডাং সন্ধি সই করা প্রকাশিত হল। এটা এবং ২-রা জুন কেম্রী বিলাক সংকলনের অঙ্গীকার হল। পাকীজী পূর্ণ লক্ষ্যের জাতিয়ে বিলাক আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রণয় করলেন। ২২শে জুন বিলাক কমিটি বড়লারের নিকট এক চতুর্থ পর পাঠিয়ে দানী করল যে পরবর্তী এটা আগ্রহের মধ্যে তুরস্কের প্রতি প্রতিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা সমস্ত ভারতের মুসলমানগণ ঐ দিন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। ঐ ২২শে জুন তারিখেই পাকীজী বড়লারের নিকট এক পর লিখলেন। ঐ পরে তিনি আন্দোলন মুসলমানদের এট দানী ব্যাঙ্গলকত। তিনি নিজে কেন এই দানী লক্ষ্য করলেন তাও তিনি বড়লারকে জানিয়ে গিলেন। পরবর্তী

এটা জুলাই পাকীজী বরা ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমানদের লক্ষ্য থেকে এক চতুর্থ পর প্রণয় করলেন। পাকীজীজী নেতৃত্বে এটা আগ্রহের ভারতীয় যোগ্য করা হল। ৩১শে আগস্ট বিলাক আন্দোলন কালীন্দ অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান এক ঐক্যে উদ্ভাটন নিয়ে সংগ্রামে কালিয়ে পড়ল। ৩১ সেপ্টেম্বর কলিকাতার কংগ্রেসের বৈশেষ অধিবেশনে জরাজীর্ণের নিকট লরকানী লক্ষ্য এবং লক্ষ্য প্রণয়ান এবং আইন সভা আলোচন ও মূল কলেক বহুতর বহুতর আবেদন জানানো হল। জরাজীর্ণের চরকার হুজা কালী এবং কালী বহুতর লক্ষ্য লিখে লেখা হল। এটা পাকীজীর সংগ্রামের প্রথম লক্ষ্য। চতুর্থ পূর্ব বহু বহুতর লক্ষ্য লক্ষ্যের প্রথম লক্ষ্য হল। পরবর্তী লক্ষ্যের মধ্যে লক্ষ্যের চতুর্থ লক্ষ্য লক্ষ্য লক্ষ্য আইন অসহযোগ নিষাচন অসহযোগ হল। কলিকাতার

(১১ পাতার পরের অংশ)

হাতে এ চতুর্থ লক্ষ্য লক্ষ্যে হবে এমনভাবে যাতে ভারত অর্থনীতির ক্ষেত্রে অচিরেই এই বিপর্যয় কালিয়ে উঠে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়। তবে একথা ঠিক যে, বিগত দুই-তিন বৎসরে ভারত অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেভাবে লক্ষ্যলক্ষ্য হয়ে পড়েছে, সেই অবস্থা থেকে তাকে টেনে তোলা ও পূর্বের ভাল অবস্থার আনা মুকতিল ও সমর্থ সাপেক্ষ। কাজেই হতাশা ভাগ করে আমাদের সকলকেই অর্থনীতির পূর্বাভাস। ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হতে হবে এবং তা সম্ভব হবে যদি ক্ষেত্রে থাকবে, কলেক-কালবানায়, খনিতে, গবেষণাগারে ও উৎপাদনের প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা জাতীয় চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে কঠিন পরিশ্রম করি নিজেদের বাঁচার তাগিদে ও দেশকে অর্থনীতিতে স্বাধীন করার জরুরী প্রয়োজন বিবেচনায়। সবার একাত্মিক শুভ প্রচেষ্টায় এ সাময়িক বিপর্যয় কেটে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি।

কংগ্রেসের স্থির অধিবেশনের নির্দেশ অনুযায়ী জনসাধারণের অধিবেশনে সে নিষিদ্ধ বসতি করল। তেঁাট লোকের জুই-তুটীয়াংগ ছোট ছাল থেকে বিস্তৃত থাকেন। ছাত্রগণ বিরাট উল্লেখ্য মিথে কল কলেক ছেড়ে অন্তঃস্থান আন্দোলনে যোগ দেয়। ভিন্দেবত মানে জাতীয় কংগ্রেসের দায়িত্ব অধিবেশনে হল নাগপুরে। এখানে বাইন হাজার প্রতিনিধি মিলিত হয়ে গান্ধীজীর সংগ্রামের পরিচয়না প্রদান করে গ্রহণ করল। প্রত্যয় অনুযায়ী কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য হল—“ব্যক্তিগত ও বৈধ উপায়ে স্বাধীন লাভ।”

নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীজী বললেন—“ব্রিটিশ জনসাধারণ জানিয়া রাখুন যে তারা যদি তাদের ধর্মো অঙ্গীকৃত আবিষ্কারের প্রতিকার না করে তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করাট হ'বে প্রত্যেক ভারতবাসীর অধিকা

কর্তব্য।” মৌলানা মহম্মদালী তাঁর ভাষণে বলেন—“ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুইটি দৃষ্টিতে আন্দোলন এবং কলকাতা থেকে দিতে হ'বে।” গান্ধীজী আরও বলেন—“ভারতবর্ষ তার সকল শক্তি দিয়ে পিলাপে ব্রিটিশের সহিত লক্ষ লক্ষ ছিন্ন করতে না চাইলেও ব্রিটিশের সহিত জিরকাল যে কোন প্রকারে সম্পর্ক অর্থাৎ রাখবার দ্বিত্ব করেও ভারতবাসীর জাতীয় মর্ম্মদার পক্ষে হানিকর। ব্রিটিশ সরকার যে সময় স্ববিচার করেচে এবং যেভাবে প্রতিকারের দাবী অগ্রাহ্য করেছে তাতে ব্রিটিশ সম্পর্ক বৈধ এলা ভারতের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।” ৩১শে ডিসেম্বর নাগপুর অধিবেশনে বসতি গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, এক বছর পরে ১৯২১ সালের এপ্রিলে ভিন্দেবত মানে। ভারতবাসীর স্বাধীন লাভ অঙ্গীকার। (চন্দে)

পন্নালোকে বিপ্লবী শান্তি সোম

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বিষ্ণু হাসপাতালে বিপ্লবী শান্তি সোমের জীবনাবসান হয়েছে। ঢাকা বিক্রমপুরের হাসান্জা গ্রামে তাঁর জন্ম। কৈশোরেই তিনি মুগ্ধতার দলের সদস্য হন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, ফোর্সে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার তিনি বরা পড়েন এবং ৮ বৎসর রাজকন্যী হয়ে বিভিন্ন জেলে ওষুধী শিবিরে আবদ্ধ থাকেন। তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন। আমরা সত্যসত্যময় বন্ধুসংসল এই বিপ্লবীর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

শোক সংবাদ

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রাক্তন কংগ্রেসী এবং আজীবন গান্ধীবাদী নেতা ও বর্তমান জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য অতুলচন্দ্র সামন্ত মহাশয় গত ২৫শে ফাল্গুন '৮৬ ইং ২২ই মাঘ '৮০ রবিবার বৈকাল ৪ টা ৫ মিঃ পন্নালোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসরের অধিক।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—CALCUTTA			
Bhowmik Smt Uma Rani	56 Sitaram Ghosh St. Cal-9	150	15 8 79
w/o Late Nired Barua	C/o Debabrata Chakraborty		
Bose Biswanath	21E Haralal Mitra St. Calcutta-3	200	30 3 74
Das Birendra Chandra	35 Balaram Majumdar St. Cal-5	200	5 3 79
Dutta Nareesh Chandra	6/4 Prince Baktiar Shah Rd. Cal-33	200	1 4 79
Datta Smt Kiranbala	c/o B. N. Kar Chowdury	100	22 1 79
(alias Kiranmoyee)	87 Baburam Ghat Road		
w/o Late Profulla Kr Dutta	(Previous Vill Digba, Gaighata, 24 Parg.		
Dist—24 PARGANAS			
Bhowmik Harendra Kumar	Vill Rajdanga, P. O. Haliu	200	27 3 74
Chatterjee Kalidas	Netaji Palli, Manikdanga	200	16 12 78
	Ghola P. O. Sodepur		
Dist—HOOGHLY			
Bhadra Smt Uma Rani	4/C Dhrubesh Chatterjee Lane	100	17 11 79
	P. O. Uttarpara		
Dist—BURDWAN			
Biswas Narendra Nath	Railper Defopara Karuna Niketan	200	2 6 78
	P. O. & Vill Annsol		
Mukherjee Saraju Prasad	Vill Kulchanda P. O. Bhatav	200	1 4 75
Dist—NADIA			
Mukhopadhyaya Smt Mira	Nagendra Nagar, Mathpara,	150	10 10 79
w/o Late Jibankrishna Mukhopadhyaya	P.O. Krishnanagar		
Dist—PURULIA			
Gorain Bilasi	P. O. & Vill Lakhampur	100	3 8 79
Dist—MIDNAPUR			
Das Bishnupari	Vill Matilal Chak, P. G. Janka	200	14 12 73
Dey Smt Mayarani	P. O. & Vill Dasagram	150	5 6 75
w/o Late Anil Kr Dey			
Gana Sadananda	Vill Chinadari, P.O. Bahadurpur	200	2 4 74
Mahato Sripati Chavan	Vill Katnimaro, P.O. Mahim nichhola	200	15 8 72
Dist—COOC BEHAR			
Bose Roy Smt Renu		200	24 10 79
w/o Late Satish Chandra Bose Roy			

২/৩৫

বিশ্ববী পুস্তকমালা

অনুশীলন সমিতির বিদ্যুৎ প্রকাশ—প্রবেশচক্র বাসে—০.০০

বিশ্ববী যানবাহন বাসবিহারী—প্রবেশ মন্ত্রণালয়ে—০.০০

কীর্ত্তন কুমার সত্তের—

- | | |
|--|---|
| ১। এংলো অসিট—১.৫০ | ২। বহির্ভাষে ভাষাভাষী বিশ্ববী—০.০০ |
| ৩। অনুশীলন সমিতির পি. বিজি—২.০০ | ৪। গৌড়ী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০ |
| ৫। কাকোয়ী পদোন্নতি—১.২৫ | ৬। কদমতা সংগ্রাম কাহিনী—১.০০ |
| ৭। বাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—০ | ৮। বাসবিহারী পদোন্নতি বা ৫ মেসে—১.০০ |
| ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—১.৫০ | ১০। বিশ্ববী বিবেকানন্দ—১.০০ |
| ১১। মহাত্মা ও ভূতাত্ত্বিক—১.০০ | ১২। ভারতের নব্যজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—১.৫০ |
| ১৩। দেশ বাসের ভোগেনি (১)—১.০০ | ১৪। দেশ বাসের ভোগেনি (২)—২.০০ |
| ১৫। পদোন্নতি সংগ্রাম কাহিনী—১.০০ | ১৬। ১৯ই এপ্রিল জাতীয় পদোন্নতি বিদ্যুৎ—১.০০ |
| ১৭। হাতিজা জাতীয় প্রচেষ্টা—১.৫০ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—১.০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পদোন্নতি ইতিহাস—১.০০ | ২০। লাইন জাতীয় প্রচেষ্টা—১.৫০ |

আবিস্থান :—১৫ বঙ্গবাস ট্রাষ্ট কলিকাতা-১০০০১

টেলিগ্রাফ :—১/১/১/A বহির্ভাষে জাতীয় পদোন্নতি-১০

27 MAR 1977



— সম্পাদক সত্তের —

অনুশীলন সমিতির (মহাপ্রতি) প্রিভেটচক্র মন্ত্রী, প্রিন্স জাটাজী

সম্পাদক—প্রিন্স জাটাজী

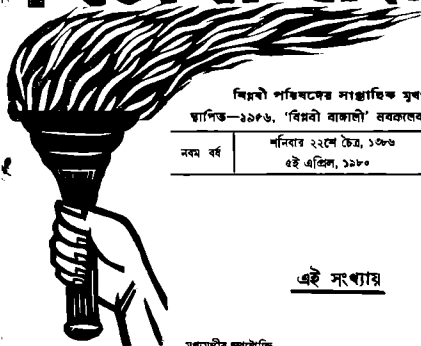
বিশ্ববী বিদ্যুৎ প্রিভেটচক্র—প্রিভেটচক্র মন্ত্রী, বেংগাল—প্রিন্স জাটাজী

একাদশ ও দ্বিতীয় :—প্রিন্স জাটাজী । প্রিভেটচক্র মন্ত্রী, বেংগাল—প্রিন্স জাটাজী

বিশ্ববী বাস বিহারী :—১৫ বঙ্গবাস ট্রাষ্ট, কলিকাতা-১০০০১

দ্বিতীয় :—প্রিন্স জাটাজী, ১১১ বঙ্গবাস ট্রাষ্ট, কলিকাতা-১০০০১

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ
স্থাপিত—১৯৪৬, 'বিপ্লবী বাংলা' সবকালেবাব—১৯৭৪

নবম বর্ষ	শনিবার ২২শে চৈত্র, ১৩৮৬ ৫ই এপ্রিল, ১৯৮০	২৮ সংখ্যা
----------	--	-----------

এই সংখ্যায়



মুখ্যমন্ত্রীর স্মৃতিচিহ্ন

শান্তিনগর বাবচৌধুরী

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—কীর্ত্তি দত্ত

চিঠিপত্র

শিবনাথ ক্যানার্স

রাষ্ট্রপুত্র সুব্রহ্মনাথের স্মৃতিচিহ্ন

—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

জন-স্বার্থের পরিপন্থী নাসকদত্ত চূর্ণ হবেই

—শ্রীমতীদেব সন্দ্যাপাণ্ডায়

ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত
এক পরামর্শী, একোভোগী না
হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই
—বঙ্কিমচন্দ্র

মুখ্যমন্ত্রীর স্পাষ্টাঙ্কি

॥ শান্তিশরণ রায়চৌধুরী ॥



সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ত্রিভোজি বসু যে কয়েকটি উক্তি করেছেন, সেগুলি খুব সমর্থিত ও বিশেষ অর্থপূর্ণ। এই প্রদেশের প্রশাসনের কর্ণ-
ের হওবার পর যে তিনক অভিযুক্তা তিনি লাভ করেছেন, তাঁর বলিষ্ট ও স্পষ্টোক্তিগুলি একটা সুস্থ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পক্ষে সহায়ক হবে বলেই মনে হয়, যদি কথায় ও কাজের মধ্যে কোন ব্যবধান না থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি জানাবে। কারণ তিনি দলীয় স্বার্থের উ-
স্থান দিয়েছেন পশ্চিম বাংলার স্বার্থকে। উক্তিগুলি একটি সংক্ষেপে আলোচনা করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেছেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু ধর্মদাওয়া নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চলতে পারে না। শ্রমিক কর্মচারীদের দৃষ্টিতে হবে যাতে উৎপাদন বাড়ে। শিল্পসংস্থার লাভ হয়। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে অর্থনীতির নিয়মামুসারে, শ্রমের পরিবর্তনের সঙ্গে দাবি আদায় করলে, অসুবিধে উৎপাদন না বাড়ালে, তাতে কোন পক্ষেই মঙ্গল হয় না। বশটাকা বোনাস আদায় করলে, সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন না বাড়ালে, মুদ্রা-
নীতির সৃষ্টি হয়ে জিনিসপত্রের দাম কুড়ি টাকা বেড়ে যায়। অতের তিসাবে শ্রমিকদের ও লোকসানই হয়। তাড়ির শিল্পসংস্থাগুলিরও প্রচুর ক্ষতি হয়। ফলে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার হয়ে পড়ে এবং নতুন কর্মসংস্থানের

সম্ভাবনাও বিনষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের দায়। এতদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন, এই সহজ সরল সত্যকে হয় তারা বুঝতে চাননি, নয় শ্রমিকদেরও বুঝতে দেন নি। সরকার বিরোধী দল হিসাবে তাদের মীতি ছিল ভাংগন সর্ব্ব্ব। গড়ার দিকে এরা নিজেরাও মনোযোগ দেন নি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। আজ প্রশাসন মন্ত্রের অধিকার লাভ করে যাওয়া হয়ে তাদের এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হচ্ছে। কিন্তু এই মানসিকতার পরিবর্তন সাধন না করলে ত কোন সুফল পাওয়া যাবে না। দ্রুতী ছোট উপাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলে, সত্যিকার ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন লক্ষাটী পরিবার বোকা যাবে। ১৯৩০ সালে অমেলাবাদ কাপড় কলের কর্মীরা গান্ধীজীকে অসুযোগ করেছিল তাদের সংস্থার সভাপতি পদ গ্রহণ করার ক্ষমতা। গান্ধীজী তাদের দৃষ্টি কথা বলে-
ছিলেন। সর্ব্বশক্তি দিয়ে সর্বোচ্চপরিমাণ উৎপাদন করতে হবে। তা হলে তিনি তাদের দাবী দাওয়া আদায়ের ক্ষমতা সর্ব শক্তি ও প্রভাব প্রয়োগ করবেন। অসুটি হালফিং জাপানের একটি বৃহত্তম শিল্প প্রতি-
ষ্ঠানের দর্শন নিয়ে। আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা হলে শ্রমিক নেতা প্রশ্ন করলেন যে দর্শনটির ফলে জাতির অর্থ নৈতিক ক্ষতির পরিমাণ কত হয়েছে। উত্তরে যখন জানলেন যে কয়েক শত কোটি টাকা, তৎক্ষণাৎ প্রত্যাব দিলেন ওভারটাইম কাজ করবার

জ্ঞান বিনা পারিভ্রমিক। কিছুদিন পর যখন দেখা গেল যে কতিপূর্ব হয়ে কয়েকশত কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ হয়েছে এবং কল্পপক্ষ ভাঙে দেখা জানালে তিনি প্রস্তাব দিলেন এক তৃতীয়াংশ শ্রমিকদের কল্যাণমূলক সংস্থাতে দিতে। বাকী দুই-তৃতীয়াংশ জাতীয় রাজকোষে জমা দিতে। নগর টাকার দ্বিত্তে নিষেধ করলেন, কারণ তাতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে, যার ফলে শ্রমিক ও দেশের মানুষের ক্ষতি হবে। একেই বলে দেশপ্রেম। শ্রমিকরা যদি অজ্ঞভাবে নিজেদের স্বার্থই বজায় রাখতে চান, দেশের অগণিত মানুষের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে, তবে পরিণামে তাদের স্বার্থহীন হতে বাধ্য। দু'খ-মাত্রা বোগটা যখন সঠিক নির্ণয় করেছেন, তখন প্রতিকার করতে বেন ভংগ হন।

দ্বিতীয় উক্তিটি করেছেন সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে। বেলা বাবটার আগে আসেন না, কাজ-কর্মও ঠিকভাবে করেন না। এতে প্রশাসন চলবে কি করে? তৃতীয় উক্তিটি করেছেন কো-অপারেশন কমিটি সম্বন্ধে। কর্মচারীদের বদলি বা প্রশাসনিক কোন ব্যাপারে অকার্যকর নাক না গলাতে। বস্তুতঃ কো-অপারেশন কমিটি সম্বন্ধে এই অভিযোগ লীগবিনের। কো-অপারেশন কমিটি বামে সরকারী কর্মচারীদের অজ্ঞাত ইউনিয়নও আছে। আজ তাদের পৃষ্ঠপোষক দলগুলি ক্ষমতায় আছেন বলে যদি কো-অপারেশন কমিটি নিজেদের খোলাখুলি মত কাজ করেন, তবে অল্প দল ক্ষমতায় এলে তার যে প্রতিক্রিয়া হবে। সেটা তাদের বোধগম্য হওয়া উচিত। নিজেদের স্বার্থ সাধন অবশ্যই করতে মচটে থাকবে, কিন্তু অন্তরে স্বার্থকে

বিসর্জন দিয়ে নয় এটাই মুখ্য মানসিকতার পরিচায়ক হবে। তা ছিন্ন দাবী-দাওয়া আদাবের সঙ্গে সরকারী কাজকর্ম সম্পন্ন করতে বস্তুমান না হলে ত তার ফল প্রশাসন পরিচালকদেরই ভুগতে হবে। এসময়ে একটা দুর্ভাগ্যজনক নজীর সৃষ্টি করেছেন, রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলি। অথচ ক্রমশে সরকার বঙ্গের আধিকার তুলনা নেই। অথচ কর্মচারীরা সেখানে রাজনীতিতে কখনও থাকেন না এবং কোন রাজনৈতিক নেতারা সে প্রচেষ্টাও করেন না। কাজেই যতই বল হোক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসন বস্তুটি কখন দলীয় রাজনীতির ধারা কসূষিত হয় না। দেশের মানুষের সেলস্তু ভূভোগ ভুগতে হয় না। সংশ্লিষ্ট সব দল উপদলকে অসুস্থ করতে হবে যে অধিকাংশ লোক কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নয়। ভোটের মাধ্যমে তারা সমর্থন করেন তাদের আস্থাভাজন এমন দলকে যারা দেশের মঙ্গল সাধন করতে পারেন। যার যার পালা বললে মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে জনগণ অন্ধও নয়, কারো ভাবেদারও নয়। কাজ-কর্মের বিচার করেই তারা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। যদি কেউ মনে করেন যে শুধু প্রোপান দিয়ে পারের জোয়ের মাধ্যমে তার আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হবেন, তবে তিনি মুখের স্বর্ণে বাস করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার বিশ্লেষণ খুব নির্ভুল, তিনি মানসিকতার সৃষ্টি করার পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এই সর্বনাশা পরিস্থিতির সংশোধন ও উন্নতিসাধন করতে পারেন, দেশবাসী নিশ্চয়ই তাঁকে সাধুবাদ জানাবে।

রাষ্ট্রগুরু শ্বরেজ্ঞ নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" এর থেকে অধ্যায়]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

শাসন সংস্কার ও চরমপন্থী মতবাদের প্রসার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯১৭ সালের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হল হাউস অব কমন্সে মি: মটেলের ঘোষণা। এই ঘোষণায় ভারতকে ক্রমশ: উন্নততর পন্থাঘের দায়িত্ব-শীল সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই ঘোষণা ভারতে এক মিশ্র অশ্রুত্বের সৃষ্টি করে। ব্রিটিশের শপথ ও প্রতিশ্রুতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের মধ্যে হয় আশার সঞ্চার আর যাদের এটসব প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মন ছিল শোলাসমান তাদের মধ্যে দেখা দিল সন্দেহ ও সংশয়। এছাড়া আর যারা সন্দেহবাসী ছিলেন তারা এতে কোন বিশ্বাসই স্থাপন করলেন না। এরপরে তিনি এমন আর একটি ঘোষণা বাণী প্রচার করলেন যা যেমন ছিল নাটকীয় তেমন অভিনবও হতুত্বিকর। মি: মটেল ঘোষণা করলেন, তিনি এক ডেপুটেশনসহ ভারত পরিদর্শন করতে আসবেন এবং ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ভারতের জনমত কী জা যাচাই করে দেখবেন। তাহলে এমন আর তার আগ্রহ বা ব্যক্তিগত ভাল মাল্লখোতে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। সরকারী চলন বলনের বীতি পদ্ধতির মধ্যে এ একটা অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম। এতে যারা অবিশ্বাসী, সন্দেহবাসী তারাও অশ্রুত্ব করতে আরম্ভ করলেন যে হ্যাঁ, এইতো একজন ভারত সচিবকে পেয়েছি যার মধ্যে কেবলমাত্র বরুতা করা ছাড়া অন্য গুণও আছে। তারা ভাবতে

শুরু করলেন যে ইনি বাস্তবিকই কিছু কাজের কাজ করতে চান। ইন্দো ভারতীয় ইতিহাসের পাতা-গুলিতে ডুবিয়ে আছে কেবল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের টুকরো টুকরো ঘটনা। কিন্তু এবারে হয়ত একটা নতুন অধ্যায় উদ্ভূত হতে চলছে।

নভেম্বর মাসে মি: মটেল তার ডেপুটেশন সহ ভারতে এলেন এবং এই ব্যাপারের সঙ্গে যে সমস্ত সমস্ত জড়িত আছে সে সম্পর্কে একটা আত্মপূর্বিক অনুসন্ধানের কাজে লেগে গেলেন। এ দেশের নানা জায়গায় তিনি ঘুরলেন এবং ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় অনেকের সাক্ষাৎ গ্রহণ করলেন। দুজন বা তিন জনের এক একটি ব্যাচের সাক্ষাৎ একসঙ্গে গ্রহণ করা হল। এই সাক্ষাৎদান কালে তাদের কঠিন জেরার সম্মুখীন হতে হয়। জেরায় ব্যাপারে মি: মটেল ছিলেন একজন পাকা গুস্তাফ। মধ্য প্রদেশের মি: আর. এন. খুলন করের সঙ্গে এক ব্যাচে আমাদের এই কঠোর পরীক্ষার কথা দিয়ে যেতে হয়। তার পরেও আমার মি: মটেলের সঙ্গে আরও কথাবার্তা হয়। সেটা হল যখন একটা বৈঠক শাসনের ধারণা গাঁজিয়ে উঠলো তখন। আমার মনে হয় এই বৈঠক শাসনের চিন্তাটি জাগে মি: লারনেল কাউন্সের মধ্যে। তিনি প্রায় এই সময়ই ভারতে আসেন এবং কয়েকটি আলোচনা বৈঠকও করেন। আমি সেই আলোচনা বৈঠকের কয়েকটিতে যোগদান

করেছিলাম। তার মধ্যে একটি হয়েছিল
 ঐ দার্জিলিংয়ে। ঐ দার্জিলিং বৈঠকে মিঃ
 সি. আর. রাস সমেত কয়েকজন চরমপন্থী নেতাও
 উপস্থিত ছিলেন। তখনও পর্যাপ্ত নয় কো-
 অপারেশন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়নি এবং দেশের
 অবস্থা ছিল বেশ স্থির, শান্ত। আমার বক্তৃতা
 মনে পড়ে বৈঠক শাসন কিংবা লেজিসলেটিভ
 কাউন্সিলের প্রতি দায়িত্বশীল কোন নির্বাচিত মন্ত্রীর
 অধীনে কোন কোন সমস্ত রাষ্ট্র প্রত্যয়ে সে রকম
 বড় ধরনের কোন আশংকা পুটেইনি। মিঃ কার্টিস
 বৈঠক শাসনে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে
 করতেন পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্রে পৌঁছতে বৈঠক
 শাসন হল একটি মাঝপথের বর বিশেষ। তিনি
 কথাবার্তা বলতেন একজন সংস্কার বিশ্বাসী বর্ন-
 প্রচাবকের মত। তার সম্পর্কে সত্যিই একথা বলা
 যায় যে তিনি যেন এলেন, দেখলেন এবং জয় করে
 ফেললেন! ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের
 সঙ্গে তিনি আলোচনা বৈঠকে বসেছিলেন, এই
 প্রতিনিধিগণের প্রথমে সমস্ত পরিকল্পনাটি সম্পর্কেই
 একটা দৃষ্টিপাশ সংগ্রহ ছিল। তাদের ধারণা ছিল—
 আর সে ধারণার কথা তখনকার দিনের সংবাদপত্রেও
 প্রকাশ পেয়েছিল—যে গভর্নমেন্ট স্থানীয় স্বায়ত্ত
 শাসন পদ্ধতিকেই নিখুঁত করে গড়ে জেলার কাজ
 থেকেই শুরু করবেন এবং তার পরে দায়িত্বশীল
 সরকার গঠনের বড় প্রকল্প নিয়ে বোঝাপড়া
 করবেন। বিবরণি নিয়ে কার্টিস ও অক্সফোর্ডের সঙ্গে
 লর্ড সিংহ একজন ছিলেন। আলোচনা
 এসঙ্গে তারা তাদের মত সংশোধন করলেন এবং
 একথা তাদের জারিয় করেই বলতে হয় যে তারা
 যখন তাদের পূর্ব ধারণার সংশোধন করলেন তখন
 তারা কোন সময়েই বোদ্ধমানতা বা ঘিবার ভাব

যেখান নি, বরং ইংরেজ প্রকৃতির না-ছোড় ভাব
 নিয়েই তাতে লেগে থাকলেন। তাই এখন শাসন
 সংস্কারের বড় বক্তৃদের মধ্যে রয়েছেন বেসরকারী
 ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়, তারা ভারতের ভাগ্যের
 আগমনকে স্বীকার করে নিলেন। সে আগমনীর
 বার্তা হল, ভারত ধাপে ধাপে উন্নতির পর্যায়ক্রমে
 ব্রিটিশ সাধারণ সম্পদের সমান অংশীদারীও অবশ্যই
 লাভ করবে। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে
 ইয়োরোপীয় সদস্যগণ মজারটদের সঙ্গেই একযোগে
 কাজ করেছেন। মজারটদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক
 ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, এমনকি খুবই আনুগত্যিক। আমার
 মনে পড়ে মাত্র একটি ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে হিন্দু
 সহযোগীদের এক বড় রকমের মতভেদ দেখা
 গিয়েছিল যে মতভেদটি ছিল কলকাতা কর্পোরেশনে
 সাংসদগণিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিয়ে। তারা
 তাদের ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই রকম
 সাংসদগণিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন।
 স্বভাবতই তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বিবরণি
 দেখেছিলেন। ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পৃথক
 নির্বাচক মণ্ডলী ছিল। তাদের স্বার্থ যথার্থ ও
 পর্যাপ্ত পরিমানে যাতে রক্ষিত হয় সে লক্ষ্যই এই
 ব্যবস্থা ছিল। স্বভাবতই তারা মনে করলেন তাদের
 পক্ষে বা হিতকর মুসলমানদের পক্ষেও তা সমানভাবে
 হিতকর হবে। তারা চিন্তা করলেন না যে তাদের
 ব্যাপার আর মুসলমানদের ব্যাপার এক নয়। একথা
 তারা ভাবলেন না যে শীঘ্রই হোক আর কিলম্বোই
 হোক হিন্দু ও মুসলমানকে অবশ্যই একত্রে মিলিত
 হবে একটি জাতি গড়ে তুলতে হবে। তারা চিন্তা
 করলেন না যে সাংসদগণিক পদ্ধতিটা ভারতীয়
 জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথে একটা বাধা।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক

কড়া হাওয়া জমে উঠছিল। এই ঝড় অবস্ফাবী-রূপে ভারতের রাজনীতিকদের মধ্যে এক সাংঘাতিক ভাঙন এনে দিল। ১৯১৭ সালের ৮ই জুলাই তারিখে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশই হল বিরোধের সন্ধেত। চরমপন্থীদের পত্র-পত্রিকাও ক্রুদ্ধ উত্তেজনা-পূর্ণ চিৎকার শুরু হল। এমনকি মিসেস বেনাথুর যিনি এখন শাসন সংস্কার পরিকল্পনা বিষয়ে নরমপন্থীদের অভিমতই খীকার করেন—তিনিও তার স্বাকীর ব্যক্তিগতপূর্ণ ভাষায় এবং দৃঢ়তার ভঙ্গীতে এই রিপোর্টকে প্রকাশে নিষেধ করতে লাগলেন। যেদিন রিপোর্ট প্রকাশিত হল সেদিনই তিনি তার নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকায় লেখার দিবে বললেন, ‘এ রকম একটা পরিকল্পনা স্থাপন করা ইংল্যান্ডের পক্ষেও উপযুক্ত হয়নি আবার ভারতের পক্ষেও তা গ্রহণের যোগ্য হয়নি।’ মজার ব্যাপার এই যে সেই একই দিনে মাত্রাজের পনেরো জন ভ্রাতৃলোক একই রকম দৃঢ়তাপূর্ণ ভাষায় পরিকল্পনার নিষেধ করে এক ইজ্ঞাহার প্রকাশ করলেন। ইজ্ঞাহারে তারা বললেন, ‘গোড়াতেই এটা এত অনিষ্টকর যে নীতি এবং খুঁটিনাটি বিজ্ঞানিত বিষয়ের অবতারণা—যেদিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, এই পরিকল্পনাকে সংশোধন করা বা উন্নত করা একটা অসম্ভব ব্যাপার।’ স্বর্গভূত: মি: ডিলক ও তার সহজ এবং স্পষ্ট কথার ভঙ্গীতে সেই একই মত করলেন। তিনি বললেন, ‘মন্টেগু পরিকল্পনা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।’

এই মনোভাব ও উত্তেজনার মধ্যে রিপোর্টটি বিবেচনা করার জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হল। আমরা যাত্রা এই .এই সময় প্রায় বিধায়ী ছিলাম না। তারা বিবেচনা

করতে লেগে গেলাম যে আমরা এই অবস্থার কি করব; আমরা এই কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করব কি করব না। আমরা যোগদান না করাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমরা বুঝতে পারলাম যে কংগ্রেসে এই বিবেচনাহীন ও চরমপন্থী মতই প্রাধান্য লাভ করবে। সুতরাং সেই সভার আমাদের উপস্থিতি দ্বারা তাদের সমর্থনের জোর বাড়ানো উচিত হবে না। আমরা তাই ১৯১৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে বোম্বোডে নরমপন্থী দলের একটি কনফারেন্স করলাম। কনফারেন্সে আমাদেরই সভাপতি নির্বাচিত করা হল। এটাটি হল সভারেট-দের প্রথম পৃথক সম্মেলন। এখনও তা বছরের পর বছর ধরেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আমাদের কতিপয় বন্ধু যাদের মধ্যে আছেন রাইট অনারবল মি: শাস্ত্রী এবং অনারবল মি: শর্মা, কংগ্রেসের সভ্যরাই যোগদান করতে থাকেন। তাদের অবস্থা ছিল যে তারা সেখানে তাদের প্রত্যাব অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কংগ্রেস পূর্বের চেয়ে আরও বেশী করে চরমপন্থী হয়ে পড়ল। তাই তারা কংগ্রেসের সভ্য যোগদান করা ছেড়ে দিলেন। এই ভাবে আমরা বিস্ত্রিত হয়ে পড়লাম: তবে তা কতদিনের জন্য তা বলা কঠিন।

আমাদের মধ্যে এই যে কাটল ধরল তা যে একটা নিবিচ্ছিন্ন আপোষ মীমাংসার আমার প্রবাসের অভাবের জন্য হয়েছে, তা কিন্তু নয়। আমাদের এই বিভেদ আমাদের দুর্বলতার সকল উৎস রূপে দেখা দেয় এবং আমরা চোঁটা করেছিলাম আর যাতে কোন বিভেদ না ঘটে। কংগ্রেসের সভ্য পুরো তিন সপ্তাহ আগে আমি লন্ডনে সেক্রেটারী ও মিসেস বেনাথুরকে তার করে অনুযোগ করেছিলাম যে কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশন কিছুদিনের জন্য

স্থগিত রাষা হোক যাতে আমরা নিজেদেরা মধ্যে মতামতের বিনিময় করতে পারি এবং তাহলে একটা সর্বসম্মত বোঝাপড়ার আলা যেতে পারে। কিন্তু সে অজুরোহ রাষা হয়নি এবং শেষ মুহুর্তে কংগ্রেসের সভা শুক হওয়ার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে, শেষ কারের মত একটা চেষ্টা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন খুব বিলম্ব হয়ে গেছে। আশাবাদের মানসিক মুহুর্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আবারো যোগদান না করার সিদ্ধান্ত যে বৃটিশদের কাজই হয়েছে, পরবর্তী ঘটনা সমূহই তা প্রমাণ করেছে; এবং আমি দাবী করছি যে আমরা নডারটেরাই এই পরিকল্পনাকে বাচিয়েছি। এর বিরুদ্ধে যারা একজোট হয়েছিলেন তারাও খুব শক্তিশালী ছিলেন। ভারতের ইয়েরো-পীয়ান সমিতিগুলি যারা এখন এর সামলোর জন্ত খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন তারাও কিন্তু এই পরিকল্পনার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। লর্ড সাইডেনহাম সংবাদপত্রে এবং হাউস অফর্সে এই পরিকল্পনার নিন্দা করেন। ভারতে অল্পত লাগে যে তিনি আবার তার সমর্থনে মিঃ তিলকের উক্তি উদ্ধৃত করেন। মাক্লেটের গাড়িয়ান পত্রিকা অভিব্যাগ করলেন যে ভারতের চরমপন্থীরা লর্ডসাইডেনহামের ও তার দলের হাতে খেলছেন। এই প্রচণ্ড বিরোধী

শক্তি সমূহের সমাবেশের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতের নডারট দলের কাছ থেকেই প্রকৃত ও সামাজ্যপূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল। এই সময়ে তারা যদি কংগ্রেসের মধ্যে থাকতেন তাহলে তারা একেবারে শূন্যস্থ হয়ে যেতেন এবং তাদের বক্তব্য হয়ে পড়ত অর্থহীন, প্রতাবহীন সংখ্যালঘুর আওয়াজ মাত্র। ব্রিটিশ গণতন্ত্র তখন এই পরিকল্পনার প্রতি এনটা সর্বসম্মত সক্রিয় বিরোধিতার চূতা ধরে চলতে পারত, "বেশ, তোমরা যদি এটা না-ই চাও, তাহলে এটা সম্পূর্ণই বাতিল করে দিচ্ছি।" ফলে এই দাড়াতে যে এর কোন বিকল্প প্রতাব না থাকায় দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সূত্রানা অনিদিষ্টকালের জন্ত স্থগিত থাকত। এদিকে আবার ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে স্পষ্ট করে কিছু না বলায় আমাদের অনুবিধা আরও বেড়ে গেল। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ভারতীয় নীতি যখন প্রচোজনের খাত্রেরেই প্রধানতঃ লর্ড কার্জনের অভিমতের ধারা চলিত হত। লর্ড কার্জন ছিলেন তখন ব্রিটিশ কেবিনেটের একজন মেম্বর। আমাদের উৎকর্ষ আরও গভীর হল এই কারনে যে বিলটি পালিয়ামেন্টে আসার আগে তার সুপারিশ-গুলি সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্ত পালিয়ামেন্টের দুইটি হাউসেরই একটি বৃষ্টি কমিটি গঠনের প্রস্তাব এল।

(চলবে)

স্বাভীয় পেটের রায়, অল্প, সর্বাঙ্গ ও পেটের বেদনার
অব্যর্থ ফলপ্রসাদ

আমলা হুত কুমারী

আমুর্বেদীয় মতে তৈরী

মূল্য ৩.০০ এক একতরফ করত

ব্যক্তিগত

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী

কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা কলিকতা

জনস্বার্থের পরিপন্থী শাসকদল চূর্ণ হবেই

ত্রিবেণীর বন্দোপাধ্যায়



বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে অর্থনৈতিক অবরোধ আসামের বিরুদ্ধে সবে শুরু হয়েছে, তাকে অগণ-তান্ত্রিক, অসার, অপ্রয়োজনীয় ও সংঘতি বিনষ্টকারী বলে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর মূল্য যে উঁসো তা তিনি নিজেও জানেন, তবু গদী রাখার তাগিদেও নিজ মুখ বন্ধের জন্য তিনি ঐ ভাবে যে কর্মোদ্ধম দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন তা পশ্চিমবঙ্গবাসী মাহেই হাড়ে হাড়ে বুঝেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আসাম ইস্যুতে তাঁর বা অবশ্যকরণীয় ছিল তা তিনি সময়ে করেন নি, পাছে কেন্দ্র তাকে বরখাস্ত করে—এই ভয়ে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি নিজে ইতিপূর্বে আসামের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের ডাক দিতেন, তাহলে নিশ্চয় বাঙালীরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর জয় ধ্বনি দিত ও তাঁর আদেশ মত বর্তমান আন্দোলনের চেয়ে আরো শক্তিশালী পথ অবরোধ ও অর্থনৈতিক অবরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হ'ত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়। যে জায়সঙ্গত ও যথোপযুক্ত পথ তাঁর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সহজ ও সরল ছিল, তিনি তা স্বেচ্ছায় পরিহার করে অল্প পথ ধরে চলতে শুরু করলেন বোধহয় দল স্বার্থে। জনস্বার্থকে এ ভাবে ইতিপূর্বে অল্প কোনও মুখ্যমন্ত্রী উপেক্ষা করতে সাহস করেননি। আমাদের গোলাপ বরবার ভূমিকা ছিল অসমীয়াদের সীমাহীন অজ্ঞারের সামিল হওয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং তিনি

তাই করে গেছেন। আর বাঙালীদের স্বার্থ রক্ষার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পশ্চাৎপদ হলেন যে কেন, তা বোধগম্য নয়। তথা কথিত বামপন্থীরা নীতি কথা আওড়ান বেশ সজোরে, কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় তাঁরাই বেশী দক্ষিণ পন্থী হয়ে পড়েন গদী আগলাবার অত্যন্ত নির্লজ্জ আগ্রহে। বামফ্রন্ট বাংলায় ও ত্রিপুরায় গদী দখলের সময়ে যাদের সাহায্য, সমর্থন ও কর্মের জোরে গদীতে আসীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন, গদীতে বসার ঠিক পরেই তাদের ক্ষতি সাধন করেছেন সর্বাধিক।

পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় সংখ্যাধিক বাংলা ভাষাভাষি মানুষের ভোট বামফ্রন্ট জয় লাভ করে, অথচ বিদেশী বিতাড়নের আছিল্লায় অসমীয়ারা যখন বাঙালী বিতাড়ন, নিধন ও বাঙালীদের সর্বস্ব অপহরণ বা কংস সাধন করে তখন বামফ্রন্ট সরকার বা জোটবদ্ধ দলের প্রধান শরিক সি, পি, এম নীতিবর্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে কেন? কি এর জবাব? কথায় কথায় বাহা কারণে অকারণে মিছিল সহবোসে কলিকাতায় তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে একটা না একটা যৌক্তিক বা অযৌক্তিক ইস্যু নিয়ে আন্দোলনের ঘাঝা আকাশ খাতাম কাঁপিয়ে তুলতো; তারা আসাম ইস্যু নিয়ে চুপচাপ বইল কেন এতদিন? কি এর বহুতা? যদি পশ্চিম-বাংলার মানুষ এই নীতিবতার জন্য সি, পি, এম বা শরিকদলগুলির উপর শোষণোপ করে রা তাদের

ওপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে আসামের বিরুদ্ধে বর্তমান পথ অবরোধে বা অর্থনৈতিক অবরোধে অন্ত্যোপায় হয়ে অঁপিয়ে পড়ে থাকে, তবে কি তা অসঙ্গত বা অত্যাচার? অস্ত্র কোনও রাজনৈতিক দলের সাহায্য ও সহযোগিতা না পেয়ে বাঙালীরা যদি কংগ্রেস (ই) দলের প্রত্যক্ষ সহায়ত্বভিত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে বর্তমান আসাম বিরোধী আন্দোলনের গামিন হয়, তবে কি তা অপরাধ? মনে হয় এ ছাড়া বাঙালীদের প্রতিবাদ জানাবার বা প্রতিরোধ করার অস্ত্র কোনও পথ খোলা ছিল না। বর্তমান আন্দোলনকারীরা দেরীতে হলেও বাংলার মান বাঁচিয়েছে। বাংলার ঐতিহ্য ও অস্ত্রাঘের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার স্পৃহা এর কলে প্রমাণ করল যে বাঙালী তার অতীত ইতিহাসকে ভোলেনি। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, অকারণে ঘাটা কলিকাতাকে নিছিল নগরীতে ইতিপূর্বে পরিবর্তিত করেছিল বারে বারে তারা আজ গদীতে বসেছে বলে কি গভীর নিরাপত্তা? যোগা সময়ে মিছিল ও গণ-আন্দোলনের পাণ্ডারা কোথায় অস্ত্যাহিত? নারী ও শিশুদের প্রথম সারিতে এগিয়ে দিয়ে তাদের বিজ্ঞ ও ককিংকর্না মহান নেতারা মিছিলের পশ্চাত্তাসে থেকে শাসক দলের পুলিশের বিরুদ্ধে দূর থেকে পাথর রটি করে তাদের গুলি চালাতে বাধা করতে। অতীতে কলে নিরীহ নারী ও শিশুরা গুলির মুখে প্রাণ দিত এবং গুলিতে নিহত সেই সব নারী ও শিশুর মৃতদেহ নিয়ে বে নেতারা এদেশের জনগণকে উত্তেজিত করে শাসক দলের বিরুদ্ধবাদী করে তুলতে সক্ষম হতেন তারা আজ কোথায়? বাংলার ও বাঙালীর এত বড় দুদিনে তারা সব কোথায় গ্যা ঢাকা দিলেন, তা পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণ আজ বামফ্রন্ট নেতাদের কাছে

যদি জানতে চায় বা এর কৈফিয়ৎ তলব করে তখন কি তার ভাব? মুখ্যমন্ত্রী ঘন ঘন হুমকি দিয়ে সংবাদপত্রে বিরক্তি দিচ্ছেন, আর সে বিরক্তি প্রমাণ করে যে তিনি আসামের হয়ে ওকালতি করতে যেন বকসরিকর। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আসামের হয়ে যখন ওকালতিতে নেমেছেন এবং বর্তমান আন্দোলনকে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে উঠে পড়ে লেগেছেন, তখন বাঙালী আবার প্রমাণ করতে বদ্ধ পরিকর যে বাঙালীরা মেরেনি, তারা শাসকের বস্তচক্কে আগেও ভয় করে নি, এখনো তা করবে না। কাজেই আন্দোলন ততদিনই চলবে খতদিন না আসামের মাটিতে তথাকার পূর্বের বসবাসকারী, চাকুরীত ও অস্ত্রাঘ ছীবিকায় নিযুক্ত বাঙালীরা যারা পূর্ববঙ্গ থেকে শেবে ১৯৭১ সালে মুক্তিব ইন্দিরা চুক্তির বলে আসামে এসে বসতি করেছিল তারা পুনরায় নিজ নিজ আবাস ভূমিতে পূর্ণ বসতি পায়; আসাম ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগীতায়, আসাম হৃৎগের মধ্যে অস্ত্র কোথাও নয়। আসামে অস্ত্রহীন গহিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে জ্যোতিবাবুই প্রথমে মুখ খোলেন, কলে তাঁর কুশপুতলিকা তথায় দাহ করা হয় এবং এই ঘটনার পর তিনি আর অসমীয়াদের চটাতে চেষ্টা করেননি। এই সার্টিফিকেট দাবিল করে তিনি সওয়াল করছেন যে তাঁর মন্ত আর কেউই বাংলার বা বাঙালীদের জন্য কুস্তীরাঙ্গ খেলেননি। আর কোন বাঙালীর কুশপুতলিকা আসামে দাহ করা হয়নি, তবে বহু জ্ঞানীপ্তনী ও আসামে কর্তৃত বা বসবাসকারী বাঙালীদের যে পিটিয়ে বা গুলি করে মারা হয়েছে, সে ঘটনাবলি সংবাদে প্রকাশ বারে বারে। তাছাড়া বেশ সুপরিকল্পিত উপায়ে অসমীয়ারা, খাসীরা, মিজোরা ও অস্ত্রাঘ দ্বন্দ্বারা

যে আসামে, মেঘালয়ে, মিজোরামে ও আসামের লাগোয়া ভূখণ্ডে বহু বাঙালী হিন্দু নিধন, বিভাঙন ও তাদের ও তাদের বাসগৃহে অগ্নি সংযোগ করেছে এবং তাদের ছিন্নদল আশ্রয় প্রার্থীতে পরিত্যক্ত করেছে, সে বিষয়ে কারো মন্তব্য নেই। এই সব ক্ষয়ক্ষতি ও নারকীয় কার্যের নায়কদের বিরুদ্ধে অনেকদিন ধরে সংগ্রাম করে যদি আজ বাঙালীরা অশান্ত ও প্রতিশোধ স্পৃহায় মগ্ন হয়ে আসামের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও পথ অবরোধের দ্বারা আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়, তবে কি বাংলার মুখামুখি সেই আন্দোলনে স্বাভাবিক হবে, তাদের পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে তাঁর গায়ের জ্বালা মেটাবেন না তিনিও তাদের সামিল হয়ে স্বীয় অস্বাভাবিক পালন করে দেশবাসীর নিকট সাধুস্বাভাবিক অগ্রসর হবেন? মনে হয় তিনি শাসকের ভূমিকায় কর্মরত বলে দস্ত প্রকাশের পথই বেছে নিয়েছেন যা সত্যিই প্রাজ্ঞজনক প্রতিটি বাঙালীর কাছে। তাঁর কাছে এই দস্ত ও প্যাঙ্কের মত উক্তি কেউই আশা করেনি ইতিপূর্বে। তিনি এখনও স্থিতাবী হয়ে পূর্ণ বিবেচনা করুন যে, তিনি এই অবরোধ আন্দোলনকে পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের সাহায্যে দমন করবেন, না এর সুস্থল পরিণতির দ্বারা ও সাধারণ দস্ত অস্বাভাবিক আন্দোলনকারীদের পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় দলবলসহ অবতীর্ণ হবেন, বাংলার ও বাঙালীদের দ্বারা গৌরব পুনরুদ্ধার মানসে? জন স্বার্থের পরিপন্থী কাজে তিনি অবশ্য দস্ত প্রকাশ করবেন না বাংলার জনস্বার্থের স্বরূপ ত্রুটি হয়ে নিজের মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে তুলবেন।

কোনটা তাঁর পক্ষে শোভন ও সমস্ত বস্তুমান পরিস্থিতিতে? যদি তিনি দস্ত সঞ্চলকোরে এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে ভাঙতে সচেষ্ট হন, তবে তাঁর

জেনে স্বাভাবিক যে, বাঙ্গালী তাঁর অতীত আদর্শ ও ঐতিহ্য আত্মা ভোলেনি এবং তা প্রমাণ করতে আন্দোলনকারীরা পুলিশ ও মিলিটারীর লাঠি, গুলি ও অস্বাভাবিক মারনাত্মকের সামনে বুক পেতে দেবে এবং সত্য বরণ কোরে শহীদ হবে, তবুও শাসকের পায়ের তলায় ক্ষম। ভিক্ষা কোরবে না কখনকালেও। অশান্ত আসামকে সংযত ও সংহত করার দ্বারা একপ এক আন্দোলনের মাসখানেক আগেই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিলম্বে তা হলেও এর দ্বারা ও বাস্তবতা কিছুকম নয় এখনও, সেক্ষেত্রে যেন বামফ্রন্ট সরকার ও তাদের পোসতরা মনে রাখেন। সি. পি. এম এর পোসতরা যারা আসামে বাঙ্গালী নিধন ও বিতর্জন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে তাদেরও সমস্ত দিতে হবে যে, চির বিপ্লবী বাংলা বাঙালী আজো মরেনি। তারা জানে মরতে ও প্রয়োজনে তাগ স্বীকার করতে দেশের বৃহত্তর জনস্বার্থের সংরক্ষণে।

কিন্তু এই বাংলায় মীরজাফর আগেও জন্মেছে। এখনও জন্মকে। ইতিহাসই তাঁর সাক্ষ্য বহন করে। সিরাজের আরলে মীরজাফর বেইমানী করে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজের হাতে দেশকে তুলে দিয়েছিল।

১২৪২ রাশিয়ার ঠাণ্ডাবার-ও অর্ধ পুষ্ট ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণের মিথ্যা আওয়াজ তুলে ও নেতাজী সুভাষকে কুইনসি আখ্যায় অবশ্য ভূষিত করে ইংরাজ সরকারের দালালি করে এদেশে বৃটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনের পশ্চাৎ ভাবে ছুরি মেয়ে বৃটিশ ও রাশিয়ার হয়ে পক্ষম বাহিনীর ভূমিকা নিরপনীয় ভূমিকা পালন করে মোটা টাকা কমিয়ে ছিল। দেশবাসী সে কথা আজো ভোলেনি। চীন-ভারত যুদ্ধের সময়ে সি. পি. এম তথা কমিউনিষ্ট পার্টি চীনের হয়ে এদেশে দালালি করে উত্তর

পূর্বাঞ্চলে চীনের আক্রমণকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিশেষ সহায়তা দেয়, দেশের চরম ক্ষতিসাধন করে। বর্তমানে আসামের আন্দোলনের পিছনে চীন ও আমেরিকার প্রচেষ্টা হাত আছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে জানা যায়। চীন ও আমেরিকান মাৰ্গদ্বারা আসাম ও সন্নিহিত এলাকার ভারতীয় গোয়েন্দাদারা পায় কি ভাবে ?

আসাম বিরোধী বর্তমান শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলনকে বান্ধাল করার জন্য সি. পি. এম দল কম্বীরা উত্তরবঙ্গে ও দেশের অন্তর সক্রিয় কেন ? কংগ্রেস (ই) দলের আরও এই গণ আন্দোলনকে ক্ষয় করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলবল প্রকাশ্যে যে বিপুল ও সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাতে ব্যস্ত তা দেশবাসীর মনে দারুণ অব্যক্ত হেনেছে ও তারই প্রতিফলিত পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে যুব-ছাত্রী মন্ত্রীরা হয়ে আন্দোলনের সামিল হবার জন্য সর্বত্র খেয়ে আসছে। সি. পি. এম তাঁর সক্রিয় দলীয় স্বার্থে এমনই দিশেহারা যে তারা উক্ত শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য পান্টা মিছিল বার কোরতে পর্যন্ত স্তব্ধ করেছে। দেশ সি. পি. এম দলের স্বজাত্য প্রীতির বহর দেশে আতঙ্কিত ও বিরক্ত। বাংলার তরুণরা অসমীয়াদের দৃষ্ণে এত কাতর যে, তারা গ্লিহ ঝাকতে পারেনি, তাই তারা অসমীয়া দুঃস্থত কারীদের মত বোগাতে সি. পি. দলের সামিল হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দন্তঃসূত্ৰ গণ-আন্দোলনকে ধমিয়ে দিতে খেজায় এগিয়ে এসেছে-এ ঘটনা। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব। তবে কারা এই গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে ? অতীতের বেশত্রেহীরাই আসাম বিরোধী বর্তমান গণ-আন্দোলনের পশ্চাৎভাগে পূর্বের মতই অতর্কিত ছুরিকাঘাতের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মত এগুতে

সাহস পাচ্ছে। দাপ্তিক মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গলী ঠিক রাখার তাগিদে ও তাঁর দলনেতাদের খুসী করার অভিপ্রায়ে যে অস্ত্রায় ও অবৈতিক পন্থায় আসাম বিরোধী গণ-আন্দোলনের ওপর আঘাত হানতে উক্তত দেখা যায় তা সত্যই কলঙ্কজনক। তিনি যদি এখনও সংযত না হন, তবে অস্ত্রায় দাপ্তিক, একঘেঁসেী ও বিকৃতবুদ্ধির শাসকের মত তাঁরও পতন অনিবার্য। কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের এই অসীম ও অনন্ত উচ্ছত নিশ্চয় লক্ষ্য করছে ও যথাসময়ে এর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তত্ত্ব নেবেই, কারণ আসামকে যখন কেন্দ্র কোন বাধা দেয়নি অতীতে, তখন পশ্চিমবঙ্গকেও তারা বাধা দিতে পারে না, নৈতিক কারণেই। কিন্তু রাজ্য-সরকার যখন এ ব্যাপারে দলীয় রাজনীতি 'আমদানি করেছে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার যদি সেই পথে চলে তবে জ্যোতিবাবুর সরকারের পতন স্বাধীন করতে কেন্দ্র নিশ্চয়ই তৎপর হবে। প্রধান মন্ত্রীর দলবল পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলনের প্ররোধ, আর কংগ্রেস (ই) দলের যুব ছাত্ররাই দলে দলে জ্যোতিবাবুর পুলিশের মার খাচ্ছে ও গ্রেপ্তার বরণ করছে। সেক্ষেত্রে দলনেতৃ শ্রীমতী গান্ধী আর কতদিন সি. পি. এম এর দলবাজী ও উদ্বেগ প্রাণোদিত এই হীন চক্রান্ত বরদাস্ত কোরতে সক্ষম হবেন ? মনে হয় শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁর দলের রাজনৈতিক স্বার্থে ও পশ্চিম-বঙ্গের জনস্বার্থে শীঘ্রই সি. পি. এম দলের বিরুদ্ধে সক্রিয় হুমিকা নিতে হবে, জ্যোতিবাবুদের হটকারীভাৱ ও অবিস্মৃকারীভাৱ ভিত্তিবিরক্ত হয়ে।

জ্যোতিবাবুদের নিলঙ্ঘন, সীমাহীন ঐক্যতা ও বাঙালী বিরোধী দলবাজীকে শাসয়তা করার জন্য
(বাকী অংশ : ২ পাতায়)

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ কীরোর লব ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯১৪-১৮ সালের বিশ্ব যুদ্ধের অবসানে দেশে বিপ্লবী সংগ্রামের নাবুক এবং কর্মীসমূহ অনেকেই আন্দামানে দ্বীপান্তর এবং দেশের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। তাদের ভিতরে একদল গান্ধীজীর পদসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের ‘স্বরাজ্য’ এর দাবীর অঙ্গীকার ত্যাগ মেনে নিতে পারেন নি। বিপ্লবী সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। বিপ্লবীদের এই সংগ্রাম সম্পর্কে ক্রিস্টিয়ান রায় তাঁর ‘ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস’ এ লিখেছেন বিপ্লবী স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরাজয় থাকিলেও পলায়নের প্রশ্ন নাই, আত্ম পর্যাণ্ড সংগ্রামে নিঃশেষে আত্মদান। মহাত্মা গান্ধী-নেতৃত্ব ও সংগ্রাম পদ্ধতিতে বিপ্লবীদের আত্মা ও ভরসা না থাকলেও তিনি কারারুদ্ধ হইবার পূর্বে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের যে বর্ণনায় বোধ্যা করিয়া গিয়াছেন সেই বর্ণনাই বিপ্লবীদেরও বর্ণনাই সেই বর্ণনাই এবার বৈপ্লবিক সংগ্রামের অগ্রিমিথ্য রূপে হত্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতের আকাশে আলোকিত করিয়া উলিল। হত্যাকাণ্ড ভারতবাসী সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের বজ্রনিদা হইতে নতুন করিয়া শুনিল, মহাত্মা-গান্ধীর দ্বারা ঘোষিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই বর্ণনাই—“অভ্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের সহিত আপোহু নাই।”

বিশ্ব যুদ্ধের সময় ১৯১৪-১৬ সালে বিপ্লবী কর্মীদের খুব ধর-পাকড় করা হয়। এই সময় পুরাতন বিপ্লবীগণ অনেকেই গাঢ়তা দেন এবং অপেক্ষাকৃত নতুন কর্মীসমূহ বিবেকবর্ন পরিচালনা করেন। পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে গিয়ে বিপ্লবী কর্মীদের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ত হয়। এ ক্ষেত্রে ১৯১৮ সালের মধ্যেই অনেকেই ধরা পড়েন। ১৯১৮ সালের পরে রাজ্যের বিপ্লবীবাদীদের আর কোন অস্তিত্ব প্রকাশ পায় নাই। সেই সময় বিপ্লবী নেতৃ-বৃন্দের মধ্যে অঘোরস্ত চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষরগোপাল মুখোপাধ্যায়, সত্যীন্দ্র চন্দ্রবর্তী, বলিনী কব, অতুল চন্দ্র ঘোষ পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। পুলিশ অনেক চেষ্টা করবেও এদের গ্রেপ্তার করতে পারে নাই। ১৯২০ সালে মন্টেগু চেমস ফোর্ড শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী নির্বাচন আরম্ভ হলে সম্রাটের বোধ্যা অনুযায়ী রাজ-বন্দীদের অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়। বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে যাঁদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি তাঁরা চন্দ্রনগরের মতিলাল-বন্দীশ্রমকে মধ্যস্থ করে ঘোষণা বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে ১৯২০ সালে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯২১ সালে থেকেই বিপ্লবী কর্মীদের কিছু কিছু মুক্তি দেওয়া হচ্ছিল, যাঁরা আন্দামানে ছিলেন

তাদের মধ্যেও অনেককেই মুক্তি দেওয়া হয়। পুলিশ বিহারী বাসকে মুক্তি দেওয়া হয় ১৯২০ সালে। পুলিশবাবুকে আন্দামান থেকে প্রথমে মাদ্রাজ জেলে নিয়ে আসা হয় এবং এগার দিন এখানে রাখার পরে তাঁকে কুমিল্লার জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে কিছু দিন পরে তাঁকে কলকাতায় গোয়েন্দা বিভাগের হেড অফিসে নিয়ে আসা হয়। পুলিশবাবুকে জানিয়ে দেওয়া হল তাঁকে ফরিদপুর গিরে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। এবং তিনিই তাঁর বাড়ী ঘাবার বাংস্থা করে দেবেন। শর্তাধীনে মুক্তি পাবার পরেও পুলিশ বাবু কিছু দিন স্বগৃহে অস্থায়ী ছিলেন। গ্রাম থেকে দুই মাইল দূরে ধানাব গিয়ে প্রতাহ একবার করে ভবপ্রাপ্ত দাবোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসতে হত। কিছু দিন এই ভাবে থাকার পরে তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পরে পুলিশবাবু ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে এলেন। সর্বশেষ বছরে পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থা। লীগ কার্য বাসের পরে বিপ্লবীদের মধ্যে এক নিরাক্রম অনিশ্চিত অবস্থা চলছিল। অল্প দিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এবং বিলাফ্‌স আন্দোলনের অপূর্ণ উদ্ভাসনা। পুলিশবাবু দেখলেন গান্ধীজী এক বছরে স্বরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি জনতাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বাবু তাঁর বিপ্লবী কার্যক্রমে কোন সাড়া পেলে না। এই সময় সম্পর্কে পুলিশবাবু নিজে লিখেছেন, “গান্ধীজীর নতুন ঘোষণার উত্তর ও বিভ্রান্ত অবস্থায় ‘গান্ধীজী কী জন্য’ ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিল, আর সেই সঙ্গে দু মাসে স্বরাজ্য ন মাসে স্বরাজ্য এক বছরে স্বরাজ্য এই তো স্বরাজ্য পাইবা গিয়াছি ইত্যাদি ভাবিয়া কেহ বা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়া জ্ঞানহার্য হইয়া

পড়িল। গান্ধী অবতার বলিয়া ঘোষিত হইলেন। সহস্র সহস্র লোক গান্ধী দর্শন আশায় রাজপথ অবরোধ করিয়া সমবেত হইতে লাগিল। কথায় কথায় স্কল, কলেজ, দোকানপাঠ বন্ধ ও হরতাল হইতে লাগিল। জনসাধারণ সর্বদে বলিতে লাগিল এতবড় সাফল্যমণ্ডিত হরতাল এর আগে কেহ কখনও দেখে নাট।”

(১০ পাতার পরের অংশ)

প্রধানমন্ত্রীকেই ব্যবস্থা গ্রহণ কোরতে হবে, বাংলার মান বাণ্ডে এবং তা বড় ভ্রুত সম্ভব হয় ভুতই মঙ্গল ; নচেৎ সি, পি, এম উদ্ভব পূর্বাঞ্চলে তাদের পুরান দোস্ত চীন বরমা, ব্রিটিশ ও আমেরিকান মিশনারীদের সঙ্গে যোগসাজসে পূর্বের মত এমন এক দৃষিত আবহাওয়া সৃষ্টি কোরবে যে, সমগ্র ভারত রাষ্ট্রের সংহতি ও নিরাপত্তা তাতে বিপর্যয় হবে ক্ষিপ্ত-গতিতে। ইতিহাস কাউকে কখনও কমা করে না, তার কাজ সত্যকে উদ্ঘাটন ও সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর আসামের প্রতি বর্তমান অবস্থার সত্যস্বীকৃতি কি সেই সব পুরান দিনের স্বপ্ন বিলাসের ফলস্রুতি না আরো গভীরে অস্ত কিছু আছে না বঙ্গবাসীরা এখনও জানতে পারেন ?

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আসামে তাদের আত্মীয় জনকে হারিয়ে যখন বিরোপাখ্যায় শোকাঙ্ক বিসর্জনে রত, ঠিক তখনই দেখা যায় মুখামুখী সদর্পে আসাম বিরোধী শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলন ধ্বংস করতে পুলিশ ও দলবল নিয়ে আগ্রহান। শাসকের দৃষ্ট যদি পশ্চিমের জনগণ বিরোধী হয়, তবে তা চূর্ণ হবেই, এর অন্ত্যথা কোথাও কখনও হয়নি।

১. মেল থেকে পুলিশ বিহারী বিদ্রবী ও সংগ্রামী মনোভাব নিয়েই বেরিয়েছিলেন। কিন্তু নানাভাবে ঘুরে বিদ্রবী কার্যক্রমে কোনরূপ সাড়া না পেয়ে তিনি আপাতত কংগ্রেসের আন্দোলনেই যোগদান করার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের কলকাতা বিশেষ অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সিল বর্জনের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মন্টেগু চেমস ফোর্ড শাসন সংস্কার পুলিশ বিহারীকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তাঁর দীর্ঘ বিদ্রবী সংগ্রামে লক্ষ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। এ ছাড়া গান্ধী আন্দোলনের গণ-সংযোগের দিকটাও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। এই ক্ষুণ্ণই তিনি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন লালা লাক্ষপত রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও ফেডারেশন বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ব্যারিষ্টার আই. বি. সেন। পুলিশ বিহারী সভাপতির শোভাযাত্রা পরিচালনা এক ফেডারেশন বাহিনীর সাহায্যে প্রধান দ্বার রক্ষার ভার নিয়েছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব ভোটাধিকো গৃহীত হল। স্থির হল যে তিন মাস পরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হলেই এই প্রস্তাব অসহযোগী কংগ্রেসের কার্যক্রমও আরম্ভ হবে।

কলকাতা অধিবেশনের কয়েক দিন পরেই দেশবদ্ধ চিন্তারত পুলিশ বিহারীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিশোধ কখনও হবে

এবং পুলিশ বিহারীকে অসহযোগী সমিতি থেকে ফেডারেশন সহ এই অধিবেশনে যোগ দিতে হবে। পুলিশ বিহারী সম্মত হয়ে গৃহে ফিরলেন। পরবর্তী কয়েক দিন এর উদ্ভোগ আরোহনে কাটল। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হল। দেশবদ্ধ চিন্তারত, মতিলাল নেহরু, মদন মোহন মলয়া এবং মায়ারী নেতৃত্ব প্রদত্ত বিরোধীতা করে বার্ষিক হলেন।

নাগপুর কংগ্রেসের কয়েকটি ব্যাপার পুলিশ বিহারীর পরবর্তী কার্যক্রমের উপর বিশেষ রোষপাত করেছিল। প্রথমত তিনি বিলাফ সমস্তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন নি। এছাড়া তিনি গান্ধী বিরোধী মনোভাব নিয়েই অধিবেশনে যোগদান করেন। তা ছাড়া নাগপুর প্রথম দিকে গান্ধীজী দেশবদ্ধের সঙ্গে একটি আপোষ রকম করে মূল প্রস্তাব আনয়নে ব্যস্ত হন। কিন্তু মুহম্মদ আলী এবং সৌকত আলীর নেতৃত্বে বহু মুসলমান সমস্তা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার গান্ধীজী বুঝতে পারেন যে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণে কোনরূপ অসুবিধা হবে না। এছাড়া তিনি দেশবদ্ধকে ডেকে বললেন যে বিশেষ চিন্তার পরে তিনি স্থির করেছেন যে তাঁর অসহযোগ নীতির পূর্ব নির্দিষ্ট কোন কঠোর-তাই শিথিল করা হবে না। অবশ্য কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরে তিনি দেশবদ্ধকে অসহযোগের বিরোধীতা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন এক দেশবদ্ধ ঐ অনুরোধ মেনে নেন।

(চলবে)

চিঠি-পত্র

মাননীয় বিপ্লবী বাংলা সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের ৮ই মার্চের সংখ্যার “২১শে ফেব্রুয়ারী অরণ্য” প্রবন্ধটি লেখার জন্য ঐজ্ঞেয় চন্দ্র দাস মহাশয়কে এবং উহা ছাপার জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। তবে আরও বিস্তারিত সংবাদ ছাপাইলে আরও অভিনন্দন বোধ্য হইবেন। আশা করি ঐজ্ঞেয়বাবু বা অশ্রু কান বোধ্য ব্যক্তি এই সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন ও ফলাফল ‘বিপ্লবী বাংলা’র মাধ্যমে জনসাধারণকে জানাইবেন।

ঐজ্ঞেয় বাবু লিখিয়াছেন পেশোয়ার হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ২২টি ক্যাক্টনমেন্টে বৈপ্লবিক সংগঠন হইয়াছিল, অস্ত্র পড়িয়াছি কোয়েটা হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ৩৪টি ক্যাক্টনমেন্টে সংগঠন হইয়াছিল। ঐ ক্যাক্টনমেন্টের নামগুলি প্রকাশ করিলে এ সমস্তা মিটিয়া যায়। ইহাই কিন্তু যথেষ্ট নয়, কোন ক্যাক্টনমেন্টে কে কে সংগঠক ছিলেন, কোথায় কত সৈন্য বিজ্ঞোহে যোগ দিতে রাজী হইয়াছিলেন ও কত সৈন্য বিজ্ঞোহ করিয়াছিলেন, ফল কি হইয়াছিল—কতজনদের প্রাণ দিতে হইয়াছিল এবং তাহারা কোন রেজিমেন্টের এবং তাহাদের নাম কি, কোন প্রদেশের লোক ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুসন্ধান ৬৫ বছর পরে খুঁটী কঠিন কাজ—তারপর বিপ্লবীদের মস্তজপ্তি ও আছেই তবে ব্রিটিশদের দলিলামি সংগ্রহ-শালায় অনেক আছে কিন্তু কিছু হয়ত ভারত ভ্রমের আগে তাহারা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, লওনেও অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে কৃপাল সিংদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিজ্ঞোহের দিন এগিয়ে ১১শে ফেব্রুয়ারী করা হয় তাহাও ঠিক নয়। জেনে ফেলে—কাহার বিশ্বাসঘাতকতা? এ সংবাদও মহানায়ক রাসবিহারী জানতে পারেন কাহার সাহায্যে এগুলি শারলক হোমসের গল্পের চেয়েও নাটকীয়।

বিপ্লবীদের খুব অধ্যাবসারের সাথে এবিষয়ে গভীরভাবে গবেষণার প্রয়োজন। আশাকরি তরুণ বিপ্লবীরা বুদ্ধদের এ আশা পূর্ণ করিবেন। এর দ্বারা সাব্যস্ত হইবে বিপ্লবীরা উপকৃত হবেন। একটি বড় ভুল ঐ প্রবন্ধে আছে। ১৯১৫ সালের ১২ই মে, মহানায়ক পি, এল, ঠাকুরের বেনামে ‘জাপান’ গিরেছিলেন ‘জার্মান’ নহে। এটা মুদ্রাকর প্রমাদ বা ‘ছাপাখানার ভুলের’ কাজ মনে হয়।

আবার ২ পৃষ্ঠার তৃতীয় প্যারায় ‘জাপানবাসী ভারতীয়দের’ আগে ‘জার্মানে’ শব্দটি কিভাবে চুকিয়া পড়িয়াছে? আবারও কি ছাপাখানার ভুল?

প্রবন্ধটি খুবই শুভাশুভ আমরা কিন্তু আরও শুভাশুভ প্রবন্ধ লিখি ও আশা করছি।

মহানায়ক রাসবিহারীর আর এক চমৎকার বৈশিষ্ট্য তিনি কখনও প্রোথার হন নাই। জগতের বড় বড় বিপ্লবীদের মধ্যে বোধ হয় কেহই এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেন নাই—কংবার পুণিল তাঁকে

ঘিরে কেসেছে কিন্তু আশ্চর্য্য উপস্থিত বৃদ্ধি ও চমৎকার বেশ পরিবর্তন রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের চেয়েও রোমাঞ্চকর। বিষ্ঠার বৃদ্ধি মাথার বেথর থেকে শৌখীন নিশাচর, এগুলিও লোকের ভাল করে জানা উচিত।

মহানায়কের বাণী সঙ্কলনও এই সংখ্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর অমর বাণী সঙ্কলন। মাত্র ১২টি বাণীর মধ্যে সমস্ত বিপ্লবী চিন্তার সার প্রকাশ পেয়েছে। এ গুলিও তিনি কি অবস্থার কোথায় বলেছেন (reference to the context) জানলে অমর বাণীর সার্থকতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা বাইত।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর মত মহানায়ক রিসার্চ ব্যুরো গঠন করা অবশ্য প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতেছে। বিপ্লবী বাংলা গোষ্ঠী এই ভূমিকা অনেকবানি পালন করিতেছেন বলিয়া আমাদের ধন্তবাদ্য। কিন্তু অলিভার টুইষ্টের মত আমরা সব সময়ই। আরো বেশী, আরো বেশী চাই।

শিবনাথ ব্যানার্জী

৬৩। ১, কালী ব্যানার্জী লেন, হাওড়া

পরলোকে বিপ্লবী রম্যনাথ ব্যানার্জী

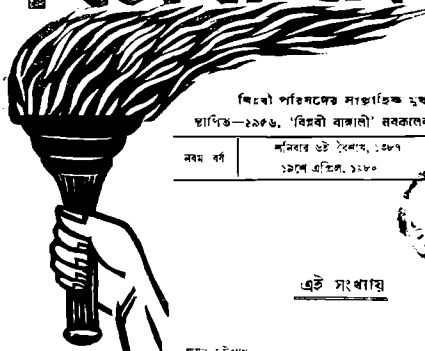
প্রবীণ বিপ্লবী রম্যনাথ ব্যানার্জী ২৫ই মার্চ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। জন্ম খুলনা জেলার ব্রাহ্মণরাংসিরা গ্রামে, অল্প বয়সেই তিনি বিপ্লবী অরুণশীল সমিতির সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার তাকে Extern করা হয়। তখন তিনি ভাতা (মিরট বড়বস্ত্র মামলার আসামী) শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জীর নিকট চলিয়া যান। সেখানেই কলেজে ভর্তি হন ও রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত হন। বি, এ, পাশ করেন। মিরট-মামলা শেষ হলে হাওড়ায় এসে ফ্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, ফলে কারাবাস হয়। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি ফ্রেড ইউনিয়ন ও সম্ভাব্য আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ভাষাপত্র পান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পেনসনভোগী ছিলেন।

আমরা তাঁহার বিনোদী আত্মার শান্তি কামনা করি।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—CALCUTTA			
Banerjee Smt Kamala w/o Late Santosh Banerjee	16/A, Picnic Garden, 3rd Floor Calcutta-39	200	3 1 79
Dist—NADIA			
De Smt Aparna w/o Late Sushanta K. De	P. O. & V-II Gouripur	150	23 10 79
Dist—BURDWAN			
Das Smt Bibha Rani w/o Late Nagendra Nath Das	Vill Foleya, P.O. Biswa Sorabho P. S. Purbasthali	150	23 4 79
Majumdar Smt Saraju w/o Late Nagendra Majumdar	8/6, Rana Pratap Road P. O. Durgapur-4	100	21 12 79
Devi (Singh) Smt Rampari w/o Late Singaldeep Singh	Street No. 38 Qr. No. 11/C P. O. Chittaranjan	200	20 8 78
Dist—MIDNAPUR			
Bag Surendra Nath	Vill Barbojitpur P. O. Chakdipa	200	5 4 74
Maity Kshudaram	Vill Raynagar P. O. Keskhali	200	8 4 74
Maity Radhanath	Vill Rauthpara P. O. Karnigarh	200	15 8 72
Patro K. U.	Rly. Qr. No. 1/23, Unit 12 New Settlement P. O. Kharagpur	200	1 6 77
Dist—JALPAIGURI			
Mustafi Smt Multi Rani w/o Late Nagendra Mohan Mustafi (Ex-Andaman Political Prisoner)	Vill Bamanpara, P. O. Kharis	200	10 7 79

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক পুস্তক
 প্রাণিত—১৯৪৬, 'বিপ্লবী বাংলা' সমকালেবার—১৯৭৯

নবম বর্ষ	শনিবার ৬ই বৈশাখ, ১৩৮৭ ১৯শে এপ্রিল, ১৯৮০	৫০ সংখ্যা
----------	--	-----------



এই সংখ্যায়

জয়ন্ত ৬টুকু

—সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক ভাষ্যমালায় বাগ

বিশ্রোভী অসাম

—প্রবর্তক

বার বিপ্লবী সতীন্দ্র দেব

—বাংলাদেশের দেশভুক্ত

বাইবেলিক প্রবেশদেব দেব শুভিকণা

—অধ্যাপক নবীনচন্দ্র দেব

বকক ভকক বেগে বিনোদ শিশু

—প্রবর্তক

চিহ্ন-পত্র

ভারতবর্ষের নামে জাতি একমত

এক পরামর্শ, একেজোখী না

হুইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই

—বক্তৃতা

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—CALCUTTA			
Bhattacharyya Smt Radha Rani w/o Late Birendra Bhattacharyya	C/o Bikash Bhattacharyya 51, South Road, Cal-32	100	4 8 79
Bose Smt Geeta w/o Late Sarad Pr. Bose	C/o S. R. Bose, 1/70, Azadgarh (Ex-Audaman) Calcutta-40	100	25 4 79
Chakraborty Niharika w/o Late Ramesh Chakraborty	P-404, Parmashree Pally Calcutta-40	150	2 6 79
Chanda Smt Puspa Rani w/o Late Chittaranjan Chanda	D-56 Bagha Jatin Colony Calcutta-32	200	24 7 79
Chatterjee Smt Mrinalini w/o Late Benoy Chatterjee	32, Deshapran Sashmal Road Calcutta-32	100	12 4 79
Dev Smt Sushama w/o Late Satya Prasanna Dev	11B, Mahesh Chowdhury Lane Calcutta-25	150	29 9 79
Ghosh Nivarani w/o Late Pulin Ghosh	104A, B. T. Road, Calcutta-35	150	21 11 79 (in place of Rs. 200 previously as a daughter got married)
Guha Smt Ashaleta w/o Late Jyotirmoy Guha	14 L. Dhakuria Station Road Calcutta-11	100	12 8 79
Kundu Smt Anga Debi w/o Late Anath Bandhu Kundu	46 (I) Block, Bagha Jatin Colony. Calcutta-47	100	22 10 79
Mitra Smt Mira w/o Late Ardhendu Mitra	13, Sarker Bye Lane, Calcutta-7	150	25 8 79
Roy Smt Usha Rani w/o Late Prakesh Roy (4 Prgs.)	69, S. K. Deb Road, Cal-48	100	6 4 79

(Contd. on 3rd Cover)

: জয়তু চট্টগ্রাম :

১৯৩০ সালের আঠারই এপ্রিল ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। ভারতবর্ষের সমস্ত সংগ্রামের যে দ্বারা কিংবা শতাব্দীর প্রথম থেকে ইংরেজ শাসনকে অপসারণের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল, নতুন করে তার একটা বাস্তব রূপায়ণে মূর্ত প্রকাশ দেখে ইংরেজ শাসক হল শঙ্কিত। দেশবাসী হল আত্মীয় ভক্তিতে গৌরবান্বিত এবং নতুন করে অতীতমস্তে দীক্ষালাভ করে আত্মসম্মিত ফিরে পেল, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিবেদন করার জন্য লাভ করল অসীম ও তুচ্ছ প্রেরণা।

এই পুণ্য দিবসে চট্টগ্রামের জালালাবাদ শহরে মাস্টারদার (সূর্য সেন) নেতৃত্বে বাংলামাতার একদল লামাল ছেলে সাময়িকভাবে ইংরেজশাসনের অবসান ঘটিয়ে দেখানে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই সব তুচ্ছ বিপ্লবীরা যুদ্ধের রক্তে জালালাবাদকে রঙিয়ে দিয়েছিল। তাদের পরাণে কোন লজা ছিলনা। জীবন-মৃত্যু তাদের পায়েই ভূত ছিল, চিত্ত ছিল তাদের ভাবনাধীন। নবযুগের এই দর্শনীদের আত্মবিশ্বাসের ফলেই অসংখ্য মানুষ পেয়েছে প্রেরণা, জেগেছে তাদের বিচারশক্তি, বোধশক্তি, উদ্ভূত হয়েছে তারা দেশপ্রেমে। এরা মুক্তাঙ্গন, এরা পথ প্রদর্শক, এরা বহু হয়েছেন অসংখ্য দেশবাসীর ভিতর। এরা শকুনি, এরা অশ্বঘ, এরা নমস্তা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আপন গৌরবেই এরা চিরদিন সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। দেশবাসীও তাদের আত্মীয় সঙ্গে, গর্বের সঙ্গে, বিনম্র চিন্তে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মর্যাদা করবে।

বীর বিশ্ববী সতীত সেন

॥ বাহুবল সেনগুপ্ত ॥

বরিশালের মুকুটহীন রাজা অধিনীকুমার দত্তের প্রয়াণের পর যে মুকুটটি আপনা থেকেই অপর একজনের মাথায় এসে আশ্রয় নিল তিনি হচ্ছেন বীর সংগ্রামী সতীত সেন।

কর্মবীর সতীত সেনের কর্মপ্রয়াস শুধু বরিশাল নয় সমগ্র বাংলায় ব্যপ্ত ছিল। যেখানে অত্যাচার, অবিচার সতীত সেন সেখানেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের রক্ত মূর্তিতে আবিভূত।

তাই দেখি পট্টাবালির সত্য্যগ্রহ, ১৯৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে প্রয়াত হেমন্ত কুমার বসুর সাথে একযোগে পিকেটিং প্রকৃতি আন্দোলনের পুরোভাগে সতীত সেন।

১৮৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল তারিখে বঙ্গাব্দ ১৩০১ (২রা বৈশাখ) বাংলাদেশের করিমপুর কোটালিপাড়ায় সতীশ্র নাথের জন্ম। তাঁর শিখা নবীনচন্দ্র মাতা সৌদামিনী দেবী।

সতীশ্রনাথ প্রথম জীবনে সমগ্র বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করেন। কপিলবর্তীকালে তিনি গান্ধীজীর অহিংস নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

অকস্মিক বিক্রম্বে প্রতিবাদ মনুষ্যের অধিদা ও মানবিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার বিরুদ্ধে কণ্ঠে দাড়াতে সতীত সেনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। তাই সতীশ্রনাথকে জীবনের আগা গোড়াই নির্ধাত্মশিষ্ট হোতে হয়েছিল। কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেও তিনি বিশ্রামের অবকাশ পাননি। সাধারণতঃ রাজনৈতিক কর্মীদের অক্লান্ত কাজ চলে বাইরে। কারাভ্যন্তরে তাঁরা বাধ্যতামূলক বিশ্রামের সুযোগ পান। সতীশ্রনাথের ভাগ্যে সে সুযোগ বা অবসর জোটে নাই। সেখানেও সংগ্রাম, এই অসাধারণ কর্মীর সমগ্র জীবনটাই সংগ্রামের কাহিনীতে চরপূর। ১৯২৯ সালে ২৪ মে তারিখে সতীশ্রনাথ বরিশাল জেলে অনশন শুরু করেন। এই অনশন চলে ১৪৩ দিন। জেলের অভ্যন্তরে অসহ্য বন্দীর হাতে অনশন ছাড়া আর কি হাতিয়ার থাকতে পারে? সতীতসেনের অনশনে সারা দেশে চাঞ্চল্য দেখা দিল। ইতিমধ্যে লাহোর জেলে ঘটীন দাস ৬৩ দিন অনশনে প্রাণ বিদর্জন দিলেন। সুভাষ চন্দ্র বসু ও বতীশ্রমোহন সেনগুপ্ত সতীশ্র নাথকে অনশন ভঞ্জে রাজি করতে বরিশালে ছুটে আসেন। দেশবন্ধু জাহ্না বাসন্তীদেবী সতীশ্রনাথকে অনশন ত্যাগ করার জন্য বার্তা পাঠান।

বরিশাল টাউনহলের জনসভায় সুভাষচন্দ্র ভাষণ প্রদক্ষে বললেন—সতীতবাবু প্রতিবারই সত্যের

কিন্তু লড়েছেন এবং প্রত্যেকবার তিনি জয়ী হয়েছেন। সতীনবাবু ইতিমধ্যেই ভারতবাসীর হৃদয় মন অধিকার করে বসেছেন।

দেশ বিভাগ হবার পর সতীশ্র নাথ পাকিস্তানে থাকারই সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দেশত্যাগের বিরোধী পাকিস্তান সরকার তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করেছে। বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। তাঁর মহৎ চরিত্রের স্তম্ভে বহু মুসলিম তরুণ তাঁহার অনুগামী হয়েছিলেন।

১৯৪২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান গুরুত্ব সম্পর্কে এক নব জাগরণের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলীম লীগ শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়।

হুজুফট অভূতপূর্ব দাফল্য লাভ করে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার এই সরকারকে বেশীদিন ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি। ফজলুল হককে পদচ্যুত করে গ্রেপ্তার করা হয়। সতীন সেনকে ১৯৫৪ সনে ৩১ মে তারিখে পটুয়াখালিতে গ্রেপ্তার করা হয় আরো বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সতীন সেনকে বরিশাল জেল থেকে রংপুর জেলে পাঠানোর দমর জেলে আটক রাজকন্দী এবং উকোল হবিবুল্লাহ সবেদে বলেছিলেন একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় ছিলাম। সে গাছ, সে ছায়া সরে গেল, বাংলার লৌহ মানব সোয়া করবেন। সতীশ্রনাথকে রংপুর জেলে নানা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রেখে ১৯৫৫ সালে ১১ মার্চ ঢাকা সেটেলজেনে আনা হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা ও দুরের কথা পাকিস্তান সরকার নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাবার পর্যন্ত তাঁকে দেয়নি। অসুস্থ অবস্থায় পুলিশ প্রহরীবাদী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চরম অবস্থায় ২৫ মার্চ রাতে সতীশ্র নাথ চির নিদ্রায় নিভ্রিত হন।

হাসপাতালের রোগীগণ কর্মীগণ কেউই জানতে পারলেন না যে এই অনাদৃত কর্মদীটি ?

আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা সেই মহাপ্রাণের প্রতি জ্ঞানভঙ্গী নিবেদন করে বলব বিপ্লবী মানব সতীন সেন অমর হয়ে আছেন।

৪ পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী জনার্দন চক্রবর্তী ৪

ঢাকার প্রবীণ বিপ্লবী জনার্দন চক্রবর্তী ৮১ বৎসর বয়সে কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

অল্প বয়সেই তিনি বিপ্লবী দলের সম্পর্কে আসেন। অকৃতকার্য এই বিপ্লবী—আন্দোলনের প্রারম্ভ স্তরে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। একানিষ্ট এই বিপ্লবী কর্মজীবনে সর্বত্রই প্রশংসার স্বাক্ষর রেখেছেন। ‘ভারত-ভাড়া’ আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। মোট ১১ বৎসর কাল তিনি কারাবরণ করেন। বহুবৎসল সর্বজন প্রিয় এই বিপ্লবীর প্রস্থানে আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

চিঠি-পত্র

মাননীয় সভাপতি,

পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্যাণ সংস্থার আহবানে বহু প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী গত ২২শে মার্চ ১৯৮০ অপরাহ্নে সংস্থার ২।১, জীনাথ দাস লেনস্থ কার্যালয়ে মিলিত হন, সংস্থার সভাপতি ত্রিভুজ নলিনীগুহ, এম. এল. এ, মহাশয় সভাপতি, আসন গ্রহণ করেন।

সভায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনী জন্ম প্রকাশের সিদ্ধান্ত লওয়া হয় ও এই কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য নিম্নোক্ত স্বাধীনতা, সংগ্রামীদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয় ত্রিনিদী গুহ, এম. এল. এ, ত্রিভুজ নলিনীগুহ, ত্রিভুজ চন্দ্র দত্ত, ত্রিভুজ নাথ বসু, ত্রিভুজ ভট্টাচার্য, ত্রিভুজেরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর, ত্রিভুজ বসু, ত্রিভুজ দত্ত, ত্রিভুজনাথ গাঙ্গুলী, ত্রিভুজাতিরিক্তদাস গুপ্ত, ত্রিভুজ চৌধুরী, ত্রিনিখিল দত্ত, ত্রিভুজনাথ কুমার চক্রবর্তী, ত্রিনিদী গোপাল দে, ও ত্রিভুজেরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় (আহবায়ক) উক্ত কমিটি পক্ষ হইতে বাংলার সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্যাণ সংস্থার ২।১, জীনাথ দাস লেন কলিকাতা ১২, ঠিকানা পাঠাইতে বা যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অফিস বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত বোলা থাকিবে।

ভবনীয়—

ত্রিভুজনাথ কুমার চক্রবর্তী।

ঃ পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী যামিনী কুমার দে ঃ

গত ২রা এপ্রিল আলিপুরদুয়ার এর জিৎপুর গ্রামে ৮৭ বৎসর বয়সে প্রবীণ বিপ্লবী যামিনী কুমার দে পরলোক গমন করেন। তরুণ বয়সেই তিনি বিপ্লবী নায়ক—।

মহারাজ ক্রৈলোকা চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্পর্কে এসে অমূল্যলীল সমিতির সভা হন, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি কর্ম প্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে দীর্ঘ ৮ বৎসর কারাবরণ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি আলিপুর দুয়ার মহকুমার কন্দুস্থান বেছে নেন এবং বস্তু সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি আলিপুর দুয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী সমিতির সভাপতি ছিলেন।

আমরা এই বিপ্লবের অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

স্বরণীয় জালিওয়ানালাবাগ

একটি জাতির জীবনে মহাকাালের পরিক্রমা পথে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে, যেটা :জাতির সৌরবোজ্জল ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে নিরবধিকালের কপোলতলে স্তম্ভ সমুচ্চল হয়ে বিরাজ করে। এই ধরণের ঘটনা কখনও গ্লান হয় না, বরং চিরদিন দেশের মানুষের সামনে পথ প্রদর্শক আলোকতন্তুতরুপে বিরাজমান থাকে। দেশের মানুষকে উত্তেজিত করে মহত্তম আগর্শলাভের জন্ত চরম স্বার্থ ত্যাগ করতে। উত্থান পতনের ধারার মধ্যে মানুষের ভিতরে জাগিয়ে তোলে ইচ্ছাপাত কঠিন সম্ভব। নৈরাশ্র বিজয়ী নিষ্ঠা, প্রামাণ্য সশ্রেয় অপরাহ্মের আশাত সহিষ্ণুতা, চূর্ণম গিরি কান্তার মত ক্ষুদ্র পায়াবার লজ্জন করার চূর্ণম মনোবল ও দুঃসাহস। জালিওয়ানালাবাগের ঘটনা ভারত ইতিহাসে এই রকম একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্ধবহ ঘটনা।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল অনুভূতমতে জালিওয়ানালাবাগে যে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড করেছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুইটি নরসেহ ধারণকারী দুই মমমত পুত্র, তার ফুলনা ইতিহাসে নেই বললেই চলে।

দুশস্ত কথ্যাত রাউলাট আইনের প্রবর্তনের প্রতিবাদ। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে লালিত, অপমানিত ভারতবাসীর বিরোধের আশ্বনের এটি ছিল মূর্ণ প্রকাশ। প্রথম মহাদ্দের সময় ইংরেজ ভারতীয়দের হস্তে শাসনভার স্তর্ণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ভারতীয় অর্থ

সহায়ক সেবা ও জীবনদানের বিনিময়ে। কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর দেখা গেল, এই প্রতিশ্রুতি একটি বিরাট ভাঙতা। স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবাদ উঠেছিল দেশবাসী। কিন্তু সাম্প্রতিক ইংরেজ শাসক প্রতিবাদের কোন মূল্য না দিয়ে নতুন ভাবে অত্যাচারী অস্ত্র প্রয়োগ করতে চাইল একটি ভবন্ত আইন পাশ করে যার দ্বারা তারা অবাধে অত্যাচার চালিয়ে যেতে পারে। দেশ প্রেমিক স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীদের উর্গণ।

ইতিহাসের ধাতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এটি অদ্বুত গণজাগরণ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি ইতিহাসের পারম্পর্যের নিদর্শন মাত্র। উনবিংশ শতাব্দী থেকে এর সূচনা বিশেষভাবে মঙ্গলপাণ্ডুর বিদ্রোহ এবং আত্মবলিদান, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের নিরলস প্রচেষ্টা, চাপেকার ভাইদের আত্মত্যাগ, কুদিরাম প্রসন্নচাকীর আত্মদান, বিপ্লবীদের ধারক ও বাহকদের সাধনা, রাসবিহারী বসুর সমস্ত বিপ্লবের সর্বাঙ্গ প্রচেষ্টা, বাঘাবতীনের জীবন বলিদান একের পর একটি অঙ্গুচ্ছেদ রচনা করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায়। দেশের মানুষের স্বাধীনতালাভের সমস্ত স্পৃহা, বিপ্লব সাধনার অটুট ধিকিধিকি করে আসেই চলেছিল মানুষের মনের মনিকোঠায়। শুধু একটা অগ্রিগন্ত স্থলদের প্রয়োজন ছিল এই আগুন ছড়িয়ে দিতে। জালিওয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ড অগ্রিসংযোগ করল

নতুনভাবে স্বদেশ প্রেমের এই বাতাসে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মানবতার অবমাননার কুক হয়ে, নাইট উপাধি ত্যাগ করে হোমরাগিতে সামিথ সংযোগ করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে গান্ধীজী অবতীর্ণ হলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মকে জালীওহালা বাগ ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে ব্যাতি অর্জন করেছিল। সেই আন্দোলন তারপর থেকে ক্রমাগত ব্যাপকভর হয়ে উঠেছে। রক্তস্রাব মুক্তিযুদ্ধ জালীনওহালাবাগ স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিলক্ষণে স্বীকৃত। জনমানসে বহুদিনের সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত বেদনা ও ক্ষোভ জন-জাগরণের মধ্য দিয়ে একটি সংহত ও দৃঢ়রূপ নিয়ে গণআন্দোলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এটাই শেষ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে

ভিত্তিস্থাপিত করেছিল। এটাই জালীনওহালা-বাগের বৈশিষ্ট্য।

জালীনওহালাবাগ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ আলোক-স্তম্ভরূপে বিস্তারিত থাকবে। তাই এই দিনটা আমাদের পরমশ্রদ্ধেয়, শ্রবণীয়, বরণীয়, এবং অপ্রিনন্দনবোধ্য। সমগ্রজাতির সঙ্গে আমরাও এই দিনটিকে মরণ করি গর্বের সঙ্গে।

স্বাধীনতা পূর্বযুগে ৬ই থেকে ১০ই এপ্রিল সমগ্র জাতি জাতীয় সপ্তাহ মলিন করত, সমাপ্তিদিবসে (জালীনওহালাবাগ দিবসে) নতুন প্রেরণালাভে করতাম শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতাম। হৃৎকের কথা এই দিনটিকে ভুলে গিয়ে আত্মবিশ্বাসের সপোহর অর্জন করেছি। আমরা প্রত্যাশী করব দেশবাসী এই ত্রুটি সংশোধন করবে এই শ্রবণীয় ও বরণীয় দিনটিকে যথাযথ মর্যাদা দান করে।

ঃ পরলোকে প্রবীত বিপ্লবী প্রবোধ গুপ্ত ঃ

জন্ম—১৯০২। গত ২রা এপ্রিল নেতাজীসহরে ঢাকার প্রবীন বিপ্লবী প্রবোধ গুপ্তের কর্মময় জীবনের সমাপ্ত ঘটে। মহাজ্ঞা গান্ধী'র উদাত্ত আহ্বানে কলেজ ছেড়ে ননকোঅপারেশন করে যেখানে এসে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। সেই সময় বিপ্লবী নায়ক জীবন লাল চাটাজী'র সংস্পর্শে এসে বিপ্লবীদলে যোগ দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ফলাফলিত তিনি দীর্ঘ ৮ বৎসর বিভিন্ন কারাবাসে এবং ডিটেনসন ক্যাম্পে আবদ্ধ থাকেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি বামবপু'রই তার কর্মস্থল-বেছেনেন, উদাত্ত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে বামবপু'র কলোনীতে উদাত্ত পুনর্বাসন—উদাত্তদের জন্ত স্থাপন—সংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অসাময়িক একানিষ্ঠ বিপ্লবীর প্রদানে আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

রাষ্ট্রগুরু শ্বরেজ্ঞ বাথের স্মৃতি কথা

[“A Nation In Making” এর থেকে অংশগ্রহণ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নগিনীমোহন দাসগুপ্ত

শাসন সংস্কার ও চরমপন্থী মতবাদের প্রসার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এটা ছিল বাংলার ভরুপ মনের একটা কলঙ্কারী অবস্থা। আরও বোঝা যায় যায় যে এই মেজাজের মধ্যেই তার অবসরের এবং ঘটনাক্রমে অবগুপ্তের বীজ ও উৎপত্তি ছিল। তার কথা সময়ে এর প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল এবং তা দেখা দিল ইচ্ছাৎ প্রবল বেগে। এখন আমরা পান্ডিত্যের বা কিছু সবই ভাব, সবই বরষীয় এবং এই মনোভাব কাটিয়ে উঠেছে এখন আমরা একটা আন্দোলনে আবর্তের মধ্যে আছি যে আন্দোলন আমাদের মূখ্য কিস্তির সেবে আমাদের নিজস্বের প্রাচীন সভ্যতার দিকে, আমাদের কালাহিত পথ ও প্রসার দিকে। যুগের পর যুগ চলে গিয়েছে। কিন্তু তার থাকা আমাদের সে পথ ও প্রসার উপরে কোন প্রভাব রেখে যেতে পারেনি, আধুনিক জীবন যাত্রা প্রণালীর শক্তিশালী ও তাদের মাত্রার ভাঙ্গা গভীর প্রচণ্ড ক্রিয়ামূলকতার থাকা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এই আন্দোলন কি সকল হবে? আমার তাতে গভীর সন্দেহ আছে। কারণ, এরকম আন্দোলন বস্তু বিধের চিরন্তন সত্যের বিরোধী, আর বিরোধী গতিশীলতার সেই সেই বিধানের যে বিধান এক অদৃশ্য শক্তি তার অদৃষ্ট হস্তে মাত্রার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠার খোদিত করে রেখেছেন। তবে এ আন্দোলন সকল হোক বা না

হোক, ব্রিটিশ শ্রীতির বোকের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা আংশিক ভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিজেরই সৃষ্টি। কারণ কোন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই তার ঐজিরের ক্ষেত্রে পুরোমাত্রায় অতিশয় হতে পারে না। ভারতে তারা অনেক অস্বীকার করেছেন, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তা সবই উল্লার এবং কল্যাণকর। অনেক প্রতিষ্ঠান গড়েছেন যার মধ্যে য় শাসনের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮৩০ সালের চাইরি আক্টের দ্বারা উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে যে অবাগ্যতা ছিল, তা দূর করেছেন। কিন্তু কার্যতঃ চাইরি আক্ট মৃত অবস্থায় রয়ে গেল। ১৮৫৮ সালে মহারাজার ঘোষণা বাণীতে মানসিক উৎসাহকেই যোগ্যতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি বলে গৃহীত হয়। এখানেও মনও প্রতিশ্রুতি প্রকৃত পক্ষে কার্যে প্রযুক্ত হলে না। ১৮৮২ সালে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন স্বীকার করে নেওয়া হল। কিন্তু যে সমস্ত বাধা নিষেধ আরোপ করা হল তাতে এ শাসনের অনেক বানিই সন্ধ্যা করে দেওয়া হল। এই বাধা নিষেধ সম্পর্কে ভারত সচিব লর্ড মলে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তার পরে এলেন লর্ড কার্জন। তিনি এমন কতগুলি কাজ করলেন বা জনপ্রিয় হলেন। তিনি সরকারী অফিসের গোপনীয়তা বিষয়ক আইন

প্রবর্তন করলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আপন প্রেশন করলেন পরে করলেন বঙ্গ বিভাগের ব্যবস্থা। বঙ্গ বিভাগের কথাটা সব শেষে উল্লেখ করলেও গুরুত্বের কিন্তু সব চেয়ে কম নয়। তার এই সমস্ত কাজই জন-সাধারণের মনে প্রবল ভূগার ভাব সৃষ্টি করে। দেশ বিভাগের ভিত্তিতে নতুন গড়া প্রদেশে সরকার যে পদ্ধতিতে শাসন কার্য পরিচালনা করেন তাতে জন-পণের ক্রমবর্ধমান স্পর্শকাতর অস্বস্তিকে আরও প্রবল করে তোলে। সরকারের সেই শাসন পদ্ধতি চরম পরিণতি লাভ করল ১৯০৬ সালে বরিশাল কনকাবেল ভেসে নেওয়ার মধ্যে। আমাকে যদি কোন একটি ঘটনাকে নির্দেশ করতে বলা হয় যে ঘটনাকে বাংলার বর্তমান চরমপন্থী মতবাদের উৎপত্তি ও বিস্তারের উৎস বলা যায়, তাহলে আমি বলব যে সেটা হচ্ছে ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বরিশাল অধিবেশন ভেসে নেওয়ার ব্যাপারে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই ঘটনাগুলোর অধ্যায়টি। সেই সময়ে বরিশালে যে সমস্ত দেশ নৈতা: সমবেত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে এমন এক জাগরণ দেখেছি সে রকমটি আমি আর দেখিনি। এমনকি মিঃ কুপেন্ড নাথ বসু বিনি কিছুদিন আগেও একমিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন এবং বিনি ধীর ধীরে, স্থির, গভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং হিসেব করে কাজ করতেন, তিনিও তখন এমন ভাবা প্রয়োগ করেছিলেন যা তিনি বা আমি পুনর্বীর উদ্ধারণ করতে চাইব না। তখন সময়টা ছিল দারুণ উত্তেজনার সময় এক আমাদের বৈধ আন্দোলনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস নিখিল হয়ে পড়েছিল। অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের মেকাজই যদি তাই হয় তা হলে পরবর্তী ভরের অঙ্গশাক্ত কয় বহনী কর্মীদের—যারা বরিশালে অধিক সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন—

মনোভাব কী হতে পারে তা অনুমান করা যায়।
এসব হল ১৯০৬ সালের কথা। আর ১৯০৮ সালে আবিষ্কৃত হল আলিপুর হত্যাকাণ্ড। বরিশাল থেকে আমি ক্রুদ্ধ মন নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। আমার অনমনীয় আশাবাদও মনে হল যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে প্রথমে আমি যে কাজটি করলাম তা হল সরকারের সঙ্গে তখনও আমার যেকোনো সম্পর্ক ছিল, তা ছিল, তা ছিন্ন করা। সেই সময়ের জন্য আমি একজন অসহযোগী হয়ে গিয়েছিলাম এ ব্যাপারে প্রথম দিকে যারা অসহযোগ মত্রে বিধানী ছিলেন আমি তাদেরই মধ্যে একজন হয়ে পড়লাম আমি কলকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ এবং বাহাওপুরের সম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ছেড়ে দিলাম। এই পদত্যাগ ছিল বরিশালের শাসন কর্তৃপক্ষের কাজের প্রতিবাদে। কোন একটা সুনির্দিষ্ট নীতি বা উদ্দেশ্যে এহণ করার জন্য নয়। এ রকম কাজ আমি এর আগেও করেছি। ১৮৯৯ সালে কর্পোরেশনের ১৭ জন মেম্বারের সঙ্গে আমি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পদ ত্যাগ করেছিলাম। সময় সময় এমন ক্ষেত্র উপস্থিত হয় যখন আমাদের অবস্থাই ‘অসহযোগ’ করতে হবে এবং প্রতিবাদরূপে তাকে কাজে লাগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অসহযোগ নীতি চালিয়ে যাওয়া আমি পছন্দ করিনা। বিশেষতঃ এমন একটি সময়ে যখন সরকার ক্রমোচ্ছিন্ন পথে চলতে প্রস্তুত, হতে পারে তাদের পদক্ষেপ ততটা ক্রান্ত নয় যতটা ক্রান্ত আমরা দেখতে চাই।

এই রকম একটা চরমপন্থী অভিমতের আওতাধার মধ্যে শাসন সংস্থার সম্পর্কে পর্যালোচনা চলে। ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সভ্যদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাওয়ার

জ্ঞাত ও শাসন সংস্থারের অভিপ্রায়কে নতিশীলী করার উদ্দেশ্যে আমি সেখানে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দেই। আমার আশা বৃথা যায় নি। ভাইস হুন্ডের সভাপতিবে জন্মগত কাউন্সিলের সভায় বিষয়টি নিয়ে সামগ্রিক ভাবে পর্যালোচনা হয়। সম্ভাব্য সর্বপ্রকার মতামতের দিক থেকে শাসন সংস্থারের বিষয়টি নিয়ে হুস্তি উত্থাপন করা হয়। আমার প্রস্তাবের পক্ষে সম্ভাব্যজনক সাড়া পাওয়া যায়। মাত্র দুজন ছাড়া ছাউসের আর সাকলেই আমার প্রস্তাবের অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সে প্রস্তাবের বয়ান যা রিল তা এখানেই তুলে ধরছি।

(১) এই কাউন্সিল শাসন সংস্থার প্রস্তাবের জ্ঞাত মহামাফ্র ভাইসহর এবং ভারত সচিব সহায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে এবং এ প্রস্তাবকে ভারতে ক্রমিক উন্নত ধরনের দাবিকশীল সরকার লাভের অভিমুখে এক সুনিসিষ্ট এবং নিতেজাল প্রয়াস বলে মনে করে।

(২) এই কাউন্সিল সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের নিকট এই অভিমত প্রকাশ করছেন যে শাসন সংস্থার সম্পর্কীয় স্টিপাট বিবেচনার জ্ঞাত এবং ভারত সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সুপারিশ করার জ্ঞাত এই কাউন্সিলের সমস্ত বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা একটি কমিটি নিয়োগ করা হোক।

প্রস্তাবটি যে দুটি অংশে বিভক্ত এবং তা যে পৃথক ভাবে রাখা হয়েছে, তা প্রস্তাবটি দেখলেই বোঝা যায়। দুটি অংশে সম্পর্কেই মাত্র ২ জন সমস্ত অংশটি জানল। মি: প্যাটেল, বিনি বর্তমানে নন-কো অ্যাপারেশন বলের একজন প্রধান ব্যক্তি, ছিলেন সেই দুজনের মধ্যে একজন দ্বারা প্রস্তাবের

প্রথম অংশের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। এই এই শাসন সংস্থার প্রস্তাবের প্রথম অংশের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।

এই শাসন সংস্থার প্রস্তাবের মধ্যে দাবিকশীল সরকার লাভের পক্ষে কোন সুস্পষ্ট ক্রমোন্নতি আছে বলে তিনি মনে করেন নি। দ্বিতীয় অংশটির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলে দু'জন ইয়োরোপীয় সদস্য। তাদের একজন হলেন কেবের চেম্বার অব কমার্শের মি: হপ এবং অপর জন হলেন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্শের মি: কাস্তুর সাইড। তবে তারা দুজনেই কিন্তু আমাদের কমিটির সভাপতিতে উপস্থিত থেকে তাদের পরামর্শ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। কাউন্সিলের সভায় তারা যে মনোভাব প্রদর্শন করে ছিলেন তার কারণ হল তারা নিজ নিজ। চেম্বারের কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাননি। আপোই বলেছি, ইয়োরোপীয়দের চেম্বারগুলি এখন সবই শাসন সংস্থারের পক্ষে এবং কাউন্সিল সমূহে তাদের দ্বারা প্রতিনিধি ছিলেন তারা সক্রিয় ভাবে শাসন সংস্থার ব্যতে সাফল্য মণ্ডিত হয় এ জ্ঞাত সহযোগিতা করেছেন। আমার এই প্রস্তাবের উপর আমি আমার যে বক্তব্য বেবেছিলাম তা থেকে একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করতে চাই এই জ্ঞাত যে তা থেকে আহার এবং সভারত পাটির শাসন সংস্থার সম্পর্কে মনোভাব কি, তা জানা যাবে।

‘শাসন সংস্থার সম্পর্কীয় এই প্রতিবেদনটিকে যদি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা যায়, তা হলে, আমার মনে হয়, এটা স্বীকার করতেই হবে, যে যে এর মধ্যে আমাদের শাসন কর্তাদের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট লক্ষন আছে, এবং আমি নির্দিষ্ট পূর্ততার সঙ্গে একথা কহতে চাই যে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অনুরূপ ভাবে মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া উচিত।

(চলবে)

বিদ্রোহী আসাম

॥ ঐসতীকৃষ্ণ সেন ॥



রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডী আসামে অত্যাবশ্যক কাজকর্ম চান্স রাখা নিয়ে একটি অভিনাস জারি করলেন।

দিন করেক আগেই 'আসাম অবরোধ' ফুল নেওয়া হয়েছিল। আসাম সরকার তৈলখাটী পাইপলাইনের দ্বারা আধ কিলোমিটার স্থানে, ১৪৪ দ্বারা জরি করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে আসাম বন্ধ আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করেছিলেন। ঐ আদেশ অমান্ত করার অপরাধে গোয়েটেড অফিসারদের মাসপেণ্ড করতে লাগলেন। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হল। আমরা মনে করিনা এইবার বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠবে আসামের সমুদ্রে বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে। কলকাতারী ভাণ্ডারের পর আসবে শান্তি ও নীরবতা।

আসামের পূর্বে রাজনৈতিক নেতারাও তাই একে একে অজ্ঞাতবাস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ৭০ দশকের অগ্রিকর্ষী তরুণ ছালাল বড়ুয়া, চল্লিশে পা নিয়ে নিভে গেলেন। এখন সারা আসাম ছাড়ে ইউনিয়ন বা 'এ, এ, এস, ইউ' মন্ত জলে উঠলেন, বললেন, 'আসামের সাম্প্রতিক আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত। জনপ্রিয় এবং সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। কারও সাধ্য নাই এই আন্দোলন দমন করবে।' ৫০-এর দশকের উগ্র বাঙালীঘেদী কমরেড গৌরিশঙ্কর,

বয়সের ভারে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। জনতা পার্টির সভাপতি রূপে দিনগত পাশকর করছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনিও নাতিশেষ মত বোঝনের ভেঙ্গে উদ্ভাবিত হয়ে উঠলেন। সারা আসাম ছাড়া ইউনিয়ন বা এ, এস, এস, ইউ, সরকারী আদেশ অমান্ত করার ক্ষমত জনসংকে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা পুনরায় উল্লেখ করলেন যে আসামবাসী বাঙালীরাও এই আন্দোলনে বোঝার যোগ দিয়েছেন, অন-অসমিতা ব্যবসায়ীরা অর্থসাহায্য করে আন্দোলনকে ধিচিয়ে রেখেছেন। এই শাস্তিপূর্ণ জনপ্রিয় গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনে ফাটল ধরাবে, সে সাধ্য কারও নেই।

নিজের আন্দোলনকে সকলেই জনপ্রিয় মনে করে, শাস্তিপূর্ণ বলেও প্রচার করতে চায়। যেখানে ১৯৫১ সালকে ভিত্তি বছর ধরে, লাখ পকাশ বাঙালী হিন্দু-মুসলিমকে খেদিরে দেওয়াই শুধের লক্ষ্য, সেখানে কোথায় শ বানেক মানুষ ভুললীলা দান্ড করল, কিংবা হাজার বিশেক পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। সেটা চোখে পড়বার কথা নয়। শুচি বাহুগুণ্ড কেউ যদি এর মাঝে নির্গাভনের গন্ধ পান, তা আর কি কথা হবে। 'শাস্তি বাবু' শাস্তির কথাটাই বকুন। শাস্তিভর হয়েছে একথা কিন্তু কেউ বলতে পারবেন না। শাস্তি বাবু ফাহিনী শোনেন নি?

শান্তি বাশক্তও ছিলেন 'হাজারিকা' মাসীসভার একজন মহী, ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে নওগাঁ জেলার 'হোজাই' কেন্দ্রে থেকে নির্বাচিত সদস্য নিগন্ত নভেশ্বর মাসে লামডিং সহরে সাম্প্রদায়িক অশান্তির সময়, স্থানীয় অসমিকা জনসাধারণের মনে সাহস কিরিয়ে আনবার ক্ষম শান্তিবাহুকেই বেতে হয় সেখানে। এ, এ, এস, ইউ-র খেজাসেবীদের তাঁরা চান নি। লামডিং থেকেই, শান্তি বাবুকে পৌছাটি ছেতে হয় মাসীসভার অধিবেশনে বোগ দিতে।

তখন গৌহাটিতে ১৪৪ ধারা বলবৎ। পাঁচজনের বেশী একত্র জমা হওয়া নিষেধ। পুলিশ ভ্যান টহল দিচ্ছে। তবু এ, এ, এস, ইউ-র ছেলেরা স্বাক্ষপথে ব্যারিকেড্ রচনা করেছে। মালবাহী ট্রাক ও বায়ীবাহী বাসকে সহরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। তারা শান্তিবাহুর গাড়ী আটকালো। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন, তবু বাওয়ার অসুস্থতি পেলেন না। তাঁর দিকিউরিটি গার্ডের হিম্মলভার কেড়ে নিল এবং গার্ড ও ড্রাইভারকে বন্দী করে নিয়ে গেল। পরে গাড়ীসত্ত্ব শান্তিবাহুকে নিয়ে, প্রথমে তারা গেল আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কাম্পাসে। 'পশুপালন ও গৃহ উৎপাদন' শান্তি বাবুর পোট'কোলিও, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সকলেই তাঁর পরিচিত; তবু কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন না। ছেলেরা সেখান থেকে হাঁটিয়ে, তাঁকে নিয়ে গেল মাইল দেড় হুয়ে পাহাড়ের মধ্যে একটি নির্জন ঘরে। তাঁকে সেই ঘরে বদ্ধ করে ভাল দিবে, পাহারা বসিবে, ছেবে গেল। পরে ববর পেরে army camp থেকে জগন্নাথ এসে শান্তি বাবুকে মুক্ত করে। তা যদি না করতো তবে বধা সময়ে কাস্তজাই তাঁর নাম দেখতেন। এ রকম গুম হওয়া, আজকের আসামে দৈনন্দিন ঘটনা। অসমিয়ারাও বাদ পড়েন

না। বেগম আবদার কথা ভুলে বান নি নিশ্চরই, কিনা দেবকান্ত বড়ুয়ার কথা।

আসামের এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ কি না, সেটা ভেবে দেববার। ভেবে দেববার এই ক্ষম, যে বর্সার জামাএসাদের মানসপুত্র অশিবিহারী এবং আমাদের ঘরের জামাই কার্ণাণ্ডিক, ইজনেই, দেখছি আসামের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করেছেন। তাঁরা কেউ যে ভারতীয় সাহিত্যর শত্রু তাতো নয়। বাঙ্গলে বিধেযী তো হতেই পারেন না। জা হলে ?—অনেক দিন আগে, আমি একটা গুম হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আজও চোখ বুজলেই সেই দৃশ্যটি দেখতে পাই, যদিও ৫৫ বছর পার হয়ে গেছে। সেটা শান্তি পূর্ণ বলা বাবে কিনা, আপনারা বিচার করবেন।

আন্দরকিন্না বস্ত্রীরহাট, চাটগাঁ সহরের কেন্দ্র। সেদিন ছিল বস্ত্রীর হাটের হাট। গ্রামের বেপারীরা সওগা নিয়ে এসেছে। পথে ভিড়, যাক লাগছে এর ওব গায়ে। তবু সকলেরই মুখে হাসি। মন্থরগতি জনতার গুমনে হাটের পথ মুখরিত। এই সময় কাদের সর্দার কিতন চেপে লায়ন থিয়েটারের 'শ্রাও-বিল' বিলি করে। আজ থিয়েটারের গাড়ী আসেনি, এসেছে অজ্ঞ এক গাড়ী। গাড়ীতে বাও নেই, বিজ্ঞাপন নেই, আছে একদল ঋণ্মুখ। ঝলমলে লুজি, জালের গেজি, চণ্ডা বেষ্ট, হাতে হাটের। পথিকেরা গাড়ীর পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়, মুখের হাসি মিলিয়ে যায় গুদের কথা শুনলে। একে অপরের মুখের দিকে চায়, ভাড়াভাড়ি বাড়ীর পথ ধরে। শুধু হিন্দু-রাই ভয় পায় না, মুসলিমরাও পায়।

জনতার মাঝে গুওরা হিন্দু মুসলিম চিনবার চৌঁচী করে। মুসলিমকে বলে একটা 'ড্যাটা' মুসলিম ভাইকে মেয়েছে। শ্রিণ্ডার গদীতে তার বিচার

হবে। আপনারা জমায়ত হোন। হিন্দুকে হাটোর দিয়ার খোঁচা মায়ে, বলে 'বা শালা বাড়ী বা'। হিন্দু মুসলিম চিনতেও ভুল করে। হিন্দুর মাঝে অনেকে লাড়ি রাখেন, মুসলিমও কেউ কেউ ধৃতি পাবেন।

বাকে নিয়ে এই আলোড়ন, ঘটনার সুরাপাতেই সে দোকান বন্ধ করে পেছনে সরে পড়েছিল। দোকানের পেছনে নালা, প্রায় ঝালের মত গভীর। বর্ষায় ধরস্রোত, শীতে বটখটে, কচুরিপানার জঙ্গল। 'কুকড়ো'রা তাকে ধরতে আসবে, বুঝেই কচুরি পানার জঙ্গলে নেমে গেল।

'ইবা কন' [কে শুটা]! গলাটা রহিমের মত। রহিম তার মস্তই একজন ছোট পোকানী। উত্তর দিল মাহুঘট, 'আই আরি চাচা, 'আই সুরেন্দর'।

'ভাঙ্কব ব্যাঘ্রার স্বপ্ননা দেখি! আয় উঠি আয়; চুই ইটা কি করলি ক' সেবি?'

'ক'বাটা শোন চাচা। কতর করে থাকি, পায়ের বড়ম গুলে হু'বা লাগাও। বাকলিয়ার মাহুঘটা দুই গজ ছিট পছন্দ করল। আমি মেপে দিলাম। দাম বায়ে আনা। তুমিই কণ, ছয় আনার কম ছিট আছে নি এই বাজারে? কাপড়টুকু নিয়ে একটা আধুলি কেলে দিয়ে চলে যায় দেখে কাপড়টুকু চেপে ধরলাম। ওর সঙ্গে কি জোরে পারি, এক ঘটকায় কেড়ে নিল। তখন হরলাম ওর ছাত্তা,—এটাই হল তুল। আর অমনি হৈ হৈ, মার মার। আমি কেন ওকে মারতে বাব? মেয়ে আমার লাভ'।

রহিমও এই রকমই কিছু ভেবেছিল। বরীয়ার হাটের দোকানদার, ভাড়া দামে ঠাকার, মাগে ঠাকার। কিন্তু মাঝামাঝি লাগলে বিশ হাত ধরে থাকে। বুঝেছিল সুরেন নির্দোষ। বাকলিয়ার গুণাবলিও সে চেপে। কালামানিকের [আকিং]

কারবারে বড় বড় সদাগরদের ডান হাত, এই বাকলিয়ার চরের মাহুঘর।

ততক্ষণে সুরেন একটু খাডস্থ হয়েছিল। বলল, চাচা আজকের রাতটা আমার লুকিয়ে রাখ। ভোর হতে হতে চলে যাব। এখন হাতে পেলে, ওরা মেয়ে কেলেবে' বলে একটু হাসল। হাসিটা সুরেনের নব সন্দেহের। বংশোদ্ভূত দোকানদারি করে, খরিদারের মনের কথা অনুমান করার শক্তি অর্জন করেছে। রহিমের কাছে 'আশ্রয় পাওয়া' যাবে কিনা বুঝবার চেষ্টা করল। রহিমের মুখ অন্ধকার, অবিচলিত।

রহিম দেখেছে পাড়ার কুকুরোরা কেমন ক্ষেপে উঠেছে। সামনে বাকে পাবে, চেপে ধরবে। সুরেনকে না পেলে ধরবে গিরে গজেনকে। একই কথা তার পক্ষে। কিন্তু যদি জানতে পারে সে সুরেনকে আশ্রয় দিয়েছে, ইচ্ছত রাখবে না।

'কেউ জানবে না চাচা, বোলা তোমার দোয়া করবেন।'

হাতি কোম্পানীর গনি মিঞা সদাগরের দরবার। মোটা-মোটো, প্রৌঢ় সদাগরটি একজন সম্মানিত বানবাস্তুর। ধনী এবং বানবীল। তাঁরই দরবারে বিচার আরম্ভ হয়েছে সুরেনের। সেনাপতি সৈয়দ মিরাহল আলি [সিরাজা গুণ্ডা] ঘটনার ইতিহাস বিবৃত করছিলেন। বিচারক একবার সুরেনের দিকে চাইছিলেন, একবার চোখ বুলান্ধিলেন সম্ভবত বিচারপ্রার্থীদের দিকে। এরা বস্তীর খেটে খাওয়া মাহুঘ। মেহেনতি জনতা। দক্ষিণ, লোভী, দুষ্ট, হিংস্র এবং এই মূহুর্তে দারুণ উত্তেজিত। সামলানো কঠিন।

তখন দরবারে প্রবেশ করলেন আশাদুল্লাহ।
সাহেব। পুলিশের দারোগা, সহরের শাস্তিরক্ষার
অধিকর্তা, শেভোয়ালীর অফিসর-ইন-চার্জ। তখনো
তিনি ইনস্পেক্টর হননি, ডি. এস. পি. হননি,।
যান বাহাদুর হননি। হবেন যে তার লক্ষণ ক্রমশঃ
ফুটে উঠছে।

সিরাজা দেলাহ দিল—“বড় মিঞা, আপনি
আবার এখানে কেন এলেন? বড়মিঞা সিরাজ্যার
পিঠ চাপড়িয়ে বসলেন। ‘সেবিস মনুষ্যটোরে খুন করে
কেলিসনা যেন ‘শাস্তিভঙ্গ’ হলে কিন্তু তোকে
আর বাঁচাতে পারব না। যা করবি, চূপে চাপে
করবি, শাস্তিভঙ্গ যেন না হয়।’” অতঃপর বড়মিঞা
কয়েকখানা নোট পকেটস্থ করে বিদায় নিলেন।
একজন হেড কন্সটেবল ও দুজন পুলিশ রইল, শাস্তি
দক্ষা করতে।

শুরেন তখন স্বপ্নাচ্ছন্ন, বলির পাঠার মত
কাঁপছিল। স্তম্ভপানের সঙ্গে জনমীর বৃক্কের গোপন
শব্দ। যন্তে সঙ্কীর্তিত হয়েছো.....হিন্দু ধর্মভীত
ফরকল, মুশলমান গোখাসক গুণ্ডা। হিন্দু কখনো
মুশলমানের সঙ্গে গায়েব জোরে পারে না।

বিচারক প্রশ্ন করলেন, “তোমার কি বলবার
আছে?” শুরেনের বলবার কিছুই ছিল না। কথা
বলবার শক্তি বা সাহস কোনটাই ছিলনা সে ফ্যাল
ফ্যাল করে চেয়েছিল, সদাগরের হাতের আংটির
দিকে। ওটা কি হীরে? এত বড় হীরে। কতো
দাম হবে?

তুই মুসলিম ভাইকে ঘেরেছিস? ‘জি হুজুব’

উত্তর দিল অভিব্যাপকারী। যমকে বললেন
“চূপ!!” —শুরেনকে আসনেশ করলেন, ‘গর
পায়ে ধরে ক্ষমা চা।’ পায়ে ধরা এবং ক্ষমা চাওয়া
হল। —‘নাকে খুঁ দে। বল, এমন কাজ আর
করব না।’ —‘নাকে খুঁ দিচ্ছি, এমন কাজ আর
করব না।’ বল আবার! আবার!! —

বারবার এই মন্ত্র রূপ করতে করতে, চতুষ্পদের
মত ঘরের এক ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত
পর্যন্ত চলতে চলতে, হাত পা অবশ হয়ে আসে।
জিভ জড়িয়ে আসতে থাকে। সম্মুখে জনতার
উল্লাস ও নিঃশ্বাস ঘর আচ্ছন্ন হয়। হাত, পা, ও
নাক আলা করে। গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে।

মাথুর ভগবানের অংশ। ভক্তকণ্ঠই সে ভগবানের
অংশ, যতকণ্ঠ সে বিপদ। যখন হাট গেড়ে বসে,
মাথা নম্র করে, পা জড়িয়ে ধরে অস্ত্র দ্বিপদের।
হামাগুড়ি দেয় চতুষ্পদের মত; তখন সে পশু।
বিশেষতঃ যদি অস্ত্র সব বিপদ সম্মুখে উপস্থিত থেকেও
তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে না আসে। যদি তারাত
তার পীড়নে আনন্দ লাভ করে, তখন সে পশুর
মতই Instinct এর নির্দেশ মত চলে। মনে করে
পৃথিবীতে ভগবান নেই, মাথুর নেই; দ্বার নেই,
অস্ত্রায় নেই; শুধু আছে ভয় আর আছে আত্মরক্ষার
চেষ্টা।

যখন আধার নেমে আসে, পথের নিশানা হারিয়ে
যায়, এখনই সমর হয় বিকলো চমকের। ইতিহাস
থেকে থাকে না, পেছনেও হটে না।



রক্ষক ভক্ষক হ'লে বিনাশ নিশ্চয়

ক্রীঃশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় আর, এম, পি, সমস্ত বিন্যাস চৌধুরী কর্তৃক বিবৃত ইসলামপুরের লোমহর্ষক ও মর্মবিধারক ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে এক জ্বালন্ত স্ফোরক করেছে। নারকীয় পুলিশী জাওবে এই থানা এলাকার সাতটি গ্রাম শাসনে পরিণত হয়েছে। গ্রাম সাতটির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ভস্মীভূত, কল কতির পরিমাণ গ্রাম পটিল লাখ টাকার মত। ঘর-ঘোর সবই আলিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ায় মানুষজন তথায় নিঃস্ব। কয়েক শত মানুষ গ্রাম ছেড়ে পলাতক হ'তে বাধ্য হয়েছে, পুলিশী অত্যাচারের জ্বালায়। বহুলোক পুলিশ হাজতে অতিক্রম করায়। বিধান সভার অজ্ঞাত দলের সমস্তরা এই ঘটনার বীভৎসতা ও নিষ্ঠুর ভয়াবহতা সম্বন্ধে বললেন যে, পুলিশের লোকেরা তথায় ডাকাতি করেছে। এ ব্যাপারে তাঁরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের জ্ঞাত দাবী তোলেন। সরকারী হস্তক্ষেপ ও বিবৃতির দাবীও জানান তাঁরা। সংবাদে প্রকাশ যে, পুলিশই ডাকাতি করে বলে শুধানকার বর্ধিষ্ণু গ্রামবাসীদের অভিযোগ। কলে ৩৫০ ভূপসিলী ৫০ মুসলাম ও ২৫ উচ্চাঙ্গ পরিবার পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়। পুলিশ তার হাতের কাছে থাকেই পেয়েছে তাকেই বেসম প্রহার করেছে। পুলিশই লুণ্ঠন চালিয়েছে সংঘবদ্ধভাবে। কলকাতার ব্রহ্মসমাজ রক্ষণ আলি সাহেবও পুলিশী নির্মম অত্যাচারের অভিযোগ সমর্থন করে এবং প্রতিকার দাবী করেন। ফুলবাড়ি, গওলগাছ, বড়গাছ, হোটেলগাছ ও আলপাশের আরও তিনটি গ্রামে পুলিশ বাড়ী বাড়ী ঢুক লুণ্ঠন চালায়।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার পুলিশ ডাকাতি করেছে, এর চেয়ে অন্তত সংবাদ আর কি হতে পারে বলে জরুরী আবেদন সাহেব মন্তব্য করেন। জনসাধারণের নিরাপত্তা বজায় রাখার জ্ঞাত তিনি আবেদন জানান। আবজল করিম চৌধুরী সাহেব বিধান সভায় বিবৃত করেন যে, পশ্চিম দিনাজপুরের পুলিশ সুপারের সমর্থনে ইসলামপুর থানার পুলিশরা এই অঞ্চলের ফুলবাড়ি, গওলগাছ, বড়গাছ ইত্যাদি সাতটি গ্রামকে দ্বিতীয় 'শি'পড়া' বানিয়ে ছেড়েছে। এই মারাত্মক অভিযোগ নিঃসন্দেহে পুলিশের ভূমিকা। যে রক্ষকের না হয়ে ভক্ষকের হয়েছিল তথায়, তা স্বরণ করিয়ে দেয়। ইতিপূর্বে পুলিশের বিরুদ্ধে একগুণ অভিযোগ শুনা গিয়াছিল বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গও যে এ ব্যাপারে পেছিয়ে নেই এখন তা জানা গেল।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অজ্ঞাত দল মোবাইল থাক না কেন, এই ধরনের অজ্ঞাতকারী ভূমিকায় তাদের ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। পুলিশবাহিনীতে এই মারাত্মক অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয় কেন? কি এর প্রকৃত কারণ? মনে হয় প্রশাসন ব্যবস্থার ও পুলিশ পরিচালনার এ রাজ্যে নুতন করে যে পার্টী বাহী আমদানী করা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাহাই এর মূল কারণ, নচেৎ পুলিশ-বাহিনীতে এ জিনিষ পূর্বে তো দেখা যায় নি। পার্টী বাহী প্রজন্ম পাওয়ার এ রাজ্যে শাসকদের কর্মী ও আশ্রিতদের অপরাধ অস্বীকার করেও পুলিশের নিষ্ঠুরতায় রেহাই পেয়ে থাকে। অপর

পক্ষে সাধারণ মানুষ ও বিরোধীপক্ষে লোকেরা পুলিশী নির্ধ্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছে সর্বত্র। এই সরকারের মনোভাবকে জনগণের দা বলে পার্টি দরদী বললেই হবে সঠিক বলা হবে, কারণ নিজ জোন্টের দুই জন প্রতিনিধির দ্বারা উক্ত জরুরি অধিবেশনের কথা শুনেও সরকার অচঞ্চল ও মৌন কেন? শাসকবল ও পুলিশের মধ্যে কি কোনও অলিখিত চুক্তি রয়েছে যে, পুলিশ শাসকবলের ও তাদের সমর্থকদের দল অপরাধেও চূপচাপ থাকবে কোন আইনামূলক ব্যবস্থা নেবে না, আর অন্য পুলিশ বা ধর্মী তা করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে শাসকবল নীরব দলবর্ষের ভূমিকা দেবে? মনে হয় শাসকবলে ও পুলিশে চমৎকার ঝগড়া চলছে, উভয়ে উভয়ের সাহায্যকারীর ভূমিকার অবতীর্ণ হবে প্রয়োজন বোধে। বর্তমান নশসে ঘটনা তাহাই প্রমাণ করে। পুলিশ আজ বসে দোবেই কতক না কেন, শাসকবলের বাবুদের ও তাদের চেলাদের দল দোবেও গায়ে হাত দেয় না; নচেৎ কোন সাহসে থানার বড়বাবুর নেতৃত্বে ডাকাতি করতে যেতে সাহস পায় পুলিশ ও সেই ডাকাতিকারীরা বাবা পোলে কোন সাহসে বৃহত্তর পুলিশবাহিনী নিয়ে গিয়ে ভাষার গ্রামকে গ্রাম লুণ্ঠন ও পরিশেষে অগ্নি দগ্ধ করতে সাহসী হয় পুলিশ, তার হিম্মতে। নিশ্চয়ই শাসকবলের পেটেরা পুলিশ ছাড়া এ কাজ অপরের দ্বারা অসম্ভব।

পুলিশ পরিচালনার এক্সপ পার্টিবাহী চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আরো অধিক পরিমাণে এক্সপ নকারজনক ঘটনা ঘটতে থাকবে। ফলে জন-জীবন বিপর্যস্ত হতে বাধ্য হবে। পুলিশের ব্যর্থতা অধঃপতন ও নকারজনক ফ্রিক্যাকলেশের মূলে হচ্ছে এই পার্টিবাহী, বা সমগ্র পুলিশ বিভাগকে কলুষিত

করেছে ও ভবিষ্যতে আরো করবে। এর হাত থেকে পরিচালনা পাবার একমাত্র উপায় পুলিশ বিভাগে ও প্রশাসনে পার্টিবাহী বন্ধ করা বা বর্তমান সরকার মনে করলেই এখনই তা করতে পারেন।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সারা পাকিস্তানের মানুষ উৎকর্ষিত। গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-বাটে, সর্বত্র এই বিত্তীহিতামর পুলিশী ডাকাতি মানুষের মনে এমন এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে হতাশা এনেছে যে তারা পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর দৃষ্ট আস্থা হারিয়েছে বাধ্য হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও গৃহদাহ, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, নারীদর্ষণ, মারদাঙ্গা প্রভৃতি অপরাধ প্রশমন ও দমন পুলিশেরই কাজ। সরকার পুলিশ প্রশাসনের দ্রুত বদলি বরচের মাধ্যমে উত্তরোত্তর বাড়িয়েই চলেছে জনগণের অসন্তোষে সেই পুলিশ যদি জনগণের রক্ষক না হ'বে জনগণের গৃহদাহের কার্যে নিয়োজিত হয় বা জনগণের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনকারী লিপ্ত হয় বা জনগণকে অকার্যে মারধোর করে, তবে জনগণ কি তাই এই বিভৎস পুলিশীরাষ্ট্রকে বরদাস্ত করতে পারে! পুলিশ তার সঠিক ভূমিকা ত্যাগ করে অর্থাৎ সেবার মনোবৃত্তি ত্যাগ করে যদি লুণ্ঠনকারীর ও অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তবে এ রাষ্ট্রের জনসাধারণ কি পুলিশকে সঠিক পথে চালিত করার দায়িত্ব তাকে শায়েস্তা করবে না? জনগণের অর্থে পোষা পুলিশ যদি জনকল্যাণের পরিবর্তে জনগণের পক্ষে অভিযোজিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে জনগণ সেই পুলিশকে আর বিশ্বাস করবে না তাদের সঙ্গে সহযোগিতা? পুলিশের বন্ধ কর্তাদের ও সরকারের এ ব্যাপারে আর পূর্বের মত নিষ্ক্রিয় থাকে চলবে না? যে অন্তত কাওকারখানা দিনের পরদিন পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত হচ্ছে তা সত্যই ভয়াবহ ও মর্মভঙ্গ, কাজেই এর ইতি টানা এখনই

প্রয়োজন জনস্বার্থে। অবশ্য কালকিলমে এই ব্যাপারে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। দুইঘণ্টা কথ্য সুবাদ্বয়ী জ্যোতিবাবু সেমিন বিধান সভায় অস্থগতিত থাকার ক্ষত কোন মত্ৰীই উক্ত ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে কোনও রূপ বিবৃতি দিয়ে জন প্রতিনিধিদের শান্ত করতে পাবেননি। সরকারের পক্ষে এ অবস্থা চলতে দেওয়া অপৌরবের নয় কি? আইনমত্ৰী সভায় উপস্থিত থেকেও কোন তথ্য সিতে অপারগ হন কেন? জ্যোতিবাবু ছাড়া অস্ত মত্ৰীরা কি সবাই নাবালক না তাঁদের নাবালক করে শুধু সভা সাক্ষিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে নাকি সভা প্রকাশ হলে সরকার লজ্জায় পড়বেন এই ভয়ে সরকার পক্ষ নির্বাক হয়ে থাকে নাকি বর্তমান সরকার পুলিশের সঙ্গে মিডালি করে চলতে চায়? কোনটা সঠিক? সরকার যে এমন নিষ্পন্দ-নিব্ব হব তা কে আগে জানতো। বামপন্থা মানে কি পুলিশী ভরসায় রাজ্য শাসন— না আরো কিছু অর্থং পুলিশী সন্তুষ্টি বিধান ও পুলিশীরাজ প্রতিষ্ঠা? কোনটা সঠিক? মনে হয় বর্তমান সরকার পুলিশকে তোয়াজ করে চলতে চায়, তাই পুলিশের বিরুদ্ধে উক্ত গুরুতর অপরাধ অত্যাচারের কথা শুনেও সরকার নীরব ও নিষ্পন্দ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এ রাজ্যের জনগণ কি এই নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতা আর সহ্য করতে রাজি হবে? বিধান সভায় ৬ই এপ্রিলের পুলিশী তাপ্তবের কথা যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে তা পশ্চিম-বঙ্গের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পুলিশী জুলুম, ডাকাতি, গৃহদ্বারের ঘটনা সর্বত্র দারুণ বিরক্তির

ও বিদ্বেষের সৃষ্টি।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ প্রশাসনে সীমাহীন ঐক্যতা ও বিশৃঙ্খলা যে হারে বর্তমানে বেড়ে চলছে তা সভাই বিবয় সৃষ্টি করেছে। খোদ কলিকাতা পুলিশে কমিশনারের বিরুদ্ধে তার ডেপুটিদের যে ধারণা ও যে আচরণ তা পুলিশ প্রশাসনকে সাধারণের চোখে হের প্রতিপন্ন করেছে। বিগত বৃহস্পতি সরকারের আমলে পুলিশ-এ্যাসোসিয়েশন থাকা সত্ত্বেও আর একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম সম্ভব হয় সরকারেরই পৃষ্ঠপোষকতার ও আচুকুলো দ্বার নাম নন-গেজেটেড পুলিশ এ্যাসোসিয়েশন বামফ্রন্ট সরকারের স্বাক্ষর লাভে কোন সময়েই বন্ধিত হয় না। পুলিশবাহিনীতে রাজনীতি আমদানী করেছে সি, পি, এম দলই প্রথম এবং তা ১৯৬৭ সালের মধ্যভাগে।

তখন থেকেই পুলিশ প্রশাসনে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও ঐক্যতার প্রকাশ ও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। জনগণের অবস্থায় এখন পুলিশ যত না সক্রিয় ততোধিক সক্রিয় দলীয় রাজনীতিতে। ফলে বঙ্গ পুলিশ ভক্তকের ভূমিকায় প্রাধান্যই ব্রহ্মরূপ সদাপটে বা ধূমী তাই করে চলছে, আর বামফ্রন্ট সরকার নীরব দর্শক মাত্র তার কেনী কিছু নয়। স্বাক্ষরী পুলিশবাহিনী যদি স্বাক্ষর কার্ণের বদলে জংলের নেমার মেতে ওঠে, তবে এ রাজ্যে জনগণের চরম বিশগ আমল। সরকার পুলিশবাহিনীকে এখনও সংযত ও সংযত করন নচেৎ বিশগ নিষ্কর।

(Contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
------	---------	---------------	------

Dist—24 PARGANAS

Adhikari Jitendra Nath	Kemdalikati, P. O. Mandra	200	1 4 71
Brahmachari Usha Rani w/o Late Atul Chandra Brahmachari	P. O. Natagarh	100	9 6 71
Gupta Smt Binapani w/o Late Bikash Chandra Gupta	P. O. Baranagar	150	27 10 71
Mukherjee Jatindra Madhab	4, Desbbandhunagar Colony P. O. Sodepur	200	1 5 71

Dist—HOOGHLY

Chatterjee Smt Gita Rani w/o Late Bholanath Chatterjee	Vill Kakagachi P. O. Bhanderbati	150	8 11 7
---	-------------------------------------	-----	--------

Dist—HOWRAH

Barua Smt Nihar Bala w/o Late Ajoy Singha Barua	P. O. & Vill Nibra (Via Makardah)	100	16 5 7
--	--------------------------------------	-----	--------

Dist—BURDWAN

Basu Smt Kiranbala w/o Late Mekhan Basu	C/o House of K. P. Sen Vill Baisnab Bani, P. O. Burapur	150	28 1 8
Dutta Usha Rani w/o Late Nanigopal Dutta	Ex No 19201/S. A. M. C. Traffic Colony, Andal, P. O. Andal	150	9 4 7
Majumdar Santisudhr w/o Late Nitish Majumdar	Vill Purnabata P. O. Durgapur	200	1 10 7
Sarma Smt Rama Devi	P. O. Barakar, P. S. Kulti	150	16 5 7

Dist—MIDNAPUR

Barik Himangshu Sekhar	P. O. & Vill Gopichak	200	1 5 7
Das Angur Mohan	Vill Purushottampur P. O. Laksminibari	200	20 3 7

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অহুসীলন সমিতির বিপ্লব প্রকাশ—অনুচ্ছেদ ১৫—০'০০

বিপ্লবী মহানায়ক বাসুবিহারী—অনুচ্ছেদ ১৫—০'০০

কীৰ্ত্তন কুমার দত্তের—

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ১। বাংলায় অহুসীলন—১'৫০ | ২। বহিষ্ঠারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮'০০ |
| ৩। অহুসীলন সমিতির পি, মিডিয়—২'০০ | ৪। দৌহাঙ্গী সংগ্রাম কাহিনী—১'০০ |
| ৫। কাকোরী নহীঃদ্রব্য—১'২৫ | ৬। কলতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—১'০০ |
| ৭। বাসুবিহারী ও অহুসীলন সমিতি—১'০০ | ৮। স্বাধীনতার পথের দা ৩ মেমোর—১'০০ |
| ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—১'০০ | ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—১'০০ |
| ১১। মহাবীর ও হুতাশ—১'০০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও তিনদিনের বিপ্লব—১'৫০ |
| ১৩। দেশ বাসের ভোগেনি (১)—১'০০ | ১৪। দেশ বাসের ভোগেনি (২)—২'০০ |
| ১৫। নহীঃদ্রব্যের আত্মক—১'০০ | ১৬। ১৯৪৭ এপ্রিল জাতীয় নহীঃদ্রব্য বিপ্লব—১'০০ |
| ১৭। হাতিজা হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অহুসীলন সমিতি—১'০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—১'০০ | ২০। লাইট হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০ |

প্রাপ্তিস্থান :—১নং বঙ্গবাস ট্রাষ্ট কলিকাতা-৭০০০০৭

টেলিগ্রাফ—১/২/১/A ৩.৫৫ চাটাকী ট্রাষ্ট কলিকাতা-৭০

— সম্পাদক অফিস —

শ্রীমতীল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীমতীল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতীল চট্টোপাধ্যায়

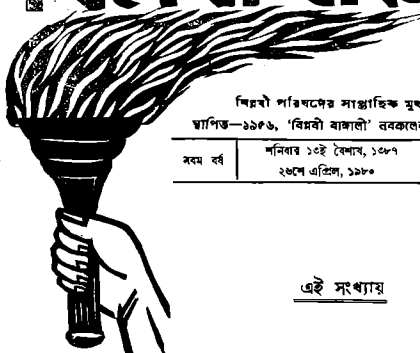
সম্পাদক—শ্রীমতীল চট্টোপাধ্যায়

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীমতীল চট্টোপাধ্যায় : বেঙ্গাল—শ্রীমতীল চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীমতীল চট্টোপাধ্যায় : প্রকাশক—শ্রীমতীল চট্টোপাধ্যায়

বিপ্লবী বাংলা কাহিনী :—১নং বঙ্গবাস ট্রাষ্ট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাংলা' তৎকালে—১৯৭৯

নবম বর্ষ

শনিবার ১০ই বৈশাখ, ১৩৮৭
২৬শে এপ্রিল, ১৯৮০

০১ সংখ্যা

এই সংখ্যায়



Who are Foreigners in Assam ?

আসাম সমস্যার সমাধান অবগতাবী

—সম্পাদকীয়

আই, সি, এম, হীন প্রশাসন জনকল্যাণ-ভিত্তিক হবে কি ?

—অজিত চন্দ্র দাস

দিনাজপুরে কৃষকদের ঝগড়া

—অনিলা দাস

দলীয় চক্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ সংসদে

ভারতবর্ষের নামে জাতি একমত
এক পয়ামা, একোত্তাপী না
হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই
—বহিঃমন্ত্র

Who are Foreigners in Assam ?

The Bengalee Hindu Refugees are being treated as 'Foreigners' during the present phase of Movement in Assam, taking advantage of existing discriminatory citizenship law of the country, which would be apparent from the very recent judgement of the so-called 'Foreigners Tribunal' set up by the Government of Assam and presided over by the one, Assistant District and Sessions Judge at Jorhat, district Sibsagar, Assam.

TRUE-COPY OF THE JUDGEMENT

In the Court of Foreigner's Tribunal, Sibsagar, Dt. Sibsagar.

Present :—Sri S. M. Deka, M. Sc., LL B.

Foreigner's Tribunal, Sibsagar, Jorhat.

P. T. Case No. 17/19

Bhromori Bala Dey.....Petitioner.

Sl. No. Dt. 17. 1. 80.

ORDER

This common order will dispose of F. T. Case No. 17, 18 and 19/79 arising out of Quit India Notice No. 111, 108 and 106 all dated 19. 10. 79 issued by the S. P. Sibsagar and served respectively Atul Dey, Sajala Rani Dey and Makhan Lal Dhar all of village Kolakota P. S. Jorhat.

No material in respect of the alleged foreign nationality of any of these persons was produced by the S. P. Two witness each Sri Doboru Gogoi being common in all these cases were examined. From the papers filed it appears that the members of the Family to which these persons belong come to Assam in 1951 and were duly registered as Refugees and had been living in the Sapokhati G. P. area since then. None of them holds citizenship Certificate. Thus neither under the constitution nor under the Citizenship Act., 1955 the petitioners have acquired Indian Citizenship. They remain foreigners under the law despite long residence. The case disposed of accordingly. The stay orders are vacated. Inform S. P.

Sd/- S. M. DEKA

Asstt. District and Sessions Judge, Jorhat

Forcible eviction and ouster from Assam of the Refugees and other Bengalee Hindus started from the middle of 1977 by the Janata Government's State Police Joining Hands with the Hooligans in the name of deportation of Bangladeshis, alleging to have come to Assam after 25th March, 1971, adopting most barbarous and inhuman means. The ouster movement or drive, took the nomenclature of detection and deportation of 'Foreigners' movement from the middle of 1979, when the Anti-nationals in Assam were made aware of the absence of a necessary legislation of Citizenship Law for the Bengalee Hindu Refugees to become the Citizens of India. This legal lacuna has encouraged the Anti-Nationals to mislead all and Genocide of the community perpetrated and continued during the last eight months in the same manner as was done in 1960 and 1972 genocide operations against the Bengalee Hindu Community living in Assam.

These millions of poor and helpless Hindu Refugees of North Eastern States have become completely crippled being subjected to three successive Genocide operations and appeals to the people of India for knowing the truth as well as to stop their complete annihilation.

Published by Shri B. C. Ghose the Leader of the Satyagraha Delegation of the Refugees living in N. E. States at New Delhi 4. 4. 80.

Note :—During the Ministry of Home Affairs directive not to deport any one from Assam who have come there before 25. 3. 71 the Court of the Asstt. Dist. Judge No. II & Member Foreigners Tribunal, Nowgong vide Case No. M. C. (F. D.) 23/80 issued Notice on 17. 3. 80

আসাম সমস্যার সমাধান অবশ্যম্ভাবী

পূর্বসূঠায় ‘Who are foreigners in Aseam’—দীর্ঘক প্রতিবেদনটিতে আসামে বিদেশী সংক্রান্ত একটি টাইবুড়ালের রায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে জনৈক অতুল দে, সঞ্জলারানী দে ও মাখনলাল ধর, (যাঁরা সকলেই ১৯৫১ সালে আসামে এসেছিলেন বসবাসের উদ্দেশ্যে, উদ্বাস্তু হিসাবে নথীকৃত হয়েছিলেন এবং তখন থেকেই সেখানে বসবাস করছেন—এঁদের কারোরই নাগরিকত্বের স্যাটিফিকেট না থাকায় দীর্ঘদিন বসবাস সবেও আসামে ‘বিদেশী’ বলে আখ্যাত হবেন। সংবিধান অথবা ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন—এর কোনটি অনুসারেই এঁরা ভারতের নাগরিকত্ব দাবী করতে পারেন না।

সুখমাত্র এই পরিবারটিই নয় আরও অসংখ্য উদ্বাস্তু পরিবার আজ আসামে ‘বিদেশী’ বলে চিহ্নিত হয়েছেন এবং সেইহেতু বিভাঙিত হচ্ছেন। ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই তৎকালীন জনতা সরকারের রাজ্য পুলিশের সক্রিয় সহায়তায় বাংলাদেশীর উদ্বাস্তুদের বিভাঙন শুরু হয়। ১৯৭৯ সাল এর মাঝামাঝি নাগাদ বিদেশী নির্ধারণ ও বিভাঙনের নামে এক সামগ্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় এবং ভারতে বাঙালী-হিন্দু-উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে কোন হুনিশিষ্ট আইন না থাকায় আসামের সমাজবিরোধী আন্দোলনকারীরা মানুষকে ভুলবৃত্তিতে ও এই আন্দোলনের প্রতি উৎসাহিত করতে আংশিক ভাবে সাক্ষ্য লাভ করে। পরবর্তী আটমাস যাবৎ খুন, লুণ্ঠরাজ্য, প্রহাৰ, অগ্নিসংযোগ জাতীয় সঙ্গতির ক্রতি ও মূলতঃ তৈল সরবরাহের মাধ্যমে সমগ্র আসাম জুড়ে এক বিশৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করা হয় ঠিক ১৯৬০ ও ৭২ সালের ‘বাঙালী খেলা’ আন্দোলনের সাদৃশ্যেই। আসামবাসী সাধারণ মানুষ তথা অসমীয়ারা অধিকাংশক্ষেত্রেই ভয়ে অথবা ভুল বোকার ফলে এই বিভাঙন অশ্রদ্ধা করে অথবা প্রতিবাদ জ্ঞাপন থেকে বিরক্ত থাকে।

ভারত সরকার ১৯৭১ সালকে ‘বিদেশী’ নির্ধারণের ভিত্তিবর্ষ হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। কারণ ১৯৫১ সালে যা তার পরবর্তী সময়ে হাঁরা আসামে এসেছেন তাঁরা অবশ্যই ৪৭ এর দেশভাগের পূর্ববর্তী সময়েই জন্ম গ্রহণ করেছেন—যখন ভারতবর্ষ অখণ্ড ছিল; দেশভাগের ফলে যখন ভারতবর্ষ দুখণ্ড হয়ে যায়, বংশপরম্পরায় বসবাসের দরুণ তখন অনেকেই পূর্ব পাকিস্তান

বা বর্তমান বাংলাদেশ অথবা ভারতের বাইরে অন্তান্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে এঁরাই আসাম প্রকৃতি স্থানে উদ্বাস্ত হিসাবে আশ্রয় নেন। অসুস্থ হয়ে যাওয়া ভারতীয়, রাজনীতির মূলকাঠে বাঁদের বলি দেওয়া। হয়েছে—ছিন্নমূল সেইসব মানুষকে বিদেশী আমায় জুড়িত করে দীর্ঘদিন পরে আবার ভারত থেকে বহিস্কার করার মধ্যে মুক্তি কোথায়? ১৯৪১ সালের নেহরু লিরাফৎ হুক্তি অনুসারে এবং ভারতীয় সংবিধান অনুসারেও এই সব উদ্বাস্ত বাঙালী হিন্দুদের পুনর্বাসন দেওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায়। কিছু অবিনয়কারী, বিশৃঙ্খলামী মূব ছাত্রের সমাজ-বিরোধী আন্দোলনের চাপে পড়ে কোনমতেই এই নির্দেশকে অমান্য করা যায় না—বিশেষতঃ যে সময়টার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমগ্র ভারতবর্ষের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নটি।

সম্মতি ছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা একযোগে আসামের এই জনবিরোধী আন্দোলনকে নিন্দা করে আসাম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। মোটামুটিভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দলই আসামের আন্দোলনের প্রতি প্রধানমন্ত্রী জীমতী গান্ধীর দৃঢ় প্রতিরোধকে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেছেন, আসামের এই আন্দোলনের পেছনে আছে কয়েকটি অন্তর্গত বিদেশী শক্তি—যারা ভারতবর্ষের সংহিতাকে বিপন্ন করতে চায়। শুধু রাজনৈতিক দলগুলি ও তাঁদের নেতৃবর্গই নয়, ভারতবর্ষের আশামর জনসাধারণ আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে নিন্দা করেছেন ও প্রধানমন্ত্রীকে নীতি এবিবয়ে ব্যবস্থা নিতে অনুপ্রাণিত জানিয়েছেন। এঁদের সকলের গুণগুণ ও সহযোগিতায় প্রশাসনিক কঠোরতা ছাড়াই আসাম সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব হবে এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলের এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটিকে ভারতীয় জনগণের ঐক্য ও সংহতির মূল সূত্রটি আবার প্রভিষ্টানিত হবে—এই কামনা করি।

আই, সি, এস হীন প্রশাসন

জনকল্যাণভিত্তিক হবে কি ?

—ব্রজেনচন্দ্র দাস

১৯৮০ সালের ৩১ মার্চ কেন্দ্রের ক্যাবিনেট সেক্রেটারী পদ থেকে শাসনবস্ত্রের শেষ আই, সি, এস, অফিসার নির্মল কুমার মুখার্জি অবসর নিলেন। ১৮৬৪ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ঢুকেছিলেন স্বরাজ্যের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ভারতীয় আই, সি, এস অফিসার।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি ছিল শোষণ। এই শোষণ অব্যাহত রাখার জন্যই ইংরেজ সরকার এই বিশেষ আই, সি, এস শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল। ভারতের অবর্থ লোকদের মেধাবী ছেলেদের এই শ্রেণীভুক্ত করার জন্য বিলাতে বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও আচার ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। ব্রিটিশ স্বার্থ ই এদের স্বার্থ এবং বৃটেনই এদের হোম এই মানসিকতা তাদের অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হত। এই মানসিকতার শিকার হয়েছে অধিকাংশ আই, সি, এস অফিসার। ইংরেজের চেয়েও তারা বেশী ছিল সাহেব। প্রশাসনে এরা ইংরেজী, আই, সি, এসদের চেয়েও অনেক সময় নির্মল হত। তথাপি ইংরেজ সরকারের নিকট সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদার দিক দিয়ে আই, সি, এস অফিসারদের মধ্যে রাজার জাত ও শাসিত জাতের পার্থক্য বজায় থাকত। এই জন্য বিক্ষোভও ছিল। স্বরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এই বিক্ষোভের জন্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। স্বরেন্দ্রনাথ বিতাড়িত হয়ে

বস্ত্রতা খীকার করেন নাই ! আন্দোলন করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন এবং বহু ইংরেজ সন্ত্রাসের সমর্থন ও প্রশংসা পেয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের সুনিপুণ চেষ্টা সত্ত্বেও সকল আই, সি, এস, অফিসারের ভারতীয়বোধ মগ্নি করতে পারে নাই। আই, সি, এস, ধর্মেন চন্দ্র দত্তের পাণ্ডিত্য জগৎ-ব্যাপী, ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আই, সি, এস, সমর্থ ব্রিটিশ নিপীড়নের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন। আই, সি, এস পদের মোহ ত্যাগ করে স্বতন্ত্র্যচন্দ্র বসু স্বাধীনতা সংগ্রামে ঋণি হয়ে পড়ে ছিলেন। এই ধরনের ব্যতিক্রম হলেও শাসনবস্ত্রের কাঠামোর কোন পরিবর্তন হয় নাই।

স্বাধীনতার পর এসেদের প্রশাসনিক ভিত্তি হওয়া উচিত জনকল্যাণ। জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা করতে হলে ইংরেজের স্বার্থে গঠিত আই, সি, এস প্রাধান কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। এই সম্বন্ধে ১৯৪৫ সালে বৃটেনে লেবার পার্টি'র বার্ষিক সভায় ইংরেজ মন্ত্রীরা অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যান্ডি সতর্ক করে বলেছিলেন বৃটেনে প্রশাসনিক কাঠামোর হাল যাবা ধরে আছে তারা কার্যময় স্বার্থের সঙ্গে আটপেঁতে বঁধা। এদের যারা সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব নয়। এই সম্বন্ধে সত্য যা বেবে নিষ্পত্তে হবে লেবার পার্টি'কে। ল্যান্ডির এই উক্তি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

ইংরেজ চলে যাওয়ার পর আই, সি, এসদের মনে জেপেছিল তারা সরকারী চাকরীতে থাকবে না, ইংরেজ অফিসারদের মত অবসর নিয়ে বানপ্রস্থে যাওয়ার কথা এদের মনে হয়েছিল। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে আই, সি, এসরা ছিল বহু নির্মিত। জওহরলাল নেহরু ওঁদের মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যখন এই বিরাট দেশে একটা সুসংহত প্রশাসন গড়ে তুলার দায়িত্ব নিলেন তখন আই, সি, এসদের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হলেন। সর্দার প্যাটেলও ওঁদের অভয় দিয়েছিলেন। দক্ষ প্রশাসকের অভাব এই দৃষ্টিতে সর্দারজী আই, সি, এস, অফিসারদের প্রশাসনের চূড়ায় বসিয়ে নিলেন। বৃটিশ ধারা বজায় রেখেই প্রশাসন চলতে লাগল। ফলে বিকৃত হয়েছে স্বাধীনতার অর্থ। নিজ অভিভাবতার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ বুঝে স্বাধীনতার অর্থ ইংরেজের পরিত্যক্ত আসনে কয়েকটি দেশীয় লোকের উপবেশন।

প্রশাসনের এই ধারা বজায় রেখে ছুইচাং জন দলদলান অফিসারের প্রচেষ্টায় সমস্তা মোকাবেলা করা যায়, কিন্তু স্থায়ী সমাধান হয় না। এই প্রসঙ্গে আই, সি, এস অফিসার হিরন্ময় ব্যানার্জী ১৯৪৫ সালের জুন মাস থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্ত সমস্তা মোকাবেলা করেছিলেন। তখন ডাঃ বিনো চন্দ্র দাস মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫৪ সালে হাইকোর্টের মাধ্যমে ট্রাম লাইনের পাশে রিকিউজী অফিস। অকল্যাড হাউসে একমল মহিলা উদ্বাস্ত হিরন্ময় ব্যানার্জিকে ঘেরাও করেছিলেন বৈকাল ৬টার। রাতে পুলিশ পাঠান হয় ওঁকে উদ্ধার করার জন্য। হিরন্ময় ব্যানার্জী পুলিশ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন। পরদিন সকাল দশটায় এই মোহেরা ঘেরাও তুলে নিয়ে তাঁর

জন্ত সরব্ব নিয়ে এলেন, বললেন বাবা সরব্ব খেয়ে নেও। এই বকম ঘটন হিরন্ময় ব্যানার্জীর চাকরী জীবনে আরও ঘটছে তাই তিনি উজ্জি করেছেন শ্রম চূষে ও অভিবোধের মধ্যেও বসি প্রশাসন দ্বন্দ্ব-বান হয় মানুষ তার প্রতিদান দেবেই। হিরন্ময় ব্যানার্জী দলদলান প্রশাসক হওয়ার সমস্তা মোকা-বিলায় কোন অবটন ঘটে নাই, জনগণের আশীর্বাদ ও পেয়েছেন। কিন্তু উদ্বাস্ত সমস্তার স্মৃতি সমাধান হয় নাই। প্রশাসনিক কাঠামোর ধারার পরিবর্তন না হলে তা সম্ভব নয়।

দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টে তৎকালীন মন্ত্রী অশোক সেন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রশাসক নিযুক্ত করে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসন জনকল্যাণমুখী ও উদ্বাস্তদরদী হবে উদ্বাস্তদের সমস্তা সমাধানে সহায়ক হবে। কিন্তু সম্ভব হল না, এরা কিংবে এলেন। কাঠামোর ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলে কোন পরিকল্পনা রূপায়ণ সম্ভব নয়, একজন বা দুইজন প্রশাসকের ঐকান্তিক চেষ্টা দিয়েও।

এই অবস্থায়ও কোন কোন আই, সি, এস, উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখায়েছেন শুধুও আই, সি, এস, সুকুমার সেন একজন। সুকুমার সেন স্বাধীন ভারতে প্রথম চিফ ইলেকট্রন অফিসার। এত বড় দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করা কঠিন ব্যাপার, কোন অভিভাবতা নেই, সমস্ত ব্যাপারটাই দুঃজন। ১৯৫২ সালে সুকুমার সেনের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হল। কোন বিনিং বা অন্ত কোন অভিযোগ নেই। দারা পৃথিবী অবাক হয়েছিল আমাদের প্রশাসনিক দক্ষতায়। প্রধান সরকার হুদানে নির্বাচন পরি-চালনায় নিয়ে গেলেন সুকুমার সেনকে, এমন সুনাম হল যে খাধুনে সুকুমার সেনের নামে স্বাক্ষর করে

তার ক্ষতি রক্ষা করা হল। কাজেই রাষ্ট্রনিয়ামক-শাসনযন্ত্রের দ্বারা পরিবর্তন করে, জনকল্যাণমুখী করার সচেতন প্রচেষ্টার পক্ষে দৃষ্টি থাকলে এই আই, সি, এস, অফিসার দায়িত্বই করা যেত, এদের মধ্যে জানীখন্দী, দল ও জন-স্বার্থী অফিসারের অভাব ছিল না। কিন্তু নেতৃত্বই জনতার ব্যাপক কল্যাণ হলে গেলেন। এই হলের মাশুলও দেশবাসী গৃহগেহ।

১৯৮০ দালের মার্চ মাসে শেষ আই, সি, এস অফিসারের বিদায়ের সঙ্গে ১১৬ বৎসরের আই, সি, এস, প্রশাসনিক ধারা বিলুপ্ত হল মনে করলে ভুল হবে, বিনাশিত ঘটবে। প্রশাসনিক এই ধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জ্ঞাত সরকারী কর্মচারীদের মানসিক পরিবর্তনের দায়িত্ব রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রকদের গ্রহণ করতে হবে। সোভিয়েত দেশে যে কোন কর্মচারীকে এমন কি বিশেষী দ্বারা পড়াশুনা করতে যায় তাৎসবৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাস, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, পরিকল্পনা, কৃষায়ণের কর্মধারা প্রভৃতি বিষয়ে ক্লাশের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া

হয়। কাজেই সোভিয়েত, প্রশাসনিক ব্যবস্থার নতুনদের চিন্তা চিকণাষেই পরিচালিত হয়, কোন সংঘর্ষ উদ্ভব হয় না। আমাদের দেশে আই, সি, এস-ভিত্তিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামো পরিবর্তন করে জনকল্যাণমুখী করতে হলে কর্মচারীদের দেশকে জানতে হবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হবে, জানতে হবে দেশের মানুষ ও সমাজকে এবং সমাধান কোন পথে। এই উদ্দেশ্যে পার্টাসূচী তৈরী করার জ্ঞাত জনস্বার্থী জানীখন্দীদের একটি বোঝ গঠন করা দরকার। এই পার্টাসূচীর উপর সরকারী কর্মচারীদের ক্লাশ হবে, পরীক্ষা হবে অজ্ঞাত বিষয়ে যেমন হয়। সরকারী কর্মচারীদের আচরণ বিধি (কন্ডাক্ট রুলস্) জনকল্যাণমুখী করতে হবে। তবেই বর্তমান অবস্থার মোড় ফেরান সম্ভব হবে। আশা করব জওহরলালজী, প্যাটেলজী যা করেন নাই, বা করতে ভরসা পান নাই, ইন্দিরাজী তা পারবেন এবং দেশবাসীর নিকট হৃদয় দিগন্ত খুলে দিবে না।

হাবেরি গেষ্টের বায়ু, অঙ্গ, জলীর্ণ ও গেষ্টের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রসাদ

আমেরা হাত কুমারী

অমূল্যবোধীয় মতে ভেদিত মূল্য ৩.০০ একক মূল্য ১.০০

খাতি-খান-খিলাফতীমোহরন চক্রবর্তী

খিলাফতীমোহরন চক্রবর্তী • কলকাতা • কলকাতা • কলকাতা

দলীয় চক্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংসোন্মুখ

ঐবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়



সর্বদেশে সর্বকালে কমিউনিষ্ট পার্টির 'মোডাস্
ওপেরাণ্ডি' বাক্যে ওরা বলে 'ষ্ট্রাটেজী' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সরকারী শাসন
ব্যবস্থার প্রতি ক্ষেত্রে এমন কি প্রতিটি স্তরে ওরা
নিজেদের বিশ্বস্ত দলীয় লোকদের ছলে বলে কৌশলে
অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শাসন ব্যবস্থাকে আংশিক কল্যাণ
করে ক্ষমতা দখলের অপ্রতিহত চেষ্টা চালিয়ে যায়।
সামরিকবাহিনীতে, আধা-সামরিকবাহিনীতে, পুলিশ-
বাহিনীতে, শিক্ষাবিভাগে, স্বাস্থ্যবিভাগে, তথ্য ও
সংস্কৃতি বিভাগে, শ্রমবিভাগে, কৃষি ও সেচ বিভাগে
এক কথায় সর্বস্তরে এভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ওরা
নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতাই, স্বদলীয়দের
আগে ভাগে অতি প্রকল্পভাবে কৌলক অভিযানের
মাধ্যমে সর্বত্র কৌশলে ঢুকিয়ে দেয় এবং ধীরে,
অতি ধীরে ওরা উদ্দেশ্যসিঁড়ির ক্ষমতা সচেষ্ট হয়
অতি সন্তুর্ণণে, যাতে অপরের স্তম্ভভেই কোন কিছু
কৃত্ত উঠতে না পারে। ওদের কাজ হাসিল হবার
পরে অনেকেই তা জানতে ও বুঝতে পারে, কিন্তু
তখন ওরা পাকাপোক্তভাবে ঘাঁটি গেড়ে এমন শক্ত
বসে, যে ওদের সেখান থেকে হটায় কার
সাধ্য? রাজনৈতিক কৌশলও কিপ্রকার দিক দিয়ে
ওরা বেশ সক্রিয় ও সমযোগ্যবোধী। ওদের কর্ম
কুশলতা ও প্রথর বুদ্ধিমত্তা সত্যই অমূল্যবর্ণী, কিন্তু
ওদের আত্মগত্যা এদেশের মানুষের কাছে নয়; বরং

ভিন্ন দেশের চিন্তায় ও অন্য দেশের আদেশে ওরা
চলতে বাধ্য হয় হেথায় বা লক্ষ্যজনক ও বদদেশের
পক্ষে কতিকারক বলেই প্রতীয়মান হয়। বিগত
১৯৪২ সালে ওরা রাশিয়ার আদেশে এদেশের
শাসন ইংরাজের হয়ে এদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত
করার কাজে লিপ্ত ছিল 'জন যুদ্ধের' ধৃয়া হলে এবং
অদেশ ও স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে
এদেশের মানুষের কাছে প্রকাজে লঙ্ঘিত হয়েছিল,
তবুও এদেশের শত্রুদের সঙ্গে মিত্রালিতে তারা
লক্ষ্যবোধ করেনি। ঐ সময়েই ইংরাজ রাজশক্তির
আত্মকুলো অথও কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতীয় ও স্বদেশী
শাসন ও পুলিশ বিভাগে এবং এদেশের প্রশাসনের
অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদের দলীয় লোকদের
কর্মসংস্থান করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। তৎকালীন
ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের লক্ষ্যই ছিল
গুড়ি মেয়ে কোন বকমে একবার ঢোকা ও পরে
তা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা। ঐ চক্রান্ত দেশ-
বাসী অচিরেই জেনে যায় ও ফলে ভারতীয়
কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতীয়দের চোখে বিশ্বাসঘাতক
ও হেয় প্রতিপন্ন হয়। এখন থেকেই সরকারী
শাসন ব্যবস্থাকে অকাজে করে কমিউনিষ্টরা নানাভাবে
নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের কাজে নিয়োজিত
বাক্যে, যদিও দেশবাসী তাদের দৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যাখান
করতেই সদ্যবাস্ত ছিল। ঐ একই কৌশলের

পুনঃ প্রয়োগ দেখা যায় ১৯৬৭ সালের মধ্যভাগে যখন ফ্রুজবুট সরকারের বড় শরীক সি. পি. এম দলের জ্যোতিবাবু পুলিশমন্ত্রী হয়ে বসলেন।

ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটাই এ্যাসোসিয়েশন ছিল এবং পুলিশবাহিনী ও পুলিশের কর্তা ব্যক্তিত্বা সকলেই সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিল। পুলিশ বিভাগে নিয়মাহুত্বতীতা ও শৃঙ্খলা ছিল তখন বেশ কড়া। পুলিশের মধ্যে পরস্পরে একটা সৌহার্দের সম্পর্ক ছিল তখন, কিন্তু জ্যোতিবাবুর পরোক্ষ উৎসাহে ও সি. পি. এম দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নেতৃত্বে নতুন একটি পুলিশ এ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে যার নাম দেওয়া হয় নন-গেজেটেড পুলিশ এসোসিয়েশন। সেই সময় থেকেই পুলিশ বিভাগে দলীয় রাজনীতির অহু-প্রবেশ, ফলে বিশৃঙ্খলা, খেচ্ছাচার ও নানা বিভ্রাট এবং মতবৈত প্রসার লাভ করে। পুলিশ অফিসারের ছায়াসঙ্গত আদেশ নিয়ন্ত পুলিশ সিপাহী অগ্রাহ্য করতে সাহস পায়, দলীয় সাহায্য ও সমর্থনের ভরসা। পুলিশ বিভাগে বর্তমানে যে বিশৃঙ্খলা ও কর্মতৎপরতার অভাব দেখা যায়, তার জন্ত পুলিশের মধ্যে দলীয় রাজনীতির আমদানী বা সি. পি. এম দল ১৯৬৭ থেকে শুরু করেছে সেই রাজনীতিই দায়ী। অসুস্থভাবে গোটা পুলিশ প্রশাসনে এমনই দলীয় রাজনীতির প্রকাশ বাবে ব্যয়ে পরিচালিত যে পুলিশ প্রশাসন তার পূর্বের দক্ষতা ও কর্মশীলতা হারানতে বাধ্য হচ্ছে প্রতিনিরন্ত। সি. পি. এম দল এ রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ইউনিয়ন গড়েছে সেই ১৯৬৭ সালে যার নাম রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সরকারী কর্মচারী বা পুলিশবাহিনী এ রাজ্যে রাজনীতিতে এমন মেতেছে যে এদের হাতে জনগণ

ছায় বিচার বা নিয়মাহুত্ব কর্ম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দলীয় লোকেরাই সব সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে। দল বিরোধী সাধারণ মানুষ কোথাও সুবিচার পাচ্ছে না, উপরোক্ত তথ্যই নিগূত হচ্ছে সরকারের দলীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় ও দলীয় পুলিশী ব্যবস্থায়।

ফলে বিশৃঙ্খলা, নীতিহীনতা, দলবাকী ক্রমাগত উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এ রাজ্যে, যার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থাই নেই আজ কতো হাতে। রাজ্যই ভাঙতি, রাহাজানি, খুনের ঘটনাগুলি বাড়তির পথে, পুলিশী দলবাকী ও নিষ্ক্রিয়তা। সংবাদপত্রের ছত্রে ছত্রে রেল ভাঙতি, রেশন দোকানে ভাঙতি ও বহু-স্তর মারদাঙ্গা এবং খুনের কথা প্রকাশ পাচ্ছে প্রতিদিনই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কি সম্পূর্ণ অরাজক রাজ্য? এ রাজ্যের কি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায় ও দায়িত্ব পালনের জন্ত পুলিশী ব্যবস্থা ও কর্ম তৎপরতার কোনরূপ বাংলাই নেই? এ রাজ্যের মানুষ সদা সমংকিত ও ভীত এবং সন্ত্রস্ত কেন? রাজ্য সরকার কি কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নোথারোপ করেই নিজেদের অক্ষমতা ও অপরিণাম-দর্শিতা ঢাকা দিয়ে চলতে যত থাকবেন? তাঁদের নিজেদের দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণেই কি দিন কাটাতে যত থাকবেন? সাধারণ মানুষ কি বিভ্রাৎ ঘটতি, ভ্রাম্যন্তা বৃদ্ধি, অরাজকতা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবের শিকার হয়ে এ রাজ্যে মূখ বুজে সব সন্ত কহবে, না আন্দোলনের পথে নামবে, এর প্রতিকারের জন্ত? এ সরকার আন্দোলনকারীদের সম্মুখে মস্তব্য করেছে- 'চলন্তকারী' বলে। চমৎকার ব্যবস্থা, জনগণ কি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত সচেষ্ট হবে না? সরকার নিজে কোন কিছু ব্যবস্থা করতে অক্ষম, অথচ জনগণ যদি তাদের

স্বাধিকার প্রয়োগ করে, তবে তাও রাজ্য সরকারের উদ্বার কারণ হবে—এ কোন দেশী কথা? সরকার তবে প্রধান শরিকদের রাজনীতি ও দলীয় চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে সক্ষম জানি, কিন্তু নিজস্বের গলগ ঢাকতে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত দোষারোপ ও মাঝে মাঝে সব তহনই করে দেবার বুধা হুমকি কেন? যে জনগণের ভোটে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার এসেছে, সেই জনগণ আজ অবহেলিত ও উশেক্ষিত কেন? দলই আজ সব, দেশের মানুষ তুচ্ছ আজ কি কারণে? সরকার জবাব দিতে পারবে কি? প্রতিটি বিজ্ঞানের দলীয় অনুপ্রবেশ খটাতে সি. পি. এম সরকারী মদত পায় কেন? অবিকাল বিজ্ঞানযেই একটির বদলে দুইটি করে প্রধান শিক্ষক রাখার সার্থকতা কি? সি. পি. এম দলের কর্মী ও সমর্থকদের চাকরী পাইয়ে দেবার স্বার্থে ঐ কাজ চালু করা হয়েছে নাকি? ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা ও কোন কোন বিজ্ঞান্যে অরাজকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সি. পি. এম দলের স্বার্থাঙ্ক চাকুর্যের জন্ত। শিক্ষামন্ত্রী কি তা জানেন না? তিনি কি সব ক্ষেত্রেই প্রমোদবাবুকে সন্তুষ্ট রাখার অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছেন? পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতালে হাসপাতালে সিট্‌র ইউনিয়ন চতুর্থ শ্রেণী কর্মীদের স্বার্থক্ষাচারের যে সুযোগ করে দিয়েছে, তাতে রোগীরা বা ডাক্তারেরা কি হাসপাতালে আশ্রয়মান বন্ধায় রেখে চলতে সক্ষম এখন? পঞ্চায়েতে যে দারুণ দলবাজী সি. পি. এম দলের প্ররোচনার দিনের পর দিন বাড়ছে তাতে গ্রামে শিক্তিত, ভয় ও মাজিত রুচিসম্পন্ন মানুষ আর বাস করতে পারবে কি এখন? সি. পি. এম দল বা ফলে সরকার তাই শোনে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে অধঃতন সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত সকলের ওপরই

ঐ দল প্রাধান্য বিস্তারের যে পন্থা হালে কার্যকরী করেছে তা যেমনই অসমানজনক তেমনই জনস্বার্থের পরিপন্থী। সারা পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম দলই একমাত্র সরকারী নীতি নির্ধারক, যদিও সে নীতি দলস্বার্থে প্রযুক্ত, জনস্বার্থে বা দেশস্বার্থে নয়। বামফ্রন্ট জোটের অস্তিত্ব শরিকরাও হাড়ে হাড়ে বুঝছে যে সি. পি. এম দলই সর্বত্র সরকারী কর্তৃত্বের দক্ষণ হুহাড়ে ফসল তুলছে, অস্ত্রেরা হাঁ করে তাই দেখছে, কিছু করার বা বলবার তাদের কোনও অধিকার নেই। গ্রামে গ্রামে অপারেশন বর্গী চালু করে সি. পি. এম অস্ত্রের ধান-চাল পার্টি অফিসে তুলেছে, বার সে সম্পদ, তাকে কলা দেখিয়ে নিজেরা ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছে পেয়াল খুদী মত। এতে দলীয় লোকদের মধ্যে আবার বখরা নিয়ে ঝামেলা বজাট বেঁধেছে। প্রশাসন দলীয় রাজনীতির তত্ত্বাবাহকে পরিণত, অথচ আর, এ সি. পি. বা ফরওয়ার্ড'রক এতে বাধা দিতে সক্ষম দেব যায় কেন? কি এর কারণ? মনে হয় না যে বামফ্রন্ট হলেও প্রমোদবাবু হকুমে না চলে আর এস. পি. ও ফরওয়ার্ড'রকের মন্ত্রীদের বিলায় নিতে বাধা করা হবে। সি. পি. এম তার শরিকদলে কাউকেই পাত্তা দিতে রাজি নয়। তার ভয় কেবল শ্রীমতী গান্ধীকে এবং তার নেতৃবাহীন কংগ্রেস (ই দলকে, যারা এ রাজ্যে সর্বাধিক নৃত্তিশালী।

সি. পি. এম দলের দলবাজীর ও অরাজক শত্রুর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র কংগ্রেস (ই) দল সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে সক্ষম; কারণ এদের 'সম্মত ও জাতীয় স্বার্থের' দাবক ও বাহন জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে কংগ্রেস (ই) দল এখন অস্ত্র রাজনৈতিক দলকে পশ্চাতে ফেলে অতিক্রম পত্তি এনিবে চলেছে। সি. পি. এম দলের দাঙ্গাবাহ

খুন খাবাবী ও অরব। মাতৃকবির বিরুদ্ধে কংগ্রেস (ই) দলই জনগণের পাশে ঠাঁড়িয়ে প্রতিবাদ ও তা প্রতিরোধ করতে অগ্রসরমান। অল্প কোনও রাজনৈতিক দল সে সাহস দেখাতে পরাম্ভ্য কেন ? সাধারণ প্রশাসনের পূর্বমান এখন অবনমিত, সি, পি, এম ভক্তনাকারী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের কর্তৃবিমুখতায় ও দলীয় চক্রান্তে। এই কমিটিভুক্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অধিকাংশই নিম্ন নিম্ন বিভাগীয় কাজের পরিবর্তে সি, পি, এম প্রচারেই অধিক মত, কারণ তাদের ধারণা কাজের বদলে দলীয় কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারলে চাকুরীতে উন্নতিবিধান বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সম্ভব হবে।

দলনিরপেক্ষ বহুসঙ্কলন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে এখনও বহাল আছেন। এবং তাঁদের নিষ্ঠা ও সংকল্প প্রচেষ্টার ফলেই সরকার কোন রকমে চালু আছে, নচেৎ এ সরকারের অবস্থা আরো বেশী কাবিল হয়ে পড়ত। বিগত প্রায় তিন বছরের মধ্যেই। সি, পি, এম এ রাজ্যে সরকার দলল করেছে শুধু দল বাড়ানোর বার্থে, জনস্বার্থে নয় কখনই, তা যদি হ'ত তবে এভাবে তাতা প্রশাসনিক মান নিম্নগামী হতে দিত না। 'এলো এলো করে দে মা লুটে পুটে খাই' ধরণের মনোবৃত্তি নিয়ে সি, পি, এম এ রাজ্যে চলছে, কাজেই পুরা পাঁচ বছর রাজত্ব চালালেই জনগণ এদের ব্যর্থতায় এমন বিমুখ হবে যে ভবিষ্যতে আর এদের ক্ষমতায় আসতে দেবে না এবং সেটাই হবে রাজনৈতিক দৃবদৃষ্টির পরিচায়ক। মানুষ কিন্তু এদের অত্যাচারে, অবিচারে, দলীয় চক্রান্তে, চরম ব্যর্থতায় ও একদেশদর্শিতায় এবং দলীয় পক্ষপাতিত্বে এদের ওপর এখনই এখনই এত অধিক পরিমাণে বিরক্ত ও বিস্কৃত হয়েচে যে তারা চাইছে যে এখনি এদের বরখাস্ত করুন শ্রীমতী গান্ধী, কারণ এরা সচরা

সীমা অতিক্রান্ত করেছে ইতিপূর্বেই।

পশ্চিমবঙ্গের দলনিরপেক্ষ প্রতিটি জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, স্মৃতি ও সংস্কৃতিবান মানুষ অতীতে ভেবেছিল যে কংগ্রেসের বদলে সি, পি, এম ক্ষমতায় আসলে বোধহয় সাধারণ মানুষের কল্যাণ হবে, কিন্তু বর্তমান অবস্থা দেখে তাঁরাই মন্তব্য করছেন যে, এঁদের আমলে অরাজকতা বেড়েছে, মানুষজন আতঙ্কিত, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গেছে, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই প্রতিনিয়ত ঘটছে অর্থাৎ এক কথায় এ রাজ্যে মানুষের পর্যায়ে নৃশৃংখরীর বদবাসের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত পদে পদে, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলে ও পুলিশী ব্যবস্থা। শাসকদলের দলীয় স্বার্থে উদ্বেগমূলকভাবে পরিচালিত বলে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর কতকাল সরকারী ব্যর্থতার কারণে এভাবে প্রতিদিন বিদ্রোহ বাটতির জন্য, প্রবাসী উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য, আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য, শিক্ষাব্যবস্থা বানচালের জন্য হাসপাতাল অকেজো থাকার জন্য, কলিরোজগারের অপ্রভুলতার জন্য এবং সর্বোপরি দল মূত্বভবে ভীত হয়ে জীবন যন্ত্রণা ভোগের জন্য এভাবে দিনগত পাপক্ষয় করে এখানে দসেমীর হয়ে বসবাস করবে ? রাজ্য সরকারের হেলেভুলান মিথ্যাস্তোত্রবাক্যে আর কতদিন মানুষ আস্থা রাখবে ? পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে, বিদ্রোহ-বাটতি, আর তার মূলে শাসকদলের দলীয় কর্মীদের দলবাজী ও সিটুকে দিয়ে আই, এন, টি, ইউ, সিবি সংগঠনকে ভেঙ্গে দেবার চক্রান্ত এবং সিটুর সাহায্যে পুরাতন বিদ্রোহ-কর্মীদের কব্জা করার চরাসা। সিটুর কারসাজি ও দল বাড়াবার কারণেই বিদ্রোহ কর্মীদের মধ্যে বিভ্রম ও রেধারেরি ক্রমবর্ধমান। ফলে বিদ্রোহ-বাটতির স্বাধীন লাভ এ রাজ্যে।

দিনাজপুরে কৃষকদের খণ্ড নড়াই

॥ অনিল দাস ॥

১৯৫৮ সালে দিনাজপুর জিলা কৃষক সমিতি সংগঠিত হয়। মন্ত্রী নিমিষ নাথ কৃষ্ণ সভাপতি, রমেশ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক। বিমল চাট্টোজী, নৃপেন দাস নগেন দাস (অনিল দাস) অরুণ বানার্জী, অজিত রায়, কামাক্ষা ভট্টাচার্য, হিরু গোস্বামী, হরি রঞ্জন দাস, নিমাই সমাদর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ভারাপদ ধর প্রমুখ কার্যকরী সমিতি সভ্য নির্বাচিত হন। জিলার গ্রামে গ.ক সভা সংকলন শুরু হয়। বাসুর মাঠ, ঠাকুর গাঁ, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, বীহগড়, বিরল, রাধিকাপুর, কালিয়াগঞ্জ, শ্রুৎসেব পুর, তিনলা। নারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে 'লাঙ্গল দার জমি তার' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড় প্রাধানত: এই ছুটি প্রোগ্রামের উপর আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। আন্দোলনের প্রাণ-কেন্দ্র করা হল নারায়ণপুর। নারায়ণপুর দিনাজপুর সহর হতে ১৮২০ মাইলের পথ, কাঁচা রাস্তা, কাকুন নদীর তীরে অবস্থিত, নদীর অপর তীরে গঙ্গারামপুর বান। কাকুন নদী প্রায় আশ মাইল প্রশস্ত।

নারায়ণপুরে গঠিত কৃষক সমিতির কমি সালাল শেনী, হরিরঞ্জন লাল, স্বর্গকমল মিত্র, কটক সরকার, নিধিরাম রায়, নিমাই হুসেন, শিবু ওর, হিরু গোস্বামী, এরা সভাসমিতি করে কৃষক সমিতির দাবী প্রচার করার কলে স্থানীয় জমিদার, জোতদারদের লোকের সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দিল। কৃষক সমিতির সভা করার প্রধান স্থান ছিল নারায়ণপুর প্রাইমারী স্কুল বাড়ী। আন্দোলন শুরু

করার পরিকল্পনায় ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের একদিন পুলিশ জমিদার-জোতদারদের লোকের সহযোগে স্কুল বাড়ী আক্রমণ করে। সালাল ও তার মা ও স্ত্রী প্রতিবাদ করার পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হল। এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পেল, হাজার হাজার কৃষক জোরান নারায়ণপুর স্কুল প্রাঙ্গণের অভিমুখে রওনা হল। এই দৃশ্য দেখে জমিদার জোতদারের লোক ও পুলিশ নারায়ণপুর হতে পশ্চাৎ অশ্রয়ণ করে গঙ্গাপুর বানায় আশ্রয় নিল।

দিনাজপুর টাউন পুলিশ লাইন হতে গঙ্গারামপুর বানায় পুলিশ পাঠান হল। এই খবর পেয়ে সালাল স্বর্গ, হিরু নিমাই, নিধিরাম কাকুন, লেখক, বিমল, হরি, কামাক্ষা, শিবু সালালর মা ও স্ত্রী প্রভৃতি প্রায় ৫০০৬০০ জন কৃষক সমিতির কমি শ্রুৎক সহ পুলিশ বাহিনী প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কাকুন নদীর তীরে জমাবেৎ হল। রাইফেলধারী পুলিশ নদীর অপর তীরে এসে নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কোন নৌকা মিলিল না, কৃষক সমিতির নির্দেশে ওরা আগেই সরে গিয়েছে। বিকল্প পথ দিনাজপুর সহর হতে কাকুন নদীর ওপর সেতু পার হয়ে ১৮১০ মাইল হেটে আসতে হবে। হাটপাথে আমাদের প্রতিরোধ হবে নিশ্চিত কেনে নারায়ণপুরে পুলিশ বাহিনী আসতে ভরসা পেল না।

তিন দিন তিন রাত্র আমরা নারায়ণপুরকে রক্ষা করে চললাম। তিন দিন পর আমরা

দিনাজপুর সহর হতে খান্ড পাঠাবার প্রস্তাব আবেদন করলাম, কিন্তু খান্ড পাঠওয়া গেল না, বাধ্য হইতে চতুর্থ দিনে অবরোধ তুলে নেওয়া হল, এবং কমিটি গা-ঢাকা দিল। চতুর্থ দিনে আমাদের অবরোধ নেই লক্ষ্য করে পুলিশ গ্রামে প্রবেশ করে অকথা অত্যাচার করল এবং সালজুর মা ও স্ত্রী সহ ৫০৬০ জনকে গ্রেপ্তার করে দিনাজপুরে চালান দেওয়া হল। দিনাজপুর কোর্টে বিচার শুরু হল। নিশিথ নাথ কুণ্ডু, বিক্রম মিত্র প্রমুখ কৃষক কর্মীদের পক্ষে উকীল নিযুক্ত হলেন। বিচারে প্রায় ৩৫১৬ জনের প্রত্যেকের ছবিসাঁসের কেশী জেল ছিল। সাক্ষাৎ প্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে ছিলেন নৃপেন দাস, লেখক, কবিমল, বিমল চাটাজী, অজিত দাস, সত্যেন ঘোষ,

হিরু গোষামী, কেমেশ চাটাজী, চিত্ত দে, তারাপদ ধর, রবি, নিমাই, রিধিরাম, কামাক্ষা, হরিলাল। জেল হতে মুক্তি পেয়েই ১৯৪২ সালের ২ই আগষ্ট ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার প্রস্তাব অনেকেরই আবার দিনাজপুর সহর হতে গ্রেপ্তার হই। পরে ইণ্ডিয়া ডিসকন্স্ট্রাক্ট এ বৃত্ত হয়ে প্রায় সকলেই রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে মিলিত হই।

৩৯ বৎসরের আগের ঘটনা। অবস্থার পরিবর্তন ও বিবর্তনে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে জানা নেই। কিন্তু এখনও মনের অস্থিরত্ব হতে ভেঙ্গে উঠে নারায়ণপুরের কৃষক সমিতি, ও সালজুর মা ও স্ত্রীর (অন্য) সাহস ও উত্তম বীর্যের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল নারায়ণপুরের ছল বাড়ীর মাটি।

শহরতলী :

শ্রীরাঘবপুরের সম্মানীয় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে

বন্ধুগণ,

আগন্তব্যে নিজস্বই জাতিগত বর্ধমানের অসহ্য পৌরসভার সঙ্গে শ্রীরাঘবপুর পৌরসভারও আলাপের দরকার এবং বহিষ্ঠ হারের কথাই না। এপ্রিল ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়েছে। আমাদের প্রাথমিক জীবনে পৌরসভার প্রতিষ্ঠার আশ্রয় আশ্রয় শুধুই উপস্থিতি করি, যখন দেখি পরবর্তীতে নোটটিং ব্যক্তিগত এসেছে। শ্রীরাঘবপুর পৌরসভার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা অসুস্থ্য করে না। এতটা জুড়ে মজার শাহজি, ভাড়া দাতা, রাতে ঘরা এবং দিনে মাটি এই নিয়ে আমরা শ্রীরাঘবপুরে আছি। লোকপল্লী-এর ব্যক্তিগত আলো প্রায় জ্বলন্তই না কিন্তু যখন জলে তখন পৌরসভার দায়িত্ব দে আলোকে হুঁকে পাওয়া যায় না। পানির জলের অধর না বলাই ভাল। নাগরিকদের স্বাক্ষর বিধানের জন্য যে সংস্থার জন্য হয়েছিল সে দায়িত্ব আমাকে নাগরিকদের দৃষ্টিতে হারিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ বিপন্ন কাগজে সুরক্ষার মৌলিক পৌরসভার আর প্রচুর বেতন, কিন্তু তার দীর্ঘ কাল হারিয়ে কমিশনারদের স্ত্রী, ঘোষ, সালিকা ও ভাইদের চাকরী হারিয়ে আর কিছু অসুস্থ্য কমিটি-কমিটি কমিশনারদের বী। হাতে পুজো করে ভান হাতে টাক। সুটকে ও অবস্থার পৌরসভা নিজেদের হস্তে কি করে বহিষ্ঠ হারিয়ে কব পাবার আশা করে সেটা বুঝতে পারা যায় না। সেজন্য আমাদের কাছে আমাদের অসুস্থ্যতার আহ্বান, আমরা একযোগে বহিষ্ঠ হারিয়ে কবান বন্ধ করি। এবং এ ব্যাপারে একযোগে আলোচনা আরম্ভ করি। যদি আমাদের দাবী পৌর কর্তৃপক্ষ না মানেন আমরা আইনের আশ্রয় নেবো, আমাদের অর্থও বিবীল আমাদের সমর্থন ও আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া না।

বিদ্যবী

নতাপতি—শ্রীরাঘবপুর টাউনশিপ কমিটি

নির্মল দাস, তপস্বী দাস

দুই দায়িত্ব সম্পাদক

বিদ্যবী দেব ও অরুণ গোষামী

মেডা কমিটি (২) কমিটির পক্ষে

নতাপতি—শ্রীরাঘবপুর পৌরসভার

নতাপতি—শ্রীরাঘবপুর টাউন কমিটি

রাজিৎ বিদ্যবী ও নটী, দায়িত্ব

দুই দায়িত্ব সম্পাদক

বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিশ্ববী পুস্তকমালা

অমূল্যমূল্য সমিতির বিবরণ প্রকাশ—প্রবেশদাতা হাঙ্গের—০.০০

বিশ্ববী মহানারক গ্রন্থবিহারী—প্রবেশদাতা হাঙ্গের—০.০০

কীর্ত্তন কুমার দত্তের—



- | | |
|--|---|
| ১। বাংলায় অক্ষয়—১.৫০ | ২। বহির্ভাষ্যে ভারতীয় বিবরণ প্রবেশদাতা—০.০০ |
| ৩। অমূল্যমূল্য সমিতির শি, শিখর—২.০০ | ৪। দ্বোদশী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০ |
| ৫। কাকোয়ী শহীদকুম—১.২৫ | ৬। কলতা বাঁকাঃ সংগ্রাম কাহিনী—১.০০ |
| ৭। গ্রন্থবিহারী ও অমূল্যমূল্য সমিতি—১.০০ | ৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—১.০০ |
| ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—১.৫০ | ১০। বিশ্ববী বিবেকানন্দ—১.৫০ |
| ১১। মহাশয় ও মহাবীর—১.৫০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও তপস্বী নিবেদিতা—১.৫০ |
| ১৩। দেশ বাসের জোড়েনি (১)—১.৫০ | ১৪। দেশ বাসের জোড়েনি (২)—১.৫০ |
| ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর খাড়া—১.৫০ | ১৬। ১০৮ এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০ |
| ১৭। হাতিয়া হত্যা প্রবেশদাতা—১.৫০ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অমূল্যমূল্য সমিতি—১.০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পুঁজির টিউন—১.০০ | ২০। লাইট হত্যা প্রবেশদাতা—১.৫০ |

প্রবেশদাতা :—১৫০ বহুতাল টিউন কলিকাতা-১০০০০

টেলিগ্রাফ :—১/১/১/A বহুতাল টিউন কলিকাতা-১০

2 MAY 1982



সম্পাদক দত্তের—

(কলিকাতা) প্রবেশদাতা দত্তের, প্রবেশদাতা দত্তের

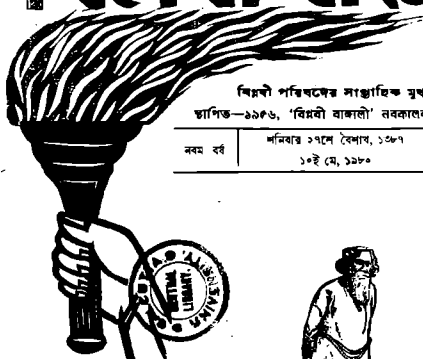
প্রবেশদাতা :—১৫০ বহুতাল টিউন কলিকাতা-১০০০০

প্রবেশদাতা :—১৫০ বহুতাল টিউন কলিকাতা-১০০০০

প্রবেশদাতা :—১৫০ বহুতাল টিউন কলিকাতা-১০০০০

প্রবেশদাতা :—১৫০ বহুতাল টিউন কলিকাতা-১০০০০

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণক
 ছাপিত—১৯৭৬, 'বিপ্লবী বাংলা' সপ্তাহাবার—১৯৭৬

নবম বর্ষ	শনিবার ১৭শে বৈশাখ, ১৩৮৭ ১০ই মে, ১৯৮০	৩২-৩৩ সংখ্যা
----------	---	--------------



১১২ তম বর্ষীয় অমলমহোত্মে

বিপ্লবী পরিষদ-এর

প্রবক্তা—

আমাদের সংস্কৃতির কুরখার চূড়ায় সাময়িক সমর্থনের আশ্রয়
 নেই অথচ সমাজজীবনের মরিয়া তগিদ আমাদের ব্যক্তিক-
 বাধের দোরগোড়ার হানা দিচ্ছে।

—কবিশঙ্কর

মহাত্মানব রবীন্দ্রনাথ

মহাকাব্যের পরিকল্পনা অল্পসময়ে এবারকার ২৫শে বৈশাখ হল কথিকবি রবীন্দ্রনাথের দেহ পরিগ্রহণের একশত বিশেষতম বৎসর। রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জীবনীটি শুধু সন তারিখের মালা নয়—এটি হল একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত বিরাট এবং সর্বতোমুখী যে তার মূল্যায়ন করা একটি নিবন্ধে সম্ভবপর নয়। তার প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি এমন ব্যাপকভাবে রেখে গিয়েছেন, যে তার যে কোন একটি নিয়েই বহুতর পৃষ্ঠা লেখা হলেও, তার পূরাপূরি মূল্যায়ন করা অসম্ভব। বিশ্ববাসী জাতি বহুভাষী হয়ে রবীন্দ্রনাথকে শ্রবণ করবে এবং মনন করবে। আমরা শুধু তাঁদের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও প্রণাম নিবেদন করব এবং সামান্যভাবে হলেও আমাদের গুণিগণ স্বীকার করব এই নিবন্ধের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, একজন স্বদেশ প্রেমিক, একজন বিশ্ব প্রেমিক, একজন আলোর দিশারী। সমগ্র পৃথিবীকে তিনি দিয়েছেন সঠিক পথের নিশানা। যেখানেই মানুষ অত্যাচারিত, মানুষের আত্মা ক্রিষ্ট, জীবনপথে মানুষ দিশাহারা, যেখানেই মানুষ চেয়েছে সব সতীর্ণতা, সব মনিনতা মুছে কেলে পৃথিবীর গোটা মমুষ্য সমাজের উন্নয়ন ও মঙ্গল সাধন, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বাণী, বিশ্ববাসীকে পথ দেখাবে মহত্তম আশীর্বাদেব জন্ত, বিশ্ববাসীকে ক্ষুদ্র ভৌগলিক সীমা ও বৈধনীর উর্ধ্বে উঠে, বিশ্বপ্রেমের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে। রবীন্দ্রনাথ শুধু তার জন্মভূমি ভারতবর্ষেরই মানুষ ছিলেননা, তিনি ছিলেন বিশ্ব ভৌমিকতার আদর্শের ধারক ও বাহকরূপে সারা বিশ্বের অঙ্গান্ত আপনজন এবং কাছের মানুষ। আমরা তাঁর এই পরিচয়টাকে স্বীকার করি এবং ভারতবাসী হিসাবে গর্ববোধ করি এই জন্ত যে তিনি ধন্ত করেছেন আমাদের দেশকে, এইদেশে জন্মগ্রহণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশ ও মহারাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে জেলে উঠেছিল জাতীয়তাবোধের সাদা। এই চেতনা প্রথম মূর্ত্ত হয়ে ওঠে স্বদেশিকতার আন্দোলনে। রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলনে মেতে উঠেন। প্রায় ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তার জীবনে আসে এই কর্মপ্রবাহের বঙ্গা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত অকাঙ্ক্ষণী ছিল যে কোন গোষ্ঠী

বা দলগত কাজ কর্ণের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিলনা। তা ভিন্ন, তাঁর নিজের কথাতেই বলা যায় “সবার অলঙ্কারে ভেতরকার অশিব বৃদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, দেখা দিলো অজ্ঞার, অনৈক্য, সুরে আস্রুত হল।” কিন্তু যদিও এটা গোটা দেশ এবং পৃথিবীর পরম ভাগ্য বলে স্বীকার করি তাঁর সিদ্ধান্তকে, তবু এটা সভ্য মাত্র আক্ষরিক অর্থে। রবীন্দ্রনাথ দেশের বাদেশিকতা আন্দোলনের সঙ্গে কখনও বোগসুত্র ছিন্ন করেননি। নিপীড়িত মানুষের হৃৎবেদনার তিনি গভীর হৃৎবেদ অনুভব করেছেন এবং তাঁর লেখনী বহুনির্বোধে গর্জন করে উঠেছে। তিনি তাঁর বিচারবুদ্ধিমত্তা কাজ করতেও বিধা করেন নি। তাঁর পরিচয় মেলে জালিওদ্বারানাবাসের স্বত্যাচারের বিরুদ্ধে নাইট’ উপাধি ভ্যাগের মাধ্যমে, পরিচয় মেলে বিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের নীতির বিরুদ্ধে কবির লেখা চিঠির মাধ্যমে। তাঁর নিজের কথাতেই বলা যায়।

‘আমি পৃথিবীর কবি, যেহা তার যত গুণে ধনি,
আমার পানের মূরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।’

রবীন্দ্রনাথ তাই এক প্রকৃত বিশ্বকবি বলে স্বীকৃত ও বর্ণিত হয়েছেন এবং মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো অধিকতররূপে বস্তুত হাতে থাকবেন এবং সকল মানুষের প্রাণে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে। কবির বক্তব্য অনুসারে চিন্তার রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসীমের পথের বাতী। কিন্তু সাধারণ মানুষের হৃৎস্পর্শে তাঁর প্রাণে অনুপ্রাণিত হত সর্বক্ষণ। এই উচ্চতম শিখর ও নিম্নতম ধরনী-এর মধ্যে বহুদূর চলাকোণা করার অতীতপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান, এর তুলনা নেই বলেলও চলে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ও ত্রিপুরা এই সামঞ্জস্য বিধানের উজ্জলতম সাক্ষর হিসাবে পরিগণিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নতুন পৃথিবী, নতুন মানুষ গড়ে তুলতে, যে মানুষ অত্যাধিক থেকে ভয় থেকে এবং অশিক্ষা থেকে মুক্ত। তিনি চেয়েছিলেন নবযুগের বোধন করতে। তিনি নিজেই শুধুমাত্র আশাবাদী ছিলেন না, নৈরাশ্র, আত্মহীনতা যাতে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে। তাকে মনকে পঙ্গু করতে না পারে, বস্তাবকে বিকৃত করতে না পারে, জ্ঞেয় ও জ্ঞেয়তা পথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে, একান্ত তিনি আজীবন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন লেখনীর সাহায্যে, বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মাধ্যমে। কিছু মানুষের কাজকর্ম যখন মানুষের জগৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে। তিনি এগিয়ে এসেছেন অস্তর বাণী নিয়ে, ভাব্য দিয়েছেন স্বতন্ত্র দৃষ্টান্তে। নির্গত নব যৌবন আসেন ভাঙ্গনের মহারথ এবং দানবের মূঢ় অপব্যয় রচিত পারে না কহু ইতিমধ্যে শাখত অধার— এই বাণী মৃত সমীচীনীর মত মানুষকে ধ্বংসের মূখ থেকে উদ্ধার করেছে।

রবীন্দ্রনাথকে জগতের একজন প্রকৃত শিক্ষাকর বলে আখ্যাত করা যায়। তাই দেশবিদেশের বহু গুণীজন তাঁকে গুরুদেব বলে মান্য করতেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে মানুষের

মনকে উদ্ভূত করে তার বিচার শক্তিকে জাগ্রত করেছেন, তার মনের মণিকোঠার অবস্থিত গুহাধিত সত্যকে প্রকাশিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ক্ষেত্রে অতুলনীয় বিদ্বৎপাল, তিনি সত্য, শিব ও সত্যের পূজারী। তাঁর নভঃ শিপাসা তাঁর স্বভাবজাত। বরনীর মূলের সঙ্গে তাঁর বোগ্যবোগও ছিল অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নকর রূপে সত্য। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় যেটা ছিল, তাঁর কথাতেই বলা যায়—

যে নাম এই বলে খ্যাত হোক,

আমি তোমাদেরই লোক—

আর কিছু নয়,

এই হোক শেষ পরিচয়।

এটাই রবীন্দ্রনাথের সার্বিক পরিচয়। উইল ডুয়াক্ট বিনি ছিলেন আমেরিকার একজন চিন্তানায়ক। তাঁর 'দি কেস ফর ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উক্তি করেছিলেন 'ইউ এ্যালোন আর সাক্সিস্ফুল রিজন হোয়াই ইণ্ডিয়া শুড্ বি ক্রি'। এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বিরাটত্বের 'পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিশেষের মনোবিদ্যা রবীন্দ্রনাথকে কি চোখে দেখতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমার রবীন্দ্রনাথের এই অসম্ভবত্বী উৎসবে তাঁর প্রতি জানাই আন্তরিক আশ্রয় এবং কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রবণ করি তাঁর নিকট জ্ঞাতির রূপ।

— — — — —

Letter addressed by Rabindranath Tagore to the then Governor-General of British India, as a protest against the brutal actions at Jalianwalla Bagh renouncing the title of "Knighthood"

"The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India.

The disproportionate severity of the punishment inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. The accounts of the insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation aroused in the heart of our people has been ignored by our rulers.

Knowing that our appeals have been in vain, the very best that I can do for my country is to take all consequences upon myself giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror.

The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongruous context of humiliation and I, for my part, wish to stand, shorn of all special distinction, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have compelled me to ask your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of "Knighthood" which I had the honour to accept at the hands of your predecessor."



বন্দীশিবিরে
রাজবন্দীদের
প্রতি
রবীন্দ্রনাথ

(১)

নিশীথের লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির নন্দন ।
পিঙ্করে বিহঙ্গ বঁধা, সংগীত না মানিল বন্দন ।
কোন্স্বাভার রক্ত গতে
উদ্ভবর উর্ধ্ব স্রোতে
বন্দী করি উচ্চারিল আলোকের কি অভিনন্দন ।

(২)

সুতিকার-ভিত্তি ভেদি অতর মাকশে দিল আনি
অসমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মহাবাণী ।
মহাক্ষণে কত্ৰাণীর
কী বর লভিল বীর,
হুত্না দিবে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী ।

(৩)

‘অমৃতের পূত্র মোরা’—কাহারো শুভাগে বিশ্বময় ।
আর বিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয় ।
ভৈরবের আনন্দেরে
হৃৎখেতে জ্বিলি কে রে
বন্দীর শৃংখল ছনে মুক্তের কে দিল পরিচয় ।

১৯শে জৈষ্ঠা, ১৩৩৮

দাঙ্গিলিঃ

(১৩৩৮ সালে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে বঙ্গা বন্দী-
শিবিরের রাজবন্দীগণ রবীন্দ্রনাথকে এক প্রশস্তি
লিখিয়া পাঠান। রবীন্দ্রনাথের উপরের কবিতা
তাহারই উত্তর) ।

॥ প্র শ্ন ॥

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছো বাবে বাবে

দরাহীন সংসারে—

তারা বলে গেলো, ‘কমা করো সবে’,

বলে গেলো ‘ভালোবাসো,

অন্তর হ’তে বিধেব বিধ নাশো।’

বরণীয় তারা, স্বরণীয় তারা, তবুও বাহির আবে

আজি দুদিনে কিরাত্ত তাদের বার্থ নমস্বারে ।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে

হেনেছে নিঃসহায়ে,

আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে

বিচারের বাণী নীরবে নিভুস্তে কাঁপে ।

আমি যে দেখিছ ভরুণ বালক উন্মাদ হরে ছুটে

কি যন্ত্রণার মূরছে পাথরে নিফল মাথাঝুটে !

ক’ল আমার রক্ত, আজিকে, বাঁশি সঙ্গীতহার্য

—অমাবস্যার কারা

লুপ্ত করেছে আমার ভুবন হ্রঃস্রবের তলে,

তাই তো তোমায় শুধাই অক্ষ জলে—

‘বাহার্য তোমার বিবাইছে বায়, নিজাইছে তব আলো,

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিরাছো ? তুমি কি রেসেছো ভালো ?

১৯৩১ সালে হিজলী বন্দীশিবিরে বন্দীদের উপর পুলিশের গুলীচালনার ফলে ভারতেশ্বর সেন ও সম্ভোষ মিত্রের নিহত হওয়ার অভিবাদে কবিগুরু এই কবিতাটি লেখেন ।

দেশের ডাক

—মানব গুণ

কথা—আসুত্ৰ হিমাচল, কুমুদলের বিত্তীর্ণ
এই ভূখণ্ড নিয়ে গড়ে ওঠা কর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র
আমাদের স্বদেশ। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ মহা-
ভারতের পুরাতন যুগ থেকে পুরুবাহুক্রমে আমাদের
জন্মভূমি। মাতৃভূমি বর্গাদশি পরীক্ষণী।
শৈশবের নিষ্ঠ-শয্যা, যৌবনের নন্দন-কানন, আর
বার্হকোর বারানসী। কবি ধীজেন্দ্রলালের ভাষায়—
ভারত আমার জননী আমার

যেখানে মানব মেলিল নেত্র।

এসিয়ার ভূমি পূণ্য ভূমি যা
জগতের ভূমি তীর্থ ক্ষেত্র।

পৃথিবীর মানব সভ্যতার এখানে সর্বপ্রথম
বিকাশ। আবহমানকাল ধরে দেশ-বিদেশের কত
মানুষ দল বেঁধে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই মহাদেশে
এসে, শেখ পর্বত পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে।
'হেথার অর্থ্য, হেথার অনর্থ্য, হেথার জাবীড় চীন।
শক দুগ দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন' ॥
আজ নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশে কত সে সুলভ।

গান

কত সুলভ ভূমি হে মাতৃ ভারত
গড়ে কুহুমে বরণে
যেহ মানস-প্রতিমা বন-ভ্রামলিমা,
বনরাজি নীলাভরণে।

কিবাঁট নিয়ে শৈল-শিখর সাগর পাদ চুমি ;
কুজা-কাবেরী, গঙ্গা যমুনা অশ্রুত ভীষণভূমি,
মূর্ত-সাগ বৈরাগ্য-ভাগ্য, তাপ কলুষ হরণে।

পবন দোলায় ডেউ খেলে যায়,
সোনালী ধানের গুচ্ছ।
তরু পাশে মাখি চাঁদের লাবনী
লীনা জ্বরে শিখি-পুচ্ছ।
হরবে কমল সরসী ফুলে
পুঞ্জিত দেখা গগনে।
বর্ষা উল্লা কাঙ্ক্ষল নয়ন
ফলশে বিজলী করণে।
কত সুলভ ভূমি !
বৃষ্ট বোধ জৈন পার্শ্ব হিন্দু মুসলমান ;
যার সম্মান সবাই সমান মহাজাতি একপ্রাণ।

তুলি মতভেদ বিবাহ বিতৈর
মিলিত অন্তর চরণে—
বেজে ওঠে মূর মিলন মধুর
কল্যাণ গ্রন্থ মরণে।

কথা—ঐতিহ্যের এই মহান আদর্শ নিয়েই গড়ে
ওঠা আমাদের জাতীয় পতাকা ও সংবিধান।

গান

জয়তু জাতির মূর্ত পতাকা হোম অনল শিখা,
রাগ মূর উর্জেশ্বর উজ্জল জয়টিকা।
প্রতীক পূত শৈবিক যেত সর্ব্ব অবলিগু,
ভাগ্য সাহস শান্তি-সত্য বিশ্বাস তেজ দীপ।
প্রগতি রথচক্র অশোক ছদ্মপটে রূপলিখা ॥
হিম অরোর নির্ব্বর হেম ক্রামল তট ঘিরে,
অনর্ব্ব ভীম ক্রম প্রেত প্রেত নত শিরে।
শক্তি মদ মত্ত প্রেলর সংহার অহমিকা ॥

ভাষ কল্মষ নাশন বণ সহ্যাস ত্রাস মাঝে,
চেতন শুভ মৈত্রী বোধন কল্যাণ কর রাখে ।
সংহতি প্রীতি লাভত নীতি পার্থক্য চর্যনিকা ॥
ভাষণ জ্ঞান অমৃতময় অভয় মহীতলে,
আত্মি তখন জীবন শুভ কর্ণের পাশে চলে ।
নমঃ পতাকা মহিম মহাভারত লঙ্ঘনিকা ॥

কথা—মহান এই পতাকার আদর্শকে দৃষ্টির
সম্মুখে রেখে সংবিধানের অনুশাসন মেনে জাতিকে
সংহতি ও কর্নের পথে পথ পরিক্রমার নির্দেশ ।

গান

জাগ্রত ভারত সংযুক্ত সংহত

তুলি নান্য মতামত অশ্মে ।

ভাব, বিচ্যুতি ভাষণ অমৃত

সহীত স্থললিত হৃদয়ে ॥

আসনে আসীন শাসন সেবারত,

গণমত চেতন সাধন বিরোচিত ।

নিষ্ঠুর নিপীড়ন বন্ধন বিমোচন

জীবন জাগে মহানন্দে ॥

জাগজ্ঞান বন্দিত যুগ অভিনন্দিত

শান্তির আশীস প্রদানী ।

নিবিল মুখরিত নিনাদিত চক্র

নিবেশিত বৈদ্যের বানী ।

চিত্র বিগলিত নভশিরে প্রণত

মানস অবিরত বন্দে ॥

কথা—কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির শাষণ ক্রমতা সর্বদা
‘সর্বক্ষেত্রে হবে সেবারপর্যায়, তারা সকলের সহ-
যোগীভাব, শিকার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরের
অন্ধকার দূর করে, অর্থনৈতিক জীবনে, হার যে
পথ সুগম তার সন্ধান দেবে। কিন্তু তার সঙ্গে
চাই দেশের প্রতিটি মানুষের ঘোলা মনের সর্ব-
প্রকার সক্রিয় সহযোগীতা । গ্রামে গ্রামে কৃটির

শিল্পের প্রবর্তন ও হুমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।
কৃটির প্রকৃত সাম্যবাদ ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে
তোলা সম্ভব। গ্রামে নিতা প্রয়োজনীয় কৃটির
শিল্পের উৎপাদন বৃহৎ শিল্পের অর্থনৈতিক শোষণ
থেকে গ্রামকে মুক্তি দিতে পারে আর এইরূপ বাস্তব
রূপায়ণ সত্যই যদি সম্ভব হয়, তাহলে ভারতবর্ষের
এই গ্রামগুলি হবে কৃষকের দৃখণ। ক্রমস্তার
লোভে ও ঈর্ষাপ্রসূত দলাদলি বন্ধ হলে সাম্য মৈত্রী
ও সংহতির আদর্শে সকলের অকণ্ঠ সমর্থনে দেশকে
এইভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। স্বাধীনতা লাভের
পূর্বে এবং পরে নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতিও ছিল
এইরূপ। ‘স্বাধীন ভারতের দরিদ্রতম মানুষটিও
যাত্রা, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ
হতে বঞ্চিত হবে না।’

১৯৫০ খৃঃ ২৬ জানুয়ারী প্রকাশিত হলো

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জষ্ঠ্য রচিত সংবিধান।

৫১ ধারায় শুরু হলো পঞ্চাষিকী পরিকল্পনার
কাজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনসাধারণের
দারিদ্রের হ্রাসে মোচনের জন্ত্য রাজ্যগুলির বিভিন্ন
স্থানে বিরাট কর্মযজ্ঞ। গড়ে উঠলো বড় বড়
ইম্পাত, জাহাজ, রেলগাড়ি ও জমির সার উৎপাদন
ও জমির সার উৎপাদনের কারখানা। বিদ্যুৎ
উৎপাদন ও সেচের জল সংরক্ষণের জন্ত্য দামোদর
মহানদী ভবানী ডাকরা লাসল প্রকৃতি নদীগুলির
বাঁধ। আর এর সবগুলিকেই কেন্দ্র করে গড়ে
উঠলো আরও অনেক শিল্প কারখানা ও ছোট
সহর। শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ও গ্রাম ছাড়া
মানুষের চাপে পূর্বের বড় ছোট সহরগুলি আদতনে
ক্রমে আরও উঠলো ‘তীত হয়ে। কিছু কিছু
বেকার সমস্যার সমাধান হলো। দেশ বিশেষের
সাংবাদিক পর্যটক ও বিদ্বান একসল, এসব দেখে

তখন সকলেই উঠলো তখন প্রশংসায় পকমুখ
হয়ে ।

গান—আমি নিজের চোখে এলাম দেখি
তুচ্ছভাষা ময়ূরাক্ষী, ভাবানী ভাকরা লালল
হীরাবুধ পরিকল্পনা ।

মেসিনে কাজ চলেছে দিব্যারাতি
এসব মোটেই গল্প না—
মোটেই গল্প না ।

বিহার আর বাংলা জুড়ে নামোদয়ের বাঁধ ।
ব্যাপক শুধুই সেচের জরে জল ধরিবার কাঁধ ।
জল বিছাতে তার উলবে বেশের
বড় বড় কারখানা ।
এসব মোটেই গল্প না ।

কথা—বিজ্ঞান প্রস্তুত বড় বড় কলকারখানা
কর্মশূচী উন্নয়নশীল সব দেশেই অর্থনৈতিক উন্নতির
কল্প গ্রহণীয় । কিন্তু তার অবদান যত বড়ই হউক,
একা তার মাথা নাই, কৃষিপ্রধান দেশের পাঁচ লক্ষ
গ্রামের সমস্ত ভাগ লোকের খেয়ে পড়ে বেঁচে
থাকার সমস্যা সে মিটায় । তাই আজ অর্থনীতির
ক্ষেত্রে বৈবচ্যময় এক কুংসিত বায়বানের চিত্র ।

গান— আমি এ কালের যন্ত্রনাব
লৌহ পিণ্ড জড় ।
বিদ্যাহ বেগে ক্রান্ত পত্তিশীল
অন্তি প্রলয়বর ।

গ্রাম ছেড়ে আসা লক্ষ বেকার জুড়েছি শ্রমের চাকে ।
ঘূর্ণির পাকে পাকে—

তার রক্ত কুটাবে ভগ্ন কটাহে, গোথা ছাড়ি তার ভর ।
উৎপাদনে ও বন্টনে খোর অবিচার অমানচার ।
প্রাসাদ সাজিয়ে তুড়ি ও মাংসে, বস্তিতে
কেলি হাড় ।

মোর কলে কড় নিঃশ্বাসে করাল অট্টহাসে,
গ্রাম বনিয়াদ হয় ধূলিসাৎ ভেঙ্গে পড়ে মর মর ।
তুলি বিখ্যাম গতি অবিকাম তুটৌছি নিবস্তর,
প্রাচুর্যে ভরে গড়িয়া তুলেছি শত শত বন্দর ।
গ্রামের রক্ত উজাড় করিয়া, কত মনোরম চর্মা গড়িয়া
সাজাই তাদের নানা উপচারে কত তারা সুন্দর !

আজ নৃত্য কর্ণশব্দে জোমানের ভাষা—
ইহাশবের স্তম্ভকে বহিয়া আত্মক নব আশা ।

হাত ধরে সাথে ডেকে নাও,
সঙ্গেহে ডাকিয়া বলা—
নিজ গ্রামে কিরে চল—
ভিক্ষাপাত্র হূরে কেলে নাও ।

বলো হে মহাজীবন—
নুতন কর্মের ডাকে নাও সাদা নাও ॥

ওরা চিরত্তরে উন্মূলিত হওয়া চাৰী—মজুর ।
ওরা দুর্ভিক্ষে, বস্ত্রায় অভাবের, মহাজনদের ধনের
দারে, অবশেষে প্রতি বংসরের ক্রমাগত প্রবাস্থলোর
চাপে । সর্বহারা হয়ে কাজকর্ম ও ভিক্ষার আশায়,
কুন্ড মা বাবা স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে অর্ধোন্নত অবস্থায়,
সহরের পথের উপর ভীড় জমিয়েছে । আমাদের
কারো চোখ এরা এড়ায় না । আমরা দেখেও
বেধি না ।

ওরা এই দেশেরই মানুষ । আমিছোর কথায়,
'তোমারই রক্ত, তোমারই ভাই ।'

গান—জবে মাঝ দরিদ্রায় কান্দেয়ে তবী
পারের দেখা নাই,
কোথায় আছে হে কাণ্ডারী

বলো ক্যামনে তোমার দেখা পাই ।
একলা কড় তুকানে আর মেথের ডাকে,
বড় ভয় করে মোর তুফান দেখে,
ও দখাল হাল ভাঙ্গা মোর জীবন তবী

হলো। কোন ফুলে তার হবে ঠাই।
 সেবে সারা জীবন চেউ-এর বেলা।
 আমার ঘাটে ঘাটে কাটিলোরে বেলা।
 শেষে পথের ফুলে সন্ধ্যাবেলা।
 বুঝি অঁধে ফুলে ডুবে যাই।

কথা—আমি পূর্বের কথায় আর একবার ফিরে আসি। প্রতিশ্রুতি পালন একটুও অসম্ভব হতো না যদি যুগে পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণের পূর্বে অথবা সাথে সাথে, গ্রামের জমিদারী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে তাদের হাত থেকে ভূমির স্বত্ব কেড়ে নিয়ে, প্রত্যেক গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের মাধ্যমে, এই সব চাষীদের ভিতর ছোট বড় বিচার না করে সমান হারে বিস্তরণ করা হতো।

কথা—তাই স্বাধীনতার ত্রিশ বৎসর পর, যে চিত্র আমাদের চোখে পড়ে তার প্রকৃত বাস্তব রূপ হচ্ছে—

গান—পল্লী দেহের অস্থি পাকুর তিলে তিলে
 করি ক্ষয়
 সহর গড়েছি সম্পদশালী নাহি তাতে সংশয়।
 শতাব্দী ভর জড়তার মোহে রুদ্ধ
 ক'রো আঁধি—

চেহন। লভিরা আঘাতে আঘাতে
 চোখ মেলে একি দেখি ?
 নিজ অগোচরে মরুত্বের আগুন জ্বলছে

গ্রাম ঘরে,
 চাহে প্রতিকার প্রাণে বাঁচিবার অল্প বস্তু ঘর।
 আমি এ যুগের বহুমানব লৌহ শিশু জড়।
 কথা—সহরগুলির বিভিন্ন স্থানে জমে উঠেছে
 সম্পদের সুউচ্চ পাহাড়। আর তাদের পায়ের
 তলায় লক্ষ ভিখারীর সমাবেশ। অর্থহীন
 অনাহারী, অর্ধাহারী, মল্লয়ুগ্মপী কতাল। ঝোড়ো

পাখির দল। এই দুয়ের মাঝখানে যে নৃভন
 মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ আত্মপ্রকাশ করেছে,
 তাদের অনেকেই আজ বিগত সাহেবিয়ানার কাহনায়
 বিলাসবাসনে মগ্ন। আত্মসমীক্ষা তারা করে না,
 অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা সমস্তার চর্চা ও সমা-
 লোচনার তারা মুগ্ধ, পকমুগ্ধ।

অপরদিকে বেকার যুবসমাজের একমল দলীয়
 রাজনীতির হানাহানি খুনাখুনিতে-মেতে আছে।
 আর একমল জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অর্থো-
 পার্জনীর লুণ্ঠন কোনও পথের সন্ধান না পেয়ে,
 চুরি ডাকাতির পথ বেছে নিয়েছে।

আর এই যে গ্রামে বসে গেতে না পাওয়া কতাল
 সার ঝোড়ো পাখির দল, এরা কারা—

এরা চিরদিন অব্যস্তিত

লাঞ্ছিত দৃগিত মিশেহারা,
 লুণ্ঠার আগুন জ্বলে সর্বত্র হারিয়ে,
 তান্ত্রিল্যের লাঞ্ছি ঘেঁরে ভিক্ষাপাত্র হাতে,
 সাজিয়াছে ভিক্ষুক লম্পট কাপুরুষ।
 মনে হলে আজও কীদে

—একদিন ছিলাম মানুষ ?

যে কথা দিকে দিকে সবার মুখে :
 মিলিয়ে সবার প্রাণে প্রাণে।
 হয়ে সুরে সাধা ক্ষয় সাধা
 ঘুরে বেড়ায় গানে গানে।
 যে চাষী ঘাটে ক্ষেতে পায়না খেতে,
 কি হবে ভাই তাহার গতি।
 যার ভাই নাই বেঁচে, ভূমির মোহ
 তার ভরে তুই যে আহ্বতি।
 না হলে কালের গতি নিষ্ঠুর অতি
 সব এসে তোমার ভাসিয়ে দেবে ॥

গান—এবার দেশের চাষী

কাজে কোমাল হাতে

চলছে ক্ষেতে বেহনতে যে যার গ্রামের পথে ।

গান—মাগো আজ আমাদের এই সাধনা

তোর গ্রামের পতিত জমি করবে আবাদ

সেখায় ফলবে দেখিস রত সোনা ।

গ্রামে খুঁলেছে মনের দুয়ার

সলা করমের বইছে ফোয়ার

সব চাষী শ্রমিক, হলে জমির মালিক

আর ভাহানের মাই ভাবনা ।

কোনও ভেদাভেদ আর কিছু নাইরে

সবাই একমত্তে কাজ করে বাই রে ।

মাগো ফিরে তোর বুক সব এক হবোছি

সবার মনে নুতন এই চেতনা ॥

ও ভাইরে, এ কথা নয়মো স্বপন,

নরত অলীক

বাগা ক্ষেত খামারে কাজ করে বায়

সবাই জমির মালিক ।

এখন সমবায়ের ট্রাকটরেতে

করলে জমি চাষ

সবার ক্ষেতে সমান ফসল

ফলবে বারমাস ॥

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হবে লেখাপড়ার

সাথে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক চাষ আবাদে

প্রণালী । আর তার সঙ্গে সঙ্গে যদি গড়ে উঠতো

বিভিন্ন কৃটির শিল্প নির্মাণের ছোট ছোট কারখানা ।

তোতে বেকার যুবকদের কাজকর্মের সংস্থান অনেকটা

ভাসের নিজ গ্রামেই হতো । আর লোকসংখ্যা

বৃদ্ধিরও তখন চাপ ছিল না । পূর্বের ঐ প্রতিশ্রুতি

পালন এখনও অসম্ভব নয়, যদি দ্বার বর্নের এই পথ

ধরে এগিয়ে আসা যায় ।

কথা—এখন গ্রামে সবসাধারণ একমত্তে নিজ

নিজ গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নের কাজকর্ম মূবর হয়ে

উঠলে গ্রামের যে ছবি কুটে উঠবে, তাই সকলের

চোখের সামনে গানের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা

করবে ।

গান—আরে ও—

আরে ও মজুর ও চাষী ভাই

চল ফিরে বাই আরার মাটির মাথের বুক ।

পাষণে কৃকলে মাথা, ভাত বা রুটি

কেউ দিবে না তোদের মুখে ।

ও চাষী আর কাদিস না চল

ভোদের চাষে ভোদের ক্ষেতে

ফলবে হেঁদিস সোনার ফসল—

লয়ে তোর কান্তে-কোমাল লাঙ্গল জোয়াল

(ক্ষেতে) চল ফিরে চল, বাঁচবি সুখে ॥

গান—ও আমার দেশের মানুষ,

আজ হতে একমত্তে ভাই কাজ করে বাই

এই পথে ফল ফুল হবে ।

মিটিবে সবার আশা ভালবাসা

সরল পথে পথ দেখাবে ।

গ্রামবাসীদের বেহনতে,

গ্রামে গ্রামে গড়তে হবে ছোট কারখানা ।

সে সব কারখানাতে তৈরি হবে

হরেক রকম যন্ত্রপাতি,

তা' দিয়ে কৃটির শিল্প গড়বে গ্রামের

মানুষ বাঁরা যেহনতী ।

হবে চরকায কাটা মতো মিহি অতি,

দিয়ে তাঁতলালে বসে তাঁত বুনেব তাঁতী,

সাবা জগৎ জুড়ে তাহার হবে খ্যাতি ।

হবে কলসী হাড়ি, বেলোয়ারী আয়না চুড়ি,

হবে বাংগাহারী ভূমি ভূমি

শিশুর খেলনা বস্ত্র মনের মত—

মাছুষ গরু বিড়াল ইতর শিয়াল হাতী ।

হবে পুষ্টিকর সব মিষ্টি খাবার—

কীরের পুলি দই ছানা ।

গ্রামে গ্রামে গড়তে হবে

ছোট কারখানা ।

হবে যাঁতা চৌক ধান ভানা

আর তেলের ধানী—

বাট পালাং আলনা তোরঃ

দিশে কাঠ সাল সেগুন ও মেহগিনি—

কেবল চলানলি কোন্দলেতে

হয় না সফল সাধনা—

গ্রামে এট পথেতে চললে হবে—

সবায় লাভ কোলআনা ।

গ্রামে গ্রামে গড়তে হবে ছোট কারখানা ।

গান—হয়ে কালের মানুষ কাজ করে যা ;

এট পথে তোর হবে জয়

ঘরের কোনে কাল শুনে আর কটাবার নাই সময় ।

ভাল কাজ করিলে ফল ভাল হয়

চোখের দেখা হুনিচ্চর ।

আমি করব না কাজ, হব রাজা,

ভাওতা ছাড়া কিছু নয় ।

এ দেখ তব্ তব্ ছুট্ছে ভবী

বইছে হাওয়া জগৎঘর ।

কালের ডেটে বেবে তুই পাহাড় সমান,

কথা—একসঙ্গে যাচ্ছে চাব ও সেচের জল

সংস্কারের ক্ষত প্রয়োজন প্রতি গ্রামে বড় বড় পুকুর
ও বীথি খননের ।

গান—খিলেছে গ্রামবাসী সব

গরীব চাবী মজুর বত

আজ গ্রামের মানুষ সবাই খিলে

নিয়মস করবে কতা ।

রবে না শেওলা ভরা পুকুর লীঘি

পাক পানা আর কুহি

লীঘির পারে মারি ভাল নারিকেল হুপারি ।

গ্রাইমারি পাঠশালা

সাথে ডাক্তারখানা সরকারী

মান-কাঠে সব তৈরী হবে

নতুন নতুন ঘর বাড়ী

সেচের ঘরে নলকূপ লাইন

বসবে জমির চারদ্বারে

একটুখানি চাপ দিলে তার

করমরিঘে জল পড়ে ।

কমবে মশা মাছির বলাই

লাগবে না আর মশারি ।

খাপরে বলে পাগিয়ে যাবে

বোগ বোলাই সবগ্রাম ছাড়ি ।

গান চলো যাই লাঙ্গল চালাই,

আবও ভাই ফসল বাড়াই,

ফসল বাড়ুক ফসল বাড়ুক,

বাড়ুক দেশে চাষের মান ।

খুঁটা মাটি পরিপাটি

গড়র খাটা প্রমের দান ।

ভাতে বর্ষা করে টাপুর টুপুর,

মেয়েরা গায় একতান

পেয়ে মাটিতে জলের ধারা,

উঠলো নেচে বানের চাড়া,

বাতাস লেগে ডেটে খেলে যায়

সেবলে জুড়ার চাবীর প্রাণ ।

ধান ফলেছে রাশি রাশি

(বেন) মাঘের কোলে খোকার হাসি,

গ্রামে আর হইবে না কেউ উপবাসী

সমবায়ের এই বিধান ।

গান—সমবায়ের পদ্ধতিতে,
করিস নাহে কোন ভয় ।

যে তোর হাল খরছে শক্ত মাখি
মানবে না সে পরাজয় ।

কথা—অত্যন্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিভাষার বিষয়,
আজও নান। স্বার্থক, ক্ষমতালোভী শক্তির প্ররোচনায়
স্থানে স্থানে আত্মঘাতী রাজনীতি, প্রাদেশিকতা ও
সাংস্কারিকতার খুনোখুনি থেকে থেকে আত্মপ্রকাশ
করে চলেছে ।

যদি ভাগ, পরস্পর ভালবাসা ও উপযুক্ত
শিক্ষার মাধ্যমে ও গ্রামীন অর্থনৈতিক সাম্যের পথে,
গ্রামের মানুষগুলির সম্বন্ধে বাবধান ঘোচে, তবে
এই সব স্বার্থবাক্ত শক্তিগুলির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার
সম্ভাবনা চিরন্তনের ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ।

এই সাড়ে পাঁচলক্ষ গ্রাম ভারতবর্ষের সাড়ে পাঁচ
লক্ষ শিকড় যার উপর রাষ্ট্রের কাঠামো দণ্ডায়মান ।
এই শিকড়ের বনিক্যাদ যত মজবুত হবে, রাষ্ট্রের
ক্ষমতা ও তত সফল হবে, আর তার অনিবার্য ফলে
আত্মসম্পূর্ণ হয়ে, চতুর্দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবসা
বাণিজ্যের মাথা প্রশাখা সে বিস্তার করবে । আর
তা না হলে—ক্রমাগত অনৈক্যের খুন খরে আত্মঘাতী
কলাহে শেষপর্যন্ত ভারত আবার বণ্ড বিখণ্ড হয়ে
যাবে । আস্তান সবাই মিলে মিলে আমরা কাজে
লেগে যাই । আমাদের স্বদেশ, আমাদের ভারত
ভূমিকে আমরা সকল দিক থেকে সফল ও ঐক্য-
যুক্ত করে গড়ে তুলি ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভাগের শত শত
জলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে । এ
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চললে এই পথে ভারতবর্ষের
বাগত বাণীর অবধান, ও নতুন নতুন চিন্তাশ্রমের
জ্ঞান-বিজ্ঞান, আত্মকের পৃথিবীকে শাস্তিতে বেঁচে
থাকার সম্ভাব্য পথ দেখাবে । শত ধারে উৎসাহিত

তার দৃষ্টান্তের কথাগুলো পান করে, আবার জগৎ
ভ্রম হবে । খুঁজে পাবে মুক্তির সন্ধান ।

গান— জয়তু হে মহান,

গাহে মুক্তির পারাবত মেঘতে উড়ে,
চাহে মৈত্রীর পথে প্রেম ঐক্যবিধান ।
পূনঃ এশিয়ার, ঘৃচি বন্ধন লাজভার
দীনতার হীনতার,

এল নব প্রভাতের লগ্ন ।

পুনঃ মহাভারতের প্রাচীন অতীতের
সার্বক হল নৃষ বধ ।

বাজে শতকেটি কহের সংগীত কাকার
শাস্তির সুসংলিত তান—

আজি মুক্ত জগৎ মোনে ভূষিত পরায়ে
ভারতের প্রেমময় গান ॥

হে মহাবীর,

যার সংগ্রাম সাধী ছদি গগন তলে,
দস্যোর প্রবর্তার মানিক জলে,
সেই হিংসার দেখ কোল পরম বলে,
প্রেম নৃত্যের করে মহীয়ান ॥

গান—আমার প্রাণ যেন বায়ু মা তোমার মেঘায়

বসে অভয় চরণতলে,

যেন গ্রামের শেষে অঙ্গ জুড়াই

বিচ্ছিয়ে ঐচ্ছল শ্রামল কোলে ।

মাগো কবীটে তোর কনককিরণ

অঙ্গে রতন শ্রামা বরণ

কালো মেঘেরা তোর খোশ চরণ

অবতার করা চোখের জলে ।

সাবা অঙ্গে মেঘে মা তোর ধূলি,

আমার ফুল মুখে মা মা ধূলি,

যেন তোর ধূলায়ই লুটার দেহ

ভবের বেলা সাজ হলে ।

দেশের অর্থনীতি লক্ষ্যহীনতায় পন্থ—ইন্দিরা

বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বার বার বলেছেন, ভারতের অর্থনীতি চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে, যা নাকি এর আগে কখনও হয়নি! তিনি বলেছেন, জনতা ও লোক দল সরকারের শাসনকালে ভারতীয় অর্থনীতি উদ্বেগজনক হলেও : বিশেষ করে শিল্প অর্থনীতি লক্ষ্যহীন ভাবে পরিচালিত হয়েছে। তার ফলেই আজকের এই আকাল, পশুদের ব্যাপক অভাব এবং আকাশ ছোঁয়া ব্রহ্মল্যা বা সামলে নিতে অনেক সময় লাগবে। অর্থাৎ, দেশবাসীকে ভর্তুকি দিয়ে মেনে নিতে টিকে থাকতে হবে।

প্রশ্ন হল : মাত্র দুমাসের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী কি সংশ্লিষ্ট সবকিছু অর্থনৈতিক দপ্তরের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ধোঁজববর নেবার সময় পেয়েছেন? তিনি কি ধরতে পেরেছেন যে, ইম্পাত, খনি, বিদ্যুৎ ও কয়লায় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা প্রতিরোধ মতো চারটি মৌলিক দপ্তরই বিপন্নকালিত হয়েছে! তিনি কি ভেবেছেন, এই চারটি ভারী শিল্প ক্ষেত্রে লক্ষ্যহীনতায় ছেলে দিয়ে শিল্প অর্থনীতির দেশব্যাপী কাঠামোটাকেই এলোমেলো করে দেবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; এবং প্রাক্তন মন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক ও তাঁর সহচরী অফিসাররা ঠিক তাই করেছে? হ্যাঁ তা করেছে, তাদের এক কথার বলে দেশপ্রাণী। সেই দেশপ্রাণীদের চিনতে এবং আইনানুগ শাস্তি দিতে দেয়ী হল, শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের ওপর দেশ-

বাসীর আস্থা অচল, অটুট নিশ্চয়ই থাকবে না। জনকল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় ফিরেছেন। দেশবাসী ইতিমধ্যেই ভাবছে, শ্রীমতী গান্ধী কী করছেন, আর কি তিনি করতে পারবেন। দেশবাসী এখনই জানতে চায়, দেশের অর্থনীতিকে লক্ষ্যহীনতায় ছেলে দেওয়ার কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তাবের ব্যাপারে ইন্দিরা সরকারের তারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা প্রতিরোধ মূলক কিস্তি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দেয়ী করছেন কেন?

দেখা যাচ্ছে কয়লার অভাব বলে টীল অর্থনীতি পরিমার্জিত চোঁচাচ্ছে। জবাবে কোনও একটি বিশেষ মহল চেনা সুরে বলছে, কয়লা আমদানী করা খুবই জরুরী। অথচ জনগণ দেখছে, কয়লা উৎপাদন এবং ইম্পাত উৎপাদন, দুইই গত তিন বছরে একচুলও এগোয়নি, বরং অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদন কমেছে। তবুও কেন কয়লা আমদানীর দাবিতে অতো চোঁচামেচি? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে পেছন দিকে একটু তাকানো দরকার।

১৯৭৭ সালে জনতা নামে রাজনৈতিক জোটটি কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় বসলো, আর বিজু পট্টনায়ক পোলেন ইম্পাত ও খনির মতো অভ্যন্তর গুরুত্বপূর্ণ দুটি দপ্তর। তখন থেকেই অপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, কয়লা এবং বিদ্যুৎ এর ওপরও বিজুবাবুর চোখ ছিল বলে পরবর্তীকালে জানা গেছে। খবরে প্রকাশ,

বিজুবাবু যখন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আয়কর সম্পর্কিত পাক্ষিকটিরও বেনী মামলা বুলছিল। বকেয়া আয়কর হিসেবে, তাঁর কাছে সরকারী দাবির মোট অংক হবে চার কোটি টাকাও বেশী। মন্ত্রী করার প্রয়োজনে, বিজুবাবু এককালীন বোল লঞ্চার মতো টাকা হাইকোর্টে জমা দিয়ে একটা বন্দোবস্ত করে নিলেন। অতঃপক্ষে জানা যায়, ঐ পরিমাণ টাকার যোগান দিয়ে, ঠীল অর্থটি অক ইণ্ডিয়ার বর্তমান চেয়ারম্যান তাঁর দায়ী পদটি কিনে নেন। সেই থেকে 'বিজুবাবু' এবং তাঁর অজ্ঞাত চেয়ারম্যান নিজেদের বৈধত্বিক বার্ষিক ব্যতীকিছু করেছেন, তার এক বিস্তৃত রিপোর্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের কাছে জমা পড়ে। তিনি তদন্তের নির্দেশও দেন।

১২৭৮ সালের ১লা এপ্রিল, দুর্গাপুর ইম্পাত নগরতে সেমিনারের নামে বিজুবাবু এবং তাঁর সহচরী অফিসারদের বেশদ্রাহী চক্রান্তের ধরুপ প্রকাশ পেলো। বিজুবাবুর এবং দুর্গাপুর ইম্পাতের তদানিন্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রশান্তকুমার পালের উপস্থিতিতে ঐ সেমিনার (আলোচনা-চক্র) টিক করলো, দেশের কয়লাশিল্প অক্ষম। ইম্পাত শিল্পকে বাচাতে অট্টেলিয়া ও কানডা থেকে কয়লা আমদানী করা খুবই জরুরী। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক কয়লা বর্ন অফিসাররাও ঐ সিদ্ধান্তে জোর মদত দিলেন। দিল্লিতে কিবে, ঐ সিদ্ধান্তের কথা বলে, বিজুবাবু কাবিনেটকে চাপ দেন এবং এককালীন দশ লক্ষ টন কয়লা আমদানীর সিদ্ধান্ত মজুতও করান। প্রকাশ, সেমিনার ব্যবব যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যবসাদারদের কাছে আদায় করা হয়েছিল, সেই টাকা বিজুবাবুর সহচরীদের ভোগে লেগেছে। প্রতিদানে, কয়লা এবং ইম্পাতের প্রভাবশালী অফিসাররা প্রশাসনকে তছনছ করে ঐ দুই শিল্পপণ্যের দেশজ উৎপাদন

দাবিয়ে রাখতে সক্রিয় হয়, যাতে করলা আমদানীর ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সেই ব্যবস্থা আজও অব্যাহত আছে। সেই সঙ্গে কয়লা এবং ইম্পাত নিয়ে কালোবাজারীর বাড়বাড়ন্তও হল। দেখবার, বলবার কেউ নেই। বরং বন্ধকরাই যে ভল্লক! নতুন নতুন ডিপো ম্যানেজার এবং সেল্‌স ম্যানেজার নিয়োগ হয়েছে, যারা দেশের স্বার্থ ভূমিরে নিজেদের সত্ত্বি বাড়ানোর কাজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। এমনই একজন ইম্পাত অফিসার বেনারীতে কলকাতা 'এয়ারপোর্টে' একটি বড় লোকানও চালাচ্ছে। সেই সঙ্গে, 'প্রবল আমার হাতের লোক' বলে প্রকাশ্যে বড়াই করছে।

১২৭৯ সালের আগস্টে, জনতা গেলো, চরণ লল এলো। বিজু পট্টনায়ক চরণপ্রিত হলেন। ইনামও পেলেন। ইম্পাত, খনি রটলো, সেই সঙ্গে কয়লা মন্ত্রকও বিজুবাবুর হাতে এলো। তাছাড়া, ডিনার পাটির জোরে, বিজ্ঞাং এবং অস্ত্রান্ত সবকটি অর্থ-নৈতিক দপ্তরের দললও পরোক্ষে তাঁর হাতেই এলো তবে বিধি বম—চরণ সরকার কয়েক মাসের বেশী টিকলো না। নইলে, কালোবাজারীর পসার যে আরও কতো বৃদ্ধি পেতো, তা কহনা করাও হামধ্য।

দেশবাসী বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চায় তাঁর হুজু ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রণব সুবাজী এবং বরকত গুণিবান চৌধুরী, জাতীয় অর্থনীতিক বিশেষ চালনা-করী বিত্তচক্রের সহচরী অফিসারদের চিনতে এবং স্বব্যবস্থ ব্যবস্থা নিতে, আরও কতোদিন সময় নেবেন? বেনী লেবী হলো, ঐ অফিসাররা নতুন মন্ত্রীদের ওপৰ-ও প্রভাব ফেলতে পারে বলেও অনেকে আশঙ্কা করছেন।

সৌজন্য : পানাগড় বার্তা।

কবিগুরু রসিকতা

॥ দিবাকর গোস্বামী ॥

রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয়তা সর্বজনবিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যে কৌতুকের মধ্যে দিয়ে সত্য উঠি' কি' সে' সে কৌতুক শুনে লোকে খুশী হয় না।'

শ্রোতাক মানুষের মধ্যেই একটা কৌতুকপ্রিয় মন লুকিয়ে থাকে। হাস্যরসিকের স্বসম্পর্ক আমরা অন্ধকারেও পেয়ে থাকি—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বহুার্থ।

রবীন্দ্রনাথের সর্ধভাসুখী প্রতিভার অমৃতস্রোত ছিল অক্লান্ত কৌতুকরসের ভাণ্ডার। রসিকতা করতে রবীন্দ্রনাথ খুব ভালোবাসতেন।

কবিগুরু সঙ্গ 'যাঁরা' ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা কবির অক্লান্ত প্রাণপ্রাচুর্যের পরিচয় পেয়েছিলেন। কবির রসিকতা ছিল পরিষ্কার ও মজ্জিত। কখনও তিনি উগ্র রসিকতা পছন্দ করতেন না।

তার জীবনের কিছু রসিকতার গল্প বলছি;—রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। একদিন একজন দর্শনপ্রার্থী তাঁর কাছে এসে হাজির। ভ্রমলোক এসে দেখেন রবীন্দ্রনাথ একটা শিশি থেকে ভেল হাতে নিয়ে পাত্রে মালিশ করছেন।

ভ্রমলোক মন করলেন, কবির পাত্রে বুঝি মাখ হয়েছে। এদিকে ভ্রমলোকের মনোভাব বুকে কবি হেসে কললেন—'বুড়ো হবেছি বলে মন করে। না বাতের ব্যাখ্যার ভূমি। এখানকার মশাগুলো এত

নয় যে সর্বদা পদদেবা করতে বাস্ত! ভ্রমের পথ-সেবা থেকে নিষ্কৃতি পেতেই এই ভেল মালিশ করছি।'

আর একটি মজার ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে এক গ্রামে বেড়াতে গেছেন। গ্রামবাসীরা রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাড়ি গেছেন।

তাঁরা খেতে বসে দেখেন বহুবিধ বাতনে চরা আছে খাবারের ঝালা! গৃহস্থানী ভোজনর কোন ক্রটিই রাখেন নি।

বহুটি ডিম খেতে গিয়ে দেখেন সেটি পচা। গৃহস্থানীকে ব্যাপারটা বলাও যায় না—কারণ তিনি তাহলে অপ্রস্তুত হবেন। তিনি আড়চোখে কবির বাতিতে দেওয়া ডিমটি দেখে বুঝলেন সেটিও পচা! এদিকে কবিকে স্বচ্ছন্দে আস্ত ডিমটাই খেয়ে কেলেতে দেখে বহুটি অনন্তোপায় হবে ডিমটি গলাধঃকরণ করলেন।

পরে বাড়ি ফেরার পথে বহুটি কবিকে শুধালেন—'পচা ডিমটা তুমি কি করে খেলে? পচা ডিম খেয়ে পর্যন্ত তো আমার গা বমি করছে!'

তার কথা শুনে কবি সহাস্তে জবাব দিলেন—'তুমি এ পচা ডিম খেয়েছ নাকি হে। কি সর্বনাশ! আমি তো ডিমটা খুন্সের কাছে তুলে দাড়ির জল

দিয়ে চাপকানে পাচার করে দিয়েছিলাম !—এই দেখ ডিমটা,—বলে চাপকানের ভেতর থেকে ডিমটা বের করে ফেলে দিলেন।

ব্যাপার দেখে তো বড়ু !

আর একদিনের কথা !

কবির গৃহে প্রায়ই সাহিত্যিকদের সভা বসতো। বাইরে চটিছতো ছেড়ে সবাই ঘরে এসে বসতেন। একদিন সেবা গেল এক ভহলোকের চটিছোড়া চুরি গেছে। এরপর এমনি করে রোজই কায়েনা কারো চটিছতো চুরি হতে লাগলো।

শরৎচন্দ্রও তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন এ সাহিত্যের মজলিসে যোগ দিতে। কিন্তু চটি পাড়ে চুরি যার এই ভয়ে তাঁর মনটা বাইরে পড়ে থাকতো। শরৎচন্দ্র তাই একদিন নিজের চটিছোড়া খবরের কাগজে মুড়ে সভায় এসে বসলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে কথা চেপে তিনি জিজ্ঞাস করলেন—‘শরৎ, ঐ মোড়কে কি আছে?’

‘—আজ্ঞে বই!’ শরৎচন্দ্র আমতা আমতা করে বললেন।

রবীন্দ্রনাথ সহাস্তে শুধালেন—‘কি বই?’ পাছকাপুরাণ নাকি?

শরৎচন্দ্র অপ্রস্তুতের একশেষ।

রবীন্দ্রনাথ লোককে যেমন খাওয়াতে ভালো-বাসতেন, তেমন যেতেও ভালোবাসতেন। পৌষ-পার্বণের পিঠে-পুলির তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একবার এক মহিলা বেশ ভালো পিঠে নিজ হাতে তৈরী করে রবীন্দ্রনাথকে ভেঁট দিলেন। রবীন্দ্রনাথের যাওয়া শেষ হতে ভহমহিলা জিজ্ঞাস করলেন—‘পিঠে কেমন ইচ্ছে শুকসে?’

রবীন্দ্রনাথ স্তব্ধ করে সহাস্তে বললেন—

‘লেহ কঠিন, পাথর কঠিন,

আর কঠিন ইষ্টক—

তাহার অধিক কঠিন কতো,

তেনার হাতের পিঠক!’

সকলে রবীন্দ্রনাথের এই বসিকতা শুনে হাসিতে ঘেঁটে পড়লেন। সাতটা বৃক্কে ভহমহিলাও সেই ছ দিতে যোগ দিলেন।

হাফজির পেটের ব্যাধি, অসুস্থ, জরীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রসাদ

আমলা হুত কুমারী

আমুবেলিয়া হতে তৈরী

মূল্য ৩.০০ এক কলসের কলস

ব্যক্তিগত

গ্রীষ্মবনীয়োহন চক্রবর্তী

কলিকতা কলিকতা • কলিকতা • কলিকতা • কলিকতা

রবীন্দ্র প্রশস্তি

ঐবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সুপরিসর প্রাঙ্গণে অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল কবিশুভক রবীন্দ্রনাথ স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ও স্বকীয় প্রতিভাশীল উজ্জ্বলো দেশীশ্রম্যমান ছিলেন। তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে গেছেন, বহু নূতন নূতন সম্রাট অর্ধবহু শতকে চরন ও সংযোজন করে ও তার স্বাধাধর প্রয়োগ করে। তাঁর কাব্যে, গানে, প্রবন্ধে, ছোট গল্পে, নাটকে ও উপন্যাসে এর প্রকাশ দেখা যায় চোখে চোখে। তিনি নূতন নূতন বহু চন্দ্রেরও আবিষ্কারক, তন্মধ্যে তাঁর 'অসম' চন্দ্র বাংলা কাব্যপ্রগতিতে এক নব দিগন্তের সূচনা করে। তৎকর্তৃক রচিত শাহজাহান কবিতাটি এর উজ্জল দৃষ্টান্ত, অবশ্য একরূপ আরো বহু কবিতাই তিনি তাঁর সৃষ্টি 'অসম' চন্দ্রে রচনা করে গেছেন। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে তিনি 'নোবেল' পুংস্কার পান ও নোবেল পুংস্কার পাবার পরই তাঁর স্থলবাসীর কাছে তিনি যোগ্য সম্রাট লাভ করেন। 'বিশ্ববৈজ্ঞান্য' কবি স্বীকৃত লাভের পর তিনি স্বরচিত কবিতায় ও গানে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন অজস্র-অসংখ্য অবদানে। বাংলা সাহিত্যে জোয়ার আসে তাঁর, কালেই, তিনি একাই কাব্যে, গানে, ছোট গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে ও উপন্যাসে মান্তিরে রাখেন সারাদেশ।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পের রচয়িতা ও

পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথই, পরে অবশ্য ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে বিশ্ব সাহিত্যের চেয়ে উচ্চ আসন লাভ করে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে, তাঁরই পদায় অনুসরণ করে। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত-জনগণ-মনে তাঁরই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাব্য রচনার প্রথম যুগে আমরা দেখি তাঁকে মল্লের কবি তথা প্রকৃতির কবি, যাকে ইংরাজীতে বলে 'লিরিক' পোয়েট হিসাবে, তৎপরবর্তী কালে বৈজ্ঞান্য কবি হিসাবে, এবং শেষে উপনিষদের কবি হিসাবে অর্থাৎ দার্শনিক কবি-সত্যপ্রাপ্তি স্থিতি হিসাবে। তাঁর কাব্য-সুখমা ও মাধুর্য্য মানুষকে এক অতিশ্রিত্য লোকে পৌছে দেয়। 'নিখর'ের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, উভয়ের মধ্যে, একই আকৃতি ও অনুভূতি কল্পিত ছিল। নিখর'ের বহিঃগমনের যুগে যে পাথর চাপা ছিল সেই প্রস্তর সরে যাওয়াতেই স্বপ্নায় অসংখ্য মল্লরাশির বেগবর্তী নিঃসরণ যেমন সম্ভব হয়, রবীন্দ্রনাথেরও সেইরূপ অসংখ্য কাব্যরাশি বিপুল আবেগে তাঁর প্রাণের মোহন পরশে ফুটিত হয়ে বিশ্বজনের মনোরঞ্জন করে স্বাভাবিকভাবেই।

স্বত্বকর্তৃক কাব্যের বিশাল ও ব্যাপক স্রোতধারা বিশ্বের বিশ্বয় সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ প্রকাশ ভঙ্গীর মনোহারিত্ব, যা অতীতপূর্ব ও অনাস্বাদিত ছিল এতকাল। তাঁর কাব্যে 'অনোমাটো

পেয়োটিক' শব্দের স্বাক্ষর এত মধুর ও অর্থবহক যে তা পাঠক মনে মোহ বিস্তার করে। যেমন 'গগনে গরজে মেঘবন বরষা' অথবা গীতাঞ্জলির 'উড়লি উঠে কলরোনানদীর কূলে কূলে' ইত্যাদি। জীবন সেবতার উদ্দেশ্যে রচিত গীতাঞ্জলি কবিকে অমর করে রাখে। তাঁর কাব্যধারা অমররূপ করলে দেখা যাবে যে, এ জীবন দেবতাকে নিয়েই তাঁর আনাগোনা সকল সফল ক্ষেত্রেই। জীবন সেবতার সম্বন্ধে সমাক্ষারণ না থাকলে বিশ্বকবি'র কাব্য সুবদ্য উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব। তাঁর রচিত সুমধুর কাব্য-রসমুখ্য পান করার অধিকার সবাই অর্জন করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু তাঁর গানে বিশ্বত্বন পাগল বোধ হয়, তাই তাঁর গানের আসর সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত বিপুল আকারে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচলন এত অধিক যে, আগেকার দিনের মার্গে সঙ্গীত অর্থাৎ বাগ প্রধান গ্রন্থ, বেহাল, টগা, ঠংরী প্রভৃতি গানের আসরের চেয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরের চড়াফড়ি প্রায় সর্বত্র। কবির জন্মদিনে পটিনে বৈশাখে কবির কাব্য, নাটক, ছোটগল্প, উপহাস ও প্রবন্ধ পাঠের পরিবর্তে দেখা যায় গানের কদরই বেশী। আজিকার বাঙালী মানস কবির গুরুগম্ভীর কাব্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেয়ে, তাঁর ছোটগল্পের রস, আনন্দের চেয়ে, তাঁর প্রবন্ধের উপকারিতা ও মনোহারিত্বের চেয়ে, তাঁর উপহাসের নাহক নাহিকার মনোবিল্লেক্ষণের চেয়ে, তাঁর গানের চর্চা ও রবীন্দ্র সঙ্গীত সাধনার বেশী আনন্দ উপভোগ করে। তবে কি কবি গুরু এ সব গুরু-গম্ভীর সাহিত্য সৃষ্টি ব্যর্থ হবে? না তা কখনই হবে না। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সাধকগণ, গবেষকগণ ও নিষ্ঠাবান পড়ুয়া নিশ্চয় রবীন্দ্র সাহিত্যের গবেষণায় ও তাঁর অমৃতরসের সন্ধানে যুগ

যুগ ধরে তাঁর সৃষ্ট কাব্য, গান, প্রবন্ধ, নাটক, ছোট গল্প ও উপহাসের পাঠোচ্চাষে ও তাঁর সমালোচনার বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন। রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনার নতুন ভাবধারা প্রবর্তন করেন। এদেশের বিখ্যাত নাট্যকার 'মোঁটার লিথ' তাঁর 'সু বার্ড' নাটকে রূপক নাটকের নতুন প্রকাশ-ভঙ্গির অবতারণা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রচেষ্টাকে সার্থকরূপ দেবার আশায় এ ধরণের রূপক নাটক লেখেন।

যেমন 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন' 'রাজারানী' প্রভৃতি। নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়, আর এ সব নাটক যখন মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ও তৎ সঙ্গীতায় কর্তৃক অভিনীত হয় তখন এক বিশেষ আলোড়ন পড়ে যায় শুধু বাংলার নয়, ভারতের সর্বত্র। নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়তার সর্বোচ্চ শিখরে স্থান লাভ করেন। নাটকে এই নবধারার প্রবর্তন তাঁরই সৃষ্টি য় বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। গল্প কবিতায় বাংলা-সাহিত্যে যে নৈপুণ্য তিনি দেখিয়েছেন তা অনবত্ত। তাঁর পূর্বে এক মাস্টার্স মধুসূদনের অমৃতাক্ষের হাতে কাব্য রচনা-বাগ দিলে, গল্প কবিতায় তাঁর অপূর্ব লেখনী সমালান মতাই বিস্ময়কর ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে অবগত গল্প প্রচলন রবীন্দ্রনাথেরও অনেক আগে। রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী অমির চক্রবর্তীকে গল্প কবিতায় দক্ষতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানদিকারী বঙ্গীকার করা যায়। 'মহা' ও 'লিপিকার' কবি যে গদ্য কবিতার উৎকর্ষমূলক রচনাভঙ্গীর অবতারণা করেছেন তা বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ সৃষ্টিকে অব্যাহত রেখেছে। একাধারে সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে এত অধিক পরিমাণে অসামান্য অবদান

রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক রবীন্দ্রনাথ 'সত্যতার সংকট' 'ব্যবেশ ও সাহিত্য' প্রভৃতি রচনা করে বশবী হয়েছেন। প্রভাবান্বী রচনাবণ্ড তাঁর সমকক খুঁজে পাওয়া যায়না। সাহিত্যের প্রতিটি শাখার তাঁর বলিষ্ঠ রচনাসম্ভার কালজয়ী ও কলমবুদ্ধ এবং তা বিধ মানবকে আকৃষ্ট করেছে এমন বিপুলভাবে যে, তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি বিশ্বের হস্তিনাটি ভাষার অন্তর্গত হয়েছে। বর্তমান যুগের রবী রচনাবলী পাঠ ও গবেষণা করায় ক্ষুদ্র বিশেষ ব্যবস্থা নিবেছেতব্যাকার সরকার ও বিন্দু সমাজ। সারা তিনি সর্বজন স্বীকৃত মনীষি ৯-বি-শ্যান্তিতে পূজ্য। তাঁর 'নাইট' উপাধি ভাগ্য এক বিগাষ ঘটনা। ১৯১৯ সালে কলকাতা ইংরাজ নিরস্ত্র ভারতবাসী উপর জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালিয়ে বহু ভারতীয়কে অঘণা হত্যা করে, সৈন্যসহ ও ভরারের নেতৃত্ব ও ক্ষম্যে। এরই প্রতিবাদে রাজনৈতিক সংগ্রহবহীন রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের দেওয়া উপাধি পরিত্যাগ করেন, স্বদেশ-বাসীর অক্লান্ত মর্ষণা রাখতে। চারিত্রিক দৃষ্টান্ত তিনি ছিলেন হিমালয়ের মত সুউচ্চ। তাঁর স্বদেশী গানও সে যুগে দেশপুরুষের আশেষ প্রেরণা ভূগিয়েছিল। মহাত্মাজীকে তিনিই প্রথম মহাত্মন বলে শাস্তিনিকেতনে সম্বোধন করেন, আর গান্ধীজি তাঁকে গুরুদেব বলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। হিন্দু স্বাধ্ব্যনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি এক ঐতি-হাসিক দলিল এবং তা চিরস্মরণীয় হবে থাকবে ভারতীয়দের কাছে ও ইংরাজ জাতির কাছে। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিতে অংশ না নিয়েও স্বজাতির ও স্বদেশের অস্ত্র উসসদীকৃত প্রাণ বলে বিবেচিত হন। তাঁর রচিত গান 'বহি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। তবে একলা চলবে - গান্ধীজিকে এক

অতৃপ্ত প্রেরণা ভূগিয়েছিল।

গান্ধীজি ভাণ্ডি অভিভাবের সময়ে এ গান গাইতে গাইতে একাই প্রথমে অগ্রসরমান হন, পরে প্রায় গান্ধী-জি হাঙ্কার সাধারণ মানুষ তাঁর অঙ্গগামী হয়। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে কি গান্ধীর অঙ্কার চোখে দেখতেন তা জানা যায় নি এক এন্ড্রু জ-এর সঙ্গে কবির কথাবার্তা থেকে। কবি বলছেন এন্ড্রু জ সাহেবকে যে, তাঁর আত্মক্লিষ্ট পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে ভারতে, তিনি তাঁর (গান্ধীজির) উপদেশ মত গান্ধী পদপ্রান্তে বসে বাকী জীবনটা তাঁর আদেশ মত চালাতে প্রস্তুত। (রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বইয়ে পাবেন) গান্ধীজি কিন্তু মহান বিশ্বকবিতে রাজনীতিতে অংশ নিতে সেননি, কারণ কবির অমর লেখনীকে শুদ্ধ করে দিয়ে তাঁর সৃষ্টিধর্মী রচনা সম্ভারের পরিময়ান্তি তিনি কামনা করেন নি। জাতীয় কবি বা জাতীয়তার কবি বলতে গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকেই স্বীকার করতেন। জাতীয় জীবনের উত্থান পতনের অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং, তাই তিনি অত্যন্ত কোত্তের সঙ্গে লিখেছিলেন 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুখ জননী। রেবেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি' আবার প্রেরণা দিয়েছেন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনিই রাখি বন্ধনের পরামর্শ দিয়েছিলেন সেদিন। গানও লিখেছিলেন 'বাংলার মাটি বাংলার মল পুণ্য হউক হে ভগবান। বাঙ্গালীর ঘরে বস ভাইবোন এক হইক এক হউক এক হউক হে ভগবান' প্রকৃতি উচ্চ সুরের রচনা মাধ্যমে। বাংলার তথা ভারতের জাতীয় সংগ্রামের কঠিন কঠোর দিনগুলিতে কবির কাছে আমরা যে প্রেরণা ও সাহস সঞ্চয় করেছি তা অকিঞ্চিৎকর নয়, বরং বিশেষভাবে তা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী

ভারতে তিনি জন্মেছিলেন ও পরবর্তী ভাবেই তিনি ১৯৪১ সালে ৭ই আগস্ট দেহত্যাগ করেন, (২২শে আশ্বিন ১৩৪২ সাল) কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার নুতন ও বিশেষভাবে আনার জন্য তিনি আশ্রয় চেষ্টা করেন, 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক বিদ্যালয়' স্থাপন করে। তাঁর এই চিন্তাধারাকে গান্ধিজিও সমর্থন করেন, কারণ গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশের তৈরী বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা তখন দেওয়া হ'ত তা মনোহর উন্নীত হওয়ার পথ প্রদর্শন করত না। অপরদিকে এ শিক্ষা দেশবাসীকে পরামুগ্ধ ও পরমবিশ্বাসী করার পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করত। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে প্রকার শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা করেন তা তৎকালে বেশ ব্যয় সাধ্য ব্যাপার ছিল। ফলে তাঁকে এ বিদ্যালয় সঠিক পথে পরিচালিত করতে অর্থের জন্য সতাই চিন্তাচিন্তিত থাকতে হত। তবুও অশেষ ক্রেশ্ন স্বীকার করে তিনি এ বিদ্যালয় চালু রাখতে সক্ষম হন, স্বীয় অধ্যবসায় ও বিশেষ কর্ম প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। আজ 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের আমুক্যলো। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের নিজে পড়িয়েছেন বহুদিন। তিনি 'জাতীয় শিক্ষকের কার্যে ত্রুটি' ছিলেন পরবর্তী ভাবে। দেশ-বিশেষে শিক্ষার ক্রম নিয়ে তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল শান্তিনিকেতনের ফলস্বরূপ। তাঁর বচনিত প্রেক্ষার ফলস্বরূপ টাকা এ শান্তিনিকেতনের ফলস্বরূপ ব্যয় হয়েছে বহুলাংশে। জাতীয় শিক্ষার বিস্তারের ফলস্বরূপ তাঁর এই প্রচেষ্টা সত্যিই বিফলকর। গীতাঞ্জলি কাব্যপ্রেক্ষার ফলস্বরূপ তিনি পুরস্কৃত হলেও তাঁর বচনিত 'কলাক' প্রকল্পই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়, কারণ

তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ 'কলাক' ভেই পরিপূর্ণমান বলে পণ্ডিতেরা মন্তব্য করেন। উপস্থানের মধ্যে 'শেখের কবিতা'ই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে, যদিও 'ঘরে বাইরে', 'গোরা' 'নৌকাডুবি', 'যোগাযোগ' প্রকৃতি আরো অনেক উপস্থান তিনি রচনা করে গেছেন। নাটকের মধ্যে 'মুক্তধারা' বোধহয় যুগোপযোগী ও নুতন চিন্তার ধারক ও বাহক। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কোন একজন কবি সাহিত্যিক এত অধিক পরিমাণে রচয়িতা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উপহার দিতে সক্ষম হননি রবীন্দ্রনাথের মত।

কবিতারই এ বিষয়ে শীর্ষ স্থানীয়, তাঁর সমকক্ষ মেলা ভার। তিনি অন্যতম প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর প্রতিটি রচনায়। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল সুপ্রাচীন, তাই তিনি রচনা করেছিলেন 'আজি হতে শতবর্ষ পরে কে হুমি পড়িছ বসি আমার এ কবিতাখানি কোতুলল ভবে/আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' তিনি তাঁর প্রতিভাশীল লেখনী সকলেন করে গেছেন প্রায় সব কয়টি বিষয়েই, যা মানব জীবনে অপরিহার্য ও আমুগ্ধকর, তাই প্রতি পদে পদে তাঁর প্রভাব বোধ করি আজও। সাহিত্যের প্রকৃতিপাল হয়েও, যশের শিবরে আরোহণ করেও, তিনি নব নব চিন্তায় ও তা কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট থাকতেন। অকুরণ প্রাণশক্তি, যৌবনোচিত কর্মো-স্থাননা ও অসাধারণ স্বী শক্তি নিয়ে তিনি ধারার ধূলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আর সেই স্বাক্ষরই তিনি রেখে গেছেন দেশবাসীর কলাগ চিন্তায়। শেষ বয়সে প্রথিতযশা কবি-নাট্যকার-সাহিত্যিক তাঁর লেখনীর সাথে সাথে তুলি সকলনেরও কাজ আরম্ভ করেন। অতনু বিজ্ঞান যে তিনি এত পারদর্শী তা

রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের মুক্তিচিন্তা

॥ মলয় বোষ ॥

‘তুমি দেশকে ভালোবাসো, তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পারো কিনা।’ ‘মাতৈঃ’ প্রবন্ধে একজন রবীন্দ্রনাথ তাঁর যশেবাসীকে এই অতিপরীক্ষার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিশেষ শতাব্দীর শুরুতে স্বামীজীও একদিন বাঙালীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—নিবীৰ্ণতা আধ্যাত্মিকতা নহে। তমোগুণ সত্ত্বগুণ দুই আঙ্গ পরিহার্য—ভারতে স্বজ্ঞা-জ্ঞানের চর্চায় প্রয়োজন।’ ত্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠনের জন্য এই দুই মহাপুরুষের দৃষ্ট দৃমিকা স্বাধীনতা। সংগ্রামে বাঙালীকে পথ দেখিয়েছে।

রবীন্দ্র রচনায় মানুষ ও মানুষের মুক্তি-প্রয়াস বারবার প্রথম পংক্তিতে স্থান পেয়েছে। মানুষের যে সর্বাঙ্গীন মুক্তি তাঁর অধিকাংশ রচনার মূল উপাদান ছিল—বিশেষী শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ অসহায় ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন ও সংস্কার তাঁর ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। ইতিহাসের যে সংকটকালে তাঁর জন্ম, দিনবাশন ও পরিণতি তাতে সামগ্রিকভাবে একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে পরাধীন জাতির আত্মজানি তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন ও তাঁর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন; আবার কখনও বিস্তৃত রোমাঞ্চিকতার আশ্রয় নিয়ে তিনি আকাশবিহারী কল্পনাবাসীতার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রধানত: রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন কবি। তাই বেশসত্ত ও কালগত অসংখ্য অবিচার, অজ্ঞান ও সামাজিক সমস্যা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিলেও

অনুকৃতির প্রকাশের ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য থাকে যথার্থিক। ‘তাই, রাষ্ট্র-নৈতিক ও সামাজিক প্রপ্তে তাঁর সোচ্চার লেখনী জীবনের খুব কাছাকাছি এসেও ভাববাদি মননে কখনো কখনো মানুষকে ছুঁতে সচিব্যে দেখে।

মানুষের আকাংক্ষিত ‘মুক্তি’কে ভাববিলাসী রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ‘ফ্রিডম’ হিসাবে দেখেন নি, তাঁর মুক্তিচিন্তনা সাময়িকভাবে বিশেষীশক্তির বন্ধন-ছেদনকে অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হয়েছে এক বিশালতর পরিপ্রেক্ষিতে। সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করে যে স্বাধীনতালভ—‘সে মুক্তি চকল, দুর্দল, ভীক, তাহা পদ্বিত, তাহা নিষ্ঠুর—তাহা পবের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করেনা; এবং দস্তা-কেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলি অজ্ঞকে আঘাত করে, এই জন্ত অস্তর আঘাতের ভয়ে’ রাজিদিন বর্ষে-চর্ষে, অগ্রে স্ত্রে কটকিত হইয়া বসিয়া থাকে—তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে—এই ফ্রিডমের চেয়ে উন্নততর বিশাল-তর যে মহত্ব—যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্কার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি - তবে ভারতবর্ষের নয় চরণের ধূলি-কাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুহূট পবিত্র হইবে।’

এই বৃহত্তর মানবিক মুক্তিই ছিল তাঁর আদর্শ; গান্ধীজীও সামগ্রিক মুক্তির কথা চিন্তা করতেন। উপনিষদকে ভিত্তি করে এই সার্বিক মুক্তির আদর্শ

পড়ে উঠেছিল উক্ত মহাপুরুষের স্বদেশে ভাবনার।
আজ্ঞার মুক্তিলাভ ও ব্যুত্থি এখানে মূল লক্ষ্য—
রাষ্ট্রিক পরাধীনতা মুক্তি উপলক্ষ্য মাত্র। কারণ,
আজ্ঞার বিকাশ ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের উজ্জীবন ছাড়া
কোন দেশ বা রাষ্ট্র সমাজতাকে মুক্তিলাভ করতে
পারেনা। বৈদেশিক সমাজবাদের সঙ্গে এখানেই
তার চিন্তার মূলগত প্রভেদ। সমাজবাদে মানুষের
উপর বর্তমান অজ্ঞার ও অবিচারকে ছোট করে দেখা
হয়েছে—কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনাকে সম্পূর্ণ অন্ধকার
করা হয়েছে। এতে মানুষের মূল্য বাড়েনি, বরং
ক্ষয় হয়েছে। যেহেতু মানুষ পশু নয়—তার ক্ষুদ্র
স্বার্থবোধ ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়াসটি তার মুক্তি-
লাভের প্রধান উদ্দেশ্য নয়; প্রধান উদ্দেশ্য হলো।
অজ্ঞার ন্যায়বোধে তার মনুষ্যত্বকে স্বীকার করা—
বিশাল বিশ্বের অল্প পরমানুষের সঙ্গে তার একাত্মতাকে
সম্মান দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের মুক্তি চেতনা ছিল এই
বিরাটেরই অনুসারী। তার আদর্শ মানুষ সেই
মানবধর্মে বিশ্বাসি যেখানে মানুষের অহং ঢাকা পড়ে
যায় তার পারিপার্শ্বিকের বিশালতায়—আরও অসংখ্য
মানুষের চেতনপ্রজ্ঞার নিজেকে মিলিয়ে দেবার মধ্যে।
বঙ্গবাসী সমাজধার তার দীর্ঘ কাল পরিক্রমা অস্তে
আজ নতুনভাবে এই বৃহত্তর মানবসাধর্মের দিকে
মোড় নিয়েছে।

রাষ্ট্র স্বাধীন হলেই যে রাষ্ট্রায়ত্ন মানুষ স্বাধীন
হবে এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল না এবং রাষ্ট্রিক
স্বাধীনতার চেয়ে তিনি সমাজ সংস্কারকেই অধিকতর
গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু সামাজিক সংস্কার ও অসাম্য
থেকে মুক্তি লাভের জন্য মানুষের সংগ্রামের প্রয়ো-
জনীয়তাকেও তিনি অস্বীকার করেননি। আর
যেহেতু এর সঙ্গেই জড়িত ছিল বিদেশী শক্তির
শোষণ কুশাসন ও নৈতিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে

জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রটি—তাই স্বদেশী
আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসী
সক্রিয় হুমিকা নিবেছেন। বঙ্গ-বিভাগকে কেন্দ্র
করে বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়,
যাকে প্রকৃত অর্থে ‘বিদ্রোহ’ বলা যায় (যেহেতু
অতীতের সঙ্গে পত্রপত্রগত সম্পর্ক ছিন্ন করে যে
আন্দোলন, তাকেই বিদ্রোহ বলে) সেই সম্বন্ধিত
প্রতিরোধ সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণীর হুমিকা
নিবেছিলেন। ‘স্বাধীনতা’ উৎসবের সূচনা সমগ্র
বাঙালী জাতিকে একমুখে বাঁধার প্রকরণ রচনারই
নামান্তর বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে তিনি বললেন—
‘বিচ্ছেদের চেয়েভেই আমাদের একাত্মকৃতি বিগুণ
করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র
ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব।’
কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই সময়
যে উৎকট স্বদেশভাবের জোয়ার আসে তাতে
রবীন্দ্রনাথ সায় দিতে পারেননি। কারণ তার মতে
আমিষিক ‘নেশন’ বর্ধিত হইবে, কিন্তু ‘বিশ্ব’
নকলে নহে’ যে স্বদেশিকতা স্বদেশের স্বার্থতত্ত্বের
উর্ধ্বে উঠতে পারে না—মনুষ্যের ধর্ম যেখানে
অবহেলিত হয়, তাতে জাতি অধবা দেশের সামগ্রিক
মঙ্গল আসতে পারে না। তার অমোঘ
ভবিষ্যদ্বাণী—‘মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ক্রাশনালত
বিকাইয়া দেয়, তবে ক্রাশনালতের মঙ্গলকেও একদিন
যাক্ষিপত স্বার্থ বিকসিত্তে আরম্ভ করিবে’—বর্তমান
যুগ ও কালের পরিশ্রমিক্তে আঞ্চলিকভাবে সত্য।

তদু দেশের মনকে স্বদেশিকতা ও জাতিপ্রেমে
উৎসাহিত করার মানসে স্বদেশিক রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি
সংগ্রামে মানুষের সঙ্গে থেকেছেন—নিরন্তর উৎসাহ
দিয়েছেন কর্মে ও ত্যাগে। অজ্ঞার প্রতিবাদ
জ্ঞাপনে। আলিয়ান্ডরলাবাণের হত্যাকাণ্ডের প্রতি-

বাঁধে তিনি অন্যায়সে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন :
 হিমালীর বন্দীশিখিরে রাজকন্যা-হত্যার প্রতিবাদে
 লিখলেন 'প্রব্র' কবিতা—জিটীশ বরভার বিরুদ্ধে
 মানুষের ভস্মবানকে নালিশ জানিয়ে; 'সিরাঙ্গী-উৎসব'
 কবিতায় তিনি ফুলে বরলেন হিন্দু জাতীয়তাবোধ
 ও অন্ধ ও হিন্দু-সাম্রাজ্য গঠনের মৌরবময় ইতিহাস।
 'অদেশী সমাজ' প্রবন্ধে দিলেন গ্রাম সেবা ও সমাজ-
 সংস্কারের নিষ্ঠুত তালিকা যা' বহুলাংশে গান্ধীজীর
 গ্রাম চিন্তার অন্তর্গত। দেশের সর্বস্তরের মানুষকে
 মানুষ হিসাবে দেখার ও মানুষের সম্মান দেওয়ার
 কথা কবি নানাভাবে প্রচার করলেন দেশবাসী—ও
 বিদেশী শাসকের কাছে। কিন্তু সবার ওপরে ছিল
 তাঁর নান্দনিক মানব-ভাবনা—যে দেশ কাল ও
 সমাজের বহু উর্ধ্বে উঠে মানুষকে নিয়ে যায় পূর্ণতার
 দিকে, পরমের দিকে। সংগ কল্যাণের জন্ত মিলিত
 কর্মের মাধ্যমে মানুষের যে মুক্তি সাধনা তারই
 জয়গান গেয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ—আর মানুষের
 মানব ধর্মে আত্মা রেখে তার ওপর অত্যাচারে অবিচার
 ও শোষণের সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছেন মানুষ
 রবীন্দ্রনাথ। অগণতান্ত্রিক অমানুষের বিরুদ্ধে সংগ
 বন্ধ মানুষের আন্দোলনের শরীক হয়ে কবি যেমন
 পথ চলেছেন তেমনি আবার পথ চলতি মানুষকে
 স্তনিয়েছেন আরও এক বৃহত্তর মুক্তির বেদগান,
 বেধানে—'আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার
 মধোই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র
 আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা' সেই পরমাত্মার
 অনুসন্ধানই রবীন্দ্রনাথের মানব মুক্তি-চিন্তার মূল
 উপজীব্য।

(২১ পাতার পরের অংশ)

ফরাসী শিল্পী ও কলা বসিকরাই প্রথমে আবিষ্কার
 করেন। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে অঙ্কিত ছবি যা মলিত
 কলার অন্তর্ভুক্ত এবং যা বিলাতি 'কিউবিক' আর্টের
 পর্যায়ে পড়ে তা এদেশ বাসী সর্বপ্রথমে স্বীকার না
 করলেও পরিশেষে এদেশের বহু মাসিক পত্রিকায়
 তাঁর অতনু বিচার পরিচয় পাই, বিশেষ করে
 'প্রবাসী', 'বিক্রম' ইত্যাদিতে। কবি শেখ জীবনে
 অন্তরের উপর বেশ জোর দেন এবং এ অঙ্কিত ছবি
 গুলি এদেশে ও বিদেশে দারুণ সমাদর লাভ করে
 কবির জীবদ্দশাতেই। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে যে
 দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, তাকে তিনি ব্যক্ত করে
 গেছেন তাঁর অজস্র গানে। তাঁর গান 'কেনরে
 এই দুয়ারটুকু গার হতে মশরু/এই দিকে ভোর
 ভরসা বত এই দিকে ভোর ভয়/জয় অজানার জয়
 ইত্যাদি উপনিষদের বাখ্যায় ভরপুর। তিনি
 উপনিষদের শাস্ত্রবাহিনীকে এমন সুমধুর ভঙ্গি ও গানে
 রূপায়িত করে পরিবেশন করে গেছেন যা সত্যই
 মনোহর ও পরম তৃপ্তিদায়ক মানব জীবনের আদার
 প্রমাণে। পরম পিতার সন্ধান আমরা ও সেই
 সুবাদেই পরস্পর আমরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে
 আবদ্ধ—এই বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের চিন্তা-ভাবনার কথা
 রবীন্দ্রনাথই তাঁর স্বদেশ বাসীকে ও বিশ্বজনকে
 স্তনিয়ে ছিলেন। তিনি জাতীয়তার ক্ষুদ্র গণ্ডী
 পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতা বাসের কথা বলেন ও সেই
 পথেই নিজে চলেন।

RgedNo. R. N. 24511/71

Dipdahi Bangla

Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—সতাক ১৫.০০ টাকা

Phone : 34-1795

বার্ষিক :—৮.০০ টাকা

মূল্য—৫০ পয়সা

With Best Compliments of :

c/30

The

Peerless General Finance & Investment Co. Limited

ESTD. 1932

Registered Office : "PEERLESS BHAVAN"

3, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-700 069

More than 100% of the Company's Liability to its certificate-holders
are kept invested in Government Securities & in Fixed Deposits
with Nationalised Banks.



বার্ষিক বন্ডনী —

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল (পাবলিক) লিমিটেডের নবী, প্রিন্স চ্যাটার্জী

সম্পাদক—শ্রীমতি শরণ চাকরোবুরী

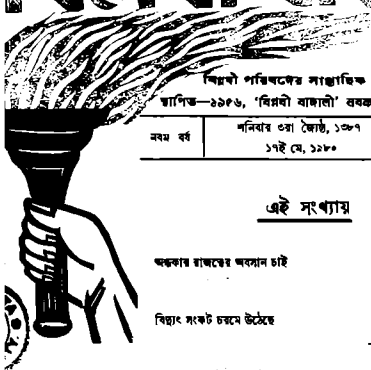
প্রিন্টার—শ্রীমতি মুন্সি—ইন্ডিয়ান প্রেস। বেকার—ইন্ডিয়ান প্রেস।

প্রকাশক—শ্রীমতি মুন্সি :—ইন্ডিয়ান প্রেস। প্রচারক—ইন্ডিয়ান প্রেস।

বিতরণী—শ্রীমতি কার্ভার :—৫০০ বাক্সের ১০০ টি, কলিকাতা-৭০০০০০

১৯৭১-৭২ সালের ১০০ টি, কলিকাতা-৭০০০০০

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক সুবপত্র
 স্থাপিত—১৯৪৬, 'বিপ্লবী বাংলা' ব্যবসায়িক—১৯৭১

নবম বর্ষ	শনিবার ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ ১৭ই মে, ১৯৮০	৩৪ সংখ্যা
----------	--	-----------

এই সংখ্যায়

অন্ধকার রাজত্বের অবসান চাই

—সম্পাদকীয়

বিদ্রোহ সংকট চক্রে উঠেছে

—কালীন্দ্র সরকার

বিপ্লবী জনাৰ্ঘন চক্রবর্তী

আমাদের সভ্যতা কখনো হবে

—নিজস্ব সংবাদদাতা

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—কীর্ত্তন দত্ত

রাষ্ট্রভুক্ত হুইয়েননাবের নৃত্যিকথা

—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মোর দুর্ভাগা দেশ

ঘাসের করেছ অপমান,

মানে হতে হবে,

ভাবের সবার সমান।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—MIDNAPUR			
Das Adhikari Smt Tilottama w/o Late Ishan Ch. Das Adhikari	P. O. & Vill Gokulnagar	200	27 11 78
Mahata Paresb	P. O. Thakurthan Bankethi Vill Rajabesha	200	15 8 72
Maity Bidhu Bhusan	Vill Chandipur, P.O. Lakehya	100	30 3 74
Maity Smt Matangini w/o Late Gagan Ch. Maity	Vill Sarsa, P. O. Dakshin Dauki	100	31 3 74
Ray Sanatan Ex-Andaman political prisoner	C/o Ram Chandra Banerjee Chirimarsal, P. O. Midnapur	500	1 10 78
Samanja Smt Labangalata w/o Late Narendra Nath	P. O. Palibishnupur	100	15 8 72
Dist—NADIA			
Chowdhury Smt Charu Bala w/o Late Priyanath Chowdhury Shyam Sarabini Vajari	Paschim Mayapur Road, South P. O. Nabadwip	200	25 5 79
Goswami Smt Nani Bala w/o Late Rasaraj Goswami	Pasehm Mayapur, Nutan Bazar para P. O. Nabadwip	150	15 5 79
Moltra Smt Suchalata w/o Late Sailaswar Moitra	109, Naara Colony P. O. Naara Colony	160 200	30 9 76 9 3 78
Nanban Smt Tarulata w/o Late Rishipada Nanda	P. O. & Vill Dharsmananda	150 100	10 3 78 23 12 77

(Continued on 3rd cover)

অন্ধকার রাজত্বের অবসান চাই

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খারাপ হতে হতে আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যে এখনই এর প্রতিকার না করা হলে গোটা রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। এই শোচনীয় পরিস্থিতির মৌল কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দুইটি প্রধান কারণের দিকে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। এই সমস্যার গুরুত্ব প্রথম থেকেই বামফ্রন্ট সরকার অনুভব করতে পারেন নি। প্রথম দিকে সমস্ত লোক পূর্বতন সরকারের ঘাড় চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট হননি। এমন কি ‘ভাল্লভদেব বেল’ এর মত ম্যাজিকের সাহায্যে সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন বলে একটা আশ-ভুতির ভাবও দেখিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা উৎপাদন কেন্দ্রে কর্মরত ইউনিয়নগুলির মধ্যে দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির এমন কাজের প্রচেষ্টা দিয়েছিলেন, যার ফলে দলানলি, কর্তব্যাকর্মে অবহেলা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ মারাত্মক হ্রাস ঘটিত হয়েছিল এবং নিকট ভবিষ্যতে অত্যাবশ্যক প্রতিকার করা না হলে, আরো ভীষণতর রূপ নেবে। কিন্তু দুইয়ের কথা, এই মারাত্মক পরিস্থিতি নিয়ে কোন উৎসাহ ও তুচ্ছতা কোথায়ও দেখা যাচ্ছে না। দলীও কোন কোন নেতা এমন অদ্ভুত কথাও বলছেন যে অত্যন্ত যোগ্য হলে বিদ্যুৎ-বিভাগের ভার আছে এবং সরকার নাকি সব রকম সম্ভবপর ব্যবস্থা নিচ্ছেন, জন সাধারণ নাকি এটা বুঝতে পেরে নীরবে বিদ্যুৎএর অভাবজনিত দুঃখ-কষ্ট নীরবে সহ্য করছেন। কোন সূত্রে এই দলনেতা এমন মূল্যবান শুভা সংগ্রহ করলেন, সেটা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। বহুলোক যে এই প্রকার মন্তব্যকে একটা বিরাট ঠাণ্ডা বলে মনে করেন, জনমত যাচাই করলে, সেটা সহজেই প্রমাণিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যদি দাইস থাকে তবে একবার জনমত যাচাই করে দেখুন না এই প্রকার প্রসঙ্গভূত উক্তিরা কি জীবন দেয় জন-সাধারণ।

যেটা সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ ঘটছে সেটা হল বর্তমান সরকার ও সরকার গঠনকারী দলগুলি এই দুবিসহ সমস্যার মৌল কারণগুলি সঠিকভাবে সমীক্ষা করছেন না এবং যথাযথভাবে সমাধানের প্রচেষ্টাও করছেন না, অথবা জেনেওনেও কুমার অব্যবস্থা ঐদারীয়া দেখাচ্ছেন। বামফ্রন্ট কমিটিতে বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে দুই শকটিও কেউ করছেন না যদিও অল্প দিনটি বিভাগের কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা করছেন। একটি বিখ্যাত কলেজের সংবাদ যে কয়েকজন মন্ত্রীর অভিমত হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি নানা দল ও বিভাগীয় কর্মীদের মধ্যে মনোমালিন্য বর্তমান বিদ্যুৎ

সঙ্কটের অস্ত্রতম প্রধান কারণ। তারা এটাও মনে করেন যে জামমতীকে এই বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলার দায়িত্ব দিলে, যথেষ্ট সুফল পাওয়া যেতে পারে। বেড়ালের গলায় কে বটা বাঁধাবে, এটাই নাকি সমস্যা। জ্যোতিষাবু বিদ্বাংমতী, তার কাছে এই প্রশ্নাব রাখতে নাকি কেউ সাহসী হচ্ছেন না। এ মন্তব্য সত্য হলে, এটা শু পৃথিবীর অষ্টমাস্তর্থা বলে পরিগণিত হবে। বিদ্বাংমতীর মর্যাদাকে দেশের স্বার্থের উপরে স্থান দিতে হবে। এই কি বামফ্রন্ট সরকারের দল সর্বাত্মক বিপ্লব ঘটাবার নমুনা? কলকারখানা, কৃষিকর্ম ব্যাহত, পানীয় জল সরবরাহের মানুষের জীবন বিপন্ন, হাজার হাজার লোক বেকার, নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সূত্রপন্ন হত। অথচ দলীয় জনৈক নেতার উদ্দেশ্যে কথা বলব না, দেশের চরম সর্বনাশকে আত্মোপাশের মত দেশের স্বার্থকে বিবেচনা করে দেশের মানুষকে টুটি চেপে ধরে মেরে ফেলা হবে, এই কি দেশসেবার নমুনা? অথচ যে সব স্বর্গীকদল এই সরকারের মধ্যে আছেন, তারাও কিছু করেন না। ভীতগ্রস্ত হয়েই। এতে করে সকল দলেই ভাবমূর্তি যে অপূরণীয়ভাবে যিনষ্ট হচ্ছে, এটাও তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তারা কি মনে করছেন After them, the deluge। ছুটি চারটি মহলীওলাভ এবং কয়েকজন দলীয় কর্মীও এম, এল, এ ইণ্ডাস্ট্রাই এদের রাজনীতির চরম আদর্শ? মুখে মুখে প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকৃত জনদরদী হওয়া যায় না। এই সহজ সরল সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার মত বুদ্ধিও কি তাদের অবশিষ্ট নেই। সে যা হোক, তারা তাদের বিচার-বুদ্ধি মত কাজ করে নিজেদের পতন যদি অশুভস্থাবী করতে চান, তা করবার স্বাধীনতা তাদের নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এই সর্বনাশ ঘটাবার অধিকার কোন দল বা গোষ্ঠির থাকতে পারে না। এরা এখনও কিছু না করলে, নিজেদের সর্বনাশ জনসাধারণকেই রুখেতে হবে। এটা গণতান্ত্রিক দেশ, এদেশের মানুষের ভাগ্য কারো হাতে মৌরসী পাট্টা দিয়ে সমর্পণ করেনি। নির্বাচনে তারা ভূযোগ দেয় বিভিন্ন দলকে জন কল্যাণ সাধন করতে। অসমর্থ হলে তাদের রাজ্য দেখিয়ে দিতেও কপুরু করে না, সংঘবদ্ধ হয়ে শাস্তিপূর্ণ উপায়ে সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। তবে শাসকদল যদি নিরবিকল্পিতভাবে জনস্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকে, তবে জনতার রক্তরোধ সব সময় নিরমলভিত্তিক পথে নাও চলতে পারে। এ কথা স্মরণে রাখলে প্রশাসক দলেরও মঙ্গল, দেশবাসীরও মঙ্গল। মানুষ চায় অবিলম্বে এই অন্ধকারপূর্ণ রাজত্বের অবসান।

বিদ্যুৎ সংকট চরমে উঠেছে

॥ কালীপদ সরকার ॥



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সব চেয়ে বড় সমস্যা কি ? এ প্রশ্নের জবাবে সকলে একবাক্যে বলবেন—বিদ্যুৎ সংকট। বর্তমান কালে বিদ্যুৎ কেবল মহর-জীবনেই অত্যাবশ্যক এমন নয়, বিদ্যুৎ শিল্প, কৃষি এবং পরিবহনেরও পরিচালন-শক্তি। এভাবে দেখে কান্দে বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প আছে ২৩,৫১০, আছে কমলাখনিতে বিদ্যুতের অপরিসীম প্রয়োজন। এক কথায় বলা যায়, এখানে জীবন একান্তভাবে বিদ্যুৎ নির্ভর।

বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান করে উঠতে পারেন নি, তবে পায়খেন তার কোন ঠিকানা নেই। তবে জনসাধারণ এই ক্রমবর্ধমান দুর্ভোগ থেকে মুক্তি চান এবং জানতে চান, বিদ্যুৎ সংকটের জন্ত কী করা যায়। সরকার প্রথমতঃ বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্ত পূর্ববর্তী সরকারের উপর সোবারোপ করতেন, কিন্তু একটা একটা করে বামফ্রন্টের শাসনকাল যখন দিন বছর হুগ এবং লোডশেডিং-এর মাত্রা ও পরিমাণ বাড়তে বাড়তে চরমে উঠল, তখন পূর্ববর্তী সরকারের বাড়ি বাড়ি সব বোকা চাপিয়ে দিয়ে তাদের পকেট লুণ্ঠিত বাহু বাজানো আর সম্ভব হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ জোগার চারটি সংস্থা: পঃ ওঃ বিদ্যুৎ পর্ষদ, দুর্গাপুর প্রজেক্টস লি., কলিকাতা ইলেকট্রিক সান্সাই করপোরেশন লিঃ এবং

ডি. ভি. সি. ডি. ভি. সি. আন্তঃরাজ্য সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গের জন্ত তার বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তি অনুযায়ী। এগুলি বামে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় গ্যাস টারবাইন এবং কখনো কখনো পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে। বিদ্যুৎ ঘাটতি নিঃসন্দেহে পুরাতন ব্যাধি কিন্তু তার জটিলতা বৃদ্ধি এবং ভয়াবহতা ইমানীং কালের।

এ রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলির ইনস্টলড ক্যাপাসিটি কত মেগাওয়াট, গড় উৎপাদন কত মেগাওয়াট এবং দৈনিক গড় ঘাটতি কত মেগাওয়াট জানলে গলদটা কোথায় লোকে কিছুটা বুঝতে পারে। কিন্তু এ বিষয় পরিকারভাবে বললে পাছে জনসাধারণ সরকারের অযোগ্যতার কথা জেনে ফেরে তাই সাধারণতঃ ঘাটতির সংবাদই শুধু পরিবেশন করা হয়। বিদ্যুৎ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উপরও কিছু নিষেধ বলবৎ হয়েছে। বিদ্যুৎ পর্বতের সদর দপ্তর ডায়মণ্ড হারবার রোডের অক্সিস থেকে খবর দেওয়া বন্ধ। এত কড়াকড়ি কেন তা বুঝতে অবশ্য অনুবিধা হয় না।

১৯৭২-৮০ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এবং উৎপাদনের একটা হিসাব ছিল এই রকম :—
সংস্থার নাম দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক গড় উৎপাদন

সি. ই. এস. সি ৩০২ মে: ওয়াট ২২০ মে: ওয়াট
 পঃব: বিদ্যায় পর্বদ ৮৫০ ,, ২৫৫ ,,
 ডি পি. এল ২৮০ ,, ৮০ ,,
 ডি. ভি সি ১৩৬১ ,, ৮২০ ,,

ডি ভি সি কর্তৃক সি ই এস. সিকে সৈনিক
 সাপ্লাই দেবার কথা ১৫ মে: ওয়াট, দিয়েছে গড়ে ৩৫
 মে: ওয়াট।

উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যায় যে, সি ই.
 এস সি তার ইনষ্টলড ক্যাপাসিটিও নতকর ১৬ ভাগ
 বিদ্যায় উৎপাদন করেছে। ভাল না হলেও তার
 উৎপাদনকে অসঙ্গত বলা যায় না কিন্তু পঃ ব: বিদ্যায়
 পর্বদ এবং ডি পি এল-এর উৎপাদন অত্যন্ত হতাশা
 ব্যঞ্জক। এ দুটি সম্পূর্ণ সরকারী উল্লেখ।

এনতা সরকারের কেন্দ্রীয় বিদ্যায় মন্ত্রী মি:
 রামচন্দ্রন দ্বন্দ্বের আগে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যায় সমস্যা
 পর্যালোচনা করে বলেছিলেন, রাজ্যের বিদ্যায় কেন্দ্র-
 গুলির উৎপাদন ক্ষমতা আছে তার সম্যবহার হলে,
 হলে, এ রাজ্যে বিদ্যায় ঘাটতি হবার কথা নয়।

পঃ ব: বিদ্যায় পর্বদের উৎপাদন কেন্দ্র হল
 ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডি। প্রতিক্রিয়ায় সাঁওতালডি
 কেন্দ্রের তিনটি ইউনিট কিন্তু কোন দিন একসঙ্গে
 চালানো যায় না। একটা না একটা ইউনিট বিকল
 থাকেই। ১৯৭৮-৭৯ সালের অডিট রিপোর্টে এই
 কেন্দ্রের পরিচালন ব্যবস্থার অসুখ্য দ্রুততির তথ্য
 তুলে ধরা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বৎসরে এই কেন্দ্রের
 কর্মীরা শুধু ওভারটাইম বেতন বাবদ পেয়েছেন ৩৪,
 ২১, ১১৭ টাকা। যে সকল ব্যক্তি ওভারটাইম
 বেতন তুলেছেন তাদের মধ্যে এমন বহুকর্মী আছেন
 যারা দৈনিক আটঘণ্টা কাজের পর, দৈনিক ১২ ঘণ্টা
 করে ওভারটাইম করেন এবং জা করেন মাসের পর
 মাস এক নাগাড়ে। বহু স্বাস্থ্যবান লোকই হোন

না কেন, প্রতিদিন একটানা কুড়ি ঘণ্টা করে কাজ
 করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? এমন সব তৃত্বভে
 কাণ্ড এখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

কর্মীদের নিয়মমত ছাফিরা এবং কে কখন চলে
 যান তার রেকর্ড রাখার বাংলাই এখানে নেই। টেডু
 ইউনিয়ন নেতারা করেন পাইরে দেবার রাজনীতি,
 কর্মীদের কাজে ঝাঁকি না দিতে, কিংবা উৎপাদন
 বাড়াতে বলেন না।

ডি পি এল হল মরা বোড়া, কখন একেবারে
 ধরাশয়ী হয় তারই শুধু ভাবনা। এখানে চলছে
 প্রাতিশ্রুতী ছুই ইউনিয়নের মধ্যে শক্তির লড়াই, যার
 শুরু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা কাল
 থেকে। বামফ্রন্ট সরকার তৈরী হলে বহু বয়স্ক
 কর্মী চাকুরি ফিরে পেয়েছেন, দণ্ডিতরা মুক্তি
 পেয়েছেন এবং তাদের অসুপস্থিতকালীন বছরগুলির
 ক্ষতি বকেয় বেতনের নামে আদায় করে নিয়েছেন ছয়
 মাস লক্ষ টাকা। অভিযোগ আছে, দলীয় স্বার্থে
 বোগাতার মার্টিবিকেট ছাড়াই চাকরমান, সুপার-
 ভাইসের প্রকৃতি পণে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে অনেক
 কর্মীকে। এ সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে কোন ফল
 হয় নি। প্রতিকারের ক্ষতি শেষ পর্যন্ত প্রমোশনের
 অপর দাবীদারদের আদালতে যেতে হয়েছে।
 মামলা স্কলছে। সর্বত্র অসন্তোষ।

ইউনিয়নের কর্তা উপকর্তাদের কাজ করতে
 হয়না, কিন্তু তারা যথার্থীতি বেতন পান, ওভারটাইম
 বেতনও। উপর ওয়ালারের প্রতি আদুগতাবোধ
 এবং নিয়মমূল্য। বলা এখানে অবর্তমান। ঘন ঘন
 টিউব লিকেজ এক বয়সার বিভ্রাট লেগেই থাকে।
 যন্ত্রপাতি বন্ধপাবেক্ষণের অভাব, দারিদ্র হীনতা এক
 অসক কর্মীদের ঘরা নাকি টেকনিক্যাল কাজ
 করানোর চেষ্টা হল বিপর্যয়ের মূল কারণ। অনেকে

বলেন, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের জীবন-মরণ কাটি
বিক্রাং উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দলীয়
নিয়ন্ত্রণে আনবার উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ
পদগুলিতে নিজেদের লোক বসিয়ে দেন।
তাক্তাভি এই কাজ করতে গিয়ে অনেক অনতিদ্রুত
অদক কর্মীকে গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল পদে বসাতে
হয়, আর তার জন্যই এই দুঃস্বপ্ন। কিছু অভিজ্ঞ
ইনজিনিয়ারদের সংস্থা ছেড়ে চলে যাবার পিছনেও
নাকি এই কারণ। নিরপেক্ষ তদন্ত হলে সভ্য
উদ্ভাটিত হবে।

এ সব কথাই বর্ণনাত্মক সম্বন্ধে ত্রিভুজ পোষণ
করলেও কয়েকটি বিষয়ে কিছু দলতন্ত্রের স্বরূপ
স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। যেমন মিঃ মোস্তাক মুরশেদের
বিদ্যাংগ সচিবের পদে নিয়োগ এবং তাঁর এ পদ ছেড়ে
চলে যেতে বাধ্য হওয়া। মিঃ মুরশেদ মুদ্রক, দৃঢ়চিত্ত
প্রশাসক বলে পরিচিত, বিদ্যাংগ-কেন্দ্রগুলি ঘিরে কিছু
অসং ইনজিনিয়ার-টেকনিক্যাল কর্মী-টিকাদার-ট্রেড
ইউনিয়ন ব্যবস্থার যে দুই চক্র গড়ে উঠেছে, তাতে
যেই তিনি আঘাত হানতে গেলেন অমনি তাঁকে সরে
যেতে হল। মথুরাক্রে লোষ্ট্রাঘাত করতে দেওয়া
চলে কি?

এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিদ্যাংগমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর
বিশেষ অনুরোধে ভারতের সেরা ডাশ-বিদ্যাং ইনজি-
নিয়ারদের নিয়ে গঠিত একটি টাসকফোর্স
সাঁওতালভি ডাশ-বিদ্যাং কেন্দ্রের গলম কোথায় তা
অনুসন্ধান করার জন্য সাঁওতালভি গেলেন কিন্তু
তাদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হল না, গেট থেকে

ফিরিয়ে দেওয়া হল। নিরপেক্ষ তদন্তের ফলে পাছে
চক্রান্ত কাঁস হবে পড়ে? কেবলমাত্র বেতন ভাতা
ইত্যাদি খাশে খাশে বাড়িয়েই যে সরকারী কর্মীদের
মন জয় করার চেষ্টা চলেছে তা নয়, তাদের হুম্মানি
মূলক কাজ ও অব্যাহতভাবে প্রকারান্তরে প্রেরণ
দেওয়া হচ্ছে।

নতুন নতুন ইউনিট বসালেই যে বিদ্যাং সংকটের
সুত্রাঙ্ক হবে তারই বা নিশ্চয়তা। কি আছে।
বর্তমান ইউনিটগুলি তাদের ইনস্টলড ক্যাপাসিটির
শতভাগ ৫০ ভাগ উৎপাদন করতে যেখানে অক্ষম,
নতুন ইউনিটগুলি সেখানে যে এদের দশাগ্রাণ হবে
না তা কে বলতে পারে?

শিরমালিকরা বলছেন, প্রতিদিন ১০/১২ ঘণ্টা
অবিচ্ছিন্নভাবে, অনিচ্ছিত এবং অবিরাম বিদ্যাং হাটাই
চলছে। এ অবস্থায় কি করে আমরা পরিকল্পনামত
উৎপাদন করব? দিনে ৪ ঘণ্টা কাজের জন্য ৮
ঘণ্টার মজুরি দিয়ে কিভাবে আমরা দেশে ও দেশের
বাইরে প্রতিযোগিতায় পণ্য বিক্রয় করে টিকে
থাকব? ক্রমাগত লোডশেডিং-এর থাকার মাল
সাপ্লাইয়ে ব্যাঘাত ঘটায়, ফ্রেজারের অন্তর অর্ডার
কি করে আমরা বন্ধ করব? যখন তখন বিদ্যাং
হাটাই-এর কারণে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার
কলকল্প ও যন্ত্রপাতির যে ক্ষতি ও যোশাতা নষ্ট হচ্ছে,
তার কি প্রতিকার আমরা করব? কতদিন এ অবস্থা
চলবে?

কৃষকরা বলছেন, ভয়াবহ বরষা, চূর্ণগর্ত সঞ্চিত
জল সেচের জন্য বিদ্যাং চাই। বিদ্যাং চালিত পাম্প-
গুলি ঠিকমত চলছে না, এখন কি করব আমরা?

বিপ্লবী জনার্দন চক্রবর্তী

আদি নিবাস ধলফর গ্রাম—জিলা ঢাকা। গ্রামটি ধলেশ্বরী নদীর গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে। জনার্দন চক্রবর্তী বয়সাপাত্তী নিকট আত্মীয়ের গৃহে থাকিয়া ভালভলা হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) শেষের দিকে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের স্ফূর্তি অবস্থায় পলাতক বিপ্লবীদের সহায়তা করিতে গিয়া বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উৎসাহে নিজেই একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করেন।

১৯২১ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আবেদনে সভা দিগা পুলিশের বক্তৃত্বাধীন কার্কে আত্মনিয়োগ করেন। সেবা কার্যের সমাপ্তির পর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনে জনার্দন চক্রবর্তীর ভূমিকা ছিল সম্মুখে আসিয়া। কারাবরণ না করিয়া পেছনে থাকিয়া সংগঠন করা ও অসহযোগী সৈনিকের বোধান অগ্রাহ্য রাখা। বিঘটতি পুলিশের নজরে পড়ে এবং জনার্দন গা ঢাকা দিয়া ঢাকা শহরে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

১৯২৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ভলান্টিয়ার্স ক.ব (B.P.V.C) যোগ দেন। ১৯২৪ সনের শেষের দিকে কালীঘাট কালীমন্দিরে সভাপ্রায় আন্দোলনেও তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন এবং ভয়বহভাবে আহত হন।

এই সময় হইতেই দেশ পোষক হত্যাকাণ্ডের অহুসোহে তাহার অন্যতম আশ্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

১৯২৮ কংগ্রেস অধিবেশনে দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন জনার্দন পরে বাংলার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে রিভোলুট প্রুপের সহিত সংযুক্ত হন। পলাতক অবস্থায় ১৯৩১ সালে বঙ্গ পড়েন জনার্দন। পুলিশকে বলিয়াছিলেন—আমি কোন প্রস্তাব উত্তর করিব না। বাক্য নির্বাচনের মুখে ও পুলিশ তাহার মুখে—আপনার কি? এই প্রশ্নের ও উত্তরটি বাহির করিতে পারেন নাই। প্রেসিডেন্সী জেল হইতে প্রথম দফায় দেউলী (রাজপুতনা যায়) বন্দী শিবিরে প্রেরিত হন তিনি এবং মুক্তিপান ১৯৩৮ সনে।

মুক্তির পর কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগে প্রথমে স্থলের শিক্ষকরূপে পরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের কার্য করেন। অবসর গ্রহণান্তে উত্তর কলিকাতায় কৃষ্ণব্রাহ্ম কন্য কুলে ও মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯০০ সনে কেরায়াড'রক গঠনে ও আন্দোলনে তিনি ছিলেন অত্যন্তদায়ী নেপথ্য সংগঠক এবং বিদ্যালয়ের আন্দোলনেও প্রচুরভাবে বাহিরে থাকিয়া আন্দোলনের নেপথ্য সংগঠন সহযোগ রক্ষা করেন।

পরিণত বয়সেই এই দৃঢ়চিত্ত, অনমনীয় আদর্শবাহী বিদ্যাবীর মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র, জিন বজা ও নন্দি নাতনী বর্তমান। কলিকাতার হামবপুর্ অঞ্চলে দেলিমপুর্ নিজ গৃহেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

সকল ভবের অবসান মৃত্যুতে। সেই তাহামেবই গৌরবান্বিত, বাঁহারা দেশ-জাতি-কর্মের জন্য আত্মত্যাগে অপরাধমুক্ত ও তৃপ্ত। জনগণবাদের মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিষেগবোধে বিদ্ধ। তাঁহার প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহার পরিজন লিগের-প্রতি সহচরুতি জ্ঞাপন করি।

**স্বাভাবিক পেটের বায়ু, অম্ল, জলীর্ণ ও পেটের বেদনার
অব্যর্থ ফলপ্রসূ**

আমেলা হুত ধুম্যারী

আমুবেদনীয় মতে ১২০০ মূল্য ৩.৫০ মক আত্মসংকল্প

ব্যক্তিগতঃ **শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী**

নিবাসঃ কলিকতা - ১০০০ - ১০০০ - ১০০০ - ১০০০

আসামে সততা রুখতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা

স্বাধীনতা লাভের পর হতেই আসামে বহিরাগত-দের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ লাগিয়াই আছে, মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ প্রকাশ পোষেছে। ১৯৬৫, ১৯৬৮, ১৯৭১, ১৯৭২ এই সমস্ত সালে বিক্ষোভ প্রদানতঃ বহিরাগত বিশেষ করে বাঙালীদের বিরুদ্ধে ছিল। প্রতিবারই আন্দোলন বন্ধ হইবে, কিন্তু আসামের এই মূল ব্যাধির কারণ নির্ণয় এবং উদ্ভাবিত বহিরাগত কিংবা বঙ্গভাষাভাষীদের উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য তেমন কোন পরিকল্পনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রসর হয় নাই। বর্তমানে ভাষা, প্রাদেশিকতা, স্বাধীনতা, অর্থ-নৈতিক অনগ্রসরতা সব মিলিয়ে এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে এই বারের আন্দোলন ভারত রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এই বারের অন্তর্নিহিত ধ্বনি Indian dogs, quit our state আন্দোলনের এইরূপ পরিগ্রহের প্রধান কারণ কমতাসীনি তৎকালীন প্রাদেশিক জনতা সরকারের ব্যর্থতা। গোটা রাজ্য কাঠামো পুলিশসহ এই আন্দোলনের সামিল হয়। অবস্থা এমন লাড়োয়েছে যে President's rule প্রবর্তন করেও ইহার মোড় কিভাবে পারে নাই, এখনও পারছে না। বাস্তবে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব All Assam Students Union এর নেতৃত্ব বর্তায়ছে। Cotton College Union Hall এবং Veterinary

College এলাকা হচ্ছে রাজ্য পরিচালনার কর্মস্থান। আসামের এই গণ হিষ্টিরিয়ার সততা কম বেশী উত্তর পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল এই রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সব রাজ্যের সংলগ্ন এলাকা বিশেষী রাষ্ট্র। অস্তিত্ব রাজ্যের সঙ্গে বিশেষ করে দিল্লীর সঙ্গে এই সব রাজ্যের মিল'মিশা ও যোগাযোগের বিরাট অভাব। ফলে ভারতীয় নাগরিক বোধ এই সব রাজ্যের জনগণের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীণ। এই সুযোগ নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারতরাষ্ট্র হতে বিভিন্নতাপ্রবণ আন্দোলনের মত দিল্লীকার্যেমীস্বার্থ-বাণীরা প্রয়োচনা দিল্লী প্রধানতঃ বাংলাদেশ ও চীন। শোনা যায়, গান্ধী, মণিপুরী, মিজো, নাগাল্যান্ড আসামের এই আন্দোলনের সামিল হয়েছে এবং আসাম হতেও যুবকরা সোনাং (নাগাল্যান্ড) সত্যাগ্রহে যোগদান করেছে। আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড মণিপুর, মিজোরামের বিভিন্নতাবাদী যুবকরা গৌহাটি দিলং, ইম্ফল, উকরুল, কোহিমার গোপনে সভা করে United States of Assam (U.S.A.) গঠন করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। আসামের কিছু সংখ্যক যুবকদের অস্ত্র-শস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা সেওয়ার জন্য চীন ও বাংলাদেশে পাঠান হয়েছে। United States of Assam (USA) এর প্রচার পত্রে লিখেছে অস্ত্র রাজ্যে ভেল, চা, পাট কাট ইত্যাদি বন্ধ কর। গোপন সৈন্তের (secret

army) সাহায্যে United States of Assam (USA) গঠন কর। USA এর লোকেরা বৃহৎ পিণ্ডায় ভারত সরকারকে উপহৃতভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতা প্রাপ্ত। ভোমারের জয় নিশ্চিত।

এই পরিস্থিতিতে বিদেশী নির্ধারণের ভিত্তি বৎসর ও নতুন বৎসর কি হবে আলোচনার কোন যুক্তি আছে কি? অথচ বাস্তব অবস্থায় আসামী ভাষাভাষীদের বাঙ্গালীরা কোণঠাসা করে ফেলেছে এমন অবস্থা মোটেই নয়। বিভিন্ন আবহমানময়ীতে (censors) দেখা যায় দিন দিনই বাঙ্গালীরা ও অন্যান্য আসামী ভাষা ও সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গি এইরূপ করে আসামী বলে পরিচয় দিতেছে। ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট দেখা যায় আসামীভাষী লোকের সংখ্যা ৬০২ পার্সেন্ট এবং বালাভাষী লোকের সংখ্যা ১২.৭ পার্সেন্ট। ১৯১১ সালে ছিল ৩৪.৫ পার্সেন্ট ও ২৬.৯ পার্সেন্ট। ১৯৭১ সালের Assam Govt. Civil List এ দেখা যায় ২০০ A. C. S. I. Officers এর মধ্যে যার ১০ জন, ৬২৮ জন A. C. S. II Officers এর মধ্যে ২৭ জন, ৬০০ P. W. D. Engineer এর মধ্যে ৬০ জন, ৩০ জন S. P. এর মধ্যে ৫ জন, ৬০ জন Co-operative Classed Officers এর মধ্যে ৭ জন, Health Service এ ২৭৪ জনের মধ্যে যার ১৮ জন বাঙ্গালী। কয়েকই সংখ্যার ভিত্তিতেও বাঙ্গালীরা ভারত ছাড়ার পাচ্ছে না। এই সব পরিসংখ্যানে পরিবার আসামের বর্তমান আন্দোলন সামাজিক অর্থনৈতিক নয়। সাধারণ লোকের মনে

চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আসাম কখনও ভারতের অংশ ছিল না। ১৮৭৬ সালের ইয়ানডাবু সন্ধি (the yandaboo treaty 1876) মূলে ভিত্তি আসাম ভারত হুক্তি করে। ভারত অধিপত্য হতে মুক্ত হওয়ার পরই আসামের মুক্ত হওয়ার পথ।

এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক অবস্থার না আনা পর্যন্ত বিদেশী নির্ধারণের ভিত্তি বৎসর নিয়ে আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না। বর্তমান কর্তব্য -

- ১) শাসন ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ভারতীয় জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠা করা।
- ২) বিদেশী আখ্যা দিয়ে বিভাজনের প্রচেষ্টা বন্ধ করা এবং উন্নয়নের যার যার সব বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করা।
- ৩) বিজ্ঞানকে লোপাড়া স্বাভাবিক করা এবং সমস্ত সমাধানের বাস্তব ভিত্তি সম্বন্ধে হুবকনের সচেতন করা।

এই প্রাথমিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই ভারতের সংহতিতে আত্মবান রাজনৈতিক দলগুলির আলোচনা সার্থক হতে পারে।

আশাকরি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আসাম ও উত্তর পূর্ব ভারতের এই বিপদজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হবেন এবং উন্নয়নের নাসিরকল্পে গণ্য করার আইনগত অন্তরায় বিঘ্নগুলি দূর করার জন্য পার্লামেন্টে আইন পাশ করবেন আসাম সমস্তা মীমাংসার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবেন।

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ কীর্ত্তন দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আলোচনার সময় স্ববোধ রায় এবং হিমাংগু বসু সর্বদাই উপস্থিত থাকতেন। গান্ধীজীর সঙ্গে পুলিশ বিহারীর স্থগিত আলোচনার কিছুটা এখানে দেওয়া গেল—

‘গান্ধীজী—ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বিভিন্ন সময় যে সমস্ত অভ্যুত্থান, দুর্ভাবহারাদি করে এবং যেভাবে দেশের অসংখ্য লোককে নিঃসহায়, নিরক্ষর ও দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে তাহা কি তুমি সমর্থন করিতে পার

পুলিন বিহারী—ঐ সমস্ত সমর্থন করি না বলিয়াই তো ইংরেজ ভাড়াইয়া স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতেছি। আমরা স্বাধীন হইতে পারিলে আমাদের দেশের সকল প্রকার দুঃখদৈন্ত নিরক্ষরতা আমরা দূর করিতে পারিতাম।

গান্ধীজী—কিন্তু তোমরা স্বাধীন হইতে পারিলে কৈ? তোমরা বৈদেশিক পদা গ্রহণ করিয়াছিলে তাহাতে ব্যর্থ হইল। এই ব্যর্থ অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ কর তোমরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

পুলিন বিহারী—অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিলেই যে স্বাধীনতা পাইব তাহারই বা কি কি মুক্তি আছে? অধিকন্তু আমাদের বৈদেশিক পদা ব্যর্থ হইয়াছে একথাও আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বৈদেশিক প্রচেষ্টার প্রভাবে ব্রিটিশ

গভর্নমেন্ট বিশেষ ভাবে বিচলিত হইয়াছিল। তাহার ফলেই বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়াছে, মটেশ সংস্কার আদিয়াছে এবং ভারতীয়গণের হস্তে আরও অধিকার অর্পনের প্রতিশ্রুতিও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দিতেছে।

গান্ধীজী—কিন্তু স্বাধীনতা তো পাও নাই, সুতরাং তোমাদের বৈদেশিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

পুলিন বিহারী—ব্যর্থই হইয়াছে একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না, আমাদের বৈদেশিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সুকৌশলে পরিচালনা করিতে পারিলে এবং প্রচেষ্টা পূর্বব্রত হইলে তবে তো স্বাধীনতা আসিবে। স্বাধীনতা লাভ অতো সহজ ব্যাপার নয় যে বিপ্লব শুরু মাত্রই পূর্ণফল মিলিয়া যায়। স্বাধীনতা লাভের জন্য বহু সময় ব্যর্থ ভ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন। পৃথিবীতে কোন পরাধীন দেশই অতি অল্প সময়ে স্বাধীন হইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের বৈদেশিক প্রচেষ্টার ফলে আমরা অনেক সুকল অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই পাইয়াছি।

গান্ধীজী—কিন্তু পরিচালনার ক্ষমতা যে পরিমাণ অল্পসংখ্যের প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহ করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব এবং অসাধ্য।

পুলিন বিহারী—ঐকান্তিকতা ও তীব্র আকাংক্ষা থাকিলে অগতে কিছুই অসম্ভব বা অসাধ্য নয়।

গান্ধীজী—কিন্তু বিদ্রোহ করিতে গেলে যুদ্ধ বাধিবে তাহাতে অসংখ্য দক্ষিণ লোকের প্রাণ বাহিবে, কত নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটবে তাহা কি করিয়া সমর্থন করিতে পার ?

পুলিন বিহারী—পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া আমরা প্রতিদিন কত নিষ্ঠুর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কত লোক অনাহারে, অর্থাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে এর প্রতিকারের ক্ষমতা তো আমরা স্বাধীনতা লাভ হেতু বিপ্লব আরম্ভ করিয়া ছিলাম। পরিনামে যুদ্ধাদি ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ হয় না ইহা আমরা বিশ্বাস করি। পৃথিবীতে কোন কালেই কোন পরাধীন দেশ যুদ্ধ বিগ্রহাদি ব্যতীত স্বাধীন হইতে পারে নাই।

গান্ধীজী—পূর্বে হয় নাই বলিয়া এখন কেন হইবে না আমি তো জোমারু যেরূপ পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতেছি যে দেশের সমস্ত লোক যদি অহিংস অসহযোগ আলোচন সমর্থন করে তবে তাহার ফলে ভারতবর্ষ অবশ্যই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

পুলিন বিহারী—আমি আপনার এই বাক্যে আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না।

গান্ধীজী—আমরা যদি সম্পূর্ণভাবে অহিংস থাকিয়া স্বরূপ ভাষা স্বীকারে প্রস্তুত থাকি তবে আমাদের সহশক্তি ও ভাষ্যের প্রভাবে যুদ্ধ হইয়া অত্যাচারীরাপ আপন। হইতেই স্বাধীনতা প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। তাহাদের কঠোর প্রাণও ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

পুলিন বিহারী—আমরা কিন্তু সাধারণত দেখিতে পাই প্রবল অত্যাচারী গন নিরীহ, নিরীক্ষ জনতার উপরে নির্বিবাদে এবং নিশ্চয় চিন্তে উদ্ভাসের সহিত অত্যাচার চালাইতে থাকে এবং তাদের ধ্বংস

করিয়াও ফেলে। বিশেষ কোন বিপর্যয়ের কারণ না থাকিলে অত্যাচারীদের অত্যাচার প্রবণ নিষ্ঠুর প্রাণ ভিন্নমাত্রণ কোমল হয় না।

স্বাধীনতার স্বরূপ বোঝাতে গান্ধীজী বলেছিলেন আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এই আত্মার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাকে সর্বস্তর রূপে সহনশীল ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে এবং একান্ত অহিংস থাকে প্রয়োজন। পুলিন বিহারী উত্তরে বলেন উহা তো আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। অতি অল্প সংখ্যক সাধু সন্ন্যাসী এবং মহাপুরুষের পক্ষে উহা আরম্ভ করা সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীতে অসংখ্য স্বাধীন দেশ যেমন প্রত্যক্ষ জাগতিক স্বাধীনতা ভোগ করছে ভারতবাসীও একরূপ স্বাধীনতাই চায় এবং বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত তা সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত আলোচনা অসমাপ্তই রয়ে গেল। গান্ধীজী পরিশেষে বললেন—প্রথমতই যদি স্থির বিশ্বাস না জন্মে তবে যুক্তি চলতে পারে না। তিন দিন পরে আলোচনা এইখানে এসেই শেষ হল। এ সম্পর্কে পুলিন বিহারী বলেছেন গান্ধীজী পরিষ্কার ভাবেই বুঝলেন যে তিনি আমাকে তর্কে পরাজিত করে তাঁর স্বমত গ্রহণ করাতে পারবেন না। আমি যে গান্ধীজীকে আমার স্বমত গ্রহণ করাতে পারবো না তা আমি ভালোভাবেই জানতাম। সে অস্তিত্ব প্রাপ্তও আমার ছিল না।

গান্ধীজীর সহিত পুলিন বিহারীর সাক্ষাৎকারের কয়েক দিন পরের ঘটনা। দেশবন্ধুর বাড়ীতে পুলিন বিহারী মাঝে মাঝে যেতেন। একদিন রবিসেন এবং এবং অমূল্যসিন সমিতির অন্যান্য কয়েক জন সভ্যের সঙ্গে পুলিন বিহারী যেখানে উপস্থিত হইবে দেখিলে সেখানে মোপলা বিগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা চলেছে মোপলারা ভয় দেখিয়ে এবং কালপ্ররোপে বহু

হিন্দুকে মুসলমান করেছে। গান্ধীজী বললেন মোপলাদের অত্যাচারের বিবরণ তিনি শেয়েছেন কিন্তু এই কথা শুনে সৌক আলি এমন ভাব প্রকাশ করলেন যে কথটা তিনি কানেই তুললেন না। এর পরে গান্ধীজী অহিংসার গুণ সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলে সৌক আলি বলে উঠলেন যে তিনি বর্ষের ক্ষুদ্র প্রয়োজন হলে অহিংসে ব্যবলে পরিবেশ না। গান্ধীজী তাঁর কথা শুনে বললেন, আমি তো তোমাকে সেই অধিকার পূর্বেই দিয়াছি। তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দু বৃক পাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ধর্মের ক্ষুদ্র প্রয়োজন হলে হিন্দুরাও হিংসার পথ অবলম্বন করতে পারবে কিনা, গান্ধীজী বিধাহীন ভাবে বলে উঠলেন না, না, তোমরা পারবে না। কারণ তোমাদের ধর্মে হিংসা সর্বোচ্চভাবেই নিষিদ্ধ। কিন্তু সৌক আলি মুসলমান, তাদের ধর্মে হিংসার স্থান আছে। গান্ধীজীর কথায় হিন্দু বৃকটি নিরস্ত হতে পারল না। সে মুক্তি দেখালো যে গীতার মধ্যে হিংসার স্থান আছে কিন্তু হিন্দু বৃকের কথায় গান্ধীজী আপত্তি জানালেন এবং বললেন যে গীতার প্রকৃত ধর্ম যেন নিলে তার মধ্যে হিংসার স্থান নেই। গান্ধীজীর এই উক্তি পুলিন বিহারী যেন নিতে পারলেন না। আসলে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করা হচ্ছে গান্ধীজী সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, ফলেই পরবর্তী ফলেই হিন্দু মুসলমানের বিভেদ বৃদ্ধি পেয়ে আজ পাকিস্তান ও ভারত বর্জিত হয়েছে। সেদিনের ঘটনার ফলে পুলিন বিহারী সশ্রদ্ধে বাড়ীর থেকে আরো গান্ধী বিরোধী মনোভাব নিয়ে গৃহে ফিরলেন। তিনি হুসঙ্গীকরণে বর্কেছিলেন গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ নীতি দেখের পরাধীনতা বোচনের সহায়ক হবে না, উপরন্তু তাঁর মোসলেম শোষণ নীতি

ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর হবে। আজ প্রকৃত প্রত্যয়ে হয়েছেও তাই। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এ সম্পর্কে বলেন, 'গান্ধীজী অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ফলে এই মুসলমান ভোষণ নীতি ভারতের জাতীয় জীবনে এমন ভাবে শিকড় গড়িয়া বসিল, ক্রম বেগে বাড়িতে বাড়িতে এই শিকড় ভারতের জাতীয় জীবনের বিরাট প্রাঙ্গণকে ভাঙিয়া ধুলিমাং করিল। ইহারই ফলে পাঁচল বঙ্গের মধ্যে বঙ্গদেশে বিভাগ ঘটিল। লর্ড কার্জন যাহা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন গান্ধীজীর অযৌক্তিক মুসলমান ভোষণের নীতি তাহা সার্থক করিয়া তুলিল। কিন্তু সেদিনের প্রবল গান্ধী আন্দোলনের মুখে বৃক্তির কোন স্থান ছিল না। এই ক্ষুদ্রই পুলিন বিহারীর বিদ্যবী মন গান্ধীজীকে সর্বভাষে সমর্থন করতে পারে নাই, গান্ধী আন্দোলনকারীরাও অনেকে পুলিন বিহারীকে কিছুটা তুল বুঝেছিলেন। কারণ সমগ্র বিধগতি ওরা বৃক্তি দ্বিবে বৃভতে প্রকৃত ছিলেন না। এই সময় কারা মুক্ত বিদ্যবীসের আল্লাহে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন লালু লাজপত রায়। পুলিন বিহারী ছিলেন অত্যর্ধনা সমিতির সভাপতি। পুলিন বিহারীর সভাপতির ভাবপটী হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সম্মেলনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেটি সম্মেলন শেষে নিয়ে গিয়ে পাঠ করেন এবং পুলিন বাবুর অভিস্রুতের প্রশংসা করেন। সভার শেষে ব্যবস্থার এস, আর দাস পুলিন বিহারীকে ডেকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। এস, আর দাস প্রস্তাব করেন যে গান্ধী আন্দোলনের ক্রটি বিদ্যাভিগুণি জন সম্মেলন তুলে ধরার আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ কাজে তিনি পুলিন বিহারীর সাহায্য চান। পুলিন বিহারী

(বাকী অংশ ১৬ পাতায়)

রাষ্ট্রপুরু যুরেল্ল নাথের স্থিতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

শাসন সংস্কার ও চরমপন্থী মতবাদের প্রসার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শাসন কর্তাদের পক্ষ থেকে যদি শান্তি, আপোষ ও সন্তুষ্টি বিধানের দিকে কোন অগ্রগতি হয়ে থাকে, তাহলে আমি মনে করি, আমাদের সাধারণ বিচার বুদ্ধি ও দেশপ্রেমের স্বাভাবিক ধারণা এই দাবীই করে যে আমরাও আমাদের তব পক্ষে অসুস্থপভাবেই আমাদের মনের সাহসে সকাহিত করব। ব্যক্তির দিক থেকেই হোক আর সমষ্টির দিক থেকেই হোক, সব কিছুই সন্তোষ নিয়ে চলাই হচ্ছে জীবনের নিয়ম। সামঞ্জস্য বিধানই হচ্ছে জীবন, তার অভাবই হচ্ছে মৃত্যু। দীর্ঘ ও বৈচিত্রপূর্ণ ইতিহাসের মধ্যে এই সামঞ্জস্য বিধানের খুঁজি আমাদের জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই চিরাগত বিধান ও কাগজের জীবন মর্শনের নীতি অনুসরণ করে আমাদের এই নবমুঠ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে হবে। হুজুর, আমাদের যদি নিজেকে সম্পর্কে এখানে কিছু কলমে অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে আমি বলব যে ৪৫ বছর ধরে আমার যে জন-সেবার জীবন চলে আসছে, তার মধ্যে সরকারের বিরোধিতা করাটাই ছিল আমার মূল সন্তোষ বাক্য। আমি দাবী করছি—আমার দাবী দোষের কিছু নেই, তা আমি জানি না, কিন্তু দাবী করছি যে আমি যত যানি নিরবিলম্বভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে সরকারের নীতির ও কাজের বিরোধিতা করেছি বর্তমানে ভীষিত আছেন এমন কোন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা ততখানি করেন নি।

কিন্তু হুজুর, এক পরিবর্তন এসেছে স্বাগত জানাচ্ছি সে পরিবর্তনকে। পরিবর্তন এসেছে আমাদের শাসন কর্তাদের দ্বারা প্রবণতার উপরে এবং আজ তারা বন্ধুত্বের ও সাহচর্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আমার দেশবাসীকে আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে সেই হাত ধরে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির বিচ্ছিন্নতার সহিত সহযোগিতা করে সেই উচ্চ দোভাগ্য লাভের দিকে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছি যে দোভাগ্য টমরের বিগানে আমাদের দেশবাসীর ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়ে আছে।

‘হুজুর, আমাদের জাতির ইতিহাসের এমন এক ক্ষুদ্রম্পর্সী মুহুর্তে আমরা এখন বাস করছি যে মুহুর্তকে আশা পূর্ণ হওয়ার সঠিক মুহুর্ত’ বলতে পারি। আমরা এখন পক্ষ পরিবর্তনের মুখে এগে পড়েছি। ভবিষ্যৎ এখন আমাদের হাতে এবং উদ্বাহানে ক্ষুদ্র। আমরা তা গড়ে ও তুলতে পারি আবার নষ্ট করেও ফেলতে পারি। আমি আমার দেশবাসীর কাছে আবেদন রাখছি তাদের প্রেমের নিষ্ঠার সহিত সাহস, দৃঢ়নিষ্ঠা, কৈশ্ব এবং আত্ম সংযম প্রদর্শন করে এই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে। জাতীয় জীবন গড়ে তোলার পক্ষে এই সমস্ত হল সর্বোৎকৃষ্ট গুণ। এই আবেদন আমি রাখছি এবং বিশ্বাস করি এ আবেদন ব্যর্থ হবে না,

কথাবহু ভাবেই সকলের কাছে পৌছবে এবং সকলে তাতে সাদৃশ্য পাবেন।'

এটুকু অস্বস্তি: বলতে পারি যে আমার এই বক্তৃতা হাউস ভালভাবেই গ্রহণ করেছিল এবং ভাইসরয় এর মর্ম অনুধাবন করেছিলেন। সেদিনই সন্ধ্যা পাঁচটার সময় টেলিফোনে ভাইসরয় তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে ডেকে পাঠান। আমি সে সময় ঘুমাইছিলাম। ঘুম থেকে জাগার পরে আমাকে ভাইসরয়ের ডেকে পাঠানোর কথা জানান হলে আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘ সময় ধরে কথাবার্তা হয়। এত পড়ন্ত বেলা পর্যন্ত আমি নিঃশ্রান্ত ছিলাম কেনে তিনি বিস্তার প্রকাশ করেন এবং পরে বেশ সহাস্রহৃতির সঙ্গে বলেন, 'তুমি যে ভ্রম করেছ তাতে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হয়ে পড়েছ। এতো ভাষ্য বাপার যে এ সময়ে ঘুমিয়ে থাকবে।' আমি উত্তরে বললাম, আমি এখন ইচ্ছা করি, ঘুমতে পারি। আমার ভাল স্বাস্থ্যের এটা একটা গুট কারণ।' তিনি বললেন, 'মি: ব্যাণাজি, সেটাতো নেপোলিয়ানের মত কাজ।' সে দিনের কাউন্সিলে আলোচিত বিধির নিরে আমরা কথাবার্তা বললাম। মহামন্ত্র ভাইসরয় মনে করেন যে যেহেতু কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি আমি এনেছি, সেইহেতু আমারই সেই কমিটির চেয়ারম্যান হওয়া উচিত।

মডরেট পার্টির বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয় তার মধ্যে একটি ছিল এই যে আমি আর আগের মত নেই, আমি মত্ত বদলে ফেলেছি। নতুন অবস্থার মধ্যে কারো পূর্বমতের পরিবর্তন হলে তা অপরাধ বা পাপ নয়। পূর্ব মতের সঙ্গে সব সময় সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি রাখা করে চলাই একটা গুণ নয়। তাহলে সেটা সময় সময় তুলকে আঁকড়ে ধরে থাকার সামিল হতে পারে।

প্রগতিশীল মনকে পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে তার পূর্ব ধারণাকে সময় সময় পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হয়। আমার ক্ষেত্রে আমি দাবী করছি, আমি এখনও আমার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন করিনি। তবে খুঁটিনাটি ব্যাপারে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে পদক্ষেপ করেছি আমার কাছে আমার লক্ষ্য সব সময় একই ছিল। সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার অত্যাধিকারী মতগুলিও পরিবর্তিত আছে। তবে খুঁটিনাটি ব্যাপারে যেটা খাট কাছে কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। আমার কাছে সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থার থেকে স্বাধীন নাসন লাভই হচ্ছে বরাবরের লক্ষ্য। আর তা লাভ করার উপায় হচ্ছে বৈধ আলোচন চালিয়ে যাওয়া। ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্টের ঘোষণা বাণীর পরিস্ফুটনে আমাকে বিবেচনা করতে হয়েছে, আমি কোন পথ নেব, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার পথ, না অসহযোগের পথ যে পথ হচ্ছে সরকারের বিরোধিতা করার পথ, সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করার পথ। আমার জন জীবনের প্রথম দিকে যা দেখেছি তাহল কেবল বিরোধের পথ নিরবিচ্ছিন্ন এবং দৃঢ় প্রতিবাদের পথ বা কোন সময়ের ভবে থমে যায়নি। কিন্তু পরিশেষে যখন সরকার জনগণের দাবী মেনে নিতে এগিয়ে আমার লক্ষ্য প্রকাশ করলেন এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করলেন, তখন আমি বিরোধিতা ত্যাগ করে সহযোগিতার পথ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলাম।

আমাদের লক্ষ্য এখন এক এবং দাবিও পূর্ণ। সরকার গঠনের কাঠামো তৈরীর জন্য যখন সহযোগিতা করার আহ্বান এসেছে তখন, আমি জিজ্ঞেস করি, বিরোধিতা না করে আমাদের সেই সর্বজন অভিলষিত মহান লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কি

কেহাঃ এবং সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা উচিত নয় ? ঘটনাটা হচ্ছে এই যে আমরা নিজেরা বললে ষাইনি, বললে গেছে সরকারের মনোভাব। সরকারের নীতি, লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার মতোই এক মৌলিক পরিবর্তন এসে গেছে। আমরা সে পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছি। আমরা সরকারের প্রতি আমাদের মনোভাবের সংশোধন করে স্বায়ত্ত শাসন লাভ করার জন্য সহযোগিতা করেছি। যেখানে তা না করে বিরোধিতা করাটা চরম স্বদেশ-প্রেম বিরোধী কাজ হবে। শুধু তাই নয়, এটা তার চেয়েও বাধা হবে।

এটা হবে মাতৃভূমির প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা। আমরা এ ভাষা ভীত বটে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে হলে এই ভাষাই হচ্ছে একমাত্র ভাষা। অবশ্য এ রকম কেউ কেউ ছিলেন যারা মনে করতেন এই শাসন সংস্কার একটা চালাকি একটা ধামা। তারা ভাবতেন এই শাসন সংস্কার একটা প্রকাণ্ড চালাকি ছাত্তা আর কিছুই নয় যা সরল বিশ্বাসী, অসাবধান জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে শাসন সংস্কারের বিরোধিতা করার জন্য তারা যে কেবল সঙ্গত উপায় অবলম্বন করতে পারেন, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই ; কিন্তু আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি বলে আমাদের গালি দিতে তারা পারেন না। এই শাসন সংস্কার যে স্বশৃঙ্খলাবেই আমাদের পারিষদীয় স্বায়ত্তশাসন লাভের পথে এক অগ্রগতি সে কথা স্বীকার করে আবার তার বিরোধিতা করা হলে তা আমাদের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা এবং দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্যে অযত্নতা করাই হত। বা হোক, আমাদের দিক থেকে আমরা কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের কলহব্দী হয়ে চলিনি। এই শাসন সংস্কারের স্বতন্ত্র

বা মূল্য আছে, সেই ভাবেই আমরা তাকে গ্রহণ করেছি। এর অসম্পূর্ণতা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে এই যে এই শাসন সংস্কারকে রূপান্তরিত করে আরও অধিক পরিমাণে তা লাভ করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করব ও তা লাভ করার জন্য অধিকতর ভাবে চাপ দিচ্ছি। শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বশৃঙ্খলভাবে ক্রমাগত পারিষদীয় সরকার লাভের এই ভো দ্রব্যোগ। এর বিকল্প কি আছে ? আমরা বতনুর ভাবতে পারছি, কোন বিকল্প নেই। হয় আমাদের ক্রম-বিকাশের এই স্বপনকেই গ্রহণ করতে হবে বা বখা সময়ে পরিপূর্ণ পারিষদীয় সরকারে পরিণতি লাভ করবে। অথবা আমাদের সংস্কার সঙ্কল বিগ্রসঙ্গক কার্যক্রম নিয়ে চলতে হবে, যার মধ্যে আছে অস্বস্তি বিপদের সূঁকি আর সাক্ষ্য সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা। প্রকৃত পক্ষে এই বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন করে দেখা হয়েছে। তারা এই আন্দোলন করেছেন তাদের আর ভাষা ও স্বদেশ প্রেম সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা। কিন্তু সে আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই দুঃখজনক ঘটনার প্রধান কর্ত্তা তারা তাদের ব্যর্থতার কথা বুঝতে পেরে অনেকেরই ভবিষ্যৎের কাছে মাথা নত করে শান্তিপূর্ণ নাগরিক জীবনে স্থিত চলেছেন।

এ বৃক্ষে কেবল মাত্র সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত সৈন্য বাহিনীর সাহায্যেই বিপ্লবী আন্দোলন সাক্ষ্য লাভ করেছে। ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য সেই সৈন্য বাহিনী কোথায় ? আর যেখানে বিপ্লব সাক্ষ্য লাভ করেছে সেখানেও সেই বিপ্লবের গতি পথে রক্তের ধারা বয়ে গিয়েছে, আমাদের মৃত্যুকে জাগিয়ে রেখেছে। সেই ক্ষমতার

চিহ্নকে বিলুপ্ত করতে। ধাকা সামলাতে ও পূর্ণ গঠন করতে কয়েক প্রজন্ম লেগে গিয়েছে। এড্‌সাও বার্ন বলেছেন, বিপ্লব হচ্ছে চিন্তাশীল ও সংলোকের শেষ উপায়। কংগ্রেসের জন্ম কাল থেকেই তার নীতি হচ্ছে বিবর্তনের পথে চলা: এক প্রবীন কংগ্রেস নেতৃত্ব পথ্যাক্রমে স্বাধীন শাসন লাভের কথাই বলে গিয়েছেন। ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্টের ঘোষণা বাণীর মতো সেই নীতিটিই প্রধান ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আরও দুই পৃষ্ঠাতে ১৯০২ সালে আমেরিকা কংগ্রেসের সভাপতিত্বপে আমি বলেছিলাম:

“আমরা চাই এমন একটি স্বাধীনশাসন দলক যৌথ রাষ্ট্র সমবায়ে প্রবেশাধিকার লাভ করতে যে যৌথ রাষ্ট্র সমবায়ের উপরে থাকবে মহিমাময়ী মাতৃব্রহ্মপিনী ইংল্যান্ড। এর চেয়ে বেশী কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই” এবং আমি আরও বলেছিলাম:

“আমরা জানি যে আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ-চলব স্বভাবতই ধীর গতি সম্পন্ন হবে; এবং কেবলমাত্র দীর্ঘ দিনের প্রয়াস ও সন্ত্রম নিকনবীলী অন্তেই সেই আশা পরি পূর্ণতার আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। কিন্তু তার ক্ষমতা আরও করে দিতে হবে।”

১৯০৫ সালে মি: পোন্সেলও বেনারস কংগ্রেসের সভাপতিত্বপে সেখা একই কথা বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, ‘ভালোর জন্মই হোক, আর মন্দের জন্মই হোক, আমাদের ভাগা ইংল্যান্ডের ভাগ্যের সঙ্গে গ্রিভিত হয়ে রয়েছে, এবং কংগ্রেস একথা সম্পূর্ণভাবেই স্বীকার করে যে আমরা যে প্রকার উন্নতিই চাই না কেন, তা লাভ করতে হবে সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত থেকে। তবে সে উন্নতি কেবলমাত্র ধাপে ধাপেই হতে পারে।’

সুতরাং সভারেট পাঠির—দাবী হচ্ছে এই যে আমরাই হিচ্—কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও আমি সংগঠকদের আসল উত্তরাধিকারী এবং আমরা সেই মহান প্রতিষ্ঠানের এতিহ্যকেই ধরে রেখেছি। এই এতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা আলাদা পথ ধরেছেন বাস্তবিক পক্ষে তারাই সাংঘাতিক ধরণের মত পরিবর্তনের পথ ধরেছেন। (চলবে)

(১২ পাতার পরের অংশ)

সম্মত হন। স্থির হল যে একটি সঙ্গ গঠন করতে হবে এবং সম্বন্ধে এক প্রতিকার মধ্যমে প্রবন্ধাধি মুদ্রিত করে গান্ধী আন্দোলনের অনিষ্টকর নিকগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। এই প্রস্তাব অগ্রদূতী পুলিন বিহারী ও এস, আর, দাসের মিলিত প্রচেষ্টার ‘ভারত সেবক সঙ্গ’ নামে এক সংগঠন গঠিত হল এবং সংগঠের মুখপত্র হিসাবে ‘হক কথা’ নাম দিয়ে এক প্রচার পত্র প্রকাশ হতে লাগল। (চলবে)

বঙ্গবী বাংলা পড়ুন

৩

সবাইকে পড়ান—

(Confd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—NADIA—confd.			
Paul Smt Ranu Bala	C/o Gopal Bhawana	200	18 1 75
w/o Late Jatindra Nath Paul	Choto Bazar P. O. Ranaghet		
Sarker Santilata	Vill Kalinagar	200	30 3 72
w/o Late Netaji Pada Sarker	P. O. Krishnanagar		
Dist—MURSHIDABAD			
Roy Kuari Tapati	Vill Sreemantapur, P. O. Lalgaola	100	1 4 79
w/o Late Rabindra Roy & Late Purnima Roy			
Dist—WEST DINAJPUR			
Bhadra Smt Asholata	P. O. & Vill Lahanda P. S. Raiganj	150	30 8 79
w/o Late Suresh Ch. Bhadra			
Majumdar Smt Araji	Mohanbati P. O. Raiganj	100	14 12 79
w/o Late Jitendra Nath Majumdar			
Dist—CALCUTTA			
Awaity Smt Jamuna Devi	12, Peary Mohan Pal Lane	100	23 3 79
w/o Late Shev Sagar Awaity	Calcutta-7		
Biswas Smt Kamala Rani	66, Aswininagar	200	9 11 79
w/o Late Upendranath Biswas	Calcutta-40		
Biswas Smt Sarasi Bala	38, Dr. Nilmoni Sarker Street	100	20 4 78
w/o Late Amulya K. Biswas	Calcutta-50		
Chakraborty Smt Parul Bala	451, Robinson Sarani	150	15 5 72
w/o Hrishikesh Chakraborty	Calcutta-5		
Chakraborty Smt Parul	3/1/87, Belegghata Main Road	100	3 2 80
w/o Late Suresh Chakraborty	Calcutta-10		
Chakraborty Saraj Bala	5/215, Jatindranagar	100	3 2 80
w/o Late Narendra Kumar	Calcutta-56		
Chatterjee Kumari Lakshmi	834/21, B. T. Road, Narendranagar	100	19 1 79
d/o Late Prasanna Chatterjee (alias Tena)	Calcutta-56		

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অল্পদীর্ঘন সমিতির বিপ্লব প্রকাশ—কলকাতা-৩০০

বিপ্লবী মহানারক বাসবিহারী—প্রবোধ মজুমদার-১০০

কীর্ত্তি কুমার দত্তের—

- | | |
|--|---|
| ১। বাংলায় অস্তিত্ব—১৫০ | ২। বর্তমানের ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮০০ |
| ৩। অল্পদীর্ঘন সমিতির শি. দিগ্বিজয়—২০০ | ৪। দেশপ্রেমী সংগ্রাম কাহিনী—১০০ |
| ৫। কাকারী শহীদগুরু—১২৫ | ৬। কলকাতা বাহাদুর সংগ্রাম কাহিনী—৪০ |
| ৭। বাসবিহারী ও অল্পদীর্ঘন সমিতি—৭০ | ৮। বাহাদুর শহীদ ম্যা ও ঘোরে—৫০ |
| ৯। বিপ্লববাদ ও পদাঙ্কবাহ—৭০ | ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—৫০ |
| ১১। মধ্যপ্রদেশ ও মুক্তাঙ্গ—৪০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও জননী নিবেদিতা—১৫ |
| ১৩। দেশ ঘোরে তোলেনি (১)—১০০ | ১৪। দেশ ঘোরে তোলেনি (২)—২০০ |
| ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আখ্যান—৪০ | ১৬। ১০ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১০০ |
| ১৭। হাড্ডিক রক্তা প্রচেষ্টা—১৫ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অল্পদীর্ঘন সমিতি—৪০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৪০ | ২০। লাইট হুতা প্রচেষ্টা—১৫০ |

প্রাপ্তিস্থান :—১নং বরত বাস ট্রাট কলিকাতা-১০০০০

চেক নম্বর—১/১/১/A বহিষ চ্যাটার্জী ট্রাট কলিকাতা-১০

— সম্পাদক বঙ্গদী —

অল্পদীর্ঘন চ্যাটার্জী (মূল্যমতি) ইন্ডোবন্দর নকী, ইন্ডোবন্দর চ্যাটার্জী

সম্পাদক—প্রিন্সিপাল শরণ মাস্তোভুদী

বিশেষ বিশেষ প্রতিমিত্তি—প্রবোধ মজুমদার । বেঙ্গলী—ইন্ডোবন্দর মাস ।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—ইন্ডোবন্দর মাস । প্রকাশক—ইন্ডোবন্দর মাস ।

বিশেষী বাংলা কাগজাদ :—১নং বরত বাস ট্রাট কলিকাতা-১০০০০

প্রকাশক—প্রিন্সিপাল শরণ মাস্তোভুদী, কলিকাতা-১০০০০

27 MAY

বিশ্ববী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
 স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিশ্ববী বাঙ্গালী' তবকালেবার—১৯৭৪

নবম বর্ষ	শনিবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ ২৫শে মে, ১৯৮০	৩৫ সংখ্যা
----------	---	-----------

এই সংখ্যায়



বিশ্ববী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

—সম্পাদকীয়

স্বর্গশেষের পরে

—নিজের সাংবাদিকতা

ইতিহাসের প্রতিশোধ

—বীরেন দে

বিশ্ববী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

—জ্যোত্স্না হালদাস

উজাপ্রদেব স্বাভাবিক মনোবৃত্তির গণ্য করার দাবী

I was a fighter.
 One fight more.
 The last and
 The best.

Rach Behar'sone
 25/5/72

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Dato
Dist—CALCUTTA			
Das Smt Jyotana Prava w/o Late Nonigopal Das (alias Bendra Sen)	68, Raja S. C. Mullick Road Calcutta-47	150	7 2 80
Das Smt Susama w/o Late Jagadish Ch. Das	O. G. Ramgarh Colony Calcutta-47	100	10 10 79
Dasgupta Smt Renu w/o Late Jagindra Nath Dasgupta	112/7, Salimpur Road Calcutta-31	100	27 9 78
Dutta Roy Smt Be'a Rani w/o Late Krishna Chandra Dutta Roy	228/B, Rash Behari Avenue Calcutta-19	100	16 12 79
Ghosh Smt Arundhati w/o Late Amar Krishna Ghosh	116, Vivekanand Road Calcutta-6	100	31 8 77
Guha Smt Bela Rani w/o Late Bankim Chaudhuri	Block o. 2, Flat No. 23 New C. I. T. Bldg., Calcutta-10	150	5 2 80
Kanjilal Smt Jyotana w/o Late Narendra Nath Kanjilal	13/C, Ghosh Lane Calcutta-6	100	26 2 80
Maalik Smt Ashlata w/o Late Amulya Chandra Malik	27, Ratan Babu Road Calcutta-2	150	16 3 78
Mitra Smt Pampa w/o Late Mani Bhushan Mitra	17-B, C. G. R. Road Calcutta-23	200	1 2 80
Mukherjee Kumari Bijoya d/o Late Binapani & Subal Ch.	3, Kailash Das Lane Calcutta-6	150	18 1 80
Roy Smt Parul Bala w/o Late Gopal Chandra Roy	19/1, Moiradanga Road Calcutta-36	200	17 9 79
Roy Prasanna	42/63, Bedianega 2nd Lane Calcutta-39	200	1 6 77
Sarkar Smt Amiya w/o Late Dulal Sarkar	8/B, Pitambar Sarkar Lane Calcutta-23	100	9 11 79
Sen Smt Sonita w/o Late Hashimoy Sen	P-35/2, Unique Park Calcutta-34	100	20 9 79
Sengupta Smt Usha Rani w/o Late Sasanka Ranjan Sengupta	2/43, Nefajinagar Calcutta 40	200	2 2 80
Dist—24 PARGANAS			
Bose Smt Shesala w/o Late Barendra Nath Bose	74, N. P. C., Ashokenagar 24 Parganas	200	23 8 79

(Continued on 3rd cover)

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

আজ থেকে প্রায় চুয়ান্নবছর বহুর পূর্বে বাংলা দেশের একটি পল্লীগ্রামে একটি অগ্নি-শিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার নাম ছিল রাসবিহারী বসু এক পরবর্তীকালে যিনি বিপ্লবী মহানায়ক হিসাবে খ্যাত, সমাদৃত এবং ইতিহাস-বিদ্রুত হয়ে আছেন। আমরা একথা বলতে পারলে খুসী হতাম যে ‘আমের বসু মহাশয়ের’ নেতাজী ঐ ভাবেই তাঁকে সম্বোধন করতেন বলে জানা যায়। প্রতিযোগী সম্মানে আমাদের দেশবাসী দেখিয়েছেন এবং তাঁর জীবন ও বাণী অসু-সরণের মাধ্যমে নিজেদের জীবন উন্নত করতে চেষ্টা করেছেন। হয়ত একথা সত্য যে দেশের মানুষ সব সময় তাদের সমকালীন মহামানবদের গুণাগুণ সঠিক ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেনা, তাঁদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় বহু বছর পর এবং এষ্ট মূল্যায়ন চলতে থাকে ধারাবাহিক ভাবে। আমাদেরও প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস যে দেশপ্রেমের প্রাচলন্ত বিগ্রহ রাসবিহারী বসুর ক্ষেত্রেও সেটা নিশ্চয়ই হবে এবং দেশবাসী তার আদর্শনিষ্ঠা, দেশহিতৈষিতা ইম্পাত কঠিন সতর্ক, বিপ্লবীর অকুতোভয়তা ও নৈবাস্তিক নিম্পূহা প্রভৃতির সঙ্গুণাবলী থেকে অহুঃশ্রয়ণ লাভ করবেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রাসবিহারী বসু একটি অনন্ত, অবিস্মরণীয় চরিত্র। সশস্ত্র অত্যাধুনিক যুদ্ধে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লুপ্ত মূল্য করে, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম প্রয়াস করেছিলেন, রাসবিহারী বসুই। তাঁর বিপ্লবের পরিকল্পনা ছিল পেশোয়ার থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ২৬টির মত ক্যান্টনমেন্টে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মধ্যে। ১৯১৫ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী সেই বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং সামরিক অত্যাধুনিক সফল হত নিশ্চয়ই, যদি না বিশ্বাসঘাতক কয়েকটি লোক তাঁর পরিকল্পনাটিকে ধ্বংস করে দিত। মহানায়কের সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়েছিল তাঁর জীবন সাব্যস্তে আজার হিন্দ কোজ সংগঠনের মাধ্যমে, যার নেতৃত্বভার তিনি খেঁচায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অবশ্য নেতাজীর অবদানও এ ব্যাপারে অসামান্য ছিল। বস্তুতঃ রাসবিহারী ও নেতাজী একে অন্যের পরিপূরক ছিলেন। একজনের বোবনের স্বপ্নকে অস্ত্রজনা সাক্ষ্যমণ্ডিত করে বাস্তবায়িত করেছিলেন। কিন্তু কি গভীর পরি-ভাষণের কথা, ভারতমাতার এই দুই উজ্জলতম সন্তানদের কীর্ণি কাহিনীর মূল্যায়ন সঠিকভাবে হয়নি। বরং তাদের গৌরবোজল অবদানকে ছোট করে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন কয়েকজন অর্বাচীন ও হীনমনা মানুষ। অবশ্য তাদের এতে বিশেষ কিছু এসে যাবেনা। তারা কোন প্রাথমিক লোভে দেশসেবা করেন নি। নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে কাহাল হয়ে ভারত-মাতার লুপ্ত মৌচন করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। একটা জাতি যদি তার প্রকৃত

ইতিহাস না জানে এবং দ্বারা ইতিহাস-পুঙ্খ ভাদের প্রভা নিবেদন না করে, তবে সে জাতির উত্থান হয় হ্রদ্বর পরাহৃত। স্মৃত্যং রাসবিহারী বহুর মত নেতাদের যদি প্রভা না জানান হয়, তবে সমগ্র জাতির শাঙ্ক সেটা কলর ও অপমানের কথা।

রাসবিহারী বহুর জন্মলগ্নেই তার মনের মণিকোঠায় বিপ্লবের বীজ উগ্ধ ছিল। রাসবিহারীর বয়স যখন মাত্র পনরো, তখনই তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। আঠারো বৎসর বয়সে বৈশ্বিক কাল্পে তার হাতে বড়ি হয়। প্রধানতঃ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁর সন্ন্যাস নাম নিরালম্ব থামা) প্রেরণায়ই তিনি বিপ্লব অস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ক্রমে অমূল্য সন্মিত্তির প্রতীক্কা—নেতৃত্বশ্বের সঙ্গে তিনি সংযোগ স্থাপন করে, দেশব্যাপী বিপ্লববাহি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য উত্তর ভারতেই একজন বড় বিপ্লবী সংগঠকরূপে তাঁর প্রতীক্কা ঘটে বিশেষ করে। কিন্তু তিনি আকলিক বা গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করেননি।

তখনকার দিনেই রাসবিহারীর দূরদৃষ্টি কত গভীর ও হৃদয় প্রসারী ছিল, সেটা তাঁর নিজের কথাতেই বলা যায়। তিনি বলেছিলেন “ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ অবশ্য দেশের স্বার্থের প্রতিকূল হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু উদাহরণ আছে যেখানে দেশের স্বার্থের উর্ধ্বে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ রাখতে গিয়ে জাতি হয়েছে ধ্বংস।” এই সঙ্গে আকলিক এবং জাতিগত স্বার্থ শূন্য গুটি বোগ করলেই মনে হবে আজকের দিনের পঙ্কিল আবহাওয়াকে লক্ষ্য করেই তিনি একথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন “আমাদের একমাত্র ভ্রত হওয়া উচিত—আমাদের মন, শক্তি এবং সম্পদ সমস্ত দেশের স্বার্থে নিয়োজিত করা।”

রাসবিহারীর মধ্যে অহং বোধ আদৌ ছিল না। তাঁর হৃদয়ের উক্তি হল : “বিপ্লব মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষ বহু হিসাবে ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ করে। দ্বারা এই পরিবর্তন ঘটাবার তার পান, তারা ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হন। দৈবী শক্তি তাদের মধ্যে অবিস্কৃত হয়। সুদীপ্যমান বহু, প্রেক্ষণ চাকী, কানাইলাল দত্ত। মনলাল বিড়ো ও অজ্ঞানদের মধ্য দিয়ে ভগবান নিজেই কাজ করে গিয়েছেন।” রাসবিহারী বা নেতাজী এই আদর্শের বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাদের কোন ব্যক্তিগত লোভ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে অসম্ভব। আমরা মনে করি রাসবিহারীর নৈরাশ্র বিজয়ী নিষ্ঠা, আবাশ সহিষ্ণুতা, প্রেক্ষলন্ত দেশপ্রেম “ভগবৎ বিশ্বাস, সবার মঙ্গলের জন্য সর্বত্র ভাগ করার ভ্রত, শুধু এসেই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, সর্বকালে ও সর্বদেশে, অনুপ্রাণিত করবে। নিজের কীতিস্তম্ভ তিনি নিজেই স্থাপন করে গিয়েছেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করে নিজেদেরই ভ্রত করব। এটা করতে পারলে, তাঁর পৌরব যতটা বৃদ্ধি হোক বা না হোক, না করলে আমাদের অঙ্গোরব বাড়বে।

তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আমরা রাসবিহারীর উদ্দেশ্যে সন্ত্রস্ত প্রণাম নিবেদন করি। এই বিপ্লবী মহানায়কের জয়গনি করি।

জয়কু রাসবিহারী।

সর্বনাশের পথে

বিশেষ প্রতিনিধি

বেল কিছুদিন ধরে পোটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অরোাস্যতা, যে অশান্তি, যে বার্ষিক্যের নমুনা প্রকট হইতে উঠেছে বিভিন্ন স্তরে এবং ক্রমান্বিত্তির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছে, তাতে দেশের মানুষ শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন সকলের ভবিষ্যৎ নিয়ে। রাজ্যটাকে কি শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের অভ্যন্তর তলে ডুবিয়ে দেবেন বর্তমান রাজ্যতন্ত্রের প্রশাসকেরা? কিন্তু সর্বনাশের অভ্যন্তর তলে নিয়ে যাবার জন্য কোন নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় না। এ সত্য কি সমাজ উপলব্ধি করতে পারছেন না। রামফ্রন্ট সরকার ও তাঁদের শরিক দলগুলি? অন্ত্যায়, অব্যবস্থা ও সমাজ বিধোদী কাজকর্ম শুধু চলছেই না; বরং উন্নয়নের বেড়ে চলছে, তার অবদান খটাত্তে না পারলে, এতদিন তাদের উপরই 'ব্রহ্মাণ্ড' হয়ে কিংবদন্তি আসার সম্ভাবনা কি একেবারেই অমূলক?

বিদ্যায় পরিহৃতি যে শুভরূপ রূপ ধারণ করেছে, সেটা একদিনে হয়নি। এই সরকার ক্ষমতার আসার পর পূর্বভূমি সরকারের উপর সব বার্ষিক্যের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে নতুন করে এই বিভাগের কার্যকর্ম সম্বন্ধে কোন নিরূপক সমীক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করেননি। ভেবেছিলেন অন্তের উপর দোষারোপ করেই নিজেদের সকলতা অর্জন করতে পারবেন। বিদ্যামন্ত্রী অবশ্য ঘটনার চাপে ব্যতিব্যস্ত ও প্রায় শিশেহারা হয়ে সেদিন স্বীকার করেছেন যে তিনি এই সমস্তার গুরুত্বটা প্রথম দিকে উপলব্ধি করতে পারেননি। অবশ্য ইতিহাস বলে তিনি কোনদিনই বিদ্যা-এর সমস্তাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। প্রায়ত ডাঃ বিধানচন্দ্রের বিদ্যাঃ উৎপাদনের পরিকল্পনাটাকে তিনি পরিহাস করে বলেছিলেন যে “এত বিদ্যাঃ নিয়ে কি হবে এবং বিদ্যাঃ কি আমর। ধাব?” শুধু তাই নয়, শোনা যায় তাঁর অর্থমন্ত্রীর আমলে তিনি এই পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি নাকি এক সময় একথাও বলেছিলেন যে ক্ষমতা পেলে তিনি সাতদিনের মধ্যেই বিদ্যাঃ সমস্তার সমাধান করে দেবেন। বাহক বিদ্যাঃ-এর প্রয়োজনের পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আজ নতুন নয়। এটা বহু পুরাতনো রোগ। অষ্টের পরিহাস যে সেই বিদ্যাঃ বিভাগের দায়িত্ব তাঁর তিনি নিজের হাতেই রাখলেন। ফলশ্রুতি হল, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আজ নান্দিত্যঃ উঠেছে বিদ্যাঃ-এর অভাবে। সবচেয়ে ভীষণ আতঙ্কের কথা হচ্ছে যে এই দুবিসহ অবস্থার শেষ কোথায় তা কেউ জানে না। তাঁদের মতে বৈরতাত্ত্বিক সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। কেন্দ্র কিন্তু ঢালাও সাহায্য দিতেও রাজী। কিন্তু

গণজন্মের একমাত্র জনস্বার্থী বামফ্রন্ট সরকার সে সাহায্য কাজে লাগাতে পারছেন না সমস্ত গলদ দূর করে। প্যারীটা সম্ভব নয়। যে দলবাজী আজ বিদ্যাপাশন ব্যাহত করেছে, নিত্য নতুন সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, কর্তব্যকর্মে অবহেলা করেও যারা বহাল তবিয়তে সরকারী রাজকোষ থেকে ভালব নিচ্ছেন, জনস্বার্থ সর্বস্তরে ক্ষুর করেও যারা কোন সাজা পাচ্ছেন না, যে বাসভোগ্যকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ওখানে, তাঁর সব দায়িত্ব অস্ত্রের উপর চাপিয়ে দিয়েই কি বাধ্যতা গ্রহণের অসমর্থতার দোষ থেকে সরকার ও তার অঙ্গগত দলগুলি নিষ্কৃতি পেতে পারেন? এই গেল একদিকের চিত্রটা। নতুন করে যে সর্বনাশের অশনি সংকেত পাওয়া যাচ্ছে, সেটা হল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সেদিন বড়তলা থানার উপর জনতা আক্রমণ করেছে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে মবার ফলেই! বর্ধমানের একটা থানার উপরও আক্রমণ চলছে বলে সংবাদে প্রকাশ ইংরেজ আমল থেকেই পুলিশের সুনাম কোনদিন ছিল না। জনস্বার্থ রক্ষা করার শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়নি। তবুও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার একটা নির্দেশ ছিল। কিন্তু আজ! যেনে প্রতিদিনই ডাকাতি হচ্ছে, চুরি বাহাদুরি সংখ্যাভীত। পাড়ায় পাড়ায় বোমা, ছুরির অব্যবহারের ফলে নিরীহ ভক্ত নাগরিকেরা ভীত ও সন্ত্রস্ত। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও যোগা নেতৃত্বের অভাব আজ পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতা পুলিশকে চূড়ান্ত অপস্বার্থ ও প্রায় অর্থহীন করে ফেলেছে। যেটুকু বা বাকি ছিল তাও বৃষ্টি ধলীয় স্বার্থে নবগঠিত নতুন একটি সংগঠনের জন্ত, সেটা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া কেলিয়াছে। ইসলামপুরে অত্যাচারী পুলিশদের ভিন্ন জেলার বদলীয় আদেশ তড়িঘড়ি প্রত্যাহার করা হইয়াছে, এই সংস্কার চাপে। এতে কি বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না? সরকারের এই অদ্ভুত মতিগতি দেখিয়া মনে হয় না যে তারা অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চান। সরকারই যদি পুলিশ বিভাগে শৃঙ্খলা, কর্তব্য পরায়ণতা, নিষ্ঠা ফিরিয়ে আনার চেয়ে রাজনৈতিক অমুগ্রবেশ ও দলগত স্বার্থ সাধন করতে বেশী আগ্রহী হন, সেখানে প্রতিকারের আশা স্রূণের পরগত। রাজ্যের পুলিশবাহিনী যদি এইভাবে আবেগে চলে, তবে বড়তলার মত ঘটনা, এই নগরীতে ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে আরো ঘটতে পারে, এই সত্য একমাত্র বন্ধ উদ্ভাস ভিন্ন সকলেই অস্বীকার করতে পারেন। রাজনৈতিক নেতাদেরও সতর্ক থাকার দরকার যে পুলিশের আশ্রয়তা হারাতে, তাদের জীবনও বিপদ মুক্ত থাকবে না। পুলিশ প্রহরাত্তেই শুধু বড় বড় নেতারা চলাকোঁচা করেন। তাঁদের জীবনের মূল্য আছে, কিন্তু জনসাধারণের জীবনটা কি এতই যে তাদের দিকটা ভেবে দেখবারও কোন প্রয়োজন নেই? এই কি জন দরদের নমুনা?

বে ভরাবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তার মোকাবিলা করতে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, শিক্ষক ও চিন্তাশীল মানুষদের নিয়ে গোল টেবিল বৈঠক করার ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। এই সমগ্রাণ্টিক জাতীয় সমস্যা বলে গ্রহণ করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। অগ্রদূত সন্থ বিপদ থেকে কারো পরিত্রাণের পথ দেখা যায় না। স্বাভাবিক সলিলে ডুবে মরতে চাইলে, সেটা অগত্যা আলাদা কথা।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

(চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জ্বলন্ত ২১শে এপ্রিল অঙ্কনানে পঠিত)

—ওয়েলসলি দাস

মাননীয় সভাপতি ও সমবেত বন্ধুবান্ধব,

আজকের অঙ্কনানে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করার আমন্ত্রণ পেয়ে মনে হয়েছে এই মহান বিপ্লবীর কর্মকাণ্ড একটা মহাভারত, এই সমাবেশে সীমিত সময়ের মধ্যে এই কর্তব্য সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন পাবিহ। ভারতের নবজাগরণের যুগ হতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত এই দীর্ঘ প্রায় ৫০ বৎসর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যার অবদান অনস্বীকার্য, অথচ দেশবাসীর নিকট এখনও যা অস্পষ্ট সেই ইতিহাস আপনাদের নিকট উত্থাপন হলে ধন্য। সময়সাপেক্ষ, আপনাদের ধর্ম-চাতিরও সম্ভাবনা। কাজেই সামান্য সময়ের মধ্যেই এই বিপ্লবী মহানায়কের বৈশিষ্ট্য ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সামান্য রূপরেখা আপনাদের নিকট নিবেদন করার চেষ্টা করব।

আমাদের দেশে রাসবিহারী বসুর মত একজন লোকের আবির্ভাব বিস্ময়কর। এমন জন্ম প্রকৃতি যা এতটুকু নোয়াতে পারেনি, এমন উগ্র পুরুষকার বা সকল বিষ় উপেক্ষা করে নিজেকে অব্যাহত রেখেছে, এমন উন্নত শির যা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐর্ষ্যের নিকট অবনত করেনি, এমন বেগবন্তী ইচ্ছা যা সর্ববিধ তর্কগত থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে এমন একটি মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৮৬ সালের ২৫শে মে বর্ধমান জেলার সবলদহ গ্রামে।

পিতা বিনোদবিহারী বসু, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। শৈশবেই মাতৃহারা হন। চন্দননগরে বাল্য জীবন ও কৈশোর কাটে। চন্দননগর ডুগে স্কুলের ইতিহাস শিক্ষক কামালউদ্দিন চৌধুরী, লক্ষণ সেন গঠিত প্রাচীন ঐতিহাসিক বিদ্যালয় ইতিহাস বলে উল্লেখ করে বাঙ্গালীকে ভীক ও কাপুরুষ বলার প্রতিবাদে স্থল হতে বহিস্কৃত হন এবং কলিকাতায় একটি স্কুলে ভর্তি হন। মৌলভী সাহেব উক্তির সন্তুষ্ট দেখায় প্রয়াসে বালক রাসবিহারী খুজতে লাগলেন ক্ষুদ্রশক্তির আরাধনাক কেন্দ্রস্থল।

তখন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, সতীশ চন্দ্র বসু ঐক্যবিন্দু, ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী সারদানন্দ, দ্বার্যাম গণেশ্বর দেউস্বর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ব্যারিষ্টার গুবরেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখের নেতৃত্বে অমূল্যলীন সমিতি কলিকাতা ও আশেপাশে শরীর চর্চা ও ক্রীড়ার মাধ্যমে যুবকদের সংগঠিত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বরোদা হতে ঐক্যবিন্দুর নির্দেশে যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিবানন্দ স্বামী) কলিকাতা এসে অমূল্যলীন সমিতিতে যোগ দেন এবং যুবকদের সামগ্রিক শিক্ষার ও শৃঙ্খলায় শিক্ষিত হতে উৎসাহ দিতে শুরু করেন। রাসবিহারী বসু কলিকাতায় স্কুলে ভর্তি হয়েই অমূল্যলীন সমিতির কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন এবং যতীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য লাভ করেন। আর্থিক অনটন হেতু ১৯০৫

সালে সিমলায় পিতার অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে দেওয়ানে কয়েক অফিসে বড়বুর্ চাকরী শেলেন এবং ইংরেজ অফিসদারদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন, তখন রাসবিহারী বসুর বয়স মাত্র ২০ বৎসর। রাসবিহারী বসুর ছাত্রজীবনে বিশেষ মেধার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু রাসবিহারী বসু ভারতীয় ও বিদেশী ভাষা ঐ ভাষা-ভাষী লোকদের মত বলতে পারতেন। পলাতক জীবনে এই কৃতিত্ব বহু অসাধ্য সাধন করেছেন, পুলিশের লোকদের কাঁকি দিতে সমর্থ হয়েছেন। ছদ্মনামে জাপানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পাসপোর্টে সংগ্রহের সময় অভ্যর্থনা অফিসার কর্তারী মহিলাকে সঙ্গে কর্তারী ভাষার কথা বলে মহিলাকে মুগ্ধ করেছিলেন এবং কাজ হাসিল হয়েছিল।

দেওয়ানে থেকেই উত্তর ভারতে লালা হরদয়াল ও জীতেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী গোষ্ঠির সংস্পর্শে আসেন, পরে চন্দননগরের মতিলাল রায় ও অমূল্যলীন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রাসবিহারীর নেতৃত্বেই অমূল্যলীন সর্বভারতীয় সংস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং বিভিন্ন নামে অমূল্যলীন সমিতির শাখা দুনিয়ার সর্বত্র বিশেষ করে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে।

রাসবিহারী বসুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বৈপ্লবিক প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়—১৯১২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর নতুন রাজধানী দিল্লীতে রাজকীয় প্রবেশের দিন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের কার্যকলাপে। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর প্রবর্তিত বঙ্গবিভাগ রূপ করে মর্জিন্দিকো সংস্কার আইনের বেড়াফালে সংস্কারপন্থীদের টেনে আনা হল, ভারত-বাসীর আত্মা ও সহযোগিতা পাওয়ার আশায়

দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। নব পর্বায়ে ব্রিটিশ শাসন উত্তোষন প্ররাসে দিল্লীতে রাজকীয় প্রবেশের দিন ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করে ভারত-বাসীর সক্রিয় বিক্ষোভ প্রদর্শনে রাসবিহারী বসু রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংরেজের স্থিতিশীল রাজত্ব করার দৃষ্ট চর্প-বিশৃঙ্খল হয়েছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর গেম নিক্ষেপ পরিকল্পনার বস্তু বিবাসকে সংগ্রহ করা, তাঁকে বোমা নিক্ষেপ শিক্ষা দেওয়া, পরীক্ষা, নিরীক্ষা করে বোমা সংগ্রহ করা, বিষম সুরকারী কর্মচারীরূপে নিজের ক্ষমতা পরিচয় পত্র সংগ্রহ করা, বোমা নিক্ষেপ সম্পন্ন করে বস্তু বিবাসকে লাহোর গামী গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে নিজে দেওয়ানে চলে আসা, দেওয়ানে রাজকর্মচারীদের সভায় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের নিম্না হুচক বক্তৃতা প্রদত্ত বিশেষণে রাসবিহারী বসুর অদৃষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি ও বৈপ্লবিক নির্বিকার চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। দেওয়ানে রাজকর্মচারীদের সভায় রাসবিহারী বসুর বক্তৃতা শুনে গোবেন্দানগরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রমীল বোব তাদের কাজে সাহায্য করার ক্ষমতা রাসবিহারী বসুকে দীর্ঘদিনের ছুটি দিয়ে বাংলার পাঠাঘ। এই সময় প্রভুস চন্দ্র গাঙ্গুলী ও রাসবিহারী বসু কলিকাতার একত্র বাস করতেন, প্রভুস চন্দ্র গাঙ্গুলী তখন বরিশাল বড়বসু মামলার পলাতক আসামী।

সারান্ডারত ব্যাপি সমস্ত অধ্যাখণ রায় ইংরেজকে পরাজিত করে স্বাধীন ভারত গঠন করার উদ্দেশ্যে রাসবিহারী বসু অমূল্যলীন সমিতি সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দলের নেতৃস্থানীয়দের নিকট গোবেন্দা বিভাগের বং সংগ্রহ করে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা এবং গোবেন্দা হেড অফিসে দর

পৌছোবার আগেই গোয়েন্দা বিভাগের কার্যকলাপ জানার ব্যবস্থা রাসবিহারী বন্ধু করেছিলেন। সেই ক্ষুদ্র দীননাথের বিশ্বাসঘাতকতার রাসবিহারী বন্ধু হাড়িছের উপর বোমা নিক্ষেপের নেতা গোয়েন্দা হেডক্বার্টার্সে পৌছার আগেই রাসবিহারী সম্পূর্ণ আত্মপোষন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অভ্যুত্থানের আয়োজনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে। যুদ্ধে বিপর্যস্ত হওয়ার সময়ই ভারতে ইংরেজ শক্তিকে চূড়ান্ত আঘাত দিতে হবে এই যুগান্ত নিয়েই রাসবিহারী বন্ধু সংগঠন করার কাজে দ্রুতী হন এবং সমিতির কর্মীদের বিভিন্ন সৈন্য বাহিনীতে ও স্থানে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেন। সেই সময় অসুশীলন সমিতির প্রথম সারির নেতা প্রায় সবই গ্রেপ্তার। রাসবিহারী বন্ধুও কেরারী, ডাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ইংরেজ সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ, প্রচুত অর্থব্যয় এবং প্রেলোডন দেখান সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় নাই। কখনও কানুলিওড়াল্লা, কখনও পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী, কখনও রাজস্বায়ী জমিদার, কখনও পুজারী ডাক্তার, কখনও সরকারী কর্মচারির পত্রি, কখনও রেলওয়ে কুলি, কখনও জমাদার পরিচরে সমস্ত উত্তর ভারত পর্যটন করে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে সংগঠিত করেন। সাধারণ লোকের নিকট পরিচয় ছিল চূচ্চল নাথ দত্ত।

শেখোয়ার হতে সিলাপুর পর্যন্ত ২২টা মিলিটারী ক্যাপ্টেনম্যান্টের টাঙ্কবাহিনী এবং বাংলা দেশ, পাঞ্জাব অস্ত্রস্থানে বিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত হয়। আমেরিকাতে গদর দল, জার্মানীতে বালিন কমিটির নেতৃত্বে বিপ্লবীরা এবং

বিসেম্বের অস্ত্রস্থ স্থানের ভারতীয় বিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থান সফল করার জন্য এগিয়ে আসে। ভারতে সিপাহীরা বিপ্লবের ঘোষণা করলে রাজ্যমহেন্দ্র প্রতাপ মুকী অধ্যাপক এবং অজিত সিংহের নেতৃত্বে কানুলিওড়ার থেকে আক্রমণ পরিচালিত হবে স্থির হয়। কেবলমাত্র সৈন্যরাই এই অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করবে না, সেই সঙ্গে বিপ্লবীদের কর্মীবৃন্দ, তাদের সমর্থক এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত জনগণও একই সময়ে বার্মা, সিলাপুর সহ সারা ভারতে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ্বাসদাতক কৃপাল সিং অভ্যুত্থানের সংবাদ ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগে ফাঁস করে দেওয়ার ইংরেজ সরকার ভারতীয় সৈন্যদের বন্দী করার চেষ্টা করে, কিন্তু সৈন্যরা আদেশ মেনে নেয় না। বাপক হরপাকড় শুরু হয়, সংঘর্ষ হয়। কিরোজপুরে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদের তুমুল লড়াই হয়, ৪০ জন ভারতীয় সৈন্য মৃত্যুবরণ করে, অনেক আহত হয়। অস্ত্রস্থ স্থানেও সংঘর্ষ হয়। সিলাপুরে ভাগিওরানের নেতৃত্বে 15th mohammadan platoon এবং 35th Sikh Regiment স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রায় এক সপ্তাহ নিজেদের শাসন কার্যে রাখা।

সৈন্য শ্রোণীর উপর কর্তার নিগ্রহের কলে তাদের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার আপাততঃ সৈন্যদের সাহায্য পাওয়া বাবে না, তাই অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাসবিহারী বন্ধু ১৯১৫ সালের ১২ই মে পি. এন ঠকুর ছদ্মনামে ক্রিমিগপুর ডকের ১২ নং বার্ষ থেকে 'সাহুকী মার' জাহাজে জাপান চলে গেলেন। ভারত জাতির পূর্বে রাসবিহারী পত্র সহকর্মীদের বলে গেলেন, 'সংগঠন বন্ধ। কল্প. যুদ্ধের শেখাভ্যেয়ক বিপ্লবী চেতনাধ উদ্ধৃ করে দল হ্রস্ত করতে থাকুন,

সৈন্যদের মধ্যেও সংযোগ রাখার চেষ্টা করবেন খুব সম্ভবশ্যে।'

জাপানে পৌঁছেই রাসবিহারী অবনী মুখার্জি ও গদর দলের নেতা ভগবান সিং-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে জার্মান কনসাল জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দুই জাহাজ বোকাই অস্ত্র সম্ভার ভাঙতে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই সংবাদ নিয়ে অবনীমুখার্জি ভারতে আসার পথে সিঙ্গাপুরে চূত হন। ভল্লাসী চালিয়ে তাঁর কাছে একটি নোট-বই পাওয়া যায়। এই নোট-বই হতে ইংরেজ গোয়েন্দা অনেক ফেরারী বিপ্লবীদের নাম উদ্ধার করে এবং ভারতে বিপ্লবীদের কাছে অস্ত্র পাঠাবার পরিকল্পনাও জানতে পারে। বিচারে অবনী মুখার্জির মৃত্যুদণ্ডদেশ হয়। সিঙ্গাপুর কোর্ট থেকে অবনী মুখার্জী জার্মান দুর্ভবলী ও স্থানীয় বন্দীদের সহায়তার পলায়ন করে।

অস্ত্র-প্রেরণ প্রতিরোধ করার জন্য বঙ্গোপসাগরে ব্রিটিশ রণতরীর টহল শুরু হল। ভারতে বিপ্লবীদের ঘাঁটির উপরও আক্রমণ আরম্ভ হল। বিপ্লবীরাও আপসে পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই। ১৯১৫ সনের ২ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে বুড়িভাণ্ডারের তীরে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধে আত্ম-হতি সেনা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ও তাঁর চারজন সহকর্মী, চিত্রপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীহারেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ পাল। ১৯১৮ সালে ৭ই ও ৯ই জাম্বুদ্বারী গোরাটী আটলাও ও নবগ্রহ পাহাড়ে বিপ্লবী নলিনী কান্ত ঘোষের নেতৃত্বে দলীয় পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয়। সিরাজগঞ্জ আটখড়িয়া তেলিকা গ্রামে পুলিশের সঙ্গে গুলিবিদ্ধ ও নিহত পালের সঙ্গে দীর্ঘ সময় সশস্ত্র লড়াই হয়। এই ধরনের লড়াই বাংলার

বাইরেও হয়। ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন ঢাকা শহরে কলভাবাজারে সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে বিপ্লবী নলিনী বাগ্‌চি ও বিপ্লবী তারিণী মজুমদার তত্বাবধান করেন, মুন্সী শিবের মুন্সী অবস্থায় পুলিশ নলিনী বাক্‌চীকে প্রহরণে জর্জরিত করলে নলিনী বাগ্‌চির উত্তর Don't disturb let me die peacefully বিপ্লবীদের মরণভয়ী সংগ্রামের আদর্শ ইতিহাসের পাতায় মহীয়ান হয়ে রয়েছে। অহাশ্বান পদ্মাস্ত্র করে ইংরেজ সরকারের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম কলভাবাজারে নলিনী বাক্‌চী ও তারিণী মজুমদারের খণ্ডযুদ্ধ।

১৯১৫ সালের মে মাস হতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত রাসবিহারী বসুকে জাপানে গলাতক অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। সেই সময় পূর্ব এশিয়ায় মহান নেতা মহাত্মা গান্ধীর মহানায়ক সানাইয়াত, সেনা এবং জাপানের রায়্‌ ডাঙ্গন সমিতির নেতা ওয়াম প্রমুখ রাসবিহারী বসুকে এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের অগ্র-পথিক্রমে গ্রহণ করেন। সাত্ত্বাক্ষাৎ থেকে মুক্ত করতে হবে এশিয়া, তাহলে মুক্ত করতে হবে ইংরেজ ভারত, ভারতের মুক্তি এশিয়ার মুক্তি এই চিন্তাধারা ও আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে টকিও, বিশ্ব-কিলালরে রাসবিহারী বসু শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং ইংরেজী ও জাপানী ভাষার বহু গ্রন্থ ও পুস্তক প্রকাশ করেন। রাসবিহারী বসু একজন বিপ্লবী, তার জীবন যে কোন মুহূর্তে সম্ভাব্য হতে পারে। ইংরেজের হাতে পড়লে ক'সি নিশ্চিত জানিয়াও রাসবিহারী বসুর আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে সম্ভাব্য সোম্য পরিবারের অষ্টাদশ বহুকা বিশ্বকিলালের হাতী তেওঁিকা ১৯১৮ সালের প্রথম দিকে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং রাসবিহারী

বন্ধুকে চোখের মনির মত হৃদয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে একটি নিশ্চ পুত্র এবং একটি শিশু কন্যার ভার রাসবিহারী বন্দ্যু উপর অর্পণ করে, স্বামীকে মুক্তি সংগ্রামের অগ্রপথিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে ভোমিকা ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একাধিক বিদেশী মহিলার অবদান আমরা স্মরণ করি, ভোমিকার অবদানও আমাদের স্বীকার করতে হবে।

১৯২৪ সালে রাসবিহারী স্থাপন করলেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লিগ। ১৯২৬ সালে 'অল এশিয়া পিউপিলস অরগানাইজেশন'-এর বাংলা স্থাপন করলেন শিকিৎসা, সাংগাই, ফরমোসা, কোরিয়া, টকিয়ো, ইয়াকোহারা, নাগাপাশিকিৎসা, হিরোসিমা, ব্যাংকক, ছাভা, বালি, সুমাত্রা, হংকং প্রভৃতি স্থানে। ১৯৩৩ সালে গড়ে তুললেন ভারত-জাপান মৈত্রী সীমিত ও টকিয়োতে 'ভিলা এশিয়ানস্'। সারা পূর্ব এশিয়ায় চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে অগ্রদূত পাল্টাচাল দেশগুলি হতে শোষণমুক্ত করার আন্দোলন জোরদার হল। ১৯৩৭ সালের ২৮শে অক্টোবর টকিয়োর সাংকায়োতে নিখিল এশিয়া যুব সম্মেলনে রাসবিহারী ভাষণ দিলেন 'এশিয়া-বাসীর জন্য এশিয়া, সাপা মানুষ কিংবদন্তি'।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বেধে গেল। জাপানে এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির বিরুদ্ধে ১৯৪১ সালের দিকে যুদ্ধ বোষণা করে। রাসবিহারী বন্দ্যু 'ইণ্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্ট লিগ'-এর সভাপতিরূপে জাপানী সামরিক বিভাগের সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মিত্র রাষ্ট্রের ন্যায়িক গণ্য করার চুক্তি করলেন এবং টকিয়োতে জাপানবাসী ভারতীয়দের নিয়ে গঠন করলেন 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'। ১৯৪২

সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব এশিয়াতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করার সমস্ত রাসবিহারী আহ্বান জানানলেন 'বহুদেশে ও বিদেশে ভারতীয় ডাক্তার, বিগত একদশ বৎসর যাবৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে আসছি, সহস্র সহস্র ভারতবাসী এই বিরাট সংগ্রামে আহ্বানস্বর্গ করেছেন, কিন্তু অস্ত্রের অভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারিনি। আজ আমরা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। আগুন এই সুযোগে জিটিশের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করি।'

১৯৪৩ সালের ১৩ই জুন রাসবিহারী বন্দ্যু আহ্বানে কর্মরত থেকে নেতাজী টকিয়োতে গৌড়ান ৪ঠা জুলাই দিল্লীপুর মহাধনে ৪০ হাজার ভারত-বাসীর এক বিরাট সমাবেশে রাসবিহারী মুক্তচন্দ্র বন্দ্যুকে নেতাজী সম্বোধন করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে বরণ করেন এবং ঘোষণা করেন আমি বিশ্বাস করি স্বভাব চক্রে নেতৃত্ব সংগ্রাম বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে। নেতাজী রাসবিহারী বন্দ্যুকে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা মার্চ আজাদ হিন্দ-ফৌজ আত্মকানের পথে ভারতভূমিতে পদার্পণ করে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ভয়ংকর ও পীড়িত অবস্থা সবেও রাসবিহারী এই অগ্রদূত উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুলাই নেতাজীর অবিস্মরণীয় জাতীয় বাণী আমাদের সামনে এখন স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিপূর্ণ জয়লাভের গুরু দায়িত্ব বিস্তারন। তার জন্য প্রয়োজন অপরিমিত রক্তাক্ত। আমাদের রক্ত লাগে, আমি তোমাদের পূর্ব স্বাধীনতা দিব' রাসবিহারী বন্দ্যু রোগ শয্যায় নেতাজীর এই বাণী শ্রবণ করে তৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের পূর্ব বিকাশ লাভ করার আগেই প্রাজ্ঞ বিপ্লবী মহানায়কের জীবন

১৯৬৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী অবসান হল। জাপান সরকার রাসবিহারী বসুরকে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর সবসঙ্গে জাপান সম্রাট পরিবারের নিজস্ব শবাধারে বহন করে যোজুকী মন্দিরে অষ্টোত্তি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

কাজেই মনে হয় রাসবিহারী জীবিত থাকলে আমরা নেতাজীকে হারানাম না, রাসবিহারী নেতাজীকে রক্ষা করতে সমর্থ হতেন। নেতাজী ও রাসবিহারীর অভাবেও তাঁদের জাতীয়তা বোধ, ত্যাগের আদর্শ, ও তাঁদের সংগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ইংরেজ সরকার চাপা দিতে পারে নাই। ভারতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও জনতার মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং দৈনন্দিন ও জনতার মধ্যে বৈপ্লবিক বিস্ফোট প্রকাশ পায়। ইংরেজ সরকার ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে ‘মন্দেত ভাল নীতি’ অমূল্যবোধ করে কংগ্রেস ও লিগ,

নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জাতীয় সংহতিভিত্তি ফাটল ধরার বীজ রোপন করে বিদায় নিল। ইহা ভারতের শেখ ইংরেজ গবর্নর জেনারেল ও শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের নামক লর্ড মাউন্টবটেনেরও উক্তি। নেতৃবৃন্দ নেতাজী ও রাসবিহারীর হিন্দু, মোসলমান লিখ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় ও সকল ভাষাভাষীর মিলিত জাতীয়তা বোধ ও ত্যাগের আদর্শে দেশবাসীকে জাতীগঠনের কাজে ত্রুতী করতে ব্যর্থ হলেন। তাই আজ বিচ্ছিন্নতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। দেশকে অগ্রগতির পথে এগুতে হলে ত্যাগ ও সর্বভারতীয় জাতীয়তা বোধ জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে।

‘একতা বিশ্বাস বলিদান’ প্রোমোদের জীবনের ত্রুত হউক যুবকদের প্রতি বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর এই অমর বাণী আমাদের এগুবার পাথেয় ও দিশারী যেন হয় অরণ্য রাতে হবে।

হাফিজ সেক্টর বায়ু, অঙ্গ, সজীর্ণ ও সেক্টর বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রসাদ

আমেরা হুত কুমারী

আমুবেনিয় মতে তৈরী

মূল্য ৩.৫০ একক

ব্যক্তিগত

গ্রীষ্মকালীন চক্রবর্তী

কিন্তু কুমারী • কুমারী • কুমারী • কুমারী

4

হোতে দেখেন; হেমচন্দ্র ভারতীর মত বিপ্লবকার হুগান-
চক্রের উদ্বোধন ও নেতৃত্বের বেশের অস্তরণের যে যোদ্ধার
বা প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছিল তার অশ্রুপাত করতেও বিপ্লবীরা
বিরোধ করেন। পরম তাঁদের অসীমতা বা নিশ্চয়তা
নেতাকীর আশ্রয়কেই ছত্রিকাঘাত করেছে। বিপ্লব
সমস্ত বৈশ্বিক ইতিহাসে এমন অবস্থার ও নিঃসৃত
ইতিপূর্বে আর কখনও অদৃষ্ট হোতে দেখা গেছে বলে
আমাদের জানা নেই। অবিকল্প এই অশ্রুপাত চাক্ষু-
ষ মণ্ডলার কালের ন্যায় দৃষ্টকাল বিস্তার করে
ইতিহাস স্ফুট করেছে। এমন কি বিশ্বেরও অধিকার
বৈশ্বিক নেতৃত্বের অস্বাভাবিক অস্থায়ী প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ
মুখ্য করে বিপ্লবীরা আবেগে অভিযে নিজে চোরা
করেছেন। অশ্রুপাতের অস্তরিত বৈশ্বিক
অসামান্যকে মুখ্য করে তথাকথিত বিপ্লবী সমিতি ও
কলকলি নিঃস্রবের তৎপরতা সৈবের স্ফুটিত তথাকথিত
তাপস্বী বিস্তারের স্ফুটিত সৃষ্টি করেছেন। এই প্রত্যক্ষ
কণ্ট আচরণ ও প্রকৃষ্ট ইতিহাস বিকল্প হয়ে একদিন
সত্যের সন্ধান দেয়। ইহা অবশ্যই ঈশ্বর ইচ্ছা অদৃষ্ট

হুগে হুগে মানব প্রতিষ্ঠার লীলা দেখতে পাই। এঁরা
পৃথিবীর পাশপাশে নীতিধর্মের দুপালে, অমল সত্যের মত
প্রস্ফুটিত হোকেন কেন? কালধর্মের উদ্বার প্রস্ফুটিত
হোতেছিলেন—সংসার ও জীবের স্বীকৃতি মত। ব্যক্তিগত
বিশ্ববাসীর উপকার করে, সমস্তের বিপত্তিতে জীবনাবধি
দিয়ে তাঁরা সাধনোচিত বাসে চলে গিয়েছেন।

ঈশ্বর নেই, সৃষ্টি আছে; বস্তু নেই, ছবি আছে;
আর তবুও তাবনার ধারণে বস্তু নেই। ইতিহাসিক
জীবনচরিত্রে এই সৃষ্টি ও জীবন বোধীমান্য থাকে।
সেই সৃষ্টি হিতে আশ্রয় পড়ে মানুষ তার মনে প্রসুত হয়।
এই তেজ মানবের পক্ষে তাঁরা মহান সাধকের মত।

স্বাধীনতা বিজ্ঞান করেছেন, এই সকল মহাপুরুষের
ঈশ্বর বলে উপাসনা করা কি অসম্ভব? এই বিশ্বমানবের
চরণে সৃষ্টি হোয়ে তাঁদের এই পৃথিবীতে একমাত্র
বেদান্তকে উপাসনা করা কি পাণ? যদি তাঁরা প্রকৃতপক্ষে
আমাদের পৃথিবী ঈশ্বরপন্থীর দ্বারা বা কর্তব্য হোতে

উচ্চতর হন, তবে তাঁদের উপাসনা করতে দোষ কি?
এতে যে শুধু দোষ নেই তাহা নহে, ঈশ্বরের সাক্ষ্য
উপাসনা কেবল এভাবেই সম্ভব। বর্তমান মানুষ সমগ্রগত
মানবধর্মের অধিকৃত, ততদিন তাঁদের মধ্য অগতাই মানব
কর্মসমূহ; তাইবৎ ধর্মও মানবধর্মের তানিত এবং তাঁদের
ঈশ্বরও মানবধর্মের হবেন। অবশ্যই এমত হবে।
সেজন্য এই ঈশ্বরভাবভারসম সর্বস্ব হুগে সকল দেশেই সৃষ্টি
হোয়েছেন। ভারতীয় মহাপুরুষদের জীবনচরিত্রে
স্বাধীনতার বিশেষ প্রত্যক্ষ বিষয়ে একান্ত প্রমাণমান্য।
তিনি বলেছেন—ঈশ্বরের তিরোভাবের কিছুকাল পূর্বেই
ভারতের ইতিহাসে এক শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হোলে:
নীতান্তেই দুঃসংসার স্রবিত মত সম্ভাব্য সমুদ্রে বিচরণ
কোলাহল আশ্রয়ের কানে আসে, আর সেই লাম্বলম্ব
অদৃষ্ট উপদেষ্টা ভগবান ঈশ্বরকে মনোহর হোয়ে বিরোধ ঘটিতে
দিয়েছেন। সত্যমতঃ ভগবানের উপদেশে এই বিরোধ
কিছুকাল মলোচ্ছন্ন হোয়ে সংসার ও শান্তি এসেছিল। কিন্তু
আবার বিরোধবাবলো। শুধু ধর্মমত নিয়ে নয়, সত্যমতঃ
জাতি লয়ে এ বিরোধ চলছিলো। আমাদের দৃষ্টিতে
দুইটি প্রবল বল—প্রাচীন ও স্রবিতের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ
হোতেছিল এবং সত্যমতঃ বলের ধরে যে মহান তরঙ্গ সমগ্র
ভারতকে প্রাবিত করেছিলো তার সর্বোচ্চ আঘাত আর
এক মহা মহিমার সৃষ্টি দেখতে পাই। তিনি আর
কেবল নহেন—আমাদেরই পৌত্তম্যপায়িনি। আমরা তাঁকে
ঈশ্বরের অস্তর বলে মানি, পূজা করে বাসি, পৃথিবী এত
বহু নীতির নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই। তিনি
কর্মবানীর মধ্যে প্রেত। সেই কৃষ্ণই যেন বিশ্বের
নিয়ন্ত্রণে নিজ মন্তগুলি কার্বে পতিত করবার জন্য
আবির্ভূত হোলেন।

.....হুগের বিশ্ব—ধর্মের প্রচারের বলে যে সকল
বিচিত্র অসত্য ও অশ্রুপাত জাতি আর্য সমাজে প্রবেশ
করতে লাগলো, তাঁরা হুগের প্রচারিত উচ্চ আশ্রয়গুলি
টিক টিক গ্রহণ করতে পারেন। এক শতাব্দী মেতে না
মেতেই তাঁরা; তাঁদের পূর্ব পুরুষের মর্গ, কৃত প্রকৃতির
উপাসনা লগ্নে চলেতে লাগলো। এইজন্য সমগ্র ভারত

কুনঃস্বাভের পুণ্য লীলাকেই হোয়ে অত্যন্ত অবনত হোলো। (বাত্তবিকলংকং)সৌন্দর্যই ভীততে পৌকৃত্য ত প্রতিপাদ্যুদায় পটী করেছিল।

.....কিন্তু ভারতের জীবনীলক্ষিত তখনও নই হয়নি, ভাই আবার তগবানের আবির্ভাব হোলো। যত্ননি বার্নিক নকের এনে দেখালেন, বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণবের সাধারণ বিশেষ প্রভেদ নেই। তখন বৌদ্ধরা সকলেই তাৎপরে প্রাচীন ধর্ম কিত্তে আসতে লাগলো। কিন্তু তারা যে লক্ষণ অপ্রচীন পদ্ধতিতে অত্যন্ত হোয়েছিলো সেগুলি তি হবে—ইহাই এক মহা লক্ষণ হোলো। তখন মহাপুরুষ রাম চন্দ্রের অভ্যুদয়। তিনি ক্রান্তন গোতে উত্তম পর্বত সকলের নিম্নে উচ্চতম আরাধ্যিত উপাসনার পথ উন্মুক্ত হাঃস্রঃ। ঐ ব্রহ্মের আশ্রিত পুণ্ড্রি পূর্বে—দুর্লভমান নামকালে ঘটেছিলো। অগ্নিকাকৃত আধুনিক আধিবর্ত-বালী আচরণের মধ্যে ইতিউতমাই প্রেই। তিনি গোপীধর প্রেমোদয় ভাবেই আদর্শ ছিলেন। তাঁর তক্তিতরকে লক্ষ্য বহুসেপ প্রাপ্তি হোলো, সত্বের প্রাপে লক্ষিবারি শিক্ত হোলো। যদিও তৎপ্রবর্তিত সন্ত্রাঃের অত্যন্ত অধনতি হোয়েছে, তখন কালক্রমারে সকলেরই চেয়ে থাকে, তবাপি তাঁর লক্ষ্যায় দ্বিত্ত, দুর্বল, ভাতিহ্যাত, পতিত—স্বাঃের পরিত্যক্ত সকল ব্যক্তিরই আশ্রয়ণল। কিন্তু আমাকে সত্যও অহরোহে স্বীকার করতে হবে যে, আজিতের প্রসে আমরা প্রত্যেক বৈকল্যার্থে উপদেশে অসুখ উদারতা বৈকতে পাই: ধর্ম সন্ধে তাঁদের দত্ত সাক্ষী।

....সংস্করের দিল বিরাট বৃত্তিক, রামায়ণ ও চৈতন্যের দিল বিশাল জ্বর। এখন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হোয়েছিলো, যাঁর মধ্যে একাধারে এতদপ বৃত্তিক ও জ্বর থাকবে এবং এক অনন্ত জ্বরের আধিক্যই থাকবে—যাঁর বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকল উভাবন করবেন যেগুলি ভারত বা ভারতের বাহিরে বিবেচনা

সম্ভাব্য স্মৃতির লবণ লক্ষন করবে এবং এইজন বিশ্বব্রহ্ম লবণের ব্যাং এক সার্বভৌম বর্ষপ্রকাশ করবেন। এইজন এক ব্যক্তি অসম্প্রদয় করেছিলেন এক আশি করেক বর্ষের তাঁর চরিত্রকে বলে শিক্ষা পাবার পৌত্তাপ লাভ করেছিলেন। এই মহাপুরুষ ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ব প্রকাশস্বরূপ মুদ্রাঃর্ষ মহোদয় শ্রীহামকক। (যাবী ও রচনা ৫৫ ও ৮ম বর্গ)।

ঐতিহাসিক নীতিলঙ্ঘনে সত্যের প্রকাশন প্রক্রিয়া। বিদ্যার আত্মী ইতিহাস প্রত্যাধিকৃত। বিদ্যি অকল্যাঃ-কর নীতি—সংস্কারে সমাজ বহন একটা অলঙ্ঘ্যতনের তপ-পরিগ্রহ করে, তখন ইতিহাসই তাকে ভাঙবার জন্য হাঃস্রের বিভারবোৎক সন্ত্রা উল্ঘাটনের প্রতি অসুঃলিলাকেত করে এবং নুতন করে বিরোধ ও অসুঃলিলানে আগ্রহ জন্মায়। বৃত্তাঃ কবি বংকিমচন্দ্রের ধোঃচিত অসংগেঃগণ ও বামী বিবেকানন্দঃ ব্যাপ্ত পর্থাঃলোচনা আমাদের সেই শিক্ষাট দেয়।

আজ ধর্মী উদ্যমরা উন্ন বর্ষের রাজনীতির মিশ্রনে ব্যতাবসেপ প্রচণ্ড কড় তুলেছে। হাঃস্রের দিল সান্নাঃিক পরিত্রাঃ ও বাহিরের অতিশাঃ ব্যাঃগাঃিক জীবনে একটা বিশাল নৈলিলা ও বিভ্রান্তির আবহ সৃষ্টিঃ কলে বিধের অর্থনীতি আজ যোরস্বভাবে বিপদেই লক্ষ্যীন। পরমহংসদেব বলতেন 'পারে একটা কাটা কুটে সেই কুটা তুলতে আর একটা কাটার প্রয়োজন হয়। পরে কুটাকেই বেলে দিতে হয়।' অপরের প্রতি লক্ষ্য মাঃ না ব্যাঃলে ইশ্বরই যা লক্ষ্যনঃ হবেন তেই। আলল কথা 'জীবে প্রেম করে বেই জন, সেই জন সেখিয়ে ইশ্বর।' তাই নেতাঃী হুঃঃঃ বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র কালঃদঃকলের হই বেচে জন্ম নেহনি, বিবেকানন্দঃের চিন্তায় তা আদিকৃত।' যাহূঃ একটা বিবীল না করলেও ইতিহাসের প্রতিঃপাঃ গ্রন্থের অধ্যাঃটি সে অবতাই স্বীকার করতে পারবেন।

উদ্ভাস্তদের স্বাভাবিক নাগরিক গণ্য করার দাবী

All India Committee for the protection of Bengalees and other minorities of North Eastern region এর General Secretaryর অনুরোধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করা হল—স: বিশ্ববী বাংলা।

INDIA IN PERIL

Since the independence India has never faced such danger as it does today on the issue of identification and deportation of foreigners from Indian soil. Almost the entire North-Eastern Region of the country is in tumult over it. Vast masses of people have become involved. secessionist ideas are gaining ground, horrible atrocities have been perpetrated on innocent minorities and the administration is practically being run by the agitators.

And who are these foreigners for the deportation of whom movement of such intensity have been unleashed? Shri S. M. Deka, Assistant District and Session Judge, Jorhat, Assam, in the Foreigners Tribunal Case No. 17/19 filed in the Court of Foreigners Tribunal, Sibsagar, Distt. Sibsagar has succinctly defined it in his order dated 17. 1. 1980. It states,

"This common order will dispose of F. T. Case Nos. 17, 18 and 17/79 arising out of Quit India Notice No. 111, 108 and 106 all dated 19. 10. 1979 issued by the S. P. Sibsagar and served respectively Atul Dey, Sajala Rani Dey and Makhan Lal Dher all of village Kolakota, P. S. Borbat.

"No material in respect of the alleged foreign nationality of any of these persons was produced by the S. P. Two witnesses each Shri Doboru Gogoi being common in all these cases were examined. From the paper filed it appears that the members of this family to which these persons belong came to Assam in 1951 and were duly registered as refugee and have been living in the Sepekhati—G. P. area since then. None of them holds Citizenship Certificate. Thus neither under the Constitution nor under the Citizenship Act, 1955, the petitioners have acquired Indian Citizenship. They remain foreigners under the law despite long residence. The cases are disposed of accordingly. The stay order are vacated. Inform S. P."

So, these are also the foreigners at par with the infiltrators from former East Pakistan and now Bangla Desh, the religious minorities who are forced

by the Government of erstwhile East Pakistan over the years by engineered riots and discrimination to take refuge in India. And they remain foreigners despite repeated assurances by the national leaders of India as also international pacts and agreements like Nehru-Liaquat Ali Pact of 1950, Nehru-Noon Pact 1964 and Indira-Mujib Pact.

Implications and magnitude of the judgment of Mr. Deka is enormous. It means the millions of people who had migrated to India after 1950 and have been living in the country since then, acquired property and been pursuing different avocations including services under the central and different State Governments may be declared any day as foreigners and treated accordingly under the Law.

The Government of India has only to blame itself for the present impasse. The fact remains that the exodus of the religious minorities both from the West and East Pakistan was the result of partition of the country on the basis of religion accepted by the then national leaders of India.

Therefore, Government of India today remain bound on all grounds to treat the refugees from West and East Pakistan as natural citizens of India and obliged to arrange for their resettlement.

The Govt. of India took partial cognition of this position by accepting the persons who had migrated to India from that and East Pakistan upto 1941 as natural citizens of India under the Indian Constitution. It was adequate for the refugees from West Pakistan as the entire surviving population of Hindus and Sikhs from that part of Pakistan had come over to India by that time. But it was different in the case of East Pakistan as the major exodus took place from there only in the years following 1950. As a result, the refugees coming after 1950 remained without any protection of the Indian constitution in the matter of citizenship.

True the subsequent Indian Citizenship Act, 1955 spells out the rules for acquirement of Indian Citizenship. However, it should be borne in mind in this connection that the partition took place much before the enactment of this act. Besides, overwhelmingly uneducated masses of millions of religious minorities from erstwhile East Pakistan could hardly take the benefit of the Indian Citizenship Act and acquire Indian Citizenship. Moreover, the fact that the Govt. of India already been allowing these refugees to acquire property, cast votes in elections, join Government Service and freely reside any-

where in the country prove that it already treated them as de facto citizens of the country and did not have them in view while adopting the Indian Citizenship Act.

Therefore, in view of all the above one way to come out of the present imbroglio on the issue of deportation of the foreigners is to recognise the religious minorities who had migrated to India from the Eastern part of the partitioned India as natural citizen of India through proper legislation in the Parliament.

This will be a recognition although delayed for long, of the reality concerning the status in India of the said refugees are the Article No. 6 of the Indian Constitution was the recognition of the status of refugees from West Pakistan.

Till such law is passed status quo must be maintained regarding such refugees. They must not be deported and discriminated against in any way and must be given the due protection of law. It must never be forgotten that they are entitled to these not only on political and moral grounds but also according to international law.

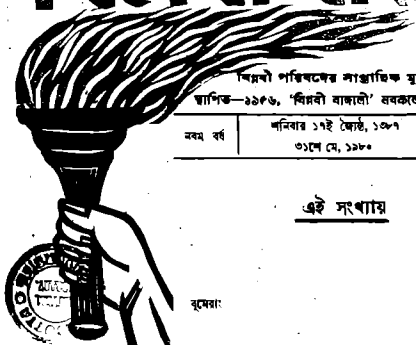
There is a world of difference between infiltrators and refugees. The infiltrators deserve to be deported but to the refugees the country owe a moral debt which can only be repaid by accepting them as our fellow citizen.

Time is fast running out. With each passing day the movement for the detection and deportation of foreigners is assuming other ominous overtones such as demand for barring the people from other areas of India from residing and acquiring land and property in the areas, do business or get employment, or pursue any other profession. On the other hand constant persecution of any community may also drive it to extreme postures unless their grievances are attended to and removed. Deportation of thousands of hapless refugees are continuing unabated, on record of which are kept. This is today the plight of the innocent and mostly illiterate and poor refugees who have nowhere to go. Government of India must bestir itself and initiate legislation to confer natural citizenship on the persons of religious minority who had come to India.

(Conjd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—24 PARGANAS (contd)			
Dey Ramani Ranjan	Niranjan Pall, Saras Mondal Road, Lichu Bagan, P.O. Kamchraper	200	15 8 72
Ghosh Smt Basanti Rani w/d Late Santi Rajan Ghosh	Kuchulia P.O. Gabandanga	200	25 12 79
Mukherjee Anil Kumar	Arunachali P.O. Sodepure	200	16 11 78
Nath Bagala Charan c/o Bengal Waterproof Works (1940) Ltd.	S. Bose Road P.O. Panahati	200	15 8 72
Dist—HOOGHLY			
Bhandari Smt Sudhamani w/o Late Sudhan Ch. Bhandari	Vill. Amdoba P.O. Suara	100	4 3 77
Chakraborti Smt Nandarani w/o Late Durga Charn Chakraborty	P.O. Dakshin Rahulpur (Araobag)	100	17 1 80
Dist—NADIA			
Banerjee Smt Manorama Debi w/o Late Priyalal Banerjee	P.O. & Vill. Midanapur	100	15 7 74
Chakraborty Barada Kanti	Lichutolla Govt. Colony P.O. Sugunn, Vill. Madanipur	200	4 3 74
Dist—MIDNAPUR			
Goosh Smt Taraprava w/o Late Bibbuti Bhusan Ghos	P.O. & Vill. Khorpai	200	24 12 79
Mullick Smt Kamal Devi w/o Late Sailendra Nath Mullick	Sikundu Chak, Kote Baza P.O. Midnapur	100	24 1 80
Probban Smt Parimal w/o Late Nagendra Nath Brodhan	P.O. Khandapasara	100	24 12 79
Santra Bibin Behari	Vill. Tutrangi, P.O. Thankur Chak	200	15 8 72
Dist—BANKURA			
Sinha Smt Golakbala w/o Late Murhara Singha	P.O. & Vill. Kafista P.S. Gangaalghati	100	13 1 80
Dist—WEST DINAJPUR			
Ghosh Smt Sevi Rani w/o Late Manasha Chandra Ghosh	Balurghat Bazar P.O. Balurghat	100	2 3 78

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
স্থাপিত—১৯৭৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' সপ্তাহপত্র—১৯৭৯

নবম বর্ষ

শনিবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭
৩১শে মে, ১৯৮০

৩৬ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

বৃন্দাবন

—সম্পাদকীয়

আসামে বাঙ্গালী বিতাড়নের বিরুদ্ধে জনমত গঠে উঠুক

—কলীদাস স্বদেশী

নয়টি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন প্রসঙ্গে

—কালীদাস সরকার

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—কীর্ত্তি বসু

রাষ্ট্রতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের স্বাভিকথা

—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাস

হে মোর দুর্ভাগ্য দেশ

বাসের করেছ অপমান,

অপমানে হতে হবে,

তাদের সবার সমান।

বু মে রায়

প্রায় সমগ্র বেশ যখন একটি রাডো আসার নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, গোটা দেশের চিত্তাশীল মানুষ যখন আসামে দেশদ্রোহীদের বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্ত ও সংহতিবিনষ্টকারী আন্দোলন নিয়ে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন তাঁদের মতে একটি বিপ্লব সাধন করেছেন। তিনি হঠাৎ এই সময় সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড-ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার অধিকার স্বীকার করে একটি বিবৃতি দাখিল করেছেন। পূর্বতন ও বর্তমান কোন সরকার ভারতবর্ষে অন্তত এই অধিকার মেনে নেন নি, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারই এ ব্যাপারে পশ্চিকৃত বলে গণিত দাবীও করেছেন। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর এই কল্পাধারা সব সরকারী কর্মীদের উপর বহিত হয়নি। এর আভ্যন্তর থেকে উচ্চ-পদস্থ কর্মীদের বাইরে রাখা হয়েছে। পুলিশের ক্ষেত্রে পালটা সংগঠন করার কাছে উৎসাহ ও মনস্ত আগেই দেওয়া হয়েছে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে পুলিশের মধ্যে কিস্তিমা, অনিয়মিতা, বহিষ্ঠা, কর্তব্য কর্ণে অবহেলা প্রকৃতির মত অনেকগুলি মারাত্মক ব্যাবির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে একই সরকারের অধীনে কর্তব্য বিভিন্ন জেলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা চালু রাখার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সরকারের অন্তঃসব বিভাগের কর্মীরা ধর্মঘট করতে পারবেন। পারবেন না শুধু পুলিশ বিভাগের কর্মীরা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। এমন হান্তকর ব্যবস্থার কথা কল্পনা করাও যায় না, অথচ সেই জন্ত গৌরব ও আত্মপ্রাচার দাবী সোচ্চার হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। এই সীমা রেখা বজায় রাখার কোন সূচী ব্যবস্থা করা সম্ভব, এটা কোন সূচ মস্তিষ্ক মানুষ বিশ্বাস করেন। পুলিশেরা ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ও ধর্মঘটের অধিকারকে 'ইন্স' করে আন্দোলনে নামতেই পারে। তখন এই সরকার যে চোখে সববের ফুল দেখতে বাধ্য হবেন, একমাত্র বহু উদ্বাস বাতীত সকলেই একথা বুঝতে পারে। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, যখন এই সরকার এসব দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

বেশ কয়েকদিন ধরে যে সব কর্মীরা সরকারী দপ্তরখানায় কলকারবানায়, কাছে ধাঁকি দিচ্ছিলেন, উৎপাদন ব্যাহত করছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেবার কথা প্রকাশ পাচ্ছিল। এখন কর্মকর্তাদের নতুন বিবৃতিতে প্রকাশ পাচ্ছে যে তারা যে সব কথা বলেছিলেন, সেটা তাদের মুখের কথা মাত্র আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই বক্তব্যের মধ্যে। দু-একটা ক্ষেত্রে যেমন কাজ না করার সময় বেতন কাটার যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তকে স্থগিত রাখার জন্ত আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। একদিন যে সব দলের নেতারা কর্মীদের শুধু অধিকার সচেতন করেছিলেন, কর্তব্য-সচেতন করার কোন প্রচেষ্টাই করেননি বিরোধী দল হিসাবে, রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, পুরানো ক্ষতিকর মানসিকতা দূর করার

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হবেন বলে যারা আশা করেছিলেন, সেখা যাচ্ছে সেটা বিকল্প চূড়ামাত্র।

সরকারী কর্মচারীদের কোন ক্ষাতিসঙ্গত দাবী দাওয়া মানা হবেনা। এটা আমাদের বক্তব্য নয়। বক্তব্য হচ্ছে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। সরকারী কর্মচারীরা সময় মত অফিসে আসেন না, কাজ করেন না, অথচ নিরন্তর দাবী দাওয়ার ফর্ম্‌ ডেরী, মিছিল সভা করতে আশোভন আগ্রহের সঙ্গে উদ্ভোগী, এসব কি টেড ইউনিয়ন গঠনের ও ধর্মঘট ডাকার অধিকারের অভাবে ঘটছিল? আগে উপযুক্ত হও, পরে দাবী (First deserve, then diserve) এটাই ভিত্তনীতি। মুখ্যমন্ত্রী এই বেসামাল অবস্থার প্রতিকার না করে, কেন এত তড়িৎগতি এই নতুন অস্ত্র এদের হাতে তুলে দিলেন, এটা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি কথাসূত পাঠও করেছেন এই সঙ্গে। সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। বাস্তবক্ষেত্রে এটা একেবারেই অসম্ভব। বরং নতুন অধিকারদানের ফলে, (বেটা কার্যতঃ সবসময়েই ছিল)। এই বিভাগে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটবে ভীষণভাবে। অল্পবয়স্ক, কলহবিবাহে কাজের সময় নষ্ট হবে আরও অনেক বেশী পরিমাণে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরা নিজ নিজ প্রভাব সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিস্তার করতে আরও বেশী সচেষ্ট হবেন স্বাভাবিক কারণেই। বর্তমান সরকার যদি মনে করে থাকেন, সরকারী কর্মচারীদের শুধু একটি মাত্র রাজনৈতিকদলের চরণে আশ্রয় নেবে, তবে তারা নিশ্চয়ই মূর্খের স্বর্ণে বাস করছেন। সরকারী দপ্তরখানায় কলকারখানায়, হাসানায়, ধর্মঘট, বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করার সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। কর্মীদের মানসিকতার পরিবর্তন, কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠা দেশের মানুষের স্বার্থসম্বন্ধে সচেতন, এসব কাজ এতদিনেই করতে পারেন নি কেউ এবং কেউ করতেও চান না বলেই অনেকে মনে করেন। বিদ্যায় উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা, কলকারখানায় লে-অফ, নতুন শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রের সত্তোচন, পানীয় জলের অবাধতা, হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থার অবনতি, চোরাকারবারীদের অবাধ শোষণ, আইনশৃঙ্খলার অভাব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নানা দুর্ভোগের ঘনঘটা আত্মপ্রকাশ করে একটা প্রায় নৈরাশ্রের অবস্থা সৃষ্টি করেছে। নতুন ইন্ধন জুগিয়ে অবস্থাটাকে জটিল করে তুলবার কোন দার্ককতা খুঁজে পাওয়া যাবনা। পুলিশকে কিছু অধিকার দিয়ে, কিছু অধিকার না দিয়ে, তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে যদি কেউ মনে করেন, তবে কি খুব ভুল হবে? পুলিশের অসন্তোষ যদি দারুণভাবে দেখা দেয়, তখন কি দলীয় ক্যাডার দিয়ে জনস্বার্থ রক্ষা করা যাবে, এই প্রশ্নটা লোকের মনে জাগবেই এবং সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা কি ভাবে করা হবে, সে দ্রুত উদ্বেগ অনুভব করার বুদ্ধিসঙ্গত কারণ আছে।

নির্বাচনভিত্তিক পন্থায় কোন দলেরই মৌরসীপাট্টা থাকেনা। সুতরাং কেউ অসকর্ম করলে, একদিন সুমরায় হরে তা তাদের উপরই কিরে আগে, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। এই শিক্ষা গ্রহণ না করলে তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না, এটা ঐক্য সত্য।

আসামে বাঙ্গালী বিতাড়নের বিরুদ্ধে

জনমত গার্জে উঠুক—

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়



আসামে বিদেশী বিতাড়নের অছিলায় প্রধানত:
১ বাঙ্গালী হিন্দুদের বহিস্কার করা হচ্ছে সুপরিকল্পিত
উপায়ে, অবশ্য কিছু কিছু নেপালী, বাংলাদেশী ও
অসমীয়া প্রদেশবাসীকেও অসমীয়ারা আত্মসমর্থনে
বিতাড়িত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যদিও তা নগন্য।
অসমীয়াদের 'বঙ্গাল খেলা' আন্দোলনের নয়রূপ
ইতিপূর্বে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে ও তার ক্ষয়
অসমীয়াদের বিরুদ্ধে সারাদেশ তখন দিবার নিতে
কম্বল করে নি। এবারেও সেই একই বাঙ্গাল খেলা
আন্দোলন চলছে আসমে, কেবল তার প্রচারটা
ভিন্ন ধরনের, আর কৌশলটা অভিনব; যদিও
কাজটা বাস্তবে একই প্রকার। পূর্বের মত
বাঙ্গালী হিন্দু প্রধান এলাকায় গৃহদাহ, লুণ্ঠতরাজ,
নারী নির্যাতন, খুন-জখম ও ভীতিপ্রদর্শন চলছে
প্রায় বিগত ছয় মাস কাল ধরে। ফলে বাঙ্গালী
হিন্দুগণ আসাম থেকে জান মান নিয়ে আসতে
বাধ্য হচ্ছে, অসমীয়াদের সংবদ্ধ রশংস অত্যাচারের
পপটে।

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু অসমীয়া বাঙ্গালীদের
রক্ষা করার চেষ্টা করবেও বার্থ হচ্ছে, কারণ দুর্বুদ্ধি
পরায়ণ, স্বার্থাভ্যাস ও মতলববাক্করাই সংখ্যায়
অত্যধিক: তাই এই নকারজনক, হীন ও জঘন্য

কাজে দলবদ্ধ ভাবে কর্মরত। তাদের মনত
যোগাতে তলানীন্তন জনতা সরকার বেশ সক্রিয় ছিল
আসামে। দুর্বৃত্ত শ্রেণীর অসমীয়ারা, ছাত্ররা ও
সংগ্ৰাম পরিষদের নেতারা সকলে মিলেই উক্ত
অত্যাচার ও খুন ব্যাপী চালাতে মনোমাজের মত
দলবদ্ধ ভাবে বাঙ্গালী বিতাড়নের বহু দিনের ঐন্দ্রি
কাজে নেমেছিল যাদের প্ররোচনার, সাহায্য ও
পরামর্শে তারা আজ জনমানসে বিকৃত নিজেদের
নোংরাতির ও নীচ মনোবৃত্তির জন্ত। এঁরা অশব
কেউ-ই নয়, এঁরা জনতামলের প্রাদেশিক নেতৃত্ব ও
সর্বভারতীয় নেতৃত্ব।

সত্যের দ্বারা আগড় সেওয়া বড়ই কঠিন।
জনতামলের দুর্বৃত্তির ও দুষ্কর্মের হিমাল পাওয়া
মেল সংবাদ পত্রের মাধ্যমে হালে। জনতাপার্টির
ছদ্মনি ব্যাপী বোম্বাই সম্মেলনে সম্মতি বৈ প্রস্তাব
গৃহীত হয়েছে, সেই প্রস্তাবে "আসাম থেকে অবিলম্বে
সেনাদল ও দমন মূলক আইন জুড়ে নেবার দাবী
জানানো হয়, যাতে পূর্বকালে অর্থাৎ আসাম ও
তৎসম্বন্ধিত রাজ্যে বিদেশী প্রদেশের সমাধানের জন্ত
একটি শান্তিপূর্ণ আলোচনা আবার শুরু
করা যায়।" আসামের আন্দোলনে যাদের
প্রেরণা করা হয়েছে তাদেরও সুপারিশ

করেছে জনতা নেতারা। অসমীয়াদের প্রতি জনতা নেতাদের কি গভীর মমতা বোধ! বাঙ্গালী বিভাগকে পরোক্ষে এমন নিলম্ব ভাবে উৎসাহিত জনতাদের পক্ষেই সম্ভব, কারণ জনতা পশ্চিমবঙ্গে তার সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পারেন আসামের মতন। রাজনৈতিক জুয়াড়ীরা এরূপ হীন পন্থাই প্রেয় মনে করে, যদিও এই হীনতা ও নীনতার জন্যই ভবিষ্যতে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জনতাদল ত্রিধা বিভক্ত বর্তমানে যথা: জনতা, জনতা (এস), ও ভারতীয় জনতা। আসামের ব্যাপারে তিন শৃঙ্গালের একই রা।

নব গঠিত ভারতীয় জনতাদলের সভাপতি অটল বিহারী বাজপেয়ী এই দলের রাজ্য শাখার প্রথম অধিবেশনে পাটনার গান্ধী মন্যানে এক জন সমাবেশে বলেন যে, “আসামে বিদেশীদের হস্তাধার করা হচ্ছে। কিন্তু জনগণ যখন তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার হস্তাধার দাবী জানাতে আন্দোলন করছে তখন তাঁদের গুলি করে মারা হচ্ছে।” শ্রীবাজপেয়ী হিংস্র নববাতক, অগ্রিসংযোগকারী ও দেশদ্রোহী অসমীয়াদের আন্দোলনকারী বলে আখ্যাত করতে লক্ষ্যবোধ করেন নি, যেহেতু তাঁদের আর, এস, এস, ও জনসংগেই আসামে হিংস্র পন্থায় বাঙ্গালী বিভাগনের মনস্তলতা গত নভেম্বর মাস থেকে। ডাছাড়া বিদেশী শক্তিচক্রগুলি সুপরিচালিত উপায়ে ভারতে উচ্চ-পূর্ণাঙ্গল এলাকাকে ভারত থেকে রিফ্রিজ করার জন্য বহু দিন থেকেই আসাম ভূখণ্ডে বিশেষা মাহতাত্ত্বের ও অর্থের প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করেছে, যার হাঙ্গল এখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের নজরে এসেছে। বলে আসামে সেন্সাবাহিনী মোতায়েন করার ও ভারতীয় নাগরিকদের জীবন ও ধনসম্পত্তির করার শুল্কঠাের দক্ষিণ দর্শন থেকে ভারত রাষ্ট্রের উপর।

শ্রীগান্ধী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন অসমীয়া ভাইদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে, কিন্তু তারা বিদেশী শক্তির প্রভাবে গড়ে ও দেশী বিরাস্বাতকদের প্ররোচনায় গড়ে আছে সঠিক পথে চলতে নারাজ। কাজেই দেশের এই সংকট মুহুর্তে দেশের অধঃতা ও সংহতি হস্তাধার কর্তব্যী প্রয়োজনে আসামের দুর্বৃত্ত শ্রেণীর হিংস্রাধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সেখানেদমন মূলক আইন চালু করা ও সৈন্য প্রেরণ করা অত্যাবশ্যক দেখা যায়, কারণ সর্বভারতীয় জাগ্রত জনমত আসামের বিরুদ্ধেও শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে সোচ্চার।

শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিটি ভারতবাসীর আছে, কিন্তু আসামের তথাকথিত আন্দোলনের তলে তলে তথাকার বাঙ্গালী হিন্দুদের গৃহদাহ, হত্যা, নাবী নির্যাতন ও কৌশলে বিভাগ কি অসমীয়াদের গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত? শ্রীবাজপেয়ী কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী ছিলেন কিছু কাল আগেও। তিনি কি সি,আই,এর দল ব্যতীে অসমীয়াদের বাহবা দিচ্ছেন। পরিণাম যে কি মারাত্মক ভয়াবহ হতে পারে ভবিষ্যতে, তিনি একবারও সে কথা ভেবে দেখেন নি। আসাম ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য, অক্ষুণ্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্র প্রদেশ ভারতের অঙ্গ রাজ্য এবং এই সব অঙ্গ রাজ্য থেকে তথাকথিত বিদেশী বিভাগনের অস্থিলায় যদি অঙ্গ প্রদেশ বাসী ও অঙ্গ ভাবাভাষী মানুষজনকে আসামের মত কৌশলে বহিস্কৃত করার মনোবৃত্তি প্রবল বেগে ছেঁগে ওঠে, তখন কি হবে? সেনাবাহিনী পাঠিয়ে

কি কেন্দ্র তার এই সব অঙ্গ রাজ্যকে সংহতির পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করবে না জাতীর বার্থে?

শ্রীবাহুশেখী ও জনতাঙ্গল শাসন ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, নচেৎ আসাম থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার ক্ষমতা এত ঠাক পাক করার কি কারণ ওঁদের? মাঘের চেয়ে মাসির দরদ যে বড় বেশী বলে বোধ হচ্ছে।

জনতাঙ্গল, ভারতীয় জনতা ও জনতা (এস) অর্থাৎ ত্রিধা বিভক্ত জনতা ভবিষ্যতে আর কোন দিনই কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পারবে না। কেনেই যত সব অব্যস্তার উক্তি করছে তারা বা সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও অবিবেচনা প্রসূত। কারা আসামে বিদেশী তা নির্ধারণের ক্ষমতা টাইকুন্সাল তৈরী করেছে সম্প্রতি। এই টাইকুন্সাল আসামে বসবাসকারী বাঙ্গালী হিন্দুদের ব্যাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৯৫১ সালে বা তৎ পূর্বেও আসামে এসেছে তাদের কাছে নাগরিকত্ব লাভের প্রমাণ পত্র আছে কি না দেখতে চাইছে! তাঁরা দলে দলে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে

যখন আসামে আসেন তখন আসাম সরকার তাঁদের অফিসুলে রিকিউজি সারটিফিকেট দিলেও তাঁদের নাগরিক সারটিফিকেট দেন নি এবং তাঁরাও নাগরিক সারটিফিকেট নেন নি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিন্ন মূল জনশ্রোত ভারতীয় সন্নিহিত এলাকা আসামেই বসবাস শুরু করেন। সেই ১৯৫১ থেকে বা তারও পূর্বকাল থেকে। আজ যদি সেই সব হিন্দু বাঙ্গালীকে নবগঠিত তত্ত্বাবধিত টাইকুন্সালের কাছে নাগরিক সারটিফিকেট দেখাতে হয়, তবে কোথায় তারা তা পাবে? জমলদেই এই সব উল্লাস জনগণ ভারতীয় নাগরিক, যেহেতু তাঁরা অথও ভারতেই জন্মেছিলেন।

পরে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলে পূর্ববাংলার

ভারতীয়রা কি সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বা বিদেশী আখ্যায় কুচিত হবে? তার কারণে এবং কেন? আন্তর্জাতিক আইন ও বে চুক্তির বলে ভারত ভাষ্য হয় তা এরূপ নির্দেশ দেয় না, বরং নেহেরু শিষ্যকণ্ড চুক্তি ও ইন্দিরা মুজিব চুক্তি বর্তমান আসামের এই হীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ও যুক্তি পূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে। শ্রীমতী ইন্দিরা তাঁই আসামের ছাত্রদের ও সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ১৯৭১ সালে মুজিবের সঙ্গে তাঁর যে চুক্তি হয় সেই চুক্তিকে মেনে নিয়ে আসামে তারা ১৯৭১ সালে বা তার আগে এসেছে তাদের বিদেশী বলে আসন্ন থেকে বহিষ্কৃত করা যাবে না, কারণ আন্তর্জাতিক চুক্তির মর্ম লঙ্ঘিত হবে বা যোড়তর অস্ত্রায় ও সেমের সংহতির পক্ষে বিপরীত জনক। আসামের ছাত্ররা ও গণ সংগ্রাম পরিষদের নেতারা শ্রীমতী পান্ডীর যুক্তি পূর্ণ ও জ্ঞানোদ্ভূত উপদেশে এখনো কর্ণপাত করে নি, বরং আসামের তৈল বহিষ্কাসামে অর্থাৎ ভারতের অন্ত কোন প্রদেশে আসতে না দিয়ে তারা দেশের ক্ষতি সাধনে সক্রিয় এখনো। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের নির্দেশ অমান্য করে আসামের প্রজ-সাহেবরা বাঙ্গালী হিন্দুদের নাগরিক সারটিফিকেটের অজহাতে আসাম থেকে তাদের তাজিয়ে দিতে দক্ষম জারি করছেন বেয়াল খুসীমত।

বাঙ্গালী হিন্দুদের উপর অসহীয়াদের জাতজোড় বহু কাল ধরেই দেখা গেছে, আর তার প্রচণ্ড প্রকাশ দেখা যায় ১৯৭৭ সালের মধ্য ভাগ থেকে অর্থাৎ আসামে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী বিতাড়ন কর্ম শুরু হয়ে যায় আসামে। আসাম রাজ্য পুলিশও এ্যাপ্যারে অসহীয়া কনিবাজ দুষ্টতাকারীদের মত বোগায় তদানীন্তন রাজ্য সরকারের উকানীতে। মুখে তারা স্লোগান দেয়

বাংলাদেশীদের ত্যাগে হবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে বাংলাদেশী মুসলমান ভাইদের চাষ আবাদেব জমি জব্বায়া অসমীয়ারা সানন্দে ছেড়ে দেয় ও বাঙ্গালী হিন্দুদের ত্যাগে শুরু করে যাতে আসামে চাকুরীর ব্যাপারে অসমীয়ারা অগ্রাধিকার পায়।

আসামের চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দুরা অসমীয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বি এবং সেইটাই মনে হয় বাঙ্গালী বিভাজনের প্রধান কারণ। আসামের সরকারী প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও চাকুরী শ্রমিক লোকেই। একযোগে আসামে বসবাসকারী বাঙ্গালী হিন্দুদের উপর জোর চাপ, গৃহদাহ, নারীনির্যাতন, খুন জব্বম ইত্যাদি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে আসাম থেকে ত্যাগাবার উদ্দেশ্যে বিগত ১৯৭৭ সালের মধ্যভাগ হতে, আর সেই চূড়ান্ত বিন্ধিত আকারে দেখা যায় ১৯৭৯ মাকামারি সময় থেকে। আসামের বর্তমান আন্দোলনকে অক্রমণ বলাই ভাল ও সেই

অক্রমণ চলছে আসাম থেকে বাঙ্গালী ত্যাগাবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে যা গহিত ও ভারতীয় সংহতির পরিপন্থী। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এখন সর্বশক্তি নিয়োগ হবে এই মানবতাবিরোধী ও জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপ আসামে এখনই বন্ধ করা দরকার; অন্যথায় আসামের মত অজ্ঞাত রাজ্যও এই মারাত্মক ব্যাধির উপসর্গ দেখা যাবে। ফলে ভারত ভেঙ্গে টুকুরা টুকুরা হয়ে যাবে বিচ্ছিন্নতা-বাদের 'শকার' হবে। যা জাতীয় জীবনের পক্ষে সর্বনাশকে ডেকে আনবে অনতিবিলম্বে। আসামের এই অস্ত্রায় আবশ্যক আর সহ্য করা ভারত সরকারের পক্ষেও ক্ষতিকারক। আসামের দৃষ্টান্তও অস্ত্রায় নয় হিংস্র, যা অজ্ঞাত রাজ্যকে প্রভাবিত ও প্রসূর করতে পারে কৃত্রিম স্বার্থে আসামের মত। কেন্দ্রকে দৃঢ় হাতে আসামের বর্তমান মানবতাবিরুদ্ধ হামলা-বাজীকে বন্ধ করেই হবে। আসামের তৈল সম্পদকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কাজে লাগতেই হবে জাতীয় স্বার্থে।

স্বাভাবিক পেটের ব্যথা, অম্ল, অসীর্ণ ও পেটের বেদনাত্ত
অব্যর্থ ফলপ্রসূ

আমলা হুত কুমারী

অম্লবেদনায় ঘাতে ভেদিত

মূল্য ৩.০০ একমাত্র মূল্য

আমলা হুত

মিঃ বনীমোহন চক্রবর্তী

কলকাতা ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০



সার্কী দেখাবল

নিশ্চিন্ত কিনাবল।

কিছুতেই না ঠকাবল,

কাজ ফল পাবল।

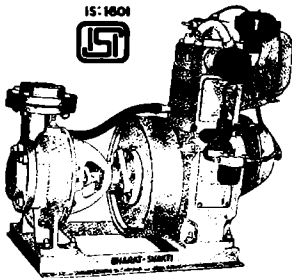
অদ্বন্দ্ব চাবের জলের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় ও অদ্বিতীয়

“ভারত শক্তি”

ডিম্বেল ইঞ্জিন পাৰ্পাসেট।

BINDUSTHAN TRACTOR 50 HORSE POWER

IS: 1801



প্রস্তুতকারক : ভারত ইন্ডাস্ট্রিয়ালস, কানপুর।

এক্সপোর্ট এজেন্ট : টাটা এক্সপোর্ট লিমিটেড, বোম্বাই।

পরিবেশক : ইন্ড ইন্ডিয়া এয়াংগো ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা।

ভারত বিশ্ব আন্দোলনের ইতিহাস

II কীংস্টন দত্ত II

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বাধীনতার বোঝা এমনভাবে জনচিন্তকে জ্বর করেছিল যে মুক্তি তর্ক দিয়ে কোনটি ঠিক এবং কোনটি যেটিক তা ভেবে দেখার দিকে কারোই মন ছিল না। আজ এতদিন পরে হক কথার প্রকৃত মূল্যায়ন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশবিহারীর মতামতের মূল্য বিচার করা যেতে পারে।

প্রবল গান্ধী আন্দোলনের মধ্যেই ১৯২১ সালের মে মাসে ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণে আসামের চা-বাগিচার কর্মীদের শিক্ষালাভের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দেশপ্রিয় এবং চাঁদপুরের নেতা হরদয়াল নাগের নেতৃত্বে বাড়লার যুব শ্রেণী চা কর্মীদের এই আন্দোলন সমর্থন করে। দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে চা শ্রমিকদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং সরকার চা শ্রমিকদের দেশে পৌছাবার ব্যবস্থা করে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু গান্ধীজী চা শ্রমিকদের এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন নাই। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছিলেন, *It is an ill service to the labourers* গান্ধীজীর এই অভিমত অনেক মেনে নিতে পারেন নাই। 'হক কথা' এ সম্পর্কে লিখেছিল 'ব্রহ্মদেশীর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববঙ্গ কোন প্রকার স্বার্থ ভাগে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাহার বাছা বাছা সহস্র সন্তানের হৃৎ-ভোগে তাহাদের ভাগের আবহাওয়ায় যে পূর্ববাঙলা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই ফলে পূর্ববঙ্গের এই যুবকল মনুষ্যোচিত বর্ধে আত্মনিয়োগ করেছিল। তাহার নাম যশ চায়না সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেয় না। কেবল 'হৃৎ-ভোগীর সেবা এই টুকুতেই তাদের আনন্দ। এই খেচ্ছা-সেবকেরাই প্রকৃতপক্ষে কুলিদের রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এ সম্পর্কে বলেন, 'বাহারাই এই হস্ততাল সংগঠন করাইয়া থাকুন তাহার শ্রমজীবীদের শত্রুর কার্য্য করিয়াছেন। ইহাতে মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গল হইবে। কিন্তু গান্ধী আন্দোলনের প্রবল উদ্ভাসনার মুখে আমরা গান্ধীজীর সমস্ত কথাই অস্বস্তি বলে মনে করেছি। তবে সেদিন যারা হক কথা বলে নিম্নোক্তজন হয়েছিলেন একবার নিলিই তাদের প্রাণ্য কিনা সে সম্বন্ধে বিচার বিবেচনার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই।

মানারূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ভারত সেবক সচিবের কার্য্যকলাপ চলতে লাগল অমূল্যলন সমিতির কর্মীগণ স্থির করলেন 'শখ' নাম দিয়ে সমিতির মুখপত্র 'পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। নলিনী কিশোর গুহই পত্রিকার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। প্রথম সংখ্যা শখ পত্রিকার রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বা কবিতার ঘাটা পত্রিকাতে মনুজ করার প্রয়োজন মনে করা হল। এছাড়া নলিনীকিশোর গুহ জীভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু

কবি তাদের বললেন যে তিনি পুলিনবিহারী সাক্ষাৎ প্রার্থী। তিনি পুলিনবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। শম্ভু পত্রিকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বা কবিতা তারপরে দেবেন। কাজেই জীভেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পুলিনবিহারী নিজের শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কবি ডারভসেবক সন্তু সম্প্রকিত পুস্তিকা এবং অজ্ঞাত পরিকল্পনা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে দেখলেন। পুলিনবাবুর রাজনৈতিক পরিকল্পনাসি জেনে কবি স্বপ্রকাশ সাহাবোর প্রতিশ্রুতি দিলেন। পুলিনবাবুর গান্ধী বিরোধী মনোভাবও তাঁকে খুলে বলা হল। ফিরে এসে পুলিনবাবু শম্ভু পত্রিকা এবং সাধারণ কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে কবির নিকট এক পত্র দিতেই পত্রাশ্রয়ের কবি শম্ভু পত্রিকার ক্ষুদ্র নিয়মিত কবিতাটি লিখে পাঠালেন।

সাধন কি জ্ঞোর আসবে নেবে হুটগোলের কাণে ?

খাঁটি জিনিস হৃদয়ের মাটি নেবার পরসাদে ॥

কথায় তো শোণ হই না দেনা

গায়ের জোরে জোরে মেলে না—

গোলমালে ফল কি ফলে জোড়াভাড়ার চাঁদে ॥

কে বলতো বিধাতারে তাড়া দিয়ে তোলায়—

মৃষ্টিকরের ধন কি মেলে বাত্বরের কোলায়

মন্তু বড় লোভের শেষে

মন্তু ফাঁকি জোটে এসে

মন্তু আশা জড়িয়ে পড়ে সর্ধনাশের ফাঁদে ॥

কবির এই কবিতায় গান্ধী আন্দোলনের উদ্ভাসনার প্রতি ইঙ্গিত স্পষ্ট! কবিতাটি শম্ভু পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যার ক্ষুদ্র বিপিনচন্দ্র পাল ও একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ প্রবন্ধেও গান্ধী আন্দোলনের নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল। নলিনীবাবু শম্ভু পত্রিকায় এ প্রবন্ধটিও প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা করে তিনি গান্ধী আন্দোলনকে সমর্থন করে তিনি অল্প একটি প্রবন্ধ লেখেন। পুলিনবাবু নলিনীবাবু এই কার্যে আপত্তি জানান। কিন্তু নলিনীবাবু এর উত্তরে জানান যে দেশের বর্তমান পরিবেশে গান্ধী আন্দোলন সমর্থন না করলে শম্ভু পত্রিকা চলবে না। এই নিষেই অহুশীলন সমিতির অজ্ঞাত সহকর্মীদের সঙ্গে পুলিনবিহারীর মতবিরোধ আরম্ভ হল। তরুণ সহকর্মীরা প্রায় সকলেই নলিনীবাবুকে সমর্থন করলেন এবং গান্ধীজীর অসহযোগও তাদের নিকট সমর্থিত হল।

অহযোগ আন্দোলনের গোড়ার দিকে একমুখ ছাত্র রবীন্দ্রনাথের নিকট জিজ্ঞাস্য করতে এসেছিল তারা এই আন্দোলনে বোঙ্গ দিয়ে গান্ধীজীর পরামর্শ অহুয্যবী ফুল কলেজ বর্জন করবে কিনা। প্রশ্নটা শুনেই রবীন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। তিনি ছাত্রদের পাল্টা প্রশ্ন করলেন ফুল-কলেজ বর্জন করবার তাৎপর্য কী ?

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের বললেন, ছাত্ররা ত্যাগ স্বীকার করুন কিন্তু যার জন্য তারা ত্যাগ স্বীকার করছেন তার একটা মহৎ ভিত্তি থাকে চাই। ছাত্ররা তুল কলেজ বর্জন করবেন কিসের জন্য? তুল কলেজ বর্জন করলে তারা কি মুশিক্ষিত হবে উঠবেন? না, যেটুকু শিক্ষা তারা পাবেন তা থেকেও তারা বঞ্চিত হবেন। গান্ধীজীর মৃত্যু কাটা কাপড় বোনা এগুলিও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিতে পারেননি। এর বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন নতুন যুগের বাণী কি এই সব বড় বহুগুলি পাম্পাত্য দেশের বিশেষের কারণ বলে পরিস্থিত হয়, তবে ছোট বহুগুলি কী আমাদের বড় বিশেষের কারণ হয়ে উঠবে না? জাতির বিভিন্ন শক্তি যদি নিজেদের মধ্যে না সহযোগিতা করে তবে তারা তুল করবে! দেশে দেশে এবং জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা করতে হবে। ভারতবর্ষের এই যে জাগরণ সেটা সারা পৃথিবীর জাগরণের সঙ্গে সূত্রে বাঁধা। যে সব জাতি নিজেদের জগতের অন্তর্গত জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে তারা নবতম যুগের নবতম চেতনাকে শোষণাত্য করছে। কেবল ভারতবর্ষই কি বর্জনের আর অধিকারের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে? চিরকাল ভারতবর্ষ পরেই শেষ গুণই কি বিচার করবে ভারতবর্ষ ত্যাগ উপর নির্ভর করে স্বাধীনতার সংগ্রাম করবে?'

রবীন্দ্রনাথ জাতীর আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মুসলমান স্বার্থের নিকট হিন্দুদের আত্মসমাপ্তি সমর্থন করতে পারেনি। বিলাকত আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ছিল না। প্রথম যুদ্ধে তুরস্ক জার্মান পক্ষে যোগদান করেছিল। এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধের পরে বিশাল তুর্ক সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এর ফলেই মুসলীম জগৎ মিশ্রশক্তি বিরোধী এবং ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে পড়ে। মুসলিম জগতের মধ্যে ভাগ করে নেয়! এর ফলেই মুসলীম জগৎ মিশ্রশক্তি বিরোধী এবং ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে পড়ে। মুসলীম জগতের নেতা বলিষ্ঠতার ক্ষমতা বর্ষ হওয়ার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন চালাতে থাকে। ভারতের মুসলমানগণও এই আন্দোলনের শরীক হল! প্রকৃতপক্ষে জগতে মুসলমানদের পূর্ব শক্তি অক্ষুর রাখা এবং অবিকল মুসলমান শক্তির প্রতিষ্ঠাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে অথবা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এর কোন মিল ছিল না তবুও গান্ধীজী হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের বিলাকত আন্দোলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সমগ্র ভারতবাসী এক দ্বারী ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম তিনি গড়ে তুলেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে আন্দোলনের ভিত্তি সে কত কাঁচা তা বুঝা গেল অনেক পরে। যখন ১৯২২ সালে কামাল পাশা তুরস্কের শাসন অধীকার দখল করে নিলেন। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে নাজান শহরে মিশ্র শক্তিবর্ষের সঙ্গে নব প্রতিষ্ঠিত তুরস্ক গভর্নমেন্টের আলোচনা আরম্ভ হয়, দীর্ঘকাল আলোচনার পরে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কামাল পাশার অধীনে তুরস্ক গভর্নমেন্টের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নেয়। জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ গভর্নমেন্টের আধিপত্যের ভয়ে সেদিনের বলিষ্ঠা তুর্কী মুলতান তুরস্ক ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। যে জাহাজে তিনি তুরস্ক ত্যাগ করে মাক্টার পালিয়ে যান সে জাহাজ তাকে দিয়েছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আর সেই বলিষ্ঠাকেই তুরস্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ সেদিন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে বাড়িল। (চলবে)

নয়টি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন প্রসঙ্গে

॥ কালীশদ সরকার ॥

গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা এই নয়টি রাজ্যে বিধান সভা নির্বাচন হবে আগামী মে মাসের শেষে। নয়টি বিধান সভার মোট আসন সংখ্যা ২২৩৭, ভোটদাতার সংখ্যা ২৪ কোটির উপর। এই মিনি-সাধারণ নির্বাচন হবে ত্রিমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্র ক্ষমতার কিংবদন্তি আসার পর, মাত্র একশত দিনের ব্যবধানে তাঁর জন-প্রিয়তার দ্বিতীয় পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তিনি কি সঙ্গোপনে উত্তীর্ণ হবেন?

আসন্ন বিধানসভাগুলির নির্বাচনের সহিত পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকলেও, নির্বাচনের ফল এ রাজ্যের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। বিধানসভা নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে, প্রথমে বলতে হয় বিধানসভাগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচনের প্রয়োজন সম্পর্কে।

সংবিধান মতে ভারত রাষ্ট্রের অতিষ্ঠা হল—সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। দীর্ঘ নামের আড়ালে যে রাষ্ট্র কাঠামো বর্তমান, তা প্রকৃতিতে ইউনিটারী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় একত্ব শাসন ভিত্তিক। কেন্দ্রীয় শক্তির উৎস হল সমগ্র দেশের জনসংখ্যা আনুপাতিক, প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন সমন্বয় গঠিত লোকসভা। কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা গঠিত। রাজ্যগুলি সুশাসিত সরকার ইউনিট নয়।

সংহতি, ঐক্য এবং সর্বত্র সুখম অর্থ নৈতিক প্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে 'সংবিধায়কগণ বৈচিত্র্যময় বিরাট দেশকে সমগ্র কেন্দ্র প্রধান রাষ্ট্রের চরিত্র দিয়েছেন। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনকালে ভারতের নিরপত্তা সুনিশ্চিত এবং সর্ববিধ ঐক্য গড়েছিল। ইতিহাসের এই শিক্ষা বিধায়কদের নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। সংবিধান সে কারণে কেন্দ্রের হাতে রাজ্য সরকার-গুলিকে নিরস্ত্র এবং প্রয়োজন বোধে অযোগ্য রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করার অধিকার দিয়েছে। সে অধিকার কেন্দ্রের সুপারিশ মত প্রয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি।

কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর কর্তব্যোক্তি রূপায়িত করে রাজ্য সরকারগুলির মাধ্যমে, সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যকে পরস্পর নির্ভরতার বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। এই ব্যবস্থা থেকে প্রতীয়মান যে কেন্দ্রের সহিত রাজ্যের সম্পর্ক হবে সম-আদর্শ, সম-উদ্দেশ্য এবং অভিন্ন কর্তব্যতা ভিত্তিক। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ যদি মস্তকের নির্দেশমত কাজ না করে, তাহলে দেহের যে নশা হয়, বিরুদ্ধ ভাষাপন্ন রাজ্য সরকারগুলি নিয়ে, রাষ্ট্র পরিচালক কেন্দ্রের অবস্থা হয় সেই রকম। এই কারণে কোন রাজ্য সরকার অযোগ্য অথবা রাজ্যবাসীর আস্থা হারিয়েছে বিবেচিত হলে, কেন্দ্রীয় সরকার সেই রাজ্য সরকারকে ক্ষমতাহীন করতে পারে। ভেঙ্গে দেওয়া নয়টি রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কারণগুলি বিশেষ ভাবে বিস্তারিত ছিল।

জনতা লোকশলের অ-শাসন এবং নির্দিষ্ট লোকের অভাবে দেশের প্রশাসন ও অর্থনীতি

ভেঙ্গে পড়েছিল, সর্বত্র এক বিশৃঙ্খল অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল, সেই দুর্ভাবস্থার প্রতিকার করে সারা দেশের মানুষ শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেস-(ই)কে ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে। পূর্বোক্তবিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৈল সংকট, ভয়াবহ খরা, আফগানিস্থানে ও আসাম পরিস্থিতি। দর ও বাইরের বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করার এক প্রবলতম চ্যালেঞ্জের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী অপদর্পণ, কেন্দ্রের সমালোচনা সর্বত্র, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকারগুলিকে জিইয়ে রাখতে পারেন না। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, আইন শৃঙ্খলার উন্নতি এবং নব কর্নেলত্বকে গুণাবিত করার প্রয়োজনে চাই প্রতিটি রাজ্যে এমন সরকার যে কেন্দ্রের কর্মনীতিকের বাস্তবায়িত করতে সক্ষম সচেষ্ট হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যে একটি রাজনৈতিক দলের সরকার গঠিত না হলে এ ধরনের সর্বাঙ্গিক উন্নয়ন কি সম্ভব ?

বিধান সভাগুলির নির্বাচনে অবতীর্ণ রাজনৈতিক দলগুলির শক্তি সামর্থ্য সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রথমে বিয়োজী দলগুলির কথা বলা দরকার। কারণ লোকসভা নির্বাচনের পর তাদের দলগত অবস্থার বৃহৎ পরিবর্তন ঘটেছে, পঞ্চাশেরে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেস-(ই) অপরিবর্তিত আছে এবং প্রতিদিন তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটছে।

জে, পি, ও কৃপালনীর পক্ষসহ সন্তান জনতাদল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মহাভারতের জরাসন্ধ মরেছিলেন বীরের মত ভীমসেনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে, পক্ষসন্ধ মরল আপন অস্ত্রপ্রত্যঙ্গের ঘূর্বোঘূর্ণিতে। জনতাদলের বার্থতার হেতু একটি এবং তা হল এডমণ্ড বাকের কথা—
Little minds and great things cannot go together ? বিচার করে দেখুন কথটি সত্য কিনা।

জনতাদল ছেড়ে বাবু জগজীবন রাম শেখমণ টুকছেন কংগ্রেস (আরস) দলে। তিনি এখন নিতান্ত ভারকা, হরিজনদেরও হাতজানি দিতে অসমর্থ! আরস—চাবন—রাম মিলন সত্যিই বিষমবর! জিনজনেই ছিলেন বহুকাল ইন্দিরা সমর্থক, জরুরী অবস্থা জারীর সময়েও তাঁদের আত্মগত্যে বিন্দুমাত্র ঠাঁটল করেনি। সম্প্রতি তাঁরা তাঁদের হারানো বিবেক খুঁজে পেয়েছেন এবং শ্রীমতী গান্ধীর কাজের পিছনে শৈবভয়ের ছায়া দেখছেন। এঁদের ভাবগতিক দেখে বলতে ইচ্ছা করে—‘সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ!’ বিধানসভাগুলির নির্বাচন সমাপ্তির সঙ্গে কংগ্রেস (আরস)-এর মুক্যাবলী বাজবে।

জনতা ছেড়ে জনসংঘীরা গড়েছেন ভারতীয় জনতাদল, তাঁদের পিছনে আছে সুগঠিত আর. এস. এস। তারা স্বাক্ষর আঙ্গুর অভিন্নর করবেন না ঠিকই, তবে কোন রাজ্যে তাদের গণক সরকার গড়া সম্ভব হবে না। যতদিন পাকিস্থানের ভারত বৈরিতা এবং বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে কমিউনিস্ট দলগুলির রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকারের সম্ভাবনা ভারতের রাষ্ট্র গগনে ছায়া, কেলবে, ততদিন আর, এস, এস, থাকবে।

চৌথ্রী চরণ সিং-এর লোকদল আঞ্চলিক সংস্থা এবং জাতি সম্প্রদায়ের আত্মদস্যু সংঘ। লোকদলকে আবার জনতা-(এর) নামে নির্বাচন লড়তে হবে এবং লড়তে হবে

লংকাকাণ্ড বিশাখ রাজ নারায়ণজীর বিরুদ্ধে। উত্তর-প্রদেশ ছাড়া লোকসল অল্প কোন রাজ্যে উল্লেখযোগ্য আসন লাভের আশাও করে না। আসন্ন নির্বাচনই হবে সম্ভবতঃ এই দলের শেষ লড়াই। জনতা এবং জনতা (এস) তাদের পূর্ব নির্বাচনী প্রতীকও পাবে না। জনতার দলের জনকরেক সংগঠন কংগ্রেসী ও সমাজতন্ত্রীর অবস্থা। কিছুটা কিছুটা বায়ুহীন: নিরাশ্রয়ের মত। সভাপতি ঐচ্ছন্দ্যবীর দলের হাল ধরে আছেন, তবু কখন ভুবে তিনি জানেন না। তাঁর ককণ আঙ্গান 'crying in the wilderness'-এর মত শোনাচ্ছে।

অ-কংগ্রেস (ই) দলগুলি মহাজোট বঁধার কথা বলছে, কিন্তু এদের মধ্যে সমঝোতা কি কখনো সম্ভব? ভাই যদি সম্ভব হত, তবে জনতার দল ভাঙ্গল কেন। নির্বাচক মণ্ডলী ভোটদানের আগে এই ধরনের জোটের অস্থায়ীক এবং তাদের নেতাদের স্বার্থ সর্ব্ব চরিত্রের বিরোধিতা নিশ্চয়ই বিবেচনা করবে।

আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কমিউনিষ্ট তথা বাম মার্ক্সীদের হুমিকা সৌণ, তবে জোট বঁটার ব্যাপারে তারা কম বান না। অবশ্য হাত বাড়তে এবং হাত টান দিতে এদের জুড়ি হু-ভারতে আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। জনতা প্রধানমন্ত্রী মোরারজী ভাই দেউ খুব ভালভাবে বুঝে গেছেন। জনতা পার্টি নির্বাসন থেকে ফুলে এনে সি, শি, আই (এম) দলকে মুক্ত প্রাটকরম করে দিয়েছিল, যথা সময়ে তার রাজনৈতিক প্রতিদানও সে পেয়েছিল।

এবার কংগ্রেস(ই) সম্পর্কে আসা বাক। এই দলের সংগঠন বিভাগ এখনো মজবুদ নয়, ঐমতী ইন্দিরা গান্ধীর অসীম জনপ্রিয়তাই কংগ্রেস(ই)-র প্রধান মূলধন। তার সঙ্গে আছে কেন্দ্রীয় সরকার দলের হাতে থাকার বিশেষ প্রভাব। লোকসভার নির্বাচনকালে ঐমতী গান্ধীর যে জনপ্রিয়তা ছিল, একশত দিনের বেশ শাসনের পর তা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। কারণ হিসাবে দু-চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়—

- (১) অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হওয়া।
- (২) মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থ স্বাধীনতার গতিরোধ।
- (৩) প্রশাসন দৃঢ়ীকরণ। হরিজন ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান।
- (৪) আসাম সমস্যার সমাধানে স্ফুটনিত পদক্ষেপ।
- (৫) আঙ্গান পরিস্থিতির উত্তাপ প্রশমন।
- (৬) পররাষ্ট্র নীতির নব স্বীকৃতি লাভ।
- (৭) ভৈল ও বরা সংকটের দ্রুত মোকাবেলা।

সামান্য তিন মাসের শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী যা করেছেন, তা তাঁর বিশ্বাসের নৈপুণ্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। সবচেয়ে বড় যা তিনি করেছেন, তা হল দেশবাসীর মনে আস্থা ফিরিয়ে আনা। আর সব চেয়ে বড় যা তিনি করেন নি, তা হল নির্বাচনে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরায়ণ নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে পালাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পৃহা পূর্ণের চেষ্টা।

দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীকে যে মানডেট দিয়েছে, তার পক্ষে তা পূরণ করতে হলে, রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা তার কর্মপ্রয়াসকে দ্রুত রূপান্তরিত করতে হবে। তার ক্ষমতা রাজ্যগুলিতে প্রধানমন্ত্রীর সম মনোভাবাপন্ন কর্মী সরকার গঠন অপরিহার্য।

দেশের থেকে বাসের কাছে দল বড়, দ্বারা অনায়াসে বলতে পারে যে, আক্ষয়ানিহানে রক্ত সৈন্তের উপস্থিতি তারা তো সমর্থন করেই, এমন কি ভারতে রক্তবাহিনী ঢুকলে, তারা তাদের স্বাণ্ড জানাবে, নির্বাচক-মণ্ডলী নিশ্চয়ই তাদের চিনে রাখতে ভুলবে না? এরা তাদের সংগে জোট বাধবে, নির্বাচনে নির্বাং তাদের ভরাডুবি হবে।

সব কিছু বিচার করে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, আগের নয়টি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস(ই) বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হবে। শ্রীমতী গান্ধী দ্বিতীয় পর্যায়ের শক্তি পরীক্ষার অধিকতর সাক্ষ্য লাভ করবেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা

গরীব দেশবাসী উপবাস বাসের বিরহিলিপি, শুধু বাসের স্বপ্নের বস্ত্র তাদের পক্ষে প্রকৃতি প্রদত্ত স্বাস্থ্যকর বায়ুগীন স্বল্প চিকিৎসায় রোগ নিরাময়ের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অহেতুক দগা, অন্ধ দৃষ্টির এবং বিভিন্ন শ্রেণী বার্ধক্যের বাধা অতিক্রম করে স্বল্প ব্যবহারে অভ্যস্ত হলে রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য সংরক্ষক ও সংগঠক। শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই স্বল্প বয়সেই কল্যাণকর। বার্ষিক্যজনিত রোগের হ্রাসজনক পরিণতি এড়াতে পরমুখাপেক্ষী না হবে আবহাওয়াবিশীল হওয়াই শ্রেয়। রোগ ঘটনা ভগবানের অতিশাপ নয়—আমাদের অজ্ঞতা ও অলসতার পরিণাম। নিজের রোগ নিজেই সারাতে চেষ্টা করুন।

বাস্তববাহী দূরদর্শী ডাঃ নলিনী রায় চৌধুরী (৭০) এম-বি, বি-এস প্রতি রবিবার সকাল ১০-১২ টা পর্যন্ত ৩নং সূর্য সেন স্ট্রিট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২। বিনা পারিশ্রমিকে স্বল্প ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ দেন এবং হাতে কলমে নিরুক্তিমূলক যোগাসন ও সহজ প্রাণায়াম শিক্ষা দেন। প্রত্যাহ সন্ধ্যা ৬-৭টা নাম লেখান হয়।

আঠারজন চিকিৎসকের তত্ত্বাপূর্ণ আলোচনা ও অভিমতে সমৃদ্ধ 'সবোববি শিবাস', (স্বল্প চিকিৎসা পদ্ধতি) পড়ুন। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

প্রান্তিক্যান : এম, ভট্টাচার্য এও কোং, ৭০, নেতাজী স্তম্ভার রোড, কলিকাতা-১।

সংস্কারবদ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত সমাজে স্বল্প চিকিৎসায় রোগ নিরাময়ের অস্বল্প পরিবেশ সৃষ্টি করতে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি।

ডাঃ হীরালাল সাহা, এম-বি, বি-এস, ডাঃ পৌরী সেন, এম-বি, বি-এস, ডাঃ সুনীতি সাহা, এম-বি-এস, ডাঃ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, এইচ, এম-বি, ডাঃ শিখির সরকার, বি-এ, এম-ডি এইচ, কবিরাজ সৌরদাস কাব্যতীর্থ, কবিরাজ জ্যোতি প্রসন্ন সেনগুপ্ত, হাকিম এম, এ খোতামেব।

যোগাযোগ—শ্রীশান্তিনাথ ভট্টাচার্য, শিবাস চিকিৎসা প্রচার কেন্দ্র

২২৩ এইচ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

রাষ্ট্রপুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" এর থেকে অধ্যায়]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

শাসন সংস্কার ও চরমপন্থী মতবাদের প্রসার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা কিস্তি কিক আমাদের সেই প্রাচীন মূল নীতিরই শিকড় ধরে রয়েছি যা আমাদের পূর্ব পুরুষ-
দ্বারা লাতের দাবীকে এবং কংগ্রেসের আদি প্রতিষ্ঠাতাদের যথাকে বাস্তবায়নের দৃষ্টি পাশের মধ্যে এনে দিয়েছে।

লেন্ডিচ লেটিভ কাউন্সিল যে কমিটি নিয়োগ করে দেয়, সে কমিটি যথাযথ কাজের মন নিয়েই পুরোপুরি কাজে লেগে গেল। আমাকে কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হল, আর সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন রাইট অনারবল্ মি: শাস্ত্রী। যখন সময়ে আমরা আমাদের প্রতিবেদন দাখিল করলাম। এই প্রতিবেদনের খুঁটি নাটক সব বিষয়ের মধ্যেই ঘাওয়া আমি আবশ্যিক বোধ করিনি। এই শাসন সংস্কার পরিকল্পনা যদিও নির্ভেজান ও সুস্পষ্ট উন্নত ধরনের, তাহলেও তা আমাদের প্রত্যাশার অল্পক্লপ নয়। বিশেষ করে একটি বিষয়ে এই আশা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারে কোন দাবিই এই ক্ষেত্রে আমাদের দেওয়া হয়নি। আমাদের রিপোর্টে বার্ষহীন ভাষার জোর দিয়েই এ কথাটি বলা হই। অর্থাৎ কমিটির নিকট এ কথাটি বলা হই, আমাদের অসম্মত সমস্ত আবেদন-নিবেদনেও তা বলা হই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা মঞ্জুর হয়নি। এই দাবী মঞ্জুর করতে এত বিলম্বের কোন কারণ নেই। প্রাদেশিক ক্ষেত্রে যদি বৈধ শাসন কার্যকরী

হতে পারে, তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারেও, সৈন্য বিভাগ ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্য বিভাগকে বাস দিয়ে অল্প সমস্ত বিভাগে তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট দুটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে। পরবর্তী করণে সেই কমিটি দুটির নাম করণ করা হয় ফ্রাঙ্কাইজ কমিটি (ভোটা-
হিকার নির্ধারণ কমিটি) এবং কারসন্স কমিটি (কর্ম সূচী নির্ধারণ কমিটি)। ফ্রাঙ্কাইজ কমিটির কাজ হল ভোটাধিকার সম্পর্কীয় বিষয় বিবেচনা করা, নির্বাচক মণ্ডলী স্থির করা। কাউন্সিলগুলির সভা সংখ্যা কত হবে, তাতে হিন্দু এবং মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা কত হবে এবং এই জাতীয় অসম্মত বিষয় স্থির করা। কারসন্স কমিটির কাজ হল, কোন কোন বিভাগ “সংরক্ষিত” থাকবে এবং কোন কোন বিভাগ “হস্তান্তরিত” করা হবে তা স্থির করা। আমাকে ফ্রাঙ্কাইজ কমিটিতে একজন সদস্যরূপে নেওয়া হয়। এই কমিটি সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন—৩ জন ইরোরোপীয়, ৩ জন ভারতীয়। এ ছাড়া ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান। ৩ জন ভারতীয় সদস্য হলেন রাইট অনারবল্ মি: শাস্ত্রী। মি: আক্টার মহম্মদ এবং আমি। ইরোরোপীয় সদস্য হলেন—স্যার ফ্রাংকল্যান্ড, স্যার ম্যালকম্ ব্লেইলি এবং স্যার ম্যালকম্ হুগ। এইরূপে একটি ছোট পথিধির মধ্যে কমিটিতে বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠিরই প্রতিনিধিত্ব

বাধ্য হয়—ইংরেজশীর্ষ এবং ভারতীয় সরকারী ও
এবং সেন্সরকারী সব। কমিটির কর্মচারীরা ছিলেন
ভিন্ন ভিন্ন মতের এবং এক মতের সঙ্গে অন্য মতের
স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত ছিল ফলে, এটা ধরেই
নেওয়া যায় যে এই সংঘাত কমিটির সুস্থ কাজে
এবং সর্ব সম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথে
বীধার সৃষ্টি করবে। তবে আমরা কাজে হাত
লাগালে এবং সে কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে
আমাদের অসুবিধা ক্রমেই কমতে থাকে এবং শেষ
পর্যন্ত এমনই কমে যায় যে কোন প্রস্তাব মীমাংসা
সর্বসম্মত হয়নি এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটেছে।
এখানে সেখানে মতানৈক্য বে দেখা দেয়নি, তা নয়।
কিন্তু আমাদের আলোচনা আলোচনার সমতা ও এক
মতোরই ছিল প্রাধান্য। এটা সম্ভব হয়েছিল লর্ড
লাউব বরোর ক্ষমতা আর পরাম্পরের মধ্যে একটা
"সেওয়া নেওয়া"র মনোভাব থাকার জন্য। চেম্বার-
মান হিসাবে লর্ড সাউথবরো ছিলেন একজন আদর্শ
চরিত্রের লোক—প্রশান্ত মনা, সহানুভূতিশীল, যার
সঙ্গে মিশে ছিল এমন এক ক্ষমতা-লব্ধ সৌজন্যবোধ
যা সব বিরোধিতাকে জয় করে ফেলে। আমার
বেশ মনে আছে, কোন জটিল ও বিসম বিষয় নিয়ে
বহুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পরে তিনি তার অপূর্ব বুদ্ধির
ধীর্গতি নিয়ে এমন স্থলর ভাবে সাজান গুছান কথা
কলতে এগিয়ে আসতেন যাতে বিরোধী সর্ভগুলিকে
খুশী করে সমস্যার সমাধান করে দিতেন। আমি
সময় সময় ভেবেছি তাকে যদি ভাইস রয় করা হত
তাহলে তিনি একজন চমৎকার ভাইস-রয় হতেন।
কিন্তু তা হওয়ার তো কোন উপায় ছিল না। ভারতে
তার স্বাস্থ্য ভাল থাকছিল না এবং একবার লাহোরে
আমাদের এক সভায় তিনি চেম্বার থেকে মুক্তি
হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় তাকে

বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। সময় সময় আমার সন্ত
কালে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি এবং তার
মুলাবান সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করেছি।
ইংল্যান্ডে থাকা কালে মধ্যে মধ্যে আমি তার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করেছি এবং তিনি সব সময় ভারতের প্রতি
তার ভালবাসা প্রকাশ করে ও আমাদের জাতীয়
আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে কথা
বলেছেন।

আমাদের কমিটি ছিল এক ত্র্যময়ান কাজের
লোকের কমিটি। বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান
কেন্দ্রগুলিতে আমরা গিয়েছি, সাক্ষাৎ গ্রহণ করেছি
এবং স্থানীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছি।
সবই আমরা সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছি।
আমাদের বয়কট করার কোন কথাই শুনে নি, কিংবা
সাক্ষাৎ দল করতেও কেউ অস্বীকার করেননি বা
কোন সংবাদ দিতেও নারাজ হন নি। বিশেষ করে
স্থানীয় সরকার সমূহের পরিমাণ আমাদের কাছে
সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়েছিল। সর্বত্রই আমরা
সরকার সমূহের প্রধানদের, কাউন্সিলারদের এবং
সেক্রেটারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা-
আলোচনার সুযোগ পেয়েছি।
যে দ্রুতি প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে সবচেয়ে
কম সহানুভূতি পেয়েছি সে সরকার দ্রুতি হল মাদ্রাজ
ও পাক্ষা। সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলী সম্পর্কে
মাদ্রাজ সরকার ছিলেন অত্যন্ত অনিচ্ছুক। তাদের
ইচ্ছা নির্বাচক মণ্ডলী আগাগোড়া সাম্প্রদায়িক
ভিত্তিতে হোক! পাক্ষা সরকারের ইচ্ছা ছিল যে
লেন্ডিক লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা কম করা
হোক এবং ম্যেট্রো চেম্-সুর্বার্ড রিপোর্টে (৮ প্রশস্ত
ভোটারিকার দানের সুশাসিত করা হয়েছে তাও
ভাল চান না। কমিটি তাতে রাজি হন নি, তারা
তাদের ইচ্ছামত কাজ করে গেলেন। (চলবে)

বিপ্লবী পুস্তকমালা

০/3.০০

অহীনীন সমিতির বিপ্লব গ্রন্থাগার—আবহাতি নং ১০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—প্রবোধ মন্ডলবাবু—১০০

কীর্ত্তন কুমার দত্তের—

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ১। বাংলায় অস্তিত্ব—১৫০ | ২। স্বাধীনতার ৩০তম বার্ষিকী—৮০০ |
| ৩। অহীনীন সমিতির শি, স্মৃতি—১০০ | ৪। শেখ হাসিনা সংগ্রাম কাহিনী—১০০ |
| ৫। কাকোরা পর্বত—১২৫ | ৬। কলকাতা বাহাদুর সংগ্রাম কাহিনী—৪০ |
| ৭। রাসবিহারী ও অহীনীন সমিতি—১০ | ৮। স্বাধীনতার পর্বত মা ও মেয়ে—৪০ |
| ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—৬০ | ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—৪০ |
| ১১। মহাত্মা ও হত্যাকাণ্ড—৪০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও তদনিনী নিবেদিতা—১৫ |
| ১৩। দেশ বাসের ভোগেনি (১)—১০০ | ১৪। দেশ বাসের ভোগেনি (২)—২০০ |
| ১৫। পর্বত চন্দ্রবাবুর আত্মজীবনী—৪০ | ১৬। ১০ই এপ্রিল আত্মীয় পর্বত বিবরণ—১০০ |
| ১৭। স্বাধীনতা চ্যালেঞ্জ—১৫ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অহীনীন সমিতি—৪০০ |
| ১৯। ভারতের আত্মীয় পত্রিকা ইতিহাস—৪০ | ২০। লাইট হত্যাকাণ্ড—১৫০ |

প্রতিখান :—৪নং বঙ্গবাস ট্রাষ্ট কলিকাতা-৭০০০০৭

টেলিগ্রাম :—১/১/১/A স্বাধীনতা ট্রাষ্ট কলিকাতা-৭০



1980



— সম্পাদক বঙ্গবাসী —

১। চম্পু (সম্পাদিত) প্রবোধ মন্ডল, বিপ্লবী চ্যালেঞ্জার

২। স্বাধীনতা—স্বাধীনতা পত্র চ্যালেঞ্জার

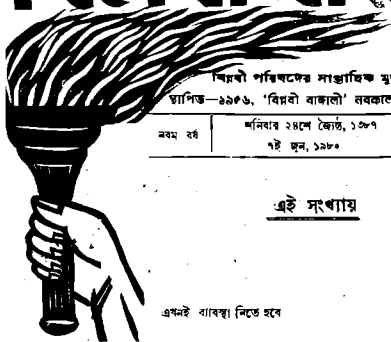
৩। স্বাধীনতা—স্বাধীনতা পত্র চ্যালেঞ্জার

৪। স্বাধীনতা—স্বাধীনতা পত্র চ্যালেঞ্জার

৫। স্বাধীনতা—স্বাধীনতা পত্র চ্যালেঞ্জার

৬। স্বাধীনতা—স্বাধীনতা পত্র চ্যালেঞ্জার

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
 প্রাপ্ত—১৯৪৬, 'বিপ্লবী বাংলা' সবকালেবার—১৯৭৯

নবম বর্ষ	শনিবার ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ ৭ই জুন, ১৯৮০	৩৭ সংখ্যা
----------	---	-----------

এই সংখ্যায়



এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে

—সম্পাদকীয়

মাত্রেরদা ও তাঁর বিপ্লব যজ্ঞ

—গৌরী ভট্টাচার্য

নয়টি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন ও দলীয় অবস্থা

জিম্বাবোয়ের স্বাধীনতালাভ

—কালীদাস সরকার

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—কীর্ত্তন দত্ত

আসাম সমস্যা—জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সমস্যা

মোর দুর্ভাগা দেশ

যাদের করেছ অপমান,

ইমানে হতে হবে,

ভাদের সবার সমান।

এখনই ব্যাবস্থা নিতে হবে

শীঘ্র করে কমান্স হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে করে কটি রাজ্যে যে সর্বনাশা আন্দোলন চলছে, তার পতি ও প্রকৃতি উনয়েই অত্যন্ত উৎসাহজনক রূপ ধারণ করেছে। এই আন্দোলন যদি কোন একটি ক্ষুদ্র এলাকার সীমাবদ্ধ থাকত, দেশের অত্যন্ত স্থানে প্রতিজ্ঞা হিসাবে ভারতের সংহতি, ঐক্য, একাত্মতাবোধকে কিলে করতে উজ্জ্বল না হত, তবে হরত এতটা হুস্তিয়ার ব্যাপার হত না। আসামের একমল অবাচীন রাজ ও দুইকরা, "খিলশী হঠাৎ" আগ্রহ্য কুলে যে লাঙ্গলজামা, অতিসংযোগ ও নরহত্যা করে চলছে এক দেশের সাহসে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে চলছে, সেটা শুধু আসামের সমস্যামাত্র নয়, সেটা আজ সর্বভারতীয় সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারতবাসী মাঝেই ভারতের যে কোন ক্ষেত্রে বসবাস ও কলিগোষ্ঠার করার সাংবিধানিক অধিকারকে বীকার ও মান্য করার ব্যাব্যাহতভাবে একমল পরলক্ষী সাহায্য প্রাপ্ত, উৎসাহ, দুইক অধীকার করে, সেটা নিম্নত দেশসেইহিতা ভিন্ন অস্ত কিছু নয়। ভারতের এই আন্দলটাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কোন কোন বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতবর্ষকে দুর্বল করে নিজ নিজ অতিক্রমিত একটা আসাম রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে তৎপর। তারা বিপক্ষবাদী, অর্থলোভী, পরপক্ষসেই একমল হার ও দুইককে তাদের কীকৃত হিসাবে ব্যবহার করতে। হামিয়ার জাম পরিকার তো খোলাখুলিভাবে অতিমুক্ত করেছে চীন দেশকে। অস্ত একথা সত্য, নিজেদের একটা বলক সাহসিক প্রসিক্ষ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রিতে চীনদেশ যথেষ্ট বকম সাহায্য করেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রকে দুর্বল করে, এনিয়া কুহেও নিজেদের প্রোভ্য বিস্তার করার চর্যায়। শুংকালীন পূর্বপাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ সরকার এই অভিযোগ সোকার) তাদের এলাকার খাটি স্থাপন করতে নিজেই এক অজান্তভাবে সাহায্য করেছে। এবারকার আন্দোলনের প্রোগানটাই বা একটু ভিন্ন ভকমের। খিলশীরা নাকি আসামের সন্ততিতে বিশ্র করে, অসমীয়াদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে চলেছে। কিন্তু এই বাহু আন্দোলনের বাহা ও প্রকৃতি আন্দোলনকারীদেরই, মুক্তি না মানবার প্রবলতা, দেশের দুইকর কার্যের প্রতি ভবনর প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে এই দেশসেইহিতা জনের দেশেই অবস্থানকারী ও স্হায়ক প্রকৃতির পানই সেয়ে চলছে। কিন্তু অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে বৃহৎ কঠে বক্তবির্যে কলতে হবে যে "thus for and so further." অজায় আবদার অনেক সস্ত করা হয়েছে। আর সস্ত করা উচিত নয় কোনকালেই। হই ছেলেরের শেজবিরও একটা সীমা আছে। তাদের শুধু

করা হবে না কোনমতেই। কেন্দ্রীয় সরকার ও দেশের দায়িত্বশীল মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা যদি একজোড় অগ্রণী না হন, তবে দেশের সাধারণ মানুষ এই অপকর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেই। একতরফাভাবে যারা অত্যাচারিত হচ্ছে তারাও মুখ বুজে দীর্ঘদিন এই অজ্ঞার সহ্য করবে না, যার প্রমাণ মিলছে আসাম সম্মালম্বী ছাত্রদের সম্মেলন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষ যদি নিজেদের হাতেই নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। বাঁচার লড়াইয়ে যদি তারাও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তবে তাদের উপর দোষারোপ করার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। এবং এটাও ভ্রম সত্য যে ভারতের ভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী এই সব নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং যারা ভারতের অঞ্চলভিত্তিক বিপ্লবী, তারাও যদি পাগল আন্দোলন শুরু করেন তবে সেটা নিশ্চয়ই আসামের জনগণ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই গণ্য হবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ বাণীতে নীরব দর্শক হয়ে বসে আছেন, একমাত্র রাজনৈতিক দলের মতলববাক নেতারা ছাড়া এ অভিযোগ করবেন না। যারা নির্বাচনে কল্যাণ হোতার ক্ষমতা অসীমতী গান্ধীর সরকারকে বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিলেন, তারা অবশ্যই হতাশ হয়েছেন। ছাত্রজন গুরুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতারা যে সব উক্তি করছেন, সেটা যে কত নিম্নস্তরের এবং ভারতের স্বাধীনতার, তা ভাবা যায় না। শ্রীজগজীবন রাম বলেছেন যে আসামের আন্দোলন জাতীয়তাবাদী। দীর্ঘদিন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে আজ যদি শ্রীবাসের বিলম্ব এই হয়, তবে বলতে হবে যে তিনি জাতীয়তাবাদের অ, আ, ক, খ ও অজ্ঞ পর্যায় লিখতে পারেন নি। শ্রীহেগড়ে ও শ্রীহাজপেটীর মত ভারতের রাজনৈতিক আকাশে হটাৎ গন্ধিয়ে ওঠা নেতাদের বক্তব্য ও প্রকাশ্যে এই আন্দোলন কারীদের কাজকর্মের সমর্থনের সাক্ষ্য। তবে কি জনসংঘ ও আর, এস, এস এই আন্দোলনকে সমর্থন করছে। এই অভিযোগ সত্য বলে ধরে নিতে হবে।

শ্রীমতী গান্ধী অভিযোগ করেছেন যে কোন কোন বিরোধী দল এই আন্দোলনকারীদের সমর্থন করছে। প্রধানমন্ত্রীর আনুগত্য সর্বদল সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ তারা গ্রহণ করবেও, শেষ পর্যায় যোগদান করেন নি বাজে অজুহাতে। কি দুর্বোধ্য এদের মানসীকতা! সমগ্র দেশের স্বাধীন সংরক্ষণের বাণীতেও তাদের এই কমাহীন অনীহা! সর্বদল সম্মেলনে কোন অমৌলিক প্রত্যাবাস। তাদের রাজনৈতিক জীবনকে পূর্ণ করে দেবার সম্ভাবনা দেখেই কি তারা এই সম্মেলন বর্জন করতে চাইছেন একটি ছলনার আশ্রয় নিয়ে এবং লম্বা চাওড়া বুলির আড়ালে? অল্প দিকে আন্দোলনকারীরা বলেছেন যে প্রধান বিরোধী দলগুলি এই সম্মেলনে যোগদান করেন নি বলে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রত্যাখ্যান করার আবেদন কে অগ্রাহ্য করেছেন। এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে সহায়ক দলগুলির অসুপস্থিতির সুযোগ তারা নিতে চান। সুতরাং ছবিটা কমন স্পট হয়ে পড়েছে, ব্যবস্থাও সেই মত নিতে হবে। দেশের স্বাধীনতার কাজ বারাই করছে, তাদের কোন কমা থাকতে পারে না। আমরা প্রত্যাশা করি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেটা এখনই নেওয়া হবে।

মাস্টারদা ও তাঁর বিপ্লব যন্ত্র

॥ গৌরী ভট্টাচার্য ॥

“Liberty is the birth-right of every body. The privilege of being free is not required to be granted by somebody else. Make up your mind, ready for any sacrifice that may be demanded of you. If you can stick to this grim resolve, no power either on this earth or in Heaven can come between you and your object” :—

এই মন্ত্রে বাঁচ জীবন ছিল মুক্ত—কর্মে ছিল প্রবল গতিবেগ, সাধনা হয়েছিল সিদ্ধ—তাকে আমরা আজকের দিনে ক’জনই বা জানি। খনামকে চারিত্রিক প্রতিভা, সংগঠন ও স্বেচ্ছাশ্রদ্ধা দিয়ে করে—ছিলেন স্বার্থক,—“চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের” হুমসাহসিক মহানায়ক। ইতিহাসে যতদিন আমাদের অতীতের বার্তা দেবে—ততদিনই নজরে ঠেকবে দুর্লভ বিপ্লবী সূর্য সেনের নাম। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উন্টানোর বৈধতা আমাদের কোথায়! যাত্রা, থিয়েটার দেখে অথবা চোখের সামনে সহসা পড়ে বাঙালী পুঁথি-পত্রিকার পাতায় হু-হুতর আগুড়িয়ে কোন প্রকার নামটা কেউ মনে রাখি, কেউ ভাঙে পারি না বা মনে রাখার মত আন্তরিক ইচ্ছে বা ভক্তি নেই। কুশমতুক আমরা—অযোগ্য নেতৃত্বে বেশ ব্যস্ত হয়েছি,—এসে-এসে হিটকে পড়েছি। তারপর স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে—উত্তরাধিকার সূত্রে

যেন পিতৃ-পুত্রের ভিত্তি বসবাস করছি পরম সৌরভেরে। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রের সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়ে আমরা এক কালে বাস্তবতা, আশ্রয়হীন অবস্থায় লুপ্ততার হাতের ক্রীড়নকে পর্যবেক্ষিত হয়ে ছিলাম—সেকথা আজ বিস্মৃতপ্রায় কারণ আমরা পতিত দেশবাসী—নামমাত্র স্বাধীন পতাকার আশ্রয়ে।

সে যুগে কি ঘটেছিলো—তা হাল আমাদের যুব সম্মুখাবের ধারণারও অত্যন্ত, মূল্যবোধ দূরে কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আজ কোণঠাসা এক শ্রেণীর মেকী সংগ্রামীদের লাগটে, একদিন ঘাঁড়ের বীর বিক্রম সাগর পারের দানব শাসকগোষ্ঠীকেও হার মানিয়েছিলো—বাধা করেছিলো ভারতের মালিকানা ত্যাগ করাতে, এ’রা আজ উত্তর চা অথবা চুকটের জমজমাট আচ্ছাদ্য হাতেরোল আর বাগ কৌতুকের পাত্র। হার বে উত্তর পুরুষ! ভারতেও লক্ষ্য হর কাণায় কুক কোঁটে ঘায়, ও’রা নাকি আজ চোর, ঠক নামে আখ্যায়িত। প্রাক্তন ইন্দিরা সরকার বর্তমান মহাবীর যুগে হু’শ টাকা দিয়েই আজীবন দেশ-প্রেমিক ও জীবনপণ সংগ্রামীদের সমস্ত ত্যাগ ভিত্তিকা, হু’ব কষ্ট, লাঞ্ছনার মূল্য দিয়ে ধস্ত করছেন নিভাস্ত করণার পাত্র মনে করে এবং অপরাধ ভাবের হু’শ টাকা গ্রহণ করা বিবেচনী শ্রেণীর কাছে। তা ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিদগ্ধ হেলে মেয়েদের দস্ত কাপড়ে পড়ে পড়ানো, চিকিৎসা

চাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগের কথা বলে রেখেছেন। কিন্তু সবই ভাঙতা মাত্র। চাকুরী ক্ষেত্রে চাকুরী প্রার্থীরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান হিসাবে পরিচয় দিলে চাকুরী দুয়ের কথা হস্তাক্ষেপ হতে হয় উপরন্তু পড়াশুনার ব্যায়ে অর্থ সাহায্য বা কল্যাণ নেলে—বিভাগীয় কর্মচারী অথবা কলার ভাণ্ডার গায়েব করতে বিশেষ পিছু পা হন না। কিন্তু সত্যিকারের পরিসংখ্যানের নজরে নিশ্চয়ই হয় পড়বে আজ প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছেলে মেয়ে কেউ উপযুক্ত তদারকি অথবা সাংগঠনিক অনটন হেতু নানা প্রতিভার অধিকারী হয়েও শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট অগ্রগতি হতে পারছেন না। ভিত্তি থাকছে না। এমন কি সামান্য মাথা গুঁজার ঠাইটুকুও অভাব—বাচার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। শ্রম জগৎ—এই কি গ্রানপণ দেশসেবার যোগ্য পুরুষের তাঁদের জীবন কি শুধু সর্বপ্রকার শ্রম, ভোগ আনন্দ জলাজলি দিতেই উৎসর্গীকৃত।

যত্মমানে দেশসেবার নামে আমাদের নেতারা নিজস্বের পার্টি, সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক নেতৃত্ব নিয়ে বাস্তব। নিন্দে আর প্রশংসার টানাপোড়েনে ব্যতিব্যস্ত নয়তঃ সর্বব্যাপারে বিশেষ সুযোগ লাভের 'অগচেষ্টা' আর লম্বা-চওড়া বুলি!

এত সংগে ভাবাক্রান্ত স্বপ্নের স্বপ্নের কথা বলতে 'মজলুম' নামের আশা নিয়ে সমাজদার অল্প সংখ্যক মানুষও যদি তাঁর প্রকৃত মূল্য দেবার চেষ্টা করে তবে বস্ত হতো। অথবা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'অবের খেয়ে বনের মোহ' ভাঙানো জেষ্ঠ্য সৈনিকদের মধ্যে তিনি অন্ততম। কেউ তাঁকে ছ' পয়সা মাহিলা দেয় নি তাঁর কাছের বিনিময়ে। এমনি বান (বাওয়া) দেয় নি—তবুও স্বপ্ন গিরেছিলেন দেশোদ্ধারের অগ্নি বলবে। "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার

অভিযানের" প্রকাশ বর্ধ পুঁতি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে মহাজাতি সদনে এবং আরও অস্ত্রাগার স্থানে কিছু কিছু সমবেত চিত্তাশীল দেশসেবকরা সেই অভ্যর্থানার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের উদযোজন অনুষ্ঠান পালন করেছেন ও করতেন। সেই অভ্যর্থানার হোতা পুরোহিত মাষ্টার দা' গুরুকে মৃত্যু সেনা যিনি অবশেষে 'জীবনের জয় গান গেয়ে গেছেন ফাঁসির মঞ্চে'। সেই জয় গানের রেশেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠির সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়ে উঠেছিলো। কোন প্রকার arms এবং ammunition ছাড়া বিন্ন সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে ফাঁকি দিবে এতবড় সংগঠন গড়ে তোলা এবং সংগ্রামের পথে পা বাড়ানো রোমাঞ্চকর অভিযান বৈকি!

মৃত্যু সেনার পেশা ছিলো শিক্ষকতা। ছাত্র বেলায় বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন কালে দেশোদ্ধার জ্ঞেতে অগ্রপ্রাণিত হন। ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম উচ্চাভিমান বিভাগের শিক্ষকতা ত্যাগ করে চট্টগ্রাম জেলা কাংগ্রেসের সম্পাদক হন। অসম্মানযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর বিদ্রোহী আন্দোলন ও সংগঠনে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ সালে 'আসাম বেঙ্গল কলেজ' (A.B.R.) কর্মচারীদের মাহিলায় টাকা লুট হওয়ারো এই ঘটনার ভিত্তিতে মৃত্যু সেনাকে প্রেরণ করা হয় এবং পরে নির্দোষ প্রমাণিত হলে মুক্তি পান। ১৯২৪ সালে বঙ্গ Bengal Ordinance জারি হয় সে সময় Ordinance-এর পরওগ্রহণার ফলে তাঁকে প্রেরণের চেষ্টা করা হয় কিন্তু তিনি পলাতক অবস্থায় কাছাকাছি প্রায় ৬ বৎসর কাল অভিযুক্ত করেন। সে সময় হাইলাকান্দিতে বিহার 'বেঙ্গল বয়স্কা' মাদ্যপ্রাণীর্ধ কারাগার প্রাপ্ত বিদ্রোহী শ্রীকান্ত উপায়ক এর

মহাশয়ের বাড়ীতে এবং করিমগঞ্জে তখনকার আয়ু-
র্বেদিক নারায়ণ ঔষধালয়ে কবিরাজ অবনী লাহিড়ীর
বাড়ীতে অবস্থান করেন এবং সাথে সাথে ভয়ে
শেখ পা না হয়ে কাছাড় বৈপ্লবিক আন্দোলনমূলক
সংগঠনে প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তখনও
মুর্খা সেন 'মাস্টারকা' নামে তুটটা প্রেসিডেন্সী লাভ
করেন নি। পাকিস্তানে বেড়ালেও ১৯২৬ সালে
কোলকাতাতে সেই Bonnal Ordinance এর
আওতায় ইংরেজদের স্টেন নল্লরকে আর ক'লিকি নিতে
পারলেন না। দীর্ঘ কারা ভোগের পর ১৯২৮-এ
মুক্তি পেলেন। সাধারণ দৃষ্টিতে এবং প্রকৃতিগত
ভাবে মানুষটিকে নিহাস্তই শাস্ত, নিরীহ ও অমানসিক
যেহালাও অন্তরে সপা জাগ্রত ছিলো। এক হৃৎস্পন্দীয়
লোকের আর সৌখ্য। ১৯২৮-এ ছাড়া পাণ্ডয়ার পর
তার বৈপ্লবিক তৎপরতা পূর্বের চাইতে অধিক সং-
গঠনিক শক্তি নিয়ে এগিয়ে চললো,—যার চূড়ান্ত
কলাকল হলো ১৯৩০-এ ১০ই এপ্রিলের "চট্টগ্রাম
অগ্নাগার অভিযান"। সেই অভ্যুত্থানের পর পলা-
তক অবস্থায় একটানা চার বছর ব্রিটিশ রাজের
কিছুকিছু মুর্খা সেন ও তার সহকর্মীগণ সমগ্র বিপ্লব
চালিয়ে যেতে থাকেন। তাতে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে
সেই সিংহ-পুরুষকে নিজ কবজার আনার পুরস্কার
বস্ত্রপ সরকার দশ হাজার টাকা পর্যন্ত খোষণা
করলো তাছাড়া অস্ত্রদিকে তদানীন্তন বাংলার নেতা
কতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে অহুসার করে Boxa
Fort Detention Camp-এ নেতৃত্বানীয়েদের
সহিত আপোষ অসোচনার জন্য পাঠালো যাতে করে
আংশিক স্বাধীনতা বিধে একটা negotiation-এ
আসা যায় কিন্তু ওরা তাতে গররাজী হলেন এই
বলে যে,—অগ্নাগার অভ্যুত্থানের যজ্ঞ পুরোহিত
মুর্খা সেন,—কাজেই মুর্খা সেন ছাড়া এ ব্যাপারে

আমরা কোন মতামত পোষণে অসমর্থ। শাসকশ্রেণী
রাজসম্মান ক্ষুদ্র হওয়ার লক্ষ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে
মরিয়া হয়ে উঠলো। মুর্খা সেন ও তার সহকর্মীদের
প্রেরণার ক্ষমতা। অবশেষে ১৯৩৪-এ বিজোহী নেতা
আটিকা পকুলেন শেতার শাসকের কন্ডার এবং
অব্যবহিত ক'লিকি গেরেই ক'লিকি মাকে 'মুর্খা সেন'
চেকে দিল নির্দয় অকাল-মৃত্যুর ঘোর কালো মেঘ,
তবে অবববেই মাত্র। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস
এখনও জাঘর-জোতিতেই কিরণ বিকিরণ করছে—
এবং চিরদিন করবে নিঃসন্দেহে।

কিন্তু মাত্র দিন কয়েকের ক্ষণ হলেও চট্টগ্রাম
স্বাধীনতা পেয়েছিলো, উত্তীর্ণ হয়েছিলো স্বাধীন
পতাকা চট্টগ্রামের আকাশে রচিত হয়েছিল 'অগ্নাগারী
বিনবী বুদ্ধব্রাহ্মণ প্রজাতান্ত্রিক সরকার'—Indian
Republican Army, যার প্রধান 'মুর্খা সেন'
স্বাধীন যজ্ঞ ঠাড়িয়ে চট্টগ্রাম তথা অঞ্চল ভাষত-
বাসীকে গুনিয়েছিলেন অস্ত্র মন্ত্র,—পরবর্তী কালের
নির্ভীক বিপ্লবী পদক্ষেপের প্রেরণার পক্ষজ্ঞ।

মাত্র বছর দুয়েক আগে এ যজ্ঞের আর এক
পুরোহিত অনন্ত সিং চরম যোগ-যজ্ঞ। এবং আধিক
অনটনে ধুকতে ধুকতে পৃথিবীর ধূলিতে মিশে
গেছেন মিশে গেছে তার সমস্ত সিংহ বিক্রম। এই
অনন্ত সিং ছিলেন মাস্টারদার দক্ষিণ হস্ত। সর্বপ্রকার
হুঁসাহসিক কাজে অনন্ত সিং থাকতেন সকলের
পুয়োভাগে এবং মাস্টারদাকে অহরহ-ই শক্তি
দুগিয়ে গেছেন—তা ছাড়া আরও আছেন নির্ভল
সেন, লোকনাথ বল, গবেশ খোষ প্রমুখ এমন কি
শ্রীভিলতা, কখনো সের মত মেহেরাও বুলেটের মুখে
ধাড়াতে পেছ পা হয় নি। এমনি ছিলো তার
(বাকী অংশ ১১ পাতায়)



হাঁ। দেখাবন
 নিশ্চিন্ত কিনাবন।
 বিহুতেই না ঠকাবন,
 কাজ হল পাবন।

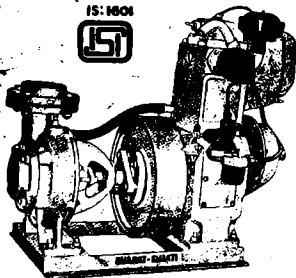
অদ্বৈত চাষের জলের ভাঙে জনপ্রিয় ❖ অস্বীকার

“ভারত শক্তি”

ডিজেল ইঞ্জিন পাৰ্পাসেট।

HINDUSTHAN TRACTOR 50 HORSE POWER

IS: 1601



প্রস্তুতকারক : ভারত ইলেকট্রিক্যালস, কামপুর।

এক্সপোর্ট এজেন্ট : টাটা এক্সপোর্ট লিমিটেড, বোম্বাই।

পরিবেশক : ইন্ডো ইন্ডিয়া এনালো ইন্ডাস্ট্রিজ (গ্রাহ) লিমিটেড, কলিকাতা।

জিম্বাবোয়ের স্বাধীনতালাভ

॥ কালীন্দ্র সরকার ॥



রোডেশিয়ার বর্তমান নাম জিম্বাবোয়ে। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণভাগে অবস্থিত চুবৈষ্টিত রোডেশিয়ার আয়তন ৩,৮২,২৬১ বর্গ কিলোমিটার, লোক সংখ্যা ৬৮,২০,০০০ বার শতকরা ১০ ভাগ যেতান, বাসবাসিক কৃষক। রোডেশিয়ার ভূমি উষ্ণর, বনিজ সমৃদ্ধ এবং প্রাণিমায় এতানান্তিম।

নব্বই বছর আগে ব্রিটিশ সাদিগ আফ্রিকা কোম্পানী বাবসা করতে যার রোডেশিয়ার এবং গড়ে সেখানে এক মজবুত ব্রিটিশ উপনিবেশ। যার রাজধানী স্যালিসবেরি। কোম্পানী এক সঙ্গে বাবসা এবং রাজ্যশাসন করতে থাকে। সেখানে যার খৃষ্টান প্রচারক গণ। তাঁদের কৃষকায়রা খৃষ্টান গ্রহণ করেন এবং ইংরাজি শিখেন। দেশের ভাষা অফ্রিকান হলেও, ইংরাজির প্রচলন বেড়ে যায়। সরকারী কাজকর্ম ও উচ্চতর শিক্ষা চলে ইংরাজির মাধ্যমে।

১৯২০ সালে ব্রিটিশ সরকার রোডেশিয়ার শাসনভার বহুতে নেন এবং অল্প দিন পরে, রোডেশিয়ায় ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ভিত্তিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বায়ত্ত শাসন চালু হলেও, দেশের অধিবাসীদের এমনভাবে নিরস্ত্রিত হয়, যাতে শাসন ক্ষমতা সংখ্যালঘু যেতানদের হাতে থাকে। বাবসা, কৃষিকৃষি ও সৈন্তবাহিনীর উপর সম্পূর্ণ যেতান-প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

অশেষতকারগণ এই ভূমি স্বায়ত্ত শাসনের বিরুদ্ধে সরব হন। দেশের কৃষি ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ ঘনীভূত হয়, কারণ প্রচলিত ব্যবস্থায় যেতানরা মাথা পিছু রাখতে পারে ৭৫ একর কৃষিকৃষি, কৃষকায়রা পারে মাথা পিছু ৫ একর পর্যন্ত। বনিগুণির মালিকানা যেতানদের দখলে, অশেষতকারগণ শ্রমিক মাত্র। শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্রেও যেতানরা সর্বস্বাধী। এ ধরনের অবিচার অনন্তকালের ক্ষত মেনে নিতে অস্বীকার করলেন কৃষকায়রা। আন্দোলন শুরু হল।

ভিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন এবং অধীন দেশগুলির স্বাধিকার লাভ জিম্বাবোয়ের কৃষক অধিবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তীব্রভর করল। সংগ্রাম চলেছিল অহিংস নিরস্ত্রাত্তরিক পথে যেতান: সিখোলে ও বিশপ মুজোরেওয়ার নেতৃত্বে। রোডেশিয়ার সরকার আন্দোলন ধম্মনে তৎপর হল, মুক্তিযোদ্ধাদের উপর চলল নির্ধাতন। অনেক লোক কারারুদ্ধ হলেন। সংখ্যা লঘু সরকারের প্রধানমন্ত্রী মি: আহান শিখ সপক্ষে ঘোষণা করলেন—‘আম’র স্বাধীনকালে রোডেশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো আদমির শাসন কিছুতেই হতে দেব না।’

আফ্রিকানরা মি: শ্বিথের কথার জবাব দিলেন সমস্ত গেরিলা যুদ্ধ ঘোষণা করে। শুরু হল সহস্রাঙ্গুল আক্রমণ ও খণ্ডযুদ্ধ। সমস্ত অভিবাসনগুলির নেতৃত্ব দিলেন জিম্বা বেংবে গ্রাশনল ইউনিয়নের প্রধান হবার্ট মুগাবে এবং জিম্বাবোয়ে পিপলস ইউনিয়নের প্রধান জোশুয়া নকোমা। রোডেশিয়ার যেতাজ অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা গুরুতর ভাবে বিঘ্নিত হল। টনক নড়ল মি: আদ্যান শ্বিথের। সংখ্যালঘু সরকারের শাসন-অধিকার অব্যাহত হল জাতিপুঞ্জ সভায় এবং জোট নিরপেক্ষ জাতি সম্মেলনে। আন্তর্জাতিক বয়কটের মুখে পড়ল নিম্নলিখিত শিব সরকার। রোডেশিয়ার অর্থনীতিতে লাগল প্রচণ্ড আঘাত।

মি: শ্বিথ রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং গড়লেন এক নতুন শাসন ব্যবস্থা। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রশাসন এবং দেশরক্ষা, ১০০ জন সদস্য বিশিষ্ট আইন সভার উপর ক্ষমত্ব হল। ১০০ সদস্য সংখ্যার মধ্যে ২০টি আসন সংরক্ষিত হল যেতাজদের জন্য, বাদ-বাকি ৮০টি আসন রইল কৃষকদের জন্য। সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে নেওয়া হলো, বিচার বিভাগ, অসামরিক চাকুরি এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ে যেতাজ সদস্যদের ভেটো প্রয়োগের অধিকার বহাল হল।

সমস্ত গেরিলা সংগ্রামীরা প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার বর্জন করলেন। অহিংস আন্দোলনের নেতা বিশপ মুজোরেওয়া মি: শ্বিথের সহিত বিস্ত্র আপসে রাজি হলেন। তিনি তখন জেলে। তাঁকে মুক্তি দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হল। নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিশপ মুজোরেওয়া নবসংগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন। যেতাজ প্রত্ন-যেমন ছিল তেমনই চলতে লাগল।

গেরিলা যুদ্ধের নেতাজা বললেন—মুজোরেওয়ার তাঁবেকার সরকার আমরা মানি না। এ সরকারাক আমরা উৎখাত করবই। মি: জোশুয়া নকোমা কমিউনিষ্ট মি: হবার্ট মুগাবে নিজেকে মার্কসবাদে বিশ্বাসী বললেও বস্তুতঃ একজন প্রজাগণপন্থী। উভয়েই সমস্ত সংগ্রামের নায়ক। নতুন করে গেরিলা ভণ্ডপরতা আরম্ভ হল, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: আদ্যান শ্বিথ ও প্রধানমন্ত্রী বিশপ মুজোরেওয়াকে আলোচনার জন্য লণ্ডনে ডেকে আনলেন। মি: জোশুয়া নকোমার পিছনে কিউবাকে যেসে সোভিয়েত রাশিয়ার অঙ্গপ্রবেশের চোঁ মিসেস মার্গারেট থ্যাচার বেশিদূর এসেতে দিলেন না। আলোচনার বসে প্রথম বৃদ্ধিমতী মিসেস থ্যাচার কিন্তু হুতলেন যে, সত্যিকার জন-প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রবর্তিত না হলে, রোডেশিয়ার সমস্তার সামাধান হবে না। তিনি অনতিবিলম্বে আলোচনার জন্য ডেকে আনলেন গেরিলা যুদ্ধের নায়কদের। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন মি: আদ্যান শ্বিথ। আলোচনা সফল হল।

নবতম ব্যবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে যে নির্গাচন অনুষ্ঠিত হল, তাতে মি: রবার্ট মুগাবে বিপুল সংখ্যা গরিবতা লাভ করলেন, কমিউনিস্ট প্রভাবিত মি: জোসুয়া নকোমা পেলেন মাত্র পাঁচটি আসন। বিশপ মুজোবেওয়া সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন, তিনি একটি আসনও পেলেন না। মি: আয়ান সিথ পেলেন হেতুগত অধুসিত সহর অঞ্চলের গুটি কয়েক আসন। মি: রবার্ট মুগাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন, তবে তিনি তাঁর সংগ্রামের সঙ্গী মি: জোসুয়া নকোমাকেও সরকারে নিলেন এবং মিলেন তাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ। এভাবে ব্রিটেনিয়ার মুক্তি সংগ্রাম সফল হল।

রোডেশিয়া এবার সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল। স্বাধীনতা উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ভারত অবিচ্ছিন্নভাবে আফ্রিকাবাসীদের স্বাধিকার লাভের সংগ্রামের পোষকতা করে এসেছে। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রামযুক্ত ভূমিকা সুবিদিত। রোডেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অবদান আছে। এক সময় ভারত কৃষ্ণাঙ্গদের সমর্থনে সশস্ত্র হস্তক্ষেপেরও হুমকি দিয়েছিল। সূতরাং জিম্বাবোয়ের অধিবাসীদের আনন্দে ভারতবাসীও আনন্দিত! শ্রীমতী গান্ধী জিম্বাবোয়ের পুনর্গঠনে ভারতের সর্বাধি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

স্বাধীনতা উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘোষণা করেছেন ইংলণ্ডের সুব্রাজ প্রিন্স চার্লস।

মি: রবার্ট মুগাবে শাসনকর্মতা হাতে নিয়েই বলেছেন যে, দেশের যাবতীয় ভূমি পুনর্গঠন হবে এবং খনিজ সম্পদ জাতীয়করণ হবে। তিনি যেভাঙ্গদের বৈধ অধিকার রক্ষার আশ্বাসও দিয়েছেন। তবুও যেভাঙ্গ সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছে না, জমি ও খনির মালিকানা হাত ছাড়় হলো তারা কি করে তাদের জীবনমান ও আভিজাত্য বজায় রাখবেন—এ চিন্তা তাদের মধ্যে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে ভাবছেন, এবার দেশ ছেড়ে সরে পড়। তবে যাবার আগে তারা যেন আফ্রিকার উদ্দেশে বলেন, ‘সত্যের বর্ষর লোভ’ এবং ‘নির্লজ্জ অমানুষতার’ ক্ষণ, হে ছায়াবৃত্তা জননী, তুমি আমাদের কমা করো।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

আসাম সমস্যা—জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সমস্যা

॥ অরুণচন্দ্র দাস ॥

গত ১৭ই মে সারা বাংলায় সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থনে পরিপূর্ণ হ্রতাল হয়। এই প্রতিবাদ আসামবাসীদের বিবৃতি নয়, বিদেশী বিতাড়নের নামে আসামের ভাত ও দুগ্ধ সংগ্রহের জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে, ভারতের একা ও জাতির সংহতি দৃঢ় করার জন্য দেশবাসীর সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণের দাবীতে।

পশ্চিমবঙ্গ বাসীর সঙ্গে আসামের অধিবাসীদের কোন বণড়া নেই। প্রতিবেশী হিসাবে আসামের সুখ ও সমৃদ্ধি পশ্চিম বাংলার কাম্য। আসাম ও পশ্চিম বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিরও অনেক মিল আছে, সেইহেতু বাঙ্গালীদের অধিকাংশের অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাং হতে কোন অসুবিধা হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও বাঙ্গালীরা যাত্রা করবে পুরুষ আসামে বসবাস করছেন, আসামেই যাত্রা মাতৃভূমি বলে জানেন এবং আসাম ছাড়া ঘরের অঙ্গ কোথাও বাওরার জায়গা নেই, তাদেরই বিদেশী আখ্যা দিয়ে নির্ধাতন ও বিতাড়নের প্রচেষ্টা চলছে। এই আন্দোলন গত ৭৮ মাসে যে রূপ নিয়েছে তাতে অসহায় সংখ্যালঘু বাঙ্গালীরাই কেবল বিপর্যয়, গোটা ভারতকেই বণ্ড বিধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। পোষ্টার পড়েছে 'ইণ্ডিয়ান জন্ম, ফ্রিট আসাম'। এরকম আন্দোলন ভারত বাহীন হওয়ার পর গত ত্রিশ বৎসরে কোন রাজ্যে হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী বার বার আবেদন সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা কোন

রূপ মীমাংসায় আসতে অসম্মত। আসামের প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচলই বলা যায়, কারণ আন্দোলনকারীরা সরকারের কোন নির্দেশ মানছে না। প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাব ছিল ১৯৭১ সাল ভিত্তি বৎসর ধরে বিদেশী তেতা নির্ধারণের কাজ শুরু হউক। কিন্তু কিন্তু আন্দোলনকারীদের দাবী ১৯৫১ সালের জাতীয় রেজিষ্টারে যাদের নিজেদের বাপিত্ব পুরুষদের নাম আছে একমাত্র তারাই আসামে থাকবার অধিকারী, বাকী সব নাগরিককে বিদেশী আখ্যা দিয়ে আসাম থেকে তাড়িয়ে হবে।

এভাবে বিদেশী বাড়াই হতে পারে না। বিদেশী বাড়াইয়ের কতকগুলি আঙ্গিনগত পদ্ধতি আছে। তাছাড়া আসামে বসবাসকারী বহু বাংলাভাষী বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণেই সেখানে গিয়েছে। অরুণাচল সরকার ১৯৪৭ সালে দেশভাগের কালে যে অকৃতপূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে মীমাংসার ভণ্ডারের সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি ভারতের একটি জাতীয় দায়িত্ব ছিল। ১৯৭৭ সালের পূর্ববর্তী অবিস্তৃত ভারতে শিতা ও শিতামহলের জন্ম হয়েছে এমন যে কোন মানুষকে ভারতে আশ্রয় ও নাগরিক অধিকার দেওয়ার অস্বীকার দেওয়া ছিল বাধীনতার জয়লাভে, এটা হল বেশভাগ করে বাধীনতা লাভের মান্দল। আজ আসামের আন্দোলনকারীরা কোন অধিকারে সেই সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন করতে পারে। ভারতের

সে কোন রাজ্যে সে কোন ভারতীয় নাগরিকের থাকার অধিকার আছে। কে বিদেশী তা নির্ধারণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সমস্যা পরিস্থিতি উপেক্ষা করে আসামে একজন ও সংখ্যা-লঘুকে হেনস্থা করা হলে ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতির উপর আঘাত করা হবে। রাজ্যে রাজ্যে প্রাদেশিকতা বৃদ্ধি পাবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তার লাভ করবে, ভারতের জাতীয় একতা ও সংহতি বিপর্যয় হবে।

সর্বদলীয় সমর্থনে বাংলার হরতাল দ্বারা আসামের উপর চাপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, তা বাড়াতে হলে অসহায় রাজ্যেরও সব্ব ভূমিকা প্রয়োজন। সম্মিলিতভাবে আসামকে বলতে হবে তোমার খেয়ালে বলি হতে পারে না রাষ্ট্রের সংহতি। ভারতীয় একতা চেতনা তোমাদের সঙ্গীত গোষ্ঠির স্বার্থের চেয়ে বড় জাতীয় স্বার্থ।

এককালে হিটলার জার্মানিতে জাতিধ্বংস এবং ইহুদি নিধাতন ও বিভাঙল করে গণ-হিরিতিবা সৃষ্টি করেছিল। ইহাও পরিসমাপ্তি হয় সর্কারক ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। এই ধ্বংসস্তম্ভের মধ্য হতেই জার্মানি দুইভাগ হয়ে নতুন জার্মানি উদ্ভব হয়েছে। আসামের ও উত্তর পূর্বান্চলের যুবকগণের এই ঐতিহাসিক ঘটনা উপলব্ধি করে মামবন্দীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে আসামকে সমৃদ্ধিশালী করার প্রচেষ্টার জন্য হওয়া উচিত। ভারত আসামকে সম্মুখে বিনাশের পাথে আর এগুতে দিতে পারে না।

আসামের এই উগ্র আনুচলিক জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষের মানচিত্রকে গুরুতরভাবে-আক্রমণ করেছে। কেবলমাত্র আসাম ও উত্তরপূর্বান্চলের রাজ্যগুলিতে নয়, অসহায় রাজ্যগুলিতেও আনুচলিক জাতীয়তাবাদের ভয়ঙ্কর সুর হতেছে। যেমন

কর্ণাটকের কংগ্রেস (আই) দৃব্যমণ্ডী ১০ই ফেব্রুয়ারী বোম্বা করেছেন তার রাজ্যে কোন চাকরী অকর্ণাটকীদের মিলবে না, ১০০ ভাগ চাকরীই কর্ণাটকীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে এই রাজ্যে রাষ্ট্রস্বায়ত ব্যাংকের সনাক্তকরণ করে বলেছিলেন রাজ্য সরকার বাংলা হয়ে নিজের উদ্যোগে একটি ব্যাংক স্থাপন করতে বাধ্য হবেন। বিভিন্ন বেসে রাজ্য সরকার ও সরকারী

(৫ পাতার পরের অংশ)

সাংগঠনিক কমতা সং বলিষ্ঠ এবং নিঃস্বার্থ বৈপ্লবিক কর্মধারা।

মত সহস্র স্বাধীনতা সংগ্রামীর আন্তর্জাতিক আয় স্ফরি-স্রাত হয়ে ভারত পবিত্র স্বাধীনতা অর্জন করে পরাধীনতার প্রানিমুক্ত হয়েছিলো কিন্তু তা আজ চরম ব্যর্থতার দ্বান হয়ে গেছে নিতান্তই আটপোরে স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের সর্ব ভারতীয় নেতারা হানাহানিতে মগ্ন। বেশ সেবার নামে যে ঘৃণিত বিদ্যাক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে মুক্তি পাওয়া বড়ই কঠিন। তবুও অসুযোগে এ ধরণের হুঃসাহসিক ও সং-সংগঠনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় যদি যুব-সম্প্রদায়ের একটা শ্রেণীও উদ্বুদ্ধ হয় তাহলেও যে-সকল অমূল্য আন্তর্জাতিকের কিছুটা মূল্যায়ন হবে। এ ব্যাপারে জন-নেতাদের কাছে অসুযোগ বিশেষতঃ যুব-সম্প্রদায়ের প্রতি, এঁরা বেন সর্বশ্রকার রাজ-নৈতিক কৌশলের উর্ধ্বে থেকে কাজ চালিয়ে হান বাতে করে ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবের পুরোধা বা তাঁদের প্রাকৃত শৈল্পিক স্বীকৃতি পেতে পারেন এবং বর্তমান দেশের চতুঃমুখীন সংকট মুহুর্তে দেশবাসী এখিধ মনঃ আশর্ষের অমূল্যলানে জড়ী হন।

প্রতিষ্ঠানের লগ্নির পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি টাকা। এই টাকা দিয়ে একটি বেস খুলে পশ্চিমবঙ্গ মানুষকে টাকা ব্যাধার ক্ষুদ্র ডাক দিবে। এই ধরনের উক্তি আনুচলিক জাতীয়তাবাদের প্রবোদন। এখন প্রায় ১৯৭২-৮০ সালে ভারতে আনুচলিক জাতীয়তাবাদ হঠাৎ এমন ক্ষমী হয়ে উঠল কেন? এই সমস্যার পূর্বানুচনের কোন ভবিষ্যতের সূচনা করতে। এবং এ সমস্যার মৌলিক সমাধানের পথ কি?

প্রশ্ন করা যায় ভারতবর্ষ কি একজাতির এক-দেশ, না বহুজাতির এক দেশ। ইংরেজের আগে কোন শাসন ব্যবস্থা ই দার। ভারতবর্ষকে দখলে আনতে পারে নাই। বিস্তৃত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম নিয়েছে বাব বাব। অশোক থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত একই ইতিহাস। কিন্তু দার। ভারতের মানসিকতার ঐক্য ও সাংস্কৃতিক সভ্যতার ঐক্য কখনও ক্ষুদ্র করতে পারে নাই এবং ক্ষুদ্র হয় নাই। ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষকে একীভূত রাজনৈতিক কাঠামোতে পরিণতি করেছে এবং ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে তিব্বত, নেপাল, ভূটান, আফগানিস্তান - ভূতি কয়েকটি দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী অভিভাবক্য করেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন ভাষার বহু ইংরেজ প্রবর্তিত কাঠামোর পরিচরিত হয় নাই। নতুন যুগের প্রয়োজনে এখানে ভাবনে ছে ডাডালি পড়েছে মায়, কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই। স্বাধীনতাভিমানের কারণগুলির উপর সচেতন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। বর্তমান দার। দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বাধীন মহাবীররা শাসন ক্ষমতার ছিলেন কংগ্রেসের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, দার। দেশকে ভারতীয় জাতীয়তা বোধে একত্রে চালাতে পেরেছেন। সেই যুগের অবসানের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তা বোধের সঙ্গে দেখানি আনুচলিক

জাতীয়তাবাদের সংঘাত। এই সংঘাতের সৃষ্টি রাজ্যে রাজ্যে উন্নয়নের বৈষম্য থেকে শিক্ষা বিস্তার, শহরীকরণ, সর্বোপরি রাজনৈতিক চেতনার উন্নতি বিসৃত ভারতে আনুচলিক স্বাধীনতা লাগিয়ে তুলেছে। আন্দোলনের বিষয় আমাদের জাতীয়তাবাদের স্রোত ধারাকে সমুদ্রের মত গ্রহণ করতে পারছে না।

তাই স্রোতধারা দুইদিকে এইবার উৎক্রম হয়েছে। ভারতের মার্কসবাদীরা ও আনুচলিক জাতীয়তাবাদের ক্ষমী আত্মপ্রকাশে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সমাধানের পথ বাতলাতে পারছে না। একক ভাষা ভিত্তিক রাজ্যগঠনের মাধ্যমে আনুচলিক জাতীয়তাবাদের দাবী কংগ্রেস মিটিয়ে দিয়েছিল। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এমন রূপ নিয়েছে আনুচলিক রাজনৈতিক আর্থিক জাতীয়তাবাদে। বর্তমান শাসকবলগুলির তুর্নীয়ে এমন কোন অস্ত্র নেই যা এই নতুন উচ্চাসকে দমন করতে পারে। কেবলমাত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী দার। জনগণের বিক্ষোভের বিপদ লড়াই করে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আনা যায় না। আনুচলিক জাতীয়তাবাদ বর্তমানে ভারত বর্ষের মৌলিক রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রধান বিষয়।

আমাদের এই জাতীয় সঙ্কট সমাধানে। টিটোর যুগোশ্লাভিয়া কেডারেল রিপাবলিক। বহু জাতি অধ্যুষিত এই দেশে আনুচলিকতা, প্রাদেশিকতা ও জাতিবিদ্বেষে গোলমাল ও বিরোধ লাগিয়ে থাকিত। মার্শাল টিটোর সমাজতন্ত্র প্রবর্তনে যুগোশ্লাভিয়া এক জাতীয়তার সংহতি গড়ে উঠল। যুগোশ্লাভিয়ার নিজস্ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কলে পশ্চিমীয়া দেখানে কোন ঘাটি করতে পারে নাই। কমিউনিজমের সঙ্গে দেশজ ঐতিহ্য ও সামাজিক

বস্থা মিলিয়ে যুগোশ্লাভিয়া সমাজতন্ত্রবাদ তীব্রিত। টিটোর মতে প্রত্যেক দেশের সামাজিক বিবেক ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সেই দেশে সমাজতন্ত্রের রোগ পদ্ধতি স্থির করতে হবে।

টিটোর মতবাদ নিয়ে ১৯৪৮ সালে ষ্টালিনের সঙ্গে বিরোধ হয়েছিল। টিটো কমিউনিষ্ট শিবিরে কখন বিতর্কিত ব্যক্তি হয়ে পড়েছিলেন। টিটো যেকার সঙ্গে যোগ দিবে কমিউনিষ্ট মহলে এটা রতর সন্দেহ ছিল, কিন্তু কোন সাম্রাজ্যবাদী ছাড়া টিটো বেগ নেব নাই, সোভিয়েত বিরোধীও বলেন না।

দুইটি রিপাবলিক ও তিনটি অটোনমাস প্রদেশে ফেডারেল রিপাবলিক অব যুগোশ্লাভিয়া কে ক সূত্রে গঠিত। যুগোশ্লাভিয়া বিভিন্ন জাতির কোষ ভিত্তিতে এগিয়ে চলছে। কোন ফাঁটলের কুণ্ড দেখা যায় না। বিশ্বরাজনীতিতে মার্শাল

টিটোর দান জোটনিরপেক্ষতার আদর্শ। টিটোর বিশ্বশান্তি, বিশ্বমৈত্রী, জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি আত্মগতা বিভিন্ন দেশের নিকট উন্নত দৃষ্টান্ত টিটো বিভিন্ন দেশের জাতীয় সমাজ সমাধানের পাথর ও রেখে গেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে চরম সাঙা লড়াইর সময় টিটো, পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর, নেতৃত্বে জোট নিরপেক্ষ আদর্শ সামনে রেখে সদস্যনে এগিয়েছি। ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের উৎস ও উপাদান আমরা টিটোর দেশ হতে পেতে পারি, যা থেকে আমাদের আনন্দলব্ধ জাতীয়তাবাদের বরজোত ভারতীয় জাতিতন্ত্রবাদের সমুদ্রে মিশে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে, বিজিত প্রবণ উজ্জ্বল ও মনস্তা নিপাত হবে।

হাফিজ স্টেটের বায়ু, অস্ত্র, অঙ্গীর্ণ ও স্টেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রসূ

আমলা হুত কুমারী

আমুবেদীয় মাত্রে ভৈরবী

মূল্য ৩.০০ এক মাত্র মাত্র

বৈষ্ণব-মহা

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী



নয়টি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন :

সর্বশেষ দলীয় অবস্থা

রাজ্য	আসন	যোগিত	কং-ই	কং-আ	জনতা-	জনতা-	জনতা-	ভারতীয় সিপি-	সিপি-	অফ্রা	
					জে পি	এস	এস	জনতা	আই	এম	
					চরণ	রাজ					
বিহার	৩২৪	২৮৯*	১৪২	১২	১৩	৩৫	১	১৯	২১	৬	৩
গুজরাট	১৮২	১৮১*	১৪০	—	২২	১	—	৯	—	—	
মধ্যপ্রদেশ	৩১০	৩২০	২৪৬	—	২	১	—	৪০	২	—	
মহারাষ্ট্র	২৮৮	২৮৮	১৮৬	৪৭	১৭	—	—	১৪	২	২	২
ওড়িশা	১৪৭	১৪৪০	১১৬	২	৩	১৩	—	—	৪	—	
পানজাব	১১৭	১১৭	৬০	—	—	—	—	১	৯	৫	২/অকালি ৫
রাজস্থান	২০০	২০০	১০৩	৬	৮	৭	—	৩২	১	১	১
জামিনাডু	২৩৪	২৩৪	৩০	—	২	—	—	—	১০	১১	১৪/ডি এম।
আ.এ ডি এম কে:											
উ: প্রদেশ	৪২৫	৪১৯০	৩০৫	১৩	৪	৫৮	৪	১১	৭	—	১
মোট	২,২৩৭	২,১৯৩	১,৩৭১	৮০	৭১	১১৫	৫	১৪৬	৫৬	২৫	৫

(* স্থানিত : উত্তর প্রদেশে ৪টি, বিহারে ৩টি, ওড়িশায় ২টি এবং গুজরাটে ১টি আসনে)।

দিসু হুলস্থলান লাগা এই আন্দোলনের সন্ধকেই এসেছিল। কিন্তু দাড়াইলো ও উৎসাহ কর-
 ছিলেন। কিন্তু সে দাড়াইল যখন হিংস কথ ভেল না। যোগলা ক্রিস্টিয়ান এই আন্দোলনের অঙ্গ ছিল। তাকে

সহিংস আন্দোলন ছাড়া অস্ত্র কিছু না। গাভীজী আন্দোলন করতে গিয়ে এটিকে একেবারেই লম্বা করে নি। কিন্তু গাভীজী উল্লেখ্য করতে পারলেন না চৌরি চৌরার সাহায্য। এটি ঘটনা, গাভী আন্দোলনে লম্বা হয়ে বড় জটিল ছিল আন্দোলনে যৌথ সাংঘর্ষ না থাকার। সম্পূর্ণ হাটের ভার গাভীজীর উপর অর্পণ হয়েছিল। কোন সমস্যা নিয়েই বিচার বিবেচনা এবং আলোচনার সুযোগ ছিল না। গাভীজী নিজে বৎ বৎপন বুকেছেন সেইজন্যই সমস্যার সমাধান করেছেন। আন্দোলনের প্রথম দিকে মিহিরের জনতাকে এখনও জায়ে পরিচালনা করা উচিত ছিল এখন তা না করে তাড়ের মধ্যে ইচ্ছা-সম্মত স্থির জল ৬ মাসে খরাক ৯ মাসে খরাক বলেই মিহিরের জনতাকে উত্তেজিত করা হয়েছিল। এমন কি গাভীজীর বাংলা কথাটির সঙ্গে বাণীবাদ সম্পর্কিত তাও পরিচাল্য করে ব্যাখ্যা করা হয় নি।

এই সমস্ত কারণেই পুলিশবাবু এই আন্দোলনের প্রতি বিপদ মনোহর অনুসরণ করে ডিলেন আন্দোলনের লক্ষ্যবিন্দু সম্পর্কে তাঁর গভীর সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু পুলিশবাবুর তরুণ সহকর্মীরা গাভী আন্দোলনে এই সমস্ত সোয় জটিল ভেবে চিত্তে বেধেন নি। তাঁরা গাভী আন্দোলনের গণসংগ্রামের দিকটাই বেগেছিলেন তাঁরা দেখেছিলেন গাভী আন্দোলনে সমগ্র দেশ উদ্ভাস হয়ে উঠেছে। সুতরাং এই আন্দোলনের বিরোধিতা করতে গেলে অগ্রশীলন সমিতির অনুভাব নিকট অগ্রসর হবে। তাই পুলিশবাবুর গাভী বিরোধিতা তাঁরা সম্পূর্ণ জা বহুদৈ নিতে পারেন নি। পুলিশবাবুর তরুণ সহকর্মীরা দেখেন নি কিছু দিন আগে সকল জায়ে বহুত আন্দোলন হয়ে গিয়েছে, সে আন্দোলন অদ্বৈত ছিল না তবুও সে আন্দোলনে উদ্ভাসনা কম ছিল না অদ্বৈত্যা বহুতল আন্দোলনের লক্ষ্যবিন্দু বহুত করে হাঁড়ার নি। সরকার পক্ষ থেকে দুসলমান হাকার হ করে সে আন্দোলনেও প্রতিরোধ করাও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁর উপর শুকল আরো না করে গেল পর্বত আন্দোলনকে সাফল্যের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। যা হোক গাভী আন্দোলন সম্পর্কিত চর্চায় এসে অগ্রশীলন সমিতির অগ্রগতির কথা হয়ে গেল। পুলিশবাবুর গাভী বিরোধিতা এত দৃঢ় ছিল যে তিনি তাঁর তরুণ সহকর্মীরা গুলে কিছুতেই একমত হতে পারলেন না যে-ও ভাষন কর্মীদের সঙ্গে বলা-বা-প করে পার হুল গঠন করাও তিনি সম্মত হলে করলেন না। সমিতির কর্ম ভার সম্পূর্ণ জায়ে শুকল কবিদের উপরে যে-ও বিয়ে তিনি নিয়ে হাঁড়ালেন। এর পরে সমিতির নেতৃত্ব তাঁর গুলল তরুণদের মধ্যে অংশকাকত বহুত লম্বা নরেন্দ্র মোহন গনের উপর। কিন্তু তিনি এক বৎসরের অবিকাল সমিতি পরিচালনা করেন নি। অল্প কিছু পরেই হল জাঙ্গ করে তিনি রায়চক বিখ্যাত বোগ বিয়ে লম্বাসী হল। নরেন্দ্র বাবুর পরে মহারাজ বৈদ্যো চন্দ্রবতি, প্রবুল গাঙ্গুলী, কেশবচন্দ্র গেল, জাম বজ্রবাহত, বদেপ আচার্য, এবং রবীন্দ্র মোহন সে-ও লম্বা জায়ে অগ্রশীলন সমিতির নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন, ১৯৪৭ সালে বাণীবাদ পর্বত অগ্রশীলন সমিতিতে এই বৈদ্যো চন্দ্রবতি বর্তমান ছিল।

10 JUN 1980

০/৩৮

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহানীলন সমিতির বিপ্লব গ্রন্থাগার—কলকাতা-৭০০

বিপ্লবী মহানীলন গ্রন্থাগার—কলকাতা-৭০০

কীর্তিকল্পিত পুস্তক—

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ১। বিপ্লবী পুস্তকমালা—৩০০ | ২। বিপ্লবীতে ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা—৩০০ |
| ৩। বিপ্লবী পুস্তকমালা, বিপ্লব—২০০ | ৪। গৌহাটি সংগ্রাম কাহিনী—১০০ |
| ৫। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ | ৬। কলকাতা সংগ্রাম কাহিনী—১০০ |
| ৭। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ | ৮। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ |
| ৯। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ | ১০। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ |
| ১১। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ | ১২। ভারতের বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ |
| ১৩। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ | ১৪। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ |
| ১৫। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ | ১৬। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ |
| ১৭। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ | ১৮। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ |
| ১৯। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ | ২০। বিপ্লবী পুস্তকমালা—১০০ |

প্রাপ্তিস্থান :—১ম বহরত হাস টিট কলিকাতা-৭০০০০

টেলিগ্রাফ—১/১/১/A বিপ্লবী চ্যাপ্টার টিট কলিকাতা-৭০

—সম্পাদক দল—

শ্রীমতী শ্রীমতী (সম্পাদক) শ্রীমতী শ্রীমতী

সম্পাদক—শ্রীমতী শ্রীমতী

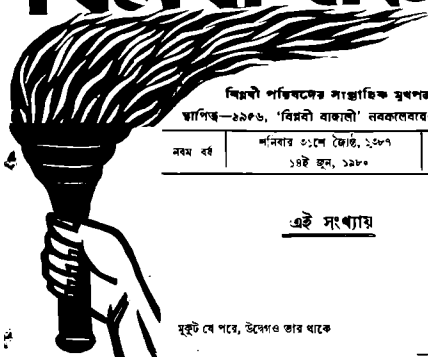
বিপ্লবী পুস্তক প্রতিনিধি—শ্রীমতী শ্রীমতী

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীমতী শ্রীমতী

বিপ্লবী পুস্তক কার্যালয় :—১ম বহরত হাস টিট, কলিকাতা-৭০০০০

১ম বহরত হাস টিট, কলিকাতা-৭০০০০

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পত্রিকার সাপ্তাহিক সংখ্যক
 স্থাপিত—১৯৪৬, 'বিপ্লবী বাংলা' লব্ধকাল—১৯৭১

নবম বর্ষ	শনিবার ৩:৩৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ ১৪ই জুন, ১৯৮০	৫৮ সংখ্যা
----------	--	-----------

এই সংখ্যায়

মুক্তি যে পরে, উদ্বেগ ও তার থাকে

—সম্পাদকীয়

দুর্ভাগ্য কীর্তির নৈশদশা !

—বীরেন্দ্র দে

প্রসঙ্গ : নব্বটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন '৮০

—মল্লিক ঘোষ

অবশ্যরোধে বামীজির মত ও পথই সহায়

—বঙ্গবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

লহীন প্রেম চাকীর অশ্রুতবাহিনীতে আরক ডাকটিকিট হবে কি ?

—জনৈক পাঠক

রাষ্ট্রপুত্র সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা

—অধ্যাপক নসিরুজ্জামান দাশগুপ্ত

রে মোর হৃদয়! বেশ

বাহের করেছ অপমান,

পমান হতে হবে,

ভালের সবার সমান।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—CALCUTTA			
Barman Smt Banaful w/o Late Brojo B. Barman	c/o Bhuban Behari Saha, Bidhan- nagar (Co-operative Colony) +S Santoshpur, Calcutta-66	100	1 10 76
Das Dinesh Chandra	M/200, Madhu Sudan Banerjee Road, Calcutta-49	200	7 74
Das Guru Charan	93, Brahma Samaj Rd. Behala, Calcutta-34	200	8 72
Khatri Smt Sabita Devi & Smt Shyama Devi w/o Late Ram Singh Khatri	7, Diamond Harbour Road, Calcutta-17	100 100	15 2 76 15 2 76
Kumari Sumta d/o Ram Singh Khatri		50	12 76
Tewari Shri Vyas Muni	40/1, Gopalnagar Rd., Cal-27	100	4 78
Dist—24 PARGANAS			
Chakraborty Smt Sadhana w/o Late Ananta (ex-Andaman)	(to be drawn on her behalf by her son Shri Ashim Chakraborty)	100	6 6 79
Mondal Shri Balai Chandra	P. O. & Vill Krishnapara P. S. Rajarhat	200	15 8 72
Sen Shri Amulya Bhuson	P-36, Ramkrishna Pally P. O. Narendrapur	200	3 3 79

(Continued on 3rd cover)

মুকুট যে পরে, উদ্বেগও তার থাকে

গত কয়েক বছর ধরে দেশের প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্নভাবে যে মারাত্মক অস্থিরতার অশনি সংকেত দেখা দিয়েছিল এবং ক্রমাগত অবস্থার অবনতি ঘটে চলেছিল, সেটা অনেকাংশে অবশেষে হয়েছিল বিগত লোকসভার নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) দলের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের কতক কয়েকটি বিশেষপূর্ণ ও জিয়াংগাপূর্ণ দলের হাতে থাকার জন্য স্থিতিশীলতার পূর্ণ বিকাশের পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। এবারকার নব্বটি প্রাদেশিক বিধানসভার একই দলের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভের পর, সবদিকে প্রগতিশীলতার পথে এদিকে চলার পথের কটক দূরীকৃত হল বহুল পরিমাণে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী ও দলের গুরুত্বপূর্ণ দাবির ভাবও স্পষ্ট হয়েছে। কথার বলে *uneasy lies the head that wears a crown* অর্থাৎ রাজ্য মুকুট যে মস্তকে খাপ খাবে, উদ্বেগও মাথার উপরে এসে পড়ে।

এই মাসটি শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের সম্মেলনের পথে বহু বাধা বিঘ্নের মোকাবিলা করতে হবে। সুভাষা তাঁকে “কাত্যাব মরু ছত্রের পায়বান” লজ্জন করতে হবে। কাগুরীকে হুসিয়ার থাকতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত জ্বালান পরিষ্কার করতে হবে। তা সত্ত্বেও পরাজিত, আহত মনগুলির পক্ষ থেকেই বাধার সৃষ্টি করবার সব রকম প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাওয়া হবে। তিন হাজার কোটি টাকার ঋণটি বাজেট নিয়ে তাঁকে নতুন বাজেট তৈরী করতে হবে! আমদানি দ্রব্যে মূল্যবৃদ্ধি হেতু, বিরাট শরচের সম্মুখীন হতে হবে। একত্র হই সরকারকে নতুন কর বসাতে হবে, নতুন বাজেটে ঋণটির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। হাওয়াহরিভাবে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারলে, মুদ্রাস্থিতির চাপ অনেক পরিমাণে কম থাকবে। কিন্তু দারুণ খরচ ফলে অর্থ ব্যয় ও উৎপাদন হ্রাসের জন্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি বন্ধ করা খুব দুঃসাহসী কাজ হবে। এর ফলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ সংকট ও হ্রাস করা সম্ভব হবে কি না, সেটা অর্থনীতিবিদরাই বলতে পারবেন। অথচ এ কাজ না করতে পারলে, জনমানসে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে বাধ্য। আর তার সুযোগ নিতে সচেষ্ট হবে বিশেষ করে তারাই বাদের আমলে দেশটা সর্কানেশের প্রায় অতল ভলে ডুবে থাকি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল আসামের সমস্যা, যার দ্বারা দেশের অর্থগুণ্ডা, ঐক্য, জাতীয়তাবোধ বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে এবং এর প্রতিবিধান না করতে পারলে দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সুখের কথা, কয়েকটি বিরোধী দল, একাজে তাদের সহায়তা ও সমর্থন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। কৃতপূর্ণ জনভাবনের কয়েকটি দল যে নীতি গ্রহণ করছে

সেটা শুধু বিশ্বকর নয়, দেশের পক্ষে রীতিমত বিপদজনক। স্বীজগজীবন বায়, যিনি হলবদলের বিশারদ, প্রেক্ষিত জনসভায় ঘোষণা করেছেন, আমাদের আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ভারতীয় জনতাপল এই আন্দোলনকে নিশা না করে, মীমাংসার জন্য শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হবার প্রতিশ্রুতি দেবার আগেই সৈন্তদল ও তাদের মত মনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করার উপদেশ দিয়েছেন। নিখিল ভারত সর্বোদর সমাজ আমাদের আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ বলে সাটি'কিকেট দিয়েছে, যার ফলে এই দলের দু'কন্দের মধ্যে বিভ্রোহের সংকট দেখা যাচ্ছে। বিদেশীদের সুপরিচিত পত্রিকানাও এর পেছনে কাজ করে চলেছে। সুতরাং দেশী বিদেশী দেশের শত্রুদের সঙ্গে মোকাফিলা করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই কাজ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন কাজ। শ্রীমতী গান্ধী'র বিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, বিশেষত্ব, বিপৎকালে অসীম সাহস ও দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বের অত্যন্ত গুণাবলী আজ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু একাজ ত তাকে করতেই হবে। সে জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। কয়েকটি বিরোধী দলও দেশ প্রেমিক চিন্তাশীল, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও দেশের জনগণ রহস্যম্ভে তার পক্ষে আছে এবং তাদের সহায়তা লাভে তিনি বঞ্চিত হবেন না বলেই আমরা বিশ্বাস করি। তবে তাকে সকলতা অর্জন করতে হবে, শুধু প্রশাসনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে চলবে না। প্রথমেই তাঁর দলের সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে হবে। আগাছা, সুবিধাবাদী, স্বার্থ সীদ্ধ লোকদের বিদায় করতে হবে। বেছে নিতে হবে আদর্শ নিষ্ঠ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক কর্মীদের। দেশের দিকে দিকে তাদের উল্কার মত ছুটে গিয়ে দেশের মানুষকে সংবেদিত, দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। দেশের বর্তমান আবহাওয়া যা লাড়িয়েছে, তাতে সব রাজনৈতিক দলের নেতারা ও কর্মীরা দেশের স্বার্থের কথা না ভেবে নিজেকে স্বার্থ নিয়েই ব্যাতিব্যস্ত। তাদের সকলেরই কাজকর্ম নির্বাচন সর্ব্ব্ব হয়ে লাড়িয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ সূত্র হলেই মুক্তের মধ্যে আহার্য্যম গরাদ্দারদের দলে ভিড়ে পড়ে। গঠনমূলক কাজ এদের কোন আগ্রহ প্রায় নেই বললেই চলে। সবাই মস্ত্রী'র চায় বা ক্ষমতার আসন চায়। কিন্তু মস্ত্রী'দের সংখ্যা ত সীমাবদ্ধ। সকলকে মস্ত্রী'র দিয়ে খুশা করা স্বয়ং শিবিরও অসাধ্য। এসে'র মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দৃষ্টি করতে হবে এবং এই বিরাট দেশের হাজারো সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাতে হবে। এ যেমন দেশের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন, তেমন সরকারী ক্ষমতাসীন দলের কল্যাণের পক্ষেও প্রয়োজন। একাজ করা সম্ভব একমাত্র সংগঠনকে মজবুত ও শক্তিশালী করে। সরকারী নীতি বাস্তবায়নের জন্যও একাজ অপরিহার্য্য। নির্বাচন পর্ব্বও শেষ হলে, এসেছে এখন কাজ করতে না পারলে, দেশের মানুষের আস্থা হারাতেই হবে। বিগত নির্বাচনগুলির কলাকল বিচার করলেও দেখা যাবে যে দেশের মানুষ অত্যাধিক ভোট কাউকে দেয় না। গুণাগুণ তারা বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিচার করে ও ভোট দেয়। এই শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে কাজ করবে না করবে তাদের অনুশীলনও সীমিত হবে। কাজেই ক্ষমতার দু'ট পথে শুধু তৃত্য করলেই হবে না। এর সঙ্গে যে বাস্তবতার এসে পড়ে, তাও সূচু'ভাবে পালন করতে হবে। আমরা প্রত্যাশা করব শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দল এদিক দিয়ে অবহিত হয়ে তাদের কর্মসূচ্য নির্ধারণ করবেন।

অবক্ষয়রোধে স্বামীজির মত ও পথই সহায়

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়



দোল পূর্ণিমার চন্দ্রালোক বিধৌত রাত্রে প্রোক্ত-
 ধিনী কম্বোলিনী ভাগিরথীর পূর্বকূলে 'মা ভব-
 তারিণীর' মন্দির প্রাক্ষণে ভক্তি-গীতি সমাবেশে
 কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের শ্লোকগুলি শ্রবণে
 তান, লয় সহযোগে শিল্পীর স্নমধুর কণ্ঠে বিভিন্ন
 বাস্তবজীবনের সংলাপের সাথে সাথে গীত শ্রবণ - আকাশ,
 বাতাস, জল, স্থল, অন্তরীক্ষে মন্থিত, স্নানিত-
 প্রতিক্রিয়াশীল করে, যেন এক অপূৰ্ব শ্রবণলোকের
 অন্তিমতঃ বাস্তবায়িত করে গুণে ভারাক্রান্ত হস্ততলে
 অমৃতধারার আবেশ মাখান স্পর্শ স্পর্শকালের ক্ষণ
 মাত্রায়কে আবিষ্ট করে উজ্জ্বলকে সঙ্গরমান অবস্থায়
 উপনীত হওয়ার ক্ষণ পরিক্ষেপ স্ফূৰ্ত্ত করে চলে।
 কুলু কুলু নাদিনী গঙ্গাবক্ষে শ্রবণ শ্রবণের রেশ এমন
 মহিমার মধুরতা আবেষ্টনী রচনা করে চলে, যার
 তুলনা নভতলে, মানবমনে ও জায়াধেয়া নদীতট
 শেষে পৌঁছন সত্যই বিরল মনে হয়। সঙ্গীত
 সমাপ্তির পর ভারকল্পক নাম সংকীৰ্ত্তন শুরু হয়,
 স্বামী শিবানন্দ গিতি মহাভাজনের কণ্ঠে 'ও, হরি ও,
 হরি ও' মূল্যবান গভীর স্বরে—ভুলোক, ভুলোক
 প্রাণিত—প্রকম্পিত করে—কি মধুর আবেশ, কি
 মুগ্ধতা, কি স্বংকার, কি অপরূপ শ্রবণ—সমগ্র প্রাণী
 জগতে যেন মূগ্ধ করে প্রাণের নব নব স্পন্দন জেগে
 ওঠে মুগ্ধ বিশ্বব্যপ্ত। কানের ভিতর দিয়ে মরমে সে
 বাণী ও শ্রবণে, আকুল করে মন, স্তব্ধ বিশ্বের

সম্মিলিত হাওয়া প্রায়। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগে যেত-
 প্রান্তর ফলকে উৎকীর্ণ স্বামী বিবেকানন্দের মহান
 আঙ্কন :—'হে ভারত তুলিও না—তোমার নারী-
 জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, তুলিও না
 তোমার উপাখ্যে উমানাথ সর্বভাষাধী শতক ; তুলিও না
 তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়
 সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের ক্ষণ নহে ; তুলিও
 না তুমি জন্ম হইতেই মাঝের ক্ষণ বলি প্রদত্ত :
 তুলিও না—নীচ জাতি মূৰ্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি,
 মেধের তোমার রক্ত, তোমার জাই। হে বীর,
 দাহস অবলম্বন কর, সপক্ষে বল—আমি ভারতবাসী,
 ভারতবাসী আমার জাই। বল—মূৰ্খ ভারতবাসী,
 দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারত-
 বাসী আমার জাই ; তুমিও কটিমাত্র বহাবৃত্ত হইয়া
 সপক্ষে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার জাই,
 ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার
 ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশ্রমণা, আমার
 বোনের উপবন, আমার বর্ষকের বারানসী ;
 বল জাই—ভারতের সত্যিকার আমার স্বামী, ভারতের
 কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, হে
 গৌরীনাথ, হে জগদগুরু, আমার মনুষ্যের দাও ; যা
 আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমার মাদুর
 কর।'

যতই মাদুরের মনে গৌরবোজ্জ্বল অতীত

ভারতের কথা মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় বর্তমান উদ্বাস্গামী ভারতকে স্বামীজির এই শাস্ত বাণী এখনও রক্ষা করতে পারে, যদি আমরা তাঁর কর্মধারা ও জীবনবেগকে মেনে চলি বিশ্বাস ও নির্ভর সূত্রে এবং স্বামীজীর আদর্শবাদের অনুসরণ করি জীবনের চলায় পথে। ভারতীয় নরনারী, ভারতের মৌলিক আদর্শ, ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি, সুস্থ চিন্তাধারা ও ত্যাগবিস্তার জীবনযাত্রা প্রাণালী পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ করে চলেছে এবং পথে পথে তাই আহত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার কুশমভূকে অধঃপতিত হচ্ছে—যার হাত থেকে পত্রিশের পথ তারা খুঁজে পাকে না। জলের জীব জলেই প্রাণশক্তি আহরণ করে, ফলে সে অসামান্য বোধ করে ও পরিণাম তার অপসৃত্য ঘটাই, কারণ সেটাই অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি। ভারতের জীবনধারা ত্যাগবিস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত যখনাভীতকাল হতে, কিন্তু আজ তার জীবনের গতি ভোগবাদকে আশ্রয় করে এগিয়ে যেতে চায়, যে ভোগের শেষ কোনদিনই নেই। ভোগের উত্তর আকাঙ্ক্ষা লাফসার বাস হয়ে, সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য উন্নতির মত সীমাহীন আবেগে সমাজ-সংসার সব কিছু ভেঙ্গে কেলে চলেছে আত্ম সুখের আশায়, বর্ষোচিত কিম্বদন্তি—যার ফল প্রতি ক্ষেত্রেই বিবমর হতে দেখা যাচ্ছে। উপনিষদ মরণ করিয়ে দেয় :—‘তেন ভাভেন কুজিবাঃ’—অর্থাৎ তুমি ত্যাগের দ্বারা তোস কর, আর ভারতীয় জীবনদর্শন তাই, কিন্তু অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের জীবনদর্শন হলো—‘বাড, লও, ফুটি কর। ইট, ড্রিক, এ্যাণ্ড বি মেরি’। পুণ্যভূমি ভারত ভোগের চিন্তা অতীতে কখনও করেনি, ভারতীয় মুনি-কবিরা ত্যাগের মাধ্যমেই জীবনযাপন করে গেছেন। তাঁরা সাধা

বিষকে খীর লব্ধ জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের দেরা সম্পদ দিয়ে গেছেন। সেই ভাগী মহান পুরুষ ও মহির্ময়ী নারীদের জ্ঞানলব্ধ শাস্ত বাণী ও উপদেশাকী কতখানি মানব কল্যাণে আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি? আমরা নিজেদের ভুলে, লোভ ও অনুকরণের বশবর্তী হয়ে নিজেকে অতীত বৈশিষ্ট্য, আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভুলে বিশৃঙ্খল হয়ে পথহারা মত বৃথা আপেক্ষিক সুখের আশায় ঘুরে মরিহ পাশ্চাত্যের অনুকরণে অথবা মত্ত হয়ে। ত্যাগ ব্রত ছেড়ে ভোগের মোহে আসক্ত হয়ে নাশের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি এই। যে বেজোয় অজ্ঞানভাবত: সর্ধনাশের পথে আমরা বেয়ে চলেছি, এর হাত থেকে বাঁচার উপায় কি? অমায়ুষ থেকে মায়ুষ হবার পথ কি? কেমনভাবে তা সম্ভব হবে? স্বামী বিবেকানন্দই তাঁর কর্মধারা ও জীবনবেদের মাধ্যমে ভারতকে সেই নিরাপদ পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। ভারতীয়রা স্বামীজিকে ত্যাগ করে, যদি কার্ল মার্কস বা অন্য কোনও পাশ্চাত্যের মহা মনীষির পথ অনুসরণ করে, তবে বাঁচার পথ ভারত কোন কালেই খুঁজে পাবে না। জলের জীব আমরা ডাক্তার উঠে বাঁচবো কি? মানবতাকে বিসর্জন দিয়ে, মনুষ্যকে তুচ্ছ করে, সঠিক পথে চলা সম্ভব হবে কি? জাতীয়তাবাদকে জলাজলি দিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদ আকড়ে ধরে বাঁচতে পারবো কি? না তা কখনই নয়, কারণ স্বাভাবিকতা পরিহার করে অস্বাভাবিক কিছু করলে কল্যাণ পাওয়া সম্ভব তো নয়ই, বরং কতির আশংকাই বেশী।

স্বাধীনোত্তর ভারতে আজ সংহতির অভাব সম্বন্ধে বেশী প্রকট, অথচ সংহতি হাল্কা বেশকণী কঠিন হয়ে পড়ে। অতীতে সংহতির অভাবেই

সমাজকে স্বদেশীদের পলানত হতে হয় বাতে বাবে, আর ইতিহাস অন্ততঃ সেই কথাই গ্রহণ করিয়ে দেয়।

সংগতি ছাড়া একজাতি, একপ্রাণ ও একতা স্বপ্নের টিকে থাকে কি ভাবে? আমরা ভারত-কর্মী, ভারতের লাভ-ক্ষতি ও ভালমন্দ সব কিছুই সমাজবানী তাই। ভারতীয় আর রাজ্যের সকল কর্মকাণ্ডই আমাদের ভাই, আমাদের রক্ত—এই মন্ত্রের আভি আর দেখা থাকে কি? নীচ হোক উচ্চ হোক সবাই আমরা সমান—সেই চেতনার অর্থই দেখা যায় কেন? স্বাভাবিকভাবে আমাদের কর্মের পথে নিয়ে : বাবে না কি? ভুক্ত আমরা স্বাধীন হতে পেরেছি? ভারতীয় সংগতির মূল মন্ত্র যে একাত্মবোধ তা অন্তর্হিত প্রায় কেন? ভারতবাসীর এই পতন সত্যই মর্ম বিদারক। এর হাত থেকে উদ্ধারের উপায় কি? উপায় একটাই—একতা হচ্ছে বিবেকানন্দের মন্ত কর্মবোগী, স্বদেশ

শ্রেমিক—স্বাধীনতার পুনরাবির্ভাব যদি বাস্তবে সম্ভব হয় তবেই, নচেৎ কোন আশার আলোক এখনও পরিলক্ষ্যমান নয়। স্বাধীনতার আবির্ভাব কামনার ঈশ্বরের কাছে কামনানোবাক্যে প্রার্থনা জানাই নতজানু হয়ে অনুকূল, আর যতদিন না সম্ভব হয় তাঁর আবির্ভাব, ততদিন ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সন্তোষ ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে তাঁর বাণী, আদর্শ ও নির্দেশগুলি অনুসরণ করে যেন চলি জীবনের চলার পথে। স্বাধীনতা। তোমার অজ্ঞান আত্ম সর্বাধিক অনুভূত হচ্ছে, তোমার যে আত্ম সারা ভারত কাতর কণ্ঠে আন্তরিকতার সাথে প্রার্থনা জানাচ্ছে—তুমি এই ধূলায় আবার নেমে এস, ভারতীয়দের জীবনকে, মানসিকতাকে ও আত্মাকে পবিত্র ও ত্যাগব্রতী কর, বশ কর এ পৃথিবী ভারতকে, আর রক্ষা কর ভারতের বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে। তোমার আবির্ভাব বখাসময়ে সম্ভব হোক, গীতার বাণীকে সকল করতে এই প্রার্থনাই আজ কেবল।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

শহীদ প্রফুল্ল চাকীর জন্ম-শতবার্ষিকীতে

স্মারক ডাকটিকিট হবে কি ?

—বিপ্লবী বাংলার ঈশনিক পাঠক

বারীপ্রফুল্লের ঘোবের নেতৃত্বে মানিকতলা বাগানবাড়ী কেন্দ্র করে বাংলায় বৈপ্লবিক প্রয়াসের শেষ চেষ্টা মোজাকরপুরে সেশন জজ কিংসফোর্ডকে ১৯০৮ সালে ৩০ এপ্রিল হত্যার চেষ্টায় বোম্বা নিক্ষেপ। এই প্রচেষ্টার নায়কদের প্রফুল্ল কুমার চাকী ও স্কুদিরাম বসু। প্রফুল্ল কুমার চাকীর জন্মস্থান বগুড়া (বর্তমানে বাংলা দেশ) জন্ম ১৮৮০ সালে ১০ই ডিসেম্বর। পিতা রাজনারায়ণ চাকী। স্কুল হতেই চলে এলেন বিপ্লবীদের সংস্পর্শে। লাট হত্যার দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় চন্দ্রনগর ও মানিকুণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে বোমা স্থাপন কারীদের মধ্যে প্রফুল্ল চাকী একজন ছিলেন।

সকাল যুগান্তর বন্দেমাতম্ সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে মামলার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সরকারের পক্ষে রায় দিয়ে কুখ্যাত হন। বন্দেমাতম পত্রিকার মামলার রায়ে জানার জন্য আদালতের সামনে জন জমায়েত হয়। এই জন সমুদ্রের উপর ইংরেজ সারজেন্ট অত্যাচার শুরু করে, প্রতিশোধ নেয় শ্রীহট্ট বালিয়াচও, নিবাসী কলিকাতা জাতীয় বিজ্ঞালয়ের ১৫ (পনের) বৎসর বয়স ছাত্র শ্রীশীল কুমার সেনগুপ্ত। জনসমুদ্রের সমুখেই শ্রীশীল সেনের বৈরাগ্যভেদ-দণ্ডদেশ হয়। জনতা বিক্ষোভে কেটে পড়ে। এই শ্রীশীল সেনই পুলিশ ইনসপেক্টর সুরেশ মুখার্জির হত্যায় অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯১৫ সালের ২রা মে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে আত্মোৎসর্গ করতেন।

জনতার বিক্ষোভ লক্ষ্য করে এবং অত্যাচারীদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীশীলসেনের নেতৃত্বে শ্রীঅরবিন্দ, সুবোধ মল্লিক ও চারুচরণ সমিতির বৈঠকে কিংসফোর্ডকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দণ্ডদেশ কার্যে পরিণত করার জন্য বড় পুস্তকের মধ্যে সুকৌশলে বোমা স্থাপন করে, প্যাক করে বিপ্লবী পরেশ নৌলিক পুস্তকটী কিংসফোর্ড সাহেবের বাসস্থান পারদর্শীরা হাতে দিয়ে আসেন। খবর হল এমন ছিল প্যাক খোলার সময় যেটুকু চাপ পড়বে তাতেই বোমা বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু আরদালী বইখানা সাহেবের হাতে না দিয়ে আলমারীতে রেখে দেওয়ার কিংসফোর্ড সাহেব বন্ধা পেয়ে গেলেন।

কিংসফোর্ডের উপর জনকোভ লক্ষ্য করে কিংসফোর্ডকে মজুরপুত্রে সেসন জজ করে বদলী করা হয়। স্থির হল যেদিনীপুরের স্কুদিরাম বসু ও বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী মজুরপুত্রেই কিংসফোর্ডকে হত্যা করবে। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসের শেষে এই দুই বিপ্লবী মজুরপুত্রে বাহাতে। এঠেটের ধর্মশালায় উঠেন। দুইজনই দুজনের নিকট অপরিচিত। প্রফুল্ল চাকীর নাম দীনেশ চন্দ্র রায় এবং স্কুদিরাম বসুর নাম দুর্গাদাস সেন। বিপ্লবী মন্ত্রগুণি বন্ধা করে উভয়ে ছিল মিশে সাময়িক কাল বৈদ্যবর ও

পর্যবেক্ষণের পর ৩০ এপ্রিল রাজিতে উভয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং কিংসফোর্ডকে ঘোড়ার গাড়ীতে বাসায় ফিরার পথে গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করেন, গাড়ী জ্বল হওয়ার মিসেস কেনেডি ও তারার কন্যা নিহত হন, কিংসফোর্ড এখারও রক্ষা পান।

এ দিনই মোকামা ট্রেনে প্রফুল্ল চাকীকে পুলিশ ধরাও করে, পুলিশ বাহু ভেদ করা সম্ভব নয় কিংবদন্তীর প্রফুল্লচাকী নিজের শিশুল দিয়ে আত্মরক্ষা করে। ১লা মে মুদিরাম ওয়াইলী ট্রেনে গ্রেপ্তার হন। বিচারে মুদিরামের ফাঁসি হয়।

মুদিরাম ও প্রফুল্লচাকী ভারতের বাহীনতা সংগ্রাম বিপ্লবী বাংলার প্রথম নহীদ। অতচ প্রফুল্ল চাকী একটা বিশুদ্ধ নাম। তার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে এমন কোন কিছুই করা হয় নাই। এই বংসর প্রফুল্ল চাকীর অন্য শত বাহিনী। তার মৃত্যুতে এই বংসর শত্রু ডাক চিকিট প্রকাশ করে প্রফুল্লচাকীর আত্মত্যাগ ও বৈপ্লবিক তিতিক্য দুবকলের নিকট জুলে ধরলে দেশ অগ্রগতির পথে এগুতে সহায়ক হবে। বিপ্লবী পরিষদ এই বিষয়ে সক্রিয় হয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বাহিনী হবে।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

অমূল্য নলের প্রবীণ বিপ্লবী দক্ষিণাচলন মিত্র মজুমদার গত ৮ই জুন ১০ রিভাড়া সেবাসননে দীর্ঘ রোগভোগের পর মরণোত্তর লোকে যাত্রা করলেন। আজীবন সংগ্রামী এই বিপ্লব জাপস ছিলেন সমালোচনী, বজ্রবংসল ও নিরহংকারী। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অমূল্য নলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে দক্ষিণাচলন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ত্রিটীয় রাজশক্তি তাঁকে অসংখ্যবার কারারুদ্ধ করে। আমরা এই সংগ্রামী আবার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধন করি ও তাঁর আত্মীয় পরিজনকে আমাদের গভীর সহানুভূতি জানাই।

with
the
compliments
of

‘আমার কাছে দেশভক্তিও বা মানবিকতাও শুই ।

আমি স্বপ্নে মানুষ এবং মানবদয়নী বলিষাই দেশভক্ত ।’

—মহাত্মা গান্ধী ।

A

WELL

WISHER

দুর্জয় কীর্তির দৈবদশা !

—বীরেন দে

“ Sleep on, Baby, sleep on—

Terrorists are coming !”

কেহাসেবক বাহিনী সন্নিবিষ্ট বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী যুব গোষ্ঠীর দাপটে এদেশে ত্রিশ দশকের আতঙ্কিত ইংরেজ জননীরা ‘বর্গী এল দেশে’র জ্ঞান ঘুমপাড়ানী ছড়া তৈরি করে তাঁদের শিশুদের ঘুম-পাড়ানো কল্পিতকণ্ঠে উক্ত কথাগুলি বলতেন। বোধ হয় চারপাশ কবি মুহূনলাসের বাণী সেদিন মিথ্যে হয়নি—‘আসিছে নাশিরা জাহের দণ্ড রক্ত, দীপ্ত মৃত্তিমান।’

১৮৯৭ সালে আলমোড়ার স্বাধীনতা ভারতের পরাধীনতা মোচন বিষয়ে মহাআ। অধিনী কুমার দত্তকে বলেছিলেন বাঙ্গালী যুবকদের হাড় থেকেই তৈরী হবে সে বহু, যা ভারতের দাসত্বকে চূর্ণ করবে। তিনি কল্লনাগ্রিহ ভাবুক বাঙ্গালী যুবকদের উদ্দেশ্যে একথাও বলেছিলেন—আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকদের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ পাইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

আচার্য ত্রীমদ্বামী প্রনবানন্দ মহারাজ (জন্ম: ১৮৯৬) স্বয়ং বিশদশকের বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন এবং বলতেন: বিপ্লবী যুবকরা ছিল এক একটি দেবশিশু।

অজ্ঞ ভারতীয় সমস্ত সাময়িক অভ্যুত্থান ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের অশ্রুতম মহান অধিনায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাবা যতীন জন্মশতাব্দিকীর পবিত্র পুত্রি বর্ষে মনে পড়ছে, অধ্যায়বাসে দীক্ষালাভ করেও তিনি জন্মভূমির স্বাধীনতার ক্ষুদ্রই সংগঠন ও সংগ্রামে কৃতদ্যক হন এবং পরাধীন ভারতের প্রথম বিদ্রোহী সন্তানরূপে বালেশ্বরের কপ্তিপদার সম্মুখসমরে বীরবাহু বীরচূড়ামণিরূপে আত্মহত্যা দেবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য ও সাথী সেই বৃদ্ধে শহিদ চিত্তপ্রিয় একদিন যতীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: দাদা দেশের কাজে কী ভগবানকে পাও ? যতীন্দ্রনাথ দৃঢ়বরে জবাব দিয়েছিলেন: তা যদি না পেতাম তবে আমি অন্তত: এ পথে আসতাম না ! — মহাভারতে ত্রীমদ্বাদশীতার রাজবর্নের এই নিষ্ঠাবান সাধক বিরাচিত জ্ঞানবর্ধের ‘কর্মজ্যোতির্কারন্তে মা ফলেষু কদাচন’এর যথার্থ আচরণকারী মৃত্তিলাভ করে অবিস্মরণীয় হোষে রয়েছেন—বিষবাসীর কাছে।

মনে পড়ছে, ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল নবাবগঞ্জীতে কেন্দ্রীয় সভাপুর্বে মৃত্তিমান ‘জাহের দণ্ড’ নেমে আসার দৃশ্য। সেদিন ছিল ‘হাউজ্ ফুল !’ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, সরকারী আমলা, কর্মচারী, প্রেস রিপোর্টার, গ্যালারীর দর্শক, যার যার স্থানে উপবিষ্ট। ডি, আই, পি-র আসনে সমাসীন

বিশিষ্ট অভিজ্ঞ স্কাব্‌ জন সাইমন সাহেব। 'সাধারণ নিরাপত্তা বিল' (Public Safety Bill) সে দিন বিধিবদ্ধ করে ভারতের জাতীয় ভাবগারা এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির উপর চরম আঘাত হানবেন। আয়েব-গিরির মুখে পাথর চাপা লেবেন। হঠাৎ আন্তর্য্যাক উঠলো 'ক্রম্ ক্রম্।' পরপর হুটি বোমা বিস্ফোরণ হোলো! সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জ উঠলো বিভলভার! সমস্তরা তাঁদের আসন ছেড়ে যে বেসিকে পারেন প্রাণ নিয়ে ছুটো পালাচ্ছেন। কিন্তু কেহ আহত বা কারো মৃত্যু হোলোনা। কাজিক লক্ষ্য করে বোমা বা বিভলভার ছোড়া হয়নি। দর্শক গ্যালারী থেকে এগিয়ে এলেন হুটি বিপ্লবী যুবা—পাঞ্জাবের বীর সন্তান ২২ বৎসরের সর্দার ভকৎ সিং আর তাঁরই সমবয়সী বাঙ্গালী যুবক কটেকেশ্বর দত্ত। পালাবার কোন চেষ্টাই করলেন না তাঁরা। ধীরে, শুষ্টে, নিরুদ্ভিন্ন চিত্তে তাঁদের বক্তব্যের ইস্তাহার বিলি করে চললেন। যেন তাঁরাই ভারতের যথার্থ প্রতিনিধি। একবারের জন্য অন্ততঃ ভারতের উচ্চতম সভাগৃহে বিস্তৃত ভারতের প্রতিনিধিদের প্রতিফলন ঘটলো।

—মার্জিনেটের সামনে তাঁরা বললেন..... যে আদর্শের জন্য লোকে চতুর্ভাবণ করে তাকে খুঁচে ফেলা বা নিশ্চিহ্ন করা যাবনা। যে দেশের লোক মানুষের শক্তির জন্য মরতে প্রস্তুত তার স্বাস নেই। সে অমর অক্ষয়। শহিদ হোয়ে জীবন উৎসর্গ করা মহত্তি কর্ম। কিন্তু তা হচ্ছে বিরাট ইমারতের সিংহদ্বারে একবৎ হীরকমাত্র ইমারত আসলে হচ্ছে বনিবাদ গড়ার শিলাকণ্ড বা না থাকলে ইমারত তৈরী হয়না।

ক'মীর পূর্বে থেকে দীনেশ গুপ্ত ১৯১১ সালে ছুটি চিঠিতে লিখেছিলেন '..... আমরা এক একজন পৃথিবীর স্বত্বকে পার্ট করিতে আসিয়াছি। পার্টশের হইলে প্রয়োজন সুরাইয়া বাইবে।'বাক্যে তিনি কাজের ভাষা দেন, সে ভার বহন করিবার শক্তিও তাকে অঘাচিত ভাবেই দান করেন। নইলে সাধা কি তার যে, সে গুরুভার একমুহুর্তও বহন করে : —ইহাতো গীতারই কথা..... 'নিমিত্তনাত্ত ভব দ্বাদ্যচিহ্ন'।

শ্রদ্ধাৰ্হ অধর্শতাকী কালবাপী পরাধীনতা বিমোচনে বৈপ্লবিক সংগ্রামে বা বৈরচ্যরী প্রশাসকদের চরম দণ্ডবিধানে যশ গ্রহণ করে শহিদ হবার দৌরব অর্জন করেছেন বহু নেতা ও কর্মী। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ও নানা রাজ্যের অধিবাসী। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণী থেকে তাঁরা এসেছিলেন। সবাই এক মাথে, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হোয়ে, শক্তিশুদ্ধের সৈনিক হোয়েছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন সোদনকারী বিদেশী শাসনের অপমৃতি ও স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ভারতবাসীর নিজের হাতে নিজেদের ভাগ্য গড়ার ক্ষমতা। এই যে চাওয়া-পাওয়ার শক্তি অর্জন করা তা সামান্য কথা নয়। সামান্য নয় বলেই ১৯৩৪ সালে জাণানীর মিউনিকে শ্রুতবচস্রকে শৌর্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার প্রাক্কালে হিটলারের বেতান্ত-ভাষণে ব্রিটিশের ভারতশাসনের স্বাধাতির জবাবে অমুর্চান বাঙালি করে বলতে পেরেছিলেন: Hitler is at liberty to lick British boots' অর্থাৎ হিটলার ব্রিটিশের জুতো চাটতে পারে, তার বেওয়া কোন বকম সংবর্ধনা গ্রহণ করতে আমি রাজি নই। জবাব শুনে বিশ্বরে স্তম্ভ হোয়ে গিয়েছিল গোটা ইউরোপ। জাণানীর ভাষণবিধাতা মহামহিম হিটলার সম্বন্ধে এমন উক্তি করার মত ক্ষমাসহ যে পৃথিবীতে কারো থাকতে পারে, সে কথা তাদের স্বাধেরও অসোচর ছিল। অবশ্য

প্রসংগ : নয়টি রাজ্যের নির্বাচন '৮০

॥ মলয় ঘোষ ॥

ভারতবর্ষের নয়টি রাজ্যের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে শুধুমাত্র তামিলনাড়ু ছাড়া অল্পসব কটি প্রদেশে ইন্দিরা কংগ্রেস দলের বিপুল সাফল্য এই দল ও পলীট নেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সামনে এক নতুন সম্মানের সিংহকে উদ্বোধিত করে দিয়েছে। দেশকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার, তার অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে হ্রাস ও শক্তিশালী করার ও মূলতঃ অসহায় জন শ্রেণীর আশা আকাংক্ষাকে বাস্তবায়িত করার যে সুবর্ণ সুযোগ তাঁরা অতঃপর এই নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জন করেছেন তার মর্যাদা মূল্যায়নে শুধু যে দেশই শক্তিশালী হবে তাই নয় শাসকদলরূপে ইন্দিরা কংগ্রেস, যাকে অতঃপর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বলাই শ্রেয়ঃ, তার লক্ষ্যপূরণের মর্যাদা শিগ্ধরূপে পাবে ও সংগঠনকেও অধিকতর সংহত করে তুলতে পারবে। চলতি বছরের জানুয়ারীতে যার সূচনা—মে-জুনে তার উত্তরণ পূর্ণতার অভিমুখে, হৃৎকোষে এবছরের মধ্যেই তার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ৮০-র বিধানসভা নির্বাচনে যে দলগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস দল ছাড়া অস্তিত্ব অধিকাংশ দলেরই কোন সুসংহত সংগঠন ছিলনা দৃষ্টান্তে। মাত্র একবছর আগেও যে জনতা দল কেন্দ্রে শাসনক্ষমতায় ছিল ত্রিধাবিকল্প হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি, চল সিং-এর গোষ্ঠী এবং

রাজ্যসভার সদস্য (এস) রূপে তারা নির্বাচনী আসরে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ মানুষের আশা আকাংক্ষার ভিত্তিতে এঁদের নির্বাচনী অভিযান পরিচালিত হয়নি—বরং পারম্পরিক দোষাত্মক ও হিতাহিতবোধেই এঁরা সময় ও শ্রম ব্যয় করেছিলেন সর্বাধিক যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে জনসংঘ-প্রভাবিত ভারতীয় জনতা দল ছাড়া অপর দল ছটির অস্তিত্বই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। বামপন্থীদের মধ্যে একমাত্র ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি এঁদের সর্বভারতীয় সংগঠনের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশে কিছু কিছু আসন সংগ্রহ করেন—তামিলনাড়ুতে এই দল ও সি, পি, এম প্রমুখ তরুণকর্তি আঞ্চলিক দল মোটামুটি সাফল্য লাভ করে।

কিছু রাজনৈতিক পার্থক্যের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর দলের এই সাফল্য ব্যতীত না নিজেদের জনপ্রিয়তার কারণে তদপেক্ষা বেশী বিরোধী দলগুলির পারম্পর্যিক অবিশ্বাস ও রেবারেবীর ফলেই অজিত! বিরোধী দলগুলি যদি একত্রিত হয়ে শ্রীমতী গান্ধীর দলের বিরুদ্ধে প্রতিটি কেন্দ্রে একক প্রার্থী দাখল করতে পারতো, তাহলে নির্বাচনের এই ফলাফল হতোনা বলে তাঁরা মনে করেন। এঁদের মধ্যে কিছু দিক চিন্তা করার আছে। প্রথমতঃ লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের পরেও ইন্দিরা কংগ্রেস দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মীবৃন্দের মধ্যে যে প্রচণ্ড অসন্তোষ—বা মূলতঃ ক্ষমতাসিক্ত

থেকে উদ্ধৃত—বিদ্রোহী কমেই বরং যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল বলা যায়। অবিকালে রাজ্যে এই কলহ, বিংস ও কমতালারের দল উদ্রোহী আকাংক্ষার আভাস দেখা গেছে এই দলের সঙ্গতদের মধ্যে। এমনকি বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে থেকেই কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তাই নিয়ে দিল্লীতে ক্রমাগতঃ দরবার ও উমদারী নির্বাচন অভিযান চলছে। এমনভাবেই, এই ভাড়া-চোরা সংগঠন নিয়ে, কমতালারী, অপদার্থ পোলিটিকালে প্রাথমিক নেতাদের নিয়ে, আসাম মণিপুর ও দেশের অন্যান্য স্থানে ক্রমাগতঃ সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিয়ে, পূর্বতন সরকারের কঠোর আওতা হাচের বকম সমস্তা নিয়েও যে কেন্দ্রে শাসনাধীন এই দল এতো বেশী সফল আসন পেয়েছে তার প্রধান কারণ—দলনেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর উপর দেশের আপামর জনসাধারণের অশেষ হস্তা ও আস্থা; সেইসব অগণিত মানুষ—যারা বেতে পায়না কিন্তু দেশকে ভালবাসে, কমতা চায় না। কিন্তু বাঁচতে চায়, তাদেরই অল্প আশীর্বাদে শ্রীমতী গান্ধীর দল নয়টির মধ্যে আটটি রাজ্যেই বিপুল গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দলের যুগান্তিক হতেই মনে করুন, তাইবাই জিতিয়েছেন দলকে এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা যতাই মনে করুন বিরোধীদের এককটা না হতে পারাই ইন্দিরার সাক্ষরার মূলে—দল সভ্য কিন্তু নিহিত সাধারণ দেশবাসীর চিন্তায়; তাদের মননে শ্রীমতী গান্ধীর ইমেজ দেশের অবিসংবাদিত নেত্রীরূপে, যাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে তিনি এবং একমাত্র তিনিই পারেন দেশকে অধঃপতনের অতকার থেকে আবার আলা আরা আশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে—এবং এরই ফলশ্রুতি এই বিপুল জয়।

তৃতীয়তঃ, জনতাদলের অস্তিত্ব ও পরম্পরের দিকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি কোনো নতুন ঘটনা নয়।

কোন বৃহত্তর কারণে এককটা হতে পারেনা—এসভাও বিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। যারা কমতা হাতে পেয়েও—অন্ততঃ সেই কমতা কলার প্রয়োজনেও মিলেমিশে থাকতে পারেনি, তারা যে জীমতি গান্ধীকে ক্রমাগত একত্রিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে একথা তাইবাই মূর্খের ঘর্ষে বাস করার সামিল। সর্বভারতীয় বিরোধী এই দলগুলির প্রত্যেকেই নিজস্বের কমতা সম্পর্কে 'এভার এটিমেট করে চলেছিল এবং সেই কারণেই পারস্পরিক বোকাপড়ার প্রতি বিদ্রোহী অগ্রহ দেখাননি।

তৃতীয়তঃ, বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নামে যে তৃতীয় বিকল্প শক্তির কথা বলা হয়েছে, যা কিনা শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে লজ্জা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে—তা বস্তুতঃ বর্তমানে কোন সুসংযত আকার নিতে পেরেছে বলে মনে হয়না। কাল ইমানো-কালের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অস্তিত্ব হওয়ার মতো দলগুলির কোনটিই পরম্পরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে পারেনা—বরং এদের কোন একটি শক্তিশালী হয়ে উঠলেই অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর দলটিকে গিলে বাওয়ার দল উদ্রোহী হয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে ব্যবহারী সমঝোতা বাধ ভেসে, অত্যন্ত অসম্মানজনক চূর্বলতর দলটিকে মিলে থাকতে হয়। সকল দলের কর্তৃত্বাধীন ফ্রন্টে। এই অসম ব্যবস্থার আর যাই হোক, বস্তুতঃ একটি সুস্থ বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে উঠতে পারেনা যা কিনা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দলের বিকল্প হিসাবে খাড়াতে পারে।

ভাষ্যকারী লোকসভা নির্বাচনের পর জুনের বিধানসভা নির্বাচন—অন্তর্ভুক্তকালীন এই পাঁচ

ভাবিয়েছে অনেক। তিনি দেখেছেন, প্রশাসনের
রক্তে রক্তে অশুভ ও বিপজ্জনক শক্তি কিভাবে তার
জাল বিছিয়েছে ও দেশের শির ও বাণিজ্যক্ষেত্রে
মুষ্টিমের মানুষ কিভাবে অগণিত জনসাধারণের নিত্য
প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে হিনিমিনি খেলছে।
বৈদেশিক চক্রান্তে সামিল হয়ে কেমন করে
এদেশেরই কিছু মানুষ দেশটাকে টুকরো টুকরো
করতে চাইছে; বিশৃংখলা, নীতিহীনতা, খেজাচার
আর নিরক্ষর দলখাণ্ডী কিভাবে দেশের সমগ্র জন-
জীবনকে আতঙ্কিত ও বিপজ্জনক করে তুলছে।
এসব জেনেও কোন সাহসিক পদক্ষেপ নেওয়া তাঁর
পক্ষে সম্ভব হয়নি—যেমন তিনি নিয়েছিলেন চক্রবর্তী
অবস্থা জারীর মাধ্যমে—যখন ঠিক এই একই
উপায়ে মানুষের অভাব আর দারিদ্র্যকে মূলধন করে
দেশের প্রশাসন আর সংহতিতে চুরমার করে
দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল। তিনি অপেক্ষা কর-
ছিলেন বিধানসভা নির্বাচনের তার আনার—তিনি
প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁর প্রতি দেশবাসীর আস্থা
ও বিশ্বাসকে আঘাত একবার ঘাটাই করে নেওয়ার।
একজন প্রকৃত গণতন্ত্রী মতোই শ্রীমতী ইন্দিরা
চেষ্টাছিলেন লোকসভা নির্বাচনের ব্যবস্থাপনার জন্যে
জনে আরো একবার আত্মল দিয়ে দেখিয়ে দিন
তীব্র নেত্রী কে, কাকে বা কোন দলের উপর তাঁরা
নিজেকে দাবি দিতে চান!

নির্বাচন নয়টি রাঙ্কো হয়েছে, আঘাত করেকটি
অনুর ভবিষ্যতে হবে। দেশের বৃহত্তর জন-সমাজ
তাঁদের বন্ধন জানিয়েছেন বালটের মাধ্যমে।
এমন ইন্দিরার সামনে অনেক কাজ, অনেক দাবি।
একটা পিছিয়ে পড়া দেশকে আবার গড়ে
তুলতে হবে, পুনর্গঠিত করতে হবে তার ভেঙে যাওয়া
অর্থনৈতিক কাঠামোকে। এর জন্য প্রয়োজন
অদম্য মনোবল, দেশপ্রেম আর শক্তিশালী
সাধারণের। প্রথম চর্চির অভাব শ্রীমতী গান্ধীর

নেই—অভাব আছে সংগঠনের। ভারতের দরিদ্র
জনসাধারণ তাঁর পেছনে অগ্গেমন কিন্তু তাঁদের স্বদেশবৎ
ও দাবিব্যবসেচন ক'রে হেলার জল্প প্রযোজন
একনিষ্ঠ ও নিঃশব্দ কর্মীর। দৃশ্যমাজ তাঁর দলের
মেরুদণ্ড—এরা জঙ্গ করতে পারে আবার নতুন
সৃষ্টির বাত্য়কটিও এদের হাতেই। হাজার হাজার
যুবক, তরুণ, ছাত্র—যারা জনতা বাঙালির বড়ো
সংকুল দিনগুলিতেও দল চাডেননি, অত্যাচারিত
হয়েছেন, ভেসে গেছেন—সব মিছিলে গিয়ে নিয়ে
গেছেন দলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, তাঁদের সৃষ্টিও
নিয়ন্ত্রণ পথে পরিচালিত করতে প্রতিটি রাঙ্কো
চাই বলিষ্ঠ ও প্রমাণিত নেতৃত্ব। শ্রীমতী গান্ধী
দলের নেত্রী—কিন্তু বলিষ্ঠ বাহুতে যারা তাঁকে তুলে
ধরে রেখেছে সেই আপামর জনসাধারণকে দলীয়
সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদে সচেতন করে
তুলতে হবে : অনেক প্রয়োজন, প্রতিশ্রুতি আর
মিথ্যা উদ্ভাসনার মোহ থেকে মুক্ত করতে হবে।
তবেই দেশ গড়ে উঠবে, জাতি উঠবে জেগে।
গোষ্ঠিবদ্ধ নয়, ক্ষমতাপ্রিয়তা নয়—মানুষের কাছে
যেতে হবে—পল্লী-ভিত্তিক ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে
সাধারণ মানুষের জোরগার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে
অসত্যের বিরুদ্ধে, অজ্ঞাঘের বিরুদ্ধে, গণহত্যা
গণতন্ত্র হত্যার অসোব চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

শ্রমজীবী মানুষের যুগের অগ্র যোগাতে তার
বলিষ্ঠ ছুই হাতে কাজ তুলে দিতে মানুষের খাল বস্ত্র
ও আশ্রয়ের মৌলিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে
গ্রামীন অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ও সেইসাথে নাগরিক
জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। দলকে গড়ে
তুলতে হবে মানুষের জন্য—মানুষকে সঙ্গে নিতে হবে
দলের জন্য। তবেই সংগঠন বাঁচবে—দেশও বাঁচবে।

বে আশা আকাংখা আর স্বপ্ন নিয়ে ভারতবর্ষের
মানুষ আশীর দশককে নতুন করে গড়ে তোলার
ব্রত নিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে—সেই
ব্রতের পূর্ণাঙ্গ মূল্যধনেই হবে দল ও দলনেত্রীর
প্রকৃত জন্মলাভ—নির্বাচনে বিজয় যার সূচনামাত্র।

রাষ্ট্রপুরু শ্বরেজ্ঞ নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" এর অন্তিম ভাষ্য]

অনুবাদক—অধ্যাপক নজিমুদ্দীন মোহন দাশগুপ্ত

শাসন সংস্কার ও চরমপন্থী মতবাদের প্রসার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কমিটির প্রসঙ্গ ছেড়ে দিতে গিয়ে আমি মধ্য-প্রদেশের হৃতপূর্ব গভর্ণর স্যার ফ্রাংক স্মি সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই। তিনি ছিলেন আমাদের কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান। লর্ড সাউথ বরোয় অল্পপস্থিতিতে তিনি সময় সময় আমাদের সভায় সভাপতিত্ব করতেন। খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তার বেশ অবধারণ ক্ষমতা ছিল। কমিটির কার্য পরিচালনা কি ভাবে করতে হয় তা তিনি জানতেন। সাক্ষীদের জেরা করার কার্যকারী শক্তি ও তার ছিল—সে সাক্ষী বিরোধী বা অনিচ্ছুক যাই হোক না কেন। তার এই সমস্ত গুণ কমিটির কাছে বেশ ভালভাবে সাহায্য করে। তার জেরা করা লক্ষ্য করে অনেক সময়ই আমি ভেবেছি যে তিনি জীবনে যে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন, সেটা ভুল হয়েছে। তার প্রকৃত স্থান হওয়া উচিত ছিল ব্যারিষ্টারী বৃত্তিতে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নয়। বন্ধুবর মি: আকটার মোহম্মদ নিজেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন জাদরেল প্রবক্তা রূপে প্রমাণিত করেছিলেন। জাতির ব্যাপকতার দ্বারের প্রতি দৃষ্টি না হাবালেও আমার কাছে মনে হল যেন কমিটির সমস্ত হিসাবে তিনি তার মুসলমান সহ-কর্মীদের বিশেষ অভিমতকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। মি: শাস্ত্রী মোটামুটি ভালই ছিলেন। তবে তার মনে এক ধরনের সন্দেহ ছিল যে বাংলা তার নিজস্ব চাহিদা বজুবন্দী পরিমাণে পেয়ে যাচ্ছে

—এবং সময় সময় তা একটি থামাবার চেষ্টা করেছেন। সরকার পক্ষ নয় সমস্তগণ, আমার মতে সমান ভাবে সামঞ্জস্য রাখা করতে চেষ্টা করেছেন এবং মোটামুটি সব স্বার্থের প্রতিই সমান ভাল মানুষ্য প্রদর্শন করেছেন। সমস্ত মিলে আমরা একটি সুখ্য পরিবারের মতই ছিলাম। কাজ করে আনন্দ পেয়েছি। বিভিন্ন দ্বারের প্রতিনির্দিগণের সঙ্গে এবং বহু প্রদেশের শাসন কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়ায় খুশী হয়েছি। এই ভাবে একটি সরকারী কমিটির সমস্তরূপে কাজ করা আমার নিকট একটি আত্মনব বৃত্তি বলে মনে হয়েছে যে বৃত্তির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্য পালনের দাবিও ছিল। আমার নিকট এ বৃত্তিটি একটা শিক্ষারূপেই প্রতিভাভূত হয়েছে। এই শিক্ষার মাধ্যমে আমি শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করার এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় না। মানুষের সঙ্গে সচল সম্পর্ক এমন সমস্ত বিষয়ের দিকে মানুষের দৃষ্টি ধুলে দেয় বা সরকারী দপ্তরখানার সূক্ষ্মাখ্য বেকর্ড পত্রে পাওয়া যায় অতি অস্পষ্ট ভাবে। দৈনিক সংবাদ পত্রের আরও উজ্জ্বল বর্ণনা বিস্তারের মধ্যেও তা অতি অস্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যায়। মানুষটি তোমার সামনে। তিনি একজন লোক-শাসক। তুমি তাকে দেখছ, তার কথা শুনছ, তার ডাব ভঙ্গী তুমি লক্ষ্য করছ। এই ভাবে সম্পূর্ণ মানুষটি তোমার সমক্ষে উপস্থিত যিনি

তাকে দেখেন তার মনের উপরে তিনি যে ছাপ রেখে যান তা সত্যের এক অখোঁচ চিহ্ন বহন করে। সে চিহ্ন লেখনী সুবের বক্তৃতায় প্রচারিত বানীর কৃত্রিম, অনাবশ্যক কথার বুরি দ্বারা অনিবার্য ভাবে স্বেচ্ছাচরিতার আচ্ছন্ন হয় না।

মর্টেম্ব কোর্ট রিপোর্ট করেকটি সুনির্দিষ্ট নীতির কথা লিপিবদ্ধ করেছে। আমাদের কমিটিকে সেই নীতিগুলির উপর বিস্তারিত কার্যক্রম প্রণয়ন করতে হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই যে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি। এই রিপোর্ট সাংসদগণিক নীতিকে নিম্ন করে বহুবার করে দিয়েছে, কারণ এই সাংসদগণিক নীতি পৌর দাবির বোধ ও জাতির বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মর্লে-মিটো পরিকল্পনায় এই সাংসদগণিক নীতিকে স্বীকৃতি দান করা হয়েছিল। কাজেই মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মতি ব্যতীত সে বিষয়ে তো আর পিছনে ফিরে যাওয়া যায় না। তা ছাড়া একটি অহুকম্পা দান করতে গিয়ে আর একটি অহুকম্পাকে তুলে নেওয়া—যা মুসলমান সম্প্রদায় খুব মূল্যবান মনে করে গ্রহণ করেছে—সামাজ্যস্থান ও অর্থনৈতিক হয়ে পড়ে। তাই সাংসদগণিক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হওয়ার আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের আসন সংখ্যা শতকরা হিসাবে কতটা ভাগাভাগি করতে হবে। এই অবস্থার ১৯১৬ সালের লন্ডো কনভেনশনের নির্দেশ আনন্দের কাজে লেগে যায়। কমিটির নিকট এখন গভীরভাবে বিবেচনার বিষয় হল এই যে আমরা এই নির্দেশ যেমনটি ছিল ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ

করব না। কোন দিকেই কোন রকম সংশোধন করব। আমরা চূড়ান্তভাবে মোটামুটি লন্ডো কনভেনশনের সূত্র ধরেই এগিয়ে যেতে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। যে সমস্ত সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি তা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে অতি বিভিন্ন ধরনের। তা এ রকমটা যে হবে তা তো ভালভাবেই বুঝতে পারা যায়। দু'তরফেই চরমপন্থী লোক ছিল। হিন্দুরা কোন রকম খাতির করবেন না। আবার মুসলমানরা চুক্তির সর্বের উপরেও বহুবার এগিয়ে যেতে চান। একরূপ অবস্থার আমরা মনে করলাম লন্ডোতে যে উত্তম উপায়টি গৃহীত হয়েছিল তাই হচ্ছে সমস্তার সমাধান, এবং তা উত্তর সম্প্রদায়েরই যে সমস্ত সম্মত দাবী আছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলায় খরাজিষ্টরা তাদের দলীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশ্নটিকে আবার জাগিয়ে তোলেন। খরাজিষ্টরা যে সমস্ত প্রস্তাব দেন তা পরে আলোচনা করা যাবে, তাদের প্রস্তাব হিন্দুদের মধ্যে যোবের সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে মুসলমান নেতারা আনন্দোল্লাসের সঙ্গে এ সমস্ত প্রস্তাবগুলি প্রকৃতপক্ষেই এক বিসম্বাদের আশেল হয়ে গাড়িয়েছে।

এছাড়া আরও একটা সমস্যা নিয়ে ক্রাফাইজ কমিটিকে কাজ করতে হয়েছে। তবে এ সমস্যাটা হয়ত কিছুটা কম বিসম্বাদমূলক ছিল। এটা হচ্ছে জমিদারদের জন্য এক বিশেষ নির্বাচক-মণ্ডলী গঠন। এই রকম বিশেষ নির্বাচক-মণ্ডলী গঠন আমার কোন সময়েই ভাল লাগেনি। আর আমি যখন মন্ত্রীরূপে কলকাতা মিউনিসিপাল বিলের ভারপ্রাপ্ত ছিলাম তখন আমি যতদূর পেয়েছি এই বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলীকে ছোট ছোট করে দিয়েছি। নীতির দিক থেকে এ ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। এ ব্যবস্থা বিশেষ অধিকার ভোগী শ্রেণী সমূহের সৃষ্টি করে। (চলবে)

(Contd. from 2nd cover)

		Dist—HOWRAH	
Beva S. T. Umarani	P. O. & Vill Deulgram	200	7 7 79
w/o Late Jiban Krishna Beva			
		Dist—HOOGHLY	
Mazumdar Shri Benoy Gopal	South Kannipur Govt. Colony	200	15 8 72
		P. O. South Kannipur P. S. Kanipur	
		Dist—NADIA	
Debi Smt Satadal Basini	Dhubulia New Refugee Camp	100	20 11 73
w/o Late Kadamohan De		Group No. 6, Block office No. 6	
		P. O. Dhubula New Camp	
		Dist—JALPAIGURI	
Ganguly Smt Sabitri	Pandapara Road (Pacca Pool	200	4 3 80
w/o Late Sailen Ganguly		P. O. Jalpaiguri	
		Dist—PURULIA	
Mahatani Smt Mitbala	Vill Brechabani, P. O. Jitujari	100	31 12 79
w/o Late Dhananjoy Mahato		P. S. Manbazar	
		Dist—MIDNAPUR	
Das Smt Chumalkari	Vill Bhaitgarh	100	11 12 79
w/o Late Adhav Chandra Das		P. O. Kanaidighi	
Maity Brojendra Kumar	P. O. & Vill Bibharpur	200	5 4 74
Maity Macgobinda	P.O. & Vill Madhabpur Via Kajalgarh	200	4 4 74
Mishra Smt Kiren Bala	Vill Panchishatia	200	18 8 79
w/o Late Sarada Mishra		P. O. Salagoria	
Paria Mukunda Behari	Vill Ramkhali, P. O. Mangalamaro	200	31 3 74
Pramanik Bhota Nath	Vill Tatabaria	200	15 8 72
		P. O. Babartpurhat	

বিশ্ববী পুস্তকশালা

অনুদান সমিতির বিপণ্য প্রকাশ—অনুদান সমিতি—০০০

বিশ্ববী পুস্তকশালায় প্রকাশিত—অনুদান সমিতি—০০০

কীর্ত্তন কুমার দত্ত—

- ১। বাংলা :—১০
- ২। ইতিহাস :—১০
- ৩। ইতিহাস :—১০
- ৪। ইতিহাস :—১০
- ৫। ইতিহাস :—১০
- ৬। ইতিহাস :—১০
- ৭। ইতিহাস :—১০
- ৮। ইতিহাস :—১০
- ৯। ইতিহাস :—১০
- ১০। ইতিহাস :—১০
- ১১। ইতিহাস :—১০
- ১২। ইতিহাস :—১০
- ১৩। ইতিহাস :—১০
- ১৪। ইতিহাস :—১০
- ১৫। ইতিহাস :—১০
- ১৬। ইতিহাস :—১০
- ১৭। ইতিহাস :—১০
- ১৮। ইতিহাস :—১০
- ১৯। ইতিহাস :—১০
- ২০। ইতিহাস :—১০

প্রতিষ্ঠান :—১০ নং বঙ্গবাসী স্ট্রীট কলিকাতা-১০০০১

টেলিগ্রাম :—১/১/১/A বঙ্গবাসী স্ট্রীট কলিকাতা-১০

—মূল্য ১০.০০—

অনুদান সমিতির বিপণ্য প্রকাশ (অনুদান সমিতি) বিশ্ববী পুস্তকশালা

অনুদান সমিতি—অনুদান সমিতি

বিশ্ববী পুস্তকশালায় প্রকাশিত—অনুদান সমিতি—০০০

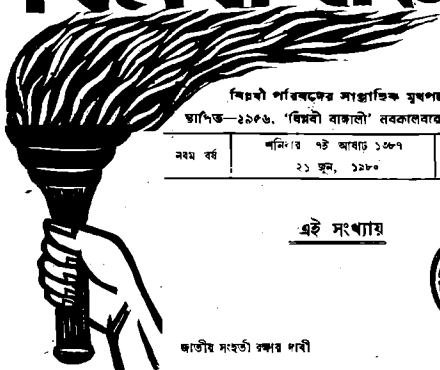
প্রকাশক ও মুদ্রক :—অনুদান সমিতি (অনুদান সমিতি) বিশ্ববী পুস্তকশালা

বিশ্ববী পুস্তকশালায় প্রকাশিত—অনুদান সমিতি—০০০

মূল্য :—১০ নং বঙ্গবাসী স্ট্রীট, কলিকাতা-১০০০১

১০/১/১/A

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ

প্রাণিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' সপ্তাহিক—১৯৭৯

নবম বর্ষ	অনিন্দিত ৭ই আষাঢ় ১৩৮৭ ২১ জুন, ১৯৮০	৩৯ সংখ্যা
----------	--	-----------

এই সংখ্যায়



জাতীয় সংহতি রক্ষার দাবী

—সম্পাদকীয়

বহুস্তর নিকা

—অনিমা দাশগুপ্ত

স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্রতম নায়ক বিপ্লবী শূর্যসেনের বাণী

বিলম্বিত চৈতন্যোদয়

—বন্দোবর বন্দোপাধ্যায়

রাষ্ট্রপুঙ্গু সুরেন্দ্রনাথের শ্রুতিকথা

—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

হে মোর দুর্ভাগা দেশ

যাদের করেছ অপমান,

অপমানে হতে হবে,

তাদের সবার সমান।

জাতীয় সংহতি রক্ষার দাবী

আসামে একদল অর্ধাচীন, দেশের স্বার্থবিনষ্টকারী 'বিসেষী হঠাৎ' আশ্রয় তুলে যে আন্দোলন শুরু করেছিল তার শূন্য প্রসারী প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশের অন্তর্ভুক্ত যে একই প্রকারের দাঙ্গাহাঙ্গামার সূচনা হতে পারে বলে চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক মানুষেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, তা ত্রিপুরার ঘটনাকলীর মধ্য দিয়ে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ক্ষমতা ভারী সুখী নয় কেহই, বরং ভারী আরও উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েছেন। একই সমীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে ত্রিপুরার আন্দোলনের গতি প্রকৃতি একই ধরনের। এটা অনুমান করলে ভুল হবে না যে এই দুইটি আন্দোলনের পেছনে একটি শূন্য পরিকল্পনা আছে এবং দুই রাজ্যের আন্দোলনকারী নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী, লক্ষ্য ও মানসিকতার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। দেশের সংহতি ও ঐক্যের ক্ষমতা এদের কোন ব্যয়িত নেই, ভাবনা চিন্তা নেই। এরা যেন সব এলো মেলা করে দিয়ে লুটে পুটে যেতে চায়। এদের লক্ষ্যও যেন একই—বাকালী ও সংযোগবিচ্ছিন্নের বিভাজন ও ধ্বংস। এদের চালচলনের সাম্প্রদায়িক অত্যাচার পরিবার। যুক্তি মানব না, আলোচনায় বসব না, গায়ের জোরে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা নবহত্যা, লুণ্ঠনরাজ, অগ্নি সংযোগ করার মত ক্ষমতামূলক কৌশল অবলম্বন করতেও দ্বিধা করব না, সমগ্র দেশ যদি বণ্ডবিবণ্ড হয়ে দেশের চরম ধ্বংসের সাধিত হয়, তবুও নিজেদের জিহ্বা ছাড়ব না। সুতরাং এই দুই রাজ্যের আন্দোলন একে অজ্ঞেয় পরিপূরক হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং দেশের ধ্বংসের ঝোঁক করার ক্ষমতা অনতিবিলম্বে নীতি নির্ধারণ করে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। অনেক দেবী হবে গিয়েছে, যার ফলে এদের আশ্পৃঙ্খল ও দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ তো গেল একটি দিক। অন্যদিকে এই প্রকারের আন্দোলন একটি বিশেষ অশনি সংকেতও দিচ্ছে। এদের যোকাখিলা করতে না পারলে, উত্তর পূর্ব অঞ্চলের অশান্ত অঞ্চল দু'একটা রাজ্যের মধ্যেও ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য। সেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটবার উৎসাহ যোগাতে পারে।

ব্যাপকতা, হিংস্রতা ও জঘন্যতার দিক দিয়ে ত্রিপুরার নববাতী আন্দোলন আরো ভয়ানক। কি করে ত্রিপুরার উপজাতি স্বসমিতি এমন অমাত্রবিক অত্যাচার করতে পারল প্রায় বিনা বাধায়, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে ভ্রম হওয়া প্রয়োজন। গোপন ভাষা ব্যবহার করার ক্ষমতা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে গোয়েন্দা বিভাগ আছে এবং সেজন্য গভীর মানুষের রক্ত জল করা বহু টাকাও খরচা হয়। ভারী কি

এ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্তরের সরকারের কাছে কোন রিপোর্ট দিবেছিল? দিয়ে থাকলে, কোন সরকার তাতে গুরুত্ব না দিয়ে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন, সে তথ্য জানানবার অধিকার দেশবাসীর নিশ্চয়ই আছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত: রাজ্য সরকারের, তবে কেন্দ্রীয় সাহায্য চাইলে, রাজ্য সরকার তা পেতে পারেন ও শেষেও থাকেন। কেন্দ্র নিজ থেকে সাধারণত: নিজেদের তত্ত্বকে কোন ব্যবস্থা নেন না, কারণ তার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের অসঙ্গত হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠতে পারে এবং পরে উঠেও থাকে। এ সম্ভাবনাটা আরো বেশী থাকে, যখন রাজ্য ও কেন্দ্রে বিভিন্ন দল ক্ষমতাসীন থাকে। রাজ্য সন্তিকার ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করতে চাইলেও, তারা এর ভেতর রাজনীতির গুরু খুঁজে বের করেন।

বর্তমান ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জীর্জেল সিং বলেছেন, ত্রিপুরা সরকারকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ সতর্ক করে দিলেও, তারা যত্নাকর্ষ্য করেন। আরো একটি গুরুতর অভিযোগ যে তুচ্ছকাণ্ডী দলটির সঙ্গে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বোঝাপড়া হওয়ার ক্ষয়। ত্রিপুরা সরকার এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন নি। এমন কি এই দলের নেতার বিরুদ্ধে মামলাও তারা তুলে নিয়েছেন। প্রশাসন যত্ন এসম্বন্ধে উদাসীন থাকার ক্ষয়ই, থানা পুলিশকে একেছো করে দিয়ে নিরপরাধ মানুষের রক্ত নিয়ে তারা হোলি খেলার সুযোগ পেয়েছে। বস্তুত: এই প্রস্তুতি একদিনে হয় নি এবং এই ধ্বংসলীলা মুহূর্তের মধ্যে আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্রপাতের মত ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরে এর প্রস্তুতি চলেছে এবং একটি পরিকল্পনা অনুসারেই তারা এই নরমহে ধ্বংস পালন করেছে। ত্রিপুরা সরকার তাদের তুর্লভতা ও অমনোযোগিতার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। তাদের গাফিলতিতে এই অবাধ নরহত্যার ঘটনা ঘটে থাকলে (ঘটেছে বলে মনে হবার কারণ আছে) তাদের ক্ষমতার আসনে বসে থাকবার কোন নৈতিক অধিকার নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারও এই ঘটনার দায়িত্ব থেকে একদম মুক্ত হতে পারেন না। তাদের গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট যখন ছিল, তখন কি তারা রাজ্য সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিবেছিল? তারা কি বলতে পারেন যে রাজ্য সরকার তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি? শুধু পরামর্শ দেওয়াই যথেষ্ট নয়, এতগুলি মানুষের জীবন রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের নিশ্চয়ই আছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতার চুনচেরা বিচার করার দায়িত্বটা পালন করার প্রাথমিক কর্তব্য ছিল।

রাজ্য সরকার যত্নাকর্ষ্য পালন না করায় ফলে যদি দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে রাজ্যের মাধ্যমে উপর দিবেও যত্নাকর্ষ্য পালন করা উচিত সমগ্র দেশের স্বার্থ রক্ষার ক্ষয়। দেশের মানুষ সমগ্র পরিস্থিতির সম্বন্ধে ভগ্নস্তম্ভ দাবী করে ও তার ফলাফল জানতে চায়। এটা দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার। প্রশ্নের ভাষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তারা ক'উকে ক্ষমতা দেয় নি।

সম্প্রতি কয়েকটি দলের সভাসমিতিতে আলোচনা, লোকসভার বক্তৃতা ও কাজ কর্তব্য মাধ্যমে এই সভা প্রমোদিত হচ্ছে। একদল মানুষ, তা তারা সর্বোদয় সমান ভারতীয় জনতা দল যে কোন দলতুই হোক না কেন, বোলাজলে মৎস শিকার করবার অশোভন বাসনায়, এই ধরণের আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মদত দিতে এবং এখনও দিতে চায়। এটা নিহক দেশত্রোহীতা ভিন্ন অণু কিছু নয়। “শ্রীমতী গান্ধীকে বিপাকে ফেলার জন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে আবোল-তাবোল কথা বলছেন” একদল রাজনৈতিক নেতারা। এরা একবারও ভাবছেন না যে এটা শুধু শ্রীমতী গান্ধী ও বঙ্গভাষাভাষীদের ও অসংখ্য সংখ্যালঘুগণের মরা বাঁচার প্রশ্ন নয়। এটা সমগ্র দেশের ও জাতির মরা বাঁচার প্রশ্ন। জাতির এই বিপদের দিনে যে রাজনৈতিক নেতারা ক্ষুদ্র দলগত ও গোপীগত লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ করছেন, তারা দেশত্রোহী। তাদের চক্ৰবর্তী কোন পার্থক্য নেই বিপ্লবগামী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে যথার্থ ব্যবস্থা নিতে ঘিঘা করলে, জাতির সর্বট আরো ঘনীভূত হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এর সমাধান করতে না পারলে, দেশ ষণ্ড বিধও হয়ে যাবে এবং সমগ্র দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।

এত মহীদের আত্মদান, এত স্বাধীনতা স'গ্রামীদের শ্রম, ধর্ম, অশ্রু ও রক্তদান, সবই কি বিফল করে দেবে ভূঁইকোড় ‘নেপোর’ দল? কিছুতেই এই দুর্ঘটনা ঘটতে দেওয়া উচিত হবে না। আমাদের প্রয়াস পূর্বসূরীরা “আমি অসংকে গাড়িয়েছে তারা” প্রমাণ করেছেন দেশে মানুষকে “দেশের জন্ত” দিবে কোন বলিদান?

এই আন্দোলন যদি নব সৃষ্টির প্রথম বেদনার প্রতীক হত, তবে সবাই একে স্বাগত জানাত। কিন্তু এ তো সমুদ্র সর্বনাশের প্রলয় নাচন। একে রুখতেই হবে এই সব দেশ প্রেমিকদের দাবী।

শ্রীমতী গান্ধী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে আমরা আহ্বান করি সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে ও অবস্থার মোকাবিলা করতে। দেশপ্রেমিক মানুষরা তাদের সঙ্গে আছেন এবং থাকবেন।

বয়স্ক শিক্ষা

—অনিমা লালগুপ্ত

হেলেনবোয়ার মীরাবাই একহুত্র গান শুনে-
 চিলাম—পুঁবি পড়ে পড়ে জনম বুঝা। পণ্ডিত
 না হোয় কোই—অর্থৎ কেবল বই পড়লে তার
 প্রকৃত অর্থবোধ না হলে, পণ্ডিত হওয়া যায় না।
 যেমন আমরা শুনে থাকি ‘নটবর সর্বভূতে বিরাজ-
 মান’—কিন্তু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি না করিলে একথা
 আমাদের কাছে সামান্য একটা কথাই হয়ে
 থাকবে, তার দ্বারা মানসিক জড়তা দূর করার কোন
 সম্ভাবনাই থাকে না। ধরা যাক এক কিরাট লৌহ
 পিণ্ড, তার ওপর আছে, তার মধ্যে ব্যবহারিক
 সম্ভাবনাও প্রচুর আছে; কিন্তু যতক্ষণ তাকে পবিত্র-
 মাজিত করে ব্যবহার যোগ্য বস্তুপাতিতে পরিণত
 না করা যায়, ততক্ষণ তার তার নিয়েই যে পড়ে
 থাকবে, কোন কাজেই তাকে লাগান যাবে না।
 সেই রকম আমাদের মনও একটি লৌহ পিণ্ডের
 বস্তু—তার মধ্যে যে চিন্তা জাবনার শক্তি আছে
 তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিমাজিত করা যায় ততক্ষণ
 পর্যন্ত সেই শক্তির ঠিকানা লাভের সম্ভাবনা নাই
 এবং মানসিক শক্তি বিকসিত না হলে গোটা
 মানুষটাই জড়বৎ হয়ে পড়ে। এই মানসিক শক্তি
 বিকাশের জন্ত চাই শিক্ষা। মনের চিন্তাভাবনাকে
 ক্রম বিকাশের পথে নিয়ে যাবে। মনকে অবিগত
 বিষয়গুলি উপলব্ধি করার মত দ্রুতগত ও প্রাণবন্ত
 করে হুগবে সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা
 সচরাচর যে সব পুস্তক পাঠ করি তাতে কি নীতি-
 ব্যাকরণ অন্তর্ভুক্ত আছে? না, নেই তবে আমরা

বহু পুঁবি পাঠ করেও নীতিজ্ঞান সম্পন্ন হই না
 কেন? তা এই উপলব্ধির অভাবেই। অনেক
 ভাল ভাল কথা মুখে উচ্চারণ করলেও অনেক সময়
 তা মূর্খের কথাই হয়ে থাকে—তাহারা কল্পনায়
 মানসিক শক্তি উন্মেষ ঘটেনা—জ্ঞোতাও যদি সং এবং
 পরিমাজিত বুদ্ধি সম্পন্ন না হয় তবে এই সব সুন্দর
 কথা তারও মনের দরজায় যা দিয়ে দরজা খুলতে
 পারবে না। তবে কি আমরা বইপুঁবি পড়ব না,
 ভাল কথাও শুনব না? না, তা নয়। বইপুঁবি
 পড়ব, ভাল কথাও শুনব। না হলে কিসে আমাদের
 মন তথা চিন্তা ভাবনা নতুন পথের সন্ধান পারে?
 শেষ কথাটা কিন্তু এই উপলব্ধির। যা পড়ব যা
 শুনব তা মন দিয়ে গ্রহণ করুক, তাকে ব্যবহারিক
 জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব—অর্থাৎ তা
 আমাদের পড়া এবং জানার সার্থক করবে।

এ যে কথাটা আছে—শিখা মিলে লাগে লাগ
 গুরু না মিলে এক। অর্থৎ গুরু বলতে এখানে
 প্রকৃত গুরুর কথাই বলা হয়েছে। যে গুরু শিষ্যের
 মানসিক বিকাশের সহায়ক হন তিনিই প্রকৃত গুরু
 এবং মনগুরু সবচেয়ে বড় গুরু। কারণ গুরুর
 দেওয়া উপদেশ অথবা বই পুঁবি পড়ে যে জ্ঞান লাভ
 করা যায় যদি মন সজাগ হয়ে মানুষকে সেই লব্ধ
 জ্ঞানের চর্চায় নিযুক্ত না করে তবে তার সার্থকতা
 কি? অতএব মনগুরু সবার বড় গুরু। এই মন-
 গুরুকেও ভৈরী হতে হবে। তাই আমাদের সবচেয়ে

কড় প্রয়োজন শিক্ষার। এ শিক্ষা নানাজায়েই লাভ করা যায়, তবে মানসিক চিন্তা-ভাবনাকে শিক্ষা প্রাপ্তির উপযোগী করতে হলে নিজে পড়া এবং লেখার স্বাভাবিক হস্তে হবে। এটাই উপায়ের সত্যের নিয়ম। যে শিশু জন্মাবধি কোলে থাকে সেও কোল ছেড়ে নিজের পায়ে হাঁটার চেষ্টা করে—এটাই স্বাভাবিক, এ চেষ্টা না করাটাই অস্বাভাবিক। সেই রকম প্রত্যেক মানুষের নিজে পড়া এবং লেখার শক্তি অর্জন করাটাই স্বাভাবিক। একটা কিছু লিখতে বা সামান্য কিছু পড়ার জন্য অন্যের সাহায্য নেওয়ার অভ্যাস ক্রমেই মনকে পঙ্গু করে তোলে। অতএব দেখা যায় মানুষের জীবনে শিক্ষার—অর্থাৎ লেখাপড়ার যোগ্যতা অর্জন অশরিরার্থ কল্প। এই শিক্ষারস্তরের প্রকৃষ্ট সময় বাল্যকাল একথা সবার জানা। কিন্তু এ সুযোগ সবার জীবনে সমানভাবে আসে না। তাই মধ্য সময়ে যথাকালে যে কাজ আরম্ভ করা যায় নাই পরবর্তী জীবনে তার সুযোগ এলে যথাসম্ভব তা কাজে লাগাতে হবে। তাছাড়া আমরা চোখের উপর দেখছি মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষমতা অগ্রগতি হচ্ছে সুত্তরায় নিবন্ধর হয়ে থাকা মানেই নিজেকে বঞ্চিত করা। অতএব যে কাজ সময়ে হয়ে উঠেনি, অসময় হলেও তার জন্য নিজেকে তৈরী করার চেষ্টা না করে তো হসে থাকা চলবে না। শিক্ষার কোন সময় অসময় নেই। যদিও মানুষের জীবনকালের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, তারই মধ্যে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়া চাই। সেইজন্য শিক্ষার সুযোগ বাল্যকাল থেকেই যদি গ্রহণ করা যায় তবে তা যতটা ব্যাপক হতে পারে বেশী ব্যয়সে আর ততটা হওয়া সম্ভব নয়। তথাপি যতটুকু পাওয়া যাবে ততটুকুই লাভ। শিক্ষার শেষ নাই। যে যা

পারবে সে তাই সংগ্রহ করুক—তা নিজের কাজে লাগবে, তার ব্যাধি অস্ত্রকেও সাহায্য করা চলবে। আই বা কম কিসে ?

আমাদের দেশেবল্যার আমরা গ্রামের কোন বাড়ীতে দুপুরে মেয়েরা ঘরের বায়ান্দার এবং সন্ধ্যায় পুরুষেরা একটি বিশেষ জায়গায় সমবেতভাবে রামায়ণ মহাভারত পাঠের আসর বসাতেন। তাছাড়া মঙ্গলকাবোর মধ্যে মনসামঙ্গল পাঠও মেয়েদের একটি সুন্দর অস্থান ছিল। অস্ত্রান্ত দেবদেবীর পূজার পুঁথি পাঠও একটি সুন্দর সমবেত অস্থান ছিল। এসব পুঁথি পাঠের পাঠক হস্ত বঃ হুঁচায় জন লোকের মধ্যে সীমিত ছিল, কিন্তু শ্রোতাদের অবিকারের মধ্যে অন্ধর পরিচয়ের জ্ঞান না থাকলেও ক্রমাগত পাঠ শোনার ফলে পাঠ্যগ্রন্থের ভাব গ্রহণে তাদের বিশেষ অসুবিধা হত না। বেশ পরিণত মন নিয়েই তারা ঐ বিষয়ে আলোচনা আলোচনা করতে পারত। কিন্তু এখন আর সেসব আসর জমানোর সুবিধা নেই। শহরে তো নেইই, গ্রামেও এ প্রথা এক রকম লুপ্ত হয়েছে। এই পাঠের আসর কিন্তু সাধারণের মধ্যে চিন্তাশক্তি বিকাশের সহায়ক ছিল। সম্পূর্ণ নিবন্ধর একজন গ্রামা লোককে মুখে মুখে ছড়া কবিতা রচনা করতে শুনেছি—যার জীবিকা ছিল ক্ষৌরকর্ম করা। আমরা মনে করি ঐ সব গ্রামা পাঠের আসরগুলি অন্ধর পরিচয় বিহীন মানুষের মনে ভাব প্রকাশের প্রেরণা যোগাবার উপায় ছিল। এমন তার অভাব ঘটেছে এক সেকালের মত গুরু গৃহের প্রচলনও নেই। তার বদলে বহুবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। এতে সেকালের নালন্দা, বিক্রমপুরী বিহারের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ প্রতিফলিত হয়নি, ইতিয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু ব্যাপক শিক্ষা প্রচারের পক্ষে আধুনিক শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলি অনতিক্রম উপযুক্ত। শহরের মত গ্রামে এখন এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট না থাকলেও কিছু মন্দই আছে। এতে করে শিক্ষার একটি জ্ঞান সার্যালয়ে বিচিয়ে দেবার সুযোগ আছে। জনসাধারণ বাস্তব অক্ষর পরিচয়টুকু লাভের সুযোগও পাওয়া যাবে যথেষ্ট সুবিধা করে দেবার চেষ্টা আছে এতে। কিন্তু এখন পর্যন্তও এ ব্যবস্থা যথোপযুক্ত করে তোলা যায় নি। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের শতকরা সংখ্যা হিসাব করলেই এসভা উপলব্ধি করা যাবে। সেজন্য যারা বহুসময়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি তাদের শিক্ষিত করার একটি ভিত্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য হবে উঠেছে। যে দেশে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতি লোকের রাজনৈতিক ভৌতিকার আছে সে দেশের শতকরা ২০ জন লোক যদি শিক্ষার সুযোগ না পায় তবে এই ভৌতিকার প্রবোলের ক্ষেত্রেও তারা বর্ষাব্যতবে নিজেদের চিত্তাভাবন। এবং বিচার বিবেচনাকে কাজে লাগাতে পারে না। এক্ষেত্রেও তারা ক্ষেত্র হাতের ক্রীড়নকের মতই কাজ করে। এই সব সংখ্যক অক্ষর পরিচয়হীনদের সাক্ষর করার কাজে দেশের শিক্ষিতদের এগিয়ে আসা উচিত। তারা যদি তাদের নাগরিক কর্তব্যের মধ্যে নিরক্ষরকে সাক্ষর করা একটি প্রধান অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে পারেন তবে তাদের নিজেদের অর্জিত বিভাগও সার্থকভাবে কাজে লাগতে পারে দেশের বৃহত্তর অংশকে বাব দিয়ে যে ক্ষুদ্রতর অংশ এগিয়ে যেতে পারে না এ সভা তো সর্বজন স্বীকৃত। তাই কবিত্বের মতে বলা যায়—এই সব জ্ঞান মুদ্র মুক হয়ে দিতে হবে ভাষা। প্রকৃতপক্ষে এরা মুক নয়, কিন্তু কার্যতঃ তাই বটে। একটি সূত্র পরিকল্পনা দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধীজীর

শিক্ষা পরিকল্পনা এক্ষেত্রে সাধ্যমত কাজে লাগান যেতে পারে। তাঁর সেই কর্মভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির একটি নমুনা আমরা বৃন্দাবনী বিদ্যালয়ে প্রচলিত হতে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম তবে তা শিশু-বালক-কিশোরদের ক্ষেত্রে। যেমন বাগানে ফুলো বীজ বুন গাছ জন্মান, তুলো সংগ্রহ করা, তার বিভিন্ন পদ্ধতির বিজ্ঞানের পরে মুক্তো তৈরী থেকে কাপড় বোনা পর্যন্ত প্রতি স্তরে ব্যবহারিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল বিজ্ঞান গণিত প্রকৃতি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ এবং দৈনন্দিন পাঠ ও কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ করে লেখার অভ্যাস করান এই পদ্ধতির অল্প হিসাবে গৃহীত হয়েছে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ততটা কার্যকর নয় বলে আমার ধারণা। কর্মক্ষেত্রে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করছে তার একটু সামান্য অংশ প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে। বসিও এখন এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে নানা পদ্ধতি উদ্ভাসিত হয়েছে তথাপি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একদমরে আমাদের কিছু ক্ষুদ্র মহিলাদের মধ্যে কাজ করতও হয়েছিল। তাদের কেউই লেখাপড়া জানতেন না; তবে ২১ জন স্ত্রী পরিবার থেকেই এসেছিলেন। এদের আমরা প্রথমে মানসিক জড়তা দূর করার জন্য ভাল ভাল বই পড়ে শোনাতাম। তাতে তারা দৈনন্দিন জীবনের জ্ঞান কিছুটা লাভ করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে তারা অতি আগ্রহের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে পাঠ্যবিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন পরে একসময়ে আমরা তাদের নিজে পড়তে দেখার এক নিজ হাতে লেখার চেষ্টা করতে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানাই। তাতে তারা একান্ত এতদূরে অসম্মত বলে মনে করেন।

কিন্তু আমরা তাদের স্টেটে নিজ নিজ নাম লিখে
সিই এবং তাতে পেন্সিল দিয়ে বার বার হাত
ঝুলতে বলি। তারা সলফ হাঙ্গো তা করতেও
থাকেন। তাতে সে অক্ষরগুলির প্রয়োজন ছিল
যুখে যুখে তা বার বার বলতে তাদের অভ্যাস করান
হয়। কিছুদিন স্ট্রিক অভ্যাস করার পরে তারা
নিজের নাম লিখতে শিখলেন এবং নামের মধ্যে
ব্যবহৃত অক্ষরগুলির পরিচয় জানলেন। এর পরে
স্টেটে অল্প শব্দ লেখা এবং সেই শব্দে ব্যবহৃত অক্ষর
গুলি চেনা এবং সাধারণ বর্ণপরিচয়ের বই থেকে ঐ
অক্ষরগুলি খুঁজে বার করার কাজ চলতে লাগল।
আমরা অল্প সময়ের জন্ত এসব করাতাম বাকী সময়
তাদের বই পড়ে শোনাতাম এবং নানাবিধ হস্ত
শিল্পের তালিম দিতাম। তারা তাদের পরিণত
মনের তাগিদে বুদ্ধি ও বিচার বোধ দিয়ে এগুলি বেশ
কম সময়েই আয়ত্ত করতে লাগলেন। এরই বেশ
কিছুদিন বাদে এক মহিলা মনের আনন্দে
বেগেছিলেন, আমি নিজে পড়তে শিখেছি, এর চেয়ে
জানন্দ আর জীবনে পাইনি। তার বয়স তখন
স্বাক্ষরের কাছাকাছি এবং তিনি বেশ অসুস্থও ছিলেন
হৃদরোগের দরুণ। কিছুকাল পরে তিনি মারা যান,
কিন্তু দীর্ঘদিন পড়েও তার সেই কথাটি আমার মনে
পড়ে—নিজে পড়তে শিখেছি, এর চেয়ে আনন্দ
আর জীবনে পায়নি। অবশ্য ঐ মহিলাদের মধ্যে
সব ক'জনই যে এতটা উন্নত করেছিলেন তা নয়,
তবুও তারা নিজের নামটা ভালভাবেই সই করতে
শিখেছিলেন এবং সামান্য রকম অক্ষর পরিচয়ও
তাদের হয়েছিল। সেই যে বই পড়া শোনা এবং

নিজে অল্প হলেও কিছুটা লিখতে পড়তে শেখা
তাদের বক্তিত জীবনে যে আনন্দের সঞ্চার করেছিল,
তাদের মনের জড়তা কাটাতে এবং জীবনকে কিছুটা
দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেখতে শেখার যে প্রবণতায়
উদ্বোধিত হয়েছিল তাতে আমরাও কম আনন্দ লাভ
করিনি।

জানিনি এ পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত কিনা অথবা
এটিতে ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব
কিনা। তবে এটি একটি পরীক্ষিত সত্য।
আমাদের ধারণা শিক্ষা পদ্ধতি ঘাই হোক না কেন
তা যেন মানুষকে মনের জড়তা কাটাতে সাহায্য
করে। লিখতে পড়তে শেখাটা যেন মানুষের
মানসিক শক্তিগুলি বিকসিত করে নিজের শুধা মানব
সমাজের পক্ষে প্রকৃতই মহলজনক হয়ে ওঠে, কেবল-
মাত্র স্বাক্ষরতার মধ্যেই যেন তা পর্যবসিত না হয়।
বর্তমান যুগে কোন কিছুতেই পরন্থাপেক্ষী হয়ে
ধাকার মত হুং এবং বিড়ম্বনা আর নেই। তাতে
যদি মানুষ নিরক্ষর হয় তবে তাদের বক্তিত জীবনের
ভার গুরুতর হতে বাধ্য। নিজ নিজ মাড়ুভাষাতে
পড়তে লিখতে শেখা এবং সাধারণ গণিতের জ্ঞান
মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে অনেকাংশে স্ব-নির্ভর
করে তোলে। তার ওপর বৃত্তিগত অভিজ্ঞতা এবং
নৈপুণ্য-বৃদ্ধি হয়ে মোটামুটিভাবে সাধারণ মানুষকে
শুষ্ক ও স্ব-নির্ভর হতে অবশ্যই সাহায্য করবে। এর
বলে মানুষ ভারবাহী পশুর মত বস্ত জীবন থেকে
মুক্তির আনন্দে প্রকৃত মানুষ হিসাবেই জীবনব্যাপনের
পথনির্দেশ লাভ করবে। আমার ধারণা বয়স
শিক্ষার সার্থকতা এখনেই।

বিলম্বিত চৈতন্যদয়

ঔষধীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়



পশ্চিম ও কর্ণের বে গুজরাটভাষে জড়িত, একথা বোধ হয় সি, পি, এম দলের জানা ছিল না। তা যদি থাকতো, তবে তারা নিশ্চয় বহুপূর্বেই সিটর রাজ্যে সংশ্লিষ্ট এক-কর্মচারীদের শ্রম করিয়ে দিত যে, কথায় কথায় ধর্মঘট করা, কলে কারখানার অবস্থা প্রো ডাউন বা অকিস কাছারিতে শেন-ডাউন ট্রাইক করা অনুচিত। ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণীর বা কর্মচারীদের শেষ অস্ত্র, কাজেই শেষ অস্ত্রটির প্রয়োগ বেশ বিবেচনা সাপেক্ষ এবং তা যখন অনাবশ্যক ভাবে প্রয়োগ করা নীতি বিপরীত ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। কমিউনিষ্ট প্রভাবিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এতাবধি বিস্তৃত শ্রমশিক্ষণ ক্ষতি সাধন করে এসেছে, অত্যাচার ও অস্বাভাবিক ধর্মঘটের মাধ্যমে। কলে শ্রমিকশ্রেণী ও শিল্প সংস্থা উভয়েই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একদিকে, আর অপরদিকে শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে গীমাহীন; যার নিউ ক্ষতির ভাগিদার হয়েছে এদেশের জনসাধারণ। শিল্পে উৎপাদন কম হলে উৎপাদিত মালের পড়তা বরফ বাড়ি, কলে প্রবাল্লা বাড়ি এবং সেট বহুত মূল্যের বোঝা জনগণের বাড়িই চাপে। এসব কথা জানা সত্ত্বেও সিটি বা অজ্ঞাত বামধর্মেরা শ্রমিক ইউনিয়নগুলি কংগ্রেসী শাসনকালে এদেশে কলে-কারখানার, ক্ষেত্রে-বাজারে, অকিস-কাছারিতে ও বিভিন্ন বনি গর্ভে উদ্বেগ প্রণোদিতভাবে অহেতুক শ্রমিক কর্মচারী অসন্তোষ সৃষ্টি করে অবস্থা অশান্তির আবহাওয়া তৈরী করে আসছিল বহুকাল ধরেই। সিটরও অজ্ঞাত বামশ্রমিক সংগঠনগুলির মূল লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, বনিমজুর ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উৎপাদন, যাতে তারা একজোট হয়ে কংগ্রেস শাসনের উৎখাত করে কমিউনিষ্টদের বা অজ্ঞাত বামপন্থীদের সহায়ক হয়। উক্ত উদ্বেগ সিদ্ধির আশায় এ সব দলের শ্রমিক নেতারা শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী ও বনি মজুরদের অনবরত কাজে ঠাকি দিতে, কম কাজ করতে, কাজ খারাপ করে দিতে, নিম্ন মানের মাল তৈরী করতে ও কথায় কথায় ধর্মঘট করে কলে কারখানা, অকিস কাছারি, ক্ষেত্রে বামার, ও বনিগুলি অচল করে দিতে প্ররোচনা দিয়ে আসছিল এবং এখনও তাই দিকে।

বহুকাল ধরে সিটর বে ত্রাট নীতিতে শ্রমিক-কর্মচারীরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সেই একই কঠোর পন্থায় তারা আজও চলছে, কলে বামঘণ্ট সরকার তথা সি, পি, এম পশ্চিম বাংলায়, ত্রিপুরায় ও কেয়লায় রাজ্য শাসনের অধিকার অর্জন করার পর প্রমাণ গোনে। তাদেরই পূর্বের অসং শিক্ষা যা তারা শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে ইতিপূর্বে সঞ্চারিত করে রাজনৈতিক মুনাকা অর্জনে তৎপর ছিল, তা আজ তাদের সি, পি, এম সরকারের বিরুদ্ধেও সমানভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে দেখে অভিভূত হয়, সি, পি,

এম নেভারা। কলে সি. পি. এম তার নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন সিটির রাজ্য সম্মেলন ডাকতে বাধ্য হয় কয়েকদিন পূর্বে। সিটির রাজ্য সম্মেলনে সি. পি. এম নেভারা ও সিটির শ্রমিক নেতারা যে ভাষণ দেন তা অস্বস্তি পূর্ণ, কারণ ইতিপূর্বে এই শ্রম সিটির মুখে সন্নিবিষ্ট হতে দেখা যায় নি। এ যেন ভূতের নৃপে রাম নাম সঙ্গ। সিটি এখন থেকে পশ্চিমবাংলায়, ত্রিপুরায় ও কেরলে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করার কাজে ও ধর্মঘট করার ব্যাপারে স্থিতিশীল হবে অর্থাৎ সহজে ও অনাবশ্যকভাবে শ্রমিক কর্মচারীদের অধঃ উত্তেজিত করে রাখার কথায় ধর্মঘট করবে না বা উৎপাদন ব্যাহত হয় এমন উদ্ভাবন দেবে না। অপরপক্ষে শ্রমিকদের উৎপাদন বাড়াতে উদ্বোধন দেবে, কাজে ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করবে ও সুপরিচালিত করবে। ধর্মঘটের অধিকার শ্রমিকদের অবশ্যই থাকবে, তবে সেটা শেষ ঐতিহাসিক মাত্র ব্যবহার হবে। এখনকার মত যখন তখন ধর্মঘট করা চলবে না। এইসব শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কাজ সিটি কেবল সি. পি. এম শাসিত তিনটি রাজ্যেই মেনে চলবে। ভারতের অগ্রাঙ্ক রাজ্যে তারা নিশ্চয় আগের মত শ্রমিক অশান্তি বাড়িয়েই যাবে, যাতে সেই সব রাজ্যে সিটির তথা সি. পি. এম এর প্রভাব শ্রমিক, কৃষক ও কর্মচারীদের মধ্যে বাড়তেই থাকে। সি. পি. এম যে যে রাজ্যে শাসন ক্ষমতার আসীন, সেই সেই রাজ্যেই শ্রমিক-কর্মচারী ও শ্রমিক-কর্মচারী ও শ্রমিকনেতারা গণহিংসারী হবে; অগ্রাঙ্ক তারা গণহিংসারী হলে নেতাদের আপত্তি নেই—এটাই উক্ত সম্মেলনে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবংলায় জ্যোতিবাবু-ক্রমোদ-বাবুরা বিদ্যুৎ সংকটে নাজেহাল হয়েছে কি সিটির রাজ্য সম্মেলন ডাকতে বাধ্য হলেন? মনে হয় শুধু বিদ্যুৎ সংকট ছাড়া আরো নানা সংকটে পড়েই তাঁদের শুভবুদ্ধির উদয় হ'ল। বিগত তিন বছর ধরে সি. পি. এম পশ্চিমবংলায় ক্ষমতাসীন, অথচ উক্ত সময়ের মধ্যে যে কত গভীর কল-কারখানা এখানে বন্ধ হয়েছে সিটির দোরগোড়, তার হিসাব কে রাখে। জ্যোতিবাবু পুঞ্জিপতিদের আশা ও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এরা রাজ্যে শ্রমিক অসন্তোষ দীর্ঘমিত হবে, কাজেই নতুন নতুন শিল্প কারখানা খোলার যেন ধনিক-বণিকরা ইতঃকৃত্ত না করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, শ্রমিক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের অভাবেই নতুন কল-কারখানা খোলা সম্ভব হল না, অপরপক্ষে বহু চালা পুরাতন কল-কারখানা বন্ধ হল, শ্রমিক অশান্তির জগৎ ও নিয়মিত বিদ্যুৎ-খাটতির জগৎ। রাজ্যসরকার দর্শকের ভূমিকায় প্রতিকারহীন অবস্থায় রয়েল ন যথো ন উদ্ভো।

সিটির ইউনিয়ন বাজীর দাপটে শ্রমিক অসন্তোষ পশ্চিমবাংলায় মহাভীতিবৃত্ত দেখা যায়। এর প্রতিকার করার ক্ষমতা কারো নেই। সেই সিটির নেতাদের যদি সত্যিই শুভ বুদ্ধির উদয় হয়, তবে দেশের পক্ষে তা মঙ্গল জনক, কিন্তু তা সত্যিই হবে কি? সি. পি. এম দলের হাত থেকে শাসন কতৃৎ যদি হঠাৎ চলে যায়, তবে নিশ্চয় সিটি তার রাজ্য সম্মেলনে বিবোধিত নীতি নিয়ে চলবে না, কারণ গরজে পড়ে যে নীতিকে মানতে চাইছে তারা, গরজ ফুরালে সে নীতিকে তারা পলাঘাত করে পূর্বদিকের স্বভাবসিদ্ধ দাবিদাঙ্গন হীনের পথই অনুসরণ করবে—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কতৃৎ আসীন থেকেও সি. পি. এম যে কেন গভীর তিন বছর চরম গণহিংসারী হীনভাবে তার শ্রমিক সংস্থা সিটিকে গতানু-গতিক পথে চলতে দিয়ে ব্যর্থতার বোঝা অঙ্কে তুলে নিল নিকেরাধের মত—সেটাই আশ্চর্যজনক ঘটনা। শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত কোন রাজনৈতিক দল একগুণভাবে নিজেদের বোকাখির পরিচয় দেয় না। সি.

পি, এম স্বাক্ষর সলিলে ডুব মরতে বসেছিল, সিট'র দাপটে। সিট' এরাছোর শ্রমিক-কর্মচারীদের বৈষ্ণব বৈপ্লবোত্তাপে কর্মবিশ্ব ও ঘন ঘন ধর্মঘটের পাখে পরিচালিত করে আসছিল, তাতে রাজ্য শাসন প্রায় অচল হবার জোগাড় হয়ে পড়ে। তাই সি, পি, এম নিরুপায় হয়েই সিট'র অমূল্যত ফেঁদাচারী ও দাবিদারী শ্রমিক আন্দোলনকে দাবিদারী করার প্রচেষ্টা চালাতেই উক্ত সম্মেলনের আয়োজন করে, কিন্তু এতদিনের বর্ষ অভ্যাস সিট' ছাড়তে পারবে কি? শ্রমিক-কর্মচারীদের যে ভুল পাখে সিট' এতাবৎ-কাল পরিচালিত করে এল, সে ভুল ও আত্মবাহিত পথ শ্রমিক-কর্মচারীরা ছাড়তেও নতুন সঠিক পথ ধরতে পারবে কি? মনে হয় বাস্তবে তা সম্ভব হবে না।

ছোট ও মাঝারি শিল্পে ঘন ঘন ধর্মঘট ডেকে সিট' যে ক্ষতি করেছে পশ্চিমবঙ্গে, তা কোন মতেই মূল্য শ্রমিক আন্দোলন নয়। সিট' এখন ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওপর হঠাৎ দরদী হয়ে উঠতে চায়, সি, পি এম নেতাদের চাপে পড়ে, কিন্তু যে ক্ষতি ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে সিট'র অবিদ্যুৎকারীতার, তা কি এখন পূরণ হবে? কখনই তা সম্ভব নয়। কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন আই, এন্, টি, ইউ, সি বরাবরই ভারতের শ্রমিক-কর্মচারীদের সঠিকপাখে পরিচালিত করার জন্য শ্রমশিল্পে উৎপাদনকে অব্যাহত রেখে দাবী পাওয়া আদায়ের চেষ্টা করেছে। তারা অর্থ ও অস্ত্র্য ধর্মঘটকে প্রসন্ন দেখনি কখনও, কিন্তু সিট' শ্রমিক-কর্মচারীদের সম্মুখীন করে প্রোগ্রামে ভুলিয়ে তাদের উত্তেজিত করেছে, নীতিহীন করেছে ও মিথ্যা ভাঙা দিয়ে বিপথগামী করে এদেশের শ্রমশিল্পের সর্বনাশ সাধন করেছে, দলীয়স্বার্থে বারবার। কল এদেশের সিট'র অধীন শ্রমিকসংস্থা গুলি শ্রমিক-কর্মচারীদের মাত্রাতিরিক্ত কর্মবিশ্ব ও শিল্প বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তুতে পরিণত করেছে, যার কুফল ভোগ করতে জনগণ আছে। বাধা হচ্ছে। এর প্রতিকারের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি, কারণ তাহলেই অশান্তি, মারদাঙ্গা, ধুন খারাপী ও শিল্পের কলদন্ডার ধ্বংস সাধন, যা সিট' অনেকদিন ধরেই করে আসছে। বর্তমান সিট' সম্মেলনে যে নীতি ঘোষিত হল তা হুবহু আই, এন্, টি, ইউ, সি'র বহুদিনের অমূল্যত নীতির প্রায় সমান। যদি অমূল্যত হু বহু আগেও এই স্তর প্রচেষ্টার সূত্রপাত হতো, তবে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা প্রায় পক্ষাঘাত ছোট ও মাঝারি শিল্পোজ্জ্বল গুলি সিট'র নির্বম অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেত এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা সবসময় হয়ে উঠত। সি, পি, এম দলের চৈতন্যহীন হল, বাস্তব অবস্থার চাপে পড়ে, কিন্তু এত দেরীতে তা হ'ল এখন সেই নীতি কাঙ্ক্ষিত করতে বহু কার্য বড় পোড়াতে হবে। বিলম্বিত হলেও যে, আসলে বাস্তবকে ধীরে ধীরে জ্যোতিবান্ধা বাধা হয়েছেন—এটাই বেশবাসীর কাছে স্বসংবাদ। এখন অপেক্ষা করে দেখা যাক যে, সিট'র রাজ্য সম্মেলনের বিবোষিত শ্রমিক আন্দোলনের নীতি বাস্তবে কি রূপ নেয় এবং কিভাবে তা প্রযুক্ত হয় জনকল্যাণে।

রাষ্ট্রগুরু শ্বরেঞ্জ নাথের স্মৃতি কথা

[“A Nation In Making” এর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ]

অমরবাক—অধ্যাপক নজিরুজ্জামান দাশগুপ্ত

শাসন সংস্কার ও চরমপন্থী মতবাদের প্রসার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাধারণ নির্বাচনদের প্রাণা আসনগুলি থেকে কতগুলি আগুন বিশেষ অধিকার ভোগীদের জন্ত নিয়ে আসা হয়। আমার মনে হয় কমিটি সাকুলো এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অগ্ররূপ সিদ্ধান্ত করলেন এবং আমাদের বাধা হবই সে নির্দেশ মেনে নিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে স্টেটস চেম্‌স কোর্ড স্বীকারে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত বলে বলতে পারা গেলেও কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শিব সম্মুখাবর্তনের জন্ত আর একটি নির্বাচক মণ্ডলী গঠন করতে হল। যুদ্ধের সময় তারা আঁত উঠ অবদান রেখেছেন, এবং ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতি হুঙ্কারবাহ্য এই সময়প্রিয় মানব গোষ্ঠীর শত্রু দাবীর কাছে কৃতজ্ঞ সরকারকে নতি স্বীকার করতে হইবে। এখানে আমরা এই সত্তাবের একটি নজির পেলাম যে রাষ্ট্রীয় নীতি সব সময় নিজেকে তার সম্ভব ও যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারে না এবং প্রত্যেকটি নীতিকেই তার প্রয়োগের ক্ষেত্রের কথা বিবেচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হতে হয়।

তারপরে আবার প্রশ্ন দেখা দিল বাসস্থান সম্পর্কে। প্রশ্নটি হল : ভোটাধিকার—কেবলমাত্র প্রকৃতই কোন নির্বাচন কেন্দ্রে বসবাস করেন তাদের প্রকৃতই সীমাবদ্ধ থাকবে যাদের নাম ভোটার তালিকায় আছে প্রদেশের এই বকম সমস্ত অধিবাসীকেও সে অধিকার দেওয়া হবে? সরকারী মহলের অভিমত প্রথমটির পক্ষে। ইংল্যান্ডের নীতি

কিন্তু অগ্ররূপ এবং শিক্ষিত ভারতীয়দের মতের সঙ্গে সে নীতির মিল আছে। কেবলমাত্র যিনি প্রকৃতই কোন নির্বাচন কেন্দ্রে বসবাস করেন এই বকম যোগাত্মক ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করে রাখলে কোন নির্বাচন কেন্দ্রে পছন্দ করে নেওয়ার অধিকারকে সংকুচিত করা হয় এবং ফলে ক্ষেত্র বিশেষে তা যোগাত্মক ব্যক্তিরদের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থেকে বাদ দিতে হতে পারে। তাছাড়া আছে নির্বাচন কেন্দ্রের অস্থিরতার কুপ্রাতি এবং তার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে স্থগিত নয় এ বকম নির্বাচক মণ্ডলীর খাম-বেয়াদলীতে হতত ভাল লোকও নির্বাচন থেকে বাদ পড়ে যেতে পারেন। এইভাবে কোন ক্ষেত্রে সর্বদা আবাসিক যোগাত্মক ভাল মানুষকে পরিত্যাগ করে। আবার এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে অনিচ্ছিত আবাসিক যোগাত্মক এমন সমস্ত রাজ্য হইকারী রাজ-নৈতিক ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দিবে যাদের সম্মিলিত নির্বাচন কেন্দ্রের স্বার্থ সম্পর্কে কোন গরজ নেই এবং হতত প্রাদেশিক বিষয়গুলি সম্পর্কেও কোন আগ্রহ নেই। সে বাই তোক স্থানীয় সরকারগুলি যেন সকলেই কোন কোন এক নিয়মের বশেই আবাসিক যোগাত্মক পক্ষপাতী ছিল। এ বিষয় নিয়ে আমার লর্ড রোণাল্ডসে এবং বাংলার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বারদের সঙ্গে মতামত নিয়ে যে ঝগড়া বিতণ্ডা হইছিল, তা আমার বেশ মনে আছে। তারা সকলেই আমার বিরোধিতা

করেন। লর্ড সাউথবোর্ড এং ভারতীয় সপ্তগুণ অস্ত্র মত পোষণ করেন এবং অবশেষে সেই মতই চাভিয়ে যায়। বাংলার নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি বিধানের আবাসিক যোগাতার স্থান রাখা হয়নি। অস্ত্র কয়েকটি প্রদেশের ক্ষেত্রে তা সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়।

১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে আমি সাউথ বোর্ড কমিটির সপ্তগুণে বোম্বে পরিদর্শনে যাই। কিছুদিন পূর্বে নাগপুরে বহুবর মিঃ ডালভি আমার কাছ থেকে এক প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন যে আমি দাদাভাই নৌরজীর প্রতিশ্রুতির আবরণ উন্মোচন করব। এলকিনষ্টোন কলগেজের ছাত্রগণের দেওয়া অর্থে এই প্রতিশ্রুতি নির্মাণ করা হয়। এই সময় আমাকে আমার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হয়। অনুষ্ঠানটি হয় ইউনিভার্সিটি কনভোকেশন হলে। হলটি এই কাজের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ বিস্তারিত লোক সমাগম হয়। তাদের মধ্যে অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রিন্সিপাল কন্সার্নটন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। আমি সভায় বেশ একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করি। অবশ্য সেই বিষয় এই ক্ষুদ্র কথার বর্ণনা করার স্থান নেই, তবে সেই বক্তৃতার মধ্যে এমন একটি বিষয় ছিল যা হয়ত ভারতীয় রাজনীতিকদের কাছে একটা স্থায়ী আগ্রহের বিষয় বলে মনে হতে পারে এবং যে বিষয়টি অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কীয় বিতর্কের পুরোভাগে এসে পড়েছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই, বিশেষ করে ভারতে, যেখানে জনসাধারণ অত্যন্ত আবেগ প্রবণ এবং যেখানে শাসনতান্ত্রিক সংবিধান সর্বোচ্চ রচিত হলেও আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সংঘাত হচ্ছে একটা চিরন্তন ব্যাপার। এই সংঘাত, এই দ্বন্দ্ব বলে পল্লঙ্গ হয়ে চলতে থাকে যে পর্যন্ত না আদর্শ ও

বাস্তবের মধ্যে মিলনসাধনের জন্য একটা যুক্তিসঙ্গত মনোভাব গড়ে ওঠে। ভারীকালের ভাগা ভাগের উপর স্তব্ধ সেই উন্নয়নের কাছে এই প্রকৃতি অস্ত্র সমস্ত প্রবন্ধে ছাপিয়ে উঠে বড় হয়ে দেখা দেওয়ার প্রহর। পশ্চিম ভারতের যুবজনের এক বড় সমাবেশ এখানে পাল্টি। এখানে তাদের কাছে এবিষয়ে আমি যা বলেছিলাম তা হল এই :

“ভাই মহোদয়গণ! আদর্শবাদ অতি ভাল জিনিস। আমি একজন অতি উৎসাহী আদর্শবাদী লোক! বর্তমানকে নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। অসন্তোষ যদি সংঘত ও নিরন্তর হয় তা হলে তা হয় সর্বোৎকৃষ্ট। আমরা সকলেই এই উজ্জ্বলতর বৃহত্তর এবং অধিকতর গৌরবময় ভবিষ্যতের জন্য আকুলভাবে অপেক্ষা করছি। সেই নতুন দিনের আবির্ভাব কালের স্বচনাক্রমে উদার আলোকের প্রায় সূর্য্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এই প্রাচীন পৃথিবী যেখানে বৈদিক ধর্মগণ আমাদের পবিত্র নদীতে সঙ্গীতের মূর্ত্ত্যায় সব প্রথমে শৈশব মানব সমাজের ঐতিহাসিক আদর্শবাদের আঙ্গিকে জাগ্রত করে তুলে ছিলেন সেই ভূখণ্ডে শীঘ্রই স্বাধীনতার নতুন সূর্য্য তার উজ্জল প্রভা ও তাপ বিস্তার করবে। আজ আমরা সকলে সেই সূর্য্যকে অভিবাদন জ্ঞাপন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। দাদাভাই এবং আরও অনেকে সেই মহত্তম আদর্শের প্রেরণার কাজ করে গেছেন। এই মহান দিনটির আবির্ভাবের জন্য বিপুল শ্রম স্বীকার করেছেন। আমরা যেন সেই আদর্শের মূল্যকে লম্বা করে না দেবি। সেই আদর্শ কল্পনামূলক প্রতি আবেদন করে, দৃষ্টব্যকে জাগ্রত করে, কর্ম শক্তিকে সতেজ করে তোলে। কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবকে এক যাবতীয় এনে তাদের মধ্যে এক সামগ্রিক মিলনের একাত্মতানে গড়ে তুলতে হবে।

ভাদেয় মধ্যে কোন বিচ্ছেদ ঘটলে চলবে না। আদর্শকে অবশ্যই বাস্তবের অনুসরণ করে চলতে হবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার শাসন তাকে যেনে নিতেই হবে। ক্রমে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘিরে অবিস্থিত গতিতে উন্নতিসাধন করে আদর্শকে লাভ করার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে বা মানুষের ব্যবহারিক জগতে হঠাৎ বিপর্যয় বলে কিছু নেই। বিবর্তনই হচ্ছে জীবনের ও ঘটনার নিয়ম। আমাদের পারিপার্শ্বিক এখন যে রূপ আছে তাকে সে অবস্থা থেকে উন্নত ও বিকশিত করতে হবে, এবং তা করতে হবে ধাপে ধাপে, সফল সফল, যে পর্যন্ত না বর্তমান প্রজন্মের আদর্শ বাদ পরজন্মে বাস্তব হয়ে ওঠে। দাদাভাই নৌরজির জীবন থেকে আমরা সেই শিক্ষাই লাভ করি। স্বাধীনতা সঙ্গীতের মতো গিয়ে কলকাতায় কংগ্রেস মঞ্চ থেকে তিনি বলেছিলেন যে একটা জাতিগত শুদ্ধ করতে হবে, ক্রমে সেই শুদ্ধ থেকে

স্বাধীনতার পূর্ণ আইন সভা গড়ে উঠবে। শুধু একটা জাতিগত শুদ্ধ করতেই হবে, উন্নতিও অবশ্যই হবে, ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে এবং পরে হবে স্বাধীনতার পূর্ণ পরিপূর্ণতা।”

এই বক্তব্যই ছিল আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ রাজ-নৈতিক শিক্ষাগুরুব চিন্তা, আর আমাদের জীবনের আদর্শ তাই। আমার বৌবনেই আমি সে ভাব গড়ে তুলেছি। আমার পরিণত বয়সে আমি তাকে লালন পালন করেছি আর এখন এই জীবন সফল্য তাকে আঁকড়ে ধরে আছি। আমার এ প্রভাব আমার দীর্ঘ কালীন অভিজ্ঞতা লক্ষ্য। টেনিসনের রচনার কয়েকটি লাইনে যে শিক্ষা আছে, তা আমি নিবিষ্ট ভাবে অনুসরণ করে চলেছি। সে শিক্ষা হল মহান শৃঙ্খলা, ক্রমশঃ এবং নিয়মিত বিকাশ বিরামহীন এবং তাড়াহুড়ো বটে। তিনি বলেছেন—“বুল তাড়াহুড়ো হচ্ছে বিলগেরই “বৈমাত্রেয় ভগিনী।”

(চলবে)

বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চাট্টাধাধ্যায় জন্মশতবর্ষ উৎসব কমিটি, উত্তরপাড়া।

সংবাদ নিবেদন,

বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষ উৎসব কমিটি নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে বৎসরব্যাপী অমরেন্দ্রনাথের বিপ্লবী কর্মধারা স্মরণের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। আগামী ১লা জুলাই ১৯৮০ তারিখে বিপ্লবী জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে।

সমিতির একান্ত ইচ্ছা যে আগামী ২২শে জুন, রবিবার তাহার জন্মস্থান উত্তরপাড়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মহান সমাবেশ দ্বারা উৎসবের প্রাক্ সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

উক্ত দিবসে প্রাতঃ ১০ ঘটিকায় উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ প্রোগ্রাম সভাকক্ষে সমবেত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মেলন এবং অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় এক জনসভার অনুষ্ঠানে আপনাকে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আশা করি আমাদের এই বিনীত আমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ করিবেন। ইতি—৮ই জুন ১৯৮০

ভবধীর

কাশী বন্দোপাধ্যায় ও অনিল চক্রবর্তী

দৃষ্টি-সম্পাদক

পূর্ণাত্মের প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু হইলে অনুগ্রহপূর্বক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে পূর্বে জানাইয়া রাখিত করিবেন।

ভারতে তৃতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক বিপ্লবী সূর্যসেনের বাণী

জন্ম : ১৮৯২

কালী : ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৯৩৪

(প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল হতে ১৯৩৫ ইং ভারতশাসন আইন অনুযায়ী বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নির্ধারিত প্রতিনিধিদের নিয়ে মহাদল গঠন পর্যন্ত সময়কে ভারতে তৃতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম কাল বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে, এ পর্বে ভারতে সশস্ত্র সংগ্রামের সংগঠনে ও অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের মানদণ্ডে বিপ্লবী মহানায়ক সূর্যসেন অনন্য ।

জাতীয় স্বাধীনতা লাভের ৫৩ বছর পরেও দেশ ও দেশ এবং স্বরাজ্য, অসহনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন । দেশের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ কোথাও দলগত, কোথাও গোষ্ঠীগত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থকে, পদস্থ পদবি বিবাহমান । শেষের শ্রেণী ও তাদের পক্ষ পুটাজিত উচ্চ কুল, উচ্চ মান ও উচ্চ বৃত্তগণ নিরস্ত, নিরক্ষর ও নিঃশ্রম জনগণের উপর শাসন ও শোষণের চাক। নির্ধারিত অবিবাহিত চালিয়ে থাকে । শ্রেণী হীন ভাষা বর্ণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার 'সোনালী স্বপ্ন' মাত্র । গণমুক্তি স্বপ্ন পরাহত । পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আশঙ্ক। হয় সাধা ভারত বাণী 'তমসাজ্ঞা যুগের' আবির্ভাব বেশী দূরে নয় ।

এই পরিবেশে মহানায়ক সূর্য সেনের বাণী মুক্তি সংগ্রামের পথিকদের বৈপ্লবিক চরিত্র গঠনের সহায়ক হবে এই আশায় এই সংকলন । বাণীগুলি অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম (অনন্তসিং বিপ্লবী সূর্যসেন (গণেশ ঘোষ) ; চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী (আনন্দ গুপ্ত) ; চট্টগ্রাম অস্ত্রাধার লুণ্ঠন (চাকবিকাশ দত্ত) বীর বিপ্লবী সূর্যসেন (নিরঞ্জন সেন) ; জিলের সশস্ত্র অস্ত্রাধার (আশা দাস) ও মচীন্দ্রনাথ গুহ

সম্পাদিত চট্টগ্রাম বিপ্লবের বক্তৃতি, বিপ্লব তীর্থ চট্টগ্রাম সংকলিত 'সূর্যসেন স্মৃতি' এবং চট্টগ্রাম সশস্ত্র অস্ত্রাধার সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯৮০) 'স্মরণিকা' হতে সংকলিত ।—সংকলক)

'রামমুর্তি আর দেশপ্রেম কি এক ? দেশকর্মী হতে হলে মনকে আগে প্রস্তুত করতে হবে—শুধু শারীরিক শক্তিরই যথেষ্ট নহে ।'

বৃকের উপর হাত রেখে ভেবে দেখ—কতখানি তোমার মনের 'শক্তি' । মনে কর, পুলিশ তোমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করছে—পারবে তুমি ঠোট বন্ধ করে রাখতে ? ভাল করে ভেবে বল—দেশের ক্ষত্র, বিপ্লবের ক্ষত্র কতখানি 'তাগ' স্বীকার করতে পারবে ? যুদ্ধের নির্দেশে পারবে তুমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে, শাসকের সঙ্গ। রক্ত চক্ষুর অস্ত্রাধার দিনের পর দিন অনাহার অনিদ্রায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ।

কিছুতেই ডাকাতির পন্থা অবলম্বন করা হবে না ।...দলের প্রত্যেকের আপন আপন স্বজনদের কাছে হতে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করা হবে ।

দেখ, দলের কাজ করবি ঠিকই কিন্তু লেখাপড়ায় কাকি দিস না । অন্ধ থাকলে শত্রু চিনতে পারবে কি করে ?

'চিরকালের ক্ষত্র আমরা নিশ্চয় হবে যাব । আমাদের ভবিষ্যত দেশের কি হবে তা দেখার বা জানার কোন উপায় আমাদের থাকবে না । হী জীবন বড় মধুর মনেই নেই, কিন্তু, দেশের ক্ষত্র প্রাণ দেওয়া আরো মধুর ।

আমার মনে হয় প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধির অভাবেই (wont of realisation of our goal) আমরা পিছিয়ে আছি। (১৯২২-২৩ সালের উক্তি)।

কি ক্ষমতা আছে আমার নেতা হবার? কি অধিকার আছে? যে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী তাকে খেচ্চার রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে যাবো। বিপ্লবের স্বার্থে, দলের স্বার্থে সকলের ওপরে সেখানে স্থান নেই। স্থান নেই আত্মপ্রাণের—স্বার্থপরতার।

সারাদিন সাইকেলে ঘুরে সব সমস্তদের সঙ্গে বোগাযোগ রাখতে আমি পারি না। তাদের গণ্ডাম ও মৃদুরাতি নিকা দেওয়া কিংবা বস্ত্রিঃ মৃদুংসু শেখানো—তাও আমার ক্ষমতার বাইরে। দলের ক্ষমতা সামান্য হয়েকটি বই কিনবার টাকা দরকার হলেও আমাকে নির্ভর করতে হয় তাদের বা নির্ভলবাবুর উপর। এই অবস্থার এতটা অসহায়তা আমার কি দলপতি হয়ে বসে থাকার উচিত? এতে আমার ক্ষতি, তাদের ক্ষতি। আর সবচেয়ে বড় কথা দলের ক্ষতি। কারণ দলের মধ্যে যদি উপযুক্ত নেতা না থাকে, শুধু সাক্ষিরে দেখাবার ক্ষমতা একজন নেতার প্রয়োজন হয়, তবে সেই দলের মৃত্যু অনিবার্য। যদি আমার অবোগাতা সবেও চক্ষু লজ্জার খাতিরে আমাকে নেতা বলে মেনে। তবে সে নেতৃত্ব আমাকে বিন্দুমাত্র আনন্দ দেবে না। এরকম সাক্ষানো নেতা হতে আমি চণা বোধ করি। তাই বলছি...বাই হোক একটা কিছু ঠিক কর। আমাকে রেহাই দে।...

আত্মগোপন অবস্থার ক্ষমতা নয়, শত্রুকে আক্রমণে বিলম্ব করার ক্ষমতা।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর মৃত্যু কি ভাবে হওয়া উচিত? কাগজে লিখলেন—suicide, surrender, hanging with bold statement—প্রথম দুটি শব্দ তিনি বায়ে বায়ে কাটালেন,

এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। Escape করার সম্ভাবনা থাকলে নিশ্চয় গুলি ছুঁড়ে পলা করে নেওয়ার চেষ্টা করত। সমানাসামান গুলি বিনিময়ে আমাকে হত্যা করার সুযোগ আমি দিব না। গুলি খেয়ে মরার চেয়ে কামিস মঞ্চে গাড়িয়ে স্বাধীনতার জয়গান করে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

আমি প্রদুর্ভা চাকীর দ্বারা মৃত্যুবরণ পছন্দ করি নাই : ক্ষুদ্রিয়াম বসুর মতো মৃত্যু কামনা করি।

ইংরেজের যে বিচারালয়ে এরা বিচারের প্রহসন করে থাকে, সেই বিচারালয়কে ব্যবহার করা হবে বৈষম্যিক কার্যকলাপ প্রচারের স্থান হিসাবে। মৃত্যুর আগে আরেকটা আশ্রয় করে যাওয়াই সংগ্রামীদের কর্তব্য।

আমি সবাইকে মায়ের বুক হতে ছিনিয়ে এনেছি। অনেক মৃত্যুবরণ করেছে, তোমাদেরকেও মরতে হবে—এই অবস্থার আমার সেরে যাওয়া শোভা পায় না। অধিকন্তু বিদেশে গিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য বিনেশীদের কি সাহায্য লাভ করা সম্ভব? মৃত্যুরা আমার এখন তাদের সবার সাথে থেকে প্রাণ দেওয়াটাই কর্তব্য। বহু নেতা তো বিদেশে গেছেন, তারা সেখানে সাধারণ প্রচেষ্টা ছাড়া স্বদেশের জন্য বিশেষ কোন প্রত্যাক কাজ করতে পারেন নি। (আত্মরক্ষার প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে)

১৮ই এপ্রিলকে তুলিস না, তুলিস না সংগঠন, সমসাহস ও ধাণ-বিসর্জনই স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ।

খুব আনন্দ হচ্ছে, বন্য রক্তপাতে দরকারী টেলিফোন ভবন ধ্বংস করার নজির ভারতের ইতিহাসে কণাকবে দেখা থাকবে।

আমাদের দেশের গোয়েন্দা বা পুলিশ হল আমাদের পরাধীনতার অভিযাপ। যে কোন

পরাধীন দেশে এ রকম সেনাপ্রহরীর অভাব হয় না। দেশবাসী গোয়েন্দার উপর কোন প্রতিশোধ নিঃসর না। যদি তারা আমাদের পথের বাধারূপ না হয়। আমাদের প্রধান শত্রু হ'ল আমাদের স্বাধীনতা হননকারী ব্রিটিশ। তাদের কোন ক্ষমা করা না।

কংগ্রেসের মনোনয়নে জরী হওয়া আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তি সর্বশক্তি করে বিপ্লবীদের শোভা পায় না। এই সামাজিক শব্দকে সামাজিকভাবেই দেখতে হবে—উপেক্ষা করতে হবে। বিপ্লবী ঘৃষ্ণির প্রভাবে আশা করি আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট বিচ্ছাদিত থেকে বিরত করবে। আমার অনুরোধ আপনারা সবাই খব শব্দভাবে একুশি বাড়ী কি র যান।

সুধেন্দ্র ব্রহ্ম আমি কারুর চাইতে কম অনুভব করিনি। কিন্তু আমরা কি শুধু দলাদলির আখ্যাত্তি সংঘর্ষে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করব। ইংরেজ তো তাই চায়। আমরা যদি আসল সংগ্রামে ভুলে গিয়ে নকল সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ি ইংরেজ তো তা হ'লেই সব চাইতে খুশি হয়।

নারী বিপ্লবীদের ঐ সংগঠন (দীপালী সংঘ) যে কোন বিপ্লবীদল দ্বারাও পরিচালিত হোক না কেন ঢাকার থাকাকালে ঐ মেয়েদের কার্যকলাপের সঙ্গে যদি প্রীতিভিত্তিক যুক্ত থাকে তবে তার ফলে নিজের উন্নতিই হবে। সব বিপ্লবীদের লক্ষ্য যখন দেশের স্বাধীনতা প্রকৃষ্টি তখন ঐ মেয়ে বিপ্লবীর সঙ্গে কাজ করা ও শিক্ষা গ্রহণ কিছুতেই গোবের হতে পারে না।

তোমার, আমার আমাদের সকলেরই মধ্যেই দায়িত্ব আছে। এক বিপ্লবী দলের বিরুদ্ধে অন্য বিপ্লবী দল এ কলঙ্কিত অধ্যায়ের স্বনিকতা টেনে দিতে হবে। আমাদের সবাইকে শপথ নিতে হবে

বগড়া-কাঁটি নিজেদের মধ্যে নয়, বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে।

অবিশ্বাস কাহাকেও করিও না। কিন্তু অপ্রয়োজনে সংবাদ দিয়ে কাহাকেও অবিশ্বাসী হওয়ার সুযোগও দিতে নাই।

বাংলার বীর যুবকের অভাব নেই। বাংলার থেকে কালারপোল পর্যন্ত এদের দৃষ্ট অভিযানে দেশের মাটি বার বার বীর যুবকদের রক্তে সিক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মারের জাতি শক্তি থেলা ক্ষেত্রে—ইতিহাসের সে অধ্যায় আজো অলিখিত রয়ে গেছে। তোমার (প্রীতিভিত্তিক) সাক্ষ্য বা আখ্যানে সে অধ্যায় রচিত হয়ে চলুক—এই আমি চাই।

ইংরেজ জাদুক, বিপ্লবগণ অলোকন করুক—এদেশের মেয়েরাও স্বাধীনতার যুদ্ধের পঙ্কজে রয়েছে।

আমাদের পথও হিংসার নয়। নীতির হংস। গান্ধীজীকেও আপনারা রেহাই দেন না।

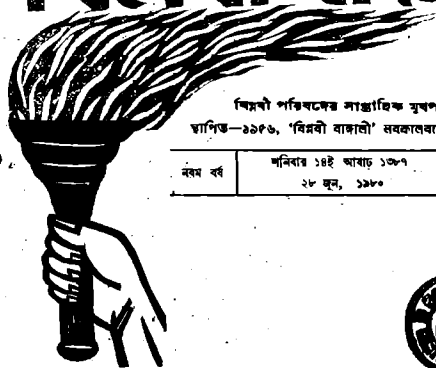
(গান্ধীজীর অহিংস পথে গেলেন না কেন প্রেমের উত্তর)

কাছের টাকা তো কাছের জুতাই। সে টাকা-তো আমি খরচ করতে পারিনি। আমাদের আদর্শ হচ্ছে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া। (নিজস্ব অর্থভাবে ২ দিন অনাহারে থাকার কৈফিয়ৎ)

জম্বাই যখন মৃত্যু তো অনিবার্য। মরবই যখন তখন সার্থক মৃত্যু বরণই শ্রেয়, নয় কি? কোটি কোটি মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের পথে যে মৃত্যু আসবে তাই আমরা বরণ করব।

যে আদর্শকে নিজের মন থেকে স্বীকার করতে পারবে না তা কখনো মানবে না, এমন কি আমি বললেও।

বিশ্ববী বাংলা



বিশ্ববী পত্রিকার সাপ্তাহিক যুবপত্র
 স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিশ্ববী বাঙালী' সবকালেবাব—১৯৭১

নবম বর্ষ	শনিবার ১৪ই আষাঢ় ১৩৮৭ ২৮ জুন, ১৯৮০	৪০ সংখ্যা
----------	---------------------------------------	-----------



We speak of many things parrot-like, but never do them ; speaking and not doing has become a habit with us. What is the cause of that ? Physical weakness. This sort of weak-brain is not able to do anything. We must strengthen it. First of all, our youngmen must be strong.

—Swami Vivekananda.

বিষ দাঁত ভেঙ্গ দিতে হবে

আসামের পর ত্রিপুরার যে নারকীরটনা ঘটে গেল, তার তুলনা বাইরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেই। এই দুই রাজ্যের ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম করলে দেখা যাবে একটি অঙ্কটির পরিপূরক। লক্ষ্য একই—বাস্তবালী নিধন ও ভারতের একা ও হস্তি বিনষ্ট করে একদল দেশদ্রোহীদের আলাদা খণ্ড রাজ্য স্থাপন করার প্রয়াস। আসামের কল্যাণটাই যে তারা সন্নিহিত অঞ্চলে একই প্রকারের আন্দোলনের পথ প্রদর্শক ও প্রেরণা সকারক। দীর্ঘদিন আসামের আন্দোলনের মোকাবিলা না করার ফলশ্রুতিই হল একই প্রকারের আন্দোলনবৃত্তি করার আশঙ্কা ও দুঃসাহস পেয়েছে দেশের শত্রুরা। তাজব ব্যাপার হল এই যে একদল রাজনৈতিক নেতা ও গোষ্ঠী এই আন্দোলনের কুফল ও ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা না করেই আসামের আন্দোলনকে শাস্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিদগ্ধ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। ত্রিপুরার ঘটনাবলীর পরও কি তাদের জানচক্ষু খুলবে না তারা উপজাতিদের কাজ কর্মকে সমর্থন জানাবে ?

আসামে তামানীশ্বন সরকারের যত্ন ও কর্মচাট্রীরা শুধু ব্যর্থতার পরিচয়ই দেন নি, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনকারীদের সাহায্যও করেছে। ত্রিপুরাতেও দেখা যাচ্ছে দেশানকার সরকার তুলনীতি অনুসরণ করছেন এবং সমরমত যথার্থ ব্যবস্থা নেবার যোগ্যতা দেখাতে পারেন নি। ১৯৭৮ সালে স্বাধীন ত্রিপুরার গঠনের ডাক দেওয়ার পরই মিজোরাম থেকে দেশী বন্দুক তৈরী করার লক্ষ্য কারিগর আসে। তাদের কাছ থেকে স্থানীয় উগ্রপন্থী যুবকেরা বন্দুক তৈরী পদ্ধতি শিখে রাখে। দীর্ঘদিন ধরে তারা প্রস্তুত হয়েছে। সমরমত রাতের অন্ধকারে তারা বন্দুক ও অস্ত্রাশ্রয় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের লক্ষ্যের দিকে। এগুলিকে প্রথম দিকে ডাকাতি বলে অভিহিত করলেও ঘটনাবলীর পেছনে ডাকাতি করার কোন 'মোটিভ' পুলিশের কাছে স্বীকৃত নয়। হামলাকারীরা আক্রমণের সময় টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেয় নি। দেখা গেছে, হত্যার উদ্দেশ্য নিবেরই আসে, আক্রমণ চালায় আবার চলে যায়। এদেরই বিশেষ কোন দলনেতার বিরুদ্ধে আনীত মামলা হলে নিয়েছেন সরকার কোন বৃত্তিতে ? উপজাতিদের হাত করে ত্রিপুরায় নিরুপলব্ধ প্রতিকারের কথা কি স্মরণ করায় ক্ষমতা ? অনেকে অনেক বক্তব্যের স্বপ্ন দেখে। এখানে কি সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলকে 'লালে লাল' করে দেবার স্বপ্নে এতই বিভোর ছিলেন যে বিপদ কোন দিক থেকে আসছে, সে ব্যর্থতা পর্যন্ত স্বাভাবিক পায়নি ওপানকার রাজনৈতিক দল ও তাদের প্রতিষ্ঠিত সরকার ? এই ব্যর্থতা, এই অপদার্থতার কি কোন ক্ষমা থাকতে পারে ? সদগরি পৃথিবীর সম্রাট হবার বাসনা থাকতে পারে অনেকেরই, কিন্তু সেজন্য যে যোগ্যতা

বুদ্ধিমত্তা ও লক্ষ্যতার প্রয়োজন হয়, সেটাও বোঝা হওয়া উচিত। অল্পখ্যাত শোচনীয় বার্ষিকতাই হয় তার চরম পরিণতি। যে অশোভন আগ্রহ যি এক চক্ষু হরিণের মত কংগ্রেস (ই) ও আমবা বাকালী' দলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, ও কিছুটাও যদি উপজাতিদের সংগঠনের প্রতি নিবদ্ধ রাখতেন তবে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটা পারত না এবং সরকার বার্ষিকতার গ্লানি থেকে রেহাই পেতেন।

ত্রিপুরা সরকার বলছেন যে তারা এসব কোন খবর পান নি এবং সে মোবটো কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপাতে চাইছেন। এমন একটাসাম্প্যস খুঁজি খাড়া করতে চাইছেন তাদের দলের নেতারা। ত্রিপুরা সরকারকে লোভমুক্ত হাতে গিয়ে, তাদের ভীষণ বিপাকে ফেলছেন তাদের দলের নেতারা, আর্মি এটা প্রমাণিত হ্য। এদের মধ্যে আবার অনেকই রাজনৈতিক খায়া দিতে চাইছেন বলে অনেক মানুষ মনে করছে।

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার ক্ষমতা দাবী করছেন, তাদের বক্তব্যটা উড়িয়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হলে শান্তি বিস্তৃত হবে ক্যেখিনি ভবিষ্যৎ দাবী করছেন, এটা কি কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয় দেখাবার কৌশল? যে কোন সম্বন্ধে এই শোচনীয় অপদার্থতার পর, সরকার নিজ থেকেই পদত্যাগ করতেন। হুঁজুয়াড়দের এ দেশে দৃষ্টি এসে ছিনিয়ে না নিলে বা কেউ ঘাড় ধরে নামিয়ে না দিলে, কেউ মজ্জীভ ত্যাগ ক্য না। শান্তি কি বস্তিত্ব হয়েছে? লক্ষ লক্ষা মানুষ গৃহ হারা হয়েছে, গ্রামকে গ্রাম ভস্মীভূত হয়েছে, হাঙ্গার হাঙ্গার মানুষ খুন হয়েছেন, এতেও যদি শান্তি বিস্তৃত না হয়ে থাকে, তবে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করলে নতুন করে আর কি করে শান্তি বিস্তৃত হবে! এসব ক'কা আওয়াজ তুলে ত্রিপুরা সরকারকে আরো অপদস্থ হতে হবে। ত্রিপুরার এবং দেশের অসীম ক্ষতি হবে। কেন্দ্র জো পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার কোন পরিকল্পনা তাদের এখনাই। তবে অবস্থা যদি আরওের বাইরে চলে যায় আবারও, তখন কি কয়েক জন বিশেষ দলীয় নেতাদের খুশী করার ক্ষমতা কেন্দ্র সরকারকে বসাতলে ডুবিয়ে দেবে? বাগাড়ানার জাগ করে, বর্তীত ফুল প্রতি সংশোধন করার ক্ষমতা সেটে না হলে, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মন করেন যে কারো কারো পক্ষে ত্রিপুরাই হবে ওয়াটারলু যুদ্ধ নেপোলিয়নের অবস্থার মত।

পাশলের প্রেলাপ, অল্প দলীয় নেতাদের প্রসঙ্গভক্তার কাণ দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের প্রেরণ কর্তন হচ্ছে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষের পুনর্বাসতি করা এবং বিভেদকাষী দেশদ্রোহীদের বিকলিত ভেঙ্গে দেওয়া। এমন শিক্ষা এদের দিতে হবে যার ফলে দেশের কোন স্থানে আর কেউ কোন দিন জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিলুপ্ত করে দেশের চরম সর্বনাশ করার স্পর্ধা দেখতে না পারে। একাজ বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই করতে হবে কারণ এই সমস্তা শুধু মাত্র ত্রিপুরাই নয়। এ সমস্তা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের, তথা সারা ভারতের।

সঞ্জয় গান্ধীর অকাল প্রয়াণ

বিগত ২৭শে জুন অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য দিয়ে সঞ্জয় গান্ধীর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। ঘটনাটি মর্মান্তিক বলে অভিহিত করেছেন সকলেই নানাবিধ কারণে। তার এটি অন্ততম যে সঞ্জয় গান্ধী মৃত্যুবরণ করেছেন খুব কম বয়সে। সব মৃত্যুই বেদনাদায়ক। তবে বেদনার গভীরতা আরো বেশী অমূল্য হ্রস্ব যখন সেটা ঘটে অকালে। অবশ্য একটা সাঙ্খ্যনাদায়ক প্রবাদ আছে। Whom the God loves, died young. ভগবানের স্নেহ ব্যাধ পক্ষ, তারা যৌবনেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সঞ্জয় গান্ধী ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি বলে কিছু লোক মনে করলেও, সঞ্জয়ের যৌবনেচিত্র প্রাণ চাকলা, বিপদকালে অমর্য সাহস ও ধৈর্য্য, স্ব-শক্তির উপর তার বিরাট প্রভাব, কঠোর শ্রমশীলতা, সাংগঠনিক প্রতিভা, নৈরাত্ন বিজয়ী নিষ্ঠা ও অন্ত্যস্ত সদগুণাবলীর জন্য তাকে একজন বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে মনে করতেন তার শত্রুমিত্র সকলেই। দেশের বহুলোক মনে করেন যে তিনি নিজের মতটা অস্ত্রায় করেছেন, তার তুলনায় তার উপর অস্ত্রায় করা হয়েছে অনেক বেশী। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে পথ পরিষ্কার করে। সঞ্জয় তার নিজের প্রতিভা প্রমাণিত করার যখন সুযোগ পেয়েছিলেন, তখনই মৃত্যু, এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সুযোগের সম্ভাবহার করার সমর্থও তিনি পেলেন না, এটাই বহু ও নিরপেক্ষজনদের ব্যথিত করে তুলেছে।

কংগ্রেস সংগঠনের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সঞ্জয় কেবলমাত্র সংগঠনের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন! কংগ্রেস অমুসলিমী তার উপর অনেক ভরসা করে দিন গুনছিলেন। কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হল। বিশেষ করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের একটি নতুন দিশস্ত খুলে দেবার সম্ভাবনা একটু দূর পরাহত হল।

শ্রীমতী গান্ধীকে অনেক কষ্ট কষ্ট স্তন্যে হয়েচে। কালের বিচারে সভ্যসভা নির্ভাবিত হবার পূর্বেই সঞ্জয়কে চলে যেতে হল বলে তার আঘাতটা আরো গুরুত্বপূর্ণ হল। কিন্তু দেশবাসী বিশ্বাস আছে যে তিনি তার হারানো সমস্তকে কোটা কোটা হুকের মধ্যে খুঁজে পাবেন এবং তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনার নিমুক্ত থেকে সঞ্জয়ের আত্মার ও নিজের শান্তি লাভের পথ প্রদর্শন করবেন।

আমরা প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর আত্মার শান্তি কামনা করি ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তার পরিবার পরিজনকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

ঈশ্বরের প্রতিশোধ

—বীরেন দে

(১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে আগষ্ট মাসের শেষের দিকে আবেহিকার মিউইংলণ্ডের একটি ছোট শান্ত শহরে হার্বিকার আবির্ভাব ও সম্ভাব্য এক বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেছিল ।)

প্রভু ব্লেচেন, 'প্রতিশোধ নেব আমি, প্রতিফল দেব' 'মহাশয়স আলচে। এই পৃথিবীতে তোমাদের ঈষ্টানরা লগ্যার কর । সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশও নয়। চেষ্টা শেষ লক্ষ লক্ষ চীনাদের দিকে, ঈশ্বরের হাতিয়ার হিসেবে তাহাই নেবে এর প্রতিশোধ। তাহাই তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। আর একবার চলবে এগ অতিথান ।' তারপর একটু দৃষ্টি হেঁসে বললেন, 'তারা সমগ্র ইউরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কোন কিছুই অস্তিত্ব রাখবেনা। নাকী, পুতল, শিশু সব ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীতে নেমে আসবে আবার এক অদ্ভুত-বৃষ্ণ ।' একথা বলবার সময় তাঁর গলায় সব এত বিষম হয়েছিল যে, তা অবশ্যম্ভাব্য। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমি—আমি কিছুই গ্রাহ্য করিনা। এই লালস্রুণ থেকে পৃথিবী আরও ভালভাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু মহাশয়স আলচে। ঈশ্বরের প্রতিশোধ ও অভিযান নেমে আসতে আর দেরী নেই'।

সকলেই প্রশ্ন করলেন, 'শীগগিরই কি এই অভিযান নেমে আসবে? 'এতহাজার বৎসরের মধ্যে এ ঘটনা ঘটবে।' পিপস আসার দূর শুনে তারা স্বতন্ত্র নিঃশ্বাস ফেললেন।

হার্বিকী বলতে লাগলেন, 'ঈশ্বর এই অস্ত্রের প্রতিশোধ নেবেনই। আপনারা ধর্মের মধ্যে রাজনীতির মধ্যে হরতো তা যেমতে পান্থেন না। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর সন্ধান করতে হবে। ধারাবাহিক এমনই ঘটছে: ভবিষ্যতেও এমনই ঘটবে। আপনারা যদি জরুরপক্ষে অত্যাচার ও পীড়ন করেন, তবে তার জন্য আপনাদের দুঃখ ভোগ করতেই হবে। চেষ্টা দেখুননা তারতের দিকে, কি করে ঈশ্বর আমাদের কানের প্রতিশোধ নিচ্ছেন। তারতের ইতিহাসে যেখা যায়, অতীতে যারা ধনী-দামী, তারা ধন-মৌলত বাড়াবার জন্য ধর্মকে নিশেধণ করেছে, তাদের প্রতি অকণ্ঠ অত্যাচার করেছে। দুর্ভাগ্য জনের কাছা তাদের কানে পৌঁছানি। তারা ধন অর্থের জন্য হাটাকার করতে, তখন ধনীরা তাদের সোনারপায় ধালার অগ্রগ্রহণ করেছে। তারপরই ঈশ্বরের প্রতিশোধরূপে এল মূলদানদারী, এদের কেটে ৮'৮ চূড়ি করলে ঐ তরবারির আঘাতে তারা তাদের উপর লুটী হল। তারপর বহুকাল ও বহুবছর ধরে তারত বারবার বিজিত হয়েছে এবং দর্শনেবে এসেছে ইংরেজ। বর্তমান তাতে এসেছে, তার মধ্যে দলচেষ্টা খাটান হ'ল এই ইংরেজ। তারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে যেমতে পান্থেন, 'হিন্দুজা যেনে গেছে অশুভ মন্দির, মূলদানদারী হুম্বর হুম্বর প্রাণালি। আর ইংরেজরা? দুপীড়িত দ্রাবির ভাষা যেতল—আর কিছু নয়। তবুও ঈশ্বর আমাদের দয়া করেন নি কারণ আমাদের প্রতি কোন দয়া-দয়তা দেখাইনি। আমাদের সেনাদারীরা তাদের নিষ্ঠুরতার সমগ্র

স্বাভাবিক নিচে টেনে এনে দানিয়েছে। তারপর বদল তাদের প্রয়োজন হ'ল জনসাধারণের, তখন জনসাধারণ কোন কষাট বটলনা তাদের সাহায্য করার। ইতিহাস ইংরেজের কৃতকার্ণের প্রতিশোধ নেবেই। আমাদের গ্রামে গ্রামে—থেকে থেকে সাহস দৃষ্টিক মরছে, তখন ইংরেজরা আমাদের পলায় পা দিয়ে টিপে ধরছে, আমাদের শেষ বকটুই তাগা নিজ তৃষ্ণার গর পান করে নিচ্ছে, আমাদের শেষের কোটি কোটি টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান দিয়েছে। চীনারাই আশ তার প্রতিশোধ নেবে—তারের উপর কাঁপিয়ে পড়ে।—কেন না, ইতিমধ্যে তাদের আফিংএর দেশে কেটে যাচ্ছে, আমরা জাতির মেনা থেকে মুক্ত না হলেও (মহা) দেখতেকণ।) আজ যদি চীনারা কেগে ওঠে ও ইংরেজকে সমুদ্রে ঠেলে দেয়, বা তাদের উচিত প্রাণা—তাহলে সুবিচারই হবে।

তারপর তাঁর সব বলা হলে তিনি চুপ গইলেন। অসংখ্য জনগণের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে চাপা গুরুত্ব উঠল : তিনি সব শুনলেন, বাইরে থেকে মনে হ'ল যেন তান গিলেন না। উপরের দিকে চেয়ে আঁতে আঁতে বলতে লাগলেন, 'নিব!' 'নিব!' (স্বাধীনতার দাবী ও রক্তা, ১০ম খণ্ড।)

অপর্যবেক প্রসঙ্গতঃ স্বাধীনতাই তাদের এও উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রদায় দাক, সাম্প্রদায়িকতা ঘূর হউক। সাম্প্রদায়িকতার ভগ্নতের কিছু উন্নতি হবেনা, কিন্তু সম্প্রদায় বা থাকলে অগৎ চলতে পারে না। বহুদিন বহু বাকবে, ততদিনই অগতের অস্তিত্ব। যে দেশে সকলকেই এক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা হয়, সে দেশ ক্রমে ধর্মহীন হয়ে উঠায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের দহিত আচ্ছন্নভাবে ভিত্তি ধর্মহীনত সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রণয়োগ্য হতে পারে না। আরও বিশেষ, খৃষ্টিয়ান ধর্মত ও তথাকথিত সাহায্যী রাষ্ট্রেও কখন কবে যেখানেই বর্তমানিক সে এর শ্রমাদ মিলে তার হবেনা।

অগতের অবপ্রদায় গুটির বিশ্লেষণ করে তিনি বললেন, যে রহমৈনতিক পদ্ধতি আমরা ভারতে আনতে চাই, ইউরোপে বহুদাল দাবৎ তা রয়েছে, বহু পদ্ধতি হয়ে তা পরীক্ষিত হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে তা অসম্পূর্ণ; রহমৈনতিক শাসনতন্ত্র-সংশ্লিষ্ট বহু প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি ও এই ধরনের অনেক কিছুই প্রয়োজন সাধনে অসমর্থ বলে একের পর এক পরিত্যক্ত হয়েছে; ইউরোপে চলল হয়ে রয়েছে, কোন পথে বাবে ঠিক করতে পারছেন। তৎকালীন সাহায্য মানবজাতিকে শাসন করার চেষ্টা করা বুঝা ও সম্পূর্ণ অবহীন। যেহেতু পাওয়ার দায় যে সব কেন্দ্র থেকে এইভাবে গৃহের জোরে শাসন করার চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল, সে সব কেন্দ্রই অবনতি ও হীনমশা ঘটতে সর্বোত্তর, সে শুধোই আগে ভেঙে ভাঙো হয়ে গেছে। অসম্পূর্ণ বিকাশকর্ম যদি তার অবস্থার পরিবর্তন সাধনে যথোপযোগ্য না হবে, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে সরে এসে আধ্যাত্মিক-ভুক্ত কৌশলের ভিত্তি করে না দাঁড়ায়, তা হলে আগামী লক্ষ্য বহুরের ক্ষেত্রে সে ভেঙে চূর্ণকার হয়ে যাবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্য নয় কি।

বিষয়ের ভিত্তি-মধ্য যে বহু আকাঙ্ক্ষিত সৌখ নির্ধারণের স্বপ্ন দেখছে সে বিষয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে স্বাধী নির্বেকানক লিখেছেন (১৯৭৭), একমাত্র বোলাই সে সৌখের সার্বজনীন ও গুণিতগত ভিত্তি পড়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু ভারতীয়-কীম্বদন্তে তার বোলাতায় নিঃসঙ্গর প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পূর্বে অগৎ যোগ্যের নিজের পুনর্নির্দেশের কাণ্ডে যোগ্যের দাতাগুলি গ্রহণ করতে পারছেন। কাজেই বৈদ্যাত্মিক সাম্প্রদায়িক অসম্পূর্ণত পক্ষি অবলম্বনে ভারতের ঐক্যসাধনের পথ যেহেই দাড়া একাত্তই অবতরণি, অগতের মুক্তি সাধনের পথে সৌম্যে

হবে। হিন্দুসমাজ এই শক্তির অন্তর্নিহিত প্রজাব্যবস্থার জীবনে প্রয়োগ করতে পারলেই অগ্নি আশ্রিত হয়েই বোম্বারের আত্মশ্রমসাধের আধুনিক সভ্যতাকে ঢেলে পাথরে উড়ানো হবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের চতুর্দিকে সম্মুখেই দুঃখের ও দুঃখটানা লক্ষ্য হবে এড. ডি. ওয়েলস্‌'এর 'OUTLINE OF HISTORY' গ্রন্থের অপ্রত্যক্ষ শব্দে কয়েকটি কথা দ্বারা প্রত্যক্ষ শব্দে কয়েকটি — আমাদের সমুদ্র বিস্তারিত ভেতর থেকে একটা বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক পুনর্জাগরণ, একটি স্বাধীনতা-আন্দোলন পাঠে, যাঁর সঙ্গে আসবে সবলতা, আসবে বিভিন্ন জাতির লোকবিশ্বকে, ঐতিহ্যের দিক থেকে আশ্রিত-বিজিত বলে প্রতীত লোকবিশ্বকে অগণিতাধিনিবেদিত একটা সাধারণ ও স্বাধীন জীবনযাত্রার মন্দির তৈরি হবে। দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট ও শোচনীয়তার সঙ্গে বিজিত অস্বাভাবিক শব্দে বহন হ'লেও, হিন্দুস্তান অধিনিবেদিত জীবনযাত্রার আশ্রিত প্রচণ্ড বড়ো আশ্রিত জীবনের উপর দিয়ে অধিনিবেদিত হয়ে যেতে পারে, তার বেগে ব্যক্তিগত জীবনের সব স্বাধীনতা, সব স্বাধীন উন্নয়ন করে দিয়ে, এবং বর্তমান অবস্থার মুখে যা বহন করা ও কষ্টসাধ্য বলে মনে হচ্ছে, — সে বহন অনেক কষ্টকে সহ্য ও সহ্য করে তুলে। এ ধারণার অধিনিবেদিত আশ্রিত কখনো সাড়িঘরে হয়না। জাতির সম্মুখেই সমস্ত আশ্রিতাধিনিবেদিত প্রথম আসে যাতেই চোখের মত নিঃশব্দে, আর তার পর হঠাৎ একদিন দেখা যায় সে হয়ে উঠেই মহাশক্তিমান ও অগ্নিআশ্রিত। তাই মনে হচ্ছে: যার আশ্রিত মুখে গেছে। আশ্রিত প্রবীণ স্বদেশাভিমানীরা লম্বাই আমাদের প্রতিশোধ নয় প্রতিশোধের মনোভাব নিয়ে আসেন। তাদের প্রবেশ করি। তবেই তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ হবে।

স্বাধীনতা পেটের ব্যথা, অসুস্থ, অসুস্থ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলস্রাব

আমলা হাত বুঝারো!

অসুস্থবেদনায় মনে ভেতর ... সুস্থতা ও ...

ব্যক্তিগত ... স্বাধীনতা ...

ভারত বিশ্বব্রহ্ম আন্দোলনের ইতিহাস

॥ স্বীকৃত দৃষ্ট ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)



তুরস্ক সম্রাটের পলায়নের পরেই কামাল পাশা তুরস্ককে বিপ্লবিক বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। প্রথম দিকে মূলতঃনের এক আত্মীয়কে বলিকা পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু পরে কামাল পাশা এই পদটি একেবারেই তুলে নেন। ফলে মুসলিম জনগণ আর কোন বলিকা বহন না! একদিকে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও জনগণ থেকে লোপ পেল। ভারতের পক্ষে আর একটি কুফল ফগলো এই যে ভারতীয় মুসলমানগণ যাদের লক্ষা ছিল বলিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁরা জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেলেন। ঘন ঘন হিন্দু মুসলমান বিরোধই ভারতীয় জনতার মধ্যে ক্রমাগতই প্রকল আকার ধারণ করতে লাগল। ১৯০১ সালে ইংল্যান্ডের যুবরাজ যখন ভারত ভ্রমণে আসেন তখনই প্রথমে বেঙ্গাই শহরে দাঙ্গা হয়। এর পরে ১৯২২ সালে মহরমের সময় মূলতঃনে এক দাঙ্গার বহু হিন্দু মুসলমান নিহত হয়। পর বছর বাংলাদেশে ও পাঞ্জাবে দাঙ্গা শুরু হয় এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। শাসক বৃটিশ শক্তি এই পারস্পরিক হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে এবং এরই পটভূমি হিসাবে ১৯৪৭ সালে তারা ভারত বিভাগ করে এক ভাগ হিন্দুর হাতে এবং আর এক ভাগ মুসলমানের হাতে দিয়ে ভারত ভাগ করে চলে যায়।

গান্ধী আন্দোলনের আরও কয়েকটি দোষ-ত্রুটি ছিল। এর সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এ আন্দোলনে অহিংসার উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানবর্ধক গুণ কোন গুণ নয়। ইহা মানুষকে মহৎ করে না। কোন মহৎ কার্য এর দ্বারা সম্পাদিত হয় না। গান্ধীজী যদি শুধু মানব সুখি সুযোগের দিক থেকে অহিংসার পথ অবলম্বন করতেন তাহলে এটা এত মারাত্মক হয়ে উঠত না। কিন্তু গান্ধীজী তা না করে স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীনতার চেয়ে অহিংসার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই জন্যই সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষেই অহিংসা নীতি একটা মারাত্মক ত্রুটি হয়ে ধাঁড়িয়ে ছিল। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা এই আন্দোলনের সম্পর্কেই এসেছিল। তিনি তা উপেক্ষা করে চলেছিলেন। কিন্তু সে দাঙ্গার মধ্যে হিংসা কম ছিল না। মোপলা বিদ্রোহও এই আন্দোলনের অঙ্গ ছিল। এইগুলি গান্ধীজী উপেক্ষা করতে পারলেন না চৌবিত্তোরার সামান্য একটা ঘটনা। গান্ধী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল আন্দোলনের যৌথ দাবি না থাকা। সম্পূর্ণ

দাবিত্য ভার একমাত্র গান্ধীজীর উপর অর্পণ করা হয়ে ছিল। কোন সমস্তা নিয়েই বিচার বিবেচনা এবং আলোচনার সুযোগ ছিল না। গান্ধীজী নিজে যখন বেকশ্ব বুঝেছেন সেইরূপই সমস্তার সমর্থন করেছেন। আন্দোলনের প্রথম দিকে নিরস্তর জনতাকে যখন স্তম্ভভাবে পরিচালনা করা উচিত ছিল তখন তা না করে তাদের মধ্যে উদ্বাদনা সৃষ্টির জন্তই হ' মাসে স্বরাজ ন মাসে স্বরাজ বলেই নিরস্তর জনতাকে উত্তেজিত করা হয়েছিল। এমন কি স্বরাজ কথাটির অস্থানিহিত অর্থও তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

এই সমস্ত কারণেই পুলিশবাবু এই আন্দোলনের প্রতি বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন। আন্দোলনের সম্মুখীন সম্পর্কে তাঁর গভীর সন্দেহ ছিল। কিন্তু পুলিশবাবুর তরুণ সহকর্মীরা গান্ধী আন্দোলনের এই সমস্ত দোষ ক্রটি ভেবে-চিন্তে দেখেননি। তাঁরা গান্ধী আন্দোলনের গণ-সংগ্রামের দিকটাই দেখেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন গান্ধী আন্দোলনে সমগ্র দেশ উদ্বাদ হয়ে চুটেছে। সুতরাং এ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে গেলে অমূল্যীয় সমিতি জনতার নিকট অপ্রিয় হবে। তাই পুলিশবাবুর গান্ধী-বিরোধিতা তাঁরা সম্পূর্ণভাবে যেনে নিতে পারেননি। পুলিশবাবুর তরুণ সহকর্মীরা দেখেননি কিছুদিন আগে সকলভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়ে গিয়েছে। সে আন্দোলন অহিংস ছিল না। তবুও সে আন্দোলনে উদ্বাদনা কম ছিল না। অহিংসা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সাফল্যের দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়ায়নি। সরকার পক্ষ হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা সৃষ্টি করে সে আন্দোলনের গতি বোধ করার চেষ্টা করে ছিল। কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যা হোক গান্ধী বিরোধিতা এবং গান্ধী আন্দোলন সমর্থন এই চক্কুর এসে অমূল্যীয় সমিতির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল। পুলিশবাবুর গান্ধী বিরোধিতা এত দৃঢ় ছিল যে তিনি তাঁর তরুণ সহকর্মীদের সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারলেন না। রেহভাজন কর্মীদের ১৫০ প্লাগলি করে পাল্টা দল গঠন করাও তিনি যুক্তিহীন মনে করলেন না। সমিতির কর্মভার সম্পূর্ণভাবে তরুণদের উপরই ছেড়ে দিয়ে তিনি সরে দাঁড়ালেন। এরপরে সমিতির নেতৃত্বভার পড়ল অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সদস্য নরেন্দ্রমোহন সেনের উপর। কিন্তু তিনি এক বঙ্গবরের অধিককাল সমিতি পরিচালনা করেন নাই। অগ্রদূত পড়েই পলত্যাগ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হন। নরেন্দ্রবাবুর পরে মহারাজ রৈলোকা চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী কেশবের দেন, জ্ঞান মজুমদার রমেশ আচার্য এবং রবীন্দ্রমোহন সে সমবেতভাবে অমূল্যীয় সমিতির নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পর্যন্ত অমূল্যীয় সমিতিতে এই বোধ নেতৃত্বই বর্তমান ছিল।

অমূল্যীয়দের নব নেতৃত্ব সমিতির বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য অস্বস্তি রেখে যতদূর সম্ভব কংগ্রেস এবং গান্ধী নীতির সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলতে লাগলেন। গান্ধীজীর আবেদন যেনে নিয়ে তাঁরা অহিংস কর্মনীতি স্থগিত রাখলেন। সংগঠনের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হল। কংগ্রেস নীতির সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলার স্বপ্নে ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, প্রভৃতি জেলার কংগ্রেস নেতৃ

অম্মশীলনের হাতেই এসে গেল। অম্মশীলন জেলায়ও অম্মশীলন সমিতি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে লাগল। অম্মশীলন সমিতির এই সময়কার চিন্তাধারা ছিল এইরূপ :—

গান্ধী নীতির বার্তা এক সময় প্রকাশ হয়ে পড়বেই। ভারতবাসীর কোন আত্মত্যাগেই মুক্ত হয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাবে না। ইতিমধ্যে গান্ধী আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করেই অম্মশীলন সমিতি সমগ্র ভারতে সশস্ত্র গণআন্দোলন গড়ে তুলবে। বিপ্লবী নেতৃজন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ আন্দোলন পরিচালনা করবেন। স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম থাকবে না। বিপ্লবী নেতৃ যদি সংগ্রামের জনতাকে অশস্ত্র সুরবাহা করতে পারে তবে জনতা সে অস্ত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে ধরবেই। অম্মশীলন সমিতির নেতাদের এই ধারণা যে অম্মশীলন ১৯৪২ সালে বাংলাদেশে, মেদিনীপুর এবং উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে তা দেখা গিয়েছে। এগাড়া বোম্বাইয়ে সত্যার অকলে এবং আসামের কয়েকটি স্থানেও জনতা সন্তোষপ্রসূ হয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল।

অম্মশীলন সমিতির ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৮ সাল অবধি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্বের কার্যক্রমে ব্যক্তিগত নরহত্যাও প্রাধান্য লাভ করেছিল। সরকারী গোয়েন্দা কর্মচারী হত্যা, গুপ্তচর হত্যা এবং বিভিন্ন বড়বড় মামলার দ্বারা সরকার প্রবৃত্ত অর্থে প্রলোভনে বিপ্লবীদের বিপক্ষে মিথ্যা অথবা সত্য-মিথ্যা সাক্ষ্যে সাক্ষ্য দিত তাদের হত্যা করাও ছিল এই সময়ের নীতি। প্রকৃত প্রত্যবে সত্যবাদী গভর্ণমেন্ট দ্বারা সাহায্যে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতেন বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণ চলছিল। এ যেন একটা পরোক্ষ সংগ্রাম। এ সংগ্রামে বিপ্লবীরাই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছিল। বিপ্লবীদের এই প্রতি আক্রমণ গমন করতে না পেলেই সরকার বস্ত্রভঙ্গ রহিত করে শেষের জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল। বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম পর্বের মাঝখানে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অম্মশীলন সমিতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু নেতৃত্বে চন্দননগর এবং গদর দলের ও উত্তর ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তায় সামরিক অত্যাচারের একটা চেষ্টা করেছিল। এই চেষ্টাই ছিল ভারতের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রচেষ্টা। এ চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফল হয়। প্রথম পর্বের বিপ্লবী প্রচেষ্টার শেষ অধ্যায়ে ১৯১৬ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংগ্রামে ব্যক্তিগত হত্যা বেশী হয় নাই। পাবনা জেলার সিরাঙ্গাঙ্গে, আসামে গৌহাটীতে এবং ঢাকা শহরের ফলতা বাজারে কয়েকটি বড় বৃদ্ধ বিপ্লবীদের এই সময়ের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য।

এবারে স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্বের ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যক্ত হল। বিপ্লবী সমিতির নূতন কর্মসূচীতে প্রথম স্থান হল ভারতবাসী ব্যাপক সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় সংগ্রাম গড়ার উত্তোষ আয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশে সংগঠন কর্মী পাঠানো হতে লাগল। পূর্বে বিপ্লবী সংগঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হত ডাকাতি করে। তাতে বিপ্লবীদের জনপ্রিয়তা নষ্ট

একটি মৃত্যু—অনেক জীবন

—মলয় ঘোষ

এই ফ্লাইয়েই তাঁর আসার কথা ছিল কলকাতায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সচিবরূপে তাঁর এই প্রথম আগমন ঘটতো পশ্চিমবঙ্গে—যার ক্ষুদ্র অধীর প্রতীক্ষায় ছিল দেশের সব স্তরের কর্মী ও নেতৃশ্রম। সাংগঠনিক দিক দিয়ে যে অপরিমিত বিচক্ষণতার পরিচয় তাঁকে ইমানিং কালের রাজনীতিতে অর্জন করেছিল—যার সঠিক মূল্যায়নে হয়তো একদিন তিনি ভারতবর্ষের প্রধান পুরুষ হতে পারতেন—সেই রাজনৈতিক চরদর্শিতার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটার আগেই আকস্মিক বিমান দুর্ঘটনা ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে—ভারতবর্ষের উদীয়মান যুগেন্দ্রা সমগ্র গান্ধীকে। আশীর দশকের শুরুতে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে পালাবদল ঘটেছিল—যার অগ্রতম প্রধান শরীক ছিলেন সম্রাট, সেই পালাবদল অতঃপর কোন পথে তার পরিণতি লাভ করবে—সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই জন্ম-কন্ডনা শুরু হয়েছে। একটি মৃত্যু যে কতো ব্যাপক ও বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্তি লাভ করতে পারে—এক সমগ্র কৃষ্ণের জনমানস ও রাজনৈতিক জীবনব্যোমের যে কি বিপুল আলোড়ন তুলতে পারে, সম্রাটের মহাপ্রয়াণ তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

রাজনীতিতে সম্রাট গান্ধীর প্রকৃত আবির্ভাব সত্তর দশকের মাঝমাঝি কলা যার। অনেক উত্থান-পতন ও রাজনৈতিক বিভ্রমের প্রাণপুরুষ হিসাবে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৭৫-এর তুনে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আড়িনায়ে যে প্রবল ঝড় শুরু হয়ে যায়, ক্ষতবী অবস্থা জারী ও পরবর্তীকালে ৭৭-এর অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের বিশৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে যে ঝড় এক রূপমুখি দাবল করে, তার অগ্রতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন সম্রাট গান্ধী। মার্কসী প্রকল্পে ও সবিসের দুর্নীতি ও ক্ষতবী অবস্থার বাড়াবাড়ি, নির্বীজকরণ, কিসসা কুসিকা মামলা ইত্যাদি একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত সম্রাট ৭০ দশকের শেষার্ধ্বে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, সংবাদপত্রে, জনসাধারণের আলাপ-আলোচনায় ও বৈদেশিক কৌতুহলের প্রধান স্থান অধিকার করেন। কিন্তু সেই সময় থেকেই কংগ্রেসের যুবশক্তিরা কাছে তিনি প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে সরাসরিতাবে নির্দিষ্ট করে যান—আসামের প্রাণজ্যোতিষপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে যার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটে। সেই অধিবেশনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যোগদান করতে বাধ্য হন—যুব কর্মীরা পালের হাটরা ঝেড়ে নিয়েছে আমাদের হাত থেকে। ভবিষ্যত তাদেরই হাতে। দেশের যুবসমাজের অধিদাবানিত মেটা হিসাবে এই স্বীকৃতি অতঃপর সম্রাট গান্ধীর সামনে নতুন সম্ভাবনার এক দিশজ্ঞকে উন্মোচিত করে দেয়। ইতিমধ্যেই ক্ষতবী অবস্থাকালে ঘোষিত কংগ্রেসের ২০ দফা কর্মসূচীর সঙ্গে তিনি

যে আরও পাঁচ দশক বৃদ্ধ করেন সেই পরিবার কল্যাণ, পণ-প্রাধা বিলোপ, জাতবৈষম্য হ্রাসকরণ, স্ব-
রোপণ ও নিরক্ষরতার অভিযান মোচনের ক্ষমতা তিনি দেশের স্বসমাজকে পূর্ণ শক্তিতে স্বাধিনে পড়তে
আহ্বান জানান। ৭৭-এর নির্বাচনে স্বাভাবিকীয় ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভগ্নাবি হয়,
উত্তরপ্রদেশের রায়েবিলী ও আমেথী কেন্দ্র দুটি থেকে যথাক্রমে শ্রীমতী গান্ধী ও সজয় শোচনীদ্বায়ে
পরাজিত হন। প্রকৃতপক্ষে এই পরাজয়ই সজয়ের কাছে এক নতুন চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দেয়। একজন
জাত স্পোর্টসম্যানের মতোই তিনি বিরাটী দলের বিপুল সাফল্যকে চ্যালেঞ্জ জানান—তাঁর ভাষ্যেচোরা
শত্রুদের সংগঠন নিয়ে। তারপর এক সুসৌখ্য পথ পরিষ্কারের সংগ্রামমুখর ইতিহাস। ৭৭-এর জুন
থেকে ৮০-এর জানুয়ারী—শ্রীমতী এই তিন বছরে অনেক দূরগম গিরি, কাস্তুর মক ছত্তর পারাবারকে
লাভন করে—হুঁশিয়ার নাবিক সজয় সংগঠনকে বিপুল প্রসিদ্ধি আর বিজয় এনে দিয়েছেন। এর মধ্যে
মাতা-পুত্রের বিরুদ্ধে মোট ৪৮টি কামিশন বসানো হয়েছে কাব্যকল্প কতা হয়েছে তাঁদের : অসংখ্য কামীকে
লাভিত ও অত্যাচারিত করে, দলীয় সংগঠনকে চূরনার করে দেওয়ার বড়বড় কেস, মিথ্যা প্রচারণার
অভিধান ঘটবে, অসংখ্য অপমানিত অভিযোগ সাক্ষরে ভারতীয় জনমানস থেকে তাঁদের মুছে ফেলার
সব রকম চেষ্টা করা হয়েছে। সেই চরম সংকটের দিনে স্মৃতিমের কিছু অসুগামী নিয়ে একমাত্র সজয়
ছিলেন অবিচল। কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে তিনি জয় করে এনেছিলেন দ্যস্ত সাম্রাজ্য
শ্রীমতী গান্ধীর বিশাল ইমেজের করেছিলেন পুনঃ প্রতিষ্ঠা। জনতা দলের যে অন্তর্কলহ ও গোষ্ঠিবন্দ
তাঁদের সর্বনাশের পথকে প্রশস্ত করেছিল তাকে তরাণিত করেছিলেন সজয়। ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষার
ক্রমাগত ইচ্ছা দুটি, এক দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে সঙ্গীহান ও বিধি করে ফুলে তিনি যেভাবে
যাত্রা তিন বছরের মধ্যে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটিকে চির-বিক্রিত করে দেন, তাতে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিশক্তি
ও বিচক্ষণতার অনবদ্য প্রকাশ ঘটে। আশীর নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস দলের বিপুল সাফল্য অবশ্যই শ্রীমতী
গান্ধীর নিজস্ব ইমেজের পুন্ড প্রতিষ্ঠা ও আংশিকভাবে বহু বিতর্ক জনতা দলের অকর্মণ্যতার নিট যোগকল।
কিন্তু সমগ্র ঘটনার পেছনে সজয় গান্ধীর অবদান কোন আশে কম নয়।

সজয় ছিলেন গতির প্রতিক, তাঁর মননে ছিল এক পৌরুষদাপু গতিময় অবেশনের হাতছানি।
‘ বাও বাও, শুধু বাও—উদ্যম উদ্যম—কিরে নাহি চাও। এই গতিময়তাই তাঁর কর্ম ও চিন্তার প্রাণ সঞ্চার
করেছিল। বহু জলাতেই জম্বালেয়। ভিড় করে—এবংহমান শ্রোতে থাকে না কোন আবজনার স্থান। গতিময়
ভেতময় অবেশ সপ্তাহার হয়ে সজয় এগিরে নিয়ে গেছেন দলকে, সংগঠনকে ব্যয়েকের ক্ষমতা কিরে ভাকান নি।
এই গতিময়তাই তাঁর প্রতি আকর্ষণ করেছিল দেশের তরুণ প্রাণকে। দেশের হাজার হাজার তরুণ স্বাধিনে
পড়তে চেয়েছিল এক কর্মক্ষেত্র—অস্ত্র আর অপসার্যতার বহুব্রহ্মসংকুল গুংগালীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের
বিতর্কে, দেশকে পঙ্গু করে দেবার অযোগ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে। সজয় তাঁদের পথ দেখিয়েছিলেন, সজয়
তাঁদের শিখিয়েছিলেন কিভাবে মানুষের কাছে যেত হয়—সাধারণের হৃৎ-হৃৎকে ভাগ করে নিতে হয়।
সজয়ের কাছে স্বাভাবিক তাঁর দ্রাবি ছিল না—বেশন ছিল না কোন আভিভ্যাসের অভিমান। বিভিন্ন
সময়সীমার জায়গা জাঁকিয়ে দেন। কথা অসংখ্য। সেই সব সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, নেতা ও

সাধারণ মানুষের সাক্ষ্যই এ সভার প্রধান যেনে। নিজস্ব লক্ষ্যে তিনি অবিলম্বে থাকতে পারতেন—যে গুণটি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর পিতার কাছ থেকে পাওয়া, এবং মাতার কাছ থেকেও। এই একমিষ্ট প্রত্যয় তাঁদের সকল করেছিল। এক বিশাল জাতির ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করে যাওয়ার মহান গৌরবের সমস্ত পূর্ণ অধিকারী।

সমস্ত গাঙ্গীর মৃত্যু ভারতীয় রাজনীতিতে এক বিশাল শূন্য স্থানের সৃষ্টি করবে—এ কথা অবশ্যকর্ষ্য। মৃত্যুকালে প্রধানমন্ত্রী জিন্নাহ গাঙ্গীর পরেই তিনি ছিলেন দেশের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। জাতীয় কংগ্রেসের মূল পরিচালনার দায়িত্বও প্রধানতঃ ছিল তাঁর হাতেই। কংগ্রেসকে অতঃপর তিনি কোন পথে পরিচালিত করতেন, তা অজানাই রয়ে গেল। এবিষয়টি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে কংগ্রেস-নেতৃবাধীনে ভারতের বৃহত্তম যুবসমাজ এক নতুন দিগ্‌দর্শন লাভ করেছিল তাদের এই অবিসংবাদিত নেতার কাছে। এক নবীন কর্মোদ্যমিতা তাদের উদ্দীপিত করেছিল বৃহত্তর কর্তব্যের পথে। এইভাবে হয়তো একদিন জাতীয় কংগ্রেসের সামগ্রিক চরিত্রেই অনেক রংবদল ঘটতো। নতুন প্রজন্মের হাতে রচিত হতো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক নবীন ইতিহাস—আরও গৌরবে, আরও প্রত্যঙ্গদীপ্ত অধেবার। সে সবেরই ইঙ্গিতো-আপাতসমাধি ঘটলো সন্ধ্যার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। আবার নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হবে। সেলে সাক্ষাতে হবে সংগঠনকে—এবং এ দায়িত্ব অতঃপর জিন্নাহ গাঙ্গীর—যিনি একাধারে এখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র নেত্রীরূপে রয়েছেন।

সন্ধ্যার মৃত্যু জিন্নাহ ইন্দিরার কাছে শুধুমাত্র সংগঠনের পথে এক নিদারুণ আঘাত নয়, এ মৃত্যু তাঁর পুত্রশোক—জননীর পক্ষে যার চেয়ে বড়ো শোক আর নেই। তাই এ আঘাত তাঁকে নিঃসন্দেহে দুর্বল করবে, ক্ষয় করে দেবে। তবু তাঁকে সামলে উঠতে হবে। সামলে উঠতে হবে যেকোনো কোটি সম্মানের মুখের দিকে চেয়ে—যাত্রা তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে অনেক আশা আর প্রতীক্ষা নিয়ে। সামনে দ্রুতর কর্তব্যের ধূ ধূ মরুভূমি। এখনও অনেক পথ বাকি, অসংখ্য প্রতিশ্রুতি পালনের অপেক্ষার প্রতীক্ষমান দিনের পর দিন বাবে—মাসের পর মাস, বছর। শোকাভূত ইন্দিরা তাঁর কর্তব্যে অবিলম্বে থেকে এগিয়ে চলেবেন অনির্দিষ্টের পথে—আশাহীন, ভরসাহীন এক কীবন সমাপ্তির লক্ষ্যে। দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০ ঘণ্টা তাঁর কেটে বাবে দেশের কাছে, মানুষের কাছে, বাকি ছ' ঘণ্টার নিকৃষ্ট অবকাশে তিনি মূবোমূখী ঝড়েবেদন নিয়ে, জীবনের—পর্যালোচনা করবেন মৃত্যু সত্তা-ভবিষ্যতের। তখন সেই সব মুহূর্তে সমস্ত এগে ঝাড়েবেদন—ভেগিশ বছরের নবীন তরুণ সমস্ত—মায়েদে সর্ব সমস্তের সঙ্গী, উপদেষ্টা হিঅকাখী, শ্রিত হান্ডো তিনি অভিমন্মন জানাবেদ তাঁর মাকে—দেশজননী ইন্দিরাকে—অসংখ্য আঘাত আর প্রতিশ্রুতায় থকা দিহেও যিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন দেশকে সত্যিকার পথে—পূর্ণতার অভিমুখে।

রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত থেকে]

অম্বুবাসক—অধ্যাপক নগিনীমোহন দাশগুপ্ত

১৯১৯ সালে মডারেট পার্টির ইংল্যান্ডে ডেপুটেশন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯১৯ সালে মডারেট পার্টির ইংল্যান্ডে ডেপুটেশন।

যদি স্মরণে রাখাইব ক্রিষ্টিয়ানিওসিটি প্রকাশিত হল।
আমরা এখন ইংল্যান্ডে মডারেট পার্টির একটি ডেপুটেশন
প্রেরণের ব্যবস্থা করলে সেখানে মডারেট পার্টির প্রথম
সংসদীয় সভাপতিত্বের আমার ভাষণ কতক মাস
আগেই আমি এই ডেপুটেশন প্রেরণের কথা বলেছিলাম,
শাসন সংস্কারের ইতিহাসে এই সময়টা ছিল এটা চরম
যুগ। লর্ড সিমন্টনহাম এবং আরও কতকগুলি লোকের
মত তারতম্যের অধ্যয়ন পথে কিছু লক্ষ্য আছে। তাদের
হাতে খেলবার মত এক গোষ্ঠী ভারতীয় চরমপন্থী লোকও
আছেন যারা এই শাসন সংস্কারে খুশী না হয়ে আরও বেশী
চাচ্ছেন। সমস্ত পরিস্থিতিটাই মহানৈমিত্য ও বিরোধ
বিশৃঙ্খলার পূর্ণ হয়ে গেছে। আমরা অহতব করলাম যে
এই অবস্থায় আমাদের দুই কতক, কতক হলে
একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি বাহিনীকে ইংল্যান্ডে পাঠান
যেখানে তারা শাসন সংস্কারে যতখানি প্ররোচনাও তাকে
সমর্থন জানানো এবং যেখানে তা দৃষ্টান্তগত করা
প্রয়োজন বলে মনে করলে সেখানে সে চরম চাপ দৃষ্টি
করবেন। আমি হলান্ডেই ডেপুটেশনের যাত্রা। আর
যদি লক্ষ্য হলে তাহা হচ্ছে, মিঃ লরী, মিঃ লম্ব, মিঃ
চিভার্লিন, মিঃ কাম্প, মিঃ সি, সি, রাব, মিঃ চেম্বারল্-
মিঃ রিকচেস রাব এবং এগেব লেডিউড প্রেরণ মিঃ কে,
সি, রাব। পরে তার তৎকালীন সঙ্গী আমাদের সঙ্গে
যোগদান করেন। সর্বপ্রথমে ইংল্যান্ডে উপনীত হলেন মিঃ
লম্ব। এটো বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ৫য় পন্থী হল
আমাদের ডেপুটেশন পার্টিতে ছিলেন। কংগ্রেস ডেপুটেশনের
একজন সদস্য ছিলেন মিঃ ল্যাটল। মিঃ হিলকও এখন

ইংল্যান্ডে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখানো ছিলেন ল্যার
গ্যালেটাইন চিরোলের বিরুদ্ধে তার মামলা সংক্রান্ত কাজের
ব্যাপারে। তিনি যেসব ক্রিষ্টিয়ানিওসিটি তার দাবী দেন।
এই দাবী গ্রহণের পূর্বে তিনি মিঃ মট্টের লক্ষ্য দৃষ্টি
বহির্ভূত এবং শাসন সংস্কার সম্পর্কে তিনি যে চরমপন্থী
অভিমত পোষণ করতেন তার এই তত্ত্ব পরিবেশের
আলোকে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা স্মৃতি-স্মৃতি ভাবে
সংশোধিত হয়। বিশেষতঃ শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে
আমাদের কর্মসূচির আলোচনা বৈধ হয়। এই
নেতাদের মধ্যে একজন হলেন কর্ণেল ওয়েল্ডন।
কিছুদিন আগে তিনি শ্রমিক সংস্কারের একজন সদস্য
ছিলেন। এই পরিচালনা বৈধ শ্রমিক সংস্কার বৈধ
ছিলেন বেশী। বিশেষ বিশেষতঃ সবে শ্রমিক নেতাদের
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনিও আর এই অভিমত পোষণ
করেন না যে এই শাসন সংস্কার 'গ্রহণের অবশ্য' অবস্থা
'এর প্রতিষ্ঠার করার মত ও কোন দৃষ্টি এর নেই' তার
এবং আমাদের অভিমতের মধ্যে সাধারণভাবে এটা এক
স্থাপিত হল এবং লক্ষ্যে তিনি আমাদের কাছে একটা
শক্তির তত্ত্ব ওয় দৃষ্টি করেন। একদিন লেডি লুটিনোর
বাড়ীতে একটি বৈদ্যনিক পার্টির অর্ন্তরূপ হল। সেখানে
মিসেস বেলাচ, আমি এবং আরও দুই-একজন ভারতীয়
অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা করি। অষ্টটিটি বেশ আনন্দ-
ময়ক হয়েছিল। সেখানে শাসন সংস্কারের সপক্ষে বেশ
সহায়কতার মনোভাব প্রকাশ পেল। আমি লক্ষ্যমণ্ডলের
পূর্বে লর্ড হাউসের সঙ্গ সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমরা
ভারতীয় পরিস্থিতি ও শাসন সংস্কারের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গাতার
বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনার এই ভবিষ্যৎ

আশা ব্যতীত বন্দেই মনে হল। কথা এসেছে আশি বললাম যে আশাযেব পক্ষীয় লোকেরে শক্তিশালী সাক্ষ্য দাতাপ্রদর্শনেরে তা'দের সাক্ষ্য দান করবেন। লড়াইয়ের ফলাফল হল যে না। তা'দেরই প্রথম সাক্ষ্যদান কথা উচিত হবে এবং তা'র ফলে একটা অস্বাভাবিক মনোভাবের সৃষ্টি হবে। আশি মনে করি তা'র মতই ঠিক ছিল এবং এই মতই গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে প্রথমে লোকের পক্ষীয় সাক্ষ্যদানের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন লড়াইয়ের দিনে ওৎকালে লবধায় তারক সুরকারের অর্থস্বামী পর ছোঁকে বিরোধের ভাবত লরকারে অভিযন্তের প্রতিনিধির করেন।

কমিটির বে কয়েক কয়েকটি সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য বলেছিল সেখানে থেকে নীচের বিকে টেমস নদী দেখা যায় 'কমিটির এই ককটিতে দিনের পর দিন কোঁজুল ও আশা নিয়ে ভাবভীরগণ ভিড় জমাতে থাকেন। তা'দের মধ্যে কিছুসংখ্যক মহিলাও ছিলেন। নানা ধর্মের মানা গোষ্ঠিক

পরিহিত বিভিন্ন ধর্মের এক প্রতিনিধি সমাবেশ সেই কয়েক ঘরত আশ কখনই হয়নি। এ'দের লোকের মনেই ছিল একই চিন্তা একই আশা। সমস্ত তা'রাই যেন এক সূত্র আকারে দেখানে উপস্থিত হয়েছিল। তা'রা সে দেখানে বিশ্বাসিত হয়েছিল তা সূত্র দেখায় আশন উপভোগের ক্ষমতা নয়। দেখানে বা ঘটনো তা'র প্রতি পক্ষীয় আশ্রয় তা'দের দেখানে টেনে নিয়ে গেছে। যখন পরামর্শের জন্য তা'রদের আশা রচনা'র কি নীতি গ্রহণ করা হবে এবং সেই নীতিকে কিতপ অকপটতার সহিত কার্যকর হল যেওতার জন্য অতি প্রয়োজনীয় লবধায়বলী এই সূত্র ককটিতে বিভ্রমে আলোচিত হবে সেই চিন্তা সেই ক্ষমতায় নিয়েই তা'রা দেখানে লবধিত হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে লোকের ভাবভীরে অযোগ্যতা সম্পর্কে লড়াই মিনোহা য় ইচ্ছা তা বলতে পারেন, চরমবর্তীরা শাসন সংস্কারকে একেবারে মূল্যহীন বলে উচ্চিয়ে দিতে পারেন।

(চলবে)

(৯ এর পাতার পর)

হচ্ছিল। একসময় নতুন পর্বের প্রস্তাবিত জাকতি একেবারেই পরিত্যক্ত হল। তার পরিবর্তে 'পতীক'-মূলকভাবে টাকা জাল করে অসুশীলন সমিতির ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা হল। নেতৃত্ব মনে করলেন এ ব্যবস্থায় সরকারী মুদ্রা ব্যবস্থার উপরেও একটা আঘাত পড়বে।

নতুন কর্মসূচী গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই ১৯২৪ সালের প্রথমদিকে মহারাজ জৈলোকা চক্রবর্তী আন্দামান থেকে মুক্তি পেলেন। টাকা জাল করার ব্যবস্থা দেখাশোনার ভার তিনি গ্রহণ করলেন। প্রথমদিকে টাকা এবং তারপরে মধ্যমসিংহ শহরে নোট জাল করা হত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় নানা প্রকার ত্রুটি থাকায় এ ব্যবস্থা সফল হয় নাই। হায়দ্রাবাদ থেকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সরোজিনী নাইডুর পিতা অধ্যায় চট্টোপাধ্যায়কে এনেও এই সমস্ত ত্রুটি দূর করার চেষ্টা হয়। কিন্তু সে চেষ্টার ফলও আশামূলক হয় নাই। শেষ পর্যন্ত নোট জালের কেন্দ্রে টাকা জৈলোর দোনারগাঁও কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়। এখানে নোট জাল করার সময় প্রোধ দাসগুপ্ত এবং শচীন্দ্র চক্রবর্তী নোট জালের প্রেস, ব্রক নোট সহ বসে পড়েন। তা'দের বিরুদ্ধে নোট জালের অভিযোগে ঢাকায় এক মামলা হয়। বিচারে দুজনেই পাঁচ বৎসর করে সশ্রম কারাগারে গণ্ডিত হয়। এরপরে টাকা জাল করার চেষ্টা একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে মহারাজ জৈলোকা চক্রবর্তী বলেন;—“এই জাল নোট দ্বারা গড়পড়ি কতিপয় হয় নাই কতিপয় হইয়াছে দেশের সাধারণ লোক। এই অনিচ্ছাকৃত বন্ধনার জন্য আমরা মনে মনে বেদনা বোধ করিতাম।”

(ক্রমশঃ)

বিপ্লবী পুস্তকমালা

ef30

অনুলীন সমিতির বিপ্লব গ্রন্থাগার—কলকাতা-৭০০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—অবোধ মঙ্গলকায়স্থ—৩০০

কলকাতা—সুখার দত্তের—



- | | |
|------------------------------------|---|
| ১। বাঙ্গালি ঐতিহাস—১৫০ | ২। বিপ্লবীতত্ত্ব ও বিপ্লবীতত্ত্বের প্রভাব—১০০ |
| ৩। অনুলীন সমিতির পি, বিবিসি—২০০ | ৪। দোহাঙ্গী সংগ্রাম কাহিনী—১০০ |
| ৫। কাকোয়ী পর্ব—১০৫ | ৬। কাকোয়ী সংগ্রাম কাহিনী—৪০ |
| ৭। রাসবিহারী ও অনুলীন সমিতি—১০ | ৮। বিপ্লবীতত্ত্বের পর্বের মা ও মেয়ে—১০ |
| ৯। বিপ্লবীতত্ত্ব ও সমাজবাদ—৬০ | ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—৪০ |
| ১১। মহানায়ক ও দ্রাবিড়—৪০ | ১২। গুপ্তচর নবজাগরণ ও গণিত নিবেদিত—১৫ |
| ১৩। দেশ ঘরের ভোজেনি (১)—১০০ | ১৪। দেশ ঘরের ভোজেনি (২)—২০০ |
| ১৫। পর্ব চন্দ্রশেখর আশা—৪০ | ১৬। ১৫ই এপ্রিল জাতীয় পর্বের দিন—১৫ |
| ১৭। হাতিজা হত্যা প্রচেষ্টা—১৫ | ১৮। গুপ্তচর দ্বারা নিহত সংগ্রাম ও ৭—৪০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৪০ | ২০। জাট হত্যা প্রচেষ্টা—১০০ |

আগ্রহণ :—৫০০ বস্ত্র হাট, কলিকাতা-৭০০০০

চলকালী—১/১/১/A বস্ত্র হাট, কলিকাতা-৭০০০০



JUL 1980

— সম্পাদক দত্ত —

অনুলীন চট্টোপাধ্যায় (মতান্তর) অজিতচন্দ্র দত্ত, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক—ঐশ্বরী শর্মা হারচৌধুরী

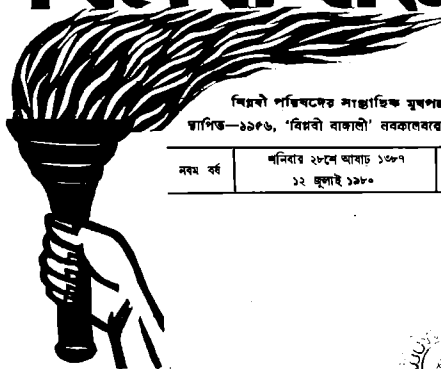
বিপ্লবী বিশেষ প্রতিনিধি—ঐশ্বরী শর্মা হারচৌধুরী

ঐক্যপ্রক ও মুক্ত :—ঐশ্বরী শর্মা হারচৌধুরী

বিপ্লবী বাংলা কাগজ :—৫০০ বস্ত্র হাট, কলিকাতা-৭০০০০

দ্রবণ—ঐশ্বরী শর্মা হারচৌধুরী, ১১৭ নং কেম্পল স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাকালী' নবকালেবাব—১৯৭১

নবম বর্ষ	শনিবার ২৮শে আষাঢ় ১৩৮৭ ১২ জুলাই ১৯৮০	৪২ সংখ্যা
----------	---	-----------



‘স্বদেশের ইতিহাসে বিনি আলোক পান না, তিনি ঐষ্ট।’

—স্বদেশবাসী উপাধ্যায়

জননী জয়ভূমি

বন্দ্র দেখেছিলাম একদিন আমরা—দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন। শরীরের রক্ত দাম আর চোখের জলের বিনিময়ে অর্জন করতে চেয়েছিলাম যা, যাটি, মানুষের বন্ধন মুক্তি। অসংখ্য শহীদেব আত্মত্যাগের মূল্যে বিদেশী শাসনের নাপাশাল থেকে মুক্ত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম আমাদের সাধের মাতৃভূমিকে। আজ প্রসন্ন করার দিন এসেছে। আত্ম-সমালোচনার কঠি পাথরে বাচাই করে দেখার সুদূরত এসেছে—আমরা কি সকল হয়েছি ?

গান্ধীজীর স্বপ্নে ছিল স্বাধীনতা, স্বনির্ভর, স্বরাজ। নেতাজী চেয়েছিলেন স্বরাজ্য, মুখবল, স্বাধীন ভারতবর্ষ। স্মৃতিরাম, শ্রীকান্ত, মহানায়ক বাঘাযতীন, বিনয় বাগল-দিনেশের কল্পনায় রূপলাভ করেছিল এক মহান ঐতিহ্যবাহু ভারতবর্ষ—জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ও দেশপ্রেমের দীপ্তিতে সমৃদ্ধ এক ধ্যানমগ্ন ভূখণ্ড। স্বাধীন ও মহান যে দেশে থাকবে না কোন বৈষম্য, ঘৃণা, অসন্তোষ—মানুষ যেখানে কাছে টেনে নেবে তার প্রতিবেশী মানুষকে—পরম স্নেহে ভালবাসার ; দীর্ঘকালের পরাধীনতার গ্রানিকে মুছিয়ে দিতে, দেশের প্রতিটি মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বলিষ্ঠভাবে ছিনিয়ে নিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করবে একগোত্র, একাঙ্গা হবে। সমগ্র পৃথিবী অবাধ বিচারে তাকিয়ে দেখবে এক আশ্চর্য উত্থানকে, এক মহান সংকল্পের রূপদানে আশোষহীন সংগ্রামকে। বাস্তবে আমরা কি দেখছি। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও এদেশে মিকি মিকি জ্বলছে সাম্প্রদায়িকতা আর বৈষম্য বোধের আভ্রন ; দারিদ্র্য, দুর্নীতি আর শোষণ ক্রুর ক্রুর খাচ্ছে মানুষকে। দেখছি, বৈদেশিক চক্রান্ত আজও অব্যাহত ; মিথ্যা প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে এদেশেরই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কিভাবে হেতে উঠেছে দেশকে ঠুকঠো ঠুকঠো করার সর্বশাসা বেলার। দেখছি, দেশ, জাতি আর সাধারণ মানুষের বার্ষিকে জলাজলী দিয়ে অসংখ্য রাজনৈতিক দল, উপদল ও দলীয় নেতৃবর্গ কিভাবে স্বার্থান্বেষিত হয়ে রত রয়েছে।—জীবন আর জীবিকার সংগ্রামে কি অসহায়ভাবে পরাজিত হয়ে চলেছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ।

দেশ কি শুধুই মাটির। কিছু গাছপালা, পাহাড় পর্বত আর নদীনালায় সমৃদ্ধি এক ভূখণ্ড মাত্র ! দেশ মানুষের। ভালবাসা আর মমতার। এক পবিত্র স্বপ্নের। মানুষ আর মানুষের জীবন নিয়েই দেশের আক্ষরিক ভূপোল। মানুষ যদি নির্গোষ্ঠিত হয়, বঞ্চিত হয়, অপমানিত হয়—দেশ সেখানে ঝাঁচতে পারে না।

হে অর্ঘ্য নয় করীর ! তুমি আমাদের কথা করো। তোমার স্বপ্নের ভারতবর্ষকে আজ আমরা অসম্মান আর হিসোর কালোছাত্রায় ঢেকে দিয়েছি—চারিদিক নাপিনীর বিবিনিঃসঙ্গ আমাদের কর্তৃত্বিত করছে, রুদ্ধ করেছে সভ্যপ্রচারণের কণ্ঠকে ! আমরা স্বাধীন পোষেছি—কিন্তু স্বরাজ লাভ করতে পারিনি।

মিথ্যার বিরুদ্ধে, অজ্ঞার বিরুদ্ধে, দেশপ্রোহিত্যের বিরুদ্ধে, জাতি আর মানুষের কতিপাদনে তৎপর চক্রান্ত জগের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ গর্জে উঠুক। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হোক—আমরা এক, অবিভাজ্য, সংহত। শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা দেশভাগের চক্রান্তকে রুদ্ধকো। ধর্ষিতার মতো নিজের অধিতে বদ্ধ তৈরী করে পৃথিবীর মাঝখানে বিদেশী আর খসেন্দী চক্রান্তকারীদের ; আমাদের জীবন দিয়ে অর্জন করে যাবো দেশবাসীর নিরাপত্তা—তাদের স্বাধীন বন্ধ আর আত্মপ্রেমের মৌলিক অধিকার। এই বীজময়ই হোক আজকের স্বদেশভাবনার উদ্বোধন।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব

আসামসহ সর্বভারতের

বিপ্লবী বাংলায় নবমবর্ষ ২৫ সংখ্যক প্রকাশিত নয়াদিল্লীতে আসাম ও মেঘালয় বিক্ষিপ্ত জৈলিগেসনের নায়ক শ্রী বি. সি. ঘোষের বিবৃতির সারাংশের উপর আমরা মন্তব্য করেছিলাম জাতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে হস্তভাগা উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সর্বভারতের নৈতিক দায়িত্ব আছে। নেতাদের উক্তি স্বরণ করে দেওয়ায় কৃত্ত ফরিয়াদি—(Fariadi, Itkhola, Silchar & Assam) কৃত্ত সংগৃহীত নেতাদের বক্তব্য পুনঃ প্রকাশ করা হল—

(স: বিপ্লবী বাংলা)

Jawahar Lal Nehru

“We think also of our Brethren and Sistets who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily can not share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen and we shall be sharer in their good and ill fortune alike.” (15th August, 1947).

“There is no doubt, of course, that those displaced persons who have come to settle in India are bound to have their citizenship. If the law is inadequate in this respect the law should be changed.”—
June 1967.

Sardar Vallabhbhai Patel

Our hearts naturally go out to those who were of us and with us so long but who are now to be separated. Few can realise the bitterness and sorrow which partition has brought to those who cherished unity, but lived to fashion its details. But let not our brethren across the border feel that they are neglected or forgotten their welfare with

claim our vigilance and we shall follow with abiding interest their future in full hope and confidence that sooner than later we shall again be united in courageous alligiance to our country". (15th August 1947)

Sardar Vallabhbai Patel's message to the convention of East Bengal refugees held in August 1947 under the presidentship Dr. Shyama Prosad Mukherjee.

"We can not full enjoy freedom that we have got until and unless we can share it with the Hindus of North or East Bengal. How can one forget the sufferings and sacrifices which they cheerfully endured for freeing our motherland from foreign domination. Their future welfare must engage the most careful and serious attention of the Government and the people of Indian Union in the light of development that may take hereafter."

Mahatma Gandhi :

"My friends ask whether those who being mortally afraid or otherwise leave Pakistan will get shelter in the Indian Union. My opinion is emphatic on this point. Such refugees should get proper shelter in this Union and vice versa.

The friends again ask as to what will happen about land and buildings, if any, left in Pakistan. I have said repeatedly that the State should pay the present market price of the land and the buildings.— (27th July, 1947)"

পদ্মলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

শ্যামসুন্দর সেন

দুগ্ধাত্ম্য দলের একনিষ্ঠ কর্মী শ্যামসুন্দর সেন গত ২৪শে জুন '৮০ তারিখে কলকাতার পদ্মলোকে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছবোঁট ৮০ বৎসর। সদাশাসী, নিরহংকারী এই বিপ্লবকর্মী ১৯১২ সাল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে একাধিকবার কারাবরণ করেন। তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আমরা তাঁর স্ত্রী ও অসন্তান পরিজনদের সম্বোধনা জানাই।

বাসবিস্তারী ঘোষ

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কৃষক নেতা হাম্মাখারী ঘোষ গত ৭ই জুলাই '৮০ তারিখে আর, জি কর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অমূল্যলীন দলের সঙ্গে যুক্ত এই বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে একাধিকবার কারাবৃত্ত হন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে একজন সক্রিয় কৃষক নেতা হিসাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন, দীর্ঘদিন তিনি ২৪ পরগণা জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। আমরা মৃত আত্মার শান্তি কামনা করি ও পরিজনদের সহানুভূতি জানাই।

অমলী চক্রবর্তী

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী অমলী চক্রবর্তী গত ৩রা জুন '৮০ তারিখে আকস্মিকভাবে পদ্মলোকে গমন করেছেন। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার একজন কর্মী হিসাবে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি কাজ করে গেছেন। অমূল্যলীন দলের সঙ্গে যুক্ত এই বিপ্লবী ১৯৩০-৩২ সালে কারাবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও এক কস্তা রেখে গেছেন। পদ্মলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা তাঁর পুত্র-কস্তাকে আমাদের আন্তরিক সম্বোধনা জ্ঞাপন করি।

সামন্ত চাট্টাঙ্গী

শ্রীমতেন চাট্টাঙ্গী গত ৪/৭/৮০ তারিখে পিঞ্জি হাসপাতালে ৭৪ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি অমূল্যলীন সমিতির ঢাকার শাখায় বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং ঢাকার বিখ্যাত নেতা ডক্টরেডর সেনগুপ্তের পরিচালনার শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কার্য করিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী—একপুত্র ও ৪ কস্তা রেখে গিয়াছেন।

এক মহানকে প্রণাম

—ঐক্যবীকেশ বোষ

আসাম, ত্রিপুরা এবং উত্তরবঙ্গে ঠিক কত হাজার লোক নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় বিনামূল্যে কোন কোন শ্রেণীর সম্ভবস্থ সুচিন্তিত গণহত্যার উন্নয়ন উন্নয়নায় মারা গেছেন, কত শত ব্যক্তির লাস বাংলা-দেশের উপকূলীয় নদীতে ভাসমান দেখা গেছে, কত লক্ষ লোক প্রাণ তরে অস্ত্র পালিয়েছেন কিংবা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ছেন, কত গ্রামের কত বাড়ী আগুনে পুড়েছে এবং কত কোটি টাকার সম্পত্তি ও শস্য বিনষ্ট হয়েছে—তা'র সঠিক হিসাব একমাত্র চিত্তশুদ্ধের স্বর্ণীয় খাতায় আছে। এখানে নারী কণ, শিশু-বৃদ্ধ, অক্ষম-সক্ষম, শিক্ষিত-মূর্খ, কুলীন-বিজ্ঞানী সবাই ঐ নরমেধ যজ্ঞের নির্ধিক অংশভাক! বাঙ্গালী বধে ইচ্ছাছায়া পাঠান-সৈন্ত অভিযান, হিটলারের ইহুদী-নিধন, সারওয়াকীর হিন্দু-হত্যা, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধ-বধকে ঘান ক'রে দিয়েছে এই একপক্ষীয় মুসলিম প্রচেষ্টা। গণনরহস্যার সাম্প্রতিক পাশবিক বীভৎস কৌশল সাবেক সমস্ত ভাণ্ডার নজীরকে অতিক্রম করেছে।

আমাদের বরেন্দ্র এবং ঐচ্ছাহ' নেতৃবৃন্দের এবং পাল'মেন্টের অথবা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের মাননীয় সভ্যদের মূল্যবান ও ব্যয় বহুল পর্যবেক্ষণ অবস্থার বা আভ্যন্তরীণ বাস্তব কি পরিবর্তন ঘটিয়েছে জানি না তবে এই বোমবস্ত্রের বিস্তৃত ও বিনাশকরম ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করি। ঐকান্তিক কামনা করি—সর্ব অস্ত্রের মানবতা বোধের জাগরণ এবং আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সংহতি স্বাক্ষর সম্মানজনক একটা মীমাংসার উপস্থিতি। এই দৃশ্য ঘটে কোন অজ্ঞাত হস্তের কোমল স্পর্শ সবাই অস্বাভাবিক অনুভব ক'রেছেন। এবং আমাদের চিন্তার চিরন্তন দৈন্তে আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্রের নীরব অসহায় পাঠক মাত্র।

পক্ষান্তরে আমরা সেবেছি বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে পাঞ্জাবের অমৃতসরে সমবেত সহস্র জনতার এক সমাবেশে ১৯১৯ সালে ১৩ই এপ্রিল তৎকালীন শাসক জেনারেল মাইকেল ডায়াব ২০ জন সৈন্ত নিয়ে সেই নিরস্ত্র জনগণকে স্থানভ্রাণের কোন আদেশ বা ইঙ্গিত না দিয়েই নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে ৩৭৯ জনকে মারেন। কিছু আহত হন, কিছু লোককে উল্লঙ্ঘন ক'রে উন্মুক্ত রাজপথে বেত্রাঘাত করেন এবং কিছু লোককে হাত-পা মুড়ে চতুর্দিক পশুর মত ইট্টিয়ে 'সরকার সেলাম' নিয়ে ডায়াব এবং ওডায়াব উৎকট আনন্দ উপভোগ করেন। সংবাদ পত্রদিন বিদ্রোহের দ্বারা পরাধীন ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়লো। লোক শোকে মুহমান কিন্তু নিরুপায়। বিদেশী শস্য সৈন্তের মুদ্রিত মুষ্টির শংকর-দৃঢ় কবলে অবলা ভারত কি ক'রে পারে?

কিন্তু শান্তিনিকেতনে এক প্রশান্ত গুরু প্রাণে বৈশাখী পূর্ণিমা মুহমতলে হস্তিয়ার ছায়া ফুটে উঠলো। নিবীড় শান্তির কোলে অশান্ত অন্তরে অনাহারে সমস্ত দিন পারিচরী ক'রে কলিকাতায় এসে সভা-সমিতির

(৮-এর পাতায় দেখুন)

পীঠস্থানে পৈশাচার

—বীরেন দে

ষাট বশকের শেষ প্রান্তে রবীণাসরীষ দৈনিক বহুমতীর পৃষ্ঠায় 'দত্তপানি' "দেশবিভাগের অস্তুরালে" নামক প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে লিখেছেন : কমতা হস্তান্তর পর্ব শেষ হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের গভীর নিশীথে দিল্লীর লালকেল। 'Divide & Rule' এর বস্তা পচা দুর্গদ্বন্দ্বাত নয়তাকে ঢাকতে 'Divide & Dilever এ সূচনা করে। এই কাজটি সম্পন্ন করেন স্বয়ং মাইনট বেটন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ভীত শাবিত তরবারী দ্বারা ভারতবর্ষকে বিলোপ করে একাধিক শতকের শাসন-শোষণকে সঙ্কীর্ণিত রাখতে, তিনি যমুনাতটে ইংরেজের জাতিগত হিংস্র লোলুপতার অর্ঘ্য দিয়ে ব্রাইট-হেরিংস্-কার্ভনের স্মৃতিস্তম্ভ করেন—তাদেরই কমগুণ্ডে রক্ষিত টেমস্ নদীর বারি সিক্তিত করে। পরন্তু 'Commonwealth' নামক সংস্থার তাদের গতপ্রায় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আমাদের 'অংশীদার করেও কৃতার্থ করেছেন। কিন্তু মুক্তাঘচক্রকে সেদিন 'ওয়ার ক্রিমিস্ট্রাল' কলডেও তার বাধেনি। এদেশে তাদের শুণ্ধ্যগ্রাহীদের দ্বারা তাঁকে 'ফুইস্‌লিং' অ্যাখ্যা দিতেও লজ্জা হয়নি। কাজির বিচারে এই নিমক-হারামি নও কি তা আমরা জানিনা, তবে এইহু বলতে পারি যে বিধে ঝিঙা-উধন নামক  দ্বারাও অভাব নেই। মদনলাল বিজো ১৯৪২ সালে কার্ভন উইলিংক মুদ্রাণ্ড দিয়ে বিলেতে ঐশি বান, উধনসি

১৯৪০ সালে বিলেতেই ঐশির রজ্জু গলায় পরেন ও 'ডাঙারকে নিধন করে।

ভগিনী নিবেদিতার জন্মচুমিমাতে বিপ্লবীরাই তাকে ভয়ীকৃত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।—মানবধর্ম অভিন্ন বলে। কেন না ছুনিয়ার বিপ্লবীরা সবাই একই জাতের মানুষ। দেশ বা জাতিভেদ তো একটা নৈসর্গিক কারণ মাত্র। শ্রুতবাং ইহাই ইতিহাসের প্রতিশোধ। বিভ্রমসৃষ্টিকারীর পরিণাম। যদিও সে পরিণামের বিষয়বস্ত্র আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

আজ যে ভারতীয় উপমহাদেশের ঈশান-অগ্নি-নৈঋৎ বায়ু কোনে অশান্তির আগুন জ্বলছে 'Divide & Deliver' এরই ফলশ্রুতি নয় কী? কমতা হস্তান্তরিত করে মানুষের বয়স বাড়ছে। সব কিছু সে এখন বুজি দ্বারা বাচাই করে নিতে চায়। 'মন বলে তুমি আছ ভগবান, চোখ বলে তুমি নাই' এ বিবাদে আজ আর তার মন ভরে না। সে ভগবানকে চাকুস দেখতে চায়। তার শ্রুৎ-শ্রুতের মধ্যেই যদি সে তার ভগবানকে প্রত্যক্ষ না করলে। তবে সে ভগবানে তার কি প্রয়োজন। মনে—তার সংশয় উপস্থিত হয়। নীতিধর্মের প্রতি সে দৃক হোষে ওঠে। সমস্ত সামাজিক কাঠামোটাই তার কাছে ভবন প্রতিপন্ন হয়। যে, সে কোন পাশবিকতাকেই ভবন কুহুরের প্রায় শুকন হাড় চর্চন দ্বারা নিজের যেন-হাংসে নিজেই পলকবরণ করে তৃপ্তি লাভ করে। তার মৌলিক

মানবিক খেয়াল-খুশিকে পর্যন্ত হার মানায়। সর্পা-
যাতের ঝরিতসত্যকেও সে শিছু কেলো যায়। এইরূপ
মনোভাব স্বার্থাঘেদীদের ব্যাঘাত হুট অর্থনৈতিক
বিপর্যয়ের মধ্যেই জন্মলাভ করে।

আজকের সমাজজীবনে এই আচরণ অবিস্মৃত-
রূপে প্রকাশমান। এর মূল কারণই হচ্ছে ভ্রষ্টাচার-
মূলক সাম্প্রদায়িকতা—যার ফলশ্রুতি উচ্ছেদের
সংগ্রাম' হিংস্রাচারী গণবিদ্বেষের অভ্যর্থনা। এ বিষয়ে
আশার বাণী শুনিযেছিলেন বামী বিবেকানন্দ।
আমরা ভ্রষ্টজাতিরা তা অবহেলা করেছি। তিনি
বলেছেন—এমন সময় আসবে যখন শূত্রের প্রাধাত্য
হবে।....যুগ-যুগান্তর শোষণের কলে শূত্রমাত্রই হয়
কুকুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র পশুবৎ কুশংসে।
তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের উপর এতদিন
অভয়চার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ
নেবে। এদের তোরা ছোটলোক ভাবছিস, আর
নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস। জীবনসংগ্রামে
সর্বদা ব্যস্ত থাকতে এতদিন ওদের জ্ঞানোন্মেষ হয়নি।
এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো। একইভাবে
কাজ করে এসেছে, আর বৃদ্ধিমান চতুর লোকেরা
এদের পরিচর্য ও উপার্জনের সারসংক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
কিন্তু আর সেকাল নেই। ইন্তর জাতিরা ক্রমে এই
কথা বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে
দাঁড়িয়ে আপনার স্বাধাগণ। আদায় করতে লুটপ্রাপ্তিজ
হোয়েছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভ্রষ্টজাতেরা
ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। এই জন-
সাধারণ যখন জেগে উঠবে, আর তাদের উপর
ভোদের অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের
ফুংকারে তোরা কোন্‌দায় উড়ে যাবি। তারাই ভোদের
ভিতর সভ্যতা এনে দিয়েছে, তারাই আবার তখন সব

ভেঙ্গে যাবে।—ইহাকেই তিনি বলেছেন ঈশ্বরের
বিধান।

আমরা বাঙ্গালীরাই আমাদের দেশে ইংরেজকে
প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছি। এদের কাঁধে করে পথ
দেখিয়েছি। গ্রাম-গঞ্জে তাদের নিরে গিয়েছি।
সহায়তা করেছি তাদের স্বার্থাঘেদে। বিজয়কেতন
উজ্জীন করতে সাহায্য করেছি সর্বতোভাবে। আমা-
দের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যকে তুলে দিয়েছি তাদেরই
হাতে। উদারতা ও ক্ষমতায় আমাদের কোন্‌দায়ও
কার্পণ্য হয়নি। অবশ্য তার জন্য আমরা প্রায়শ্চিত্তও
করেছি রাজনীতির হস্তা হোয়ে—ইংরেজদের 'ফ্যাক্টমতে
Settle fact কে unsettle করে। আর আজ
দেশবিভাগের বেসারত দিচ্ছি কামরূপের গগনচূর্ণী
পর্বতগারে ত্রুক্ষপুত্রের অববাহিকায় উদাস্তজ্ঞে
পুনঃবিস্তৃত হোয়ে প্রজলিত বৈধনরের লেলিহান
শিখায় ভষ্মীকৃত হোয়ে এবং কুশংস জালিওরনাগো-
বাগের চেয়েও ক্রুর গণহত্যার পাশব নৃত্য মণ্ডলীন
হোয়ে—যাযাবররূপে বাস্তবতার অপরিণামশর্ততায়।
তবে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার একটি মহৎ কাজ করতে
পারেন যদি কতালগুলি সংগ্রহ করে রাখেন দধীচির
শ্রুতিচারণের উদ্দেশ্যে পৈশাচ্যের নিরাকৃতির জন্য।

ভারতে পাঁচকোটি আদিবাসী উপজাতি সমাজের
মধ্যে বিভিন্ন উপসমাজের সংখ্যা চারিশত (এক
একটিতে প্রায় ১,২৫,০০০)। উপভাষার সংখ্যা
চারিশত পঞ্চাশ। ইহাদের অধিকাংশের পক্ষে নিজ
নিজ আকলিক আয়তনের মধ্যেই প্রশাসনিক কাজের
ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা নেই। সুতরাং
বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ অব্যাহত। রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচাররাই
নিজেদের স্বার্থে তাদের উদকানি—সেই ও নাচার।
এবার তাদের বুরবার ও বুঝবার সময় উপস্থিত।

তাই কলহিলাম পাঠস্থানে পৈশাচার আঙ্গ
অশান্তের।

আসলে যে কথা বলতে চাচ্ছি, তা হচ্ছে যে,
একটা অদৃশ্যশক্তি নিরন্তর ক্রিয়া করে চলেছে স্রাব
ও নীতির নিয়মকল্পে। এ নিয়ম লঙ্ঘন করার
করা সাধ্য নেই। আমরা নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং
দেশবিতান্স আমাদেরই কৃত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার
একটা অবিস্তৃত্যবী পরিণতি। আবার আজকের
বিত্ত ও বিচ্ছিন্নতাবোধ বলে উপমহাদেশের চতু-
তোপে বিশেষ করে উঃ পূঃ ভারতে যে ভেসলিকি দেখছি

তাও আমাদের কৃত কর্ণেরই প্রতিকলন। এই
বিক্ষেপণ থেকেই আজ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের
মহানিস্ত উদ্ভাসিত হবে বলেই আমাদের নৃচ
বিশ্বাস।

মহাত্মাতত্তের প্রাচীন নাম ‘জন্ম’ আমরা ‘জন্ম
ভারত’ বলে থাকি! বোলবও চিরদিন। বৈচিত্র্যের
মধ্যে এখানটায়ই আমাদের ঐক্য। এই ঐক্যই আজ
হলধাক্ষম হোতে চলেছে পাঠস্থানে-পৈশাচারের
নিরাকৃতির মধ্য দিয়ে।

(৫ এর পাতার পর)

মাধ্যমে প্রতিবাদ—ধর্ষিকার ধ্বনি তুলবার চেষ্টা কর্ণেন। কিন্তু নেতৃবৃন্দ সেদিন ছিলেন নীরব
ও নিম্পুহ !

বাধা হইবে অন্তর্বেদনায় এবং বিবেকের গংশনে ২৯ শে মে ভাইসরয়ের কাছে এক সুভাবিত
অঙ্করের স-সন্মান বিনম্র ভাবার ঐ তেজবী পুরুষসিংহ মহাভাষা বৃটিশ সরকারের প্রমত্ত ‘স্রাব’ উপাধিটী
কেহণ পাঠিয়ে দিলেন—এ গণহত্যার নীরব প্রতিবাদে ! প্রোগাড মানবতাবোধ, উজল দেশাত্মবোধ এবং
চৈতন্যিক নির্ভিকতার স্বার্থক জীবন্ত প্রতীক ঐ মহামানবটী হলেন—বাল্লজী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর !
সুতরাং পরেও তিনি বরেন্ত এক প্রকার সঙ্গে মরগীর।

নির্দল নিষ্ঠা, প্রোগাড ভক্তি হৃদয়ের সঙ্কিত আন্তরিকতার অর্বাভালি ঠা’র প্রোজ্ঞাল স্বতির
পাদবুলে রেখে অসংখ্য সৌন প্রণাম জানাই !

ত্রাণি সংকেত

—বন্দীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘের গুরু গুরু গর্জন আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যেমন ডমক ধ্বনিত মুখরিত করে মানুষকে বর্ষাঋতুর পূর্বাভাস দেয়। ঠিক তেমনি আজ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে, পশ্চিমে, এবং অন্তান্ত অঞ্চলেও মাদলের ধ্বনি, কাড়া-নাকাড়ার তীব্র আওয়াজ ও অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্ ঝনানি, বিশেষ করে বল্লম—ভীষ ধনুক—ভোজালী ও বন্দুকের প্রদর্শনী বেরূপ চলমান ও গতিশীল দেখা যায়, তাতে আশংকিত হবার বশেষ্ট কারণ আছে বলে আমরা মনে করি। ইতিপূর্বে উপজাতীর হিংস্র মানুষের দল বেতাবে ত্রিপুরার নরহত্যায় মেতে উঠে পৈশাচিক নৃত্য করেছে, তাতে এখানেও যে আদিবাসীরা, খণ্ডজাতীররা ও অন্তর্জরা ঠিক একই অন্তত ইচ্ছিতের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিরীহ দেশবাসীর ক্ষতি সাধনে হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠবে না—একথা হলপ্ করে কেউই বলতে পারবেন না।

এই অবতন ঘটবার চক্রান্তে যারা বহুদিন ধরেই ইকন যুগিয়ে আসছে, তারা এখন বেশ সক্রিয়। মেদিনীপুরের স্বাক্ষগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে উক্ত অন্তত শক্তি ইতিমধ্যেই মাথা চাড়া দিয়েছে। বাঁকুড়ার রাণীবাঁধ ও সম্মিলিত আদিবাসী অধুষিত এলাকাগুলিতে একই মহত্ব চাচ্ছে। ঐ জেলার খালভোড়া, তালডাংরা ও পার্শ্ববর্তী আদিবাসী এলাকাগুলিতেও ঠিক একই অবস্থা।

ঐ সব এলাকার যেন অস্ত্রসজ্জার মরুমু পড়ে। ভীষ-ধনুক, বল্লম ও হৈম্বর প্রকৃতি মাঝপাশ লাগিত হচ্ছে বিপুল উৎসাহ ভরে, যেন শত্রু সংগ্রামে ঐগুলির একান্ত প্রয়োজন এখনই। মেদিনীপুর জেলার আদিবাসীরা, বিশেষ করে লোখা সম্মিলিতের লোকেরা যে নরহত্যায়, লুণ্ঠনে ও অন্তান্ত দৃষ্টান্তে পটু তা পুলিশ রিপোর্ট সাক্ষ্য দেয়। এদের সংঘর্ষে আনবার বহু চেষ্টা হয়েছে বহুদিন ধরে, তবু এরা ঐ সব দৃষ্টান্তে আজও ছাড়তে পারেনি। কোন দৃষ্ট-চক্র যদি ঐ লোখাদের একবার একটু উত্তানি দিয়ে বর জ্বালানীর কাজে বা নরহত্যার কাজে বা লুণ্ঠরাজ্যের কাজে নামিয়ে দেয়, তবে আর দেখতে হবে না।

সারা পশ্চিমবঙ্গকে স্থানানু পরিত্যক্ত করতে ওদের বৈধী সময় লাগবে না। আমাদের কাছে বহু মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রশ্ন করছে যে, বাংলা সরকার বীরকুমার গঙ্গপুত্র সাঙতাল সমাবেশ ঘটিয়ে সাঙতাল বিদ্রোহের নেতা দ্বিধু ও কান্ধুর বীর্য গাথা শুনিয়ে সকলকে বিপদ এক-পত পঁচিশ বর্ষ পূর্বের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে ও তৎসহ এই সরকারভুক্ত অপারেশন বর্গার স্ততিভাষ করে যে কার্যক্রম অনুসরণ করেছেন তাতে ঐ সমাবেশ জমায়ত সাঙতালরা (যার সংখ্যা প্রায়

লক্ষ্যাবিক) অল্প ভবিষ্যতে সংঘবদ্ধ ভাবে বীরচুম্বের স্থানীয় অ-সাঁওতালদের ওপর কোন উৎপাত করবে না তো :

ঘর পোড়া গরু সিংহের মেঘ লেলে উড়ায়, তাই ঐ ভীত সন্ত্রস্ত মানুষদের সামান্য দেবার বা আশ্বাস দেবার কোন ক্ষমতাই কারো নেই। আসামে, মেঘালয়ে, মণিপুরে, মিজোরামে, ত্রিপুরায় ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য এলাকায় হাজার হাজার বাঙ্গালী উপজাতিদের, পাহাড়িয়াদের, খাসিয়ারদের, মিজোরামের, মণিপুরীদের ও অসমীয়াদের হাতে প্রাণ হারতে বাধ্য হয়েছে। আত্মীয়-হারা বাঙ্গালীরা তাই আজ শংকিত উরকারের হঠাৎ সাঁওতাল বিদ্রোহের শরণোৎসর্গে। সরকার যে কক্ষেণে ঐ কাজ করতে সাহসী হলেন তা বড়ই বিশদ্বন্দনক। যদি কোন এর অবটন ফলে না ঘটে তবে ভালই।

স্বয়ং যদি ঐ সরকারী প্রচেষ্টার ফলে দেখা যায় যে বিপ্লবীত অবস্থা স্থিতি হয়েছে, তখন সরকার তথা সি. পি. এম দল এককভাবেই দায়ী হবে বাংলার জনগণের প্রকাশ্য দরবারে, তাদের কৃতকার্যের ক্ষমতা ও অসুস্থগতিতার ক্ষমতা। উপর্যুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বীরচুম্ব, বীকুড়া, পুন্ডলিয়া ও মেনিনীপুর—এই কয়টি জেলার সর্বত্র রাখা একান্ত দরকার। সরকার বহু পূর্বাঙ্কে হুঁশিয়ার না হলে শেষ ত্রিপুরার মত ঘোর দুর্দশা এখানেও হবার সম্ভাবনা থাকবে এবং পরিণামে তা মারাত্মক আকার ধারণ করবে, যা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে বলে বিশেষ আশংকা হয়।

ইতিমধ্যে বাংলা ও বিহার রাজ্যে সীমানা বরাবর কাড়খণ্ড দলের কোলভীল সাঁওতাল, ওয়াও, মুণ্ডা, প্রভৃতি ষণ্ড জাতীয় লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের খানিকটা ও বিহারের খানিকটা এলাকা নিয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কাড়খণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বিপুল উৎসাহে অগ্রসরমান। বিভিন্নতা-বাদের এই উন্মাদি বৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় বহুকাল ধরেই পালামৌ, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, এলাকায় মালচুমি প্রভৃতি এলাকায় দিয়ে আসছিল। বর্তমানে তারা বীকুড়া, পুন্ডলিয়া ও মেনিনীপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও অন্তর্ভুক্ত হস্ত প্রসারিত করেছে এবং বীরচুম্বের যে অংশ চুম্বকার সন্নিকটে সেই সেই অঞ্চলগুলিকেও একই কায়দায় বাংলা থেকে বিভিন্ন করার ক্ষমতা নানা প্রয়োজন দেখিয়ে আদিবাসীদের মন জয় করে তাদের নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধাতে সচেষ্ট দেখা যায়।

সরকারের বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ নিশ্চয় এখনই রাখেন। আদিবাসীরা, উপজাতিরা ও অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্রাভীত কাল থেকে অর্থনৈতিক ছরবছার দিনাতিপাতে বাধ্য হয়েছে, বর্ষ হিন্দুরা ওদের দুঃখ দুর্দশা লাভের ভেতন কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। ফলে বৃষ্টান মিশনারীরা ওদের মধ্যে অর্থ, শিক্ষা ও সভ্যতার বিতরণ করেছে একদিকে এবং অপরদিকে স্বাভাবিক সংরক্ষণ সাহায্য করেছে ও রোগ প্রতিরোধে সক্রিয় ব্যবস্থা নিয়েছে, এমন কি মহামারীর আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে বহু মিশনারী সাহেব প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। মিশনারীদের

সম্পর্কে ওরা প্রায় এক শতাব্দিকাল এসেছে, কলে এই সব মিশনারী বৃষ্টান সাহেবরাই ওদের পরম বন্ধু। সেই বন্ধুত্বই যখন ওদের বে পাখে ঢালায় সেই পাখেই ওরা চলে। ওদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাই বৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বহুদিন বটলি বার্খ এদেশে অক্লান্ত ছিল, ততদিন বৃষ্টাবর্ষে বর্ষাচ্যুত কখন ছিল মিশনারীদের প্রধান কাজ।

সেই বার্খই মিশনারীরা ওদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিত। কুজি বোজগারের পথ খুঁজে দিত উক্ত মিশনারী সম্প্রদায়, বৃষ্টাবর্ষপ্রচারের উদ্দেশ্যেই। ভারত স্বাধীন হবার পর বৃষ্টান মিশনারীরা তাদের বদশেষের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ মানসে ভারতকে সংহতিহীন ও বিভ্রান্তভাবুদ্বী করার গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য—ভারতকে দুর্বল ও শতভা বিচ্ছিন্ন করে রাখা। বিদ্রোহী নাগা নেতা ফিভো, বিদ্রোহী মিজোনেতা লালডেঙ্গা ও বর্ধমানের সন্ত বিদ্রোহের মণিপুর নেতারা সকলেই বিদেশী ও স্থানীয় মিশনারীদের সাহায্য ও সমর্থন পুটে যা ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। ত্রিপুরার উপজাতীয় যুব সমিতিও তাদের নেতারা এই একই পন্থায় বাঙ্গালী নিধনের সলা পরামর্শ ও আয়োজনে সংগ্রহ করেছে বলে সংবাদে প্রকাশ। উত্তর বঙ্গেও বিভ্রান্তভাবাদের ডেউ এসে উপস্থিত হবার উপক্রম। রাজবংশীরাও অপরূপ অমূল্য সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তরবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে থেকে বিভ্রান্তকরার হুমকি দিয়েছে গত মাসাধিককাল পূর্বে। ত্রিপুরার ফের সংবর্ধ শুরু হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। উক্ত অবস্থা পুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করলে একথা স্বতই মনে উদ্ভিত হয় যে, আসামের পুনরাবৃত্তি ঘটবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত এলাকায়, আর পশ্চিমবঙ্গও সেই আগুনের চহন ফালা থেকে বেধে ছড় রেহাই পাবেনা।

পরিস্থিতি ক্রমশ যেরূপ খোঁরাল ও ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেছে দিনের পর দিন, তাতে অনুমান হয় যে, অপ্রত্যাশিত ও অত্যাশনীয় দারুণ বিপদ পশ্চিমবঙ্গের দুকেও বৃষ্টি হঠাৎ নেমে আসছে। এসবের মাঝে হালে অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র মহাশয় যে ত্রৈণী সংগ্রামের পবিত্র কর্ণের ডাক দিয়েছেন গণপুত্রের সাঁওতাল সমাবেশে গত ২২শে জুন তা যদি এখনই পূর্ণোজ্জ্বেল শুরু হবে দ্বায় তবে তো সোনার মোহাগা।

রাজনীতির এই মোক্ষম দাবার চালে সাধারণ মানুষ শুধু নাজে হাল হবে না, আরো বেশী কিছু চরম শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। সি, পি, এম যে অভিসন্ধি নিয়ে সাঁওতাল নেতাদের হাত কববার মন্তব্যে উক্তসমাবেশ বীরকুম জেলায় মহম্মদ বাজার থানার অন্তর্গত গণপুর গ্রামে গত ২১ ও ৩০শে জুন সংগঠিত করলো। তার ফল সূত্রের প্রসারী হতে বাধ্য। এই সমাবেশে সমাগত নিরীহ সাঁওতাল ভাইদের যে হটকারী রাজনীতির তালিম দেয়া হলো, তার প্রতিক্রিয়া অদূর ভবিষ্যতে কি অকৃতরূপ নেবে স্বাস্থ্যক পথ বেছে নেবে তা বলা শক্ত।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ অঙ্কন থেকে]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাসগুপ্ত

১৯১৯ সালে মজারিট পার্টির ইংলণ্ডে ডেপুটিমেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এক দিকের বিষয় ছিল। সে দিকটা খুব তাৎপর্য পূর্ণ ও ব্যাপক। সে তাৎপর্য, সে প্রত্যয় প্রকাশ পাচ্ছে এরূপ মৌনের মধ্যে। মৌন হলেও তা যেন সুবহু হয়ে এই সবাই ঘোষণা করছে যে আমাদের বেশবাহীর স্বাভাবিকতাদের প্রতি উচ্চাঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পালন সংস্কার সম্পর্কে আগ্রহ রয়েছে। যারা সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন এমন সব আইনজীবী যারা অল্প সময়ের জন্য হলেও তাদের প্রচুর ঘোটা উপাঙ্গের সুযোগ ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছিলেন, এমন সমস্ত ব্রিট্যান হিন্দুও অনেক উপস্থিত ছিলেন তারা সামাজিক ও ধর্মীয় ও মান-বাহ্যের সমস্ত ব্যাপার বাবা পান। তারাও বলে বলে সেখানে দিনের পর দিন সেই কমিটি কক্ষে উপস্থিত থেকে লাক্ষ্যমান প্রদান করেন কমিটির যেসব তি রত্ন তাও লক্ষ্য করেন। সমস্ত তারতাই যেন সেখানে উপস্থিত ছিল। আর হুঁয় থেকে লক্ষ লক্ষ প্রত্যানী মন্ত্রণ রত্নবাস আগ্রহে সেই কমিটির কার্য পরিচালনা লক্ষ্য করতে থাকেন।

কমিটি মধ্যে অবশ্যই কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন এম চোরাম্যান লর্ড সেলফোর্ড। তিনিই ছিলেন সেখানে সমস্তের আলনে অবস্থিত, বীর, বীর বর্গাধা যত্নিত ব্যক্তি। প্রত্যেকটি সাক্ষীর প্রতি এবং সব রকম স্বার্থ বিচক্ষিত বিষয়ের প্রতিই ঠাণ্ডা আচরণ করেন। সমস্ত কাজ তিনি নিজস্ব বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী পরিচালনা করেন। আমি স্বীকার করছি, প্রথম দিকে তার বিরুদ্ধে আমার একটা দৃষ্টি ছিল, তিনি ছিলেন বন্ধন আকর্ষণের পণ্ডিত আর এই বন্ধন আকর্ষণ তার তারত বিবোধী নীতির লক্ষ্য প্রত্যেক যখন প্রেমিক ভারতবাসীরাই নরকে হুগুয়ের রত্ন যেনে আছে। তবে এটা সমস্ত যে এটি খারজ পানিত মানব গোষ্ঠীর প্রাণ বিবাবে সেই গোষ্ঠীর অস্বস্তি নীতি সম্পর্ক সমস্তের নিষেধ কোন কিছু করার থাকে না।

তবে রাষ্ট্রের প্রাধিকার সেই রাষ্ট্রের নীতি থেকে আলাদা করে দেখাও একটা কঠিন ব্যাপার। বিচার বিবেচনার ক্রমবদ্ধ সব সময়ই সমস্ত হয় না। কিন্তু ক্রমবদ্ধ তার বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে তারেই তার সামনের সব কিছুকেই কেড়ে নেয়। আমার মনে ভবন এটাও অস্বস্তি ছিল যে এটি আরেট পালিহমেন্টারী কমিটি গঠনের প্রস্তাবটিও তারই চিন্তা প্রসূত। আমার সবলে তার সেই প্রস্তাবকে নিন্দা করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছে আমাদের সেই বিরুদ্ধ মতটা আমার কথা সময়ের আগেই পড়ে তুলেছিলাম। কার্যত তাকেই কমিটি গঠন তারতের স্বার্থের এবং স্বাভাবিকতাসম লাতের পক্ষে অস্বস্তিই হয়েছিল।

চোরাম্যানের পরে কমিটির বিচারী আওতাবীর ব্যক্তি ছিলেন মিঃ মর্টেম। প্রচুরপক্ষে কমিটিটি ছিল তারই কমিটি, এবং প্রকাশ্য সভাসমিতি এম কার্য পরিচালনাকে ওপ বেওয়ারে তারই হাত ছিল বেশী শক্তিশালী। তার জেরা তনেছিল বেশ স্বাধীন ও কলপ্রসূ। এই জেরার সামনে বিরোধী লাক্ষ্যাতাও সংকুচিত হয়ে পড়েন। একজন আইনজীবী সাক্ষ্যলতা সাক্ষ্য বিচ্ছিন্নলেন। তিনি একজন প্রাক্তন ভারতীয় বিচারক। জেরার সম্মুখীন হয়ে তিনি তার স্বতন্ত্র প্রকাশ করে কোনেন। তাঁকে স্বীকার করতে হয় যে তিনি হুঁয় নিজ দেশে ছিলেন, তাই তিনি সমস্ত কাসমপন পড়ে যেখেননি। লর্ড সিং বেশ নিদান অপরিবেছিলেন। তার আগ্রহ-আচরণ ও ব্যবহারী ছিল বেশ বীর, শান্ত ও বর্গাধা-ব্যাপক। তার সাক্ষ্য গ্রহণ ও সাক্ষীদের জেরা করার বরণ ছিল ঠিক নিক্সন পাক আইনজীবীর মত। তার কোন কথাই কোন বোধ-জড়িত ব্যক্তি বাধনি। (জলবে)



cf30 6 JUL 1980

মুগান্তর বিপ্লবী সম্মিলনী

স্বরণ-সভা

প্রিয়বন্ধু,

প্রয়াত বিপ্লবী শ্রামানন্দ সেন, শান্তি সোম, প্রবোধ গুপ্ত, কটিক রায় (নরেশ) বেণু হাসিন্দর, জীভেন মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারজন মিত্র মহম্মদার, অমিত দাশগুপ্ত এবং কুমুদ সেন এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন উপলক্ষে আগামী ১২ই জুলাই/৮০ শনিবার অপরাহ্ন ৪টায় প্রজ্ঞানানন্দ পাঠশ্রুত ভবনে কিরণচন্দ্র হলে (মৌলানার মোড়) স্বরণ। সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই স্মৃতিসভার আপনাদের সম্বন্ধে উপস্থিতি কামনা করি।

ভবনীর

সত্যীজ্জয় সেন

সভাপতি, মুগান্তর বিপ্লবী সম্মিলনী

৫২ নং আচার্য প্রহ্লাদ চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০২



— মধ্যাহ্ন বক্তব্য —

শ্রীমদীন চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅরুণচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুল চ্যাটার্জী :

দপ্যাহক—শ্রীপতি দাল দায়চৌধুরী

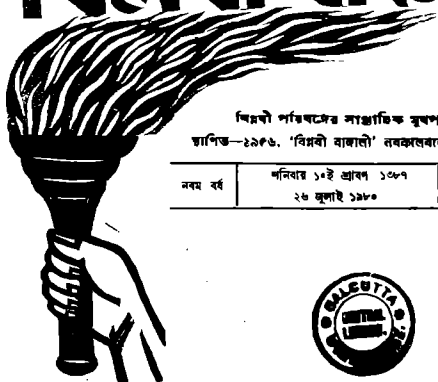
বিজ্ঞাপন কেন্দ্র প্রতিনিধি—শ্রীমদীন বোষ। বেকায়া—শ্রীঅরুণচন্দ্র দাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :- শ্রীঅমল সেনগুপ্ত । প্রচারক—শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন।

বিজ্ঞাপন দালা কার্যালয় :- ৫২ নং বহুতলাস ট্রাট, কলিকাতা-৭০০০০২

মুদ্রক—শ্রীমদীন দায়চৌধুরী, ১১১ নং কেন্দ্র সেন ট্রাট, কলিকাতা-৭০০০০২

বিশ্ববী বাংলা



বিশ্ববী পরিষদের সাপ্তাহিক পুস্তক
 স্থাপিত—১৯৭৬. 'বিশ্ববী বাজালী' নবমালবার—১৯৭৯

নবম বর্ষ	শনিবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ ২৬ জুলাই ১৯৮০	৪৪ সংখ্যা
----------	--	-----------



“পরের উপকার করিয়া কিছু প্রত্যাশা করিবেনা, প্রশংসাত্ত
 আশা রাখিবেনা। নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিলাইয়া দিবে।”

—সেবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

NO. 3/3/80-FF(P)
GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
New Delhi-110003, the

To,

the 14 July 1980

**The President,
All Bengal Freedom Fighters Conference,
4, Ballavdas Street, Calcutta-700 007.**

**Sub : Grant of pension to freedom fighters under
Freedom Fighters pension Scheme, 1972.**

●

Dear Sri,

I am Directed acknowledge the receipt of your letter dated 26.5.1980 addressed to Prime Minister on the above subject, and to say that demands for enhancement of pension and removal of annual income ceiling are under examination.

Yours faithfully,

(A. V. S. KRISHNAN)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বর্ধিত ভাতা পাবেন

নবাবগিরি, ২২ জুলাই—কম্প্রাইমন্ট্রী জৈল সিং আজ লোকসভায় ঘোষণা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভাতার পরিমাণ মাসিক ২০০ টাকার জায়গায় ৩০০ টাকা করা হল। তিনি এই সঙ্গে আরও ঘোষণা করেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিধবা পত্নীদের ভাতার পরিমাণ ১০০ টাকার জায়গায় বাড়িয়ে করা হল ২০০ টাকা। তিনি স্বর্ধক্ষনির মধ্যে আরও ঘোষণা করেন সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভাতা পাওয়ার উপযুক্ততার নিয়ম-কানুনও সংশোধন করতে চান। তিনি বলেন বর্তমানে নিয়ম আছে যাদের আয় বছরে পাঁচ হাজার টাকার বেশি তাঁরা এই ভাতা পাবেন না—কিন্তু নতুন নিয়মে সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীই ভাতার জন্য আবেদন করতে পারবেন। নতুন আইনে অদিবাসী, তপসীলী জাতি ও উপজাতির অথবা নারীদের ক্ষেত্রে তিন মাস কারাবাস করলে ভাতার জন্য আবেদন করতে পারেন। তিনি জানান, ভাতা বাবদ বছরে সরকারী খরচ হবে ২১ কোটি টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা

শহীদ প্রফুল্ল চাকী

[একটি পত্র]

প্রিয় মহাশয়,

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদ্রোহী বাংলার প্রথম শহীদ অগ্নিযুগের মৃত প্রতীক প্রফুল্ল চাকী একটি বিশুদ্ধ ও উশেক্ষিত নাম। জেনে হুবী হবেন যে শহীদ প্রফুল্ল চাকী স্মৃতি কমিটির দুই বছরের চেষ্টায় শহীদের একটি পূর্ণাবয়ব ত্রৈক স্মৃতি ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক শীঘ্রই স্থাপিত হতে চলছে।

ভারত সরকার ইতিপূর্বে প্রফুল্লের সহযোগী কুদিরাম দত্তের ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। শহীদ প্রফুল্ল চাকীকে বাতে অমুকুণ ভাবে সম্মানিত করা হয় তার জন্য আমরা বিভিন্ন ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সার্কলের পোস্ট মাষ্টার জেনারেলের ওপর চাপ সৃষ্টি করছি। পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার বিভিন্ন মহল থেকে এ ব্যাপারে অমুরোধ ও দাবী জানিয়ে P, M, G-কে চিঠি দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিনিধিত্ব মূলক সংগঠন হিসেবে আমাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে অমুরোধ করছি। আশাকরি আপনরা প্রফুল্ল দত্তের ডাকটিকিট প্রকাশের দাবী জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি, এম ট্রিকেনের নিকট চিঠি দেবেন এবং P, M, G, West Bengal Circle—এর কাছে representation দেবেন। আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় হতভোতা আমরা সফল হতে পারব।

প্রফুল্ল চাকীর জন্ম তারিখ হচ্ছে ১৮৮৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯০৮ সালের ২রা মে।

আশাকরি পত্রোত্তর দানে হুবী করবেন। আমার সংগ্রামী অন্তিমক্ষণ গ্রহণ করুন।

ইতি—বিনীত

শহীদ প্রফুল্ল চাকী স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষে

নবীগোপাল দেবদাস

আত্মায়ক

● পূর্বাঞ্চে-ই বিদ্রোহী বাংলার নবমবর্ষ ৩৮ সংখ্যার (১৬ই জুন ১৯৮০) শহীদ প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দত্তের ডাকটিকিট প্রকাশ করার জন্য বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছে।

সং: বিদ্রোহী বাংলা

উত্তীর্ণত—জাগ্রত

দিনের পর দিন কলকাতার জনজীবন যেভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে, তাতে কলকাতা নামক স্থানটি ত বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। অথচ পায়টিয়া, সভাসদ, দল, গোষ্ঠী, বাদ্যের সংখ্যা অসংখ্য কলা চলে, সব বহাল তবিদ্যতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিরাটমান। সমস্তা সমাধানের জন্য কোন ব্যস্ততা নেই, আগ্রহ নেই, নিষ্ঠা নেই, আন্তরিকতা নেই, কোন বোগতার দাবীও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ জনগণের দরদী বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে, চীৎকারের অবধি নেই। নিজেদের অক্ষমতা চাকার জন্ত নিত্য নতুন কৈফিয়ৎ খাড়া করার নির্লজ্জ প্রয়াস সীমাহীন। কলকাতা এটাই দেখা যাচ্ছে, কলকাতাবাসীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। বাদ্যের সর্বাঙ্গীণ অক্ষমতার ফলে এই দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের উপর জ্বাঘের দণ্ডও নেমে আসছে না। ফলে যার যা ধূসী, তাই করে পার পেয়ে যাচ্ছে। আর যাচ্ছে শুধু জনসাধারণ। জনসাধারণের কোন সংগঠন না থাকার জন্ত, তাদের দুর্ববস্থার অবদান ঘটাবার কোন আন্দোলন গড়ে উঠছে না। অবশ্য এটাও একটা কারণ, এখানকার মানুষ দুর্ভোগ ভোগ করে করে যেন মৃত-প্রায় এবং অসাড় হয়ে পড়ছে। সব বিপর্যয়ই যেন গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। একটু বিস্তারিত আলোচনা করলে সমস্তাগুলির ব্যাপকতা ও গভীরতা কত ভরস্ব, সেটা পরিষ্কার হবে।

মামুষকে বাঁচতে হলে তাঁর আবেগিক কয়েকটি প্রয়োজন অবশ্যই মেটাতে হয়। তার মধ্যে খাদ্য, বাসস্থান, পানীয়জল, চিকিৎসা ব্যবস্থা, নিরাপত্তা : শিক্ষা প্রধান। খাদ্য সমস্যার কথা বলতে হয়, রেশনের দোকানের মারক-যে চাউল পরিবেশন করা হচ্ছে, সেটা স্বাস্থ্যমত অযথা। পশুদেরও বোধহয় এই বাজো রুচি নেই। অথচ পশ্চিমবঙ্গ এখন খাদ্যে স্বল্পবর। সংগ্রহের অভাবে, বিলি-বটনও করা সম্ভব হচ্ছে না। যখনই সঙ্কট খনিরে আসছে, সেই বদভ্যাস মত সব দোষ কেন্দ্রে বাড়ে চাপিয়ে দেবার অপকৌশল অংগলগ্ন করে যথেষ্ট কাগজে একটা বিবৃতি জেড়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষ দায়মুক্ত হতে চেষ্টা করছেন। তাই মনে করছেন যে এতেই তাদের কর্তব্য শেষ হচ্ছে। অজদিকে জনগণের চেতনাহীনতার জন্ত সব অপরাধীই বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছেন। রেশনের দোকানের নমুনা সংগ্রহ করে, সেই বাজ যদি উজ্জ্বল কর্তৃপক্ষীয় লোকদের খেতে বাধ্য করা যেত, তবে হয়ত তারা সজ্ঞিত করে যেতেন। সে কাজ করা হয়ত সম্ভব নয়, তাই এই দুর্ববস্থার কোন সুরাহা হচ্ছে না। সব রাজনৈতিক দলই, জনগণের উন্নতির জন্ত এত ব্যস্ত যে এসব ছোট কাজে বোধহয় সময় দিতে পারছেন না।

বাসস্থানের অবস্থা এমনই শোচনীয়, বাড়ীর ভাড়া হার এত আকাশচুম্বী, যে কিছু দিনের মধ্যেই হয়ত বনজঙ্গলে বা উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাস করতে বাধ্য হবেন নগরবাসীরা।

পানীয় জল সরবরাহ ত হামেশাই বিঘ্নিত হচ্ছে এবং বহু ক্ষেত্রেই সেটা ঘটছে প্রতি-রোধযোগ্য কারণের জ্ঞাত। সম্প্রতি যে জলাভাব দেখা গেল, ইলেকট্রিক লাইনে বিগ্ন ঘটাব জঙ্গ, সেজঙ্গ টেলিকোন বিভাগ এখানে একটি আকব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মাসের পর মাস ধরে টেলিকোন একেকো থাকছে, অভিযোগ করলে কেউ শুনছেন না। অথচ বিলের টাকটা আদায়ের জঙ্গ সর্বনা অতি সহজ। তাই এই বিভাগের কর্মীদের অবিমুখ্যতারিতার কলে, কলকাতার মানুষ যে পানীয় জল পেল না, এজঙ্গ তাদের মানুষের জীবন বিপন্ন করার জঙ্গ গায়ী করা হবে না কেন ?

চিকিৎসার জঙ্গ মানুষ হাসপাতালে ছোটো হাজারে হাজারে। সেখানে অব্যবস্থার মরণ ফাঁদ পাড়া আছে, একবার গেলে ফিরে আসা নেহাতই ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। এ গণগোল, সে গণগোল তো লেগেই আছে। সেখানে চিকিৎসার ব্যয়ের বহর যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে লোক আর গুণোনা হবে না এমন দিন খুব দূরে নয়।

নিরাপত্তার অবস্থা কত শোচনীয় হতে পারে, তা প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়লেই জানা যায়। ত্রুণ খবরের কাগজে কটা খবরই বা বেরোয়। ট্রেনে, রাস্তায়, শোকান ঘরে হামেশা খুন হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে। একবার রাস্তায় বেরলে, ঘরে ফিরে আসবেনই, এমন কথা গুরু বিধাতা পুরুষ তির কেউ বলতে পারবে না। পোর্ট কমিশনের ছাব্বিশটি রেলগুদাম উধাও। কবে শুনতে হবে রাইটাস বিল্ডিং উধাও।

শিক্ষাক্ষেত্রেও রীতিমত নৈরাজ্য। স্কুল কলেজে আর যাই হোক লেখাপড়া হয় না, এটা অভিভাবক ও ছাত্রদের অভিযোগ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জঙ্গ যে রত্ন দেন পরীক্ষায় পাশ করার ক্ষেত্রে দুই বছরের মধ্যেও তা পাওয়া যায় না। কলে কিছু গরীর অথচ মেধাবী ছাত্রদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। অথচ দুইকোড়ের মত বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল-কলেজ গছিয়ে উঠছে ব্রহ্মত, কোটি কোটি টাকার শ্রাঙ্ক হচ্ছে অথচ দেশের যারা ভবিষ্যৎ তাদের ভাষা অন্তকরাভিন্ন হচ্ছে।

কতি রোজগারের জঙ্গ ও অসঙ্গ অগ্রাবশ্যক কারণে কলকাতাবাসীদের চলাফেরা করতে হয়। অথচ বানবাহনের বা শোচনীয় অবস্থা তাতে উরাস্ত হয়ে ত্রিশহুর মত কলে থাকার কৌশল অবিসংকত করতে না পারলে, গম্ভ্যস্থানে পৌছান যায় না। সেবে একটু আশস্ত হতে পারেন এখানকার মানুষেরা যে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে আটজন মন্ত্রী জঙ্গ নতুন মোটরগাড়ী কেনা হচ্ছে। অবশ্য এজঙ্গ ঈর্ষা করে লাভ নেই। এরা শু সাধারণ মানুষের মত নিজেব কাক নিজেই ব্যস্ত থাকেন না। সাধারণের কল্যাণের জঙ্গই শু এরা দিনরাত পরিচর্য করছেন। কাজেই পরশ্রী-কাভরতা থেকে মানুষকে মুক্ত থাকতে হবে, ভালদিন আসছে বলে যে বোকা দেওয়া হয়, সেটাতে

সবুট ঝাকতে হবে। অগ্ৰাধ্য বড়বন্ধুকারী বলে চিহ্নিত হবার বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলেও ত নিভৃতি মিলবে না। সর্বশাস্ত্রের অতল খাদ ত আর বোধহয় বেশী দূরে নয়। 'বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতি নিতি' অবস্থার থেকে বাঁচবার চেষ্টা করাই ত মানবোচিত। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশ এমনভাবে আর কখনো মেঘাচ্ছন্ন হয়েচে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু অতীতের দুদিনে ত এই বাংলার ছেলেরাই আশার আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিল সারা ভারতের পক্ষ থেকে। তবে সেজন্য তাদের প্রস্তুতি করতে হয়েছে। নিজেদের চরিত্রবল, আদর্শনিষ্ঠা, অসীম সাহসিকতা, ভাগ ও তিভিকাকে মূলধন করে অনেক 'দুর্গমগিরি, কাপ্তার মরু লঙ্ঘন' করতে হয়েছে। আদর্শ লাভের জন্য অগ্ৰার অবিচারকে প্রতিরোধ করার জন্য জীবন আহুতিও দিতে হয়েছে। বাংলাদেশ বিপ্লবের পীঠস্থান। এখানে আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ, শ্যামী বিবেকানন্দ, স্রীঅরবিন্দ, রাসবিহারী ও নেতাজীর মত মহামানবগণ এবং ভাগ মধ্যে দীক্ষিত আরো বহু দেশমাতার সম্মানধন। বাঙ্গালী জে কখনও অস্ত্রাঘের সঙ্গে আপোষ করেনি। সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে জয়ী হয়েছে অবিচারের বিরুদ্ধে। তাদের পর কি আজ বাংলাদেশ বক্ষা হয়ে গেলেন ?

জীবনের সর্বক্ষেত্রে এইভাবে মার যেতে থাকলে, বাঙ্গালী জাতি চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে সাবে। তাই আজ বিজোহী কবি নজরুলের কথায় গ্লান করি 'নেই কিরে কেউ সত্য—সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায় ?' মজুরের মত বাঁচবার অধিকারের দাবী নিয়ে আজ দ্রিচুবন কল্পিত করে আওহাদ জুগতে হবে যে বাঙ্গালীকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলবার সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা হবে নিশ্চিত ভাবে। সেই পথের অগ্রশব্দিক হবে যে যুবদল, তাদের স্বাগত জানাবে সব চিন্তাশীল মানুষ। বাংলার ছেলেরা এটা সম্ভব করতে সক্ষম গ্রহণ করুন, শুধু বাংলার জন্যই নয়, সমগ্র দেশ ও জাতির জন্যও। সজীবিত করুন, সারা দেশের মানুষকে। সাধু যার সমস্ত, ভগবান তার সহায়, রবীন্দ্রনাথের এই বাণী স্মরণ করে মনন করে, তারা নতুন ভারত গড়ার পথিকৃৎ হোন, সব দেশপ্রেমিক মানুষ তাদের নিকট এই প্রত্যাশা রাখে, জাতীর জীবনের এই সন্ধিক্ষেপে। উত্তীর্ণত জাগ্রত, প্রাণাবধান নিবোধত।

ফৌজরা চেকির আওয়াজ বেশী

—বন্দীদের বন্দ্যোপাধার

আমরা সস্ত্রীক পেয়েছি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। মুখামম্বী নাকি জনসমাবেশে বলেছেন যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গ-বাসী মানুষদের বিগত তিন বছরে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন! তাঁর এই দল্লোক্তি যে কত বড় অসঙ্গ ও অসার তা সাধারণ মানুষ পদে পদে জানে, আর হাড়ে হাড়ে তা বেশ ভাল ভাবে বুঝেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত, নত্ন, ভক্ত, চিন্তাশীল ও বুদ্ধিছাঁবি সস্ত্রীকাদের মানুষ জনেরা মাথা তুলে দাঁড়ান তো দূরের কথা, আইনের শাসন পর্যন্ত নেই এখানে বলে খোশোক্তি করেন। তাঁরা বলেন যে, কে এই দৃষ্টকারীদের প্রেরণনকারী বামফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধে কোন কথা বলে অবশ্য হাররাণ হবেন বা গুণাদের হাতে মারধোর খাবেন?

তাঁরা আরো মন্তব্য করেন যে, যে রাজ্যে পুলিশ নিরস্ত্র, সং ও নিরপেক্ষ মানুষ বিপন্ন, চোর-ডাকাত ওরাগনপ্রকার—খুন—নারীধর্ষণকারী—হিন্তাইবাজ, প্রকৃতি অসঙ্গ চরিত্রের মানুষেরা পুরাদমে সজ্জিত এবং তারা একমাত্র মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকারী এরাফো বামফ্রন্ট সরকারের প্রেরণে ও আমুকুলো, সে রাজ্যে সাধারণ দল নিরপেক্ষ মানুষ জনেরা যে কত অসহায় এবং পদে পদে তারা যে কত দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে সে সংবাদ নিশ্চয় জ্যোতিবাহু রাখেন না বা রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনেও করেন না। তাঁর দলের ক্যাডাররা শুধে শান্তিতে থাকলেই তিনি নিশ্চিত। মুখামম্বীর কাছে দল আগে বা দলের সুখ সুবিধা আগে, পরে আর সব, নচেৎ উপরোক্ত ঐ রূপ দল্লোক্তি করার সাহস তিনি কোথায় পান? বামফ্রন্ট সরকারের বিগত তিন বছর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন, আর সি, পি, এম দল তাঁর প্রধান শত্রিক। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের সুখাতি বা কুখাতি সম্বন্ধে সি, পি, এম দলের প্রাণ্য। পশ্চিমবঙ্গে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় না, বিশেষ করে মকঃবল সংবাদের লভকরা আশী ভাগ গোপা পাড়ে যায়।

গ্রাম বাংলার সি, পি এম দলের ক্যাডার বা সমর্থকদের অভিচারে তথাকার দল নিরপেক্ষ মানুষ চরম লাঞ্ছনা ভোগ করছে গত তিন বৎসরকাল ধরে উক্ত অভিচার ও লাঞ্ছনার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন রাস্তাই শুধার বোলা নেই, কারণ থানার অফিসাররা গ্রামে আইনামুগ কাজ করতে পারে না এবং যদি কেউ তা করে তবে সঙ্গে সঙ্গে তার বদলির হুকুম হয় সি, পি, এম ক্যাডারদের আস্থা অমান্ত করার ক্ষমতা। এ সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে একটিও আগ্রহশীল নয়, বরং অপরপক্ষে এ সরকার সব কিছু পেয়াল খুশী মত চালাতে অভ্যস্ত। মহামান্ত হাইকোর্টের ওকুমকে পর্যাপ্ত মেনে চলতে রাজি নয়। হাইকোর্টকে

অবস্থা করার ফলে আদালত অবমাননার মামলার জড়িয়ে পড়েও এ সরকারের কোন কোন বিভাগ অপশব্দ হচ্ছে, তবুও তাদের লক্ষ্য বা ভয় নেই।

আইন অমান্ত্রই এদের নিত্যকার অভ্যাস, কারণ গারের জোরকেই এরা প্রাধান্য দেয় সর্ব সময়ে ও সর্ব বিধে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে ও দিকে দিকে চরম অরাজকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এখানে আইনমান্ত্রকারী মানুষের দল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাসরিক, কারণ তারা কোন রাজনৈতিকদলের আশ্রয় পুষ্ট লোক নয়। এরাই সংখ্যায় শতকরা বাট-সত্তর ভাগ পশ্চিমবঙ্গবাসী। এরাই সবচেয়ে বেশী অবহেলায়, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের দল; যাদের এই সরকার মানুষ বলেই মনে করে না, যেহেতু এরা রাজনীতির দর্শক মাত্র কিন্তু সমর্থক নয়। পশ্চিমবঙ্গের মাথা উঠু করে বা মাথা তুলে চলতে সাহস পাচ্ছে একমাত্র শারিরীক শক্তিতে বলবান ও রাজনৈতিক শক্তিতে বর্ণাশ্রয়িত, বিশেষ করে সি, পি, এম দলভুক্ত ব্যক্তিরা। অপরেয়া সে সুযোগ থেকে একেবারেই বঞ্চিত কেন? জ্যোতিবাবু কি এর কারণ বলে দিতে পারেন?

পশ্চিমবঙ্গে যে যজ্ঞোচ্চারণ ও আইনকে কলা দেখিয়ে বহু বে-আইনী কাজ সংঘটিত হচ্ছে তা নিশ্চয় অনেকেই জানেন, কিন্তু সি, পি, এম এর ভয়ে সাধারণ মানুষ এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত যে তারা মুখ তুলতে বেশ রীতিমত ভয় পায়, এমনকি প্রাণ নাশেরও আশংকা তারা করে। এই হলো বাস্তব অবস্থা এখানে। বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যে তিন বছর রাজত্ব করেছে এখানে। এই তিন বছরে আমাদের কি কি মঙ্গল তারা করেছে তার কোন কিরিস্তি পাওয়া যায় নি, মুখামন্ত্রী এ পূর্বোক্ত দস্তাভি হাড়া। মুখামন্ত্রী বিদ্যায় মন্ত্রীও বাটে, কাজেই মুখামন্ত্রীর সীমাহীন ব্যর্থতা আজ পশ্চিমবঙ্গে চির অন্ধকারে নিমগ্ন করে চোর, ডাকাত, খুনে ও চক্রতকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে। এরাছোর বিবোধীরা জ্যোতিবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কারণ নিত্যকার চোর ছদ্ম বাপী লোডশেডিং তাদের কাজের বেশ সুবিধা করে দিয়েছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে এইসব সমাজ-বিবোধীরা আজ জ্যোতিবাবুর রাজত্বকালে হাতে বর্গ পেয়েছে এবং ফলে এরাও বেশ মাথা তুলে পাড়াতে শিখেছে জ্যোতিবাবুর সন্তদরতায়।

বিদ্যায় ঘাটতি যে কি ভীষণ অভিশাপ তা এরাছোর প্রতিটি অধিবাসীই মর্মে মর্মে অনুভব করছে। প্রতিটি মানুষ বিদ্যায় ঘাটতির জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে রোজ দিনান্তে অন্ততঃ একবার করে বিচার দিচ্ছে আর এ সরকারের পতন কামনা করছে নিত্যদিন। জ্যোতিবাবু এরাছোর জনগণের সঙ্গে তামাশা করেই চলেছেন। তারা কোন সমস্যারই সমাধান বার করতে আগ্রহী নন বলে এখন সবার মনে হয়। অবশ্য বামফ্রন্ট সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রত্যাশা ছিল অনেক এবং তাই তারা তাদের ক্ষমতাসীন করেও ছিল, কিন্তু সকল আশা চুরাশার বা হতাশার পরিণত হল দেখা যায়। বাস্তবে বামফ্রন্ট যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে এবং তা সি, পি, এম দলের কারসাজিতেই তা আজ সবাই বলছে মুক্তকণ্ঠে। মানুষ নিরুৎসাহ, ভয়মনোবশ ও চরম হতাশ হয়ে পড়েছে বিগত তিন বছরে। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গবাসীদের অন্তর সাগরে ডুবিয়েছে চিরন্তনে।

এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুইটি দপ্তর নিজ কঠোরদীনে রাখেন। একটি বিদ্যায় অপরাধ পুলিশ এবং এই দুই দপ্তরে কাজই সর্বাধিক। অধিক হতাশাব্যাক্ত। পুলিশ বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখে বামফ্রন্ট এগিয়ে আনিন শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করেচে একদিকে আবার অপরদিকে নন—গেজেটের পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনকে মনস্ত দিয়ে পুলিশের ভিতর বিভেদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করে এরাঙ্গার পুলিশ প্রসামশনকে সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রণের করে তুলেছে। বিদ্যায় ব্যবস্থায় কোথায় ত্রুটি বিচ্যুতি তা দেখার জন্য টাক্সকোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা মাঠে মাঝে গেল সরকারী কর্মদক্ষতা প্রমাণের জন্য।

বিদ্যায় এরাঙ্গার মানুষের নাগালের বাইরেই রয়ে গেল আলো এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুই এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, কারণ তিনিই বিদ্যামন্ত্রী আবার তিনিই মুখ্যমন্ত্রী। যে মন্ত্রী বা ম্যানেজার পুরা ভিন্ন বছরে একটা ব্যবস্থাকে ঢেলে সেজে তার উন্নতি করতে অপারগ হয় সে সত্যই অপদার্থ। কাজের কিছুই যে লোক বোঝে না, সে লোক দিয়ে কোন কাজই হয় না। অনভ্যাসের ফৌটার কপাল চড় চড় করে—এই হলো প্রকৃত কারণ ভাববে ভুল মত্কাব না শ্রোণীর লোক এরাই। এদের এইসব অবিদ্যাকারীতার কলে শক্তিমবজবাসী আজ দারুণ বিপদগ্রস্ত ও সর্ব্বকমে পশ্চাদগম হতে বাধ্য হচ্ছে। বিদ্যায় ব্যবস্থায় সর্বনাশ সাধন করেছেন জ্যোতিবাবু, তাঁর অজ্ঞানতার ও অনভিজ্ঞতার জন্য, যা তাঁকে এখন খীকার কলঙ্কেই হবে।

মহামাফ হাইকোর্ট বিদ্যায় ব্যবস্থায় কি গলম তা উদ্ভেদর জন্য ভিন্ন সদস্যের কমিশন নিয়োগ করেছেন এবং এটা এরাঙ্কো কেন সাফা ভারতে এক অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একদম ঘটনা ভারতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন ও চাকল্যকর। কমিশন বাই কিছু কখন না কেন, আসলে জ্যোতিবাবুর বার্ষিকার ইতিহাস পরিমাপ করার ব্যবস্থা হাইকোর্টে নিতে বাধ্য হলেন, ভারতীয় সংবিধানকে তার যোগ্য মর্যাদাদানের জন্য। আমরা কমিশনের রায়ে অপেক্ষায় রহিলাম। পুলিশ বিভাগে যে বিবাদ ও বিসংবাদ চুকিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার তথা সি, পি, এম দল তার কুফল আমরা পেরেছি ও দেখেছি ইসলামপুরের রশংস পুলিশী অত্যাচার, যা সত্যই ভীতিপ্রদ ও মারাত্মক ব্যাপার।

এই বিভৎস পুলিশি তাওবের পর যখন মুখ্যমন্ত্রী ওধানকার অত্যাচারী পুলিশ কর্মীদের, যাদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কিছু না কিছু কাগজপত্র বা সাক্ষ্য সাবুদ ছিল, তাদের হঠাৎ বলির আদেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বলির আদেশ ছিল অত্যন্ত নিয়মানুগ ও স্তায়পরাধপত্র, ভিত্তিতে লুণ্ঠার এক নিদর্শন, কিন্তু তাঁর সে স্তাব্য আদেশ লঙ্ঘন করলো ইসলামের পুলিশ কর্মীরা কোন সাহসে তা বোকা সত্যই জ্ঞান। স্তাব্যর মানুষ মুখ্যমন্ত্রীকেই ঘোব দিতে থাকে এই বলে যে, তাঁর বলিষ্ঠ নীতির অতাবেই পুলিশ তাঁর কথার কান দেয়নি আর বিরোধীরা বলে যে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের অনেক দ্রুতকারীকে পুলিশের সহায়তার আইনের বেড়া জাল থেকে বন্ধ করেছেন তাই তিনি চূপ করে যেতে বাধ্য হয়েছেন। পুলিশকে চটাত্তে

(এর পর ১২ পাতায় দেখুন)

কাম্পুচিয়ার স্বীকৃতি কিসের ইঙ্গিত

— অজেন্সি প্রেস দাস

২৪ জুন মন্ডায় সংবাদে প্রকাশ সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক শক্তি অবশ্যই পূর্বতম অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে একথাও ঘোষণা করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে পূর্ববর্তী বিশ্বশান্তি ও শে-তাতের নীতি অনুসরণ করবে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের আগ্রাসী পশ্চিমী মহল থেকে যুদ্ধের যে হুমকি চলেছে, তার উপরও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রেসিডেন্ট কার্টার এবং মার্কিন জনস্বামী মহল এই নীতির জন্য দায়ী। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির গৃহীত এই প্রস্তাবে আগামী দিনের যুদ্ধের আশঙ্কা প্রতিফলিত। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব ডাঃ কুই জাংহাইম কতকদিন আগে এক প্রেস সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যদিও এখনই যুদ্ধ বেধে যাচ্ছে না, তবুও একথা সত্য পৃথিবী একটা মহাযুদ্ধের বিপজ্জনক অবস্থার দিকে চলেছে। ডাঃ জাংহাইমের মত পদস্থ ব্যক্তির এমন সতর্কবাণী উপেক্ষা করা যায় না। 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শান্তি জোটের বিপজ্জনক সমাবেশ ঘটছে এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ বেন যুদ্ধের আশঙ্কার রণনীতির পছিনস নেওয়ার (startigy) ব্যবস্থার ব্যত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বামীর আতঙ্ক বোধ করতে থাকে এবং ছাটা বা উত্তর অত্যাধুনিক সামরিক চুক্তি সংস্থা গড়ে তুলে যার সদস্য পশ্চিমের ১৪ টি রাষ্ট্র। যতদিন মন্ডা ও শিকিং এর ত্রাত্ব বন্ধ ছিল ততদিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট অবস্থান ভীতিপ্রদ ছিল। এবং সোভিয়েতের সঙ্গে সমঝোতা করে চলত। ১৯৬০ সালের পর মন্ডা শিকিং এর মধ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়; বর্তমানে তা প্রকৃত শত্রুতার পরিস্থিতি হয়েছে। এককালে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুণ্ডপাত না করে জলস্পর্শ করত না, আজ অবস্থাটা দাড়িয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ চীন ও আমেরিকা এক সারিতে দাড়িয়েছে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও ছাটা জোটের সঙ্গে চীনের বন্ধু হয়েছে। এমন কি সে জনস্বামী আপান ছিল চীনের পরম শত্রু আজ তার সঙ্গে সমঝোতার বন্ধন স্থিতি করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানি ইতালী ও জাপানের মধ্যে যেমন এক ধরনের তৈরবীচক্র গড়ে উঠেছিল এবং সেই চক্রের চরম লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করা। তেমনি আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন ও জাপান-মধ্য যে সমঝোতা ও সামরিক সহযোগিতা গড়ে উঠেছে তারও লক্ষ্য সোভিয়েত রাশিয়া ও তার সহযোগীদের ধ্বংস করা। চীন কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর বিপদের কারণ নয়, সবচেয়ে মারাত্মক বিপদের কারণ সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ। সুতরাং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যেমন নীতি চালাতে হবে যেমন চলেছিল বিপরীত চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। চীন হতে এই আশঙ্কা শেষের আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের চারদিকে ২৬৮ টা সামরিক বাহিনী তৈরী করেছে। এবং সারা পৃথিবীতে এই বাহিনী

সংখ্যা ৫০০। ১১০ টি দেশে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। ইস্রায়েল মিশর এবং পারস্য উপসাগর অঞ্চলের ওজন ও মেমোনিয়াকে মার্কিন বেইন নীতির অন্তর্গত করেছে। ভারত মহাসাগরে নিয়োগারনিয়ার মার্কিন নৌ-বাহিনীর উদ্বেষ্ট ভারতের উপরও পারস্য উপসাগরের সূচক যে অঞ্চল থেকে পৃথিবী ছুই তৃতীয়তঃ পেট্রোল সরবরাহ করে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা। সুদূর প্রাচ্যে চীন ও জাপানে সঙ্গে অস্টেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে একা সূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমপূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদিকেও সোভিয়েত বিরোধী পরিমণ্ডলের দৃষ্ট করা হবে। চলছে ভারতের ছই পাশে ছইটি দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আমেরিকা ও চীনের উপর নির্ভরশীল এবং সোভিয়েত-বিরোধী ও ভারত বিরোধী। ভারতের বিক্ষম হামলা করতে সামান্যতমও বিধা করবে না। বর্তমানে ভারতের প্রতি চীনের যে অকম্পাৎ এত প্রে জোগছে তারও আসল রহস্য—রণনীতির পছিন্দ নথল করা। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেবার দাবীতে চী ভারতের পূর্বদিকে ম্যাকমোহন লাইন যেনে নিতে রাষ্ট্রী—কিন্তু কিছুতেই পশ্চিমদিকের লাজাক অকরে আকসাই চীন ছাড়তে রাষ্ট্রী নয়; কারণ এই পথ দিয়ে কাবাকোবাসের পোক অধিকৃত কাশ্মিরের পশ্চিমা পার্বত্য সামরিক সড়ক থেকে কাশ্মির এলাকার লোক নিয়ে প্রয়োজন মত সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রম করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

এ ছাড়াই পাকিস্তানের প্রতি চীনের এত দরদ এবং সেই দরদের সঙ্গে ইরানি যুক্ত হয়েছে ভারতের সঙ্গে সমঝোতার আগ্রহ। কুটনীতির এই চালের তাৎপর্য এবং ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে অস্ত্রপ্রদানের অভিসন্ধি নিরীক্ষণ করে ইন্দিরা সরকার কাশ্মুচিয়ার স্বীকৃতিদানে প্রস্তাবে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত কর্তৃক ১:০০ কোটি টাকার সামরিক অস্ত্র ক্রয় কর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকারও যেসকল সরকার কুজাকদের ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন এজেন্সি কাত করছে। পশ্চিম আমেরিকার ও চিলি ও আর্জেন্টিনাকে কেন্দ্র করে হট্টগোল বাধাবার চেষ্টা করছে সুতরাং সারা পৃথিবীতেই একটা সত্তীর সামরিক জাল চারিদিকে বিস্তৃত হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া ও ত মিত্রদের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধে ঝড়ল করার জন্য। এই বড়বড়ের জন্যই সোভিয়েত রাশিয়ার মনোভাব কঠোর হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ ঘোষণা করেছেন যতক্ষণ আকগানিস্থানের অভ্যন্তরে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ না হবে ততক্ষণ আর কোন সোভিয়েত সৈন্য আকগানিস্থান থেকে প্রত্যাহার করা হবে না। অর্থ রাশিয়া আশ্রয়ী যুদ্ধের আশংকার সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নিচ্ছে। আকগানিস্থান সোভিয়েত রাশির সোয়গোড়ার এবং এখান থেকে ইরান ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এলাকাটা রণনীতির দিক থেকে সোভিয়েতের নিকট ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং এই এলাকা কিছুতেই সোভিয়েত বিরোধী শক্তিবৃদ্ধি বাটতে পরিণত হতে দিতে পারে না।

মহামতি লেনিনের ভবিষ্যৎ বাণী বাণীয়া চীন ভারত এক জোট হলে সারা পৃথিবী সমাজতন্ত্রের
যে এগিয়ে চলেবে এবং দুনিয়া হতে যুদ্ধবাজ নীতি অপসারিত হবে। মহান নেতায় এই আশাকে
দলিত করে মাওবাদী চীন পত্নিল পাখে পা বাড়ালে। এবং শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার আশদ
যে চলেছে। ইহার প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ষার্থে সোভিয়েতের হাত দৃঢ় করার
ক্ষেত্র ও ভারতের জোট নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষমত দিল্লির কম্পুটিয়ার স্বীকৃতি।

চীন মেডুয়ের জাতি দান্তিকতা পরিপ্রেক্ষিতে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে লেখা আমেরিকা
কুংরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টিকে লেখা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গ্যাস
লের চিঠির অংশ বিশেষ উল্লেখ করে চীনের বিপ্লবী নীতি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

গ্যাস হল লিখেছেন :—

‘আপনাদের পার্টির নীতি ও কাজকর্ম সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য আশা ও শক্তি
যাগালে।’ ‘আমরা জানি মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কমিউনিষ্ট
পার্টিকে নিজ নিজ দেশের ইতিহাস এবং জাতি ও জনগণের অভিজ্ঞতা সামাজিক ও রাজনৈতিক
শক্তিশুলির চেতনার স্তর বিবেচনা করতে হয়। সে কারণে আমরা এও জানি যে বর্ণনীতি ও বর্ণকৌশল
দর্শনক্ষেত্রে এক হবেনা। কিন্তু আপনারা যে নীতি অনুসরণ করছেন তা ঐ বিবর নয়। আপনারা এমন
একটা লাইন অনুসরণ করছেন যার সঙ্গে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক নেই।’

‘চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস দুই দৃষ্টিভঙ্গীর সংগ্রামের ইতিহাস, একটি হল মার্কসীয়
লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। সি.তা-চাও, মু-চিউ-পো, পেংপাই, চাং-তাই-লি য় চাও-চেঙ, চুতে এবং আরও
বিশিষ্ট নেতা এই সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান করেছেন। বিরোধী মতটি ছিল সর্দীর্ণ জাতীয়তাবাদী।
মাও-সে তুঙ এই মতের পক্ষে ছিলেন। এই মতই শেষ পর্যন্ত মাও-সে-তুঙ-এর চিন্তাধারায় মার্কসবাদ
লেনিনবাদের স্থানে মাওবাদে পরিণত হয়।’

‘মাও-সে-তুঙ-এর পাতি বর্জ্যতা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় শ্রেণী সংগ্রাম কখনও দুনিয়াবী
নীতি নির্দেশিকা ছিল না। অতএব মাওবাদ কোনদিন শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে একটা মত ছিল না।

কারণ মাও কখনও শ্রেণী-সংগ্রামকে দুনিয়াবী ধারণা হিসাবে গ্রহণ করে নাই।’

‘মাওবাদ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের যুগের সুবিধাবাদ। মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদের
হাত থেকে দুই এক টুকরো উন্নিষ্টের প্রতিদানে সমাজতন্ত্রবাদের স্বার্থ বেঁচে দেওয়ার নীতি’।

‘সাধারণভাবে মাওবাদ হল সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে বিশেষভাবে নেতৃস্থানীয় সাম্রাজ্যবাদী
দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন বিধানের মতবাদ’

‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চীনকে সাময়িক সস্তার বিক্রি করতে চায় এবং ৩৭ দিনে ইচ্ছুক ততদিন
ততদিন চীন বর্তমান নীতি অনুসরণ করবে; কারণ এই লাইন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে

বুড়' 'মাওবাদ যে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলামীতা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুংসাগ্রচার এবং বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছে তা যদি না হত তবে আজ বিশ্ববিপ্লব প্রক্রিয়া, সমাজতন্ত্রে রামায়ণ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কোথায় পৌঁছে যেত সাধারণভাবে শুধু তার একটা অনুমান করা সম্ভব। ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠভাবে এই সব অশ্রাব্যের পূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারে।'

'মাওবাদ ইন্ডোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, কোরিয়ার অনেক নষ্টামি ঘটায়ছে। আমাদের দেশের 'নকশাল আন্দোলন'ও মাওবাদ হতে উদ্ভূত। এই আন্দোলনের প্রক্রিয়াশীল চেহারা আমরা দেখেছি। দেশের অনেক জ্ঞানীজনী শিক্ষিত ত্যাগী যুবককে বিপন্ন হতে ফিরাতে পারিনি অহেতু নিজের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে।

কাম্পুচিয়ার বীকৃতি মাওবাদের নিকট হ'লিয়ারী ও কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতা বিরোধিতা ও প্রগতির সহায়ক।

(৮ এর পাতার পর)

তিনিও সাহস পান না কারণ আজ গণীতে কাল অবার যে কে সেই, সেই সাধারণ সান্ত্বিত তাকেও বসতে হবে।

যাইহোক পুলিশ মস্তুরী চকুম হেঁড়া পাতার মত কেনে দেখে এই পশ্চিমবঙ্গের যা সত্যই চমকপ্রদ। এর আসে একপ বটনা কখনও খতেন এরাভে। তাই লোক বলে যে, জ্যোতিবাবু সবদিক থেকে ব্যর্থ হয়েছেন রাজা পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং তিনি তাঁর ব্যর্থতা ঢাকা দিতেই যত সব আড়ম্বর পল্লী জীবনে যা লোকে আজকাল ধরে ফেসছে। পশ্চিমবঙ্গের হাটে মার্চে গিয়ে গঞ্জে শহরে যেখানেই যান না কেন সর্ব্ব সি. পি. এম ক্যাডারদের স্বপনহীন অত্যাচারের বটনা চাক্স দেখতে পাবেন এবং স্থানীয় মানুষ-জনেরা ওদের অত্যাচারে যে কি দারুণভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত তা না লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন না। সরকারী অফিসে গেলে দেখতে পাবেন এক বিশেষ সুবিধাভোগীর দলকে, তাঁরা হলেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য অর্থাৎ সি. পি. এম দলের আজ্ঞাবহ। এঁরা আবার জেলা প্রশাসনে নাক গলান। এস, ডি, ও বা জেলা শাসকরাও এঁদের দোঁরীও প্রস্তাবে সম্মত কল্পমান। সংবিধান বাইহুঁত এই শাসন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মাথা হেঁট করে দিয়েছে, এরপরও যদি সুখ্যয়ী আত্মশাসন লাভের জন্য কিছু উটো-পাটো কথা বলে তাঁর মনের শান্তি কিরে পান তো মন নয়। পশ্চিমবঙ্গে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই—আজো আছে।

রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

[“A Nation In Making” এর অধ্যায় থেকে]

অনুবাদক—অধ্যাপক নতিনীমোহন দাশগুপ্ত

১৯১৯ সালে মডারেট পার্টির ইংলেণ্ডে ডেপুটিশন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই ডেপুটিশন সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়েছিল, তা হল এই যে তেজস্বী সরকার বর্তমানে লেখিতলেটিড অবনতির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, ভারতীয় সাক্ষাৎকারের অভিমত গ্রহণ করলে তা সম্পূর্ণরূপে বিমূর্তিত হত কিংবা বহুদূর পরিমানে কমে যেত। কিছু আগেই হোক বা পরেই হোক, দাবী এখন মিথ্যে কিছু বিত্তেই হবে। তবে যে সমস্ত বেয় চেষ্টা তখন দেখা দেবে যে কেই এই নীতির উপরে কাজ করলে তাৎক্ষণিক বিজ্ঞতার কাজ হয়। সিবিলাইন প্রচেষ্টার পৌরাতনিক উপাখ্যান বর্ণিত সত্যের দাবী পত্রিকার তীক্ষ্ণতার দ্বারা দ্বিগুণ প্রতীকিত দৃষ্টান্তে প্রকটিত হচ্ছে। সরকার কিছু করতে চাচ্ছেন, আগার কতটুকু করবেন সে বিষয়ে অতি দ্রুতের সত্যতা অবলম্বন করে চলছেন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সাহস যদি একটি উত্তম গুণ হয়, গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সে আগার হবে লবোঁতব, পরম আগার যদি তা বিজ্ঞতার সহিত নিরূপিত হয়। কাগজের সরকারকে পুনর্জন্ম করার যে প্রচেষ্টা লন্ডন প্রচেষ্টার বেগেই তার চেয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিগত বড় দৃষ্টান্ত গুণ কমেই মেলে। যেকোন চেষ্টাকার পত্রিকার মোটামুটিভাবে সেই একই ধরনের একটি সাহসিকতা পূর্ণ অঙ্গপতি।

সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ কালে একটি বিবরণের উপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছিল। বিবরণ লক্ষ্য করার মত। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যে ডেপুটিশন পাঠান হয়েছিল তাতে এই বক্তার একটি প্রস্তাব ছিল যে হস্তান্তরিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে একটি পৃথক তহবিল দ্বারা প্রয়োজন। এই বিবরণটিও উপর লক্ষ্য করে তার সাক্ষ্য। যুব বেনী জোঁ দিয়ে বলেছিলেন। ভারতীয় সাক্ষাৎকারে সকলেই ছিলেন এই প্রস্তাবের বিরোধী। আমারই মধ্যে অনেকেই তাৎক্ষণিক যে এই প্রস্তাব গৃহীত হলে একটি বৈষম্যের দৃষ্টিতে দাবী

হবে যে বৈষম্যটি নিবৃত্তি এইটা পরিবর্তনীয় সাময়িক ব্যবস্থায়। এর ফলে আমরা যে সংরক্ষিত বিভাগগুলিকেও হস্তান্তরিত বিভাগের মধ্যে আনতে চাইছি তা থেকে বিদূষ হবে। শ্রম লক্ষ্যের লক্ষ্যগত সাংরক্ষিত বিভাগগুলিতে হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি করা। অর্থাৎ কতিপয় এই ধারণাকে গ্রহণ করেননি এবং শ্রমসংরক্ষিত পত্রিকার এ ধারণা স্থান পায়নি। তবে আমি এ সম্বন্ধে না করে পারিনি যে এই মতের অন্তর্ভুক্ত একটি ক্রম-বর্ধমান মত গড়ে উঠতে প্রধানতঃ এই কারণে যে নবগঠিত সরকার সমূহকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং হস্তান্তরিত বিভাগগুলির অর্থনৈতিক দাবী সংরক্ষণের সঙ্গে পৃথক ধন-ভাণ্ডার দ্বারা বর্তমানের প্রকৃতি ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর কমগ্রহ হবে।

বাংলাদেশ মোট যে পরিমাণ রাজস্ব আগার হয় তার একটি বিরাট অংশ খারব করা হয় সংরক্ষিত দলগুলির ক্ষেত্রে। মাত্র শতকরা ৩৫ কি ৩৬ ভাগের মত অর্থ রাখা হয় সেই সমস্ত দলগুলির ব্যয়-ভরণের জন্য লাভি দ্বারা বিভাগ দ্বারা দায় একটি স্থায়ী নাম রাখা করা হয়েছে এ ব্যবস্থাটা পূর্ব ব্যবস্থার চেয়ে হিসাবেই ভাল এসেছে কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে প্রবেশের বিকাশ এবং নানা বিকাশ নানা প্রয়োজনীয় উন্নয়ন মূলক কাজে ভীষণভাবে বাধা দেয় হয়েছে। দাবী, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-সমন্বিত উন্নয়ন মূলক কাজই এই সমস্ত বিভাগীয় কাজের জন্য ব্যয় হচ্ছে। সমস্ত বিভাগের কাজ বর্তমান প্রয়োজনীয় এমন বিপর্যয়বশত্রে আগেরকালে বিবেচনা করা চোকা না কেন তা জাতীয় কল্যাণ মূলক কাজে প্রত্যক্ষভাবে কোন সাহায্য করে না বা যা কিছু করে পৌঁছ তাৎক্ষণিক তা করে থাকে এভাবে টিকি যে দাবী উন্নতি বিকাশের জন্য যে প্রাথমিক অবস্থা সৃষ্টি প্রয়োজন তাইল যেনো শান্তি ও শৃঙ্খলা হয়

করা। তবে সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রেমিক জায়তীকণ এ অভিনয়গণ করতে পারেন যে কি পড়তে গিয়ে প্রচুর পরিচয়নে উপরের পাখি গুলি নিহায়ে ব্যবস্থা করেই তাড়াতাড়ি সম্পন্ন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আগে অস্বস্তি এত প্রবল যে একবারে যখন লেভেলসেটিভ কাউন্সিলে পুলিশ ফাঁদে ব্যস্ত হয়ে প্রায় সবটাই অনুমোদিত হয়ে যায় বলিষ্ঠ পথে তা সমস্তের সঙ্গে আলোচনা-আলোচনার ফলে পুনঃনির্বাচন করা হয় এবং অনুমোদন লাভ করে।

হট্টেও চেম্বারসেও প্রিন্সিপাল হয়েছিল যে তাদের পরিকল্পনা মত কাজ এগিয়ে গেলে পাঁচ বছর পরে তারতে একটি পানিয়ারেটোরী কমিশন আসবে। সেট কমিশনের কাজ হবে হট্টেও চেম্বারসেও পরিকল্পনা অনুযায়ী পানিয়ারেটোরী কমিশন লাভ করেছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়া এবং আবশ্যিক ধোঁবে তার সংশোধনের প্রণালি করা। এই সময়সীমা পানিয়ারেটোরী ট্র্যাডিং ট্যাক্স বাড়িয়ে দিতে মন বসে করা হয়। ভারতীয়-সেব বিবেচনার এই অস্বস্তি কালীন সবটাই অতি দীর্ঘ বলে মনে হল এবং পূর্বে নির্দিষ্ট পাঁচ বছরের সীমাবদ্ধতাই বজায় রাখার জন্য লাবী আসান হল। কিন্তু হট্টেও কমিটি সে দাবী গ্রহণ করলেন না। আরি যখন করি সরকারী দৃষ্টি কোন থেকেও মূল প্রস্তাব মত পাঁচ বছর সময় সীমার মধ্যে থাকাই অধিকতর বিজ্ঞতার পরিচায়ক হত। কারণ, তাহলে বর মানে ভারতীয় জনগণের এক বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে পুনঃপ্রাথমিক ব্যৱস্থাপন লাভের মত যে আন্দোলনের সঙ্গি হয়েছিল তাকে এড়িয়ে যাওয়া যেত পাঁচ বছরের সময় সীমাটা বৃহৎ সময় নয়। এখন কি যে পঠিতে তারতে এখন উন্নয়নের কাজ-কর্ম চলতে তা বিবেচনা করলেও এই সময়টা নেহাৎ কম নয়। সে অবস্থায় এ দেশের জনমতও আর তোড়জোড় না করে সমস্ত চিন্তে কিছুকাল অপেক্ষা করত, হিসেবতঃ এখন এটা বুঝতে পারা যেত যে একটা পরিবর্তনের আশা দেখা যাচ্ছে এবং তা আর সময়ের মধ্যেই আসছে। তাই হট্টেও চেম্বারসেও প্রণালি থেকে

অবস্থায় উন্নতির আশা তুলে ধরেছিল। যেত পানিয়ারেটোরী একটা অভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও অনেকেই কাছে যেত পানির ব্যবস্থাটা একটা কৃষ্ণিক ব মনে হয়। তাই তড়াতাড়ি এর কর্ম পরিমিত নীতি করে অবস্থ তদ্বিষয়ে একে একেবারে দ্রুত গোল করে পাতলে জনমতের উপর তা একটা দৃষ্টির প্রদর্শনের করত। কিন্তু তা হওয়াই নয়। ভারতীয় লাক্ষ্যাত্মক বিবেচনিতা সবচেয়ে বৃহৎ স্থাপত্যের পরিবর্তন করা হল

তবে এটা অস্বস্তি পাঠ্যেই যোগ্য গিয়েছে যে অ তদ্বিষয় সব সন্তোষে কাছেই যেতপানির ব্যবস্থা প্যামি। ব্রিটিশ জনমতের কাছেও তারাই সম্পূর্ণ যোগ্য বলে মনে হয়নি। ব্রিটিশ প্রেসের একজন নাম লগনের সঙ্গে আবার আলোচনা করার সুযোগ হয়ে তিনি ভারতীয় উচ্চাভিলাষের প্রতি বিতর্ক ছিলেন, এ কোন ক্ষেত্রেই বলা যায় না; আর পূর্ণক্ষেত্রেই কতবি কোন অতিপ্রায়ও তার ছিলনা। আমার মনে আমি তাকে বুঝতে পেরেছিল যে সংশোধনের থেকে এই পদ্ধতির যে একটি থাক না কেন ১৯১৭ স ২০শে আগস্টের ঘোষণাযাচীর পরিপ্রেক্ষিতে এ রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। তারতে পানির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়ার কথা ছিল বাড়ি সরকার প্রকৃতি এবং সেই ঘোষণাযাচীর সর্বমত সরকার লাভ হবে পর্যায়ক্রমিক ক্রম বিকাশের পদ্ধতি একসঙ্গে একবারেই পুরানোতার তা বেওয়া হবেনা। বিকাশ লাভ করবে ধাপে ধাপে চূড়ান্ত পর্যায়ের না পণ্ডিত। একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল-সীমা প্যাকবে। সেই সময়-সীমার মধ্যে জনগণের এক নি হট্টেও আইন সভার কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রকের পানির কার্যের কোন কোন বিভাগের পরিষদ্যায় বেওয়া হবে। এ তাড়াতাড়ি হবে পুরানোতার দায়িত্ব সরকার পঠনের অধিকার বানো প্রকৃতি হিসাবে। তবে মাত্র আংশিকভাবেই দায়িত্বশীল সরকার অবস্থা

✓ Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
------	---------	---------------	------

Dist—CALCUTTA

Bhowmik Smt Suchilata	27, Baniapukur	100	24 12 79
w/o Late Dr. Rebati Bhowmik	Calcutta-14		
Biswas Smt Ava	169, R. N. Tagore Rd. Dakshinagar	100	27 8 78
w/o Late Pran Kumar Biswas	Calcutta-87		
(alias Binu Biswas			
Chakraborty Smt Sudharani	Govt. Qtr. Block-13 Jatin Bagchi Rd.	200	15 8 72
w/o Late Sushil Chakraborty			
Das Prafulla Chandra	225/1, Netaji Subhas Rd. Cal 34	200	15 8 72
Das Nilmadhab	105 Sarat Ghosh Garden Rd. Cal 31	200	26 3 74
Dutta Kumud Bandhu	37, B. N. Ghosal Lane Cal 56	200	20 9 73
Debi Sadhu Rani	58/35 Prince Avatu Shah Rd,	150	27 7 76
w/o Late Bhupendra Nath Das	Calcutta 45		
Majumdar (Bishnu Majumdar)			
Kumari Rama	1. 14 Surjanagar Cal. 40	100	6 4 78
d/o Charu Ch. Bishnu Majumdar			
Samajdar Smt Anandamoyee	2/8, Nabo Kumar Raba Road	150	31 1 80
w/o Late Naltniranjan Samajdar	Cal. 4		
Sarkar Smt Bimala	25, Sreemanta De Lane	200	15 8 72
w/o Late Balai Sarkar	Calcutta 12		
Shome Smt Binapani	P 289/C, Darga Road	200	9 2 80
w/o Late Santi Ranjan Shome	Calcutta 17		

Dist—24 PARGANAS

Devi Smt Radha	Bashirhat Barakahibaripara	100	25 11 79
w/o Late Haridas Debi			
Mitra Smt Bina	272/3, Jabapur Road	100	25 3 78
w/o Late Manindra Mitra	P. O. Ghugudanga, Cal 30		

Dist—HOWRAH

De Mobendra Kumar	Vill Dadpur P. O. Beldhibi	200	30 3
Guba Smt Nihar Kona	Vill Sapuipara P. N. Colony	200	11 2
w/o Late Narendra Nath Guha	P. O. Sapuipara (Bally)		

Dist—HOOGHLY

Chakraborty Smt Radha Rani	Radha Gobinda Nagar Colony	200	2 6
w/o Late Kshitinath Chakraborty	131, R.G. Nagar, P.O. Hind Motor		
Chatterjee Smt Rajlakshmi	Samindar Road Bye Lane	100	14 3
w/o Late Deboprosad Chatterji	P. O. Sincorafuli		
Chatterji Smt Bina	Pathakbagan P. O. Hooghly	100	13 12
w/o Late Makhan Chatterji			
Dutta Smt Niharkonn	55, G. T. Road, P.O. Serampore	100	11 2
w/o Late Dharendra Nath Dutta			
Mondal Smt Saroj Nalini	Vill Daharkundu	100	9 9
w/o Late Jamini Ranjan Mondal			
Mukherji Kumari Atpara	257, Battala Lane, Katrung	150	5 1
d/o Harani Mukherjee	P. S. Uttarpura		

Dist—BURDWAN

Banerji Smt Rekha	Vill & P. O. Somarpur	200	23 11
w/o Late Bijoy Kumar Banerji	P. S. Ausgram		
Dutta Smt Ava Rani	P. O. & Vill Dainhat, P. S. Rat	200	8 12
w/o Late Jamini Kumar Dutta			
Ganguli Smt Radharani	P. O. & Vill Jaogram	200	22 8
w/o Late Sakti Pada Gauguli	P. S. Jansipuri		
Raha Smt Nilima	Vill Nowgachi, P. O. Jahannagar	200	28 4
w/o Late Sudhir Chandra Raha			
Roy Smt Saali	P. O. & Vill Chandrapur	200	11 1

০/30

বিপ্লবী পুস্তকশালা

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী পুস্তকশালা খাঙ্গের-১০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাণবিহারী ঠাকুরের পুস্তকশালা-১০০

কীর্ত্তন কুমার দত্তের-

- | | |
|--|--|
| ১। বাংলায় অস্তিত্ব-১৫০ | ২। বহির্ভাগে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা-৮০০ |
| ৩। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী পুস্তকশালা-১০০ | ৪। গৌড়ানী সংগ্রাম কাহিনী-১০০ |
| ৫। গাঙ্গোত্রী পুস্তকশালা-১২৫ | ৬। কমলা বাজার সংগ্রাম কাহিনী-৪০ |
| ৭। রাণবিহারী ঠাকুরের অনুশীলন সমিতি-১০০ | ৮। অধীনতা পন্থার মা ও মেয়ে-৪০ |
| ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ-৪০ | ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ-৪০ |
| ১১। মহাত্মা ও অধীনতা-৪০ | ১২। ভারতের নবজাগরণ ও উন্নয়ন নিবেদিতা-১০০ |
| ১৩। দেশ দ্বারা ভোগেনি (১)-১০০ | ১৪। দেশ দ্বারা ভোগেনি (২)-২০০ |
| ১৫। মহান চন্দ্রশেখর আজাদ-৪০ | ১৬। ১৯৫ এপ্রিল জাতীয় মহান দিবস-১০০ |
| ১৭। হাফিজ হত্যার প্রচেষ্টা-১৫ | ১৮। ভারতের অধীনতা সংগ্রাম ও অস্তিত্বের সন্ধি |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পত্রিকা ইতিহাস-৪০ | ২০। লাইট হত্যার প্রচেষ্টা-১৫০ |

প্রাপ্তি স্থান :- ৪২/১ বঙ্গবন্ধু স্ট্রীট কলিকাতা-১০০০০৭

টেলিগ্রাম-১/১/১/A বঙ্গবন্ধু স্ট্রীট কলিকাতা-১০

30 JU

- সম্পাদক দল -

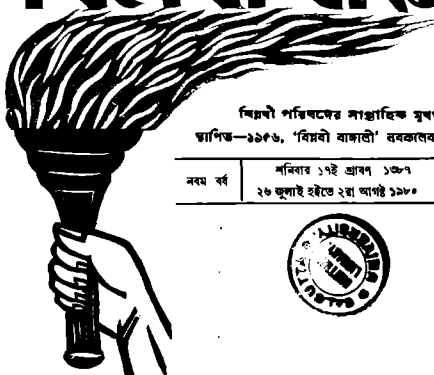
ঐক্যবদ্ধ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) ঐক্যবদ্ধ দল, ঐক্যবদ্ধ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক-ঐক্যবদ্ধ দল, ঐক্যবদ্ধ চট্টোপাধ্যায়

বিভিন্ন বিশেষ প্রতিনিধি-ঐক্যবদ্ধ দল, বোম্বা-ঐক্যবদ্ধ দল, পাক।

প্রকাশক ও মুদ্রক :- ঐক্যবদ্ধ দল, ঐক্যবদ্ধ চট্টোপাধ্যায়।

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
 ছাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' লবকাগারে—১৯৭

নবম বর্ষ	শনিবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ ২৬ জুলাই হইতে ২রা আগষ্ট ১৯৫৬	৪৫ সা
----------	---	-------



“দেশের কাজ আমার কর্মের অঙ্গ।

ইহা আমার জীবনের আদর্শ।

আমার দেশের কলনায় আমি

ভগবানের মূর্তি দেখতে পাই।”

—শেখবন্ধু চিন্তারঞ্জন।

আসামের আন্দোলনকারীদের মোচ নীত হবে।

আসাম রাজ্যে এতদিন মনুষ্য নৃষ্ট যে সমস্তার জন্য একটি গুরুতর পরিস্থিতির অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছিল। আজ প্রকৃতির কল্যাণে আসামের ভাগ্যাকাল উপলব্ধি করার প্রকোপে দুর্ভাগ্যের ঘোর ঘনঘটা অশ্রুনি সংকোচ দেখা যাচ্ছে। এই সময় দেশের সাহায্য ও সহায়ত্ব ব্যতীত আসামের অধিবাসীদের জীবন রক্ষা করাই ক্লেশ হবে। রাজ্যের প্রকোপটা শুধুমাত্র তথাকথিত “বহিরাগতদেরই ভোগ করতে হবে না। এর থেকে আসামের সাধারণ মানুষ এবং আন্দোলনের নেতারাও রেহাই পাবেন না। তাদের ক্ষয়ক্ষতি হবে সমূহ। তাহা একটি অঙ্গ-রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব থেকে সমগ্র দেশও রেহাই পাবে না। কাজেই অবিলম্বে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য প্রদেশের মানুষ আসামের প্রতি দৃষ্টি কর্তব্য করতে উদ্যিত করবেন না। এ বিশ্বাস সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরই আছে। কিন্তু যারা আসাম থেকে কোন জিনিষপত্র বাইরে যেতে দিচ্ছেন না, শিকিটিং করে যানবাহন সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অচল করে রাখতে চাচ্ছেন, তাদের কি ক্ষমতি হবে? আন্দোলনকারীরা ছই সপ্তাহের জন্য তাদের শিকিটিং করার কর্মসূচি বন্ধ রাখতে রাজী হইতেন বলে সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু কোন জীবের পুচ্ছদেশে বিষ যেমন সংরক্ষিত থাকে, তেমনি আসামে উৎপন্ন কোন জিনিষপত্র বাইরে যেতে না দেওয়ার সিদ্ধান্তকে মচল রাখবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এটা কি খোলা মন নিয়ে আলোচনার বসার মনুনা? এরা কি ভীত হয়ে পড়ছেন যে একবার আন্দোলন বন্ধ করলে আর থাকে পুনরুদ্ধারিত করা যাবে না? দ্বার দত্তা ও দেশের মানুষের মঙ্গলাকাজ্জল্য জন্য যদি তাদের আন্দোলন হয়ে থাকে, তবে তাদের সহায়ত্ব তো তারা সব সময়ই পাবেন, এটাই তো সাধারণ বুদ্ধিতে বলে। তবে তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন কোথায়? তা জিন্ন, অনেক জল ব্রহ্মপুত্র দিয়ে বয়ে গিয়েছে। আসাম সমস্তার সমাধান এবার করতেই হবে সমগ্র ভারতের ও আসামের প্রকৃত স্বার্থে। আসামের আন্দোলনকারীদের পেছনে যে ধলনেতা ধনিকার আড়ালে থেকে মৌখিক সহায়ত্ব দিক না

কেন, বিশদকালে তারা কোন সাহায্যই করতে পারবে না। অগণিত আসামে বসবাসকারী মানুষ ভীষণ অভিজ্ঞ হবেন। বস্ত্রের প্রকোপ যদি খটে, বেটা কোন শুভমুখি-সম্পন্ন মানুষ চান না, তবে তার মোকাবিলা করতে পারবে কি এই আন্দোলনকারীরা? আসামের মত একটি প্রকৃতিবস্ত্র সম্পদে সম্পদশালী রাজ্য যদি বস্ত্রের কবলে পড়ে কংসের মুখে পড়ে, তবে সমগ্র ভারতের অর্থনীতি অভিজ্ঞ হতে উদ্বিগ্ন হবে। নিরীহ নিরপরাধ মানুষের জীবন বিপন্ন হবে নিশ্চিতভাবে। এই দুর্ভাগ্যের সকলভাবে মোকাবিলা করতে পারেন সমগ্র দেশের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বাধীনে! সে কাজ যদি কারো অবিবেচনা-প্রসূত কাজকর্মের দ্বারা ব্যাহত হয়, তবে তাদের শুধু আসামেরই নয়, সমগ্র দেশের শত্রু বলেই গণ্য করতে হবে। এবং দেশ ও দেশের মানুষ বাঁচাবার জন্য যথা কঠোর করেই হবে কেন্দ্রীয় সরকার ও দেশপ্রেমিক নেতৃশ্রম ও ভারতবাসীকেই। এ ভিন্ন অন্য কোন রাস্তা দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যাশা করব, গোয়াহাট্‌মি, জি.পি. মিথ্যা প্রেক্ষিতের দোহাট দিয়ে এই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কারো উচিত হবে না। আলোচনার এসবার আগেই সেটা বার্ষ্য হবে, এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। অবশ্য যদি এই পরিকল্পনা থাকে, যে জাব হোক, অজাব হোক, আন্দোলনকারীদের সব দাবীই মানতে হবে নতজানু হয়ে, তবে সেটা হবে মূর্খের স্বর্ণে বাস করা। সুতরাং আমরা আলোচনা বৈঠকে তদানুগত একটা সমাধান করতেই হবে, এই সত্ত্বা নিয়েই দেখানে যোগ দিতে হবে। এই ব্যাপারে সফলতা অর্জন করার জন্য দুই সপ্তাহের জরুরিগত তিন সপ্তাহ লাগলেও মহাত্ম্যত অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং সেজন্য অধৈর্য্য হয়ে দেশবৈরীদের কোন কাজ করাও সমীচীন হবে না। আসামের অসংলগ্নতাবোধের মাধ্যমে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কঠোর রয়েছে। দেখানে তারা অস্বাভাবিক মনোভাব দেখালে সমস্ত দাবির তাদেরই নিতে হবে। তাদের ও বেধে নিতে হবে যে তারা প্রকৃত ভারতবাসী হিসাবে ভারতের স্বার্থেই কাজ করবেন, অথবা দেশবৈরীদের কৃমিকা পালন করবেন। আমরা প্রত্যাশা করি ভগবান তাদের স্তম্ভ বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করবেন। আমরা আবার প্রত্যাশা করব, তারা এই সন্ধিক্ষণে এমন কাজ করবেন না, যাতে তাদের স্থান হয় বলে ইতিহাসের আন্তরুড়ে।

॥ চট্টল বিদ্রোহের স্মরণ জয়ন্তী ॥

গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী ।

১৯৩০ সালের ১২শে এপ্রিল ভারতের প্রায় সবক'টি সংবাদপত্রের হেডলাইনে ছিল চট্টগ্রামে অত্যাচার লুণ্ঠনের লোমহর্ষ কাহিনী। চারদিন পর আবার সংবাদপত্রের পাতায় নাম উঠলো চট্টগ্রামের। জালালাবাদ পাহাড়ে অসম যুদ্ধে ১২ জন বিদ্রোহী যুবক নিহত, আর ক্ষেপীয়েল ট্রেনে পুলিশের চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করে চারজনকে পলায়ন। ২৮শে মে দেশের প্রধান পত্রিকাগুলি এক চাকল্যকর সংবাদ পরিবেশন করল। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের এক প্রধান নায়ক অনন্ত সিং ১৩নং লর্ডসিংহ বোডে আই, বি হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হয়ে সেক্সার আত্মসমর্পণ করেছেন। ২৪ সেপ্টেম্বর আর একটি চাকল্যকর সংবাদ সমস্ত দৈনিক কাগজে বেরল। চন্দনগরের গোপন ঘাটি পতীর রাতে অতর্কিতে আক্রমণ করে চার্লস টেগার্ট' চট্টগ্রাম অত্যাচার লুণ্ঠনের দুই প্রধান নায়ক লোকনাথ বগ ও গণেশ ঘোষ সহ অনন্ত গুপ্ত, শশধর আচার্য মহাসিনী গাদুলীকে ধন্দী করেছেন। জীবন গাদুলী পুলিশের গুলিতে নিহত। পুলিশ ইন্সপেক্টর আমানুল্লাহকে বেলায় মাঠে বসিন ১৫ বছরের বালক হরিপদ ভট্টাচার্য হত্যা করেছিল তার পরদিন সংবাদপত্রের পাতায় চট্টগ্রামের নাম আবার বড় করে ছাপা হয়। আত্মগোপনকারী বিদ্রোহী নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তীর গ্রেপ্তার ও লাঞ্চার বঙ্গলা নেয় হরিপদ। এই বিদ্রোহের শেষ বিস্ময়কর সংবাদ বেরল ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ সাল। সূর্যসেন—মাষ্টারদাকে ক্যাপটেন ক্যামেরন গোপন ঘাটিতে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করেন।

এ যাবৎ বহু ভারতীয় তরুণের কাছে চট্টগ্রামের নাম অজ্ঞাত ছিল; হস্ততো আরো বহু বছর অজ্ঞাতই রয়ে যেত যদি না চট্টগ্রাম অত্যাচার লুণ্ঠনের মত ঘটনা না ঘটত। ভারতের স্বাভাৱ্য সাধনা গঙ্গা-যমুনার মত পানাপানি দুই পথ অনুসরণ করে প্রবাহিত ঈর্ষাস পথ ও হিংসাক্রোধী পথ। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রাম অগ্র-গামীর হুমিকা নিয়েছিল। এ স্বীকৃতি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীজী দেন। হিংসাক্রোধী অভ্যুত্থানেও চট্টগ্রামের হুমিকা সর্বাঙ্গগণ্য ছিল। বিপ্লবী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় চট্টগ্রাম অত্যাচার লুণ্ঠনের সূচনা ও শেষ এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। পঞ্চাশ বছর পরেও সে কাহিনী আমাদের চিত্তে সমভাবে ভাসবে। বিপ্লবীরা ভাল করেই জানতেন সরকারী ঘাটি লুণ্ঠন ও দখল করলেও সেটা বেশীদিন কড়াতালে রাখা যাবে না। অসম সম্মুখ যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে দ্রুতাবরণ করতে হবে। তবে জেনেছিলেন এই death programme নেওয়া কেন? তার জবাবও বিপ্লবীদের কাছে ছিল সুস্পষ্ট। দৃঢ় বিশ্বাস চিত্তে জেগেছিল—‘তাদের প্রাণ দানের ভিত্তি দিয়েই দেশের অগণিত জনসাধারণ নতুন প্রেরণা; নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন জীবন লাভ করে সাম্রাজ্যবাদী মাসনের বিকৃত অতুপ্রাপিত হয়ে উঠবে।’ ‘বহু প্রচেষ্টা বহু বিক্রম বহু ত্যাগ স্বীকারের পরেই কোন জাতির মুক্তি প্রচেষ্টা সফল হয়’—এ বিষয়ে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তাই নিজেদের আত্ম-বলিদান ছিল লক্ষ্য। আত্ম-বলিদানের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামের দিকে দেশকে

এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁদের প্রবল উচ্ছ্বাস। যশলাভের ইচ্ছা, খ্যাতির উচ্ছ্বাস, প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাভের ইচ্ছা, আরাম ভোগের উচ্ছ্বাস তাঁরা ভাগ করেছিলেন। তাঁরা পণ করেছিলেন—মরব, মরার আগে মারব; মরে দেশের মুক্তি আনব। এই ভাবে মরার ইচ্ছা।

ইংরেজ-শাসক দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই বিদ্রোহীদের এনাকিষ্ট, ক্রিমিনাল, সন্ত্রাসবাদী, বড়বড়কারী, ডাকাত অথবা গুণ্ডা বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছে। এদিকে মার্কস সাহেবের দর্শন অধ্যয়ন করে, সেনিনের ব্যাখ্যা পড়ে ও স্ট্যালিনের চিন্তা আদর্শ ধরে আমাদের দেশের কিছু বামপন্থী সেনিনের বিজ্ঞান প্রচেষ্টাকে বাটো করতে চেয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে অশেষী দুপের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল গোটাকতক সাহেব খুন করা অথবা খুন করার চেষ্টা চালান, সঙ্গে সঙ্গে দেশী গোয়েন্দা ও অত্যাচারী পুলিশ অকিসারকে হত্যা করার চেষ্টা। এই প্রচেষ্টার মধ্যে স্বাধীনতার তেমন কিছু ছিল না। গণচেতনার কোন প্রোগ্রাম ছিল না। মধ্যবিত্ত ঘরের কস্তকগুলি কুল-কলেক্টর ছেলেদের বেশ প্রেমের উৎকট সেক্সিমেটে মাড়ির তুলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। সেনিনের বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি না করে ইরানীদের এই ভাবিক বিশ্লেষণ বড়ই ভ্রান্তিমূলক। জাপান থেকে বাসবিহারী বহু তাঁর বন্ধু চন্দননগরের ব্রিগেড বোম্বকে লিখিত একপত্রের আশ্বাসের করে লিখেন - 'আমার ভিতরটা কি কেউ দেখেছে, দেশের জন্ত সবটা পেতে দিয়ে যে বসে আছি, সেটা কি কেউ দেখেছে; তারা বোম্বের দেখে আমি বোমা আর রিকলডার, আর বড়বড়ের একটা মন্ত খেলোয়ার।' চট্টগ্রাম বিদ্রোহের

পরিকল্পনাটি খুঁটিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যায়—মায়কগণ 'প্যারি কমুন', মস্কো 'ইনসাবেকশন' 'অক্টোবর রেভলুশন' 'মাংহাই আপরাইজিং' ইত্যাদির ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে মূলখল ভলেন্টারি বাহিনী বাংলার তরুণচিহ্নে অতৃপ্ত প্রেরণা সঞ্চার করে। চট্টগ্রাম সকল কক্ষেই স্বাগতম। স্বর্গদেব-মাতারদা সেখানকার নায়ক। এক দিকে জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট তিনি, আবার বিপ্লবী শোস্তির অবিসংবাদী নেতা। তাঁর একান্ত পার্শ্ব—অমিত্র চক্রবর্তী, নির্মল সেন, পদ্মেশ বোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ কল। ১৯২২ সালে প্রকাশিত সংগঠন করলেন কংগ্রেস ভলেন্টারি বাহিনী। নিয়মিত হাজিরা, কুচকাওয়াজ, লুখলা রক, সাহসীকতার তালিম চললো নিয়মিত। ছড়তা ও আড়ষ্টতা ভাঙ্গার নানারূপ প্রকৃষ্ণা চলে দিনের পর দিন। বহুর মধ্যে থেকে বাছাই শুরু হয় সত্বর্ণণে। সংগৃহীত হলো ৬৪টি ডাক্তার ডাক্তার—বাদের বাইরে থাকবে নিরীহ কংগ্রেস কর্মীর আত্মরক্ষা, ভিতরে থাকবে বিদ্রোহের বহিঃ ও কঠোর পণ। সকলের উদ্দেশ্য থাকবে মূলত সংগঠন, হুসাইন ও বীরের মৃত্যু বরণ। মৃত্যু হবে একটি—'do or die'। লাহোর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিল এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছালে—পরবর্তী ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩০) দেশের সর্বত্র কংগ্রেস কর্মী প্রকাশ্য স্থানে কংগ্রেস পতাকা পূর্ণস্বাধীনতার উত্তোলন করবে এবং স্বাধীনতার লক্ষ্য-বাক্য পাঠ করবে। মাতারদা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পতাকা উত্তোলন করলেন, লক্ষ্যবাক্য পাঠও করলেন স্বাধীনতা, কিন্তু আত্মতুষ্টি পেলেন না। দেশের সামনে দাঁড়াতে তুলে ধরতে চাইলেন—স্বাধীনতা অর্জনের পথ এটাও নয়, অস্ত। গোটা বিশ্বে উপনিষদের

বিকল্পে অভ্যর্থনাব্যবস্থার অভাব ছিল।

পার্বত্যবর্তন সত্ত্বেও একেবারে তৈরী হলে প্রায়। চট্টগ্রাম মহরে রক্তিশেষ যেকটি শক্তি-কেন্দ্র রয়েছে সবগুলি একই সঙ্গে অভ্যর্থনিত আক্রমণ করা হবে; ইজিবন জ্যাক নামিয়ে ফেলে, প্রতিটি গৃহে কংক্রিট পতাকা তোলা হবে। গভীর কাঁটার কাঁটার কাজ হবে ও বিজ্ঞান গভিতে কাজ চলবে। পদক্ষেপ হবে—গঠন, দখল, প্রতিরোধ ও মুক্তা। ১৯৩০ সালের ১২ই এপ্রিল শুক্রবার রাত ঠিক দশটার আক্রমণ চালাবার ‘জিহো আওরার’। কেন এই দিন? ইষ্টার বিজ্রোহের শুভদিন এটি। আয়ারল্যান্ডে সংঘবদ্ধ একদল বিপ্লবী তরুণ রুটিশ নাপাশ মুক্ত হবার ক্ষণ ১২ই এপ্রিল বিজ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সেদিনের স্মৃতি চট্টোগ্রামের বিজ্রোহের সঙ্গেও মূল হোক। নিছক সন্ত্রাস সৃষ্টি নয়, অস্তি সামান্য অস্ত্র নিয়ে সংঘবদ্ধ আক্রমণ ও যুগবিজ্রোহের জাতি কোন শহর দখলে আনা যে সম্ভব তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে দেশবাসীর সামনে। লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের নেতৃত্বে একদল তরুণ ভারতীয় অকজিলারী কোর্সের অস্ত্রাগার গঠন ও দখল করবে। পুলিশের অস্ত্রাগার আক্রান্ত হবে অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে। নগরেশ্বর পরিচালনা ইউরোপীয়ান ক্লাবে হানা দেওয়া হবে; পাঁচ মিনিট আগে রাত ৯-৫৫ মিনিটে টেলিফোন ও টেলিগ্রাম অফিস আলিয়ে দেওয়া হবে; নেতৃব দেবেন অস্ত্রিকা চক্রবর্তী। চারজন করে তরুণের দ্বিটি গ্রুপকে একদিন আগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে—দুম ও লাঙ্গবা-বাট স্টেশনে। রেলপথ ধরে করে তাড়া, যাতে চট্টোগ্রামের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায়। কখনো জাহাজের ওয়ারলেস সিস্টেম অচল করে দেওয়া হবে যেন বাইরে সংবাদ প্রেরণ বিলম্বিত

হয়। তড়িৎ গভিতে এই কার্যগুলি সম্পাদন করে সকলে এসে জমায়েত হবে পুলিশ লাইনে। বিজ্রোহী বিজ্রোহী আর্মির বাট স্থাপিত হবে সেখানে। তারপর একসঙ্গে মাঠ করে শহরে গিয়ে ইম্পিরিয়াল বাস ও আয়েয় অগ্নের দোকান দখল করে নেওয়া হবে। সেন্ট্রাল জেল আক্রমণ করে কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হবে। সর্বাধিনায়ক মাষ্টারলার নামে শহরের তরুণদের কাছে আহ্বান জানান হবে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মির শক্তি বৃদ্ধি করতে। প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রত্যেকের হাতে আয়েয় অস্ত্র দেওয়া হবে। বিজ্রোহীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিবরণ উল্লেখ করে, চাত্র, যুবক জনসাধারণের সমর্থন চেয়ে শহরে প্রচুর পাম্পেট ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

প্রাচীন ছিল সৃষ্টিশীল, কিন্তু বিধিভিলা বাদী। প্রচুর রিভলভার ও রাইফেল নিশল অকজিলারী কোর্সের দুর্গে, কার্টিজের সন্ধান পাওয়া গেল না এটাও। অকেশ রইল আয়েয়স্ত্র। পুলিশের অস্ত্রাগার পেট্রল জেলে আলিয়ে দিতে গিয়ে হিমাংশু হলো অগ্নিদগ্ধ। শুভক্রাইডের রাত থাকার ইউরোপিয়ান ক্লাব আগেই হয়ে যায় বন্ধ। অসম্পূর্ণ রইল অনেক কাজ; পুলিশ লাইনে সকলে জমায়েত হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রোগ্রামে আর হাত দেওয়া গেল না। শুক হলো আত্মগোপন, পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ, বিচ্ছিন্ন হয়ে সংগ্রাম, জেলখানায় বসে বড়বড়, বিচার, স্বীকার্য একের পর এক চলতে থাকলো এই বিজ্রোহকে কেন্দ্র করে। শেষ হলো নির্মল সেন ও প্রীতিসিতার জীবন আগুতিহনে এবং মাষ্টারলার কাসিতে। বিচারের সময় বিজ্রোহী পক্ষে সওয়াল করেন মুজিব চন্দ্রের বড় শরণ চন্দ্র বসু। কচি বালক হরিপদর উপরে পৈশাচিক পুলিশী বৈষ্যত্বের প্রতিবাদ জানান রুটিশ পার্লামেন্টে জে. এম. সেনগুপ্ত।

এর পর ১৮ পাড়ায় দেখুন।

আমরা মনে কৰি

- কোন ব্যক্তিৰ আন্দোলনকাৰীৰা ঠিক কৰাত পাৰেন না। বিদেশী নাগৰিক কৰা। ঠিক কৰবেন সরকার জাতীয় ভিত্তিত সৰ্বদলীয় মতামত নিয়ে।
- সংস্থালক্ষণেৰ নিৰাপত্তা কেউ কোন কাৰণেই বিঘ্নিত কৰাত পাৰেন না। ভাৰতৰ নাগৰিক হিসাব যে কোন ব্যক্তাই আমতা বসবাস কৰাত পাৰি। প্রত্যেকটি ব্যক্তাই সংস্থালক্ষণেৰ নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰ মৌলিক।
- কোন একটি ব্যক্তিৰ প্রাকৃতিক সম্পদ কেবলমাত্র সেই ব্যক্তাই দাবী কৰাত পাৰেন না। ভাৰতৰ যে কোন ব্যক্তিৰ প্রাকৃতিক সম্পদেৰ উপৰ অধিকাৰ সমগ্র ভাৰতবাসীৰ।

জাতীয় সংহতি রক্ষা কৰুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাক্তন ছাত্রনেতা বীরেন রায়

বীরেন রায় ১৯২৮ সালে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির (A B S A) প্রমোদ ঘোষাল, বীরেন দাসগুপ্ত, শচীন মিত্র ও জগদীশ চ্যাটার্জির সহিত একসঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা ছিল। বীরেন ছিল Presidency college এর একজন কৃতী বিজ্ঞানী ছাত্র।

১৯৬৫ সালে জামুয়াবী মাসে বীরেন তার বশত বাড়ী ছাড়া সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে একটি দানক সংস্থা (Charitable Trust) স্থাপন করে। এটার থেকে কয়েকটি দানব্য চিকিৎসালয় চালানো হয় এবং বিদ্যার্থীদের ও সাহায্য করা হয়। ১লা জুলাই ১৯৮০ সালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বীরেন বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দান করে, এ টাকার সেখানে একটি প্রযুক্তিগত পরীক্ষা ও গবেষণাগার তৈরী হবে। বীরেন ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান সন্থ (দিল্লি) (Indian National Science Association New Delhi) ও আই,আই, টি, (কলকাতা) (Indian Institute Of Technology) কে বৈজ্ঞানিক ও পরমাণু বিজ্ঞান এর ক্লাস (Course) খোলা ও চালানোর ক্ষমতা দিয়ে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দান করছে। বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণাগারটি বীরেন রায় এর নামেই চালু করছে। আমরা আমাদের একজন সহকর্মীর এই সুকার্যে নিজেদের গর্বিত মনে করছি।

১৯২৫-২৭ সালে ৬ কিংগ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ এনে বিব্রণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন! এই সময়ে ১৯২৭ থেকে বীরেন কলিকাতা বেতার কেন্দ্র বা তখন নারকোনি আন্তর্জাতিক কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হতো তাতে মহিলা মহল, ছাত্রদের ধর্মী এবং সকালের বঙ্গ ইত্যাদির ভার নিয়েছিল। বীরেন এরই উদ্যোগে ভারতে সর্বপ্রথম বেতার মারফত বিজ্ঞাপন চালানো শুরু হয়—আজকের ‘বিবিধ ভারতী’ তার ই নকল মাত্র। ভারত সরকার ‘বেতার চালনা’ (Broadcasting) হাতে নিলে বীরেন ওই সংস্থা থেকে সরে আসে। প্রথম দ্বিতাবী ‘বেতার সাপ্তাহিক’ বার নাম ছিল ‘Indian Radio News—মেঘদূত’ বর্তমানে চিত্তবর্তন এভিনিউ তখনকার ‘সেন্ট্রাল এভিনিউ’-র আই, আর, পি কোম্পানীর (I, R, P, Company) অফিসে বীরেনের সম্পাদনার ১৯২৭ সাল থেকে বার হ’ত। ১৯২৯ সালে ৬ কিংগলা সরকারী প্রেস থেকে বীরেনের বিবরণী বই ‘বেঙ্গালী’ প্রকাশ করেন। উহা প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যেই তখনকার ইংরেজ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। ভারত স্বাধীন হবার অনেক পর বইটি পুনঃ

প্রকাশিত হয় এবং এ কাহিনীর সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে বীরেন ১৯৬২ সালে একটি বিপ্লবী চিত্র 'অগ্নিদগের কাহিনী' তৈরি করে। বীরেন বেঙ্গল টাইমস্‌ ক্লাবের একজন প্রতিষ্ঠাতা। ভারতে ইহাট প্রথম বেসরকারী বিমান চালনা বিদ্যালয়। বীরেন নিজেও ছিল ১৯২২ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত একজন সক্রিয় বৈমানিক। এট সময় বীরেন বেতার বহু নির্মাণ সম্বন্ধে পাঁচ ছদ্মবানি বইও লেখে যা ভারতে প্রথম।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী পৌর প্রধানও হচ্ছে বীরেন। ১৯৩৩ সালে ২২ বছর বয়সে বীরেন দক্ষিণ মহরতলা পৌর প্রতিষ্ঠানের (South Suburban Municipality) পৌরপ্রধান নির্বাচিত হন এবং এই পদে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বরাবর অধিষ্ঠিত ছিলো। এবং পৌর প্রধানদের নিয়ে গিল্লীর সভা থেকে একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে বার্লিন (Berlin) যাত্রা করে এবং সেখানে বিশ্ব পৌর সংঘে (World Municipal Congress) ভারত এবং প্রাচ্য দেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে জার্মান ভাষার বক্তৃতা দেন, বীরেন একমাত্র ভারতীয় যিনি জার্মান পার্লামেন্টের উপর অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন দেশের পতাকা র সঙ্গে ভারতের ত্রিভুজিত কংগ্রেস পতাকাকে সম-সম্মান দিয়ে উন্মোচন করেন। এই জন্ত পরে বীরেনকে ইংরেজ পুলিশ এবং সোভিয়েতদের হাতে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

বীরেন ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ২৪ পরগণা হাওড়া ও হুগলী পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের (West Bengal) বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। এবং ১৯৫২ সালে দক্ষিণ পশ্চিম কলিকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বীরেন বিল্লীতে রাজ্য সভার সদস্য ছিলো।

বীরেনের সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান এয়ারম্যান ও স্পেসম্যান' (Indian Airman & Spaceman) বৈমানিক মাসিক পত্রিকা, ১৯৪৭ সাল থেকে আজ ৩৪ বৎসর নিয়মিত বার হচ্ছে এই পত্রিকার আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। এবং এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রথম মহাকাশ পর্যটনকারী যুরি গ্যাগারিন (yuri gagarin) বীরেনের হাত থেকেই ইন্ডিয়ান স্পেস ট্রফি (Indian Space Trophy) গ্রহণ করেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস-ই দলের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

স্টাফ রিপোর্টার

গত রবিবার পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত উপনির্বাচনে কংগ্রেস-ই দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সি, পি, এম দলের আসন কংগ্রেস-ই দল কার্যত কেড়ে নিয়েছে।

এ পর্যন্ত বোঝিত ১২০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস (ই) দল পেয়েছে ৫২টি আসন এবং সি পি এম পেয়েছে ২৫ আসন। এছাড়া নির্দল প্রার্থীরাও নির্বাচনে ভালো ফল করেছেন।

সি, পি, এম দলের শত্রু বাঁটি বঙ্গে পরিচিত বর্ধমান জেলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস-ই দল পেয়েছে ১২টি আসন, নির্দল প্রার্থীরা পেয়েছেন ৩টি আসন এবং অবশিষ্ট ১৪টি আসন পেয়েছে সি, পি, এম দল।

মালিঙ্গা জেলায় এদিন পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে ১০টি আসনের ফলাফল বোঝিত হয়েছে, তার সবগুলিই পেয়েছে গোথালীদেব। এই নির্বাচনের ফলাফলে এটা প্রমাণিত হলে যে, মালিঙ্গা-এ গোথালীদেব তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এদিকে ২৪ পরগণা জেলায় চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপনির্বাচনে কংগ্রেস-ই প্রার্থী আসক আলি সিখাই জয়ী হয়েছেন।

তিনি তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি সি পি এম প্রার্থীকে শরবিন্দু মিত্রকে ১২৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। কংগ্রেস-ই পেয়েছে ৫৪৫টি ভোট এবং সি, পি, এম পেয়েছে ৩৪৮টি ভোট। এবারের উপনির্বাচনে সি পি এম প্রার্থী শরবিন্দু বাবু তার পিতার মৃত্যুর ফলে যে আসন শূন্য হয়, সেই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হলেন।

গত রবিবারে ২২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৩টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৪টি জেলা পরিষদ আসনের ক্ষত নির্বাচন হয়।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস-ই ২৬২টি অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী প্রার্থী দেয়। সি পি এম দল দেয় ২৫০টি প্রার্থী। অন্ততঃ ৫০টি ক্ষেত্রে সি পি এম এবং কংগ্রেস-ই দল সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। কয়েকটি কেন্দ্রে সি, পি, এম বামফ্রন্টের অগ্রতম শরিক দল কংগ্রেস-ই ব্রক ও অ্যুর, এস, পির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

রেশনের মাল প্রকাশ্যে কালো বাজারে যাচ্ছে, আর শ্রুধীন কুমার নিত্য চিন্তাচ্ছেন

নিম্নে প্রতিিনি

কলকাতা রেশনিং এখন সারা রাজ্যের কালো বাজারকে জীবিয়ে রেখেছে। চাল, ডাল, গম প্রভৃতি যা কালো বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে তার বেশির ভাগই রেশন দোকান থেকে আসছে।

যে কোন রেশনের দোকানে একবার গেলেই দেখবেন রেশন কার্ডধারীরা চিনি ছাড়া কিছুই নিচ্ছেন না। এমন কি মুটে-মজুর কি চাকরদ্বাও রেশনের চাল গম কিনছেন না। সর্ব্বেষ্ট এক কথা : অখাদ্য যেরে কি প্রাণ দেব ?

কেন্দ্রের খাদ্য করপোরেশন যে চাল দেন, রাজ্যের খাদ্য দপ্তর তা বাচাই করে দেখে নেন। কেনার আগে এজিওয়ে দেখার জন্য খাদ্য দপ্তরের মোটা বেতনের অনেক কর্মচারী আছেন। তাঁরা ভাল দেখে যে চাল কেনেন রেশন দোকান থেকে বিক্রির সময় তা অখাদ্যে পরিণত হয় কেন ?

কারণ চূড়ি। লরি কন্ট্রাকটর, গুলাম মালিক, খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী সকলের পকেট ভর্তি করতে গেলে চাল-গম অখাদ্য হবেই। এই অখাদ্য কেউ না কিনলে কি হবে খাদ্য পাত্রে বিতরিকিনি ঠিকই চলছে। তাই রেশনের দোকানের চাল চলে আসে রাজপথে। সেখানে শুধু গরিবেরাই কেনেন না। কেনেন ধনীরাও। মুদগী, গরু, ভেড়া এবং ঘোড়ার ভাল খাদ্য ঐ অখাদ্য চাল। ক্যানিং ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি লংগের যান, দেখবেন রাস্তার মেলে কলকাতার রেশনের গম চাল বিক্রি হচ্ছে।

কেন্দ্র থেকে খাদ্য দপ্তর প্রচুর পরিমাণে বেপসীড অয়েল দিলে কি হবে, সে ডেল রেশনে খাবার জো নেই। গোপন পথে সেই বেপসীড চলে যাচ্ছে পোস্তা বাজারে। সেখান থেকে সারা রাজ্যে। রেশনে বার নাম সাড়ে আট টাকা বাজারে তা বার টাকা ধানেশ বিক্রি হচ্ছে।

এই কাণ্ড যখন চলছে খাদ্যমন্ত্রী শ্রুধীন কুমার তখন দিল্লির কাছে আরও চাল গম দাও বলে চেলাচ্ছেন কোন প্রয়োজনই ছিল না। যে চাল গম বিক্রি হচ্ছে না সেগুলো যদি সরকারীভাবে বিক্রি না হয় এ রাজ্যে চাল গমের কোন অভাবই থাকে না। বিশ্বাস না করেন তৌ খবর নিন দেখবেন আগনি চাল গম না নিলে কি হবে কী দপ্তর আপনার নামেই ওগুলো বিক্রি হয়ে থাকে।

সৌ: জয়নী

পুলিশ, শ্রম দপ্তর ও সি ই এস সি একজোট নতুন খেলায় মেতেছেন

নিম্ন প্রতিনিধি

পুলিশ, শ্রমদপ্তর এবং সি ই এস সি এখন একজোট হয়ে নতুন খেলার মেতেছেন। সম্ভ্য সাতটা বাজলেই সল বেধে ওরা বেরিয়ে পড়ছেন। কোন দোকানে আলো জ্বলে দেখলেই লাইন কেটে দিচ্ছেন। এই নতুন অভিযানে ইতিমধ্যেই একশতটি দোকানের বৈদ্যুতিক তারের গলা কাটা গেছে।

ব্রাহ্মপুর্নের ঐ অভিযানকে টেকা দিচ্ছে ওয়ার্কার্স পার্টি পরিচালিত একটি ইউনিয়ন, যার দোলতে প্রাক্তন মহী জ্যোতি ভট্টাচার্য আবার 'ভাইতা উঠতি চেষ্টা করিতেছেন।' লালবাতা নিয়ে তারা দোকানে দোকানে যাচ্ছেন। এবং সকলকে বাধা করছেন সাতটার মধ্যে দোকান বন্ধ করতে। এই বাধা করাটা সর্বত্র খুব সহজ কাজ হচ্ছে না। কোথায় মার দিচ্ছে আবার কোথায়ও বা থাকে।

বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্য এত মেहनত, এর প্রতিদান বলে কিছু নেই কি? আছে আছে। 'সি ই এস সি কাউন বাবল মোটা' টাকা পাচ্ছেন। সবকারের গল্লেরও কিছু থাকে।

আর পুলিশকে যদি জানেন তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ওরা কাজে হাত দিলেই হাত ভরে যায়। এখন অবস্থা হচ্ছে বিচার। দেখা যাক পুলিশ সপস প্যাণ্ড এসটাবলিস-মেন্টের কর্মীরা সকলেই করিবকর্মী সকলের হাতই ভরে উঠেছে।

কিন্তু বিদ্যুৎ বাঁচছে কি? জানিনা। তবে লোডশেডিং বেড়েই চলেছে।

ব্রাহ্মপুর্ন কিন্তু রাজপথের হকারদের আলোক সম্ভার বাধা দিতে সাহস করছে না। একজন পুলিশ অফিসার অফুংসাহী এক সি ই এস সি কর্মীকে নাকি বলেছিলেন, ওরিকে শ্রাম চেয়ে না, চেয়ে না।

মে: গুননী

একটি আবেদন

আগামী ২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ বিপ্লবী বাঘা যতীনের স্মৃতিবিজড়িত বালেশ্বর দিবস এবং ঐ দিনই 'বিপ্লবী-বাংলা' সাপ্তাহিক পত্রিকা তার নশম বয়ঃক্রমে পদার্পণ করছে। এই উপলক্ষ্যে ঐ দিন 'বিপ্লবী-বাংলা'র একটি বিশেষ প্রকল্প প্রকাশের আয়োজন আমরা করেছি। এই সংখ্যার প্রকাশের জন্য মূলত: বালেশ্বর দিবসের তাত্পর্য এবং বাঘা যতীনের বৈপ্লবিক কর্মবাহা সম্পর্কে শুভাসমৃদ্ধ রচনা আহ্বান করা হচ্ছে। 'বিপ্লবী বাংলা'র নবী-পাঠকবৃন্দ এবং চিত্রশিল্পী পৃষ্ঠপোষকগণ আমাদের আবেদনে সাড়া দেবেন বিশ্বাস রাখি।

স. বি. বা

রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" এর থেকে অধ্যায়]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

১৯১২ সালে মডারেট পার্টির ইংলেণ্ডে ডেপুটেশন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গোড়ার দিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে মি: মর্টন প্রথমটাই প্রতিজ্ঞাতি দিয়েছিলেন। কোনরূপ কার্যকারিতা পরীক্ষা না করেই সেই প্রতিজ্ঞাতি থেকে এই যুক্তিতে সরে যাওয়া যে এটা অকার্যকর, লর্ড রোনাল্ডসে এবং তার গভর্নমেন্টের ভাবাব বলা যায় যে তা একটা বিশ্বাস ভ্রমের কাজ।

আমার মনে হয় এই যুক্তিতেই কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে চূড়ান্তভাবে মনস্থির করে ফেলেছেন। আর ব্রিটিশ জনমতের ব্যবহৃত মতো যাদের মনোভাব ছিল সেগুল্যমান তাদেরও এই ভাবেই সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে। ব্রিটিশ গণজন্মের নামে একটা প্রতিজ্ঞাতি দেওয়া হয়েছে, এখন তা থেকে তো আর প্রত্যাখ্যান করা চলেনা। একথা মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় আপনাতা। এখানে সেখানে কিছু ব্যতিক্রম হাজা, মোটামুটি ভাবে সকলেই যৈত-শাসনের বিরোধী ছিলেন। স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে পাঁচটি সরকার যৈত শাসনকে অবাঞ্ছনীয় ও অকার্যকর বলে এর বিরুদ্ধে তাদের ডেচপাচ তৈয়ার করেন তেবলমাত্র, বাংলা ও বিহার এই দুটি সরকারই এই ব্যবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। আর মডারেট দলও জরুরী কমিটির কাছে তাদের সাক্ষ্য দান কালে তা সমর্থন করেছেন। তবে মডারেট দলের এই সমর্থন এই ক্ষত নয় যে তার এই ব্যবস্থার খুব আত্মসম্মতি হয়েছিলেন বা তারা সরকারকে আরও উদার করার প্রচেষ্টার আর এগোবেন না।

তারা সমর্থন করেছিল এই কারণে যে তারা যুক্তিতে পারলেন যে এই ব্যবস্থাকে সমর্থন না করলে যে অসুস্থতা দানের প্রতিজ্ঞাতি দেওয়া হয়েছে তা হারাতে হবে এবং ফলে দারিদ্র্যশীল সরকার লাভের আশা অনিশ্চিত কালের জন্য স্থগিত থাকবে।

কিন্তু জরুরী কমিটি যখন টেমস্ নদীর ভটুফ্রিতে নীরব ও ল'স্ট কন্সে বসে তাদের কাজ করে থাকেন, ঠিক সেই সময়ে ভারতে কুশাসনের ফলে উদ্ভূত আর একটি আন্দোলনের মধ্যে ভারতের শিক্ষিত সমাজ বিক্ষোভে উদ্ভাস হয়ে পড়ল। এই বিক্ষোভ দেখা দিল পাঞ্জাব, স্তার হাইকোল ও ভাদারের এক বিধগুরুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণের ফলে। তা: কিচলু ও মি: সত্য পালের নির্ধারন, অনুভবের জন-জাগরণ এবং তার সঙ্গে অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি। সাময়িক আইনকারি এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের গোমর্হরক হত্যাকাণ্ড সমস্ত ভারত জুড়িকা। এমনভাবে দাবানলে জালিয়ে দিল যে তাকে প্রশাসিত করতে বহু বছর লেগে যাবে। এই দাবানল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সবত্রই ছড়িয়ে পড়ল এবং এক সময়ে সকলের দৃষ্টিতেই উজ্জ্বল হয়ে ফুলল এবং শাসন কাব্যকে সু-অভিগ্রাহ্য প্রবৃত্তি বলে মনে হতে লাগল। লর্ডচেমসফোর্ড চেয়েছিলেন তাদের অপোচনার জন্য একটা শাস্ত পরিবেশ। কিন্তু পাঞ্জাব সরকারের কার্যাবলী এখনই

এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল যে, কেবলমাত্র পাজাবকেই নয়, সকল ভারত কৃষিকেই এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও ক্ষোভিতার মধ্যে ফেলল এবং তারই প্রতিক্রিয়া সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত ডেপুটেশনগুলির মনো-জ্ঞানের উপর অত্যধিক পরিমাণে গভীরভাবে পড়ল।

ইংল্যাণ্ডে একটি জনসভা হল। তাতে লেবার পার্টির কয়েকজন সমস্ত উপস্থিত ছিলেন। সি. হাউন্সের কাছে বিখ্যাত উপস্থাপিত করা হল। 'মডারেট পার্টি' একাধিকবার তার সঙ্গে আলোচনা করলেন। কেবলমাত্র আমরাই প্রকাশ্য তত্ত্বের দাবি জানালাম এই সেই তত্ত্ব কমিশনের অন্য ভারতীয় কমিশনারদের নামের তালিকাও পেশ করি। আমরা ভারতের পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাদের নিজস্বের বিচার হৃদয়ের আলোকে মত-পরামর্শ দান করলাম।

কেবলমাত্র খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপার ছাড়া এক্ষেত্রে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে কোন মত-পার্থক্য ছিল না। পাজাব সরকারের কার্যাবলীতে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এক সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে এবং ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকারী আমাদের বেশবাসিগণের মধ্যে তা বিস্তার লাভ করে। হৃৎকের বিষয় যে, ভারত সচিব এ. ব্যাপারে যে ডেচপ্যাচ পাঠান তার মধ্যে পাজাব সরকারের এই কার্যাবলীকে যে অনুমোদন করা হয়নি সে কথাটি আরও সম্পূর্ণ ও পুরোপুরি ভাবে ব্যক্ত করা হয়নি। বোঁকু নিন্দা করা হয়েছে তার মূর আরও দৃঢ়ভাবে ধ্বনিত হয়নি। তাছাড়া পরবর্তীকালে লর্ড সত্যাব যে বিতর্ক হয় তাতে পরিস্থিতি আরও বোঝা গিয়ে ওঠে।

অবশ্য সময়ের অভিক্রমণে সব কিছু উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায়। কিন্তু জাতির জীবনে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তা এখনও শুকাইনি। পাজাবে গণচেতনার গভীর প্রবেশে বিষ থেকে যায় যা দেশের অফলেও মহানুভূতিপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এর সঙ্গে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী মিলিত হয়ে এখন অতীতের গুরুত্বজনক স্মৃতিক জাগিয়ে তোলে এখন হৃদয়ের গভীরে স্থিত বিক্ষোভের অনুভূতি বাইরে প্রকাশ পায়। রাজকার্য পরিচালনার কূর্ব্বের ফলে যে ক্ষতি সাধন করা হয় সে সম্পর্কে শাসন কর্তাদের প্রতি এটা একটা কঠোর সতর্কবাণী। অস্বাভাবিকতার অবশ্যই অবিকমাত্র তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। রাজ্য পরিচালকদের এই কেওয়ারের লিখন পাঠ করে শিক্ষালাভ করা উচিত।

ডেপুটেশনের তাত্ক্ষণিক কাজ ছাড়াও অন্য কিছু কিছু কাজে আমাকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। ভারত সচিব আমাকে একটি অচুসন্ধান কমিটির সমস্ত নিযুক্ত করেছিলেন। এই কমিটির কাজ হল ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় স্থায়ত্বশাসনে মূল্য প্রতিক্রিয়াগুলির কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি ভারতে প্রয়োগ করার উপযোগিতা সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়া। এই কমিটিতে আমার সহযোগী ব্যক্তি ছিলেন তারা সকলেই আই, সি, এলসের লোক। তারা এখন ইংল্যাণ্ডে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। আমি তাদের সঙ্গে বেশ মিলিয়ে নিয়েই কাজ করেছি। কমিটিতে আমিই ছিলাম একমাত্র বেসরকারী লোক। তারা আমার সঙ্গে বেশ হৃদয়তা ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং আমার কাজে সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন ২৪ পরগণার প্রাক্তন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. লিংসে, মহা প্রদেশের কমিশনার মি. ব্রাউন এবং আসাম কমিশনের মি. অ্যাগেন।

স্বেপুটেনের সমস্ত হিসাবে আমাকে অনেক কাজ করতে হত। সেই কর্তব্য করতে গিয়ে আমি এট কমিটির সমস্ত হিসাবে হাতটা কাজ করতে চেয়েছিলাম ততটা কাজ করার মত সময় দিতে পারিনি। তবে এট কমিটির কাজ সম্পর্কে অগ্রহস্ত নানা সভায় ও আলোচনা বৈঠকে যোগদান করেছি। আমি বামিংহাম পরিদর্শন করেছি এবং সেখানে শহরের নর্দমা দিয়ে জল কিভাবে নিকাশ করা হয় তার অদ্ভুত পদ্ধতি দেখেছি। এ কাজের জন্য ২ মিলিয়ন স্টার্লিং ব্যয় করা হয়েছে বলে আমাকে জানান হল। যানরা সময় কাজের ভাষাটা বুঝে দেখলাম, কিন্তু কোথাও বিন্দুমাত্র দুর্গন্ধের আভাসও পাইনি। আমি তারপ্রান্ত ইভিনিয়ারের সঙ্গে তগলী নদীতে শির অকলের সেপটিক ট্যাংকগুলো থেকে যে প্রবাহ নিঃসৃত হয়ে আসে সে সমস্তা নিয়ে আলোচনা করেছি।

সে বিষয়ে আমার মত হচ্ছে এট যে সে জল প্রবাহ যতই পরিশোধিত করা হোক না কেন, নদীর জলকে তা দূষিত করবেই। তিনি এই সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতিতে ব্যবস্থা পদ্ধতি বলে নিন্দা করবেন।

যখন সময়ে কমিটি তার রিপোর্ট' পেশ করল। আমি তাতে সই করি, কিন্তু একটা সংযোজন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করলাম। সে মন্তব্যে আমি দূতজার সহিত ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে গোবাল গন্ডন'য়েট বোর্ড' গঠনের দাবী জানাই। আমার সেই মন্তব্য ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের কাছে বিলি করা হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র আসাম ও মহাপ্রদেশ সরকার ছাড়া আর সমস্ত প্রাদেশিক সরকারই ছিল এট প্রস্তাবের বিরোধী।

(চলবে)

৫ পাতার শেখাংশ

অসুখাভী কাজে বিপ্লবীদের বহু প্রাণ প্রোগ্রাম
এর আগে বানচাল হয়েছে। চট্টোগ্রামের সংগঠন
ছিল এত নিখুঁত যে অসুখাভী কাজের কোন নজির
সেখানে ছিল না। শুধু এইটুকু বললেই সব বলা
হলো না—মাষ্টারলার আত্মগোপনের ঘাটির সম্ভাবন
পুলিশকে জানিয়ে দেওয়ায় অপরূপে মস্তাঘাটী নেম
সেবের সুওচ্চেন করা হয়েছিল—নিজগৃহে ডাক্তার
খালার। বিপ্লবীরা সদা আশাবাদী; নৈরাজ্য তাদের
চিন্তা স্রাস্ত হয় না। কান্দীর পাঁচ বড়। আগে যুবক-
দের কাছে সূর্যসেনের শেষ বাণী ছিল—‘আদর্শ ও
একতা। বিপ্লবীদের প্রধানতম আয়ুধ হুইট—
আদর্শে জলন্ত বিশ্বাস ও লোক শক্তির সুদৃঢ় একতা।
চট্টোগ্রাম বিদ্রোহীদের ক্ষণ সার্থক হয়ে ওঠে নেতাজীর
আজাদ হিন্দ কোরের মধ্যে। মাষ্টারলার আক্যান
প্রভিন্সনিত দেখি নেতাজীর কণ্ঠে—‘বড় দাও,
আবীনজা বিশ্ব’।

বংলার ভরুসদের নীতিক আত্মভাগ হবে—
একদা বেশবড়ু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—‘হোক
হিংস্রাভী, শুধের বেশ প্রেমকে অধীকার করবে,
কি করে? অগ্নিভূগের বিপ্লবীরা ছিল সংকটে অটুট,
উৎসর্গীকৃত জীবন, চরিত্রে সবল। হুৎকে বরন,
তাগিকে গ্রহণ, মৃত্যুকে আলিঙ্গন, বন্ধুর পথ অভিক্রম
ছিল তাদের সাধনা। রক্তের শুণে স্বাধীনতার
পথকে ভরাধিত করেছেন গুঁরা। বনে-জঙ্গলে
কাড়াগায়ে, পুলিশ নির্গাভনে রোগে, অনাসরে-অব-
হেলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন; পুলিশের
গুলিতে নিহত হয়েছেন; কান্দীর বড় গলায়
দিয়েছেন। তাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।
এই বরনের শাহুদের পুনরাবির্ভাব বাংলার লোক
মানুষ চাইছে।

লোকায়ত পাঠচক্রের

অতীত রায় স্মৃতি বিভাগ উদ্বোধন

প্রিয় শ্রদ্ধী,

আপনি আশা করি অকলত আছেন, অগ্নিস্থের অন্ততম নায়ক অতীশ্র মোহন রায়
কিনত এই এপ্রেল ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে (বর্তমানে বাংলাদেশ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।
সমাজ-বিদ্রব-বর্ণনের একনিষ্ট সাধক অতীশ্র মোহনের মহামূল্য অবদানের স্মৃতিরক্ষাকল্পে
আগামী ২ই আগষ্ট শনিবার বিকাল পাঁচ ঘটিকায় লোকায়ত পাঠচক্রের অতীত রায় স্মৃতি
বিভাগটি উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়েছে। তাতে পৌরোহিত্য করবেন মাস্তাবাদী
চিন্তানায়ক ঐতাবাপন লাহিড়ী এবং উদ্বোধন করবেন জননেতা ঐত্রিদিব চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে আপনার সবাব্ব উপস্থিতি ও সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি।

নিবেদক

১০৪ শি লেনিন সরদী

কলকাতা ৭০০০১০

১৮.৭.৮০

লোকায়ত সমাজ টাটের পক্ষে

মাহত পাল

পরিচালক, লোকায়ত পাঠচক্র

বিপ্লবতাপস

মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীর ১০ম স্মৃতি বার্ষিকী

—০—

আগামী ২ই আগষ্ট শনিবার, ১৯৮০ সনাল ৯ ঘটিকায় কলকাতা মহানগর
মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথের স্মৃতি মন্দিরের সম্মুখে মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীর ১০ম স্মৃতি
বার্ষিকী উদযাপিত হইবে।

এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সবাব্বই যোগদান করিয়া বিদ্রব সাধক মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথের
স্মৃতির প্রতি পূর্ণাধা নিবেদন করিবাব জন সঙ্কলকে আন্তরিক অনুরোধ জানানাইতেছি।

ইতি—২৫শে জুলাই, ১৯৮০

নিবেদক—

ঐহেমচন্দ্র ঘোষ

সভাপতি

ঐদীনেশ চন্দ্র ঘটক

সাধারণ সম্পাদক

মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর স্মৃতি রক্ষা কমিটি

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
Dist—NADIA			
Biswas Smt Kamala w/o Late Jitendra Biswas	Vill Nasra Colony Plot No, 921 P. O. Ranaghat	100	1 10 76
Mandal Smt Nanda Rani w/o Late Durgapada Mandal	P 70 & Vill Shibpur P. S. Nakadpara	200	24 1 80
Dist—MURSHIDABAD			
Guha Smt Gouri w/o Late Bimal Guha	Shyamal Bhawan, 23 Babul Rana Road, P. O. Berhampur	200	26 3 74
Dist—MIDNAPUR			
Bera Smt Sumati w/o Late Gupadhar Bera	Vill Siribinda P. O. Saharda	150	15 10 79
Chakraborty Smt w/o Late Bisbaupada Chakraborty	P. O. & Vill Khukurda	200	29 12 78
Chatteropadhyaya Smt Nirmala w/o Late Chatteropadhyaya	Vill Sundara P. O. Madhyahingli	150	155 8 72
Das Amulya Charan	Vill Kanpur P.O. Balisai	200	11 10 74
Das Smt Narayani w/o Late Trilokyspath Das	Vill Jagati Present Address : P.O. & Vill Narajole	150	23 5 79
Das Smt Raikishori w/o Late Kailash Chandra Das	Vill Balabhadrapur P. O. Dantan	100	8 3 80
Das Smt Ratan Bala w/o Late Bankim Ch Das	Vill Gajipur P. O. Purba Sirampur	100	11 1 80
Maity Smt Ramani Bala w/o Late Bepin Behari Maity	Vill Ghagrah P. O. Mahisadal	100	17 7 74
Pani Smt Hiranmoyee w/o Late Himangshu Pani	P O & Vill Rantira (also arrears due 200/- from 15 8 72 to 10 10 75)	130	11 10 75
Saboo Smt Debjani Bala w/o Late Abanjo Kumar	P. O. & Vill Kanadighi	100	5 1 80
Dist—PURULIA			
Mahatani Smt Miri w/o Late Laxmi Kanta Mahatani	P. O & Vill Metysta P.S. Manbazar	100	26 1 80
Dist.—DINAJPUR			
Acharjya Smt Chhaya w/o Late Sushil Acharjya	Vill Mohishbathan P.O. Itabar	200	17 1 80
Dist—JALPAIGURI			
Bhattacharjee Smt Chinmoyee w/o Late Nagen Bhattacharjee	Kaikatpara Ward No. 1 Jalpaiguri	100	16 2 80

বিশ্ববো শুল্ককম্বালা

ଅନୁଲୋମ ସମିତିର ବିଲ୍ଲବ ଗ୍ରହଣ — ଓଡ଼ିଶାରେ ୩ ମେସ — ୩୦୦

বিষয়: মহানারিক-এসবিহারী—মুদ্রণ: মজুমদার—১০০

କୀର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥାଟି ହେଲା—

- | | |
|------------------------------------|---|
| ১। বাংলায় অক্ষয়-১৫০ | ২। বহির্ভাষিত ভারতীয় বিপ্লব-প্রবর্তা-১০০ |
| ৩। অক্ষয়গন সমিতির পি. বিজি-২০০ | ৪। পৌরসীল সংগ্রাম কাহিনী-১০০ |
| ৫। কাকারী পৌরস্বত্ব-১২৫ | ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী-৪০ |
| ৭। বাসবিহারী ও অক্ষয়গন সমিতি-৫০ | ৮। বাসিন্দার পৌরস্বত্ব ও যেরে-৪০ |
| ৯। বিপ্লবগন ও সমাজবাদ-৫০ | ১০। বিপ্লবী বিপ্লবকাম্য-৪০ |
| ১১। সংগ্রাম ও স্বাধীনতা-৪০ | ১২। ভারতের স্বাধীনতা ও জননী বিপ্লব-১৫ |
| ১৩। দেশ বাহ্যে ডোলেমি (১)-১০০ | ১৪। দেশ বাহ্যে ডোলেমি (২)-১০০ |
| ১৫। নতুন চন্দ্রসেনের আত্মজ-৪০ | ১৬। ১০৮ এপ্রিল জাতীয় নতুন বিপ্লব-১০০ |
| ১৭। হাতিয়া হত্যাকাণ্ড-১৫ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অক্ষয়গন সমিতি-১০০ |
| ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন-৪০ | ২০। লাক্ষ্মী প্রবর্তা-১৫০ |

ଆନୁମତି :—ଶ୍ରୀ ରଘୁ ପାଣି ଟି କଲିକତା-୧୦୦୦୧

ଫେସଲ ନଂ-୧୮୮୧/୧୮୮୧/୧୮୮୧ ଫେସଲ ନଂ-୧୮୮୧/୧୮୮୧/୧୮୮୧

— बर्खास्त करने —

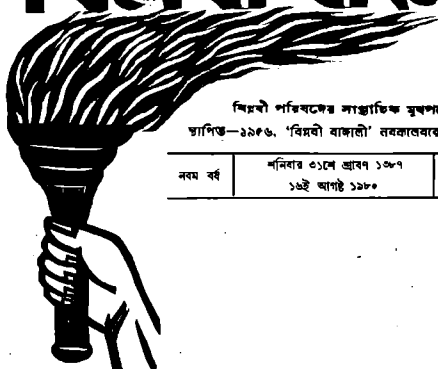
ଅ. ସ. ପା. (ମହାନଦୀ) ଶିଖରପାଠ ଓ, ମିଳନ ଗାଟାଳ

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ-ଶ୍ରୀମତୀ ସତ୍ୟ ବାମନ ଚୌଧୁରୀ

বিহারী কিশোরী প্রতিমিত—ঐশ্বর্য্যম যোষ । বেচারা—ঐক্য-ধোণাল পাল ।

[illegible][illegible]

বিশ্ববী বাংলা



বিশ্ববী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
 প্রাপ্তি—১৯৪৬, 'বিশ্ববী বাঙ্গালী' নবমাসব্যয়—১৯৭১

নবম বর্ষ	শনিবার ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ ১৬ই আগষ্ট ১৯৮০	৪৬ সংখ্যা
----------	--	-----------



“ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী—এই কথাই স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পন্থকে একই লক্ষ্যে অভিমুখী করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতরূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীক্ষমান হয়, সেগুলিকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার করা।”

—শ্রীমতী বিবেকানন্দ

১৫ই আগষ্ট

প্রতি বছরের মত এবারেও মান। উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস পালিত হচ্ছে। বছরের পর বছর আচরিত রীতি অনুসারে রাষ্ট্র চালকগণ ভারতের উন্নতির কথা, অগ্রগতির কথা জন-সাধারণকে স্মরণিয়েছেন। এই ৩৩ বছর একই কথা শুনে শুনে জন-সাধারণ আর কৌতূহলি হয়ে ওঠে না। অথচ এই দিনটির মূল্যকে কোন মতে অধীকার করা যায় না।

দীর্ঘকাল পরাধীনতার মধ্যে থেকে দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতা ছিল স্বপ্নের বস্তু। সেই স্বপ্নকে কেন্দ্র করে কত না আশা আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে ফলে ফুলে পল্লবিত হয়ে উঠত। স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের প্রতি, ক্ষত বিক্ষত দেহ বোদ্ধাদের প্রতি জন-সাধারণের মন অবিস্মৃত স্বাক্ষরিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৩ বছর ইতিহাসে পট পরিবর্তিত হয়ে স্বাধীনতার সহজ দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে।

দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব যে বিরাট তা সকলেই স্বীকার করেন, দায়িত্ব কাদের উপর ক্ষুদ্র থাকলে দেশ সভ্যতাই আকাজিক রূপে গড়ে উঠবে তাই নিয়ে মতানৈক্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশের জন-সাধারণের মনে সহজ ধারণা ছিল দেশকে শাসন পালনের দায়িত্ব থাকবে তাদের উপরেই যারা দেশকে ভালবাসার জন্য বিদেশী শাসকের হাতে বার বার লাঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের ছুঁড়াগা দেশ শাসনের ভার তাদের উপর অশিত হ'ল ভারত আমাদের আকাজিক পথে দেশকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হলেন না।

আজ তাই অরণ করি বিশ্বস্ত প্রাণ শহীদদের যাদের বৃক্কের তন্ত্রে একদা সম্বীর্ণিত হয়েছিল 'সমগ্র দেশ'। অরণ করি সেই মহাপ্রাণদের উদয়ের পথে যাদের বাণী মরণ-জরী করেছিল বিপ্লবী বাঙ্গালীকে। অরণ করি পর শাসনে ক্ষত-বিক্ষত সেই অবহেলিত বিপ্লবীদের—যাদের তিল তিল আত্মদানে উর্বর হয়ে উঠেছিল রক্তা দেশ। তাই অরণ করি বাংলার সামগ্রিক বিপ্লবী মহাকে—তাকে প্রগতি জানাই।

বাংলার বু-শক্তি তাদের ত্যাগ ভিত্তিক তাদের সভ্যতা ও শক্তি নিয়ে আবার দেশকে সঠিক পথে চালিত করবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা তারই পথ চেয়ে আছি।

No. 8/24/80-FF (P)
GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
Ministry of Home Affairs/Grin Mantralaya
New Delhi 110 003, the 6th August, 1980

To

The Accountant General,

Subject :—Freedom Fighters Pension Scheme, 1972—Abolition of
Income Limit

Sir,

It has been decided by the Govt. of India that with effect from 1. 8. 80 the annual ceiling of Rs. 5,000 fixed for eligibility for the grant of freedom fighter's pension should be removed and all freedom fighters irrespective of their annual income will be eligible to get pension, if they fulfil the other conditions of eligibility for the grant of pension.

2. As a consequence of the above decision, the requirement of getting annual declaration of income during the beginning of each financial year as laid down in para 1 (b) of this Ministry's letter No 3/7/74-FF (P) dated 20th March, 1976 addressed to all Accountants General may be dispensed with effect from 1. 4. 1981.

3. Seperate instructions will be issued with regard to restoration with effect from 1. 8. 80 of pensions so far suspended/cancelled on the ground of annual income having exceeded Rs. 5000. As regards fresh applications, individual sanctions will be issued, as hithertofore.

Yours faithfully,

Sd/- P. N. Kalra

Deputy Secretary to the Government of India

Copy forwarded for information to all State Govts. and Union Territories,
West Bengal.

Sd/- P. N. Kalra

Deputy Secretary to the Govt. of India

Internal distribution : All Processing Section/Branch Officers in the
freedom fighters division,

PA to JS (A)/PA to DS (FF)

No. 8/25/80-FF(P)
GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
Ministry of Home Affairs/Grin Mantralaya

To New Delhi-110 003, the 6th August, 1980

The Accountant General,

Subject : Grant of Pension under Freedom Fighters Pension Scheme—now re-named as Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme.

Sir,

I am directed to inform you that with the approval of the Cabinet, decision has been taken inter-alia to enhance the monthly pension from Rs. 200 to Rs. 300 in the case of living freedom fighters and Rs. 100 to Rs. 200 in the case of widows with provision of additional Rs. 50 for each of her unmarried dependent daughters subject to the overall ceiling of Rs. 300 per month. I am therefore directed to convey the sanction of the President to the enhancement w.e.f. 1. 8. 1980 of all pensions sanctioned so far by this Ministry from Rs. 200 to Rs. 300 in the case of living freedom fighters and from Rs. 100 to Rs. 200 in the case of widows with provision of additional Rs. 50 each for unmarried daughters subject to the overall ceiling of Rs. 300. Treasury Officers concerned may be instructed to modify the existing Pension payment Order in each individual case to effect revision of the monthly pension as above.

2. This order will exclude cases where pensions have been suspended/cancelled by separate orders by this Ministry. Pension should not be enhanced in their cases until further instructions from this Ministry.

3. I am also to state that the Scheme has been re-named as 'Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme'. This change in the nomenclature of the Scheme may kindly be noted and pension payment orders may be issued under the new nomenclature.

This issue with the concurrence of the Ministry of Finance and the Comptroller and Auditor General of India.

Sd/- P. N. Kalra
Deputy Secretary to the Govt. of India

No. 8/25/80 FF (P) New Delhi-110003 the 6th August, 1980

Copy forwarded for information and necessary action to :—

1. The Comptroller and Auditor General of India, their U. Q. No. CAG No. 1042-TA II/176-79, dated 1st August, 1980 refers.
2. The Chief Secretaries of all States and Union Territories, W. B. Calcutta.
3. Finance III/Ac. I Sections.

Sd/- P. N. Kalra
Deputy Secretary to the Govt. of India.

Copy forwarded to all Processing Sections in the Freedom Fighters Division.

স্বাধীনতা দিবসের পতাকায় আন্দোলিত হোক জাতীয় সংহতির প্রতিক্রিতি গণতান্ত্রিক শপথ

আজ থেকে ২০ বছর আগ, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এই দেশের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। সেই আন্দোলিত পতাকার সামনে রক্তে স্নেহে কঠোর, উদ্যম জনতা যশে ঘেঁষেছিল এক সংহত ভারতবর্ষের; শপথ নিয়েছিল গণতান্ত্রিক সমাজ ও মেহনতী মানুষের শোষণ মুক্ত স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার, সমাজতন্ত্রের।

স্বাধীন ৩০ বছরের ইতিহাসে সেই যশ, সেই লাগিত শপথ বারে বারে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। বিদেশী চক্র ও ভারতীয় স্বার্থবহু দেশীয় চক্র অবিচ্ছিন্ন আঘাত ছেলেছে ভারতের সংহতির উপর, কখনও সাম্প্রদায়িকতার লাগিত অস্ত্রে, কখনও বা প্রাণেশিকতার হিংস্র আক্রমণে। আবার এই আঘাত ভয়ংকর ও নশাৎ হয়ে উঠেছে মেহনতী মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে। ১৯৮০ সাল সেই হীন চক্রান্তেরই এক রক্তাক্ত অধ্যায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পার্বত্য জমিতে এই চক্রের পদচারণা। পশ্চিমবঙ্গে তার অন্তত ছায়া। উত্তর পূর্ব ভারতের জাগ্রত, গণতান্ত্রিক জনমতকে ধ্বংস করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে লাগন করার জবজব বড়ঘর।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এই ষণ্ডায়মান বড়ঘর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। মেহনতী মানুষের সরকার, জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের শত্রু এই বিচ্ছিন্নতাবাদের মোকাবিলায় অতন্তর। গ্রাম-গঞ্জে ক্ষেত্র-বামারে, নগরের কলকারখানার মেহনতী মানুষের কাছে কাঁধ দিয়ে, অনেক সংগ্রাম ও রক্তের মূল্যে অজিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অটুট রাখতে, গণতন্ত্রের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে সমাজের দুর্বল ও অসহজ শ্রেণীর অধিকারকে প্রসারিত করতে বহুশরিকর।

গত তিন বছরের শাসনে বামফ্রন্ট সরকার তার অস্তি সীমিত শক্তি নিয়েই এই উপলব্ধ মতাকেই রূপায়িত করার প্রাণপাত চেষ্টা করেছে। গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর স্বাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। পকারভেদী ব্যবস্থার এসেছে গণতন্ত্রের বিস্তৃতি। কলকারখানার মেহনতী মানুষকে দিয়েছে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের অধিকার। দীনভদ্র কুটিরেরও প্রসারিত করতে চেয়েছে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ। বিচ্ছিন্ন ও বহু বর্ষ ভাষা সংস্কৃতির আলোকিত ধার উন্মুক্ত করে দিয়েছে উত্তরের পার্বত্য জমি থেকে দমুস্ত্র-মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত এই গঙ্গাজলি বঙ্গভূমিতে। এক নতুন পথে বাত্মা শুরু হয়েছে।

দরিদ্রশ্রেণীর জন্ত আরও অনেক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মর্যাদাময় প্রতিষ্ঠার জন্ত বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ় প্রেতিজ্ঞ। এই প্রতিষ্ঠিত মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির তো জাতীয় সংহতির বনিয়াদ; তার প্রতিরোধের প্রাচীরেই তো গণতন্ত্রের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদের চূড়ান্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের বনিয়াদ সেই সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতিপ্রতিই ১৫ই আগস্টের উত্তোলিত পতাকার আন্দোলিত হোক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিপ্লবী নায়ক ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ

॥ বাণী সংকলন ॥

[জন্ম : ২২শে বৈশাখ ১২২৬ সন (১৮৮২ ইং) :

মৃত্যু : ২ই আগষ্ট, ১২৭০ ইং

(১) অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১২০০ খ্রী: প্রথম সংবৎসর রাজনৈতিক দল অমূল্যলীন অবিভক্তবঙ্গদেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত, উদ্ভূত ও সংগঠিত। উদ্দেশ্য যুবকদের শক্তি সাধনায় উদ্দেশ্য করা। পরবর্তী কালে এই দল সমগ্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন তাদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন।

(২) ১২০৬ সনে ত্রৈলোক্যনাথ অমূল্যলীন দলের সভ্য হন, এবং কয়েক কাল মধ্যে আপন কর্ম কৃতিত্বে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বশ্রেণীতে স্বীকৃত ও মহারাজ নামে সর্বত্র পরিচিত হন। দেশপ্রেম তাঁর অমূল্যলীনীয়, তিনি কর্মে মহান, কষ্টবীর্যবান ও জাগ্রত অধিনায়ক, তাঁর বিচিত্র জীবন কথা রূপ কথাকেও হার মানায়। তিনি আদর্শ শিক্ষক, চিন্তামণ্ডল শিক্ষাবিদ, নৈতিকশক্তিসম্পন্ন শক্তিদায়ক! তিনি খ্রিষ্ট বছর বৃষ্টিপা কারাগারে আটক ছিলেন।

(৩) ১২২১ সনের পর হতে তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁর নিজের ভাষায়, ‘১২২১ সনের পর হইতে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে আগ্রহের হইতেছি, প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগ দিতেছি, শ্রমিকদল গঠন করার চেষ্টা করিতেছি।.....১২৫৮ সনে আমাদের দলে প্রকাশ্য নাম হইল ‘বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদল। আমরা ভারতের সমাজতন্ত্রীদলের সহিত এক হওয়ার

চেষ্টা করিয়াছি। ১২৪৭ সনে আমরা দেশে দেশে মিলিত হইয়া আলাপ আলোচনা করি, দেশে দেশে প্রকাশ্য নারায়ণ, রামমোহনোদয় লোহিয়া, প্রফুল্ল পাদুলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র আচার্য, ত্রিদিব চৌধুরী, নরেন্দ্র দাস, প্রমথ রাও উপস্থিত ছিলেন।’ (জীবন স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৬২) দেশ বিভাগের পূর্বে ত্রিদিব বঙ্গ ছাড়া পূর্বেই প্রায় সকলেই সর্বভারতীয় সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

(৪) দেশ বিভাগের পর সোস্যালিস্ট পার্টি ও হুঁভাগে বিভক্ত হয়। গঠিত হয় পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টি, বহিরাঙ্গ কনভেনশনে মহারাজ চেয়ারম্যান, মোবারক সাগর (কলকাতা) ও অধ্যাপক পুলিন দে (চট্টগ্রাম) সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি বর্জিত শোষণমুক্ত সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। ভারত ভ্রমণে এসে ১২৭০ ইং ২ই আগষ্ট দিনীতে হঠাৎ অন্তহু হয়ে তাঁর দেহাবসান ঘটে, তাঁর জীবন ও কর্মকৃতি দেশপ্রেমিক বিপ্লবী তত্ত্ব গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের অন্তর্ভুক্ত অমূল্যলীন যোগ্য।

—সংকলন]

১ : “স্বদেশী আন্দোলনের সময় যুবকদিগের মন স্বদেশিকতায় ভরপুর ছিল, তখন কোন কৃত্রিমতা ছিল না, ছিল আন্তরিকতা। তখন সম্মুখে কোন

হেলোডন ছিল না, ত্র্যাসের আদর্শই ছিল বড়। (৭)”

২ “বহুমতশ্রেণীর অমূল্যলীন হইতে মিত্র মহাশয় (শি মিত্র) অমূল্যলীন নাম গ্রহণ করেন। অমূল্যলীন নামের মধ্যেই অমূল্যলীনের মতবাদ, নিহিত আছে। অমূল্যলীনের নেতারা এরূপ একটি আদর্শ সমাজ কল্পনা করিয়াছিলেন যে, সমাজের প্রত্যেকটি নব-নারীর ক্ষুদ্রত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে। “সাম্রাজ্যের পারীক্ষিক ও মানবিক বুদ্ধিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশই হইতেছে মনুষ্য এবং উহার বিকাশ শুধু অমূল্যলীন দ্বারা সম্ভব। (৭)”

৩ “অমূল্যলীন চার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা কোন শ্রেণী বিশেষের নয়, এ স্বাধীনতা দেশের সর্বজনের স্বাধীনতা, এ স্বাধীনতা মনুষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (৬)”

৪ “প্রতিজ্ঞাগুলি ছিল অতি সাধারণ, যেমন (১) আমি কখনও এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। (২) সর্বদা আমি আমার চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিব। (৩) নেতার আদেশ আমি বিনা বাধ্যব্যায়ে প্রতিপালন করিব। (২০)”

৫ “আজকাল কোন দুবক-কর্মীকে কাজের কথা বলিলে প্রথমত: সে একদফা তর্ক করিবে কারণ সেতো অন্ধ বিশ্বাসী নহে, তাহাকে বুঝিতে হইবে কাজটি ঠিক কিনা—অত:পর দুইখন্ডা তর্কের পরে সে বলিবে, ‘এ কাজের ভার ত আমার উপর দেওয়া হইতে পারে।’ ইহাই হইতেছে আজকালের অধিকাংশ যুবকের কর্মচরিত্র। আজকালকার হেলোডা অবশ্য যুব বৈশী, তাই বোধ হয় তর্কও করে বেশী। তর্ক করিতে করিতেই সমস্ত শক্তি নষ্ট করে, কাজ করিবার আর বেশী ক্ষমতা থাকেনা। অথচ যখনকার

হেলোডা কাজই বেশী করিত, তর্ক করিত না।....যখন বাহ্যিক বাহা বলা হইয়াছে, বিনাব্যায়ে সে তখনই তাহা করিয়াছে। আজকাল কোন ছেলেকে শাসন করিলে সে হরত দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, অথবা গোপনে দল পাকাইবার চেষ্টা করিবে—বড়বয়স করিবে। তাই সেখা বার বর্তমান যুগে ভাব প্রচেষ্টা যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু আন্তরিকতা কমিয়া গিয়াছে। নেতা ইওরাও তখন বড় শক্ত ব্যাপার ছিল। নেতৃত্ব তখন মোটেই লোভনীয় ব্যবসা ছিল না। (২৭)”

৬ “প্রথমে প্রত্যেককে বাড়ীঘর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া বসিতেহইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, হরত সেখানে কোন ছত্রলোকের বাস নাই। সেখানে তাহাকে একটি অঐক্যনৈতিক প্রাথমিক বিজ্ঞান দ্বাপন করিয়া থাকিতে হইয়াছে, গ্রামের লোকের মুষ্টিভিকার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। সেখানে যে সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছে, যে অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছে, যে দুঃখকষ্ট ভোগ ও ত্র্যাসের পরিচয় দিতে পারিয়াছে সেই ধীরে ধীরে গ্রামান কেন্দ্রে আসিয়াছে। হলের লোক তাহাকেই নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে, কে কার নেতৃত্ব মানিবে, সকলেই নেতা। (২৭)”

৭ “স্বাময় কোন ছেলেকে হলে আনিবার সময় প্রথমেই তাহাকে দেশের স্বাধীনতার কথা বলিতাম না। প্রথমত: তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম হেলোটের সত্য চরিত্র ভাল কিনা। তারপর তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহাকে ধর্ম-পুস্তক পড়িতে দিতাম—পরে পৃথিবীর অস্বাস্ত্য পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, রাজপুত কাহিনী, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রকৃতি পড়িতে দিতাম। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার

কথাও আলোচনা করিতাম। এইরূপ ভাবে তাহার মন গড়িয়া পরে তাহাকে দেশের স্বাধীনতার কথা বলা হইত। (৫৫)”

৮ “আমরা প্রাক্ত সভা সমিতিতে যোগ দিতাম না, কারণ বেখানে স্বাধীনতার কথা উঠিবে না, শুধু আবেদন নিবেদনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইবে সেখানে যাওয়া আমরা বুঝা সমর্থ নষ্ট মনে করিতাম!..... আমরা.....গ্রামে গ্রামে পাঠশালা গঠন করিয়া শিক্ষা বিস্তার ও স্বদেশী প্রচারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। স্থানে স্থানে পাঠশালার পাশাপাশি পাঠাগার ও আশ্রম স্থাপন করিয়াছি। এ আশ্রম আর স্কুল ছিল আমাদের আর—একটি কেন্দ্র। (৫৬)”

৯ “বঙ্গভঙ্গ রদ হইল, কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনের গতি বামিল না। বিপ্লবীদের সহিত নেতাদের কোন কার্যকরী সংঘর্ষ ছিল না। নেতারা তাহাদের উপর গালিধর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। বিপ্লবীরাও তাহাদের সহিত কোন সংগ্রহ রাখিডেন না! স্বদেশী নেতারা কেহ ছিলেন স্বার্থপর, কেহ অতিরিক্ত বিবেচক। আগে চলার সাহস ও ক্ষমতা তাহাদের ছিলনা.... যুবকদের দল ছিল নির্ভীক, নিঃস্বার্থপর। তাহারা চাহিত আগে চলিতে।....নেতারা চলিলেন নিরাপদ পথে আর যুবকরা (বিপ্লবীরা) চলিল বিপদসঙ্কুল পথে। (৬৪)”

১০ “১৯১৪ সনের প্রায় মাঝামাঝি কার্খান যুদ্ধ শুরু হইয়াছে, ইংলও এখন বিপন্ন। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নেতা এই বিপদে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে বাস্তব হইয়া পড়িয়াছেন, বিপ্লবীরা ভাবিল ইহাই সুযোগ। এই সুযোগে কিছু না করিতে পারিলে ভারতের

১১ “স্বাধীনতাই দেশবাসীকে দেশপ্রেমিক করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল তখন আমাদের দেশেও দেশপ্রেমিকের অভাব ছিলনা—সেদিন তাহারাও দেশের ক্ষত্র প্রাণ দিতে পারিলে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিডেন। আজ ভারতবর্ষ পরাধীন, তাই আমরা স্বার্থপর, দুর্বল ও ভীত হইয়া পড়িয়াছি। (১০)”

১২ “জাতীয় বিদ্যালয়গুলি যদি সরকারী বিভাগের অধুতরণে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে বিদ্যালয়ে দেশের কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ হইবে ছেলেগুলোকে দেশপ্রেমিক করিয়া তোলা। জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িয়া যদি জাতীয় ভাব না জাগে, দেশপ্রেম না জাগে, তবে সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাই নহে। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলের যদি দেশের কাছে না আসে, তাহাদের যদি অশ্রদ্ধাভবের মত চাকুর্বীই কাটাতে হয়, তবে জাতীয় বিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা দেশপ্রেমিক, নির্ভীক ও চরিত্রবাহু হইবে।....তাহারা দেশের সেবার নিযুক্ত হইবে এং প্রয়োজন হইলে দেশের ক্ষত্র প্রাণ বিসর্জন দিবে।...শৈশবে হইতে ছেলদের কৌমল প্রাণে দেশপ্রেমে বীজ বপন করিতে হইবে—এ ক্ষত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতেই জাতীয় শিক্ষা আরম্ভ করা সরকারী। (১১১)”

১৩ “স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলিতেছিল তখন কমুনিষ্ট পার্টি বিত্তীয় সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধকে জনবলিয়া প্রচার করিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তান্ত দেয় নাই, রুবিয়ার বন্ধ বলিয়া বুট সাম্রাজ্যবাদকেই তখন কার্খত: সমর্থন করিয়াছে। বিত্তীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাবুদ্ধ ভারতবাসীর জনবলিয়া ছিল না। (১২১)”

১৪ “সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কতিপয় হত সাধারণ গরীব লোক। তাহাজাই মৃত্যুবরণ করে, তাহাজাই উপবাসী থাকে,...। বাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় তাহারা বড়লোক, তাহাদের গায়ে আঁচড়ও লাগে না।...তাহারা লাভবানই হয়। আর লাভবান হয় গুণ্ডা জেলীর লোক। গভর্ণমেন্ট দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য যদি কৃত নিশ্চয় হন এবং একটু শক্ত হন তবে দাঙ্গা বেশীদিন চলিতে পারেনা।...দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষয়েভাব নেই, স্বার্থ সংগ্রিষ্ট লোক সময় সময় দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ করিয়া ধর্মের নামে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া কার্য হাসিল করে। (১৭০-১৭১)”

১৫ “নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও বিদ্রোহী রাগবিহারী বসু বিদেশী গভর্ণমেন্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়া কি অস্ত্রায় কাজ করিয়াছিলেন?...আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাই,...তবে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক পরাধীন জাতি বিদেশী গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। যদি তাহারা বিদেশী সাহায্য গ্রহণ না করিত, তবে তাহারা দাবীন হইতে পারিত না। বৈশ্বিক সাহায্য গ্রহণ যদি অস্ত্রায় হয়, তবে জর্জ ওয়াশিংটন, লেনিন, মান্‌ইনস সেন, ডি ভ্যালায়ে, শিল সূত্রী সকলেই অস্ত্রায় করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস সে কথা বলে না। (১৭২)”

১৬ “বর্তমান পৃথিবীর কোথাও ডেমোক্রেসী নাই, সর্বত্রই ডেমোক্রেসীর নামে প্রতারণা চলিতেছে: জনগণ প্রতারণিত হইতেছে। বর্তমানে প্রকৃত ডেমোক্রেসী ইংলণ্ডেও নাই। পূর্বে রুশিয়াতে বংশধিক পার্টিই মধ্যে সেটে সিমম ছিল, কিন্তু ডেমোক্রেসী ছিল না। দেশ শিক্ষিত ও উন্নত না হইলে ডেমোক্রেসীর কোন অর্থ হয় না। দেশের

জনগণ যখন শিক্ষিত হইবে,...আজ্ঞেভেনা আসিবে, যখন তাহাদের মধ্য হইতে দ্বন্দ্বীতি দূর হইবে, কর্তব্য-জ্ঞান জাগিবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ অশেষ। জাতীয় স্বার্থ-ই বড় হইবে, তখনই জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবে তখনই দেশে প্রকৃত ডেমোক্রেসী আসিবে। (১৯১)”

(১১৬ জেলে জিন বহর ও ভারতের বিদ্রোহ সাধনা : ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী। ২য় সং ১৩৬৯ পৃষ্ঠক হতে সংকলিত)। প্রত্যেক উদ্ধৃতির শেষে পুস্তকের পৃ: সংখ্যা দেওয়া আছে।

(খ)

১৭ “বেশানে সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্বীতি, সেখানে সমাজতন্ত্রবাদ চলিতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদের জন্য প্রয়োজন সমাজতাত্ত্বিক আবহাওয়া সৃষ্টি।...সমাজতন্ত্রবাদের জন্য প্রয়োজন মানুষের মন তৈয়ার করা। মানুষের প্রতি মানুষের একান্তবোধ বা সম-বোধ আনানো। আমি এবং আমার প্রতিবেশী এক। সকলের একত্বপূর্ণ অস্তিত্ব, একত্বপূর্ণ প্রয়োজন, সকলে একসঙ্গে উৎসাহন করিব, সমান ভাগে ভাগ করিয়া খাইব—এই মনোভাব আনানো বল—প্রয়োজ্য ধারা বা আইন প্রণয়ন ধারা সম্ভব নয়,—শিক্ষার ধারাই সম্ভব। (৭৪)”

১৮ “দেশ এখন দাবীন হইয়াছে। এখন সাংগাম বিদেশী গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নয়, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে, পারিতোষ বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে।...দাবীনতালান্তের পর দেশ প্রেমিকদের কর্তব্য জাতির সকল প্রকার দুর্বলতা দূর করিয়া জাতিকে সমল করিয়া গড়িয়া তোলা,—জাতীয় চরিত্র গড়িয়া তোলা। চরিত্রই জাতির বেঙ্গল। একটা জাতির মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা

ও ক্রান্তি থাকে তবে সেই জাতি কখনো বড় হইতে পারে না। (৭৬)''

১১ 'স্বাধীনতা লাভের পর অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, বাহারা কারাগারীদের অভ্যন্তরে বাস করে এবং বাহারা কারাগারীদের বাহিরে বাস করে, সকলেই একদেশের অধিবাসী, একই সমাজ-সেহের অঙ্গ। কোন দেশ কতটা উন্নত তাহার মাপকাটি জেলখানা। কয়েদীরা যে অপরাধ করে: সেজন্য সবটা তাহারা নিজেরা দায়ী নয়, দায়ী তাহাদের সমাজ এবং গভর্নমেন্ট, লোকের অপরাধ করার প্ররোচনা কেন? পারিপার্শ্বিক অবস্থা এক শুল্ককার অভাব তাহার কারণ। আমার গ্রামে যদি কেহ অপরাধ করে বা কোন সমাজ-বিদ্বেষী কাজ করে তবে সেজন্য আমিও দায়ী, কারণ আমার গ্রামের উপর আমার একটা সাধারণ কর্তব্য আছে। আমি সেই কর্তব্য পালন করি নাই। গভর্নমেন্ট দায়ী, সে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কী? বর্তমান শিক্ষার মাপকাটির চরিত্র গঠন হয় কি?' (৯৪)

২০ 'বর্তমান অবস্থার মধ্যেও কারা-সংস্কার চলিতে পারে এবং সংস্কারের প্রয়োজনও আছে, তবে জেলের কয়েদীদের চরিত্র সংশোধনের পূর্বে, জেল কর্মচারীদের এবং দেশের নেতাদের চরিত্র সংশোধন প্রয়োজন।' (৯২)

২১ 'স্বাধীনতা লাভের পর জাতি গঠনের বা জাতীয় চরিত্র গঠনের কোন চেষ্টা হয় নাই। আমাদের ছেলেপরা শৈশব হইতে দেখিতে পার, ক্রান্তির আশ্রয় না নিলে জীবন যাত্রা নির্ভর হয় না, ঘুঘু না নিলে কোন কাজ হয় না, প্রচুর অর্থ

উপার্জন হয় না, বাহার প্রচুর অর্থ আছে তিনিই বড়লোক, তিনিই দেশের গণ্য-মান্য নেতা, তিনিই সুখী। বাহারা সংলোক, সাধারণতঃ তাহারা ধনী, কেহ তাহাঙ্গিকে গ্রাস্ত করে না।' (৯২)

২২ 'বর্তমানে প্রয়োজন সমাজ সংস্কার। সরকার দূষিত আবহাওয়ার পরিবর্তন করিয়া নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা। তাহার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম। দেশপ্রেম থাকিলে প্রত্যেকেই মনে করিবে আমি জাতির সেবা করিতেছি, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইবে, তখন সরকারী কর্মচারীরা ঘুঘু লাইতে সাহসী হইবে না, লম্বাবোধ করিবে। ব্যবসায়ীরা খাণ্ডে ভেজাল মিশ্রিত করিবে না, মনে করিবে আমার জাতি দুর্বল হইয়া পড়িবে। বাহারা সমাজ সংস্কার করিবেন... তাহাদের প্রথমে আদর্শ-ভূমির হইতে হইবে, নতুনা কেহ তাহাদের কথার কর্পণাত করিবে না।' (৯২)

২৩ 'পৃথিবীর কোন দেশই সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত নহে, জাতি হিসাবে পরিচিত। ভৌগোলিক সীমারেখার দেশ। সেই সীমারেখার মধ্যে বাহারা বাস করে তাহারা সেই দেশের নামে, সেই জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়।...একদেশে বিভিন্ন বর্ণবলসী থাকিতে পারে কিন্তু জাতি হিসাবে তাহারা এক।' (১১৫-১১৬)

২৪ 'আমার অধিকার আমাকে বক্ষা করিতে হইবে। আমার অধিকার যদি আমি বক্ষা না করি, তবে সে দোষ আমার নিজের, অপরের নয়। পশুর মত বাচিয়া লাভ কি? ভীকর কোন স্থান নাই। ভীক পদধলিত হইবে, লাঞ্চিত, অপমানিত হইবে ইহাই আভাবিক। শক্তিমানেকে দকৃৎ ভয় পায়।' (১২০)

[১৭—২৪নং উক্তি জীবনযুতি—শ্রীলোকানান্দ চক্রবর্তী (মহারাজ), ১৩৭৬ গ্রন্থ হইতে উক্তি। বঙ্কনী মথো সংঘ। গ্রন্থের পৃষ্ঠাসূচক]

২৫ ‘আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, তবু আমাদের দ্রববস্থা ঘুচিল না কেন? ইহার কারণ যে স্বাধীনতা পাইয়াছি তাহা স্বাধীনতা নয়.....ইহা স্বাধীনতাকারী স্বাধীনতা।....আজিকার এই স্বাধীনতা অযোগ্যত্ব দ্বারা পরিচালিত—পরিত্রক শ্রেণীর নিকট বাহ্যিক উপস্থিতি করিয়া দিয়াছে।’

২৬ ‘দরিদ্রের দারিদ্র ঈশ্বর প্রদত্ত নহে, ভদ্রবান বা বোদা কাহাকেও ধনী বা কাহাকেও দারিদ্র করিয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহা বর্তমান জনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফল, দেশে যতদিন পর্যন্ত বর্তমান জনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকিবে ততদিন পরীষ আরো গরীব হইবে।’

২৭ ‘শ্রেণী সংঘাত কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না কেহ উহাকে উন্মীলিত দিতে পারে না। উহা সমাজের অন্তর্নিহিত ব্যাপ্তি এবং উহাই সামাজিক অশান্তির মূল কারণ, দুর্নীতি, অভ্যাসের ও অন্যাচারের স্রোত।’

২৮ ‘সমাজের ভিতর বৈপ্লবীক পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য সমাজতান্ত্রিক বহু-পন্থিক। সমাজ-

বিপ্লব বাহাতে সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।....সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।’

২৯ ‘সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রচার প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।....একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবহার মধ্যম মানবতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।’

৩০ ‘সমাজতান্ত্রিক দলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে দলের কর্মীদের যোগ্যতার উপর। দলের প্রত্যেক সভ্যকে খাতি সমাজতান্ত্রিক হইতে হইবে।....সমাজতান্ত্রিক দলের সভ্যরা যদি আদর্শ সমাজতান্ত্রিক না হয়, তাহারা যদি সুবিধাবাদী হয় তাহা হইলে তাহাদের আদর্শ কেহই অনুপ্রাণিত হইবে না এবং তাহাদের হাতে যদি কখনো রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার আসে তবে তাহা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে না, সুবিধাবাদীদের রাষ্ট্র হইবে। তাহারা সমাজতন্ত্রের নামে নিকৃষ্ট স্বার্থসিদ্ধি করিবে, দেশের জনসাধারণকে শোষণ করিবে।’

[১৯৪৪ ইং এই জুন বরিশালে পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) সোশালিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ২৫ হইতে ৩০নং উক্তি]

১৯৪২—আগষ্ট বিপ্লবের ঋতিয়ান

—ঐপর্ধবেক্ষক



আগষ্ট বিপ্লবের আগুন যখন সারা দেশ জুড়ে মাথাটির মতো লেলিহান লিখায় অগ্নি উঠলো : সে দিন সারা দেশ জুড়ে নেতৃবৃন্দের প্রেক্ষারত প্রতীতিতে এবং পাকিস্তানের ঐতিহাসিক প্রস্তাব ‘ভারত ছাড়’ এই আন্দোলনে ভারতবর্ষের বিশাল জনতার মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সর্বাঙ্গিক বিজ্ঞান সংগঠিত হয়েছিল, সেই অগ্নিতে চতুর্ভুজিত বেগুনের মতোই অক্ষমতার বেতার ভার্য এবং কার্যসীমিত নেতাজী কর্তৃক সংগঠিত ইতিহাস দ্বন্দ্বনাশ আমি ভারতবাসীর মনে এক নব উদীপনার প্রেরণা এনে দিয়েছিল। তদানিন্তন ভারত সচিব মিষ্টার আমেরি তাই শক্তিত হইবে বেতার ভাষণে ওই ১১ দফা ধ্বংসাত্মক কর্তৃকচীর জন্ত দায়ী করলো কংগ্রেসকে।

উজ্জ্বলিত জনতার যোববহি কেটে শঙ্কলো-দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। মাইলের পর মাইল রেল লাইন হল উৎপাতিত—ডাকঘর হল বিপ্লব—খানাগুলি হল অগ্নিদগ্ধ—কোটি কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি হল লুপ্তিত ধ্বংসপ্রাপ্ত। বড় বড় শহরের যথা আমলাবাদ, বোম্বাই ও টাটা শিল্প কারখানাগুলির লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজবদ্ধ করে ধর্মঘট ঘোষণা করলো। বিভ্রান্তনগুলি থেকে হাজার হাজার ছাত্র—স্কুল কলেজে পরিত্যাগ করে সংগ্রামে সামিল হল। সারা দেশে জারী হয়ে গেল অডিভিস—গ্রেস ও পত্রিকাগুলি স্পষ্ট লেখনীর ওপর শুকু হল বাধানিবোধের কড়া সেন্সার ব্যবস্থা, সংবাদপত্রগুলির জামানত হল বাজেয়াপ্ত।

আমলাভ্রম, যাত্রা শাসনের বহুটিকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত করে রেখেছিল—ভীষণ ও ভয়াবহ আকারে তাদের দমন পীড়ন নির্ধাভন শুরু করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। তাদের পুরাতন অস্ত্র—ব্যাটন-লাঠি-রাইফেলের ইন্দোদিয়ে কাছনে গ্যাস জনতাকে শায়েস্তা করতে ব্যবহার করতে লাগল।

সারাদেশটা যেন বৃষ্টিশের বন্দীলিখিরে পরিণত হয়ে গেল। ৬০ হাজারের অধিক নরনারীকে প্রেক্ষারত করে কারারুদ্ধ করে রাখা হল। কোনও কোনও স্থানে জারী হল সামরিক আইন, পিটুণী ট্যাঙ্ক বদিয়ে জোর জুলুম করে পাইকারী হয়ে জরিমানা ধাৰ্য্য হল। গৃহে গৃহে চললো ব্যাপক খানাতল্লাসী নারী জাতির প্রতি চললো নির্ধাভন, অধমাননা। গ্রামে গ্রামে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হতে লাগল—কলে গ্রামবাসীরা হল গৃহহারা। আমলাভ্রম অত্যাচারে এমনই মরিয়া হয়ে উঠলো যে, দেশের কয়েকটি অঞ্চলে বোম্বার্বণে জনতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে কুপ্তিত হলনা, কিন্তু এতৎসঙ্গে বীর খাদানতা সংগ্রামীদের দমিত করতে পারলোনা। হাজারে হাজারে মুক্তি পাগল মানুষ প্রাণ দিল বন্দুকের গুলিতে। দেশের কয়েকটি

অকল মুক্তাকল বলে ঘোষিত হল ব্রিটিশের আর কোন কর্তব্য রইলনা। মুক্ত স্বাধীন বলে ঘোষিত হল বালিয়া—সাতারা, তমগুক। সরকারী দমন পীড়নের কলঙ্কভিত্তি যে ক্ষয় ক্ষতির হিসাব তদানিন্তন কালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত হয়েছিল সেটা এখানে উল্লেখ করা হল।

পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে নিহত— ২৪০ জন।

পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে আহত— ১,৬৩০ জন।

গুলি চলেছিল— ৫৩৮টি ক্ষেত্রে।

মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা— ৬০ হাজার ২২২ জন।

নিরাপত্তা বন্দীর সংখ্যা— ১৮ হাজার।

মিলিটারী ডলব করা হয়েছিল—৬০টি ক্ষেত্রে।

বোমা বর্ষিত হয়েছিল— ৬টি স্থানে।

পাটনা, ভাদলপুর, নবীয়া, মুন্সের, তালচের, বেলগের স্টেশন অগ্নি ছিল—ভিলেবর পর্যন্ত— ৩১৮টি টেলিফোন ও টেলিগ্রাম বোমাবোম্ব বিচ্ছিন্ন—১২ হাজার জায়গায়।

ডাকঘর লুণ্ঠিত হয়েছিল—২৫২টি তার মধ্যে ৬০টি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল।

অগ্নি সংযোগের ঘটনা— ২৪৬টি ক্ষেত্রে।

রেল লাইন অপসারিত— ৫২টি ক্ষেত্রে।

রেলের ক্ষতি হয়েছিল— ১৮ লক্ষ টাকা।

বঙ্গির ক্ষতির হার— ২ লক্ষ টাকা।

স্টেশন ভবনের ক্ষতি— ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

কাল ও অর্থ লুণ্ঠিত হয়েছিল— ২ লাখ টাকা।

রাজনৈতিক বড়ের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিল প্রধান উপকৃত অকলগুলির মধ্যে আসাম, উপত্যাকা, বাংলার পশ্চিম উপকূল, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বিহারের সমস্ত অকল, উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল, ওড়িশার সমুদ্রে উপকূল অকল, পূর্ব গোদাবরী, গুন্টুর, কোয়েম্বাটুর, পূর্ব ও পশ্চিম বাম্বেস, সাতারা, বারোচ, নেপাল সীমান্ত, কদমাখালি ও সমরোৎপাদনকারী অকলগুলিতে আগষ্ট বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল।

‘অনেক মুক্তা ও জাগরণের স্তিতর দিয়া ভারতীয় জাতি চলে এসেছে, কারণ ভারতের একটা মিশন আছে, ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে, বাহা আজও সফল নাই।’

—নেতাজী ॥

মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস চর্চার সার্থকতা

: কালিদাস সরকার :

স্বাধীন ভারতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস যেমন সঠিক ভাবে আজও সংকলিত হয় নি, তেমনি হয় নি ইতিহাস চর্চার সমস্ত ব্যবস্থা। স্থূল কলেজ ব্যংকিং ইতিহাস পাঠ ছাড়া অনেকের পক্ষেই ইতিহাস সম্বন্ধে অতিরিক্ত জ্ঞানলাভ ঘটে উঠে না। অথচ এক্ষণে অনবধীকার্য যে, জাতিগঠনে ইতিহাস শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক। যে স্বাধীনতা আমরা পেরেছি এ যে ব্রিটিশের দান হিসাবে পাই নি, অথবা আন্তর্জাতিক ঘটনা। প্রবাহের ফলে আমাদের হাতে এসে যায় নি, আমরা তা অর্জন করেছি বহু ক্লেশবরণ, ত্যাগস্বীকার ও আত্মবলিদানের মূল্যে, এই সত্য কে কি জানি কেন স্বাধীনভাবে দেশের সামনে তুলে ধরা হয় নি।

দেশে বর্তমানে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সংকীর্ণ আঞ্চলিক স্বার্থের কালোছায়া পক্ষ বিস্তার করেছে, তার মূল আছে জাতীয় ইতিহাস শিক্ষা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমন্বয়ী চেতনার অভাব। পঞ্চান্তরে, নির্বাচনে ভোটলাভের উদ্দেশ্যে, বড় ছোট প্রায় সকল রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক এবং বিচ্ছিন্নতাকামী গোষ্ঠিগুলিকে নানাভাবে উৎসাহ দেয়।

সরকার অসুস্থ শ্রেণীর মানুষের ক্ষুদ্র শিক্ষা, বাসগৃহ নির্মাণ, ভূমি-অধিকার এবং পেশাগত উপার্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিন তাতে কারো বলবার কিছু নেই, তবে জাতি ও বংশগত ক্ষয়ের ভিত্তিতে এই ধর্মমেরাধী সুবিধাদান বিশেষ শ্রেণীস্বার্থমুগ্ধ করতে বাধা, পরিণামে যার ফল জাতীয় সংহতির অন্তরায় হবে। জাতি-ক্ষয়ের তুল ভিত্তি তুলে দিয়ে, বিশেষ সুবিধানের ভিত্তি করা উচিত আর্থিক অনগ্রসরতা। সম্প্রতি উপজাতি, আদিবাসী এবং ভূমিসীলী জাতির কল্যাণ প্রয়াস নিয়ে বিভিন্ন মতবাদের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে মাতামাতি দৃষ্টিগোচর হয়, তার লক্ষ্য রাজনৈতিক মুনাফা শিকার ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে ভিত্তি করে বিশেষ সুবিধাদান সম্প্রসারিত করলে, সমাজের সকল জাতি ও ধর্মের গুণগত মানুষ উপকৃত হবে, শ্রেণীসচেতনতা হ্রাস পাবে এবং জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর হবে।

ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস এবং সংগ্রামে নেতৃত্বদান নিঃসন্দেহে বিরাট, কিন্তু তাই সবটুকু নয়। গান্ধীজী পরিচালিত অহিংস সংগ্রামের ঠিক পাশাপাশি চলেছিল সশস্ত্র সংগ্রামও, সশস্ত্র বণ্ড অভিযানগুলিকে পৃথক ভাবে না দেখে একটি অবিচ্ছিন্ন বৈশবিক সংগ্রামের অংশ হিসাবে গণ্য কর উচিত। বহু ভারতীয় ও বিদেশী ব্যাতিমান ঐতিহাসিকের নৃতিতে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীজীর ব্যর্থতা অপরিণীম বলে নিমিত্ত এবং যার পরিণতি দেশবিভাগ। আন্দোলনের বিষয়, স্বাধীনতা উত্তর ভারত সরকার ধর্মকাল ধরে নিরন্তর প্রচার চালিয়েছিলেন যে, একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের ফলেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। এই মিথ্যা প্রচার না পেরেছে দেশবাসীকে গান্ধীজীর নৈতিক আশ্রণে অহুগোপিত করতে, না দেশপ্রাণে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করতে। বর্তমানে গান্ধীজীর ভগ্নাধী

অনেকটা স্বেচ্ছা, তবে সশস্ত্র বিপ্লবীদের নির্ভীক আত্মদানের দৌরব্যবস্থার আলোকে সঠিকভাবে জন-মানসে তুলে ধরা হয়নি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে মুসলমান অধিকারের বিরুদ্ধে কাল ১১২২-১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ। তারারনের যুদ্ধ থেকে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত। মুসলমান শাসককুল ভারতভূমিতে স্থায়ীভাবে বাস করলেও ছিলেন বহিরাগত। ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, বেশভূষার তারা বিচ্ছিন্ন হিন্দুদের থেকে নিজেদের পৃথক করে রেখেছিলেন। তারা হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক জিম্মিরূপে গণ্য করতেন এবং তাদের থেকে জিজিয়া কর আদায় করতেন। হিন্দুদের অবস্থা ছিল নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত। মুসলমান শাসকদের মধ্যে একমাত্র বাদশাহ আকবর হিন্দু ও মুসলমানদের বিভিন্ন দূর করে একাবদ্ধ ভারতীয় একজাতি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয় নি।

মুসলমান রাজত্বের দুই শত বছর পরে, ১২৪৭ সালে, মুসলমান শাসক-প্রশাসকের বংশ-ধররা দেশবিত্যাস ঘাণি করে বলেছিলেন, 'আমরা ভারতীয় নই, আমাদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন ইরান, তুরান, আফগানিস্তান থেকে ধর্ম, ভাষা, আচার আচরণে আমরা ভারতীয়দের থেকে স্বতন্ত্র। আমরা চাই আমাদের পৃথক বাসভূমি পাকিস্তান।'

তাই যেহেতু মুসলমান নবাব বাদশাহরা ভারতবর্ষকে তাদের বাসভূমি করে নিয়েছিলেন, সেই কারণে তারা বিদেশী ছিলেন না, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নয়। ভারতে পাঁচশত বছরের তুর্কি, আফগান এবং মুসল অধিকারের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম চলেছিল অবিচ্ছিন্নভাবে। এ সংগ্রাম করেছিলেন প্রধানত: রাজপুত, জাঠ, বাঙ্গালী, মারাঠা এবং শিবজীরা। মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইত। তারবারির দাবী এক টিকে ছিল তারবারির সাহায্যে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা সেনাপতি সন্যাসি রাও দিল্লী অধিকার করলে, বাদশাহ আমেদ শাহ, অর্ধাধ্যায় নবাব, রোহিল্লা অধিপতি এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান প্রধানরা আফগান নৃপতি আহমদ শাহ আবদালিকে ভারত আক্রমণের জন্য ডেকে আনেন এবং সকলে একযোগে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজিত করেন। মারাঠাদের অপ্রত্যাশিত পরাস্তব অবশ্য ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের পরমায়ু না বাড়িয়ে, ইংরাজ রাজত্ব বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্বে দুটি ব্রিটিশ অধিকারের বিরুদ্ধে কাল ১২০৫-১২৪৭। বঙ্গভঙ্গ হ্রসব দ্বন্দ্বের আন্দোলন থেকে ব্রিটিশ ভারতীয় নৌ-সেনানী বিদ্রোহ পর্যন্ত। এই ক্রান্তি-কালের কথা অনেকেরই জানা, তাই তার বিশদ বিবরণ অনাবশ্যক। তবে মুসলমান আমল থেকে ব্রিটিশ আমলে পৌছবার দুঃসম্মতিকাল সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ ছিল যুদ্ধের অভিনয় মাত্র। মুঘল বাদশাহ ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নি। ১৭৫৪ সালে বঙ্গের যুদ্ধে বেদিন অর্ধাধ্যায় নবাব এবং নবাব মীরকাসেমের সৈন্য বাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পরাজিত হয়, তারপরের দিন বাদশাহ শাহ আলম ব্রিটিশ শিবিরে

গিরে ইংরাজ সেনাপতি মেজর মনরোকে অভিনন্দন জানান। ইংরাজ অধিকার প্রতিরোধে সত্যিকার লড়াই যা হয়েছিল তা করেছিলেন মারাঠা ও শিবগণ এবং কিছুটা টিপু সুলতান। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের হাত থেকে ইংরাজ এসেছে জয় করেছিল।

ইংরাজ কোম্পানীর রাজত্বস্থাপনের পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে ফরাসী চিকিৎসক ডাঃ বার্নিয়েরের বৃত্তান্তকে নিরপেক্ষ অভিমত বলে ধরা যেতে পারে। বিশেষতঃ তিনি মুঘল রাজ পরিবারের চিকিৎসক। তাঁর লেখা থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

A tyranny so excessive as to deprive the peasantry and artisan of the necessities of life and leave them to die in misery and exhaustion, a tyranny owing to which these wretched people either to have no children or have them only to endure the agonies of starvation and die at a tender age, a tyranny in fine, that drives the cultivators from their wretched home."

ঐতিহাসিক ডিনসেট শিখ বলেছেন, "The condition of India during half century following the death of Aurangzeb may summed up in one word -misery."

ইতালীয় ডাঃ মাহুচি ও সমকালীন অবস্থার যে বৃত্তান্ত বেবে গিরেছেন তা থেকে জানা যায় যে, সমগ্র দেশ অবিচার অত্যাচার পূর্ণ ঘোর অরাজকতার মধ্যে পড়েছিল।

বস্ত্তঃ বৈদেশিক দৃষ্টিতে মুসলমান শাসনের যে চিত্রটি ধরা পড়েছিল তাই ছিল সাময়িক ব্যতিক্রম ছাড়া ভারতে দীর্ঘ মুসলমান শাসনের সামগ্রিক রূপ। ভারতবর্ষের মানুষ তাই ইংরাজ শাসনকে অবিচারিত মনে গ্রহণ করেছিল। ইংরাজ অধিকারের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামকালে মুসলমানদের সেই সংগ্রামের সহিত যুক্ত করার উদ্দেশ্যে, মুসলিম রাজত্বের কর্ণ ইমারতের উপর যে হুকুম করা হয়েছিল এবং সিরাজদৌলা, মীরকাসেম, টিপু সুলতান, বাহাদুর শাহ প্রমুখদের দেশপ্রেমিক জাতীয় বীরের মর্যাদা দেবার যে চেষ্টা হয়েছিল তাকে ইতিহাস সন্দেহ বলা যায় না।

ইংরাজ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেছে। ইংরাজ শাসনের প্রকৃতি অতীত দিনের ইতিহাসের বিবরণবস্ত্ত। একথা আদ্য মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে, দোষ-ত্রুটি এবং বাণিজ্যিক শোষণ সবেও ইংরাজী শিক্ষা ভারতের ভৌগোলিক ঐক্য, একজাতি তত্ত্ব, দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি আগ্রহ এবং আত্মবিশ্বাস থেকে জাগরণের সহায়ক হয়েছিল। দেশ-বিভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর ইংরাজ শাসনের ঐতিহাসিক অবদানকে ম্লান করলেও, তার গুরুত্ব মুছে ফেলবার নয়, অকটারলোনি স্মৃতিস্তম্ভকে শহিদ-মিনার নাম দিবেও তা করা বাবে না।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যারাই বিদ্রোহ করেছে তাদের সবাইকেই ভারতের জাতীয় মুক্তি-বোদ্ধরূপে ভুলে বরাদ্দ একটা অযৌক্তিক প্রবণতা সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য

হল প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কৃমিকাকে লম্বু করা। এ চেয়ার উজোক্তা হল কমিউনিষ্ট দলগুলি, যারা জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ, ওয়াহেবি বিদ্রোহ, ভিত্তুবীরের বাগের কোয়ার লড়াই প্রকৃতি সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণ স্বার্থ বণ্ড-বিদ্রোহগুলি নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ব্যাভাবাড়ির মধ্যে সেই অভিসন্ধি মুগ্ধকট।

ত্রিপুরা রাজ্যের খোদাই ও কমলাপুরে ১৯৪২-৪১ সালে মার্কসবাদী ত্রিপুরা উপজাতি পরিষদ তেলেননা ও কাকদীপের ধরনে গৃহবাহ, লুটতরাজ ও গণহত্যার মাধ্যমে মুক্তাঞ্চল গঠনের যে অভিযান চালিয়েছিল, কিছুদিন আগে তার শরণ-ভিষিতে ত্রিপুরার সি, পি, আই (এম) মন্ত্রীসভার উক্ত বিদ্রোহের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন, সাম্প্রতিক নারকীর হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস কর্মের অন্ততম সচেতক। স্বাভূষণ ও উত্তরবণ আন্দোলনের শিহনে আদিবাসী এবং উপজাতি লোকসব সক্রীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিকে চালা করে তুলে, এই ধরনের অভিসন্ধি হাসিল করার চক্রান্ত থাকা সম্ভব। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে যে আদিবাসী-উপজাতি অশান্তি নানা বেঁধে উঠেছে তার মূলে আছে মার্কসীয় শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্বের শিক্ষা, যার পরিণতি ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংহতি ধ্বংসকারী বিচ্ছিন্নতাবাদের বিস্তার। সুতরাং মার্কসবাদীদের সম্পর্কে সন্তর্ক হবার সময় এসে গেছে, কারণ সমাজে বিশৃঙ্খলা, বিভেদ এবং অরাজকতা সৃষ্টির দ্বারাই শুধু কমিউনিষ্ট বিদ্রব ঘটানো যায়।

১৯০৫ সালের অক্টোবর আন্দোলন এবং সেই আন্দোলন থেকে উদ্ভূত সমগ্র বিদ্রব সংগ্রামের ত্রিটিশের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-যুদ্ধের প্রারম্ভকাল বলে ধরলেও, ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধকে কেনিভাবে ছোট করা হচ্ছে না সিপাহী যুদ্ধকে ভারতের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলে মেনে নিতে পারেননি কিন্তু বহু প্রচ্যুত ঐতিহাসিক। তাঁদের অভিযন্তকে অগ্রাহ্য করা যায় না।

সিপাহী-যুদ্ধ ব্যাপক হলেও কংসরকাল মধ্যে তার সমাপ্তি ঘটে, এই বিদ্রোহ সংগ্রাম ছিল মুস্পট লক্ষ্যবজিত, সামন্ততন্ত্র ও মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ভাবিত। সংগ্রামের ধর-প্রবাহে ধাবিত অস্থির তক্তবীর বাড়ে হালে মিল ছিল না, ছিল না দক্ষ নাবিক। বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বলে ঘোষণা করার, বিদ্রোহ যুদ্ধে যোগ দেননি দেশপ্রেমিক রাজপুত্র এবং বণিনিপুণ লিখদণ। সিপাহীযুদ্ধকে দেশের প্রসতির প্রতিবন্ধক মনে করে, যুদ্ধ থেকে দূরে ছিলেন দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। গণচেতনার কথা সে যুগে বর্তব্য ছিল না।

সিপাহী সংগ্রাম সফল হলে কি হত? পরম্পর বিরমমান কতকগুলি আকলিক রাজ্যের এক বণিত ভারতবর্ষ, যার উপর রাজহুত্র মেলে বসতেন এক চর্লস শাহানশাহ কোনক্রমে একবার শক্ত হয়ে বসতে পারলে, কাসেম হত কুশাসন, জিজিহ্বা কব, কাজির বিচার এবং মন্দির ধ্বংসের অভিযান। কয়মান শাসিক সাহিত্য রচনা যেমন সাবলীল রস প্রবাহে কালজয়ী হতে পারে না তেমনি রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভেদ সিদ্ধির উপায় হিসাবে যে ইতিহাস লেখা হয় তাও সর্বজন গ্রাহ্য হয় না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিরশেক পৃষ্টি, সজ্ঞা এবং পবনশা ভিত্তিক করে রচনার প্রয়োজন আছে। যে ইতিহাসের শিক্ষা জাতিকে করবে ঐতিহ্য মণ্ডিত, ভ্রমহন্ত, আশ্রনর্শিত এবং ভাবীকালের নানাবীরকে মহত্তর ভাবে অঙ্গপ্রাণিত করবে।

চরম পত্র—নেতাজী



[১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেন বাংলা সরকার হলওয়েল মন্ত্রুমেন্ট অপসারণের আন্দোলনের নেতা হিসাবে। সরকার কিন্তু বাধা হলেন এ অপসারণের দাবী মেনে নিতে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে নানা অছিলায় মুক্তি দেওয়া হল না। সুভাষচন্দ্র অনুভব করলেন সরকার যেন তাঁকে বন্দী করে রেখেই তার জীবনাবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, নিজের দেশের ও দেশের স্বার্থে মুক্তা বরণ করাই হ্রদ মনে করলেন এবং তখন তাঁর মনোভাব জানিয়ে এই চরমপত্র দিলেন ভবনকার দিনের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভাকে।]

৩০শে অক্টোবর, ১৯৪০ সালে হোম মিষ্টারকে যে চিঠি লিখেছিলাম (যার নকল মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে) এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্সি ফেলার সুপারিণ্টেনডেন্টকে ১৯৪০ সালের ৩০শে অক্টোবর ও ১৪ই নভেম্বর লিখিত পত্রের সম্পর্কেই, আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। আমার নিজের ব্যাপার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করছি এবং যে কারণগুলি আমাকে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে প্রলুব্ধ করেছে, সেটা কাগজে কলমে লিখে জানাচ্ছি।

আপনার নিকট থেকে কোন প্রতিনিধিগণ পাবার আশা আমি রাখি না। আমি আপনাকে ছুটি অনুরোধ করব—দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে এই পত্রে শেষভাগে উল্লেখ করব। আমার প্রথম অনুরোধ হল এই যে আমার এই চিঠিটা যেন সরকারী দপ্তরখানায় সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। যাতে করে আমার যে সমস্ত দেশবাসী আপনার পরে ক্ষমতায় আসবেন, তারা এই পত্র দেখতে পান। এই পত্রটির মধ্যে আমার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি বাণী আছে এবং সেজন্য এটা আমার রাজনৈতিক উইল বা ইচ্ছাপত্র।

১৯৪০ সালের ২৪ জুলাই ডি, আই কলসের ১২২ খারা অনুযায়ী বাংলা গভর্নমেন্ট কোন কৈফিয়ৎ বা হুক্তি না দেখিয়েই আমাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন। প্রথম কৈফিয়ৎ আসে সেক্রেটারী অব হেট মি: আমেরীর নিকট থেকে। তিনি হাউস অব কমন্স-এ বলেন, হলওয়েল মন্ত্রুমেন্ট সংক্রান্ত আন্দোলনের সম্পর্কে আমাকে বন্দী করা হয়েছে।

এই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গভা: এই বিরুদ্ধিতে সমর্থন করেই বাংলাদেশ বিধানসভায় বিবৃতি দেন। হলওয়েল মডমেট সভ্য।এহ আন্দোলনই নাকি আমার মুক্তিযুদ্ধের বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সরকার যখন হলওয়েল মডমেট অশাসনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন আমাকে স্ট্রিনরেল্স নারায়ন চক্রবর্তী এম, এল, একে ভিন্ন সর্বশেষই মুক্তি দেন। আগষ্ট মাসের শেষের দিকেই এই বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে Defence of India Rules এর ২৬ ধারা অনুসারে পাকাপাকিভাবে আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়, অবশ্য ১২৯ ধারা অনুযায়ী সাময়িকভাবে আটক রাখার পরিবর্তে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, এই ২৬ ধারা অনুযায়ী নতুন আদেশ যখন দেওয়া হল, তখন D, I, Rules-এর ৩৮ ধারা অনুসারে দুইজন ম্যাজিস্ট্রেটের সাম্মুখে আমার তিনটি বক্তৃতা ও আমার সম্পাদিত 'কবওয়াড' ব্রক পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধ লেখার ক্ষমতা আমাকে অভিব্যক্ত করা হল। এর মধ্যে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম ১৯৭০ সালের কেরবারী মাসে এবং তৃতীয়টি এপ্রিল মাসে।

গত আগষ্ট মাসের শেষ দিকে, ডিসেন্স অব ইণ্ডিয়া, কুলের একটি ধারায় আমাকে বরাবরের জন্য আটক রেখে ও একই সময় অন্য একটি ধারা অনুযায়ী আদালতে আমাকে অভিযুক্ত করে, সরকার একটি অস্থিতীয় এবং অতীতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। এই ঘটনা ঘটোর আগে আন্তর্জাতিক ক্রম ও বিচার বিভাগীয় মর্দখ্যা চালাবার এই প্রকার অসুস্থ সংমিশ্রণ আমি দেখিনি। এইপ্রকার কার্যধারা পুঙ্খভেই বে-আইনী, অস্বাভাবিক এবং নির্ভর্য্য প্রতিনিহাসমূলক।

এটা দেখতে কেউ ভুল করবে না যে আমার বিরুদ্ধে যে মর্দখ্যা করা হয়েছিল, সেটা তথাকথিত অপরাধ সংঘটনের অনেক পরে। এটাও সঠিক এড়িয়ে যেতে পারে না, যে প্রবন্ধটি 'কবওয়াড' ব্রক কাগজে মুদ্রিত হয়েছিল, শান্তি হিসাবে সেক্ষেত্র পাঁচশত টাকার জামানত জমা করে, নতুন করে দুই হাজার টাকার জামানত দাবী করা হয়েছে। অধিকন্তু, সরকারের প্রচলিত বিধি অনুসারে কোনপ্রকারে হুঁসিয়ার না করে দিয়েই, অনেকদিন পর হঠাৎ ঐ কাগজটির উপর আক্রমণ চালান হয়েছিল।

সরকারের মনোভাব আরো প্রকোটে হয়ে পড়েছিল, যখন আমার জামীনের ক্ষমতা দুই বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করা হয়েছিল। সরকারী মুখপাত্ররা এই আবেদনের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। Wali-ul-Islam নামে ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামীনের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন, কিন্তু বলতে বাধা হয়েছিলেন যে, D, I, Rules এর ২৬ ধারা অনুযায়ী আমার অন্তরীণের আবেদন প্রত্যাহত না হলে, তার আবেদন কার্যকরী হবে না।

একথা দিব্যলোকের মত পরিষ্কার যে সরকার এমন নীতি অনুসরণ করেছেন, যাতে আদালতের বিচার বিবেচনার পক্ষে বাঁধা সৃষ্টি করছে এবং আইনের শাসন প্রচলন করতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। স্থানীয় সরকারের কার্যকলাপ আরো আপত্তিজনক হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় এই সমস্ত মর্দখ্যার ব্যাপারে ভারত সরকারের পরামর্শ অমান্য করা হচ্ছে।

সরকারী নীতির আর একটি কৌতূহল জনক দিক্ হচ্ছে আমাদের যুগক দুইজন অ্যাজিটেটে সম্বন্ধ অভিযুক্ত করা হয়েছে। বাসু কলকাতার আমি গত বার মাসের মধ্যে অনেকগুলি বক্তৃতা করেছি। যদি একাধিক বক্তৃতা বিচারকের সামনে উপস্থিত করার ইচ্ছা থাকত, তবে দুইজন বিচারকের সাহায্য নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। একজন সাধারণ মানুষ একথা ভাবতে বাধ্য হবে যে সরকার আমাদের নও দিতে এতই আগ্রহী, যে বিচারের ধনুকে দ্বিতীয় জ্যা-এর কলবস্ত্র করে রাখা হয়েছে।

সরকারের কর্তৃক যে কোন নিরপেক্ষ লোকের নিকট দুর্বিস্তাস্থিমূলক বলে প্রতীয়মান হবে, কারণ তৎকালীন অনিষ্টমূলক কাজে সমাধা হবার অনেক পরেই আমাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মগুলি যদি সত্যিই অনিষ্টজনক হত, তবে যখন একাজ করা হয়েছিল, তখনই সরকারের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল।

D, I, Rules-এ আটক মুসলমান বন্দীদের ও আমাদের মত বন্দীদের প্রতি সরকারী মনোভাবকে তুলনা করে দেবতে আপনাকে অনুরোধ করতে পারি কি? এই আইনেই যে সমস্ত মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কোন কারণ না দেখিয়েই তাদের মধ্যে কতজনকে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

সাম্প্রতিককালে মুরাশাড়ার মৌলভীর ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সবিশেষ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের কি একথাই বৃকতে হবে যে আপনার শাসনকালে হিন্দুদের জন্য একরকমের আইন আর মুসলমানদের জন্য অপরকায় আইন চালু আছে এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে D, I, Rules-এর ব্যাখ্যা ভিন্ন প্রকারের? যদি তাই হয়, তবে সরকারের তরফ থেকে তেমনি যোগা করা উচিত।

তর্কের ব্যভিচারে যদি বলা হয় যে আমাদের কারাকন্ড করার জন্য, প্রাদেশিক সরকার নয়, কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী, তবে আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য পণ্ডিত এন্ড কে মৈত্রেয় মূলতঃই প্রস্তাবের জবাবে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে যেহেতু বাংলা সরকার আমাদের কারাকন্ড করেছেন, কেন্দ্রীয় আইনসভার এ বিষয়টি তুলে কোন লাভ নেই। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের আইনসভার মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে একথা স্বীকার করা হয়েছিল।

এবং আমরা ভুলতে পারিনি যে বাংলাদেশে আমরা একটি 'জনপ্রিয়' সরকারের অধীনে বাস করছি।

কেন্দ্রীয় আইন সভার আমার সাম্প্রতিক নির্বাচন আরো একটি প্রশ্ন তুলেছে—এ আইন সভার অধিবেশনের সময় সদস্যদের কারাগার থেকে মুক্তি দিতে হবে। পরিকারভাবে উল্লেখ থাক বা না থাক, এটা একটা সংবিধানগত অধিকার এবং এই অধিকার দীর্ঘদিন লড়াই করে আদায় করা হয়েছে। অতি সাম্প্রতি, বর্ধা সরকার একজন দণ্ডিত আসামীকে আইন সভায় যোগ দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি যদিও দণ্ডিত আসামী নই, জুও 'লোকপ্রিয়' সরকার আমাদের এই অধীকার দিতে অস্বীকার করেছেন।

তাকিকরা যদি ক্যাপটেন রামসের (এম, সি) ব্যাপারটি সরকারের সমর্থনে খাড়া করতে চান, আমি বলব, তার ব্যাপারটা আমাদের থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। তার বিরুদ্ধে, গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল, এবং সমস্ত ভাষা না মেনে ভালমন্দ কিছু বলা শক্ত।

একথা জোর দিয়ে সমর্থন করা যায় যে Captain Ramsayকে যদি অজ্ঞানভাবে কারাকুদ্ধ করা হয়ে থাকে এবং তার কোন প্রতিবিধান করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইংল্যান্ডে গণতন্ত্র হত বলে মি: কেনেডি ও অজ্ঞানরা যে সমালোচনা করেছেন, তাকেই সত্যি বলে মনে নিতে হবে। সে ঘাহোক, Captain Ramsay House : of Commons-এর একটি কমিটি কর্তৃক তার ব্যাপারটিকে পরীক্ষা করিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

আমার মামলাটি সম্বন্ধে দুইদিক থেকে বিচার বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত: এই প্রতিরক্ষা আইনটির পিছনে, লৌকিক বা নৈতিক কোন সমর্থন আছে কি? দ্বিতীয়ত: আইনটি কি বখাবতভাবে আমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে? দুটি প্রশ্নেরই নেতিবাচক উত্তরই মিলবে।

জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার বিরোধী বলেই এই প্রতিরক্ষা আইনটির পেছনে কোন নৈতিক সমর্থন নেই। অবিকল্প, এটা একটা হুঙ্কালান বাবদ্যা এবং প্রত্যেকেই জানেন জনগণের ও আইনসভার অস্তিত্ব না নিষেই ভারতবর্ষকে দুচ্ছরত দেশ বলে তাকে হুঙ্কের সামিল হতে বাধ্য করা হয়েছে।

আরো বলতে হয়, এই হুঙ্কে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াই করা হচ্ছে বলে ত্রিটেনে যে সোকার দাবী করা হচ্ছে, এই আইনগুলি, তার পরিপন্থী। সর্বশেষে, একথাও বলতে হবে যে কেন্দ্রীয় আইন সভা প্রতিরক্ষা আইনটির পক্ষে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই প্রতিরক্ষা আইনগুলিকে ভারতীয় দমন আইন বা অজ্ঞানকে সমর্থনকারী আইন বলে আখ্যা দিলে অসুচিত করা হবে কিনা, এটাই জিজ্ঞাস্য।

সমর্থনে একথা বলা হতে পারে যে প্রতিরক্ষা আইনটী কেন্দ্র থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে বলে, প্রাথমিক সরকার সে আইনগুলি মানতে এবং প্রয়োগ করতে বাধ্য। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যে এই আইনটির বখাবত প্রয়োগ হয়নি, তার সমর্থনে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।

অবৈধতা ও অবিচার সুস্পষ্টভাবে প্রকট হয়েছে। আমার মনে হয়, সরকারের অদ্বুত ব্যবহারের একটি মাত্র ব্যাখ্যাই আছে। সেটা হল, সরকার দুর্ধেধ্য কারণে আমার সম্বন্ধে প্রতিহিংসামূলক নীতি অনুসরণ করছেন।

দুই মাসের উপর ধরে, এই সঙ্কটজনক অবস্থার আমার কি করণীয়, এই প্রশ্ন আমার বিবেকের দরজার বাববার আঘাত করেছে।

ঘটনাপ্রবাহের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বা ভাসে। আত্মে ঝটক, তাকেই মেনে নেব অথবা বেটা। আমার নিকট বে-আইনী, অবিচার মূলক ও অজ্ঞায় বলে মনে হয়, তার বিরুদ্ধে ক্রোধ ধাঁড়াব ? পরিপূর্ণভাবে বিচার বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে ঘটনা প্রবাহের নিকট আত্মসমর্পণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অজ্ঞায়ের নিকট নতিস্বীকার করা, অজ্ঞায় কর্ম করার থেকে স্বাভাবিক পাপ। স্বভাব প্রতীকার আমি করবই।

কিন্তু আজকালকার দিনে প্রতিবাদ চলছে এবং প্রতিবাদের সাধারণ পদ্ধতি নিশ্চেষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্ববরের কাগজ ও সভাসমিতির মাধ্যমে আন্দোলন, সরকারের নিকট প্রতিবেদন, আইনসভায় দাবী এবং অজ্ঞাত আইনসম্মত পথের পরিকল্পনা—এ সবই কি পরীক্ষা করা এবং বার্ষ প্রমাণিত হয়নি ? শুধুমাত্র পন্থাই খোলা আছে—সেটা হচ্ছে অনশন করা, যা একজন বন্দীর হুঁতের শেষ অস্ত্র।

আমি ধীর মন্থিত্ব এবং বৃদ্ধি দিয়ে এই পরিক্ষণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সবমুঠ পরীক্ষা করেছি এবং এর থেকে কি লাভ ও ক্ষতি হতে পারে, তাও বিবেচনা করেছি। আমার এ স্বপক্ষে কোন মোহ নেই এবং পরিপূর্ণভাবে আমি জানি এর অস্ত্র এবং অস্ত্রভবনীয় ফল কিছুই হবে না। কারণ এমনভরো সম্মুখে সরকার এবং আমলাতন্ত্রের ব্যবহার কি হয়, তাও আমার অজ্ঞাত নয়। আমার শ্রবণপথে ম্যাকমুইনি ও বর্তমান দলের চিরায়ত ও অমর উদাহরণ ভেসে বেড়ানো। এই প্রশাসন তন্ত্রের কোন দলই নেই। যাকে আন্দোলিত করা যায় যদিও এর সম্মানের একটি মিথ্যা ধারণা আছে, যেটা সকল সময়ের জন্য আকড়ে ধরা হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবন আমার নিকট ছবিসহ হয়ে উঠেছে। অজ্ঞায় এবং অবিচারের সঙ্গে আপোষ করে বেচে থাকার আমার হাতে নেই। এই মূল্য দিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আমি জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। পার্শ্বিক শক্তির জোরে সরকার আমাকে কারাবদ্ধ করে রাখতে চায় উত্তরে আমি বলব “আমাকে মুক্ত করে দাও, অজ্ঞাত আমি বেঁচে থাকব কি মৃত্যুবরণ করব, সে সিদ্ধান্ত আমিই নেব।”

যদিও আত্ম এবং অস্ত্রভবোন্মাদ ফল এখনই পাওয়া যাবেনা, কোন আশংকানাই ব্যর্থ হয় না। যুগে যুগে দেশে দেশে হুঃস্বরের মধ্যেই শান্ত অশ্রুশাসন জরী হয়—“শহীদদের রক্তই গীর্জার ভিত্তি স্থাপন করে।”

এই মরজগতে সব নষ্ট হয়ে যায় এবং হবো। কিন্তু ভাব, ভাবগতা ও স্বপ্নের মৃত্যু নেই (আদর্শ, মনীষা)। কোন আদর্শের জন্য হবো কেউ প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু তার জীবনহাতির পর সেই আদর্শ সহস্র আত্মায় পুনর্জন্ম লাভ করে। এই বীজিত্যেই বিবর্তনের চাকা এগিয়ে চলে। একযুগের স্বপ্ন শেষের যুগে পূর্ণ মূর্ত হয়ে ওঠে। ত্যাগ, লাঞ্ছনা বরণ ও হুঃখত্রস্ত ছাড়া এ পৃথিবীতে কোন উদ্বেগ পূর্ণ হয় নি।

আদর্শের জন্যই জীবনধারণ এবং মৃত্যুবরণ—এই করুণা অপেক্ষা আর পরমতৃপ্তির কি হতে পারে ? তার অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্য, তারই আত্মা সমমনোভাবাপন্ন আরো বহু মানবাত্মার জন্য দেবে—

এই চেতনা থেকে আর বৃহত্তর সম্ভাব্য কি হতে পারে? তার মৃত্যুর পর তার বাণী, পবিত্র উপভাষার, সমস্তলক্ষ্মিতে, সমুদ্রপারের ছববর্তী দেশগুলিতে জলবায়ুর ভিতর দিয়ে ভেসে বেড়াবে নিশ্চিতভাবে। এর থেকে বড় পুরস্কার মানুষ আশা করতে পারে কি? নিজের আদর্শের বোধীমূলে শান্তিতে আত্মবিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা জীবনের বৃহত্তর সার্থকতা আর কি থাকতে পারে?।

একথা স্বভাসিদ্ধ, ভাগ্য ও লাভনা বরণের পথে কেউ কিছু হারায় না। যদি জগতের কিছুও সৈ হারায়, তবু প্রতিদানে অনেক কিছু লাভ করে—লাভ করে অমর জীবনের উত্তরাধিকার।

এই আবার ধর্ম জাতিতে বাঁচানোর জন্য ব্যক্তিকে মরতেই হবে। ভারতবর্ষকে বাঁচাতে এবং তার বাণীনা ও গৌরব অর্জন করার সহায়তা করতে আমাকে জীবনদান করতেই হবে।

আমার বদেশবাসীকে আমি বলব—একথা তুলো না পতাহীন হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় অভিশাপ আর নেই। অস্ত্র এবং অবিচারের সঙ্গে আশোষ করার চেয়ে বড় পাপ আর নেই। সেই চিরন্তন নীতিকথা শ্রবণ রেখো—যদি তাকে পেতে চাও, তবে তোমাকে দিতে হবে। মনে রেখো, অসামান্য বিকল্পে সংগ্রাম করাই জীবনের মহত্ব সার্থকতা। এবং সেজন্য কি মূল্য দিতে হবে, সেটা বর্তব্য নয়।

বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্যে বলব—সাম্প্রদায়িকতা ও অত্যাচারের যে পথে আপনি উদ্দেশ্যের মত খেয়ে চলেছেন। বন্ধ করুন সেই অভিবান। এখনও ফিরে আসবার সময় আছে। সেই অস্ত্র (Boomer-rod) নিক্ষেপ করবেন না যেটা একদিন আপনার নিজের উপরই আঘাত হানবে। এবং বাংলাকে দ্বিতীয় সিঙ্কুদেশে পরিণত করবেন না।

আমার বক্তব্য শেষ করেছি। আপনার নিকট আমার দ্বিতীয় এবং শেষ অনুরোধ হল যে জবর-দস্তিয়ারকভাবে আমার অনশন প্রতে বিয় উপাসন করবেন না। বরং আমাকে শান্তভাবে মৃত্যুবরণ করতে দিন। ম্যাক সুইনী, বতীন দাস, মহাশয় গান্ধী ও ১৯২৬ সালে আমার নিজের ক্ষেত্রে সরকার অনশনের উপর হস্তক্ষেপ করেন নি। অস্ত্রাশ্রয় বারে যেমন করা হয়েছিল, আমি আশা করি সরকার আমার অনশনের ব্যাপারে কোন রকমে হস্তক্ষেপ করবেন না। যদি তারা জোর করে আমাকে শাওরাতে ঢেঁটা করেন, আমি সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেব। যদিও তার ফল আরো তীব্র এবং বিপজ্জনক হবে। আমি ১৯৪০ সালের ২০শে নভেম্বর অনশন শুরু করব।

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

ভূমি সংস্কার যুগে যুগে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসুর অতীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন মানুষ গাছের ফলমূল ও জীবজন্তুর পোড়া মাংস ইত্যাদি খাড়া আর কিছু খাওয়ার সন্ধান পায়নি, তখন তারা কণ্ঠ বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় ও সহজ প্রাপ্য খাওয়ার একান্ত প্রয়োজনবোধে বীচের বীচের ভূমিকর্ষণ করে শস্ত ফলাতে ও তাহা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে আরম্ভ করে ও ক্রমশ শস্ত ও সবজী এবং শাক ইত্যাদি ভক্ষণে অভ্যস্ত হয়। মাছ-মাংসের অপ্রাপ্ততা ক্রমশ বাড়তে থাকে, ফলে প্রয়োজনের মোতাবেক আমিষ খাওয়ার অভাব ঘটলে মানুষ তখন কর্তৃত্ব ভূমিতে ফলান শস্ত ও অজ্ঞাত ফসল অধিক মাত্রায় খেতে বাধ্য হয় ও ক্রমে ক্রমে খাদ্য-শস্তের ওপর অধিক মাত্রার নির্ভরশীল হয়ে পড়ে কালক্রমে। ভূমি কর্ষণ করা তখন সমাজে একান্ত আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে খাদ্য আহরণের জৈবিক প্রয়োজনে। দলে দলে মানুষ বনভূমি, উদ্বনভূমি, জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ীভূমি ও সমভূমি কঠিন প্রস্তর ফলকের সাহায্যে কর্ষণ করতে ও ঐ কর্তৃত্ব ভূমিতে শস্তবীজ বুনতে, সবজীবীজ বুনতে ও অজ্ঞাত ফসলের বীজ বুনতে শুরু করে। পরিত্যক্ত ও অকরিত ভূমি তখন প্রায় সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য ছিল, কারণ মানুষের বসতি এত অল্প তখনও ভূমির পরিমাণ এত অধিক যে, যে কেউ ইচ্ছা করলেই তখনই কোন ভূভাগ কর্ষণ ও বীজ রোপণ ও খাদ্য অনায়াসেই করতে পারত। বাধ্য দেবার কথা তখন কেউই চিন্তা করত না, বরং অধিক পরিমাণ ভূমি কর্তৃত্ব ও তাতে অভ্যাসনা

রোপিত হতে দেখলে মানুষ আনন্দিত চিত্তে তা অবলোকন করত।

যাত্রা সে সময়ে ভূমি চাষ করত তারা সেই চরিত্ত ভূমির মালিকের মত ভূমিতে উৎপন্ন সব ফসলই পাবার অধিকারী ছিল। কর্ষণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণই সে সময়ে ভূমির মালিকানা ভোগে অভ্যস্ত ছিল। অল্প কেউ তা নিয়ে কোনরূপ বড়ো বাঁধাতে আসতো না বা ফসল ফলাবার বাপারে কোন ভাবেই হস্তাক্ষর হতো না। বৈদিক যুগেও ভূমি-কর্মে নিযুক্ত ব্যবহারী ভূমির মালিকানা ভোগ করতো, তবে যে যেটুকু ভূমি বহন করে চাষ করতে পারতো, সেটুকু ভূমিরই ফসল সে গ্রহণ করতো। অপরের চাষ-করা ভূমির ফসল কেউই কখনও নিত না। মানুষের লোভ তখন এমনকার মত এত বেশী পরম অপহরণে সিদ্ধ হস্ত হয়নি। ভূমির প্রাচুর্য তখন মাঝাপিছ এত বেশী যে ভূমিহীন তখন কোন লোকই ছিল না, বরং সঠিক চাষ-আবাসের অভাবে বহু ভূমি বহ্য হয়ে পড়ে থাকতো তখন, কর্ষণকারী মানুষের অভাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি কৃষা বেড়েছে ও তারই ফলে ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে পরস্পরে মারামারি হানাহানি এখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অতীতে ভূমি চাষ করার ক্ষমতা লোক পাণ্ডা যেত না, আর এখন চাষী তার নিরুতম প্রয়োজন মেটাবার মত চাষের ভূমি পায় না। ভূমিহীন চাষীর সংখ্যাই এদেশে সীমাহীন বর্তমানে, ফলে ভূমি নিয়েই বড় কঠিন সমস্যা ও মানুষের মানুষের বিবাদ। বিভ্রম ও পরস্পর ভুল বোঝাবুঝি এবং

পরিণামে দারুণ হানাহানি বা মানুষের পক্ষে চরম ক্ষতিকর ও দুঃখজনক। বিভিন্ন সময়ে ভূমি ব্যবস্থা ভারতে কিরূপ ছিল সেই বিবরণই দেবার চেষ্টা করছি :-

থয়েমে ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, কৃষি জমির উপর রাজারও তখন মালিকানা ছিল না। কৃষকের কর্কষত্বই তখনকার কালে কঠিন প্রত্যয়াকীর্ণ ভূমিতে তার অধিকার সাব্যস্ত করত। তার পরবর্তীকালে ক্রমশ সম্পত্তির ওপর ব্যক্তি মালিকানার বিকাশের সঙ্গে জমির ওপর কৃষক হাফাও অস্ত্রান্তের উপস্থানের প্রবর্তন হল। ফলে আধিয়ার বা ভাগচাষী বা বর্গাদারের সৃষ্টি হল। শুরু হল সংঘাতের ভূমামী ও ভাগচাষীর মধ্যে উৎপন্ন ফসলের ভাগ-বাটোদার নিয়ে প্রায়ই অশান্তি ও হানাহানির সূত্রপাত হল। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব ২ কট আকার ধারণ করল। শোষিত ও বঞ্চিত ভাগচাষী বা বর্গাদারের দল ফসলের দ্বারা অংশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে না পাওয়ার ক্ষুধা ও অসন্তুষ্টি হতে লাগল।

সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থাই এর মূল কারণ ছিল তখন। কাজেই সেই ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য কৃষকসুল জোট বাঁধতে লাগল সোপানে এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজারা সংঘবদ্ধ হবার জন্য সচেষ্ট হতে থাকল। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সে সময়ে প্রজা বা চাষী বা ভাগচাষীদের স্বপক্ষে এক জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার ও বন্ধ্যার বিরুদ্ধে তাঁর 'বঙ্গবর্নন' পত্রিকার বিবিধ প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য পরিবেশনের দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে চাষীরা প্রজাদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস উৎখাটন করে গ্রাম সমাজের পল্লীতে পল্লীতে এক নব-জাগরণের ঢেউ সঞ্চারিত করলেন। এর ফলে

কৃষকসুল দরদী মানুষের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রস্তাব পাস করল। বেশ বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস পর্তী চাষীর মঙ্গলের জন্য জমিদারী অধিগ্রহণের জন্য আইন পাস করল এবং অত্রকাল পরেই সেই আইনকে কার্যকরী করল, প্রজাসাধারণের বন্ধনার ইতি ধটাত। প্রজাধার আইনও প্রবর্তিত হল। ভাগচাষীদের স্বার্থের ব্যবস্থাও হল কংগ্রেসের রাজত্বকালে। শোষণের বিরুদ্ধে কংগ্রেসই যোগ্য করল 'লাজল যার জমি তার'। মহান কংগ্রেস এদেশের কৃষকসুলের পাশে দাঁড়িয়ে অতীতে জমিদারদের বিরুদ্ধে বহু উল্লেখযোগ্য আন্দোলন করেছে ও ব্রিটিশ রাজশক্তির কোপানিলে পড়ে কারা-বাসে বাধ্য হয়েছে, কারণ জমিদাররা অনেককেই ব্রিটিশের বিশ্বাসভাজন ও স্নেহভাজ ছিল সে যুগ। ভাগচাষী বা বর্গাদারদের মহাভ্রমনের হাত থেকে রক্ষা করতে হক সাহেবও আইন প্রণয়ন করেন।

অবশ্য বাংলার পর্তী চাষী, ভাগচাষী বা বর্গাদারদের প্রকৃত হিত-সাধন করে গেছেন ফজলুল হক সাহেব তাঁর শাসনকালে। কংগ্রেস ও কংগ্রেসী শাসনকালে জমিদারী প্রথার মণ্ডল উচ্ছেদ করে ও সারা ভারতের ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে এবং প্রকৃত চাষীকে ভূমিঅধিকার দিয়ে আইনের সাহায্যে যে ভূমি সংস্থার করে গেছে তা বর্গাদার ভাগচাষী, আধিয়ার প্রকৃতি শোষিত, বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের প্রকৃত উপকার করেছে। কংগ্রেসী শাসনে ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে কোন দলীয় রাজনীতির বা পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত দেখা যায় নি, কারণ কংগ্রেস তার বহু বিবোধিত নীতিকেই রূপান্তরিত করেছিল দল নিরপেক্ষ ভাবে আদর্শে অবিলম্ব থেকে। কংগ্রেসের নেতারা আত্মতরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে বহু

কালের অভিক্রম অস্ত্রের প্রথাকে রূপ করে গ্রামীণ অর্থনীতিক চাক্ষুস করতে সক্ষম হয়েছিল; গরীব কৃষকসমূহকে, ভাগ্যচ্যাবীকে বা বর্গাদারকে তাদের জাতি অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে আইনের মাধ্যমে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার জমি সংস্কার মানসে ‘অপারেশন বর্গা’ আইন চালু করেছেন। এই আইন কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই সারা ভারতে জমিহীনদের, বিশেষ করে জমিহীন চাষী সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খাবলস্বী করার জন্য কংগ্রেস সরকার শ্রাণশিছু ও পরিবার শিছু জমির উর্ধ্ব সীমা আইনের সাহায্যে বেঁধে দিয়ে দিয়ে উর্বর জমি বাণ্টার করে এবং সেই উর্বর জমি জমিহীন চাষী ও আবাসহীন দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে বন্টনের এক সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা কার্যকরী করে। শ্রীমতী গান্ধীর দ্বারা ঘোষিত জরুরী অবস্থার সময়ে বহু চাষী ও জমিহীনদের মধ্যে এই সব উর্বর জমি বিলি করা হয় ও জমির ‘পাট্টা’ তাদের দেওয়া হয় মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য। এতে বহু জমিহীন সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষ তাদের বসবাসের জন্য ও চাষ আবাদের জন্য ঐক্যপূর্ণ পাট্টা মারফৎ স্থায়ীভাবে জমির মালিকানা পায় কংগ্রেসী শাসনে ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় পর্যন্ত।

তবুও আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির জন্য বহু উর্বর জমি বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হাতে থেকে যায় তবনও। সব জমি সম্পূর্ণভাবে বিলি বন্টন করা সম্ভব হয় না, কোন কোন রাজ্য সরকারের আমলাদের কার-সাজিতে, কোথাও বা গাফিলতিতে। কর্মসূচি কিস্তি এ ব্যবস্থা শ্রীমতী গান্ধীর কুড়িসকা কর্মসূচির ভিত্তিতে সম্পূর্ণভাবে ক্রয়ান্বিত হয় এক অস্ত্রান্ত রাজ্যে আংশিকভাবে তা সক্ষম হয়। পশ্চিমবঙ্গেও

বহুজমি ঐভাবে পাট্টার মাধ্যমে বিলি ব্যবস্থায় হয় এবং জমিহীন চাষী ও দরিদ্র জনগণ সে সব জমির মালিকানা পায়। হঠাৎ কংগ্রেস সরকারের পতনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে সব উর্বর জমি বিলিবন্টন করা ব্যস্তব্যস্ত হয় না, কিন্তু এই প্রথা চালু করে কংগ্রেস এ রাজ্যেও শ্রীমতী গান্ধীর কুড়ি নকা কর্মসূচি ক্রয়ানের ভাগিদেই। কংগ্রেসের এই কাজে কোনরূপ দলীয় চক্রান্ত বা কোন রাজনীতির বেলা দেখা যায় নি, এমন বামফ্রন্ট আমলে বেশপ্রকট।

১৯৭৮ সালে বর্গাদারদের নথিভুক্ত করার জন্য বামফ্রন্ট এ রাজ্যে অপারেশন শুরু করল। প্রজাবর আইনের মতই উক্ত অপারেশন বর্গা বার বার জমির মালিক অর্থাৎ জোতদার ও কৃষাক সম্প্রদায়ের মালিকানা স্বত্ব কোন ভাবেই ক্ষুণ্ণ না করার প্রতিশ্রুতি দিতে লাগল। বর্গাদার যেন চিরকাল অর্থাৎ স্থায়ীভাবে যে জমি সে চাষ করে, সেই জমিতে বর্গাদারই থেকে যায়। মালিকানা বর্গাদারদের মোটেই বেওয়া হল না। এ কেমন জমিসংস্কার? একি ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মত চালাকি করা হল না। ‘লাঙ্গল বার জমি তার’ ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন? বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দল এর জবাব দিতে পারবে কি? কখনই নয়, কারণ সবই যে কৃষা ব্যবস্থা। জমি সংস্কারের নামে গ্রাম বাংলায় দলীয়লোকদের প্রাধান্য সৃষ্টিই হল ওদের আসল উদ্দেশ্য। গরীব ও জমিহীন চাষীর হাতে জমির মালিকানা তুলে দেওয়া নয়। কংগ্রেস তবু সে কাজ সবটা না হলেও অনেকটা করেছিল এবং ক্ষমতাস্বত্ব আর কিছুদিন থাকলে নিশ্চয় বাকীটাও সম্পূর্ণ করে দিতে পারতো।

রাষ্ট্রের হাতে উর্বর জমি এক হটকণ্ড অবশিষ্ট থাকতো না। সবটাই গরীবদের মধ্যে বিলিবন্টন

করা হয়ে যেত। কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল মহান্ আর্থ সি, সি, এম এর আদর্শ হল দলবাজী ও দলের লোকদের পেটেরান, অস্ত্র কারবার নয়। পরীক্ষণের পরীক্ষণ সুযোগ নিয়ে তারা মুখে তাদের বড় দরদ দেখায়, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরজ্ঞা এটা আচ্ছ পরিকার হয়েছে বিসত জিন বহুরের শাসন ব্যবস্থা কালে। সি, সি, এম, যে কি কঠিন বস্তু ও কতখানি সর্বস্বহার্য দরদী তা তাদের কাছেই প্রমাণ। গ্রাম বাংলার মানুষ তাই গুণের সর্বমাত্রার দল বলে। অপারেশন বর্গীর ভূমিহীন চাষী বা বর্গীদার কেউ-ই জমির মালিকানা পায় নি, শুধু তারা জোতদারের বা চুখামীর জমিতে ভাগে চাষ করার অধিকার পেয়েছে এবং তাও বেশ ক্রটিপূর্ণ, কারণ সেক্ষেত্রে বহু পুরাতন বর্গীদারের বহলে নতুন লোক বর্গীদার বলে সরকারী নথিভুক্ত হয়েছে গ্রাম্য দলবাজি ও সি, সি, এম কর্মীদের দ্বারা স্বজন পোষণ ও দলীয় ভোয়নের চক্রান্তের ফলে, যা গ্রামে গ্রামে অকার্য অশাস্তি ও সাধারণের মধ্যে চরম অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। অপারেশন বর্গী মারফৎ গরীব ভূমিহীন চাষীকে এক বিরাট বাজা দিয়েছে রাজ্য সরকার। ফলে এখন গ্রাম প্রতিটি গ্রামেই সি, সি, এম ক্যাজার ছাড়া অস্ত্রান্তরা কষ্ট ও বিরক্ত।

শ্রু সংহিতায় পক্ষিকার উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি ভূমির স্থায়ীকেন করে অর্থাৎ জঙ্গল বা অস্ত্রবাধা অপসারণ করে জমিকে বাসোপযোগী বা চাষযোগ্য করে তোলে ভূমি তারই সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। ভবনকার কালে ভূমি ব্যবস্থার মূল নীতি ছিল, চাষ যে করে জমি তারই। তথাকথিত গরীব দরদী বামকুট সরকার ভূমি ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন আভ্যে করতে চেষ্টা করেন নি, কেবল ছুখী মানুষকে মিথ্যা স্কোকাব্যো তুলিয়েছেন মাত্র। অপারেশন বর্গী

কোন ইঙ্গিত ফল লাভ করতে পারে নি, বরং মানুষ বিভ্রান্ত ও বিসংবাদ সৃষ্টি করে গ্রামবাংলায় এক চরম অর্যাকৃত্য ও অকার্য অশাস্তির জোয়ার এনেছে, যা মানুষ মোটেই চায় নি। ভূমিহীনরা চায় জমির মালিকানা, কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের দুঃখের বদলে খোল খাইয়েই খুসী রাখার চেষ্টা করেছে উক্ত অপারেশন বর্গীরদ্বারা যা সত্যই হস্তান্তর এক অভিনব কৌশল। গ্রামবাংলায় যে সব উৎস জমি কংগ্রেসী আমলে সরকারে হস্ত হয়েছিল ও যা অবশিষ্ট ছিল কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবার কারণে, সেই সব ভেট্টেড ল্যান্ড কোথায় গেল বামকুট আমলে? সব কি সি, সি, এমের দলীয় ব্যক্তিদের গোপনে গোপনে দান করা হল প্রকৃত ভূমিহীন নিরস্ত্র চাষীভাইদের বাস দিয়ে, আর তাই কি এই অপারেশনবর্গী তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে চালু করে থাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেবার ফকি-কিকির? সত্য সেলুকাস এ এক বিচিত্র দেশ। মানুষকে মানুষ এত প্রবক্তনা বোধহয় আর কোন কালেই করেনি যা সি, সি, এম দল ক্ষমতার এমে করছে। গ্রামবাংলায় জোতদার, ছোট জমির মালিক ও বর্গীদার শ্রেণীর মধ্যে এক স্থায়ী ঘৈরৎ বৃদ্ধির সূচনা করেছে বর্তমান রাজ্যসরকার, ফলে গ্রামের শান্তি ও স্বস্তি চিরন্তনে নির্বাসিত। বর্গীদার বহুরে একশত পঞ্চাশ দিনের বোরাক কায় ক্রেশে জোগাড় করতে পারবে, তারপর বাকী দিন গুলোয় তারা বেকার থাকবে।

আর্মি চাষের মতনম বাঘ দিয়ে বাকী সময়ে কি বর্গীদার বেকার বা আধা বেকার থাকতে বাধ্য হবে না? সেই বেকারী বোচাতে কি রাজ্যসরকার চিরকালই গ্রাণিবিধ, লক্ষ্যবানা ও বহু বিভক্তিত (বাকি অংশ ৩২ পাতায় দেখুন)

রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে সংগ্রহিত]

অনুবাদক—অধ্যাপক মলিনীমোহন দাশগুপ্ত

১৯১৯ সালে মহারাষ্ট্র পার্টির ইংল্যান্ডে ডেপুটেশন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লন্ডনে আমাদের ডেপুটেশন বহুদূরী যে সমস্ত কাক করেছে তার একটুখানি আভাস দেওয়ার জন্য আমি প্রসঙ্গক্রমে আর মাত্র একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। উপনিবেশিক দেশগুলিতে ভারতীয়-গণের মণ্ডল কি হবে এবং তাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা মি: মর্টেন্ডের সঙ্গে একা ডেপুটেশনে মিলিত হই। মি: পোলক এই ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। পোলক ছিলেন সমুদ্রের ওপারের উপনিবেশগুলিতে প্রবাসী ভারতীয়দের একজন ক্রান্তিহীন নিববচ্ছিন্ন বন্ধু। এই ডেপুটেশন আমি হিলাম নামেরাত্র দূরপাত্র। বিবৃতিটা তিনিই পাঠ করেন, আর তার সমস্তাও তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন। সেই ডেপুটেশনের সময়ে ইয়োহোপৌর বন্ধু যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন স্যার জনবীশ এবং স্যার উইলিয়াম মেরার বলা বাহুল্য মি: মর্টেন্ড সহানুভূতির সঙ্গেই আমাদের ডেপুটেশনের বক্তব্যের উত্তর দিয়েছিলেন।

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে মুসলমান অধিবাসীদের পক্ষ থেকে বিলাফৎ সমস্তা নিয়ে আয়োজিত এক সভার আমাকে সভাপতির কর্তব্যে আহ্বান জানান হয়। কারণ এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের দাবীর প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন

জানিয়েছিলাম এবং আমার সেই সমর্থন ছিল প্রধানমন্ত্রী মি: লরেন্ড কর্জের ঘোষণা-বাসীর সঙ্গে সঙ্গতির মত্রে। বর্তমানে এই দাবী কিছু পরিমাণে আদায় হয়েছে। ভারতের জনমতের সমর্থনে ভারত সরকার একজন চাপের সৃষ্টি করেছিলেন তাতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। সেজন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। তবে ভারতের জনমতের আনুকূল্যের সঙ্গে কামাল পাশার যুদ্ধে জয়লাভ করার ঘটনাটাও সে চাপকেও শক্তি জুগিয়েছিল। \

১৯১৯ সালে কাথি বাপমেশে আমাকে বারে বারে ইণ্ডিয়া অফিসে বেতে হয়েছে। আমি দেখলাম, ইণ্ডিয়া অফিসের আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগের মত, যেমন ১৮৭৪ কিংবা ১৮৯৭ সালের আমার পূর্বজন দিনগুলির মত আর নেই। সেই আমলাতন্ত্রের মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে যেন এক নতুন ভাবের হাওয়া বইতে শুরু করেছে যে হাওয়া বেন জোরাল গণতন্ত্রের, শাস প্রদানে ক্ষম উঠেছে। আমার মনে হল বেন যেভাবেই হোক স্থানটি যেন আমাদের নিজস্ব হয়ে গেছে। অবশ্য আমার এই নিজস্ব বোধের মাত্রা নিশ্চয়ই ততটা ছিল না যতটা আমি মন্ত্রী থাকাকালে রাইটস' বিল্ডিংয়ে অনুভব করেছিলাম। মনের দিক থেকে বেন অফিসটি ভারতীয় হবে গিয়েছিল

যশিও কর্মচারী নিয়োগের সিক থেকে তা হয়নি। মনে হল যেন সকলেই কাজ করতে চায়, তুষ্ট করতে চায়। কাল চামড়া যেন এখন আর অব্যোমতার বাহন নয়, যেন তা এখন ছাড়পত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশ্রয়প্রার্থীদের আচার-আচরণের মধ্যে যেন আপেকার মত সেই কাঠের মনোভাব আর। সম্ভবতঃ মি: কুপেন্সনাথ বহুই ছিলেন এই পরিবর্তন আনরণে প্রধান কেন্দ্রীয় শক্তি যে শক্তি মি: মন্টেগুর প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং শাসন সংস্কারের ফলে ক্ষাত নতুন জীবনের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছে। মি: বহুই যথেষ্ট ছিল ভারতীয়দের স্বাধীনতা। 'বৈঠকবানা' ইংরেজীতে এই 'বৈঠকবানা' শব্দটির অর্থবাদ করা যায় না। যে কোন ভারতীয় হোয়াইট হলে বা তার আশেপাশে কোন জায়গায় কোন কার্য ব্যাপশেষে গেলেই তার ঘরে চূ মারতেন, কয়েক মিনিট সেখানে বসতেন এবং গৃহকর্তার সঙ্গে বোমগত করে লগুন সহরের ব্যস্ততাজনিত ক্লান্তি দূর করতেন। কুপেন্সনাথ ছিলেন সর্বোত্তম অর্থে সর্বদাই সকলকে পরামর্শ দিতে ও সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমার সঙ্গে তার সম্পর্কে ছিল অনেকের চেয়ে বেশী অন্তরঙ্গ। তবে সাধারণভাবে তিনি ভারতীয় সম্মেলনের রক্ষাকর্তা ছিলেন—বিশেষভাবে বাঙ্গালীরা আর সময়ই অনেকে তার সাহায্য চাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে সাহায্য দেওয়া হত।

যে সমস্ত ব্যক্তি তার কাছে খুব ঘন ঘন বাতায়নত করতেন তার মধ্যে একজন ছিলেন মি: কোয়ারনাথ দাশগুপ্ত। কোয়ারনাথ ছিলেন বাংলা-দেশের চিটাগাংয়ের লোক; কিন্তু এখন লন্ডনবাসী। সেখানে তার কাজ হল খেলাফাত ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাদি সংগঠন করা, আর প্রাচীন ভারতীয় জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির সহিত

ত্রিটিশ জনগণকে পরিচিত করান। ত্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রভূমি লণ্ডনের কলোমাদের মত বিরাট বিপুল জীবন প্রবাহের মধ্যে তার স্বাভাব্য ও সংগঠন শক্তি হারিয়ে গেছে। তিনি যেন লগুন সহরের একটি চলমান মানচিত্র। তাকে ভিজেন্স করুন, লণ্ডনের কোন রাস্তার কোন বাড়ীতে আপনি যেতে চান; তিনি সেখানে আপনাকে নিয়ে যাবেন। লণ্ডনের একজন সবজাতীয় খোঁজার-গাড়ীর চালক আপনাকে বত সন্টার এবং তাড়াতাড়ি সেখানে নিয়ে যাবে, হয়ত তার চেয়েও কম খরচে ও তাড়াতাড়ি তিনি আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেবেন। কর্ম ব্যস্ততার এবং অশ্রমের সেবা-কার্যের আকাঙ্ক্ষায়—তিনি যেন বিনিময় জীবনব্যাপন করে চলতেন। এইভাবে কোয়ারনাথ দাশগুপ্ত লণ্ডনে বাঙ্গালীদের নিকট একজন অতি পরিচিত ব্যক্তি। তাকে বার্তা জানেন তারা সকলেই তাকে ভালবাসেন এবং সম্মিহ করেন। লণ্ডন সহরে—পথ চলায় ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আছে, একজন নবাগতের কাছে—তা হত-বুদ্ধিকর। এই অবস্থার মধ্যে তিনি ছিলেন আমার তাত্ত্বিক উপদেষ্টা ও বন্ধু। তুমি যদি নিজ জীবনকালের মধ্যে ছ বারও লণ্ডন সহরে আস, তাহলেও প্রতিবারই তুমি সেখানে নিজেকে নবাগত বলে মনে করবে, এত দ্রুত সেখানে স্থানের পরিবর্তন ঘটছে। ধর্মবাদ জানাই সেখানকার স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার দ্রুত পথ চলায় ব্যতিক্রম কৌশলকে।

এই কথা যখন লেখা হয় তখনও পর্যন্ত মি: কুপেন্সনাথ বহু আমাদের মধ্যে ছিলেন। ১৯২৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি লোকান্তরিত হন। তাকে বার্তা জানতেন তারা সকলেই তার দ্রুত শোক প্রকাশ করেছেন। তার স্মৃতিতে

আমাদের নাগরিক জীবনে যে স্থানটিপূর্ণ হয়ে গেল তা পূর্ণ করা খুব কঠিন কাজ। আশু প্রত্যয়ের শক্তি, দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিবিধ সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা হস্তক্ষেপের নৈপুণ্য এবং বিচার-বিবেচনা—এ সমস্ত বিষয়ে তিনি ছিলেন তার কালে সর্বাগ্রগণ্য। প্রথম জীবনেই তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৮৮৬ সালে প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনকালেই তিনি খেজাসেবক তালিকাভুক্ত হন। কেউ ভুলান্দিয়ার হলেও যে সে ডেলিগেট হবে, তা নয়; যদিও সাম্প্রতিককালে স্বরাষ্ট্রসেবক অবলম্বিত কৌশলে ভুলান্দিয়ারকেও সেই মর্যাদার পদে সমন্বয় করা উদ্ভূত করা হয়ে থাকে, যেমন করা হয়েছিল সিংহাসনকে। এর এক উদ্দেশ্য হল স্বরাষ্ট্রসেবক ভোটের সংখ্যা ঠাঁপিয়ে তোলা। কিন্তু এই ভুলান্দিয়ারটি কংগ্রেসের কাছে একেবারে সন্তোষজনক হলেও তার বোঁচকার মধ্যে লুকিয়ে ছিল মার্শালের হাতের ব্যাটন। তাই ১৯১৪ সালে এই ভুলান্দিয়ারটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। একবার যখন রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন তখন তার পতীরত্ন শ্রোত তাকে টেনে নিয়ে গেল এবং আমাদের সমস্ত বড় বড় গণ-আন্দোলনে একজন নেতার মতই ব্যক্তি হয়ে নিজে থেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে কোললেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বিরোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন একজন কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তি। ১৯০৬ সালে বরিশালে যখন আমাদের প্রার্থী করা হল, তখন কনকোয়েসের কার্য পরিচালনার ভার পড়েছিল তারই উপর। ১৯০৯ সালে আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন সরকারের উচ্চ

তরফ থেকে বাধানানের ক্ষমতা চাপ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও এই আগষ্ট বয়সটি দিবস উৎসাহের অগ্রদূত সত্যাপত্তি করেন। ১৯১৬ সালে তিনি ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন, এবং পর বৎসর লর্ড চেমসফোর্ড তাকে ইন্ডিয়া কাউন্সিলে একটি পদ খালি হলে সেই পদে নিয়োগ করেন। শব্দ সংস্কার পরিচালনা ব্যাপদেশে তিনি মিঃ মর্টগুর ডেপুটিশনের সঙ্গে ভারতে আসেন এবং ডেপুটিশনের সদস্যরূপে অনেক মূল্যবান কাজ তিনি করেন। লী কমিশনের মেম্বর হিসাবেও তিনি পুনরায় ভারতে আসেন এবং যত্নের কয়েক মাস পূর্বে বাংলার গভর্ণরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজন সদস্য নিযুক্ত হন।

রাজনীতিতে সারাজীবন তিনি ছিলেন একজন নরমহাদী এবং সন্তোষভাবের অসহযোগের নীতি ও বিশ্বাসের বিরোধী। অনেকের মত তিনিও মনে করতেন যে অসহযোগের মধ্যে এমন কিছু আছে যা দেশের চরম স্বার্থের পক্ষে বিপক্ষনক। আমি আশা করি সেদিন আর বেশী দূরে নয় যখন বাংলা তার মহৎ ব্যক্তির স্মৃতিতে উৎসর্গ করার জন্য এক স্মৃতি-মন্দির গড়ে তুলবে। যই জাতীয় প্রতিষ্ঠান মৃত মহৎ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বহন করবে, আর জীবিতদের কাছে তা হবে একটা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উৎস। সেই শান্তির পুনর্মিলনের মন্দিরে যেখানে সমস্ত বিরোধ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে এবং সেখানে সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তির আত্মা একের সঙ্গে অপর মিশে যাবে, সেখানে ভূপেন্দ্রনাথ বসু এক উচ্চ ও সম্মানের আসন লাভ করবেন।

ক্রমশঃ

রাষ্ট্রীয় সংহতি

সুবোধ মজুমদার

১৯৫৮ সন থেকে ১৯৪০ সনের জুন মাস এই আড়াই বৎসর ব্যাপী সংগ্রামী নেতৃত্বের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র একটি গুরুতর ভবিষ্যৎবাণী প্রায়ই ঘোষণা করতেন। কলকাতার লক্ষ্যনিক পার্কে এক জনসভায় তিনি প্রথম বললেন,—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আত্ম-ল্যাঞ্চে যেমন বিচ্ছিন্ন করেছে ঠিক তেমন করে বিচ্ছিন্ন করবে সাইপ্রাসকে, প্যালেষ্টাইনকে, এবং ভারতকে। ইংরেজ রাজনীতিক ধূরন্ধররা সচকিত সহুস্ত হয়ে উঠলেন, এবং স্থির করলেন যেভাবেই হোক সুভাষচন্দ্রকে হত্যাতেই হবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তখন কংগ্রেসের প্রথম বামপন্থী সভাপতি, সকল স্বাধীনভা-কামী নরনারীর নরনের মণি। এই দুঃসমী, হৃদয়লী মহাত্মানী, মহাত্মাগী, বিশ্বপ্রেমিক, স্বদেশ বংসল নেতার সংসে যে সাম্রাজ্যবাদী কোনো চালাকি বাটবে না এটা ভেবেই অস্তির হয়ে উঠল ইংরেজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসার, তার আগে হোক পরে হোক, ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটবেই; সে সময় যেন সুভাষচন্দ্র না থাকে কংগ্রেস তার ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকরা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের অস্তান্ত সব নেতারা ভারতেও পায়তেন না যে ভারত-বিতাণ সম্ভব হতে পারে বা ইংরেজ সরকারের মনে সেরকম কোনো অভিসন্ধি থাকতে পারে। অতএব তাঁরা বড় বড় শপথ করতে লাগলেন—দেশ ছেদন করার আগে আমরা আমাদের অংশ ছেদন করব।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এসকল শপথের অসারতা উপলব্ধি করে মনে মনে হাসলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁরা ব্যস্ত-বিস্ত্র হতে উঠলেন যখন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন তিনটি মহাবাণী :—

১) ইংরেজ ভারত বিভাগের জন্য প্রস্তুত, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে হবে ভারত-বাসীকে ;

২) ভারতে ইংরেজ রাজত্বের স্থানা বট্টছিল বাংলাদেশে, আবার তার অবমানও ঘটাবে এই বাংলাদেশেই ;

৩) যেত আমলাতন্ত্রের স্থানে বাগামী আমলা তন্ত্রকে বসতে দেওয়া হবে না কিছুতেই।

আজ আমাম অকলে-বাংগালী বিভাডন, পার্বতা ত্রিপুরা অকলে বাংগালী বিভাডন, উত্তরবংগ অকলে আদিবাসী আন্দোলন, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সারা দেশকে শক্তিত করে তুলেছে। সারা দেশের সাধারণ লোক মনে করছে তাদের জাতীয় সংহতি বিঘ্নর কারণ এসব আন্দোলনগুলো হচ্ছে একাছুই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। অনেক মনে করেন এসব আন্দোলনের মূলে আছে বিদেশী রাষ্ট্রের মদত, বিভ্রাতার মিশনারীর প্ররোচনা, এবং স্থানীয় প্রাদেশিকতাদুষ্ট রাজনীতিকদের সংগঠন। এটা ঠিক, আন্দোলনগুলি অতিশয় সজীব ও শক্তিশালী। নিহক নিন্দা বা সমালোচনার চাপে অবশমিত হবার আন্দোলন নয় এগুলো। এসবের মূলে নিহিত

য়েছে কতগুলো ভীষণ বাস্তব সমস্যা। সে-সমস্যা
হলোর সঠিক সমাধান করার জন্য নিত্যনতুন প্রয়োজন
জাতিচন্দ্রের মহাবাহী তিনটির সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি
রা।

নেতাজী বলেছিলেন ইংরেজ বাবার আগে
শকে বিভক্ত ক'রে যাবে এবং আরও বিচ্ছিন্নতার
জ রেখে যাবে। নেতাজী বলেছিলেন খিচি
ামলাতন্ত্র চলে গেলে ভারতীয় আমলাতন্ত্র ভারতীয়
নগণকে শোষণ করতে পারে। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার
জ রয়েছে ইংরেজের হাতে গড়া ভারতীয় পুঁজি
দ ও ভারতীয় আমলাতন্ত্রের মধ্যে। এই বক্তব্যটি
স্পষ্ট করতে গেলে স্মরণ করতে হবে নেতাজীর
তীয় বার্নীটি—ইংরেজ আমলাতন্ত্রকে সহায়তা
রার অপরাধের জন্য প্ররোচিত করতে হবে
গোলকোকে। বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্তরা ও নিম্ন-
স্তরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার
ত্রে প্রাপ্ত হয়েছে যে বাবু-সংস্কৃতি তার জন্য
প্ররোচিত করতেই হবে তাদের। এই বাবু সংস্কৃতির
শব্দ পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাব
জকের আন্দোলনগুলি প্রায় সবই হচ্ছে
ামণবিবোধী ও অংজ্ঞাবিবোধী আন্দোলন।
বু সংস্কৃতির আলোচনাকে সহজ ও সুস্পষ্ট করার
জ আমাদের আবার একটু ভাবতে হবে পেছনে
নে—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কিছু কার্য-কলাপের
কে।

ইংরেজ ভাবলক্ষ্যতা হস্তাক্ষরিত ক'রে চলে
লেও যাতে আমাদের আর্থিক ক্ষতি না হয় সে-
বস্থা জগতই ক'রে বাব। গুরুত্বপূর্ণ প্রধান করণীয়
ক্ষ:—(১) রাজনৈতিক অস্থিরতা জীইয়ে রাখা ;
। অর্থনৈতিক অস্থিরতা জীইয়ে রাখা ; ৩) সাম্রাজ্য-

অসাব্যতার প্রতিষ্ঠা করা ; ৪) অসাব্যতার প্রবর্তন
করা প্রতিরক্ষা-বিভাগেও ; ৬) দেশের মধ্যে বহু
অসাব্য ব্যবসায়ী সৃষ্টি ক'রে তাদের হাতেই গুরুত্ব-
পূর্ণ ব্যবসায়গুলি তুলে দিয়ে বাঙালী ; ৭) শোষণ-
ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখা। ব্রিটিশ সরকার নেতাজী
সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে অপসারিত করার ব্যবস্থা
ক'রে এসব কাজ নিযুক্তভাবে সম্পন্ন ক'রে গেছেন।
কী ক'রে করলেন সে কথা আলোচনা করার পূর্বে
আমরা আলোচনা করব আজকের তথাকথিত
বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কথা।

ব্রিটিশ প্রশাসক-বহল ও ব্যবসায়ী মহল বুঝতে
পারলেন যুদ্ধের অধাবহিত পরেই তাদের চলে যেতে
হবে ভারত ছেড়ে। ১৯৩৯ সন থেকে ১৯৪৭ সন
পর্যন্ত এই আট বৎসর তারা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে
সম্পন্ন করতে লাগলেন উপরোক্ত কতব্যগুলি।
প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা বিভাগে প্রচুর পরিমাণে অসাব্য
লোক নিযুক্ত ক'রে তারা ভারতের অসাব্য ব্যবসায়ী
আর পুঁজিপতিদের ডেকে বললেন—ভাল যদি চাও
তাহলে আমাদের কথা মন দিয়ে শোনো। ভারতের
সোনার ধনি হচ্ছে তার পূর্বকল, যদি এ-অঞ্চলকে
শোষণ ক'রে লাগ হতে চাও তাহলে এখন থেকেই
প্রস্তুত হও। আসামের সাধারণ অধিবাসী, পাতিয়া
অঞ্চলের অধিবাসী এবং অন্তান্ত আদিবাসী উপজাতি
লোকেরা সবাই যেমন সরল, তেমনি সং, তেমনি
কর্মী ও প্রমোদ। এদের বস্তু শোষণ ক'রে লাগ
হওয়া মোটেই কঠিন হবে না যদি স্থানীয় উচ্চাকাংখী
মধ্যবিত্ত লোক কল্পটিকে কিনে নিতে পার। কিন্তু
যাগ আসবে বাঙ্গালীদের কাছ থেকে। এদের
মধ্যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অনেক। এরা
প্রম বিমুখ বাবু জাত।

২৬ পাত্রের শেষাংশ)

‘কাজের বদলে খাজ প্রকল্প’ কেন্দ্রীয় সরকারের পুর্বেই ঘটি জন্ম বর্গাদার খন হয়েছে আর আহত বাদান্ততার চাপু রাখতে সচেষ্ট থাকবে? তত হয়েছে আর ‘তনশত জন। নথিভুক্তির সময়ে পরিবার বর্গের সংকার, রেগের চিকিৎসা, কল্যাণ ও অত্যাশ্র সামাজিক দায় মেটাতে কি বর্গাদারকে আবার মহাজনের দায়স্থ হতে হবে না? রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রদায় ব্যাধ কি এইসব দায়ভার বহন করবে? হুমি সংস্কারের নামে ‘অপারেশন বর্গ’ শুধু একটি গাল ভরা প্রচার ব্যবস্থা, তার বেশী কিছু নয়। সরকারী হিসাবে জানা যায় যে, এ বছর এরূপ সংঘর্ষে ইতি

— —

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

গত ৮ই আগষ্ট শুক্রবার রাত্রি সাতের বারটার বেণু হাডহরীতে প্রবীণ বিপ্লবী শৈলেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত (আমাদের রুনা) ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

এম, এস, সি, পাশ করার পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং গ্রেপ্তার বরণ করেন। জেস থেকে বাহির হয়েই বরিশালে জিলা কংগ্রেসের প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত হন। বরিশালে শুক্রন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক ছিলেন বিপ্লব আন্দোলনে যুক্ত থাকার ১৯২৪ সনের ২৫শে অক্টোবর বেক্সল অডিনাসএ গ্রেপ্তার হন-১৯২৮ সনের সেপ্টেম্বরে মুক্তি লাভ করেন। আবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সনে গ্রেপ্তার হয়ে রাজবন্দী অবস্থায় বঙ্গা বন্দিশিবের নেতিল কবীনিবাসে থাকেন। ১৯৩৮ সনের ১৫ই জুলাই মুক্তিলাভ করেন। বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একান্তিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিপ্লবী পাঠকদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও ‘বিপ্লবী বাংলার’ নিয়মিত লেখক ছিলেন। বিপ্লবের একনিষ্ঠ সৈনিক সর্বজন প্রিয় এই মহান বিপ্লবী বিপ্লবী আদ্যার শান্তি কামনা করি।

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অমূল্য নথি বিক্রয় গ্রন্থ-গ্রন্থপত্রিকা ১০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী-স্বদেশ মঙ্গলবাহিনী-০০০

কীর্ত্তন কুমার বসু-১০০

১। বাংলায় অমূল্য-১০০

২। অমূল্য নথি বিক্রয়-১০০



৩। অমূল্য-১০০

৪। অমূল্য নথি বিক্রয়-১০০

৫। অমূল্য-১০০

৬। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

৭। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

৮। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

৯। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

১০। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

১১। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

১২। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

১৩। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

১৪। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

১৫। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

১৬। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

১৭। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

১৮। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

১৯। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

২০। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

২১। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

২২। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

২৩। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

২৪। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

২৫। অমূল্য ও দ্ব্য-১০০

— সম্পাদক মঙ্গল —

অমূল্য নথি বিক্রয় (নথি) অমূল্য নথি, অমূল্য নথি
সম্পাদক-অমূল্য নথি বিক্রয়

অমূল্য নথি বিক্রয়-অমূল্য নথি, অমূল্য নথি

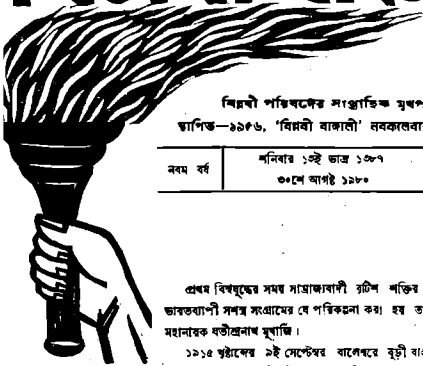
অমূল্য নথি বিক্রয়-অমূল্য নথি, অমূল্য নথি

অমূল্য নথি বিক্রয়-অমূল্য নথি, অমূল্য নথি

অমূল্য নথি বিক্রয়-অমূল্য নথি, অমূল্য নথি

22 AUG 1980

বিপ্লবী বাংলা



বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুদ্রণ
স্থাপিত—১৯৪৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' লবকালবার—১৯৭১

নবম বর্ষ	শনিবার ১৫ই ভাদ্র ১৩৮৭ ৩০শে আগষ্ট ১৯৮০	৪৮ সংখ্যা
----------	--	-----------

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসী সশস্ত্র সংগ্রামের যে পরিকল্পনা করা হয় তারই পরিচয় মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি।

১৯১৪ সালের ২৫ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে বৃহী বাগানের তীরে শক্তিমান, রাইফেলধারী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধে আত্মত্যাগে দেন বিপ্লবী মহানায়ক স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর চারজন বীর অগ্রগামী চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরঞ্জন এবং যতীন্দ্র পাল।

এই ত্যাগপূর্ণ পরিকল্পনা ও পরিশেষে তাঁদের এই আত্মত্যাগের ঘটনা বিপ্লবী বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরভাস্বর।

দেশের ছাত্র, ছাত্রী ও সৈন্যের প্রতিটি মানুষকে জলন্ত দেশপ্রেম ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক।

স: বিপ্লবী বাংলা

— স্থিতিশীলতা চাই —

দুর্ভাগ্যক্রমে সারা ভারতের বিভিন্ন অংশে যেন একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা আত্মপ্রকাশ করছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং ত্রিপুরাতে তা যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে, তাতে দেশের সংহতি, একা ও একাত্তবোধের চরম অবনতির প্রমাণ মিলছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমান শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত কংগ্রেস (ই) দলের মধ্যেও অন্তর্ঘর্ষের ক্রমশই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সংবাদ প্রকাশ, ক্রীমতী গান্ধী একত্র গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বলা বাহুল্য, দেশের মানুষও একত্র চিন্তিত হয়ে উঠছেন। কারণ, এই অন্তর্ঘর্ষের ফলস্বরূপ কখন একটি বিশেষ দলকেই ভোগ করতে হবে না, দেশের মানুষও তার থেকে পরিহাণ পাবেন না। ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ।

নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষ তাদের পছন্দমত দলকেই ক্ষমতার আসনে বসায়। জনতা বলকে করে কংসর পূর্বকই কংগ্রেস দলের বনলী হিসাবে একটা বিরাট সুযোগ নিয়েছিল ভারতবর্ষের মানুষের স্বর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করার স্বাক্ষর সম্পন্ন করতে। এই দল শোচনীয়ভাবে বার্ষ হবার পর, আবার ক্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন দলটিকে একটা সুযোগসুযোগ দিয়েছে, নিজেদের বোণাতা প্রমাণ করতে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এই দলের মধ্যে বহু সুযোগ-সন্ধানী, ক্ষমতালোভী, রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের সম্মেলন ঘটছে এবং তারা ইতিহাসের পাতা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে অসমর্থ। তাদের নিজেদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাদের সঠিক ধারণা নেই। যে ভ্রমহিলার অস্ত্রস্ত পরিভ্রম, দুর্জয় মনোবল, আঘাত সহিষ্ণুতা, নিষ্ঠা ও ধৈর্যের ফলে এরা নির্বাচন-বৈজয়িনী পার হয়েছেন এবং এখনও হতে চায়, তারও কোন স্বীকৃতি, এবং যথাযথ মূল্য দিচ্ছেনা। কিছু একটা পাওয়ার জন্য আবার নিজেদের মধ্যে হানাহানি শুরু দেশের নানা সমস্যা নিয়ে বিব্রত দলকেইকে সমস্যা সমাধানের পথে সহায়তা না করে, তাঁকে বলীয় কলহ সৃষ্টি করে নতুন সমস্যার সম্মুখীন করছে। দেখে অবাক হতে হয় যে কোন কিছু করার আগে তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনাও করেন নি এবং তাঁর থেকে কোন নির্দেশও নেন নি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলছে অত্রপ্রদেশ ও পশ্চিম বাংলার দলীয় কৌশলের মধ্যে। বেন্দুহো অত্র দুটি একটা রাজ্যেও বাজছে বলে মনে হয়।

কিন্তু কেন? কি চায় এরা? সমীক্ষা করলে দেখা যাবে এরা সুযোগ সন্ধানী, নিজেদের লাভের মোতেই অন্ধ। বিচার বিবেচনাহীন হয়ে পড়েছে। দেশ ও দেশের সেবার মত আদর্শ এদের মধ্যেও বিস্মৃত আছে বলে মনে হয় না। আজ এখানে আছে সুবিধা সুযোগের আশা, কাল অস্ত্রয় গেলে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা সম্ভাবনা দেখা যায়, কালকিল্ম নাকরে সেখানেই ভীড় করবে। বর্তমান ভারতে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সমর্থক সংগ্রহ করার সময় কোন মানবও অহুসরণ করেন না। লোক পেলেই লুকে নেয়, তার অতীত কার্যকলাপের অহুসধান বা বিবেচনা না করেই। ফলে তাদেরও একদিন বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে সরে পড়ে এই সুযোগ সন্ধানীরা। কিন্তু চেতনা বোধ জাগছে না কেন রাজনৈতিক দলগুলির, এটাই

লক্ষ্যনীর। এর প্রধান কারণ আদর্শ ও নিষ্ঠাকে প্রোৎসাহ না দিয়ে, ক্ষমতালিপ্সা ও অত্যাধিকার এদের বিচার বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। কলকাতা, দেশময় একটা রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি এবং দেশের প্রকৃত স্বার্থের ক্ষতিসাধন। কিন্তু এই সর্বনাশা পরিস্থিতির অবসান ঘটানো একান্ত প্রয়োজন।

দেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত দীর্ঘদিনের বিপদের সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। যে বলই যেখানে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত, তারা প্রত্যেকই নিজ নিজ বল এবং গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধন অসোনিহিত আগ্রহের সঙ্গে কাজ করছেন। দেশের কথা কেউ ভাবেনা। দেশপ্রেমের এমন দালন খন্ডাব ঘটলে, দেশ ঠাচবে কি করে? শ্রমীর কর্মীকে উচ্চাধর্শে অনুপ্রাণিত না করে, পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে প্রেরণ দণে, এটা ঘটেবেই এবং স্বাভাবিক নিয়মে ঘটেও চলেছে।, একা স্বয়ং সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন বলে যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অত্যা কখন দলের সাথে দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করার সূত্রাবলি এখন পর্যন্ত সূত্র পরাহত। এইখানেই বর্তমান ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনা দাবির যে কংগ্রেস (ই) দলের হাতে সমর্পিত হয়েছে, তাদের বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। দলের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, নীতিবোধ, আদর্শনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আগাছা সমূলে উৎপাটন করতে হবে। পার্শ্বের সঙ্গে ঠাট্টা সৃষ্টি হতে দেওয়া উচিত হবে না। এতদিনে এই দলের সংগঠনকে মজবুত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। শক্ততা থাকার ফলে, অন্তত শক্তির দাপাদপি দেখা যত্নে এবং বর্গীয় কৌশলও বেড়ে চলেছে। যেমন পশ্চিম বাংলার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে, আজো পর্যন্ত কংগ্রেস (ই) দলের যেদিন পর্যন্ত কোন কনিষ্ঠ ছিল না। এমন কি একটি অফিস পর্যন্ত নেই। অথচ পশ্চিম বাংলার বহু প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক মানুষ আজো বেঁচে আছেন। তাদের থেকে কোন সাহায্য ও সহায়তা নেওয়া হচ্ছেনা। সংগঠনের মধ্যে ভাল লোক থাকলে আগাছা এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারত না। বর্তমান হতে এই অন্তত প্রবণতাকে দমন করতে না পারলে, এবার একদিন চরম বিপদ ছেক আনবে। প্রমত্তী গান্ধী যদি এখনও জীবিত না হন, তবে তাঁর সব শক্ত প্রচেষ্টাকে এরা ব্যর্থ করে দেবে। বহু খাশা আকাজক নিয়ে ভারতের মানুষ তাকে মর্য়াদা দিয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে। প্রতিদিনে তারা তাদের জীবনের সমস্তগুলির সমাধান চায়। তাঁর ছদ্মসৃষ্টি, তাঁর নেতৃত্ব, তাঁর দেশপ্রেম ও নিষ্ঠা, তাঁর যোগ্যতা ও সক্ষমতার উপর দেশের মানুষের আস্থা আছে। সময়ে সতর্ক হয়ে এই আগাছার মূল উৎপাটন করতে না পারলে তাঁরা আবার পরাভব ঘটাবে, যেটা দেশের মানুষের আদৌ কাম্য নয়। তিনি শুধু নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেই কেন ক্ষান্ত না থাকেন। নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করুন, তারা যাতে ভবিষ্যতে ভারত-রাষ্ট্রভরসার হাল ধরতে পারে সফলভাবে দেখে তিনি একটা আশা ও দৃষ্টিশীলতা সৃষ্টি করে যান, এই প্রত্যাশাও জরুরি করে। সে কাজে সফল হলে, লক্ষ কোটি মানুষের মনে তাঁর ভাব-দৃষ্টি চিরকাল জ্বলবে থাকবে।

সমীকার বলেছেন—১৯৭৪ সালে অপরূপ অমূল্যে দুর্ভুক্তিকারীরা ১৪,৫০৭ টি আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করেছিল, যার মধ্যে ১১,৬০০ টি ছিল লাইসেন্সহীন। ইতিমধ্যে বে-আইনী অস্ত্রের ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণেই বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ-রামপুর অঞ্চলে অবৈধ অস্ত্রকারখানাগুলি থেকে মাসে ১৫০০০ ছাণ্ড গান এবং ৫০০০ শট-গান তৈরী হয়। লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুকের সংখ্যা এক মোরাদাবাদেই হল ৩০,০০০, যার সবই প্রায় ফরেন মেড।

জামিল নাডুর দিয়াশলাই কারখানাগুলি থেকে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার পটাসিয়াম সোরাইড অন্য পাচার হবার খবর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এ সব যে সমাজ বিরোধীদের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে, সে সন্দেহে কোন সন্দেহ নেই। বিবেচনাক পূর্বে অস্ত্র হস্ত থেকেও দুর্ভুক্তিচক্র সংগ্রহ করে থাকে। অভিজ্ঞাল কারখানা এবং পুলিশ অস্ত্র ভাণ্ডার থেকেও অস্ত্র ও গুলী খোঁষা যাবার সংবাদ কখনো কখনো প্রকাশ পায়।

ভারতের স্তায় বিরাট রাষ্ট্রে দাঙ্গা হস্তাক্ষর ঘটনা একেবারে আশ্চর্যকর কিছু নয়, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থার বেখানে বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতাদর্শ অনুশীলন ও প্রচারের স্বাধীনতা বর্তমান। পরস্পর বিরোধী মানা মতের লোক একস্থানে বাস করলে আনুগত্য সংঘাত ঘটতে পারে কিন্তু তাকে কোন মতেই হিংসাত্মক হতে দেওয়া চলে না, সমস্ত তেঁা নয়ই। এ ব্যাপারে সকল দায়িত্ব সরকারের বাড়ি চাপিয়ে দেওয়া চলে না, দেশের শক্তিত সম্প্রদায়ের নাগরিক দায়িত্ব সচেতন হওয়া একান্ত আবশ্যিক। সামাজিক বাধির প্রতিশোধক সমাজ জীবনের সুস্থ ধারণার মধ্যেই খুঁজে পেতে হবে। নতুবা গণতন্ত্র যে ব্যক্তিস্বাধীনতা দেয় তারই ব্যত্যয় ঘটবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে অনেকেই জানান, ব্রিটিশ আমলে একটি লাইসেন্স বিহীন বন্দুক অথবা পিস্তল সংগ্রহ এবং তা কাছে রাখার ককি কতখানি ছিল। বন্দুকের লাইসেন্সও তখন এমন ঢালাও ভাবে দেওয়া হত না। আগ্নেয় অস্ত্রের লাইসেন্সধারীরা যদি তাদের অস্ত্র সমাজ বিরোধীদের ব্যবহার করতে সেন, যা অজকাল হামেলাই ঘটতে দেখা যায়, তাহলে লাইসেন্স মঞ্জুর সম্পূর্ণ সরকারকে কঠোর হতে হবে।

অন্ত একটি বিষয় হল সরকারী চাকুরি বিশেষ করে পুলিশ বিভাগে লোক নিয়োগকালে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার সহিত তার সামাজিক আচরণ ও চারিত্রিক তথ্যকেও বিবেচনার বিষয়রূপে গণ্য করা উচিত। পুলিশ বিভাগে সাম্প্রদায়িক অথবা আকলিক লোকসংখ্যার ভিত্তিতে নিয়োগের যে দাবী উঠেছে তা সর্বথা পরিত্যাগ্য। পুলিশ বিভাগ রাজ্যান্তরের বিষয় হলেও তাকে একটি সর্ব ভারতীয় আচরণ বিধির অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব এবং রাজ্যগুলির পুলিশ বাহিনীকে ভাগে ভাগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবিরে এনে তালিম দেওয়া দরকার। ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থিতির জন্য পুলিশ তথা অস্ত্রাস্ত্র সরকারী কর্মচারীদের এইভাবে শিক্ষাদান অপরিহার্য।

মসজিদের সামনে দিগে বাড়সহ মিছিল পরিচালনা কিংবা ধর্মভূতানে গো-কোরবাদি, যা নিয়ে ভারতে বহুকাল থেকে সাম্প্রদায়িক রেবারেখি ঘট আসছে, তা এতই দুচ্ছ বিষয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত

চিন্তাধারার সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্যই নেই। উক্ত সম্প্রদায়ই যদি উল্লার বিচারশীল মন নিয়ে বিরোধীরা বিরুদ্ধতা একটু ভেবে দেখেন তা হলে দেখবেন সত্যিকার ধর্মের সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। অল্প-
গান বিধি বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল, তা ধর্মের মর্মকথা নয়।

সম্রাট আকবর বলতেন, “আমার ধর্ম আমার অন্তরে, অপরের ধর্ম আমার মস্তকে”। দিল্লীরের
সই মহান বানী’ ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির শাস্ত্র উপলব্ধি-ভূমি। যে সত্যের আলোকে ভারত বহর মধ্যে এক,
যুক্তির মধ্যে অভিন্ন, বিবর্তনের মধ্যে চিরন্তনকে খুঁজে পেয়েছে।

সাম্প্রদায়িক অথবা রাজনৈতিক সংঘর্ষে কতিপয় হুজুগ? প্রাণহানি হয় কাদের? নিশ্চয়ই
লভাদের নয়। তারা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে হুজুম দেন, ‘লড়া বাহাই’। সম্প্রতি যে সব দাঙ্গা
গান্ধী বাটোতে তার দিকে তাকালেই দেখা যাবে, কি আসাম, কি ত্রিপুরা, কি আমেদাবাদ অথবা কি
মাদ্রাসা সর্বত্রই মরুভূমি গরীবরা, বরবাদি, দোকান পশার খোয়া গেছে গরীবদের। পক্ষান্তরে হাঙ্গামা
থাকে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সুযোগ করে নিয়েছেন নেতারা। হযরত সেইসঙ্গে পরমা কামাবার স্বিকৃতিও। সমা-
জের এইসব হুজুগে নেতাদের মুখের খুলে দিতে হবে।

আকগান্ধীস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর প্রবেশ ও অবস্থান সম্পর্কে ভারতীয় নীতি বাস্তবধর্মী ও
স্বতন্ত্র। প্রশমনের সহায়ক হলেও, দেশের ও বিদেশের অনেকের নিকট তাকে সোভিয়েত অমুদর্তী বলে
মনে করা হয়। অনেকে বলেছেন যে, মোরাদাবাদের ঘটনা আকগান্ধীস্থান সম্পর্কিত ভারতীয় নীতির
কলঙ্কে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের প্রথম প্রত্যক্ষ প্রয়াস। প্রতিবাদ জ্ঞাপনের যোগ্যতার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা
রিহারস করে সরকারী নীতির বিরোধীরা মারদাস্তার পথ কেন বেছে নেবে বোঝা যায় না। এসব অমুমান
মনো গুজবের সত্ত্বে, সত্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত অমুমানের উপর মন্তব্য অসুচিত।

সর্বশেষে ঠিকরপ্রদেশ সহ সকল রাজ্যসরকারের নিকট বলব, রাজ্যগুলি থেকে অনতিবিলম্বে
যেই অস্ত্রের মজুদাগার ও ব্যবহার বন্ধ করতে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। অপরাধীদের যথোচিত
শাস্তি দিন এবং গোয়েন্দা সংস্থাকে অধিকতর সক্রিয় হতে বলুন। দেশ মলভস্থের উর্দে একথা মরণে
থুন।

রাজনৈতিক কারণের শোহাই দিয়ে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধে গণিতদের মুক্তি
দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যতিচার করা হয়েছে, তার ফলেই সমাজ বিরোধীরা নানাভাবে তাদের
হরণতা চালিয়ে যেতে প্রশ্রয় ও সাহস পেয়েছে এবং তার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী জনতা সরকারের অপশাসন।
শাসনের আবর্তন দূর করে দেশবাসীকে প্রগতি, সমৃদ্ধি ও ঐক্যের পথে এগিয়ে যেতেই হবে।

: বিজ্ঞপ্তি :

আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা স্থগিত থাকিবে। “বিদ্রবী বাংলা” দশম বর্ষে

জরুরী ভিত্তিতে বন্যকল গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান

নয়াগিল্লী, ২৫শে আগস্ট—

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সমাজ কল্যাণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে বন্যকল গড়ে তোলার কর্মসূচী হাতে নেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

আজ নয়াগিল্লীতে কেন্দ্রীয় অরণ্য পর্ষদের ১৮শ বৈঠকের উদ্বোধন করে তিনি বলেছেন যে এর কলে বন সম্পদের উপর চাপ হ্রাস পাবে।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, বন্যকলের ক্ষতিপূরণ করতে হবে এবং নতুন বৃক্ষরোপণ করতে হবে। বন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে আমাদের কৃষককে বন্যকল গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হবে।

প্রধানমন্ত্রী নিবিচারে গাছকাট', বিশেষ করে হিমালয় অঞ্চলে গাছকাটার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন—বন থেকে খাচ, পবাদি পশুর খাচ এবং আলানী পাণ্ডা দরকার যোগ্য বনে এবং আশেপাশে বাস করেন, এটা তাঁদের আয়ের ভাল পথ হতে পারে।

যত গাছ কেটে কোলা হয়, ততগুলি গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে আরও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ও উৎসাহ উদ্বীপনার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

সো: দৈনিক জননী

বিরুলিয়ায় সম্ভ্রাস, জমি অনাবাদী, মালিকরা গ্রামছাড়া

সানিগ্রাম থানার বিরুলিয়া গ্রামে জমি দখলের নতুন কৌশল আরম্ভ হয়েছে। জমির মালিককে জমি চাষ করবার জন্য লোকজন দেওয়া হচ্ছে না এবং মালিকের লোককেও জমিতে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে পড়ে থাকে জমিতে দলবদ্ধভাবে জোর করে চাষ শুরু করে নতুন ভাগ দখল কার্যে মগ্ন হতে। জমির মালিক ভয়ে সপরিবারে গ্রামছাড়া। এই গ্রামের মানুষ ভূতভরণ বণ্ডা, সিংহাস্ত বণ্ডা, শতদল ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন বাল, প্রভাত জানা, পুলিন মাস্তা, অম্বিনী রবিন দাস, কান্তিপদ মাধা, ভায়া কামিলা, ব্যোমকেশ পণ্ডা, সত্য পাল আরও অনেকে জানানেন তারা ভূবর্তীদের দোরাকায়ে গ্রামে কিংবতে পারছেন না, রাতে রাতে তাদের বাড়ি দলবদ্ধভাবে লোকেরা আক্রমণ চালাচ্ছে।

প্রতিকারের জন্য স্থানীয় বি ডি ওকে জানালে তিনি তদন্ত করে খটনা সত্য প্রমাণিত হলেও কোন নিরাপত্তা দিতে পারেন নি। উর্ধ্বতন সব প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবং সম্বন্ধে সুখামস্বীকেও জানানো হয়েছে। সম্ভ্রান্ত গত ১৫ই আগস্ট অপরাহ্নে এক উন্নত জনতা বিরুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমতী পালের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং তাঁর টালির ঘরের কিছু অংশ ভেঙে দেয়। উন্নত জনতা সি, পি, এম সমর্থক বলে প্রকাশ। পুলিস থেকেও নেই, নিরস্তর।

সো:—জননী

রাষ্ট্রীয় সংহতি

সুবোধ মজুমদার
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উত্তর প্রদেশে, পাক্ষায়ে, দাক্ষিণাত্যেও ঘটাবে। যেখানেই শোষণকার্য ব্যাহত হবে সেখানেই রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্ট হবে। তবে বিহার উড়িষ্যা আসাম অঞ্চলে বিশেষভাবে এই অস্থিরতা জাগিরে রাখা হবে কারণ এই প্রাকলটা হচ্ছে ভারতীয় ধনিক ও শোষক সম্প্রদায়ের স্বর্ন-ধনি। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের মালিকানায কোন বড় শিল্প গড়ে উঠতে দেবে না শোষক সম্প্রদায়। যদি অহমীয়া, উড়িষ্যা বিহারী বা কোন উপজাতীয় গোষ্ঠি আজ কোন গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ব্রহ্ম উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করতে পারে তাহলেই তারা দেখবে তাদের প্রকৃত বন্ধু কে আর শত্রু কে। তখন তারা দেখবে তাদের শিল্প-প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে এগিয়ে আসবে শুধুমাত্র বাঙ্গালীরা, আর বাধা সৃষ্টি করতে এগিয়ে আসবে তাদের আত্মকের দ্বন্দ্ববন্ধু ও উচ্ছান্নাতারা।

এসব আন্দোলন থেকে স্থানীয় অধিবাসীরা একটা শিক্ষা গ্রহণ না করলে ঠকবেন। অহমীয়ারা বাঙ্গালী-বিরোধী আন্দোলন করতে করতে আসাম রাজ্যকে ছয়টি রাজ্যে বিভক্ত করেছেন। উড়িষ্যাবাও যদি বাঙ্গালী-বিরোধী আন্দোলন করেন তাহলে উড়িষ্যারাজ্যও কয়েকটি রাজ্যে পরিণত হবে। বিধায়ে

যদি বাঙ্গালী-বিরোধী আন্দোলন চলে তাহলে বিহার রাজ্যও কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত হবে। আর বাঙ্গালী যদি ইংরেজের দেওয়া তার বাবু-সংস্কৃতি বর্জন না করে তাহলে পশ্চিমবঙ্গও ঠিক থাকবে না। বাঙ্গালী আগে নিজের বাবু-সংস্কৃতি ত্যাগ করবে, তারপর অস্ত্রাস্ত্র রাজ্যেও মধ্যবিত্তরাও তাদের বাবু-সংস্কৃতি ছাড়বে। তাহলেই সকল রাজ্য থেকেই বাঙ্গালী বিরোধী মনোভাব চলে যাবে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যদি আসাম, পিপুয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সমতা স্থাপীতবে সমাধান করতে চান তাহলে প্রথমেই তাদের জানতে হবে শোষক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রস্রোহী ও দেশস্রোহী চরিত্রটাকে, তারপর প্রশাসন থেকে খুঁজে বার করতে হবে শোষক সম্প্রদায়ের গণ্ডগব্দদের। বিগত আমি বৎসরের ইতিহাস অধ্যয়ন না করলে একাজ সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে। তাছাড়া, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে হুমিয়ার হতে হবে বাবু-সংস্কৃতির ধাক্কা ও বাহক ব্যাতিষ্ঠার শ্রেণীর রাষ্ট্রস্রোহী চরিত্র সম্বন্ধে। অন্নপাতা শোষক শ্রেনীর বিরুদ্ধে বাওয়া সম্ভব হয় না বাবু সংস্কৃতি সম্পন্ন লোকদের পক্ষে।

(ক্রমশঃ)

সমগ্র বাঙ্গালী প্রতি জাতীয় অবহেলা ও অপমান প্রতিরোধার্থে

ASSAM VICTIMS' APPEAL To BenGalee Citizens Of India

["If Benglee Rfuges are not legally acmited as Natural Citizens of India by the Government, these unfortunate vicms of freedom of the Country shall have no other alternative but to continue their present 33 years long humiliated 'live and living' like domestic animals in their mother land—but would then, be consequential position of the Citizen-Bengalees in Indina &..... World then Refugees "]

আসামের বর্তমান তথাকথিত 'বিশেষী' বিতাড়নের আন্দোলন, বস্তুত আসামবাসী 'কনৌজি' শ্রেণীভুক্ত লোকদের তাহাদের অস্বীকৃতি 'প্রাধান্ত ও সরকারী ক্ষমতা' বজায় রাখিয়া আসামের জনসাধারণকে শোষণের পরিকল্পনার গঠিত 'অহম সাহিত্য সভা' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত 'চিরাচরিত 'বাঙ্গালী-খেদা' আন্দোলনের নতুন অত্যাচার এবং ভংসহ মহাত্মা গান্ধীজী কর্তৃক উদ্ভাবিত ও অনুপ্রাণিত মহান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারঘাত করিয়া ভারতীয় স্বত্বাধিকার সমাধি রচনা করিয়া ভাঙনের শত্রুশাস্ত্রবাদের মনোরঞ্জন করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে, বর্তমান আন্দোলন, বাঙ্গালী সমাজের সমুদ্রে তাহাদের ভারতীয় নাগরিকদের বিচ্ছেদ একটা আইনগত কঠিন সমস্যা উদ্ঘাটিত করিয়াছে এবং ভারতবাসী বাঙ্গালীদের সমান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। এক অর্ধাংশ, বর্তমানে ভারতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী, ভারতের নাগরিক নয়, আর বাকী অর্ধাংশ আইনত স্বীকৃত ভারতীয় নাগরিক।

ইহা একটি মর্মান্বিত অবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তান ছইতে আগত উদ্বাস্তুদের ভারতীয় নাগরিক বলিয়া আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া আছে, কিন্তু বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের বেলায় সেই বিষয়ে আজ পর্যন্তও স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই; যদিও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ৬জওহরলাল নেহেরু, পরিষ্কার ভাষায় পালিয়ারমেটে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে উক্ত উদ্বাস্তুরা ভারতের নাগরিক এবং বলিয়াছিলেন যে এই বিষয়ে যদি কোন আইনগত অসুবিধা থাকিয়া থাকে, তবে সেই আইন পরিবর্তন করা উচিত। কিন্তু আজ পর্যন্তও নাগরিকদের আইন স্বাধীনভাবে পরিবর্তন করিয়া বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের ভারতের নাগরিক বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। আসাম আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত উদ্বাস্তুদের পক্ষ হইতে আবেদন করিয়াও ভারত সরকারের নিকট হইতে এই বিষয়ে আজ পর্যন্তও কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় নাই।

অন্তর্গতের আসাম ওবা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে আন্দোলনকারীরা সরকারী কর্মচারী ও পুলিশের সহায়তায়, বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের 'বিশেনী' আখ্য। দিয়া তাহাদের উপর অকথা-চার চালাইয়া তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে এবং দিতেছে। হাজার হাজার উদ্বাস্তুদের হত্যা করা হইয়াছে, লক্ষাধিক গুরুতর ভাবে ক্ষতম করিয়াছে এবং তাহাদের বাড়ীঘর শোভাইয়া হারবার করিয়া দিয়াছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বিধায়ন্ত প্রতীক্ষমান হওয়ায়, তাহারা এখন জীবনের ভয়ে সেখানে হইতে দলে দলে চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে যেভাবে অত্যাচারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার তুলনা হয়না এবং এই অত্যাচার সহ্য করিয়া আর সেখানে জীবনধারণ করা সম্ভব হইতেছে না। ভারত সরকারের কি মনোগত ইচ্ছা তাহাও বুঝা যাইতেছে না।

উক্ত উদ্বাস্তুদের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে ভারতের জন্মগত নাগরিক বলিয়া আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী জানাইয়া গত কংসর অক্টোবর মাস হইতে এই রাজধানীতে আমরা সত্যাপ্রহ ঘোষণা করিয়া আন্দোলন করিতেছি। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে এই মরিচ ও অসহায় উদ্বাস্তুদের আন্দোলন বিশেষ কার্যকরী হইতেছে না। এবং বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের হযত নাগরিকবহীন হিসাবেই ভারতে থাকিতে হইবে, বলিয়া মনে হয়।

এই উদ্বাস্তুদের প্রকৃত পরিচয়, তাদের প্রতি প্রদত্ত ভারতীয় জাতীয় প্রতিশ্রুতি এবং এদের বিঘ্নে ভারত সরকারের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্বের কথা বলিয়া লাভ নাই। ভাবিয়া ও চিন্তা করিয়াও লাভ নাই। ধরিয়া নেওয়া যাক, উদ্বাস্তুদের ভাগ্যে আছে এইভাবে অত্যাচারিত হইয়া তাহাদের ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু সকলেরই ভাষা উচিত, সেই বাঙ্গালীদের কথা বাহারা আইনগত ভারতের নাগরিক এবং বড়ই নিশ্চিত আছেন। বাঙ্গালী ব্রিকিউজীদের ভারতের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া না হইলে এই ভারতীয় নাগরিক বাঙ্গালীদের অবস্থা ব্রিকিউজীদের চেয়ে আরোও লক্ষ্য ও অপমানজনক হইতে বাধ্য। কারণ, বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা ভারতের নাগরিকত্ব না পাইলেও এবং ভারতের নাগরিক হিসাবে কোন সুযোগ সুবিধা না পাইলেও তাহারা দ্বিগুণিত শ্রমীর লোক হিসাবে এই ভারতের বুকেই, নাগরিক বাঙ্গালীদের আশে পাশে, অবস্থান ও বিচরণ করিয়া থাকিবে, কারণ তাহারা না মরা পর্যন্ত যাইবে কোথায়? এবং সুযোগমত মিথ্যার আশ্রয় নিয়া ভারতীয় নাগরিকের স্বত্ব—সুবিধা উপভোগ করার চেষ্টাও অবশ্যই করিবে।

এমত অবস্থায়, একই গোষ্ঠী, শ্রেণী বা জাতিভুক্ত লোক হিসাবে ভারতীয় নাগরিক সদাশিব বাঙ্গালীরা তাদের স্বাভাবিক বজায় রাখিয়া চলিবেন কিরূপে? এই উদ্বাস্তু জীবনের মানির আঁচড় তাহাদের পায়ে লাগিতে বাধ্য। বাঙ্গালী বিষেবীরা এই সুযোগের সদ্যবহার করিতেও ছাড়িবেনা।

সুতরাং নাগরিক বাঙ্গালীদের, আইনগত কারণেই প্রত্যেকের পকেটে একটি ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ পত্র (Certificate of Citizen-ship in cases of doubt) সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। বাঙ্গালীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর, অর্থাৎ নাগরিক ও নাগরিকত্বহীন লোক থাকার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই Certificate of Citizenship না দেওয়া, নাগরিক বাঙ্গালীদের প্রাণা সুরোপ সুরোপ দেওয়া সম্ভব হইবে না। সৈন্যদল জীবনের প্রায় ক্ষেত্রেই ইহা প্রদর্শনের প্রয়োজন পড়িবে। যেমন সম্পত্তি অর্জন, ব্যবসা—বাণিজ্য, ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা, চাকুরী, আইন-আদালতের সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি। (দিল্লীর DDA কর্তৃপক্ষ, তাহাদের Flat-এর বাঙ্গালী এ্যাপলোটাদের নিকট এই কারণেই এই Certificate of Citizenship দেখিতে চাইয়াছে)। আমরা নাগরিক বাঙ্গালীদের বিশেষ কারণে এই প্রচার পত্র মারফৎ হাশিয়ায় করিয়া দিতেছি, এবং অনুরোধ করিতেছি, সমস্ত থাকিতে এই বিষয়ে সচেতন হইয়া যত্নসহকারে করিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত রাখুন হইতে আরম্ভ করুন সচেষ্ট হউন। আমরা পরিস্কার ভাষায় জানাইয়া দিতে চাই যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের যদি আভাবিক নাগরিক রূপে স্বীকৃতি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী নাগরিক বাঙ্গালীদের অবস্থা উদ্বাস্তুদের চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ, কঠোর এবং অপমানজনক হইতে পারে।

কারণ বর্তমান আইনগত ব্যবস্থা অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে যে নিয়ম ও পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, তাহা লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সেই একই আইনের আর এক ধারার বিধান অনুযায়ী, সেই একই পদ্ধতিতে নাগরিক বাঙ্গালীদের তাহাদের ভারতের নাগরিকত্বের 'প্রমাণ পত্র' সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ লোকের সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ হওয়ার, সেই উদ্বাস্তুদের মতো একই অবস্থার অবস্থার তাহারা পড়িবেন। কিন্তু উদ্বাস্তুরা যেমন এখন বিকল্প আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে তাহাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দাবী করিতেছে, সেই রকম কোনো বিকল্প দাবী নাগরিক বাঙ্গালীদের পক্ষে করার উপায় থাকিবে না।

আবার, উদ্বাস্তুদের রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেনশিপ (Registration of Citizenship) মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইনগত অধিকার ভারতের সমস্ত District Magistrate কে দেওয়া আছে। কিন্তু Certificate of Citizenship in case of doubt মন্ত্রণালয় কর্তৃক একমাত্র ভারত সরকারের Secretary-র হাতে। এবার চিন্তা করুন বাস্তব অবস্থাটা।

তাহার, উদ্বাস্তুদের Registration of Citizenship এর দরখাস্তের ক্ষমতা কোন Fee লাগে না, কিন্তু Certificate of Citizenship এর দরখাস্তের ক্ষমতা বর্তমানে দাঁড়ানো Fee—Rs. 27.50p

সরকার; এই 'Certificate of Citizenship in case of doubt' একমাত্র শুধুমাত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক হইবে যখন আপনি আইনগত প্রমাণপত্র, হলিগ ইত্যাদি উক্ত সেক্রেটারি মন্ত্রণালয়ের দরখাস্তে দাখিল করিয়া আপনার ভারতীয় নাগরিকত্বের দাবী নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। কিন্তু উদ্বাস্তুদের Registration of Citizenship এর ক্ষমতা কোন প্রমাণ পত্রই দাখিল করিতে হয় না।

উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এতদূর সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের পক্ষে দরখাস্ত করিয়া ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করা বাস্তবে সম্ভব হয় নাই। নাগরিক বাঙ্গালীদের অধিকাংশই কল্পে ঠাড়াইবে তাহা কি আরও বিশদ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন আছে ?

ইচ্ছাং বাঁচাইবার একমাত্র উপায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে একত্রে আগাইয়া আসিয়া প্রয়োজনীয় আন্দোলন করিয়া উদ্বাস্তুদের ভারতের জন্মগত নাগরিক বলিয়া আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করিয়া এই স্বীকৃতি আদায় করা।

তাই সমগ্র বাঙ্গালীদের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা যে আপনারা নিজস্বার্থে অধস্তার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবীর সমর্থনে সক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় আন্দোলন আরম্ভ করিয়া সরকারের নিকট হইতে এই দাবী আদায় করুন।

বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের দাবী

‘হয়, ভারত সরকার যেভাবে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের ভারতের নাগরিকত্ব দিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে তাহাদেরও ভারতের নাগরিক বলিয়া স্বীকৃতি দিন এবং ক্ষতিপূরণ সহ তাহাদের পূর্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করুন—না হয়তো তাহাদের তিলে তিলে না মরিয়া ‘Gas Chamber’-এর ব্যবস্থা করুন।

Either—Admit Bengalee Refugees as Natural Citizens of India and rehabilitate them with full compensation :

Or—put them all at a time into a ‘gas-chamber’ to get rid of Refugees’ botheration :

“এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য আমরা সকলের নিকট আর্থিক সাহায্যও প্রার্থনা করি”

পরলোকে

প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী

বিগত ১০ই আগষ্ট রিষড়া সেবাসদনে প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘটক ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১৯২১ সনে মহাৎকা গান্ধীর আহ্বানে ঘর ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। প্রোভিট আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে বার বার কারাভোগ হন। কিন্তু ঘরে আর ফিরে যান নি। তিনি অকৃতকার ছিলেন। এই নির্ভীক নির্ভাবান আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রামীর অমর আত্মা শান্তি কামনা করি।

॥ সবজি ॥

—কনক কমল চট্টোপাধ্যায়

বর্তমানে জমিতে পাওয়া যায়, আপনার গৃহসংলগ্ন জমিতে শাক সজির চাষ করুন। এতে অন্ততঃ পরিবারের দৈনিক প্রয়োজনীয় সজির চাহিদা মিটেতে পারে। সজির সঙ্গে সম্ভব হলে পেঁপে, কলা, লেবু পাছও আপনি লাগাতে পারেন। শাক সজিতে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, প্রোটিন জাতীয় উপাদান ও ভিটামিন থাকায়, শরীরের কনুপূরণ ও বৃদ্ধিসাধনে সাহায্য করে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে একজন প্রাপ্ত বয়স্কের প্রতিদিন ২৮০ গ্রাম সজি বাওয়া দরকার। এর মধ্যে ১১২ গ্রাম সবুজ শাকপাতা ও সজি, ৮৪ গ্রাম মূলজ সজি এবং ৮৪ গ্রাম অল্প রকমের।

পাতাজাতীয় সজি বলতে বিভিন্ন ধরনের শাক, কচি কচি সজনে পাতা, বাঁধাকপি প্রভৃতি বোঝায়। এইসব পাতাজাতীয় সজি সেহের পুষ্টির জন্য খনিজ লবণ, বিশেষ করে চুণ ও লৌহ ভিটামিন যোগান দেয়। আবার বীজ জাতীয় সজি যেমন মটরশুঁটি, বরবটি, সিম, কচিচুড়া ইত্যাদি বোঝায়। এদের থেকে সেহের গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ভিটামিন ‘সি’ অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ফল জাতীয় সজি বলতে কাঁচালম্বা, পেঁপে, টমাটো, কচি কাঁঠাল ইত্যাদি বোঝায়। ভিটামিন ‘সি’ টমেটোতে বেশী পাওয়া যায়। পুষ্টির অন্তর্গত ফলজাতীয় সজি হোল সজনে, বেগুন, ঢেঁড়স, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি। সজনেতে চুণ ও ভিটামিন ‘সি’ পাওয়া যায়। এছাড়া মিষ্টিআলু, আলু, ওল, কচু, বীট, গাজর, মুলো ইত্যাদি কন্দ ও মূল জাতীয় সজিতে ভিটামিন ‘সি’ শর্করা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায় গাজের ও মিষ্টিআলু থেকে।

চাষবাস বিষয়ে একটু জ্ঞান থাকলে এবং প্রতিদিন কিছু সময় নিতে পারলেই আপনি সুনন্দর একটি সজি বাগান তৈরী করতে পারবেন। প্রয়োজন হলে স্থানীয় কৃষিকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

সবজি চাষ করতে হলে কয়েকটি দরকারী কথা জেনে রাখা দরকার। তা হোলো, (১) উঁচু ও সমতল, আলো বাতাস পূর্ণ এবং সেচ ও জল নিশ্চায়নের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এমন জমিই বেছে নিতে হবে। (২) জমিকে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে প্রাচুর্য মতো সবজি লাগাবেন। (৩) জমি সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। (৪) সময়মত সবজি চাষে যে সময় ছোট ছোট বরপাতি যা লাগে তা সংগ্রহ করে রাখুন। যত্নপাতি বলতে নিড়ানি, ধূসি, হাত কোলালি, কাঁকরি জল দেওয়ার জন্য, ছোট স্ট্রোরার ও ভাট্টার ওষুধ ছোট্টনোর জন্য ইত্যাদির কথাই কছি। (৫) গৃহসংলগ্ন আপনার জমি যদি বেশী থাকে তাহলে অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এমন সবজি যেমন পেঁপাছ, রমন, আলুর চাষ করতে পারেন। এছাড়া প্রয়োজনমত ফলসহ যেমন কলা, নেলু, পেঁপেও লাগাতে পারেন। (৬) সবজি চাষে জৈব সার সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে বাগান বা জমির একপাশে একটি বা দুটি গর্ত খুঁড়ে তাতে আবছা না ফেলে পচিয়ে কম্পাষ্ট সার তৈরী করে নিতে পারেন।

(এর পর ১২ পাতায় দেখুন)

ভাষাতত্ত্ব বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ কীর্ত্তন নব ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুলিন বিহারীর নেতৃত্বকালেই বহির্ভূত অমূল্যলীন সমিতির স্বেচ্ছাসেবক প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধকালে যে উত্তর ভারত ব্যাপী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল এই সূত্র ধরেই পুলিন-বিহারী প্রথমে কাজ আরম্ভ করেন। এবারে উত্তর প্রদেশে কাশীকে কেন্দ্র করেই বহির্ভূত কাজ করা স্থির হয়। কাশীতে বাঙ্গালীদের পক্ষে কাজ করার কিছুটা সুবিধা আছে। কাশীর সঙ্গে বাঙলা দেশের সম্পর্ক বহুদিনের। শহরের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বাঙালী। কাশীর বাঙালীটোলা একটা ছোটখাটো বাংলাদেশ। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই ১৯১১ সালে অমূল্যলীন সমিতির নেতৃত্বানীত কর্মী অমৃত হাজরা সহজে কাশী বিপ্লবী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা শচীন সাক্সালের পরিচয় পড়ে। এই পরিচয়ের ফলে শচীন্দ্রনাথ অনেকটা অমূল্যলীন সমিতির কর্মী হয়ে পড়েন। অমূল্যলীন সমিতির বিশিষ্ট কর্মী নগেন্দ্রনাথ দত্ত রাসবিহারীর সহকর্মীরূপে কাশীতে ছিলেন। কাশী বড়বস্ত্র মামলায় তিনি দণ্ডিত হয়েছিলেন।

দশভোগ কালে ১৯১৮ সালে আগ্রাঙ্গেলে তাঁর মৃত্যু হয়। মহাযুদ্ধের আগেই অমূল্যলীন সমিতির আরও কয়েকজন কর্মী কাশীতে গিয়ে বৈপ্লবিক কাজ কর্ম করতে আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে ত্রিপুরা জেলার শশী মজুমদার একজন। শশীবাবু কুমিলার এক জমিদার পরিবার হুক্ত ছিলেন। তিনি ধনামন্যাত বসন্ত মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অমূল্যলীন সমিতির নেতা কেন্দ্রাধর সেন এবং তরুণী সোমকেও সমিতির পক্ষ থেকে কাশীতে বৈপ্লবী সংগঠন গড়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা দুজনেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পুলিনবিহারীর নেতৃত্ব কালেই উপেন্দ্রনাথ বর কাশীতে গিয়ে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়তে আরম্ভ করেন। উপেন্দ্রনাথ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচিত্র নাট্যায়ণ শর্মার সহপাঠী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ রূপান্তর হয়েছিল। এই বন্ধুত্বের ফলে বিচিত্রবাবু কাশীতে অমূল্যলীন সমিতিভুক্ত হয়েই কাজ করতে থাকেন। বিচিত্রবাবু পরে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেস পরিবেশন কালে কাশী সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন প্রবোধেন্দু রায়।

১৯২১-২২ সালে স্বামী সত্যানন্দ কাশীতে ছিলেন তাঁর পূর্ব নাম প্রফুল্ল সেন। তিনি করিমপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। কাশীতে তিনি কল্যাণ আশ্রম নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সন্ন্যাসী রূপেই তিনি বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। কাশী থেকে তিনি মালয়ে গমন করেন। সেখানে তিনি মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিভিন্ন মহাযুদ্ধের সময় তিনি রাসবিহারীবাহুর সহকর্মীরূপে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন। সিলাপুর থেকে জাপান যাত্রা কালে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। স্বামী সত্যানন্দ পুত্রের কাশী ত্যাগ কালে অল্প একজন ব্রহ্মচারী কল্যাণ আশ্রমে ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল শচীন্দ্র চক্রবর্তী।

১৯২৫ সালে সমিতির উদ্দেশ্যে টাকা জাল করার সময় ধরাপড়ে তিনি গৃহীত হন আগেই বলা হয়েছে। আসলে কল্যাণ আজম ছিল কাশীতে বিপ্লবী সংগঠনের কেন্দ্র ১৯২১ সালের প্রথম দিকে ঠানপুরের গ্রাম চক্রবর্তী দলীর নির্দেশে কাশীতে আসেন। তিনিও অমূল্যলন সমিতির বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। এর কিছুদিন পরে ক্ষেত্র সিংহ এবং তাঁর ভাই সত্যীশ সিংহ কাশীতে আসেন।

১৯২৩ সালে সত্যীশ সিংহ কাশী বিপ্লবী কেন্দ্রের পর প্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। সিংহ ত্র্যম্বকও ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী ছিলেন। কাশী বিপ্লবী কেন্দ্রকে অমূল্যলন নেতৃত্ব দ্বারা বিশেষ শক্তিশালী কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন। কারণ এখান থেকে সমগ্র উত্তর ভারতের বৈপ্লবিক কাজ কর্ম নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও কাশীতে বৈপ্লবিক কাজ কর্ম আশাশ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল না। একদল বোম্বার্ডার কর্মীর স্থান চলছিল।

১৯২১ সালের শেষ দিকে ত্রিপুরা জেলার বিশিষ্ট কর্মী ঐক্যবোধ চ্যাটার্জীকে বাঙালার বাইরে কোথাও বৈপ্লবিক সংগঠন গড়বার কাজে নিয়োগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। একদল প্রথমে তাঁকে আসামে পাঠানো হয়। অমূল্যলন সমিতির নেতা ঐক্যবোধ গান্ধী বোম্বার্ডার বাক্যে আসামে গিয়ে বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে বোম্ব দিতে বলেন। প্রতুলবাবু তাঁকে শিলচর, ঐহট, করীমগঞ্জ এবং শ্রুতামগঞ্জে কয়েকজন সমিতির কর্মীর চিকানা দেন। এই সমস্ত চিকানা নিয়ে বোম্বার্ডার বাবু এই সকল ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ঐনিহার রায়। শ্রুতামগঞ্জে বোম্বার্ডার সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী ধরনী গোখরামীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। ধরনীবাবু পরে অমূল্যলন সমিতির সম্পর্ক ত্যাগ করে কমিউনিস্ট দলে বোম্ব দিতেছিলেন। তিনি মৌর্যট বড়োয় মামলার দণ্ডিত হন।

আসাম ভ্রমণ করে ফিরে এসে বোম্বার্ডারবাবু জানতে পারেন যে বোম্বাইতে সমিতির কাজ ভালভাবে চলছে না। প্রতুল বাবু বোম্বার্ডার চক্রকে বোম্বাইতে গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে বলেন। কিন্তু বোম্বাই বাঙালার আগেই প্রতুলবাবুর সহকারী ঐক্যবোধ ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেন যে বোম্বার্ডার বাক্যে বোম্বাই না পাঠিয়ে কাশী কেন্দ্র পাঠানোই সঙ্গত বর্তমানে। কাশী কেন্দ্র একজন উপযুক্ত সংগঠন কর্মীর প্রয়োজন। প্রতুল বাবু এই অসিত বাবুর প্রস্তাব মেনে নেন। এই অমূল্যলন বিস্তারিত নির্দেশ দিয়ে বোম্বার্ডারচক্রকে দুই প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে বোম্বার্ডারচক্র বাঙালার ত্যাগ করে কাশী রওনা হয়ে যান।

এর কিছু দিন আগেই ১৯২০ সালে শচীন্দ্রনাথ সন্তাল আন্দোলন থেকে মুক্তি পান। অমূল্যলন নেতৃত্ব প্রথমে তাঁকেই বুদ্ধ প্রদেশ সংগঠনের ভার নিয়ে পাঠান এবং সমগ্র উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক সংগঠন সম্প্রসারণ করতে বললেন। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ এই সময়ে বলেন যে তিনি বিপ্লবী কাজ কর্মের মধ্যে আর থাকতে চান না। এই সময়ে তিনি কাশী ছেড়ে এলাহাবাদে গিয়ে বাস করতে থাকেন। পাবনা জেলার আন্তোভা লাহিড়ীর কন্ডাকে তিনি বিয়ে করেন। এই কন্ডাই

যুক্ত প্রদেশ সংগঠনের ভার দিবে বোগেশচন্দ্রকে কান্দীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে নিদেশ দেওয়া হয় যে পুরাতন অভিজ্ঞ কর্মী হিসেবে তিনি যেন প্রয়োজন মত শচীন্দ্রনাথের পরামর্শ এবং সাহায্য গ্রহণ করেন। বোগেশচন্দ্রকে আরও বলা হয় যে তিনি যেন শচীন্দ্রনাথকে বৈপ্লবিক কাজকর্মে আগ্রহশীল করে তুলবার চেষ্টা করেন। বোগেশচন্দ্র কান্দী পৌঁছে তার প্রাপ্ত কর্মী সতীশ সিংহের নিকট থেকে জানতে পারেন যে শচীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক কাজকর্মের আগ্রহ আগের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় সতীশ সিংহ ও ক্ষেত্র সিংহ কান্দী সংগঠনের ভার নিয়ে কাজ করছিলেন। বোগেশচন্দ্র কান্দী পৌঁছে কয়েক দিনের মধ্যেই এলাহাবাদ গিয়ে শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। শচীন্দ্রনাথ বোগেশচন্দ্রকে বলেন যে বাড়লা সংগঠনের সঙ্গে পূর্বের দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে চলতে তাঁর আপত্তি নাই কিন্তু এ সম্পর্কে তিনি বাংলা দেশের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে আগে আলোচনা করতে চান। শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার বোগেশচন্দ্র বলেন যে শচীন্দ্রনাথ যুক্তপ্রদেশ সংগঠনের কিছুটা স্বাধীনতা চান।

অমূলীলন সমিতির প্রথম পর্বে বাড়লার সংগঠন শচীন্দ্রনাথের কান্দী সংগঠনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। উভয় সংগঠন যুক্ত সংগঠনরূপে রাসবিহারীর নেতৃত্বাধীনে ভারত বাপী সমস্ত অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিল। রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বেই কান্দী সংগঠন অমূলীলন সমিতিত্যাগ হয়েছিল। এ সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ বলেন, 'পুলিন বাবুর পরে বাঁহারা ঢাকা সমিতির নেতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন তাঁহারা বৃষ্টিতে পারিয়া ছিলেন যে দেশের বিভিন্ন বিপ্লবী দল মিলিয়া মিশিয়া সম্পূর্ণ এক হইতে না পারিলে দেশের মঙ্গল নাই। তাই তাঁহারা দেশের সকল দলের সহিতই মিলিবার জন্ত ইচ্ছুক ছিলেন। সেই জন্তই সম্ভবত বরিশাল বড়বস্ত্র মামলার সময়েই ঢাকা সমিতি চন্দননগর দলের সহিত মিলিত হইয়া যায়। কান্দীর দল ঢাকা সমিতির মাধ্যমেই রাসবিহারীর উত্তর ভারত দলের সহিত পরিচিত হয়। (বন্দী জীবন দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২০-২৪)

(ক্রমশ)

(১২ পাতার পর)

এই সারে উদ্ভিদ খাজের শতকরা পরিমাণ হোল, নাইট্রোজেন ১.০, ফসফেট ১.০, পটাশ ১.০। আপনার সবজী চাষের জৈবসার প্রয়োগের চাহিদা মিটে যাবে। (৭) বীজই হোল প্রথম কথা। সব-লক্ষ্য রাখতে হবে বীজ যেন বেগে পোকা মুক্ত উৎকৃষ্ট মটিক জাতের হয়। এর জন্য বিস্তৃত প্রতিষ্ঠান, উন্নীত সবজী চাষীভাই বা কৃষি বামার থেকে সংগ্রহ করবেন। (৮) পোশাক মাটি সবজী চাষের পক্ষে বর ভালো। কমি ভাগভাবে চাষে, ইট পাথরের ইকরো, আগছা শক্ত শেকড় বেছে মাটি খুব ফ্রুয়েত হবে। (৯) বীজ বোনার আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে নিশ্চয়ই। সাধারণতঃ প্রতি কেজি তার জন্য তিন গ্রাম এগ্রোসেন কি এন্‌সাগে। (১০) বন্ধগবেষণ বা যত পরিচর্যা : যা এনে দেবে

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address July—1980	Amount Rs.	Date
Dist—CALCUTTA			
Baak Smt Sova Rani w/o Late Haripada Baak (alias Baakya)	12, Dilkhuse Street Calcutta-17	100	8 8 79
Gupta Smt Shanti w/o Late Probodh Chandra	2/56, Netajinagar Calcutta 40	200	3 4 80
Nag Smt Parul Bala w/o Late Jagadish Ch. Nag	35 Darpa Narayan Tagore Street Calcutta 6	100	2 3 80
Neogy (1) Smt Kamala & (2) Smt Santi w/o Late Shudhindra Neogy	(1) Flat No. 2 Block B MIG Housing State Calcutta 54 (2) 76/D, Jawpur Road Cal. 74	100	7 3 79
Sarkar Kumari Rumi d/o Late Smt Santl Sarkar	10/31 A, Netajinagar Calcutta 40	100	22 2 81
Singh Smt Gurbachan Kaur w/o Late Harkishan Singh	2 Haradhan Dutta Lane Calcutta 2	150	17 12 79
Dist—HOWRAH			
Banerjee Smt Sulakshna w/o Late Bhajendra Nath	P. O. Andal Mouri Andal Purbapara	200	21 3 79
Bhattacharjee Smt Kanchanprova w/o Late Priyanath Bhattacharji	Vill. Nabanagar P. O. Dhuliyā	150	23 11 79
Dist—HOOGHLY			
Devi (Banerji) Smt Bisheupriya w/o Late D. N. Banerji	P. O. Dhaniakhali	150	1 4 80
Devi (Chakraborty) Smt Kusumkumari Mother of martyr Nripendra Kr. Chakraborty, Pathakbagan Chinsura		100	1 10 76
Mondal Smt Bijoli w/o Late Sailendra Nath Mondal	P. O. Chinsura	150	18 4 80

Dist—24 PARAGANAS

Chakraborty Smt Bina	12, Talbagan Road, Nona	150	24 4 80
w/o Late Rebati Chakraborty	Chandanpukur, P. O. Barrackpur		

Dist—NADIA

Biswas Krishna Bhabu	P. O. & Vill Gopinathpur	100	1 4 80
w/o Late Sishir Kr. Biswas			

Dist —MURSHIDABAD

Bhattacharyya Smt Rama Devi	Radberghat, Khagra	100	15 10 79
w/o Late Narayan Ch. Bhattacharyya			
Chowdhury Smt Kamala	Banspatta Lane	200	27 11 78
w/o Late Sital Ch. Chowdhury	P. O. Khagra		

Dist—BURDWAN

Bagchi Suresh Chandra	St. No. 65 Qr. No. C—19A	200	1 4 80
	P. O. Chittaranjan		
Chowdhury Smt Tulsi Bala	P. O., Vill Palsuraj	150	16 3 80
w/o Late Achutananda			
Kumar Smt Sovu Rani	P. O. & Vill Baidyapur	150	12 1 79
w/o Late Suresh Kumar			
Mukherjee Smt Proba Rani	Vill Kulchanda P. O. Bhatar	150	27 3 80
w/o Late Sarojit Prosad Mukherjee			

Dist—MIDNAPUR

Bera Smt Chayamoni	P. O. & Vill Depal, Union No 6	200	18 2 79
w/o Rakhal Chandra Bera			
Bose Smt Sudharani	Narpota (Tamluk Town)	200	4 5 80
w/o Late Jitendranath Bose			
Chakraborty Smt Kamala	Barbaisavpur P.O. Midnapur	100	15 3 79
w/o Late Amulya Ratan Chakraborty			
Maity Kumari Satadal		100	28 2 80
d/o Late Motilal Maity & Late Charubala Maity	(until marriage)		
Pahary Smt Puti Bala	Bikalmunda, P. O. Phandur	100	8 12 75
w/o Late Iswar Chandra Pahary			

০/৩০

বিশ্ববী পুস্তকমালা

অনুশীলন সমিতির বিমল গ্রন্থ—প্রবেশিকা বই—০.০০

বিশ্ববী প্রধানমন্ত্রীর বার্ষিক—১.০০



- | | |
|--|---|
| ১। বাঙালি অভিধান—১.৫০ | ২। বহিঃজাত ভারতীয় বিমল গ্রন্থ—১.০০ |
| ৩। অনুশীলন সমিতির দি, দিকি—২.০০ | ৪। সৌহার্দ্য সংগ্রাম কাহিনী—১.০০ |
| ৫। কাকোয়ী পত্রিকা—১.২৫ | ৬। মিলন বামাঃ সংগ্রাম কাহিনী—১.০০ |
| ৭। গান্ধীজী ও অনুশীলন সমিতি—১.৫০ | ৮। স্বাধীনতার পথের দা ও মেরে—১.০০ |
| ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—১.৫০ | ১০। বিশ্ববী বিবেকানন্দ—১.৫০ |
| ১১। বহুভাষ্য ও প্রভাষ্য—১.৫০ | ১২। ভারতের নব্যজাগরণ ও জননী বিবেকানন্দ—১.৫০ |
| ১৩। দেশ বান্ধে ভোলেমি (১)—১.০০ | ১৪। দেশ বান্ধে ভোলেমি (২)—১.০০ |
| ১৫। পত্রিকা প্রকাশনার আদায়—১.৫০ | ১৬। এই এপ্রিল ভারতীয় পত্রিকা বিবল—১.০০ |
| ১৭। হাতিম হুজা প্রভৃতি—১.৫০ | ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—১.৫০ |
| ১৯। ভারতের ভারতীয় পত্রিকা ইতিহাস—১.৫০ | ২০। হাতি হুজা প্রভৃতি—১.৫০ |

প্রতিষ্ঠান :—৫০০ বঙ্গবন্ধু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

টেলিগ্রাফ :—১/১/১/A কলিকাতা-৭০০০০৭

— সম্পাদক প্রভৃতি —

উপদেষ্টা সভাপতি (মহাপতি) :—শ্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রধান চ্যাম্পিয়ন
সম্পাদক :—শ্রী শ্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সিদ্ধির বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা :—শ্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রধান চ্যাম্পিয়ন
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রধান চ্যাম্পিয়ন

সিদ্ধির বাংলা কার্যালয় :—৫০০ বঙ্গবন্ধু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

ফোন :—১/১/১/A কলিকাতা-৭০০০০৭